৭ম খণ্ড । ঢাকা—বৈশাখ, ১৩২৪ । ১ম সংখ্যা ।

বর্ষ-বোধন ।

গিয়াছে সে যাক্ যাক্, জরায় শিথিল দেহ,
বিষাদ-বিধুর,
ডুবে যাক্, মিশে যাক্, নিশান্তের শশীসম
বিশীর্ণ পাণ্ডুর ;
কুণ্ঠিত মন্থর গতি, লাজ-নত ব্যর্থতায়,
বহি' শ্রান্ত প্রাণ,
আহা সে গিয়াছে যাক্ দু'ফোঁটা আঁখির জল
লভি' শেষদান ।

বিশীর্ণ কানন-বীথি, শুষ্কপত্র মরমর,
হাহাকার বায়,
বসন্তের চিতানল ভস্মরাশি-অবশেষ
কানন-ছায়ায় ;
ফুরায়েছে পুষ্পসাজ, আনন্দ-সঙ্গীত-রব,
নূপুর-শিঞ্জন,
লুণ্ঠিত কবরীমালা, বিলুপ্ত অলকবাস,
ফাগ-আলিম্পন ।

কে এল কে এল ওই নবীন প্রভাতে বাহি'
আলোক-নির্ঝর,—
নবছন্দে নবরূপে নব দৃপ্ত গরিমায়
চপল সুন্দর !
ফুৎকারে উড়ায়ে দিয়া শুষ্কপত্র ঝরাফুল
চিতাভস্ম প্রায়,
জরায় জাগায়ে প্রাণ কে এল বিজয়ী আজ
নবীন উষায় !

এস এস হে প্রবীণ ! হে অনাদি পুরাতন !
ধরি' নববেশ,
লাবণ্য-তুলিকা দিয়া লুপ্ত করি' অঙ্গে অঙ্গে
জড়িমা অশেষ ।
যত ভুল যত ভ্রান্তি, যত ক্ষতি অপূর্ণতা,
যত পরাজয়,
সকল ভুলায়ে আজি জাগাও আনন্দ আশা
সারা বিশ্বময় ।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ ।

সাহিত্যে নবীন পন্থা।

"যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী তাহাকে আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না।"

—স্যর আশুতোষ।

আমার বেশ মনে আছে ছেলেবেলায় প্রথম যখন উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করি তখন একটা বিষয় আমার মনটাকে বড়ই আলোড়িত করিয়া দিয়াছিল। দেখিলাম, নায়ক নায়িকা অনবরত প্রেমই করিয়া যাইতেছেন, একে অন্যের নিকট বড় বড় চিঠি লিখিতেছেন; দেখা হইলেই বলিতেছেন, 'ভালবাস'?—'বাসি'; উচ্ছ্বাস, হা হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাসে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়া যাইতেছে; দর্শন, শ্রবণ, মনন সবই ঐ 'বঁধুয়া' ভাব; পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরাগ এবং আরও কত কিছু তাতে রহিয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাইলাম না একটা জিনিস, সেটা আর কিছু নয়, নায়ক নায়িকা অর্থাৎ যারা ভালবাসে এবং পরে বিবাহ করে কিংবা বিবাহ করিতে পায় না বলিয়া আপিং খায় তারাও যে সংসার করিয়া থাকে—তাদেরও যে খাওয়া পরা দরকার হয়, তাদেরও যে ভাইবোন পিতামাতা থাকে, তাদেরও যে বাড়ীঘর থাকে এবং তাহা দেখিয়া শুনিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাদেরও যে ঝি পলায় এবং চাকরকে শাসন করিতে হয়, তাদেরও যে বন্ধুবান্ধব আসিলে দেখা করিতে হয় এবং 'আহা' 'উহু' ছাড়া অন্যরকম কথাবার্ত্তাও কহিতে হয়,—আমার ভাগ্যে প্রথম যেসব উপন্যাস জুটিয়াছিল তাতে এ সত্য কথাটা খুঁজিয়া না পাইয়া আমার মনটা বড় আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তখনও বোধহয় পূর্ণযৌবন আসে নাই, তখনও কৈশোরের অজ্ঞতা মন হইতে বোধহয় একেবারে দূর হয় নাই, তাই উপন্যাসে এক নায়িকা ছাড়া অন্য সব জিনিষেরই অভাব দেখিয়াও তার অর্থ বুঝিতে পারিতাম না।

ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় জ্ঞানও একটু বাড়িয়াছিল। তখন জানিতে পারিয়াছিলাম যে পুরুষ এবং প্রকৃতি ছাড়া জগৎ-সৃষ্টির জন্য আর কিছু আবশ্যক হয় নাই; এবং নায়ক ও নায়িকা ছাড়া উপন্যাস ও কাব্যের অন্য কোন উপাদান অনাবশ্যক।

অনেক শব্দ আছে যার পূর্ব্বে 'মহচ্ছব্দো ন দীয়তে,' দিলে অর্থ অন্যরূপ হইয়া যায়; যেমন ব্রাহ্মণ ও মহাব্রাহ্মণ, যাত্রা ও মহাযাত্রা। 'কাব্য' এই শব্দটী সম্বন্ধে এই নিয়ম কোথাও কেহ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানি না; কিন্তু তথাপি রামায়ণ ও মহাভারতকে কাব্য না বলিয়া মহাকাব্য বলায় এই অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, এরূপ বলা যায় না। প্রেম করা ছাড়া মানুষের জীবনে অন্য যাহা কিছু ঘটে তাহাও অনেক, বোধহয় সবই রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে; এ দুই সুতরাং কাব্য নয়, মহাকাব্য।

তারপর 'কাদম্বরী,' 'বাসবদত্তা' 'বিক্রমোর্ব্বশী' প্রভৃতির যুগ। সেগুলি কাব্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে শাসিত। সুতরাং সেগুলিতে শৃঙ্গার-রসকে মূল করিয়া তাহারই বিকাশের জন্য অবশ্যই দুই এক জন সখা-সখীর আবির্ভাব দেখা যায়—দুই একটা অবান্তর ঘটনারও সন্নিবেশ দেখা যায়; কিন্তু যে বয়স্য বা যে বিট, চেট প্রভৃতি উপস্থিত হয়, নায়কের প্রেম-স্ফূর্ত্তির সাহায্য করা ছাড়া জীবনে তাদের অন্য কোন কাজ করিতে হয়, এরূপ বোধ হয় না; যে সখীর কথা বলা হয়, তিনি নায়িকা মূর্চ্ছিতা হইলে তাঁহাকে পদ্মপত্রে শয়ন করাইয়া ব্যজন করা ছাড়া অন্য কোন কাজ করেন, এরূপ বলা হয় না; যে দুই একটা অবান্তর ঘটনার বর্ণনা করা হয় তার মধ্যে স্বপ্নই বেশী। স্বপ্ন দেখা—বিশেষতঃ আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিবিশেষের স্বপ্ন দেখা—আমাদের জীবনে খুব একটী প্রধান ঘটনা নয়। অথচ, এ ছাড়া অন্য কোন ঘটনা না হইলেও উপন্যাস চলে। পুষ্পশরের উপদ্রবে অস্থির হইয়া উন্মত্ত-প্রায় নায়িকা বলিবেন, 'তরলিকে, তরলয় কৃষ্ণাগুরুধূমপটলং; শশিলেখে, লিখ ললাটপট্টে শশিলেখং; শৃঙ্গারমঞ্জরি, সঞ্জরয় শৃঙ্গার-বচনানি; কাঞ্চনিকে, বিকির কস্তুরীদ্রব্য'—ইত্যাদি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নায়িকা এইরূপ প্রলাপ বকিয়া যাইতেছেন, আর উপন্যাসের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কিংবা,

নায়কের 'জাগরঃ কৃশতারতিঃ,'—হ্রীত্যাগ, উন্মাদ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা করিলেই কাব্যের অঙ্গপুষ্টি হয়।

এই সাহিত্যে বাস্তব মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ আদর্শ মানুষও নয়। আদর্শ অর্থে আমরা তাহাই বুঝি যাহা হওয়া উচিত, অথচ হয় নাই। হওয়া উচিত বলিয়াই তাহার বর্ণনা করা, তাহার দিকে মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করা আবশ্যক। কিন্তু এ যে মানুষের বর্ণনা তাহা বাস্তব মানুষ নয়; কারণ মানুষ কেবলই প্রেমে পড়ে না, আর প্রেমে পড়িলেই অনবরত কেবল প্রলাপ বকিয়া যায় না; গুরুজনের ভয়ে অন্ততঃ তাকে কতকটা সংযত হইয়া থাকিতে হয়। আর এ মানুষ কখনও কোনও সমাজে আদর্শস্বরূপও উপাসিত হয় নাই। এরূপ অবস্থা মানুষের দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, শুধু চিকিৎসকের মতে নয়, শুধু মানবের সাধারণ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য অনুসারে নয়, কামশাস্ত্রেরও মতে, মৃত্যুতেই তাহার অবসান হইবে। কামশাস্ত্র অনুসারে যে দশটী স্মরদশা হওয়ার কথা, তাহার দশমটী মৃত্যু। এই দশম অবস্থা যাহাতে না ঘটে, সেইজন্যই সংস্কৃত সাহিত্যিকেরা তাহার পূর্ব্বেই নায়ক নায়িকার মিলন ঘটাইয়া দিয়া থাকেন। সংস্কৃতে বিয়োগান্ত নাটক ও উপন্যাসের অভাব তার সাক্ষী।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে, সাহিত্যের প্রাচীন পন্থা অনুসারে আমরা অবাস্তব চরিত্রের সহিত পরিচিত। কিন্তু সেগুলি অনেক সময় এতই অবাস্তব, মানুষের পরিচিত জীবনধারা হইতে তাহা এতই বিচ্ছিন্ন, যে সেখানে ভাষার ঝঙ্কার, বর্ণনার চাতুর্য্য প্রভৃতি উপভোগ করা ছাড়া আমরা অন্য বিশেষ কিছু আশা করি না। ঈশপের গল্প কিংবা পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান বৃদ্ধেরও মনস্তুষ্টি করিতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ কখনও ভুলিয়া যায় না যে বনের জন্তুর মুখে ভাষা নাই। আরব্য উপন্যাস সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু দৈত্যদানব যে মানুষের জীবনের সহিত সম্পৃক্ত নয় এ কথা আমরা জানি। কাদম্বরী প্রভৃতি আমরা সেই ভাবেই উপভোগ করি।

ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষে এক নূতন সাহিত্যের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। বাংলাদেশেই তার প্রভাব সব চেয়ে বেশী। বঙ্কিম সাতসমুদ্র তের নদীর ওপার হইতে সাহিত্যরাণীর জন্য এক নূতন গয়না তৈয়ার করিয়া আনিয়াছেন। বিলাতী ছাঁচে উপন্যাসই এই নূতন সামগ্রী। এ উপন্যাসে কাদম্বরীর মত শুকপক্ষীর মুখে প্রণয়ের কাহিনী তুলিয়া দেওয়া হয় না। মেঘ কিংবা হংস ইহাতে দৌত্যকর্ম্ম করে না; 'অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্ট-বৈভবাৎ, করোতি সুপ্তিজ্জন-দর্শনাতিথিং'—এই ন্যায় অনুসারে, যাহাকে কখনও চোখে দেখা হয় নাই, যাহার সম্বন্ধে 'শুধু বাঁশী শুনেছি' বলাও সম্ভব নয়, ভাগ্যের জোরে তাহাকেই স্বপ্নে দেখিয়া প্রণয় করিতে চাওয়াও এ উপন্যাসের বর্ণিত নয়। ইহাতে সত্যসত্যই বাস্তব মানুষ, পশুপক্ষীর সম্পর্ক ছাড়া, স্বপ্নে নয়—চোখে দেখিয়া, মানুষীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে; এবং গ্রন্থের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এই প্রেমেরই পরিণতির জন্য নানাপ্রকার কর্ম্মচেষ্টা দেখাইয়া থাকে। যেমন—'দুর্গেশ-নন্দিনী'।

বিলাত হইতে এই যে নূতন উপন্যাসের ছাঁচ এ দেশে আসিয়াছে, তাহা অনুসরণ করিতে গিয়া এ দেশের সামাজিক অবস্থার প্রতি লেখকেরা সব সময় দৃষ্টি রাখিয়াছেন এমন নহে। অনেককাল পূর্ব্বেও বহুবার এই বিলাতী আমদানীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার উত্তরে বরাবরই বলা হইয়া আসিতেছে, 'আনন্দের জন্য উপন্যাস, নিখুঁত সমাজচিত্র এতে না থাকিলেও চলে।' ভালবাসা সব সমাজেই আছে এবং বোধ হয়, সকল ব্যক্তির জীবনেও আছে। কিন্তু সব সমাজের ভালবাসিবার কিংবা ভালবাসা দেখাইবার প্রণালী এক নয়। বিলাতী আমদানীর বিরুদ্ধে যাঁরা আপত্তি করিতেন তাঁরা এই সবের উপর নির্ভর করিয়াই প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু তথাপি বিলাতী আমদানী রহিত হয় নাই; কারণ, যাঁহারা সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

স্ত্রীপুরুষের প্রেমই মানব-চিত্তের একমাত্র বৃত্তি নয়। ইহাই সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি কিনা সে বিষয়েও ঘোর

সন্দেহ চলে। ইহা ঠিক যে, এ বৃত্তি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত; বর্ষার পার্ব্বত্য নদীর মত অনেক সংযমের বাধা অতিক্রম করিতে পারে; চিত্তকে সহজেই ইহা আকুল করিয়া দিতে পারে; এবং এ প্রবৃত্তি অনেক সময় মানুষের স্বাভাবিক বিচার-শক্তিও লোপ করিয়া দিতে পারে। জীবজগতে ইহার স্থান অতি আবশ্যক; এবং ইহার ক্রিয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহাই যে চিত্তের সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি নয়, তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। এ চিত্তবৃত্তি ছাড়া পশুযোনির প্রজাসৃষ্টি হয় না সত্য, কিন্তু প্রজা-রক্ষার পক্ষে ইহা অপেক্ষা মাতার সন্তান-বাৎসল্য অধিক প্রয়োজনীয়। মানবশিশু, অন্ততঃ সভ্যসমাজের মানবশিশু, অবশ্যই পরিবারের কোলে লালিত হয়; এবং এই পরিবার স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতেই উৎপন্ন হয়; এই হিসাবে যৌন প্রেমও প্রজারক্ষার কতক সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু ইতর জন্তুর সমাজে পরিবার নামক বস্তুটীর একান্ত অভাব না হইলেও অভাব রহিয়াছে; সন্তানপালনে বাঘ কখনও বাঘিনীর কিংবা বিড়াল কখনও বিড়ালীর সহায়তা করে না। প্রতিপ্রসব কয়েকটী বাদ দিলে ইতর জন্তুর সমাজে প্রজারক্ষা সাধারণ ভাবে মাতৃস্নেহ হইতেই ঘটিয়া থাকে। বিবর্ত্তনবাদ প্রাণিজগতের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, জগতে মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহের তেমন একটা বিকাশ দেখা যায় না। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতে প্রজার সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রজার রক্ষার জন্য ইহা অপরিহার্য্য নহে। সুতরাং যে প্রবৃত্তি স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটায় তাহাই যে সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি, একথা বলা যায় না। মানবচিত্তে যেমন, ইতর জন্তুর চিত্তেও তেমনই ইহা অত্যন্ত প্রবল ভাব ধারণ করিয়া করিয়া থাকে; মাতৃস্নেহের ধীরগম্ভীর স্রোত ইহার খরস্রোতের নিকট বাহ্য অভিব্যক্তিতে সর্ব্বদাই পরাজয় মানিতেবাধ্য; কিন্তু ইহার তীক্ষ্ণ বেগ হাজার পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চলিলেও ইহার চেয়েও উচ্চ চিত্তবৃত্তি আছে একথা বোধ হয় যুক্তিতর্কের মুখে অস্বীকার করা যায় না।

শুধু ইতরপ্রাণির বেলায়ই যে ইহা সত্য তাহা নহে। মানুষেরও ইহা সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি নহে। ইহার উন্মাদনা যথেষ্ট; তথাপি ইহার মূল্য সব চেয়ে বেশী একথা কে বলিতে চাহিবে? কোন ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে নষ্ট করিতে না বলিতে পারে, কিন্তু সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহাকে সংযত করিয়া রাখিতে বলে। আর সংসার-বদ্ধ পরিবার বদ্ধ মানুষ তাহার সমস্ত জীবন ভরিয়া কেবল এই এক প্রবৃত্তির অনুসরণ কদাপি করে না। জীবনের কোনও এক সন্ধিস্থলে ইহার দুর্দ্দম উন্মাদনা আমরা ভোগ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু পুরুষ যখন পিতৃত্বের কিংবা নারী যখন মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কি এই বৃত্তি আপনা হইতেই সংকোচিত হইয়া আসে না?

আর, এ বৃত্তির একান্ত প্রশ্রয় কোনও সমাজ কখনও দিতে পারে না। ইহাকে বিনাশ করিতে কেহ চায় না; নারীকে নরকের একমাত্র দ্বার যিনি মনে করিয়াছিলেন প্রচলিত উপাখ্যান বিশ্বাস করিলে সেই শঙ্করাচার্য্যও এ প্রবৃত্তিকে একেবারে বিনাশ করিতে পারেন নাই; সুতরাং চাহিলেও ইহার একান্ত লোপ রক্তমাংসের দেহে অসম্ভব। কিন্তু সব সমাজই ইহাকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তথাপি যে কিরূপে এবং কেন ইহা সাহিত্যের সাড়ে পোনর আনা দখল করিয়া বসিয়াছে—কিরূপে যে আদিরসই প্রধান রস হইয়া পড়িয়াছে, তাহা একটী কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। এ বৃত্তি ছাড়া যে সাহিত্যের উপাদান নাই, তাহা নহে। পরীর কেচ্ছা, ঈশপের গল্প, প্রভৃতি যেগুলিকে আমরা এখন শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করি, তাহাও সাহিত্য; অথচ সেখানে ইহার গন্ধও নাই। বেদ, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিও সাহিত্য; সেখানেও ইহা মূল বর্ণনীয় বিষয় নহে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, সেখানেও ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তথাপি জগতের কাব্য ও উপন্যাসে যে ইহা সর্ব্বপ্রধান উপাদান, তাহার কারণ কি?

অবশ্যই সাহিত্যিকের বয়স এই প্রশ্নের আংশিক উত্তর দিতে পারে। মানুষের অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যায় সাহিত্যসেবাও শক্তির প্রাচুর্য্য যত দিন বর্ত্তমান থাকে ততদিনই পূর্ণবেগে চলিয়া থাকে। অথচ শারীরিক ও মানসিক শক্তি যত দিন পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, ততদিন এই প্রবৃত্তির হ্রাস হয় না; ইহাই কি সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্যের কারণ? বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের লেখার দিকে চাহিলে মনে হয়, তাহাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'কড়ি ও কোমল' ও 'গীতাঞ্জলির' যুগ এক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও জীবনের শেষ অঙ্কে 'ঘরে বাইরে' লিখিতে পারিয়াছেন; আজ যখন তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার ঋষিত্ব প্রতিপাদনের এবং তাঁহার কাব্যের সহিত বেদের মন্ত্র-ব্রাহ্মণের সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—সেই সময়েও রবীন্দ্রের লেখনী একটা অনেকেরই মতে নিন্দিত প্রেমলীলা প্রসব করিতে পারিয়াছে। সুতরাং যদিও সাহিত্যিকের বয়স অনেক সময় তাঁহার লেখার রস নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় তথাপি সর্ব্বদাই এ নিয়ম ঠিক নয়।

সাহিত্যে-শৃঙ্গার রসের প্রাধান্যের মূল কারণ বোধ হয় এই রসের প্রবল উন্মাদনা। প্রবৃত্তির দুর্দ্দম উত্তেজনায় জীবের জীবনে যত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন প্রবৃত্তি হইতে এত হয় কিনা সন্দেহ। মাতৃস্নেহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি ধীর, প্রশান্ত ক্ষীর-নদীর ন্যায় জীবের জীবনে ক্রিয়া করিয়া যায়; তরঙ্গায়িত পার্ব্বত্য নদীর সফেণ বারিরাশির ন্যায় ইহা কূলঙ্কষা গতিতে দুই দিক বিক্ষোভিত করিয়া চলে না। অবশ্যই ইতর প্রাণি-জগতে মাতৃত্বকেও অনেক সময় সমরে অবতীর্ণ হইতে হয়, সন্তানের রক্ষার জন্য মাতাকেও অনেক সময় জীবনপাত করিতে হয়; কিন্তু একই সন্তানকে দুই মাতা নিজের বলিয়া দাবী করিতে সেই কাজীর উপাখ্যানের বাহিরে বড় দেখা যায় না। মানব-সমাজে অর্থলিপ্সা ইতিহাসের বহু ঘটনার জন্য দায়ী; আর যৌন প্রবৃত্তি শুধু মানবসমাজে নয় সমস্ত জীবজগতে প্রতিদিন নানা ঘটনার জননী হইতেছে। স্ত্রীনিমিত্ত বৈর ট্রয়ের যুদ্ধ ও লঙ্কার যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত হত্যা ও আত্মহত্যার কাহিনী আধুনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভ ভরিয়া রাখে সে পর্য্যন্ত, বহু ঘটনার কারণ হইয়া আসিতেছে। যে কারণেই হউক, সাহিত্যে আদিরসই প্রধান। কালিদাস, ভবভূতি, সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া জয়দেব পর্য্যন্ত, ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আদিরসকে কেহই অবহেলা করিতে পারেন নাই, বরং সকলেই উচ্চ আসন দিয়াছেন। আদিরসের সাম্রাজ্য এখন প্রতিষ্ঠিত, তাহার বিরুদ্ধে অভিমান করার এখন আর সময় নাই। কিন্তু তথাপি অনেকে যে জাহাজভরা বিলাতী শৃঙ্গার-রস আমদানী করিতেছেন এবং নূতন জিনিষ বলিয়া তাহার সাফাই গাহিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় এখনও আছে। বিলাতি ঢংয়ের প্রেম আমরা অনেক হজম করিয়াছি; বেড়াইতে গিয়া কিংবা নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া হঠাৎ চারি চক্ষুর মিলন হইল এবং তাহাই সাড়েচারশ পৃষ্ঠার এক বইয়ের বীজ হইল, বাংলা সাহিত্য এরূপ বহু দৃষ্টান্ত বক্ষে ধারণ করিতেছে। এরূপ প্রেমের কাহিনী, বলিতে গেলে, আমাদের সাহিত্যে এখন পুরাণ হইয়া গিয়াছে। তাই নবীন পন্থীরা ইহার চেয়েও নূতন কিছু আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন।

সমাজে বিবাহিতা নারীর স্থান কোথায় আমাদের শাস্ত্র ও আচার তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। বিলাতেও তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু যে দেশের রমণীরা শুধু টেলিগ্রাফের কল টিপিতে ও পোষ্ট আফিসের সীল মারিতে পারে এমন নয়, কারখানায় বসিয়া গোলাগুলি তৈয়ার করিতে এবং লাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় পাহারা দিতে পারে, সে দেশের নারীদের জানিবার ইচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে তাহারা পুরুষের অধীন না সমকক্ষ। বিবাহ করিলেও পুরুষের যে স্বাধীনতা ও বাহিরে সহিত যে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে, নারীর কেন তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে, নারী কেন তাহার নাম গোত্র সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিজের পৃথক্ সত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিবে? ইংলণ্ডে এই প্রশ্ন অনেকদিন হইল উঠিয়াছে।

দর্শনে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল ও কাব্যে লর্ড টেনিসন এবং কার্য্যে মিসেস্ প্যাঙ্খার্ষ্ট (Mrs. Pankhurst) প্রমুখ রমণীগণ তাহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বাহিরে ইউরোপের অন্যত্রও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ইব্‌সেন্ প্রমুখ নবীন যুগের সাহিত্যিকেরাই তাহার প্রমাণ। এবং বাংলা সাহিত্যেও যে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে যদি বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' ও 'ঘরে বাইরে' তাহার প্রমাণ।

কিন্তু ইউরোপেও বাস্তবিক উহা একটী স্বাভাবিক, ন্যায্য প্রশ্ন কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির তথা-কথিত মুক্তি সম্বন্ধে যে একটা ধারণা উঠিয়াছে, ট্রেইচকে (Treitschke) ইহাকে অশুভকর (unfortunate) কহিয়াছেন। এবং তাঁহার মতে ইহার কারণ ইউরোপীয় সমাজে অস্বাভাবিক বিলম্বে বিবাহ-প্রথা এবং তার নিমিত্ত নারীর পণ্যতা। *

পত্নীকে আমরা পাশে রাখিব না মাথায় রাখিব—নিজের সমকক্ষ মনে করিব না উপাস্য মনে করিব, কিংবা হিন্দুর শাস্ত্রবিধান অনুসারে উপাসক মনে করিব—ইহাই বোধ হয় প্রশ্ন নহে। ইউরোপের নবীন সাহিত্যে উপরিস্থ বাগ্‌বিতণ্ডার নীচে যে গভীর সমস্যা রহিয়াছে তাহা পত্নীর আসন নিয়া নহে, নারীর স্থান নিয়া। নারীত্বের সমাপ্তি কোথায়—পত্নীত্বে না মাতৃত্বে, ইহাই আজ বাস্তবিক জিজ্ঞাস্য। উপন্যাসে এতকাল ইউরোপে এবং তাহার অনুকরণে বাংলা দেশেও নারীকে শুধু পুরুষের প্রেমার্থিনী করিয়াই চিত্রিত করা হইতেছিল এবং পত্নীত্বে কিংবা উপপত্নীত্বেই তাহার নারীত্বের পরিসমাপ্তি মনে করা হইত। কিন্তু আজ জিজ্ঞাসা হইয়াছে, নারী কি শুধু ভোগের বস্তু—এই বিশ্বজগতে কি নারীর এর চেয়ে উচ্চ কোন স্থান নাই? হাব, ভাব, মোট্টায়িত, কুট্টমিত প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি সত্বজ বিকার দ্বারা পুরুষের চিত্তকে হরণ করিয়া, তাহার লালসা চরিতার্থ করাই রমণীর জীবনের একমাত্র ব্যবহার নহে। বিভ্রমাদি দ্বারা হৃতচিত্ত পুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনই যে নারীর জীবনের একমাত্র উপযোগিতা নয় সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। পশুর সমাজে, পক্ষীর সমাজে, সর্ব্বত্রই নারী যে বিভ্রমাদি দ্বারা পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করে সে শুধু তার মাতৃত্বের উপক্রমণিকা মাত্র। মানুষের সমাজের বাহিরে কোথাও নারী পণ্য নহে—আর কোথাও নারী শুধু ভোগের বস্তু নহে। সুতরাং মানুষের সমাজের বাহিরে কোথাও এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না যে, পুরুষ কি নারীকে টুপির মত মাথায় রাখিবে না চাদরের মত গলায় রাখিবে কিংবা জুতার মত পদানত রাখিবে। ভোগের বস্তু—সহধর্ম্মিণী নয় সহচারিণী—করিয়া নিয়াছে বলিয়াই মানুষের সমাজে পুরুষকে নারীর সম্বন্ধে এই প্রশ্ন তুলিতে হইয়াছে। প্রকৃতিতে নারী যে পুরুষের সঙ্গিনী হয়, সে শুধু তাহার মাতৃত্বের বিকাশের জন্য। সেই জন্য নারী দাসী না সখী এই প্রশ্ন সেখানে উঠে না।

সুতরাং উপন্যাসের যে রমণীর কুন্তলদাম ও তাহার পটল-চেরা ডাগর চক্ষুর বর্ণনা পাই, এবং এ সব পুরুষের চিত্তে যে বিকার আনয়ন করে তাহার যে দীর্ঘ ইতিহাস পাই, তাহা যদি মানবজীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস হইত তবে নিশ্চয়ই উহা স্বভাব ও আদর্শ উভয়েরই বিরোধী হইত। তবে উপন্যাসের পক্ষে বক্তব্য

---

* তাঁহার কথার ইংরেজী অনুবাদ এই 'Through the unnatural lateness of marriages prostitution has become so extensive, and flaunts itself with such impudence, that even the tone of intercourse in society has been vitiated by it. Thence the *unfortunate* idea of an emancipation of women'. তিনি আরও বলেন;—'If woman believes she is able to make an impression upon us in daily intercourse by masculine means, if she seeks to impress us by terrifying looks, it has the opposite effect, and the social boorishness arises that has gained so strong a hold at the present time.'—'রমণী যদি মনে করেন যে পুরুষোচিত ব্যবহার দ্বারা কিংবা রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি আমাদের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিবেন, তবে তাহার ফল বিপরীতই হইবে, এবং সামাজিক ব্যবহারে অধুনা নারীর প্রতি যে গ্রাম্য কর্কশ ভাব বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে তাহারই উৎপত্তি হইবে।'

এই যে ইহা মানবজীবনের একটী অধ্যায় মাত্র—পরিপূর্ণ ইতিহাস নহে। কিন্তু সাহিত্যে নবীন পন্থীরা মনে করিতেছেন পুরুষ ও নারীর মধ্যে পতি-পত্নীরূপে যে সম্বন্ধ হয় তাহাই মানবজীবনের পূর্ণ পরিণতি, তাহাই এই নিখিল বিশ্বের চরম সত্য; ইহার চেয়ে গরীয়ান্—ইহার চেয়ে মূল্যবান্ জগতে আর কিছুই নাই। যে দেশে স্বীয়া ব্যতীত পরকীয়া এবং সাধারণী নায়িকাও সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে—যে দেশে পরের স্ত্রী ও পণ্যস্ত্রীর সঙ্গে প্রেমও সাহিত্যশাস্ত্র মঞ্জুর করিয়াছে,—সে দেশে ইহা নিতান্তই নূতন কথা নহে। কিন্তু বিলাত-ফেরত বাঙ্গালীর মত ইহা নূতন ঢংয়ে এ দেশে উপস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্র-শাসিত, অসংখ্য বেদান্ত-নির্জ্জিত সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর ন্যায় নারীর প্রেমভোগকেও ভোগ্য মাত্রই মনে করা হইত—ইহাকে মোক্ষলাভের উপায় মনে করা হয় নাই। বিবাহ ধর্ম্ম বটে, কিন্তু সে ভোগ দিতে পারে বলিয়া নয়, পুত্র দিতে পারে বলিয়া। পুত্রলাভও ধর্ম্ম, নারী-ভোগ ধর্ম্ম নহে; এবং এ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাও বুঝা কঠিন নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে সুতরাং উপন্যাসিক নারীপ্রেমের স্থান অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর সহিত এক সম-ভূমিতে। কিন্তু বিলাত হইতে যে নূতন পোষাক পরিয়া ইহা এদেশে আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় যেন ইহাই চতুর্ব্বর্গ লাভের একমাত্র উপায়। যে দেশের পত্নী শ্মশান পর্য্যন্ত পতির অনুসরণ করিতে পারিত, পত্নী যে পতিকে ভালবাসিতে পারে, একথা সেদেশের লোক জানিত না এমন নহে। কিন্তু এ চারি চক্ষুর মিলন-প্রসূত, পূর্ব্বরাগ-সঞ্চিত, কাব্যালাপ-সন্ধুক্ষিত প্রেম নহে, ইহা বিবাহের ধর্ম্মবন্ধ-সম্ভূত প্রেম। আর মোক্ষলাভের নূতন উপায় যে বিলাতী প্রেম তাহা কি এই ধরণের? পার্ব্বতী যে মহাদেবের চিত্ত হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা 'বল্' নাচের রঙ্গীণ পোষাক পরিয়া নয়, ডাগর চোখের অপাঙ্গ-দৃষ্টি দ্বারা নয়;—কিন্তু পূজা করিয়া, বল্কল পরিধানপূর্ব্বক কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা; প্রেম যদি কখনও মোক্ষলাভের উপায় হয়, তবে এইরূপ প্রেমই হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী প্রেম কি এই ধরণের?

ঐহিক ভোগের উপর যাদের সমস্ত জীবন প্রতিষ্ঠিত, প্রধান ভোগ্যবস্তু নারীর তাহারা একরূপ সাদর ব্যবহার করিয়া থাকে। এ দেশের নবীন সাহিত্য ইউরোপ হইতে তাহা ষোল আনা গ্রহণ করিয়াছে। নারীর আত্মা শুধু ভোগ্যবস্তুর উপযুক্ত আদরে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ইউ-রোপে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, সে দেশের সাহিত্যে ও জীবনে তাহা ক্রমশঃ তীক্ষবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে। এ দেশে সে প্রশ্ন না উঠিলেও, ইউরোপ হইতে ধার করিয়া বাংলায় নবীন সাহিত্য তাহাও গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে, প্রশ্নটী বাস্তবিক ভালবাসার সামগ্রী পত্নীর বিষয়ে নয়, জীব-জগতের অর্দ্ধাঙ্গ নারীর বিষয়ে। যে নারী নিজকে শুধু পত্নীত্বে পর্য্যবসিত করিতে চায়—পুরুষের প্রেমের উন্মত্ত আমোদ মাত্র উপভোগ করিতে চায়, কিন্তু মাতৃত্বের মধুর দায়িত্ব, উপাস্য অথচ কঠোর সম্পদ্ গ্রহণ করিতে চায় না, সে ভ্রান্ত। আর যে পুরুষ কামচর্চ্চার উৎসবে শুধু মত্ত থাকিতে চায়, পিতৃত্বের কঠোর কর্ত্তব্য গ্রহণ করিতে চায় না, সে-ও ভ্রান্ত। আর যে দেশের স্ত্রীপুরুষ প্রেম হইতে দায়-শূন্য অসংযত ভোগ মাত্র লাভ করিতে চায়, পরিবার প্রতিষ্ঠার গুরুভার, সন্তান প্রতিপালনের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিতে চায় না, সে দেশ ধ্বংসের পথে পা দিয়াছে। আর, যে সাহিত্য স্ত্রী-পুরুষের মিলনে কামনা চরিতার্থ করিবার উপায় ভিন্ন অন্য কোন দায়িত্ব দেখিতে পায় না, সে সাহিত্য সমাজের চরম বিকারের অন্যতম উপায়। এই মহৎ সত্য ইউরোপের কেহ কি বুঝে নাই?

দেখিতে পাই উপন্যাসের উদ্দেশ্য বাহির করিতে গেলে ঔপন্যাসিক অনেক সময় অসন্তুষ্ট হন। জানিনা অন্য উদ্দেশ্য ধরা পড়িলেই এইরূপ ক্রোধ হয় কিনা। কিন্তু তথাপি টলষ্টয়ের য়্যানা কারেনিন্ (Anna Karenin) নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসে কি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হয় নাই যে, যে নারী উন্মাদক রূপের সাহায্যে হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে বলিয়া নিজেকে শুধু ভোগ্যমাত্র মনে করে, সে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যায়? সেখানে কি টলষ্টয় ইহাই বলিতে চেষ্টা করেন নাই যে নরনারীর

প্রেম পরিবার স্থাপনের প্রথম সোপান মাত্র এবং মাতৃত্বেই নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ? মানবজীবন শুধু একটা যৌন প্রেমের অপরিচ্ছিন্ন কাহিনী নহে; কঠোর কর্ত্তব্য ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য সন্তানের প্রতি মাতার ও পিতার কর্ত্তব্য। এ দায়িত্ব অবহেলা করা শুধু ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়, অস্বাভাবিক।

মানবসমাজের বাহিরে জগতের কোথাও পণ্য নারী নাই। মানুষের সমাজে যে নারী মাতৃত্বকে অবহেলা করিয়া রূপ বিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করে, ইহা কি অস্বাভাবিক নয়? টলষ্টয়ের য়্যানা কারেনিন্ তাহা বুঝেন নাই; এবং বুঝেন নাই বলিয়াই গৃহ, স্বামী, আটবছরের একটী পুত্র,—সকলকে ত্যাগ করিয়া পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করিতে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন। স্বভাবের বিরুদ্ধে এই শোচনীয় অভিযানের ফলে স্বভাবেরই বিরুদ্ধ মৃত্যু—আত্মহত্যা তাঁহার শেষ গতি হইয়াছিল।

রাজ্য বিস্তার করিতে, রাষ্ট্র-শক্তি বর্দ্ধিত করিতে, সমস্ত পৃথিবী শ্বেত জাতির পদানত করিতে, ইউরোপীয় জাতিরা ব্যস্ত; তাহাদের দৃষ্টি এখনও অন্তর্মুখীন হয় নাই, এখনও একটা গুরুতর কলরব না উঠিলে, সমাজ-দেহে কোন গুরুতর পৃষ্ঠাঘাত রোগ দর্শন না দিলে, তাহারা সমাজের দিকে দৃষ্টি করিতে চায় না। আজ ইউরোপের সমাজে নারী সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সহিত সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। একজনের স্ত্রী হওয়াই নারীজন্মের শেষ লক্ষ্য মনে করিলে এই প্রশ্ন উঠিত কিনা সন্দেহ। যে কারণেই হউক, এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু ইউরোপীয় জাতিরা যেন চাহে, তাড়াতাড়ি ইহার একটা মীমাংসা করিয়া দিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ একাগ্রতা আবার রাজ্যবিস্তারের দিকে নিবিষ্ট করে। তাই, নারীর এই দাবীর মূলে যে স্বভাবের বিদ্রোহ, মাতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সকলে তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। তাই অনেকে মূল রোগ উপেক্ষা করিতেছেন, এবং সহজেই চক্ষে পড়ে বলিয়া তাহার একটী উপসর্গ মাত্র নিয়া মস্তিষ্ক ক্ষয় করিতেছেন; এবং তাই নারীর এই অস্বাভাবিক দাবীর ফেণিল আবর্ত্ত সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দিতেছে।

বেদ দার্শনিক কূটতর্কে পূর্ণ নহে; সহজ, সরল ভাষায় মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাইবেল কোনও এক অজানা দেশের অজানা কথায় পূর্ণ নহে; এ পৃথিবীর সকল সুখদুঃখও তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। বেদ বাইবেল ও সাহিত্য—এখনও সকলেরই মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু যে দিন হইতে নারীর প্রতি পুরুষের বিকট তৃষ্ণাকে সাহিত্য তাহার প্রধান সামগ্রী বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, জানিনা সে দিন হইতে মানবসমাজ কোন্ দিকে চলিয়াছে। একথা কেহ অস্বীকার করে না যে মানুষের সকল সুখদুঃখের প্রকাশ সাহিত্যে হইবে; এ কথা কেহ বলিতে চায় না যে সাহিত্য কেবলই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রচার করিবে; এ কথা কেহ বলিতে চায় না যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও প্রেমের বন্ধন থাকা উচিত নহে। কিন্তু উপন্যাসিক প্রেমই মানুষের সুখদুঃখের একমাত্র কারণ নহে। গৃহে, রাষ্ট্রে, সমাজে, মানুষের অন্য বহুবিধ সম্বন্ধ আছে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ এ সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে যে কি অসংযত উত্তেজনার উৎপত্তি হয় তাহা বুঝা কঠিন নহে।

স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা গুরুকর্ত্তব্য, একটা দায়িত্ব, একটা ধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া সাহিত্যের নবীন পন্থা রমণীর যে চিত্র উদ্ভাবিত করিতেছে, তাহাতে রমণীকে শুধু পুরুষের প্রেমার্থিনীই দেখিতে পাই, তাহার শেষ পরিণতি যে সেখানে নয়, একথার দিকে লক্ষ্য দেখিতে পাই না। রমণী যে কেবল নায়িকা নয়, গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গিনী, সে যে শুধু বিলাসিনী নয়, পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এ কথা ত কেহ মনে রাখিতে চায় না। রমণীর প্রেম যে শুধু পুরুষকে সম্মোহিত করিবার জন্য নয়, পৃথিবীতে সন্তান-কাকলি-পরিপূরিত, কলহাস্যমুখরিত গৃহের সৃষ্টির জন্য—তাহার মোহিনী শক্তি যে সংসার ও সমাজ উৎসন্ন করিয়া দিবার জন্য নয়, গৃহে ও সমাজে শান্তি

আনয়নের জন্য, এবং পুষ্পের সৌরভের ন্যায় রমণীর জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য যে তাহা হইতে অন্য জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য, অধিকারের এক অস্বাভাবিক প্রশ্ন তুলিয়া নবীন সাহিত্য আজ তাহা ভুলিতে বসিয়াছে।

যাহাদের সংহিতা বলিয়াছিল, 'যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—তাহারা নারীর সম্মান করিতে জানিত; কিন্তু সে বিলাসিনী বরবর্ণিনী রূপে নয়, আদ্যাজননীর অংশরূপে; এ সম্মান তার স্ত্রীত্বের নয়, মাতৃত্বের। কবে আমরা ভাবিতে শিখিব যে নারীত্বের পরিসমাপ্তি পত্নীত্বে নয়, মাতৃত্বে; কবে আমাদের সাহিত্য অস্বাভাবিক ভোগতৃষ্ণা সংযমিত করিয়া পবিত্রভাব ধারণ করিবে?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার অবসর।

(১)

সূচনা।—এতদিন বিদ্যালয়ে কেবল মাথার চালনাই হইত। অধুনা সর্ব্বত্রই শরীরচালনার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু বিদ্যার্থীদিগকে নীতিজ্ঞ করিবার চেষ্টা আজিও তেমন জোরে হইতেছে না। জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও নীতি এই তিনটি জিনিষ লইয়া মানুষ; এই কারণে এবং অন্যান্য কারণে যাহাতে স্কুলের ছেলেদের ন্যায়বুদ্ধিরও পরিণতি হইতে পারে তাহার একটা আন্দোলনের ক্ষীণ সুর অনেক জায়গায় বাজিয়া উঠিতেছে। এই ন্যায়নিষ্ঠা বা নীতিশিক্ষার (moral training) অবসর বিদ্যালয়ে আছে কি না এই সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলা আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের স্কুলের ছেলেদের ন্যায়নিষ্ঠার পরিণতি না হইলে তাহাদিগকে জীবনের পথে যে অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে তাহা বিবেচক মাত্রেই ধারণা করিতে পারেন।

নীতিধর্ম্ম কি?—নীতিধর্ম্মশিক্ষার উপায়গুলি আলোচনা করার পূর্ব্বে নীতিধর্ম্মটা কি তাহাই দেখা যাউক। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত শিক্ষা-সংস্কারক রুসো বলিয়াছেন, শিশু সৎবৃত্তি (good instincts) লইয়া সংসারে আসে কিন্তু সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া শেষে তাহারা খারাপ হইয়া যায়। যদি সমাজের বাহিরে শিশুর সহজবৃত্তিগুলি (instincts) পরিণতি লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই তাহার সুশিক্ষা হয়। শিশুর মন্দের জন্য সমাজই দায়ী। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা রুসোর মতবাদ মানিয়া চলেন না। তাঁহারা বলেন শিশু কতগুলি সহজ বৃত্তি লইয়া সংসারে আসে সত্য কিন্তু সবগুলিই যে ভাল তাহা নহে। এবং যে সহজবৃত্তিগুলি ভাল সেগুলির বিকাশ ও পরিণতির জন্য সমাজের পরিণত ব্যক্তিগণের বা শিক্ষকের সাহায্য ও পরিচালনের প্রয়োজন, কারণ শিশু ভালমন্দ জানে না, বোঝে না, সুতরাং তাহাকে ভালর পথে চালাইতে হইবে; এজন্যই সমাজে শিক্ষকের স্থান উচ্চে। বিষয়টা আর একটু তলাইয়া দেখা যাউক। শিশুর স্বাভাবিক জীবন সহজবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিশু বর্ত্তমানে যাহাতে সুখ পায়, যাহা তাহার ভাল লাগে, না ভাবিয়া না থামিয়া সে তাহাই করিয়া থাকে। সহজ বুদ্ধির (intuition) বলেই বালক তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়—মাত্র দুটি বিষয়ে তাহার লক্ষ্য থাকে,—একটি আত্মসুখ অপরটি বর্ত্তমান সুখ। কিন্তু বালক তাহা করিতে পারে না, বা বালককে তাহা করিতে দেওয়া হয় না, কারণ বালক সমাজের অঙ্গ, সমাজ হইতে বিভিন্ন নহে। সমাজ কতগুলি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছে সুতরাং বালক স্বতন্ত্র নহে, পরতন্ত্র। বালককেও তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। সমাজের দিক দিয়া এই পরতন্ত্রতাই ন্যায়নিষ্ঠা। যদি স্বতন্ত্রতাই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এই পরতন্ত্রতা কিছুতেই ন্যায্য বলিয়া সমর্থন করা যায় না, এমন কি ইহাকে অন্যায় বলিলেও দোষ হয় না। কারণ দেখাইতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিশু কতগুলি সহজবৃত্তি (instinct) লইয়া সংসারে আসে, তন্মধ্যে আহার, হত্যা এবং ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতি কতগুলি সহজবৃত্তি বড়ই প্রবল। যদি এই সকল সহজবৃত্তির পরিণতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে কোন ব্যক্তি অব্যাহত ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আহার করিলে, যাহা তাহার অনিষ্ট করিতে পারে তাহাকে বিনষ্ট করিলে এবং ইচ্ছানুরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিলে তাহাকে দোষী করে চলেনা। কিন্তু সমাজের বিধান তাহা নহে। আমরা সমাজবদ্ধ, সুতরাং সকলেই কতগুলি ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করি পরস্পরের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত অসুবিধা ভোগ করি, এবং শিশুকাল হইতেই আমরা এইরূপ শিক্ষা লাভ বা অভ্যাস গঠন করিয়া লই। আমরা অখণ্ড বা সহজবুদ্ধি (intuition) বলে কর্ত্তব্য স্থির করি না। যাহা করি একটু থামিয়া এবং ভাবিয়াই তাহা স্থির করিয়া লই। এইরূপেই সমাজের নিয়ম স্থির হইয়া থাকে। বালককেও ভাবিয়া এবং থামিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে অভ্যাস করিতে হয়। এই অভ্যাস শিক্ষা-সাপেক্ষ।

বালকের শিক্ষার প্রকৃতি।—যদি কেবল অবিচারিত ভাবে সহজবৃত্তিগুলির পূর্ণতার দিকেই লক্ষ্য করা হয় তাহা হইলে এই শিক্ষা লাভ হয় না। এইরূপ শিক্ষা জীবনের উদ্দেশ্য হইলে ইহার নাম হইত আত্ম-পরিণতি (self-development)। কিন্তু আমি যে শিক্ষার কথা বলিতেছি তাহা বাস্তবিক কৃত্রিম শিক্ষা, কারণ এই শিক্ষার বলে পশুভাবাপন্ন (instinctive animal) শিশু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিতে (intellectual creature) পরিণত হয়। অর্থাৎ সে থামিয়া এবং ভাবিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করার অভ্যাস গঠন করে। অখণ্ড বা সহজবুদ্ধিবলে কর্ত্তব্যে লিপ্ত হয় না। কিন্তু কি উপায়ে শিশুকে এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে ?

আমরা দেখিয়াছি বালক অখণ্ড বা সহজবুদ্ধিবলে চালিত হয়। সুখই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং যাহা সমাজ চায় তাহা শিশুদ্বারা করাইতে হইলে এই কার্য্যটাকেও একটা কৃত্রিম সুখ বা কষ্টের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক কার্য্য-প্রবৃত্তির সহিত এই কৃত্রিম কার্য্য-প্রবৃত্তি খাপ খাইবে। সুতরাং যাহা ব্যক্তির পক্ষে ভাল বা সুখকর তাহা সমাজের পক্ষে যাহা ভাল বা সুখকর তাহার সহযোগী (associated) করিতে হইবে, এবং যাহা ব্যক্তির পক্ষে মন্দ বা কষ্টদায়ক তাহা যাহা সমাজের পক্ষে মন্দ বা কষ্টদায়ক তাহার সহযোগী করিতে হইবে। এইরূপে সমাজ বুঝিবার পূর্ব্বে বালক কতগুলি ভাল অভ্যাস গঠন করিয়া লইবে। অর্থাৎ সমাজের পক্ষে যাহা ভাল তাহার জন্য বালককে পুরস্কার বা প্রশংসা দ্বারা সন্তুষ্ট করা এবং যাহা সমাজের পক্ষে অহিতকর তজ্জন্য বালককে শাস্তিপ্রদান বা ভর্ৎসনা করা অভিভাবক ও শিক্ষকের প্রথম কর্ত্তব্য। এইরূপে কতগুলি অভ্যাস গঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্বভাব-গঠনের চেষ্টার নামই নীতিধর্ম্ম, এবং স্বভাবের এই পরিবর্ত্তনের নামই শিক্ষা। এই শিক্ষার বলেই বালক বর্ত্তমানের সুখ লক্ষ্য ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ বুঝিতে চেষ্টা করে এবং বুদ্ধিজীবী প্রাণীতে পরিণত হয়।

বালকের নৈতিক জীবনের দুটী অবস্থা।—বালক নীতিধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে দুটি অবস্থা অতিক্রম করে। প্রাথমিক অবস্থায় বালকের প্রত্যক্ষ (positive) ন্যায়বুদ্ধির বিকাশ হয় না। তখন বালক বড়ই স্বতন্ত্র, কেবল আত্মসুখ খুঁজিয়া কার্য্য করে। কিন্তু স্বতন্ত্র হইলেও বালককে স্বার্থপর বলা যায় না, কারণ সে তখনও স্বীয় স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত তুলনা করিয়া কার্য্য করে না। সে কেবল নিজের সুখ চায়। সুতরাং এই সময়টার পরপ্রীতির (altruism) আদৌ বিকাশ হয় না। তাহাকে পরের মঙ্গলের বিষয় ভাবিতে শিখাইতে হইলে অনুকরণের আশ্রয় লইতে হইবে এবং পরপ্রীতিমূলক কার্য্য করাইয়া তাহাকে প্রশংসা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাহা হইলেই পরপ্রীতি আত্মসুখের সহযোগী হইয়া পড়িবে। যে বাড়ীতে কর্ত্তা দরিদ্রকে দান করেন, পুত্রও পিতার কার্য্য দেখিয়া তাহার অনুকরণ করে, তখন তজ্জন্য

বালককে প্রশংসা করিতে হয়। যদি বালক কোনও অন্যায় কার্য্য করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শাস্তি দিতে হয়। এইরূপে প্রশংসা বা পুরস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বালক ভাল কার্য্য করিতে শিখে, এবং শাস্তির ভয়ে মন্দকার্য্য হইতে বিরত হয়। এইরূপে বালক শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক চরিত্র গঠন করিতে আরম্ভ করে। এই প্রাথমিক অবস্থা আদেশের অবস্থা, অর্থাৎ বালকেরা তখন গুরুজনের আদেশ পাইলেই তদনুসারে কার্য্য করে, সুতরাং তখন বালকেরা সহজেই পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টাচার এবং সাধুতা প্রভৃতি বিষয়ক চরিত্র গঠন করে। এই সঙ্গে একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় নিষেধমূলক আদেশ প্রদান করা ভাল নয়। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে ঈশ্বরের দশটি আদেশবাণীর অল্প কয়টিই নিষেধমূলক। বালকের দ্বিতীয় বা পরিণতের অবস্থায় এই সকল অভ্যাসই ন্যায়ধর্ম্মের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজ ও ন্যায়ধর্ম্ম।—সমাজের দিক দিয়া আমরা ন্যায়ধর্ম্মের অনেকটা আলোচনা করিলাম। যদি সমাজ জটিল না হয় তাহা হইলে সামাজিক ন্যায়ধর্ম্মও অনেকটা অখণ্ড বা সহজবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকে। কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ক্রমশই জটিল হইয়া দাঁড়ায় সুতরাং ন্যায়ধর্ম্মের সূত্রগুলির ব্যাখ্যানও জটিল হইয়া পড়ে। সুতরাং শিক্ষাবিভাগ স্কুলের ছেলেদের ন্যায়ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না। স্কুলে নানা সম্প্রদায়, নানা ধর্ম্ম এবং প্রত্যেক স্কুলেই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের ছেলেরা লেখাপড়া করে সুতরাং সকলের উপযোগী ন্যায়ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত করা চলে না। আবার প্রামাণ্য (sanction) লইয়া গোলযোগ। বিবেকবোধ, সামাজিক নিয়ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যক্তিগত ভাব প্রভৃতি নানা প্রামাণ্যের উপর ন্যায়ধর্ম্ম নির্ভর করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণ করিবেন এবং কোন্‌টাই বা অগ্রাহ্য করিবেন? আবার স্কুলের দিক দিয়া দেখিলে নীতিধর্ম্মশিক্ষার অনেকগুলি অন্তরায় দৃষ্ট হয়, সুতরাং নীতিধর্ম্মশিক্ষার জন্য অনেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—

(১) শিক্ষক ও শিক্ষকের কর্ত্তব্যজ্ঞান।

(২) স্কুলের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন (Corporate life)।

(৩) উপশিক্ষক-পদ্ধতি-মূলক বিদ্যালয়ের পরিচালন (Monitorial system)।

(৪) স্কুলের ধারা (The tone) ও স্কুলের গৃহ ও অবাস্থিতি স্থান।

(৫) পরম্পরাগত স্কুল-ধর্ম্ম (Tradition of the School), অর্থাৎ যে ধর্ম্ম বা ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলেই তাহার দিকে অগ্রসর হয়।

(৬) পরিচালনকারী কর্ত্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের সহিত স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকের সম্বন্ধ।

(৭) স্কুলের পুরাতন ছাত্রগণের সভা এবং স্কুলের সহিত তাহাদের সম্পর্ক।

(৮) পাঠ্যতালিকার প্রভাব।

স্কুলে ন্যায়ধর্ম্মশিক্ষার মূলে এতগুলি জটিলতা রহিয়াছে, সুতরাং এই বিষয় যে বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন বিদ্যালয়ে এই ন্যায়ধর্ম্মশিক্ষার কতদূর অবসর রহিয়াছে তাহাই দেখা যাউক।

বিদ্যালয়ে ন্যায়ধর্ম্মশিক্ষার অবসর।—এই বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে বিদ্যালয়কে দুইভাবে দেখা যাইতে পারে। একদিক দিয়া বিদ্যালয় উপদেশ লাভের স্থান, সুতরাং ইহাতে ন্যায়ধর্ম্মের **উপদেশের** অবসর এবং সুযোগ রহিয়াছে। আর একদিক দিয়া বিদ্যালয় সামাজিক কার্য্যপরতার স্থান, সুতরাং ইহাতে ন্যায়ধর্ম্ম**শিক্ষার** অবসর রহিয়াছে। এই স্থলে শিক্ষা শব্দটি আমি স্বভাবগঠন বা 'ট্রেনিং' অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। প্রথমতঃ আমি বিদ্যালয়কে সামাজিক কার্য্যপরতা (social activity) শিক্ষার স্থান ধরিয়া লইয়া উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিব। আমরা বুঝিতেছি বিদ্যালয় দুই কাজ করিতে পারে, এক কাজ আদর্শ বা সাধুভাব (ideals and ideas) দ্বারা মনোমন্দির পূর্ণ করিয়া

দেওয়া, আর এক কাজ স্বভাব গঠন করিয়া দেওয়া। কোনটা শ্রেষ্ঠতর আমরা পরে দেখিব।

বিদ্যালয় সামাজিক কার্য্যপরতা শিক্ষার স্থান।—ন্যায়ধর্ম্মশিক্ষার বিষয় চিন্তা করিলে আমরা দেখিব যে, ইহার উপাদান সহজবৃত্তি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা কতগুলি সহজবৃত্তি লইয়া সংসারে আসি তন্মধ্যে কতগুলি ভাল এবং কতগুলি মন্দ। ভাল বৃত্তিগুলির বিকাশের পথ পরিষ্কার করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য। এই সকল বৃত্তি পরিচালনার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং অপর পক্ষে মন্দ প্রবৃত্তি পরিচালনার যাহাতে সুযোগ না ঘটিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। যদি কোন কারণে এই অনভিপ্রেত সুযোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে তৎসদৃশ অন্য কোনও হিতকর উদ্বোধকের (stimulus) সৃষ্টি করিয়া সেই মন্দ প্রবৃত্তিকে ভাল পথে চালাইয়া লইতে হইবে। অনেক সময় শাস্তি বিধান করিয়া এই মন্দ প্রবৃত্তিকে কষ্টের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ মন্দ প্রবৃত্তিমূলক কোন কার্য্য করিলে বালককে তখনই শাস্তি দিতে হইবে, তাহা হইলে ইহার অনেকটা প্রতীকার হইবে। কারণ, বালক মনে করিবে এইরূপ কার্য্য করিলে কষ্ট পাইতে হয় সুতরাং এই কার্য্য সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। আর বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, কিংবা অন্যত্র যে সকল সাধু আদর্শ বা ভাব বালকের মনে প্রবেশ করে সে সকল আদর্শ বা ভাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য সাধন করিতে শিক্ষা দিলে বালকেরা পরিশেষে জটিল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারিবে। আর যখনই মন্দ প্রবৃত্তির আকর্ষণে বালকের মন বিপথগামী হইতে চায় তখন থামিয়া ও ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য বালককে শিক্ষিত করিতে হইবে। এইরূপে নানা বিষয়ে অভ্যাস গঠিত হইলে ভবিষ্যতে নীতিবুদ্ধির পরিচালনে আর অন্তরায় উপস্থিত হইবে না। এখন ব্যবহারিক ভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বিদ্যালয়ে নীতিধর্ম্মশিক্ষার অন্তরায়।—বিদ্যালয়ে নীতিধর্ম্মশিক্ষার অন্তরায় অনেক। আমি মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিব—

(১) স্কুলের ছেলেরা তাহাদের জাগ্রত সময়ের ১/৪ সময় মাত্র শিক্ষকগণের শাসনাধীন থাকে।

(২) এক এক শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ৩০ কি ৪০ এবং ইহাদের প্রত্যেকের হিতাহিত বিচার-বুদ্ধির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; এবং এক অভিন্ন শিক্ষক সকলকেই শিক্ষা দেন।

(৩) জ্ঞানচর্চ্চাই বিদ্যালয়ে মুখ্য। ইহার পরে যদি সময় থাকে তবে নীতিধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে।

(৪) নীতিধর্ম্ম চর্চ্চার জন্য শিক্ষক যে উপায় অবলম্বন করিতে পারেন তাহা বড়ই সীমাবদ্ধ। কারণ, এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনাসাপেক্ষ—

(ক) যে বালক যে পরিবারের সেই পরিবারের পরম্পরাগত ধর্ম্ম ও ধারা (tradition and tone)।

(খ) বন্ধু হইতে বালকেরা বিদ্যালয়ের বাহিরে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হয়।

(গ) বিষয় বিশেষে সাধারণের অভিমত ও আচার-পদ্ধতি।

(ঘ) জাতিগত বা বংশগত ধর্ম্ম-সংস্কার।

শিক্ষক পরিবারের পরম্পরাগত ধারা বা ধর্ম্ম বদলাইতে পারেন না। তিনি স্বয়ং ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে আচরণ করিলে বাহিরের এই বিষয়ের দোষ কতকটা সংশোধন করিতে পারেন। আর তাঁহার যদি একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব থাকে, তিনি যদি বিচক্ষণতার সহিত নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন এবং তাঁহার মনোমত ছাত্র নির্ব্বাচন করিয়া ভর্ত্তি করিতে পারেন, তাহা হইলে স্কুলের ধারা বা tone উন্নত করিয়া তিনি সাধারণের অভিমত এবং সাধারণ-আচার-পদ্ধতিরও দোষগুণ বুঝিবার ক্ষমতা অনেকটা উন্নত করিতে পারেন, কিন্তু বংশ বা জাতিগত ধর্ম্মসংস্কারের উপর তাঁহার কিছুই হাত নাই। বিদ্যালয়ে আর একটা অন্তরায় এই যে, সামাজিক জীবনের অনেক অবস্থাই বিদ্যালয়ে নাই। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ, পিতা-

পুত্রের সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেক অবস্থার অভাব। সংসার-জীবন ব্যতীত বিদ্যালয়ে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা হইতে পারে না। এই বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, সকল ছাত্রকে নীতিধর্ম্মে উন্নত করা শিক্ষকের সাধ্যায়ত্ত নহে। জলের কল সহরের সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ পানীয় জল যোগাইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া সহরের সকল স্থান হইতে রোগ দূর করিতে পারে না। স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক দিয়া জলের কলের পক্ষে এই ব্যাপার যেরূপ, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া শিক্ষকের পক্ষেও নীতিধর্ম্মের শিক্ষার বিষয়টা সেইরূপ। তাহা হইলে নীতিধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক কি করিবেন?

শিক্ষকের কর্ত্তব্য।—আমরা দেখিয়াছি জ্ঞানচর্চ্চার হানি না করিয়া নীতিধর্ম্মচর্চ্চার জন্য সময় পাওয়া দুর্লভ। সুতরাং বিদ্যালয়ের নীতিধর্ম্মশিক্ষার অন্তরায়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার যে সকল মূল-সূত্র হিতাহিত বিচারবুদ্ধির উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতে পারে শিক্ষক সেইগুলি আয়ত্ত করিবেন। এখন সেই সকল মূলসূত্র কি তাহাই দেখা যাউক।

নীতিধর্ম্মশিক্ষায় প্রয়োজ্য শিক্ষা-কার্য্যের মূলসূত্র।—শিক্ষাকার্য্যের যে যে মূলসূত্র নীতিধর্ম্মশিক্ষায় প্রযুক্ত হইতে পারে সেগুলি এই—

(ক) সহজবৃত্তির ধর্ম্ম।

(খ) অভ্যাস গঠনের নিয়ম।

(গ) চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনের নিয়ম।

(ঘ) অন্যের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়ার নিয়ম (Law of Suggestion)।

সহজবৃত্তির ধর্ম্ম এই যে, ব্যক্তি সহজবৃত্তির দ্বারা কার্য্যে প্রণোদিত হইয়া থাকে, সুতরাং তজ্জন্য শাস্তি-বিধান সব সময় সমীচীন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই অবস্থায় মঙ্গলজনক কোনও উদ্বোধকের (stimulus) আশ্রয় লইয়া ভালর দিকে কোনও সহজবৃত্তিকে চালাইয়া লইতে হইবে। আর অভ্যাস গঠনের জন্য ব্যক্তিকে শুধু একটা কোন অবস্থায় ফেলিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়, জীবনের অনুরূপ অবস্থায় ফেলিয়া ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া লাভ করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির তুষ্টিবিধান করে তাহাও দেখিতে হইবে। তর্কসভায়, খেলার মাঠে বালকদিগকে অনেক সময় এরূপ অবস্থায় পড়িতে হয়, এবং নানা প্রতিকূল অবস্থায় ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া লাভ করিয়া জীবন-সংগ্রামের জন্য বালকেরা প্রস্তুত হয়। কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন বিষয়ে সর্ব্বদাই অন্ততঃ দুইটা দিক বিবেচনাধীন হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে কোনও স্কুলের এক খেলার দল এক প্রতিযোগী খেলায় বিজয় লাভ করিয়া ফিরিতেছিল। পথে স্কুলের নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের এক বাগান ছিল। বাগানের কাছে আসামাত্র দলের ছেলেদের মনে হইল বেড়া ভাঙ্গিয়া ও বেড়ায় আগুন ধরাইয়া তাহারা এই বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিবে, কিন্তু তখনই আবার তাহাদের মনে হইল এই গৃহস্থ প্রায়ই তাহাদের খেলা দেখিবার জন্য খেলার মাঠে উপস্থিত থাকে। এই কথা মনে আসাতে তাহাদের বেড়া ভাঙ্গার ইচ্ছা চলিয়া গেল। সুতরাং কোনও কার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবার পূর্ব্বে নীতিধর্ম্মের দিকটার দিকে যাহাতে ছেলেদের মনোযোগ পড়ে তাহার শিক্ষাবিধান করা কর্ত্তব্য। যখন কোনও ছেলে তাহার প্রতিবেশীর অঙ্ক নকল করে তখন তাহাকে বুঝিতে দেওয়া উচিত যে ইহা প্রকৃত পক্ষে চুরি, সুতরাং চুরি করার যে দোষ অঙ্ক নকল করারও সেই দোষ। এইরূপ ধারণা মনে আসিলে অনেক ছেলে আর কখনও অঙ্ক নকল করিবে না। অন্যের মনে একটা ধারণা জন্মাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা বড়ই মূল্যবান। যদি কোনও ছেলের আচরণে ভীরুতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহাকে "তোমার বেশ সাহস আছে" এই কথা বলিয়া উৎসাহিত করিতে হইবে। তাহা হইলে বালক বুঝিবে সে বাস্তবিক ভীরু নয়, তাহার সত্য সত্যই সাহস আছে। কিন্তু যদি এরূপ ধারণা না জন্মাইয়া ভয়ের দোষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তাহাকে ভীরুতার অপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বালককে ভীরু হওয়ার আরও অবসর দেওয়া হইবে, কারণ সে সাহসের গুণ বা উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে

পারিবে না। আর যদি ভীরুতার জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করা যায় তাহা হইলেও তাহাকে ভীরু হওয়ার আরও বেশী অবসর দেওয়া হইবে। কোনও নিষেধমূলক ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা বড়ই অহিতকর। অনেক সময় কোন শিশুকে বলা হয়, "দেখিও যেন কুকুরের লেজ ধরিয়া টানিও না।" ইহাতে উপকার ত হয়ই না, বরং শুধু কুকুর লেজ ধরিয়া টানিলে কি করে তাহাই দেখিবার জন্য বালকেরা আরও বেশী করিয়া কুকুরের লেজ ধরিয়া টানে। কিন্তু এ সকল সূত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যে নীতিধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনায় প্রযুক্ত হইতে পারে কি না তাহা দেখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ সংখ্যা লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এক শ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে অনেকে ভীরু, আবার অনেকে হঠকারী বা গোঁয়ার। অনেক ছাত্রের এরূপ প্রকৃতি যে তাহারা সহানুভূতি ও সখ্যভাব দ্বারা পরিচালিত হইলে উপকৃত হয় আবার অনেক ছাত্রের প্রতি কঠোরভাবে ন্যায়দণ্ড পরিচালনা না করিলে তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে পারা যায় না। ইংরেজিতে যে সকল ছাত্রকে bully (তর্জ্জনগর্জ্জনকারী অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত বালক) বলে, তাহারাও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। বালকেরা বাড়ীতে এবং স্কুলের বাহিরে অনেক সৎ ও অসৎ অভ্যাস গঠন করিয়া লয়, এবং ব্যক্তিসাধারণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া নানাবিষয়ের ধারণা করিয়া লওয়ার (suggestion) সুযোগ প্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের প্রায় সম্যক সময়ই জ্ঞানচর্চ্চায় ব্যয়িত হয় সুতরাং আত্মসম্মান বা ন্যায়বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ছাত্রেরা পরহিতমূলক নিঃস্বার্থ কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার অবসর পায় না। এই সকল কারণে উল্লিখিত শিক্ষার মূলসূত্রগুলি নীতিধর্ম্ম শিক্ষায় বিদ্যালয়ে সম্যক প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি শিক্ষকগণ নীতিধর্ম্মশিক্ষায় উদাসীন বা অমনোযোগী হইবেন?—কখনই নহে। তাঁহাদের যে স্বল্প সুযোগ বা সুবিধা আছে জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। নিম্নে আমি কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ করিলাম।—

(১) গৃহ পরিদর্শন।—শিক্ষকগণ যথাসম্ভব ছাত্রদের আবাসস্থানের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হইবেন এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন। যদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় থাকে তবে কতকটা সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল তাহার একটিও কার্য্যতঃ অবলম্বন করা যাইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।

(২) স্কুলগৃহে কিংবা স্কুলের বাহিরে শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে বালকেরা যে সকল কার্য্যে লিপ্ত হয় সেসকল কার্য্য সহযোগে নীতিধর্ম্মশিক্ষার উপযোগী স্বভাব গঠন।

(৩) বিদ্যালয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ক্রীড়া (collective games) আত্মসম্মান ও ন্যায়বুদ্ধির বিকাশ সাধন করে। সুতরাং তাদৃশ ক্রীড়ার ব্যবস্থা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এস্থলে একটা বিষয়ের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। অনেক সময় প্রতিযোগী ক্রীড়ার জন্য (matches) স্কুলের খেলার দলে বাহিরের লোক লওয়া হয়। এটা নীতিধর্ম্মশিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। আবার স্কুলে যে সকল ছাত্র সাধারণতঃ খেলার দলভুক্ত থাকে তাহারাই প্রায় সর্ব্বদা খেলিয়া থাকে, অন্যান্য বালকেরা তাহাদের খেলার দাবী হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে প্রতিযোগী ক্রীড়ায় পরাজয় হয় এই ভয়ে যাহারা ভাল খেলিতে পারে না তাহাদিগকে খেলিবার অবসরই দেওয়া হয় না। ইহাতে খেলার মধ্যে যে একটা সামাজিক ভাব আছে সেটা নষ্ট হইয়া যায়।

(৪) তর্কসভা।—তর্কসভা নীতিধর্ম্মশিক্ষায় বিশেষ সাহায্য করে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই বরং ঐতিহাসিক কিংবা পর্য্যবেক্ষণমূলক প্রমোদ-পর্য্যটনের জন্য যদি কোনও সঙ্ঘের সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে অধিকতর ফল লাভের আশা করা যায়, কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি অভ্যাসগঠনের পক্ষে সমধিক অনুকূল। অভ্যাস কার্য্যের প্রতিরূপ বা কাউণ্টার পার্ট (counterpart)।

(৫) সঙ্ঘজীবন গঠন করিতে বিদ্যালয়ের মিলনকক্ষ বা হল (hall) বিশেষ উপযোগী। এই মিলন-কক্ষে

প্রায়শঃ ছাত্রেরা নানা সময়ে নানা অবস্থায় মিলিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ মিলন-কক্ষ বহুব্যয়সাপেক্ষ।

(৬) উপশিক্ষক বা প্রিফেক্ট (Prefect) প্রথা। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য উচ্চ শ্রেণীর কোন কোন ছাত্রকে শিক্ষকের সহায়তার জন্য নির্বাচিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি স্কুলের ছাত্রেরাই তাহাদের মধ্যে ভোট দিয়া একজনকে নির্বাচন করে তাহা হইলে আরও ভাল হয়। এই উপশিক্ষক প্রথায় আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভর প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন হয়। কিন্তু উপশিক্ষক প্রথা সম্পূর্ণ দোষশূন্য নহে। অনেক সময় উপশিক্ষক তাহাদের ক্ষমতার ও পদ-গৌরবের অপব্যবহার করিতে পারে।

(৭) স্কুলের পুরাতন ছাত্রগণের মিলন-সভা। ইহাতে বিদ্যালয়ের পরম্পরাগত ধারা ও সুনাম নূতন হইয়া বাঁচিয়া থাকে, এবং বর্ত্তমান ছাত্রগণের আদর্শের কার্য্য করিয়া থাকে।

(৮) পুরস্কার-বিতরণ সভা সামাজিক ভাবে বড়ই মূল্যবান। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনপ্রিয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি না হইলে এই সভা নীতিধর্ম্ম-শিক্ষায় বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে না।

(৯) বিদ্যালয়ের চতুঃপার্শ্বে অসদ্ভাব-সম্পর্ক-শূন্য হইবে। অনভিপ্রেত স্থানে বিদ্যালয় থাকিলে বালকেরা নীতিধর্ম্মের প্রতিকূল অনেক বিষয়ের ধারণা করিয়া লইতে পারে।

(১০) বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনিয়মিত ভাবে ছাত্রগণের অভিভাবকবর্গের সহিত মিলিত হইলে অনেক উপকার হয়। শিক্ষকমণ্ডলী যদি সময় সময় স্কুলে সমবেত অভিভাবকবর্গের নিকট বিদ্যালয়-ঘটিত কোন কোন আবশ্যক ব্যাপারের বক্তৃতা-মূলক আলোচনা করেন তাহা হইলে নীতিধর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের অনেক হিত হইতে পারে। অভিভাবকবর্গ আমাদের দেশে তাঁহাদের বালকগণের তত্ত্ব লইবার জন্য কোনও দিন কোন শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। বৎসরের শেষে কোনও বালক যদি প্রমোশন না পায় তাহা হইলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করেন। এইরূপ অবস্থা নীতিধর্ম্মশিক্ষার একটা বিশেষ অন্তরায়। আর, শিক্ষকগণ অন্ততঃ প্রতিমাসে একবার অভিভাবকগণের নিকট ছাত্রগণের মাসিক কার্য্যের একটা জ্ঞাপনী প্রেরণ করিবেন। তিন মাস অন্তর এরূপ জ্ঞাপনী প্রেরণ করিলে বিশেষ ফললাভ হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নহে।

(১১) বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য্যকালের মধ্যে যে অবকাশ প্রদানের নিয়ম আছে তাহা শিষ্টাচার, সৌহার্দ্দ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শনের অনুকূল। যাহাতে এই সময়ে বালকগণ শ্রেণীতে বসিয়া স্কুলের কার্য্য না করে শিক্ষকগণের তাহা দেখা উচিত।

(১২) আজকাল প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই এক একটি মেগেজিন বা পত্রী হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ অভিমত (public opinion) প্রকাশের উপযুক্ত শিক্ষা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ধারা বা পরম্পরাগত ধর্ম্ম (tone and tradition) অব্যাহত থাকে।

(১৩) অনেক বিদ্যালয়ে দরিদ্রভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে উপযুক্ত পাত্রে দান করার প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হয়।

(১৪) শরীরের ও পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস স্কুলের ছেলেরা অতি সহজে শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু শিক্ষকগণ এই বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইবেন। পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্গ।

(১৫) যে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুশাসন (discipline) ভাল সে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সময়ানুবর্ত্তিতা, কার্য্যতৎপরতা, কার্য্য সাধনে সম্পূর্ণতা (thoroughness,) পরহিতাকাঙ্ক্ষা, কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি নীতিধর্ম্মমূলক স্বভাব গঠন করে। কিন্তু যাঁহারা অনুশাসন-তৎপর হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে—

(ক) সহপাঠির কিংবা একই স্কুলের ছাত্রের প্রতি অসদ্ব্যবহার ও শিক্ষকের প্রতি অসদ্ব্যবহার, এই উভয়ের মধ্যে ইতরবিশেষ নাই।

(খ) বিদ্যালয়ের ছেলেরা যদি শুধু মন্দ কাজ

না করে তাহা হইলেই যে সেই বিদ্যালয়ের অনুশাসন ভাল হইল তাহা নহে। দেখিতে হইবে কোন্ বিদ্যালয়ের ছেলে কতটা ভাল কাজ করে। শেষোক্ত বিষয়টিই অনুশাসনের মাপকাঠী।

(গ) ছাত্রগণের সৌহার্দ্দ্য আকাঙ্ক্ষা করা অকর্ত্তব্য। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন ছাত্রেরা যাহাকে ভয় করে প্রকৃতপক্ষে তাহাকেই প্রীতির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। যাঁহারা স্বীয় অধিকার প্রতিপন্ন করিতে পারেন অধীন ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে সম্মান করে, অন্যথা তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষক ছাত্রকে উৎপীড়ন করিবেন না বা তাহার প্রতি অযথা কঠোর হইবেন না।

(ঘ) ভয়ের মূলে আত্মপ্রীতি (self-love)। ভয় সহজবৃত্তি। ছেলেরা কোন একটা প্রাণীকে ভয় করে, কোনও কার্য্য করিতে ভয় করে, কারণ এই সহজবৃত্তির মূল বা আদি কারণ আত্ম-লোপ (self-destruction)। তাহার আত্মলোপ হইতে পারে বলিয়া সে এই কার্য্য করে না বা এই প্রাণীর সম্মুখীন হয় না। পৃথিবীতে কেহই মরিতে চায় না, বাঁচিয়া থাকিতে চায়। সুতরাং নিয়মপ্রণালী ও বিদ্যালয়ের অনুশাসন যথাসম্ভব ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এপর্য্যন্ত আমরা নীতিধর্ম্মশিক্ষার আলোচনা করিলাম। এই শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে হইয়া থাকে। উপশিক্ষক প্রথা, সঙ্ঘবদ্ধ ক্রীড়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শিক্ষার সহায়। আর সাধু-স্বভাব শিক্ষক বা বালকের চরিত্রের অনুকরণে যে শিক্ষা হয় তাহা পরোক্ষ শিক্ষা।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

সমাধি ও গোলাপ।

(Victor Hugoর ইংরাজী হইতে।)

করুণ সুহাসে সমাধি জিজ্ঞাসে,
"ওহে ঊষার ভূষণ!
প্রতি নিশিশেষে তব শিরোদেশে,
হয় অশ্রু বরিষণ;
কোথা তার স্থিতি, কোথা পরিণতি,
কোথায় গমন তার ?"
গোলাপ সুধীরে কহে সমাধিরে,
"(আগে) কহ তব সমাচার;
ব্যাদানি আনন, মুরতি ভীষণ,
লইতেছ তুমি নরে,—
বল শুনি ত্বরা কোথা যায় তারা,
কোথায় মিশিয়ে পড়ে ?"
কহে পুষ্প পুনঃ, "হে সমাধি শুন,
আমি সুধা-গন্ধ রচি,
গাহে যশঃ যার কাব্য গীত আর,
ফিরে কবিকুল যাচি'।"
কহিলা সমাধি, "হে ঊষার সাথী!
লইয়া মানব-দেহ
সৃজি আমি পুনঃ, হে গোলাপ শুন!
পূত স্বর্গ-দূত-দেহ।
তা'রা পক্ষ ভরে গগনে বিহরে,
অসীম হরষে ভাসি';
চিরতরে তারা জন্মমৃত্যুহারা,
গায় যশঃ বিশ্ববাসী।"

শ্রীনরেশচন্দ্র সরকার।

"সিনলজি"র (চীনতত্ত্বের) এক পর্ব্ব।

কয়েক বৎসর হইল চীনা মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস ইংরাজিতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় বোধ হয় কোন রচনা নাই। ইংরাজিতে এই বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ দেখি নাই। পাদ্রী Broomhall প্রণীত Islam in China (Morgan and Scott, London,) গ্রন্থে চীনা মুসলমান-ধর্ম্মের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত আছে। বর্ত্তমান সমাজ সম্বন্ধেও তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চীনাভাষায় মুসলমানী সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। তাহার বিবরণও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

চীনা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থই আছে। Johnston প্রণীত Buddhist China (Murray, London), Edkins প্রণীত Chinese Buddhism (Trubner, London), Eitel প্রণীত Chinese Buddhism (Trubner, London), Hackmann প্রণীত Buddhism as a Religion, এবং জাপানী Nanjio Bunyiu প্রণীত A Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, the Sacred Canon of the Buddhists in China and Japan (Clarendon Press, Oxford) ভারতবর্ষে বোধ হয় সুপরিচিত। চীনা ভারত-পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তও বাঙ্গালী মাত্রেরই জানা আছে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থমালার কয়েক খণ্ডে এইসকল বৃত্তান্তের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবার কথা। বোধহয় প্রকাশিত হইয়াছে। এইসঙ্গে জাপানী বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক Lloyd প্রণীত The Creed of Half Gapan (Smith, Elder & Co, London) উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু জাপানী দার্শনিক ও চিত্র-সমালোচক ওকাকুরা প্রণীত The Ideals of the East (নিবেদিতার ভূমিকা সহ) সকলের পড়া আছে। Beal প্রণীত Buddhist Literature in China (Trubner, London) বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানা বিরাট গ্রন্থ দুই বৎসর হইল অক্সফোর্ডের ক্লেরেণ্ডন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অক্সফোর্ডে থাকিবার সময়ে একদিনে ভিন্সেণ্ট স্মিথের ভারতেতিহাসের তৃতীয় সংস্করণ এবং সেই গ্রন্থ বাহির হইতে দেখি। বোধ হয় এতদিন উহা ভারতীয় পণ্ডিত-মহলে সুপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু মূল্য প্রায় ৫০৲. এই জন্য ভাবিতেছি যে হয়ত এখনও অনেকে তাহা চোখে দেখেন নাই। গ্রন্থের নাম The Gods of Northern Buddhism, লেখক শ্রীযুক্তা A. Getty. এই পুস্তকের পাতা উল্টাইলে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক (অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের) হিন্দু-মাত্রেই বুঝিবেন যে তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম্মে এবং তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে একচুলও প্রভেদ নাই। এই গ্রন্থে ফরাসী পণ্ডিত Deniker লিখিত ভূমিকার ইংরেজী অনুবাদ আছে। ইহারা কেহই চীনা জাপানী বৌদ্ধ ধর্ম্মের (অর্থাৎ ভারতীয় মহাযান ধর্ম্মের) সঙ্গে হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম্মের তুলনা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই।

চীনে এবং জাপানে নিম্নলিখিত দেবতাগুলি বৌদ্ধ :— নাগ, গরুড়, কুবের, লোকপাল, মহাকাল, মারীচী, হারিতী, যম ইত্যাদি। জাপানীরা ব্রহ্মাকে "বোটেন" বলে, অগ্নিকে "খাটেন" বলে, ইন্দ্রকে "আইসক" বলে, কুবেরকে "বিশমন" বলে, যমকে "এমা" বলে, গণেশকে "শোডেন" বলে, লক্ষ্মীকে "কিচিজোতেন" বলে, সরস্বতীকে "বেন্টেন" বলে, কার্ত্তিককে "তাইগেন সুই" বলে, কালীকে "কারিতীমো" বলে, এবং বুড়াশিব বা রুদ্রকে "ফুদো" বলে। এই সমুদয় দেবদেবী জাপানে বৌদ্ধ।

চীনের খাশ আবিষ্কার কন্‌ফিউশিয়াসের মতবাদ। তাহা প্রাচীনতম চীনা সাহিত্যে নিবদ্ধ। কন্‌ফিউশিয়াস সেই সাহিত্যের সঙ্কলন-কর্ত্তা বা "ব্যাস"। কন্‌ফিউশিয়াসকে চীনা বেদ-ব্যাস বলা চলিতে পারে। এই "চীনা বৈদিক" সাহিত্যকে ইংরাজীতে Chinese Classics বলা হয়। সেইগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া Legge প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। প্রকাশক Trubner & Co, London. বলা বাহুল্য প্রাচীনতম চীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে সেই গ্রন্থমালা দেখিতে

হইবে। এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত শী-কিঙ (She-king—a Book of Poetry) পাঠ করিলে অনেক সরস কবিতার সংস্পর্শে আসিতে পারি। কনফিউশিয়াস প্রাচীন সাহিত্য সঙ্কলন করিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মাত্র একখানা প্রাদেশিক ইতিহাস তাঁহার লিখিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে। তবে তাঁহার কথোপকথন উপদেশামৃতরূপে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। সেইগুলিকেও ক্লাসিকের অন্তর্গত বিবেচনা করা হয়। পরবর্ত্তীকালে এই সমুদয়ের ব্যাখ্যা, টীকা, ভাষ্য ও সমালোচনাই কনফিউশিয়ান মতবাদের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই মতবাদ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণও নানা ভাবে নানা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমাদের বৈদিক সাহিত্য যুগে যুগে যেরূপ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে চীনা ক্লাসিক সাহিত্যেরও ক্রমবিকাশ সেইরূপ। আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান যুগে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে যেরূপ নানা কথা বলিয়া থাকেন চীনা কনফিউশিয় সাহিত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ নানা মুনির নানা মত চলিতেছে। চীনসন্তান এখনও তাঁহাদের স্বধর্ম্ম ও জাতীয় সাহিত্য বিদেশীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ যেভাবে স্বদেশের অতীতকে বর্ত্তমান আলোচনা-প্রণালী অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে যত্ন লইতেছেন চীনে সেইরূপ কোন আয়োজন দেখিতেছি না। পিকিঙে থাকিতে শ্রীযুক্ত কু-হুঙ্-মিঙের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। একমাত্র তিনিই বোধহয় চীনা ধর্ম্ম ও সাহিত্য বর্ত্তমান জগতে ইংরাজি ভাষায় প্রচার করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেক ব্যাখ্যার মিল নাই। কিন্তু তিনি একাকী এবং তাহার রচনার পরিমাণ এত অল্প যে খাঁটি স্বদেশী পণ্ডিতের ব্যাখ্যা বাজারে সম্মানিত হইতে পারে না। কু-প্রণীত The Universal Order or Conduct of Life (Shanghai) এবং Higher Education (Shanghai) কনফিউশিয়ান্ "কথামৃতের" দুইটি ক্ষুদ্র রূপ মাত্র।

চীনের আর একটা খাঁটি স্বদেশী বস্তু "তাও" ধর্ম্ম Taoism)। ইহার প্রবর্ত্তক লাওট্‌জে (Lao-tsze)। তিনি কনফিউশিয়াসের সমসাময়িক—বয়সে বড় ছিলেন। উভয়েই আমাদের শাক্যসিংহের প্রায় সমসাময়িক। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর লোক। তাও-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণের মতভেদ অত্যধিক। এই ধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থের নাম "তাও-তে-চিঙ্" (Tao-te-ching)। ইহার ইংরাজী অনুবাদ একাধিক আছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছে যে এই গ্রন্থ চীনাদের "গীতা" স্বরূপ। আমার ধারণা যে, ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদাদি দার্শনিক সাহিত্যের যে স্থান, চীনা ক্লাসিকে তাও-তে-চিঙের সেই স্থান। প্রাচীন চীনা জীবন ও সাহিত্যের এক অংশ কনফিউশিয়াসের সঙ্কলনে নিবদ্ধ রহিয়াছে—অপর অংশ লাওট্‌জে-কথিত তাও-তে-চিঙ্ ইত্যাদি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই দুই অংশের একদিক দেখিলে প্রাচীন চীন বুঝা হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই দুই অংশকে পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিয়া থাকেন। আমি বলিতে চাহি যে, প্রাচীন বৈদিকেরা যেমন "ঋত"-পন্থী ছিলেন, প্রাচীন চীনারা সকলেই সেইরূপ "তাও-পন্থী"। সেই তাও-ধর্ম্মের ইতিহাস, কাব্য, কর্ম্মকাণ্ড ইত্যাদির সঙ্কলন-কর্ত্তা ছিলেন কনফিউশিয়াস এবং তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, Metaphysics বা মিষ্টিক অংশ লাওট্‌জের নামে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল কথা আমার Chinese Religion নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে বলিয়া গিয়াছি।

Parker প্রণীত Studies in Chinese Religion (Chapman and Hall, London) গ্রন্থে লাওট্‌জে, তাও-তে-চিঙ্ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কূটতর্কের সমালোচনা আছে। এতদ্ব্যতীত Legge প্রণীত Religions of China (Hodder and Stoughton, London) এবং Giles প্রণীত Religions of Ancient China ও Confucianism and its Rivals গ্রন্থদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

শিকাগোর The Open Court পত্রিকার সম্পাদক Carus তাও-তে-চিঙের ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন।

তাঁহাকে চীনা অধ্যাত্মবাদের প্রচারক বলা যাইতে পারে। Sacred Books of the East গ্রন্থমালার Texts of Taoism (Legge অনূদিত) সহজেই অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। এই গ্রন্থমালায় Texts of Confucianismও আছে, বলা বাহুল্য।

চীনা ধর্ম্মের আলোচনায় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক De Groot বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আছে। আমাদের অথর্ব্ববেদে যে সমুদয় ভুতুড়ে কাণ্ডের পরিচয় পাই চীনা ধর্ম্মে এবং সমাজেও সেই সমুদয়ের যথেষ্ট ছড়াছড়ি ছিল এবং আছে। চীনা সমাজের সেই দিক দেখিতে হইলে De Groot প্রণীত গ্রন্থাবলী ঘাঁটা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত তাঁহার Religion in China (Putnanis Sons, New York) গ্রন্থ সুলিখিত। সহজে অনেক কথা বুঝান আছে। এই গ্রন্থের শিরোনামার বিশদ বিবরণ এই— Universism : A Key to the Study of Taoism and Confucianism.

আমি Universism এর নাম দিয়াছি The Cult of World Forces অর্থাৎ বিশ্বশক্তির আরাধনা। প্রাচীন চীনে এবং বৈদিক ভারতে সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা ভারতবর্ষে যেমন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ইত্যাদি দিকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া ঘরবাড়ী তৈয়ারি করি চীনারাও আবহমান কাল সেইরূপ করিয়া আসিতেছে। স্থানমাহাত্ম্য, কালমাহাত্ম্য, ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি সবই চীনা সমাজের প্রাচীনতম কন্‌ফিউশিয়ান সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের "বৃহৎসংহিতায়" এবং "যুক্তিকল্পতরু" ইত্যাদি গ্রন্থে গৃহনির্ম্মাণ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে সেই সকল জ্যোতিষিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তাহাকে ইংরাজীতে Geomancy বলে। চীনা পারিভাষিক—Fung-shui (ফুঙ্—বায়ু, শুই—জল) অর্থাৎ সেই বিদ্যার নাম "জলবায়ু-বিদ্যা"। আমি ইহাকে আধুনিক Climatology র আদিম অবস্থা বিবেচনা করিতেছি। Groot এর পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে এবং অন্যান্য পুস্তকে এই সকল সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য তাঁহার The Religious System of China: Its Ancient Forms,—evolution, history and present aspect, manners and social institutions connected therewith গ্রন্থ চীনা ধর্ম্মের বিশ্বকোষ স্বরূপ ঘাঁটা আবশ্যক। বিরাট গ্রন্থ—মূল্য প্রায় ৭০৲। এই সকল লৌকিক আচার ও ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য ফরাসী Dore প্রণীত Researches into Chinese Superstitionsও দেখা উচিত। ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি জাপানী পণ্ডিত Suzuki প্রণীত History of Chinese Philosophy (Probsthain and Co., London) প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা ধর্ম্মের প্রসঙ্গে এই দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থও দেখা যাইতে পারে। চীনা দর্শন সম্বন্ধে আর কোন ইংরাজী গ্রন্থ আমার চোখে পড়ে নাই। সুজুকির পুস্তক অতি ক্ষুদ্র। ইঁহার Outlines of Mahayana Buddhism ভারতে প্রসিদ্ধ। সুজুকির পুস্তিকায় কন্‌ফিউশিয়াসের যুগ হইতে পরবর্ত্তী তিন চারিশত বৎসরের চীনা চিন্তাধারার পরিচয় পাই। অর্থাৎ শাক্যসিংহের কাল হইতে অশোক মৌর্য্য পর্য্যন্ত ভারতের সমসাময়িক চীনা দর্শন বুঝিতে পারি। এই সেদিন আর এক খানা পুস্তিকা বাহির হইল— শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশক। তাহাতে প্রাক্-কন্‌ফিউশিয় যুগের চীনা জীবনের চিত্র আছে। এই পুস্তকে দর্শনের ইতিহাস প্রদত্ত হয় নাই পরন্তু কন্‌ফিউসিয়াসের আমল পর্য্যন্ত চীনারা কোন্ আদর্শে পরিবার, সমাজ ইত্যাদি পরিচালনা করিত তাহার বিবরণ আছে। পুস্তকের নাম Chinese Moral Sentiments before Confucius, লেখকের নাম Rudd। রচনা প্রাঞ্জল, গ্রন্থাকারও সহৃদয়। সহজে প্রাচীন চীন বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তিকা অতি উৎকৃষ্ট প্রবেশিকা।

চীনা দর্শন সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় বোধ হয় বহু আলোচনা আছে। ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ শাংহাইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় পাঠ

করিয়াছি। অতি সামান্যই বলিতে হইবে। পেট ভরে না। প্রবন্ধাবলীর নাম উদ্ধৃত করিতেছি :—

(1) The Chinese Sophists—লেখক Forke.

(2) Wang-Chung and Plato on Death and Immortality—Forke.

(3) Mencius and Some Other Reformers of China—Macklin.

(4) Siun-King, the Philosopher—Edkins.

(5) The Character and Writings of Meh-tsi--Edkins.

(6) The Naturalistic Philosophy of China—Balfour.

(7) The Ethics of the Chinese—Griffith.

(8) Tu-li or Precious Records—Clarke.

(9) Chinese System of Family Relationship and its Aryan affinities—Kingsmill.

(10) Militant Spirit of the Buddhist Clergy in China—Groot.

হিন্দু দার্শনিক চীনে না আসিলে চীনাদর্শনের পুনরুদ্ধার শীঘ্র হইবে না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

বসন্ত-শেষে।

বসন্ত ফুরায়ে গেছে, মলয়-অনিল
থামে ধীরে, নাহি গায় মধুরে কোকিল।
ঝরে পড়ে শুকাইয়া মাধবী অশোক
কঠিন ধরণী-বুকে। দ্যুলোক ভূলোক
গ্রাসে বহ্নি, রুদ্র-নেত্রে হেরে দিনমণি,
কুসুম-শায়ক-শিরে পড়িল অশনি
যেন আজি হরকোপে! বসন্ত আমার
বিফলে গিয়াছে কেটে, নূপুর-ঝঙ্কার
উঠেনি এ শূন্য-কুঞ্জে, প্রেমের বাঁশরী
বাজে নাই কভু ভুলে! দিবা-বিভাবরী
যাপিয়াছি প্রতীক্ষায় কেবা নিবে মোর
বুকভরা ভালবাসা! কার বাহু-ডোর
বাঁধিবে আমারে বুকে! বৃথা হ'ল সব;
আজি দাব-দাহে শুধু জাগে আর্ত্তরব।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তীর্থভ্রমণ

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিবার কালে অযোধ্যা দর্শনের বাসনা মনে জাগিয়া উঠিল। পরের দিন অযোধ্যার টিকিট কিনিলাম। প্রাতে ৭টার সময় লক্ষ্ণৌ হইতে গাড়ী অযোধ্যাভিমুখে ছুটিল। আমি যে গাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছিলাম সেই গাড়ীতে অযোধ্যার যাত্রিই বেশী ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই অযোধ্যাবাসী। আমাকে বাঙ্গালী ও তীর্থ-যাত্রী বুঝিতে পারিয়া একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ঘেঁসিয়া বসিলেন। পাণ্ডাজী হরিদ্বার হইতে অযোধ্যা ফিরিতেছেন। কিছুকাল পরে পাণ্ডাজী আমাকে তাঁহার সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'বাবু! ষ্টেশনে নামিলে আপনাকে অনেক পাণ্ডাই সঙ্গে নিতে চাহিবে, আপনি কিন্তু কাহারও কথায় কাণ দিবেন না! অনেকে হয়ত দুই চারি আনা দিলেই আপনাকে সব দেখাইয়া আনিবে।' তদুত্তরে আমি পাণ্ডাঠাকুরকে বলিলাম, 'পাণ্ডাজী! আমার এখানে কাজকর্ম্ম কিছুই নাই, শুধু স্নান ও তীর্থ দর্শন মাত্র। যাহা কিছু দেখিবার জিনিষ আছে দেখাইবেন, কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে আমার মত গরীবের সাধ্যে কুলাইবেনা।' পাণ্ডাজী 'যাহা আপনার খুসী' বলিয়া চুপ্ করিলেন। বেলা ১১টার সময় গাড়ী আসিয়া অযোধ্যা ষ্টেশনে থামিল। অযোধ্যার পূর্ব্ব ষ্টেশনে উঠিয়াই কয়েকটী পাণ্ডা আমাকে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ

প্রকাশ করিতেছিল এবং নানারকম সুবিধার প্রলোভন দেখাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে গেলে আমার বেশী সুবিধা হইত কিনা জানি না কিন্তু বাক্যরক্ষার ভয়ে আমি প্রথম পরিচিতের সঙ্গে যাইতেই বাধ্য হইলাম। ষ্টেশনে অবতরণ করার পরও অনেক লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডার টর্নি বা সরকারগণ আমার নামধাম ও পিতৃপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল।

ষ্টেশনে নামিয়াই পাণ্ডাঠাকুর মির্জ্জাপুরের একটী যাত্রী সংগ্রহ করিয়া একটী এক্কা ভাড়া করিলেন। আমরা তিনজন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। উত্তরাভিমুখে অনুমান অর্দ্ধক্রোশ পথ গমনের পর সম্মুখভাগে সরযুনদী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নিমেষ মধ্যে যেন এক অভিনব রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। করযোড়ে সরযুনদীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'মা! তোমারই দর্শন-লালসায় ব্যস্ত হইয়া আজ আমি এই স্থানে আসিয়াছি। তোমাকে দর্শন করিয়া আজ আমার জীবন মন ধন্য হইল।' দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া সরযুর তীরস্থিত একটী ডুমুরবৃক্ষমূলে পাণ্ডার আশ্রম-দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইল। পাণ্ডা নামিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনার সহিত ভিতরে নিয়া বসাইলেন। কুটিরের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একখানা কম্বল পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তদুপরি উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী মির্জ্জাপুরের যাত্রীটী সম্মানরক্ষার্থেই বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই আমার সঙ্গে একাসন গ্রহণ করে নাই। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া কুঠারীতে তালা বন্ধ করিলাম এবং উভয়েই স্নানার্থ সরযুনদীতে গমন করিলাম। সঙ্গে পাণ্ডাঠাকুর আসিলেন।

প্রকাণ্ড চওড়া নদী। সৈকতভূমির উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপর দিয়া চলিতে চলিতে পা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। নদীতে চর পড়িয়াছে, এখনও নদীর স্রোতঃস্থান পর্য্যন্ত পৌছি নাই। বায়ুতে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আবৃত করিয়া তুলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বালুকা ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বালির ভয়ে চক্ষু খুলিয়া রাখা দুষ্কর। কোনও প্রকারে ৩।৪ মিনিটের পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সরযুর পবিত্র জল প্রাপ্ত হইলাম। সঙ্গীয় পাণ্ডা আমাদিগকে ঘাট দেখাইয়া ফিরিয়া গেলেন। এই ঘাটে আর ধূলিরাশির তত উৎপাত নাই, বায়ুতে তেমন উত্তাপ নাই। সরযুর জলের সঙ্গে কেলি করিয়া এই স্থানের বাতাসও শীতল হইয়াছে। মনে মনে মাকে ডাকিলাম—'মা! এই কি তুমি সেই সরযু, যেই সরযুর ঘাটে স্নান করিয়া সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ পবিত্র হইয়াছেন, যে সরযুর শীতল জলে অবগাহন করিয়া বশিষ্ঠপ্রমুখ ঋষিগণ স্নানতর্পণাদি করিয়াছেন, যাহার পবিত্র সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া শত শত সপল্লব মঙ্গলঘট ভগবান্ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিল! এই কি সেই সরযু যাহার ঘাটে ভ্রাতৃ-প্রেমিক ভরত বন্ধু-বর্গ ও প্রজাগণ সহ পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন, যাহার পবিত্র তটদেশে উপবেশন করিয়া পিতৃতর্পণ ও পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়াছেন! এই সরযু নদীর তীরদেশ বাহিয়াই ত বুঝি ভরত শ্রীরামচন্দ্রের অনুসন্ধানে শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইয়াছিলেন! এই সরযুর বিমল জলে ঝম্প প্রদান করিয়াই ত বুঝি ভ্রাতৃবর্জ্জিত লক্ষ্মণ নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! এই বুঝি সেই সরযুর নীর যাহাতে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র ভরতশত্রুঘ্নসহ বৈকুণ্ঠে গমন করেন! মা সরযু! তোমার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি নমস্কার! আমারও পাপরাশি তোমার পুণ্যজলে প্রক্ষালন করিও মা!'

সরযুর উপর একটী প্রকাণ্ড ভাসমান সেতু। সেতুর উপর দিয়া লোকজন ও গোশকটাদি যাতায়াত করিতেছে। নদীর মধ্যদেশেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর আছে। আমরা কতকস্থান অগ্রসর হইয়া একটা চড়ায় উঠিলাম। সেই স্থান হইতে অযোধ্যাসুন্দরীর দিকে তাকাইয়া চক্ষু আর ফিরাইতে ইচ্ছা হইল না। বস্তুতই অযোধ্যা-নগরী মনোহর বেশে বিভূষিতা। উন্নত প্রাসাদ ও ধবল-চূড় মন্দির প্রভৃতি মুকুটের ন্যায় শোভা পাইয়া

সগর্ব্বে যেন আকাশ ভেদ করিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় সুবর্ণরাগে রঞ্জিত পতাকাসমূহ মস্তকাভরণের শোভা ধারণ করিয়াছে। বিস্তৃত সুনীল নভোমণ্ডল ইহার অলকরাজি। অযোধ্যাপুরী অঞ্জলি প্রদানের মানসে তরুরাজি হস্তে অহর্নিশ সরযূদেবীর পদে পুষ্প প্রদান করিতেছেন। সরযুর খরস্রোতঃ এক্ষণে অনেক নিম্ন-গতিতে চলিয়াছে বটে, কিন্তু 'ভাদরের বরষায়' যখন তটিনী তটে তটে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, স্রোতের বেগ যখন খরতর হয়, তীরস্থিত সৌধরাজির সোপানাবলী বিধৌত করিয়া স্রোতস্বতী যখন কুলু কুলু রবে বহিতে থাকে, না জানি রাজধানী এবং সরযূ আরও কত মনোহারিণী শোভা ধারণ করে! মনে মনে ভাবিলাম অযোধ্যাধিপতি ইন্দ্রসখা মহারাজ দশরথের পক্ষেই এই বিশাল রাজধানী শোভা পায়। এই অযোধ্যাপুরীতেই—

"কৌশল্যায়াঽসাব সুখেন রামঃ
প্রাক্, কৈকেয়ীতো ভরতস্ততোঽভূৎ।
প্রাসোষ্ট শত্রুঘ্নমুদারচেষ্টম্
একা সুমিত্রা সহ লক্ষ্মণেন॥"

—রাজ্ঞী কৌশল্যা রামচন্দ্রকে, কৈকেয়ী ভরতকে এবং সুমিত্রা শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণকে প্রসব করিয়াছিলেন।

রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম-স্থান সন্দর্শন করিতে উৎকণ্ঠা আসিল। স্নানসন্ধ্যাদি সমাপনান্তে বাসায় আসিলাম। ঘাটে ঘাটে স্নানার্থিগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। কোথাও বা পাণ্ডাগণ সমাগত যাত্রীকে মন্ত্র পাঠ করাইতেছেন শুনিতে পাইলাম। আহারের নিমিত্ত লুচী প্রস্তুত ছিল। তিনদিন যাবৎ ভাত খাই নাই। ফলমূল দধিদুগ্ধদ্বারাই আহারের কাজ চলিয়াছে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও লুচী ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। অযোধ্যার পেরাসহকারে লুচীর বেশ কাট্‌তি হইল। লুচী বেশ সুন্দররকমে তৈয়ারী। সঙ্গীয় পশ্চিমা সহচরটী তাহার তল্পী হইতে খুলিয়া কয়েকটা কাঁচালঙ্কা আমাকে দিয়াছিল তৎসংযোগে খাস্তা লুচি চলিয়াছিল বেশ। পাক করিবার আলস্যে ভাতের আস্বাদে বঞ্চিত হইলাম।

আহারের কালে সঙ্গীটী বলিল 'বাবু! এস্থানে বেশী বিলম্ব করা উচিত নহে, আজ রাত্রি ৮ টার গাড়ীতেই কাশী চলিয়া যাওয়া ভাল।' তাহার কথায় চমকিয়া উঠিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'বাজারে গিয়া শুনিয়া আসিলাম এই স্থানে নাকি ভয়ানক প্লেগের উপদ্রব হইয়াছিল, অনেক লোক মারা গিয়াছে। পাণ্ডারা এ সকল কথা আমাদের নিকট বলে নাই।' তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না। নগরে মহামারির লক্ষণ আমি নিজেও কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নগরে প্রবেশ করিবার কালে একাগাড়ী হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম বড় বড় রাজ-পথের উভয় পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড অট্টালিকাগুলি জন-মানবহীন, অধিকাংশ বাড়ীই তালায় আবদ্ধ, ধর্ম্মশালায় অভ্যাগত নাই, দোকানে বিক্রেতা নাই, রাস্তায় লোক-চলাচল নাই; কেমন যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তখন ঐ সংবাদ অবগত না থাকায় ভাবিয়াছিলাম, 'এখন আর সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই।' বিজয়-বৈজয়ন্তীর মধ্যে আছে শুধু এক 'হনুমানগড়।' পবনতনয় বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান অসমসাহসে সীতাদেবীর সন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারই শক্তি ও ভক্তিতে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপতি দশাননকে পরা-জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতাদৃশ প্রভুভক্ত ভাগবত হনুমানের সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ কোশল-পতি রামচন্দ্র এই স্থানটীতে তাহার নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই স্থানে একটী অত্যুচ্চ স্বর্ণচূড় মন্দির পরিদৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে হনুমানজীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। অযোধ্যাবাসিগণ এখনও ইহার নিত্যপূজা সম্পাদন করিয়া থাকে। বিশ্ববাসীর ভক্তি-পূর্ণ নয়নে ইহাই রাঘবের জয়পতাকা বলিয়া সূচিত হয়। অযোধ্যাবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা এখনও 'জয় সীতারামকী জয়' রবে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। রামের জয়ধ্বনি ভক্ত-হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভক্তিরস সঞ্চার করিয়া দেয়।

আহারাদি সম্পাদন করিয়া বিশ্রাম করিলাম। বিশ্রামের সময় সঙ্গী লোকটী আমাকে কয়েকটী ম্যাজিক

বিস্তার কৌশল দেখাইয়া চমৎকৃত করিল। কিছু সময় এইভাবে কাটিল বটে, কিন্তু এই নির্জ্জন স্থানে আমাদের ভয় ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রকাণ্ড একটী তেতালা চক্‌মিলান বাড়ীতে আমরা দুইজন ভিন্ন আর কেহই ছিল না। মধ্যে মধ্যে দুই একটী খাদ্যলোভী বানর আসিয়া প্রাণিশূন্যতার অভাব দূর করিতেছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, মধ্যাহ্নকালীন প্রখর রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ভাবিলাম, তবে কি সত্য সত্যই পাণ্ডাঠাকুর আমাদিগকে প্লেগের কবলে ফেলিয়া গেলেন? তাহাতেই বা তাঁহার স্বার্থ কি? প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীটা পরিদর্শন করিলাম। উপরে ও নীচে সকল দরজাই প্রায় তালায় বন্ধ। তীব্র জলপিপাসায় আকুল হইয়া ইন্দারা হইতে জল তুলিলাম। প্লেগদুষ্ট স্থানের জল অপকারী হইতে পারে ভাবিয়াও রামনাম স্মরণপূর্ব্বক পিপাসা নিবৃত্তি করিলাম। কয়েক ঘণ্টা চলিয়া গেল। বেলা ৩ টার সময় পাণ্ডাঠাকুর আসিয়া উপস্থিত; তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি অকপটে বলিলেন, 'ফাল্গুন মাসের প্রথমভাগে এই স্থানে প্লেগের ধূম ছিল এবং সেই সময় অনেক লোক মারা গিয়াছে, স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই নিজ ঘরবাড়ী ফেলিয়া যার যে স্থানে সুবিধা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় কোথাও প্লেগের প্রাদুর্ভাব নাই। সকলেই আবার স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। সহরে যে অংশে সর্ব্বাগ্রে প্লেগ দেখা দিয়াছিল সেই স্থানের প্লেগ আগেই চলিয়া গিয়াছে এবং লোকজন সব চলিয়া আসিয়াছে। যে স্থানে প্লেগের আক্রমন পরে হয় সেই স্থানের লোক এখনও আসিতে আরম্ভ করে নাই। কাজেই এত বড় এই মস্ত বাড়ীটা খালি পড়িয়া আছে। এখন আর ভয়ের কোন কারণ নাই।'

পাণ্ডাজীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আশ্বস্ত হইয়া আমরা তাঁহার সঙ্গে অযোধ্যার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দর্শন করিতে চলিলাম। বর্ত্তমান সময়ে সহরটী খুব বড় নহে। উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১½ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী হইতে পারে। বড় রাস্তার ধারে একটী পোলিশ ষ্টেশন দেখিতে পাইলাম। বামপার্শ্বে অযোধ্যা-রাজের বাড়ী এবং রাজবাটীসদৃশ প্রকাণ্ড একটী ধর্ম্মশালা। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটী চত্বর মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্বেতপ্রস্তরখোদিত একটী মূর্ত্তি (statue)। আমরা বড় রাস্তা ছাড়িয়া দক্ষিণ পার্শ্বের একটী পথ অবলম্বনে রামের জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভাবিলাম, এইত বুঝি সেই অন্তঃপুর যে স্থানে চৈত্রের শুক্লা নবমী তিথিতে স্বয়ং নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাবিতেই শরীরের তন্ত্রীসমূহে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল, পবিত্রতার পুলকরেখা অঙ্গমাঝে ফুটিয়া উঠিল; রামায়ণ পড়িয়া যে স্থান দেখিবার জন্য পাগল হইয়াছিলাম, আজ তাহা দেখিয়া ধন্য হইলাম। শরীর ও মন পবিত্র হইল। সগরবংশ, অসমঞ্জ ও অংশুমান, দিলীপ, রঘু, অজ, ভগীরথ, দশরথ, প্রভৃতি সকলের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের স্মৃতিতেই শান্তি অনুভব করিলাম। এখন স্মৃতিছাড়া সে স্থানে আর থাকিবার কি আছে, রাম-রাজধানীর পুরাতন চিহ্ন সকলই লুপ্ত। যুগযুগান্ত চলিয়া যাইতেছে, ক্রমে ক্রমে সকলই লোপ পাইতেছে। কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া সকলেই সেই অনন্তের গর্ভে বিলীন হইতেছে। একমাত্র সরযূদেবী অযোধ্যানগরীকে বক্ষে করিয়া এখনও সেই পুরাতন স্মৃতিটুকু জাগাইয়া তুলিতেছেন; রাজবাড়ীর সেই তোরণ-দ্বার নাই, সভাগৃহ নাই, যজ্ঞশালা নাই। যজ্ঞোপলক্ষে এখন আর দেশীয় রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হন না। পৌরোহিত্য কার্য্যে দেশ বিদেশের মুনিঋষিগণের আহ্বান হয় না। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের অধ্যক্ষতায় যজ্ঞভূমি বেদমন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠে না। সঙ্কীর্ণ একটী গলির ভিতর একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন, তন্মধ্যে ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণসহ শ্রীরামচন্দ্রের প্রস্তরমূর্ত্তি অবস্থিত। পাণ্ডাগণের বর্ণনায় ইহাই দশরথ রাজার বাড়ী এবং ইহাই রামচন্দ্র প্রভৃতির জন্মস্থান। সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটীই অত্যধিক পুরাতন বলিয়া বোধ হয়।

দুই আনা চারি আনা, হইতে আরম্ভ করিয়া যার যেমন সাধ্য ভক্তি-ভেট দিয়া এই স্থানের মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। পাণ্ডাঠাকুর বিগ্রহ-দ্বারের উপর পর্দ্দা ফেলিয়া বসিয়াছেন, যাত্রীদিগকে প্রতিমা দর্শন করাইতে বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন। আমরা আরও কয়েকটী স্থানে বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি আর ভেট দিতে হয় নাই। রামের জন্মস্থান হইতে সীতাদেবীর পাকশালা প্রায় পোয়া মাইল ব্যবধান হইবে। ইহাতেই বাড়ীটীর বিস্তৃতি অনুমান করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র একটী দালানের ভিতর অন্ধকারময় এক প্রকোষ্ঠে সীতাদেবীর রসুইশালা। ইহাই যে সেই ত্রেতাযুগের দালান তাহা কে বলিবে? এই স্থানে জানকীর একটী প্রস্তরময়ী ক্ষুদ্রমূর্ত্তি বসাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখে ক্ষুদ্র একটী চুলা ও রন্ধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসবাবপত্র। দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মানা একটী স্ত্রীলোকের হস্তে একটী পয়সা দিয়া আমরা রন্ধনশালা প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকটী আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিয়া সীতাদেবী যে সত্য সত্যই এই স্থানে বসিয়া রন্ধন করিতেন তাহা বুঝাইয়া দিল। এই তাঁহার চুলা, এই তাঁহার রুটি ভাজিবার বেলন, এই তাঁহার অর্দ্ধপ্রস্তুত রুটী ইত্যাদি অনেক পদার্থ দেখাইয়া সে সীতাদেবীর ব্যাখ্যা করিল। স্থানটী ভিন্ন দালান, চুলা প্রভৃতি যে সকলই কৃত্রিম তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

হনুমানগড়ে হনুমানজীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। তথায় পূজা হয়। এই স্থানে বানরের বড় উপদ্রব, হনুমানজীর জন্য খাদ্যসামগ্রীর ডালা অসাবধানে হাতে করিয়া নিলে মূর্ত্তিমান হনুমানগণ আগে উহা প্রসাদী করিয়া ফেলে।

নিকটেই বশিষ্ঠমুনির আশ্রম। সংসারত্যাগী ঋষি দ্রষ্টব্য বা বর্ণনীয় কিছুই রাখিয়া যান নাই। সরযুর তীরে যাত্রীগণ পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থ পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। সরযুর তীরস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীগুলি দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম ইহারই কোন একটী রাজা দশরথের বাড়ী হইবে। কিন্তু শেষে জানিতে পারিলাম যে ঐ সকল স্থান দশরথের বাসগৃহ না হইলেও তাঁহার বাড়ীরই অংশবিশেষ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিলাম। পাণ্ডাঠাকুরকে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রি ৮টায় কাশীর গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম, রাত্রিতে আর খাওয়া হইল না।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ।

গীতার সহজ যোগ।

পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যে যোগে যমনিয়মাসনাদি অষ্টাঙ্গের সাধনপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তির নিরোধ করতঃ পরমাত্মধ্যানে মগ্ন হইতে হয় গীতাতে সেই উচ্চাঙ্গ কঠোর যোগের বিষয় প্রতিপাদিত হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য যে সহজ-সাধ্য যোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাতেই গীতার বিশেষত্ব। আমরা সেই সহজসাধ্য যোগের বিষয়ই এখানে আলোচনা করিব।

পাতঞ্জলোক্ত যোগে সর্ব্বকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াই যোগাভ্যাস করিতে হয়। কারণ পতঞ্জলির মতে চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধই যখন যোগ, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ", তখন কর্ম্মের সম্ভাবনা আর কিরূপে হইতে পারে? কর্ম্মের প্রেরণা চিত্ত হইতেই আসে সেই চিত্ত নিষ্ক্রিয় হইলে সমস্ত দেহযন্ত্রই যে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। গীতোক্ত যোগে কিন্তু সর্ব্ব-কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ইহার অভ্যাস করিতে হয়। কর্ম্মের দ্বারা গীতার যোগ সাধন করিতে হয় বলিয়াই ইহার নাম 'কর্ম্মযোগ' হইয়াছে। গীতায় অপর সমস্ত যোগের সঙ্গে কর্ম্মযোগও এইরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথাঃ—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥" ২৫॥
১৩শ অধ্যায়।

"কেহ কেহ ধ্যান ও মননদ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করে; কেহ কেহ সাংখ্যযোগ অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকরূপ যোগদ্বারা কেহ বা কর্ম্মযোগদ্বারা তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়।" বলা বাহুল্য যে প্রথমোক্ত যোগ পাতঞ্জল দর্শনের যোগ, আর দ্বিতীয়োক্ত যোগ সাংখ্যদর্শনের যোগ।

অপর যোগে যেমন যমনিয়মাদির সংযম পালন করিতে হয়, "কর্ম্মযোগের" জন্যও তদ্রূপ সংযম পালনের আবশ্যকতা এইরূপে বিহিত হইয়াছেঃ—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন॥ ১৬॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥" ১৭॥
৬ষ্ঠ অধ্যায়।

"অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতি নিদ্রালু বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির যোগ হয় না।"

যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ উপযুক্তরূপ অর্থাৎ পরিমিত তাঁহারই দুঃখবিনাশক যোগ হইয়া থাকে।"

শরীরকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখিয়াই কর্ম্মযোগের সাধন করিতে হইবে। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্।" "শরীরই প্রথম ধর্ম্মসাধন।" শরীরকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখিবার পক্ষে উপরি উদ্ধৃত গীতোক্ত মিতাচারই প্রকৃষ্ট স্বাভাবিক নিয়ম। গীতার এই যুক্ত-বাদ বা মিতাচারবাদ অতি আশ্চর্য্যরূপেই প্রথিতনামা গ্রীক্ দার্শনিক অরিষ্টটলের (Aristotle) সুপ্রসিদ্ধ "Golden mean" অর্থাৎ "সুবর্ণ-মধ্যপথবাদে" সমর্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি উল্লিখিত মিতাচারের দ্বারা শরীরকে সম্পূর্ণ-রূপে কর্ম্মোপযোগী করিয়াই 'কর্ম্মযোগের' অনুশীলন করিতে হইবে। কর্ম্মযোগের জন্য বাহ্যতঃ যেমন মিতাচার আবশ্যক অন্তরেও তেমনি সর্ব্ববিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আবশ্যক। কারণ মন নানাবিষয়ে আসক্ত থাকিলে তাহার বিক্ষিপ্ত অবস্থাবশতঃ যোগের একাগ্রতা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এই অনাসক্ত ভাবকেই আমরা গীতোক্ত যোগের মূলমন্ত্র মনে করি। তাহাতেই গীতাতে "যুক্ত" ব্যক্তি সম্বন্ধে মিতাচারের পরই অনাসক্তির উল্লেখ আমরা প্রাপ্ত হই। যথাঃ—

"যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥" ১৮॥
৬ষ্ঠ অধ্যায়।

"যখন সংযত চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে তখনই (সেই ব্যক্তি) 'যুক্ত' বলিয়া উক্ত হয়।"

নিস্পৃহ বা অনাসক্ত ভাবের অভ্যাসই যে চিত্তের পক্ষে সংযম তাহা আমরা উপরি উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে

বুঝিতে পারি এবং অনাসক্ত ভাবের দ্বারাই যে চিত্ত আত্মসংযত হইয়া একাগ্রতা ভাব প্রাপ্ত হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারি।

প্রাগুক্ত অনাসক্ত ভাবের দ্বারা কর্ম্মযোগ যে অন্যান্য যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৎসম্বন্ধে গীতায় স্পষ্ট নির্দ্দেশই আছে যথা :—

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎজ্ঞানাদধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২॥
১২শ অধ্যায়।

"বিবেকশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল পরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিলেই শান্তিলাভ হয়।"

কর্ম্মফল পরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ কেন? এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য হইতেছে। 'যোগ' গীতাতে ইহার ধাতুগত সংযোগার্থেই গৃহীত হইয়াছে। এই সংযোগ ঈশ্বরেরই সহিত করিতে হইবে—ইহাই গীতার যোগের সার কথা। এই সংযোগটী সর্ব্বতোভাবে হইতে হইলে অন্য সমস্ত যোগই ছিন্ন করিতে হইবে। কারণ এক সঙ্গে ঈশ্বর ও বিষয়ের সহিত যোগ কখনও সম্ভবপর নহে; অথচ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের সহিত সংযোগ সাধন করিতে হইবে। ইহা অবশ্যই বিষম সমস্যা। কিন্তু গীতা এই সমস্যার অতি সুন্দর সমাধানই করিয়াছে। সমস্ত বিষয় হইতে আসক্তি উচ্ছিন্ন-করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সমস্ত আসক্তি সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই গীতার সমাধান। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মই করিতে হইবে বটে, কিন্তু কোন কর্ম্মেই আসক্তি থাকিবে না, সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে কেবল ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইবে।

সমস্ত কর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের সংশ্রব রাখিতে পারিলে তবেই কর্ম্মের মধ্য দিয়াই আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সাধন করিতে পারি। ঈশ্বরের সহিত কর্ম্মের এই নিয়ত সংশ্রবের জন্য সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার জন্য গীতার মত প্রচারিত হইয়াছে। যথা :—

"যদশ্নাসি যৎকরোষি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥"

"হে অর্জ্জুন! যাহা আহার কর, যে কর্ম্ম কর, যে যজ্ঞ কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ কর।"

ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করাই যোগের প্রধান উপায় কিন্তু ইহা সকলেরই পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে। তজ্জন্য গীতায় যোগের আরও সহজ প্রক্রিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতায় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ে সেই সহজ প্রক্রিয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। যথা :—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়িস্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুম্ ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥
অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুম্ মৎযোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং তত কুরু যতদাত্মবান্ ॥ ১১ ॥
১২শ অধ্যায়।

"হে ধনঞ্জয়! যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর।"

"যদি তদ্বিষয়েও অসমর্থ হও; তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ মঙ্গল কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে।"

"যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ কর।"

কর্ম্মফল ত্যাগের দ্বারা মনের ব্যগ্রতা বিদূরিত হইলে মন তখন শান্ত ভাব ধারণ করে। এই শান্তভাবকে অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের তন্ময় ভাব জন্মিয়া মুক্তির কারণ হয়। গীতাতে এই তন্ময় ভাব এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়িসংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসা ॥ ৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ॥
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

১২শ অধ্যায়।

"যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে অচির-কাল মধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।" ৬-৭।

"তুমি আমাতে স্থিরতররূপে চিত্ত আহিত (স্থাপিত) ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর। তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।" ৮। বঙ্কিম বাবুর অনুবাদ।

গীতার শেষ অধ্যায়ের উপসংহারভাগেও আমরা প্রাগুক্ত ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপ যোগকেই পরব্রহ্মে লয়রূপ অনন্ত জীবনের সাধকরূপে কীর্ত্তিত দেখিতে পাই। যথা:—

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যাপি সদাকুর্ব্বাণোমদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতংপদমব্যয়ম্ ॥" ৫৬

১৮শ অধ্যায়।

"তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর।" ৫৭

"লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মসমুদয় অনুষ্ঠান করতঃ আমারই অনুকম্পায় অব্যয় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" ৫৬

বাইবেলে—"To live, move and have one's being in God"—"ঈশ্বরেই স্থিতি করা, চেষ্টা করা ও প্রাণধারণ করা" বলিয়া যে সাধকের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, উহা সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক গীতার সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে নির্ভরকারী উপরি উল্লিখিত যোগ-সাধকের অবস্থারই সম্পূর্ণ অনুরূপ।

গীতার কর্ম্মযোগ এই প্রকারেই সংসার-জীবনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মজীবনের চরম সীমায় লইয়া যাইবার প্রশস্ত বর্ত্মরূপে সকল যোগের শ্রেষ্ঠ যোগ হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অজ্ঞাত-পদকর্ত্তৃগণ।

(৩)

কাশীদাস।

কাশীদাসের ভণিতা-যুক্ত নিম্নলিখিত রাস-লীলার পদটি পদ-রস-সার পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে—

মাউর।

নন্দ-নন্দন সঙ্গে মোহন
নতুন গোকুল-কামিনী।
তপন-নন্দিনি- তীরে ভালে বনি
ভুবন-মোহন-লাবণি॥
তাথৈ তাথৈ মৃদঙ্গ বাজই
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণি।
বিলসে গোবিন্দ প্রেমে আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণি॥
উরে লম্বিত কনক-চম্পক-
দাম কর্দ্দম চন্দনে।
দোহ কলেবর ভেল শ্রমজল
মোতি মরকত কাঞ্চনে॥
রাসে মাতল সঙ্গে ষড়্ঋতু
কুঞ্জ-কাননে রাজই।
শুক শিখি পিক চাতক ডাহুক
ভ্রমরা পঞ্চম গায়ই॥
রাস-মণ্ডল গোপিনী-কুল
শ্যাম সঙ্গে নব রঙ্গিণি।
দেই করতালি বোলে ভালি ভালি
কাশীদাস বলি যাইনি॥

পদকল্পতরুর ৩য় শাখার ২৪শ পল্লবের 'নন্দ-নন্দন সঙ্গে মোহন' ইত্যাদি পদটির প্রথম দুইটি কলির সহিত এই পদের প্রথম দুইটি কলি প্রায় অভিন্ন। কিন্তু ভণিতাসহ বাকি কলিগুলি স্বতন্ত্র; তথাপি উভয় পদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বস্তুতঃ একটি পদ যে অপরটিরই রূপান্তর তাহা বেশ বুঝা যায়। কোন্‌টি আসল ও কোন্‌টি নকল স্থির করিতে হইলে দুইটি পদ পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করা আবশ্যক; সুতরাং আমরা পদকল্পতরুর পদটির ৩—৫ কলিগুলিও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"চারু-চিত্রিত দুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনি।
দুহুঁ কলেবর ভরল শ্রম-জল
মোতি মরকত হেম-মণি॥
উরহি দোলনি বাজত কিঙ্কিণি
নুপুর-ধ্বনি অনু-সঙ্গিয়া।
গীম-দোলনি নয়ন-নাচনি
সঙ্গে রসবতি রঙ্গিয়া॥
রাসে মাধব বিবিধ বিলসই
সঙ্গে সঙ্গিনি মাতিয়া।
নীল-দরপণ শ্যাম-মুরতি
হেরত গোবিন্দ দাসিয়া॥"

এই কলিগুলিতে অনেক অনাবশ্যক পুনরুক্তি দেখা যায়; তদ্ভিন্ন এই পদের প্রত্যেক যুগ্ম-চরণের শেষে পদ-কর্ত্তা 'কামিনি' 'লাবণি' ইত্যাদি চারি-মাত্রা-পরিমিত তিন-অক্ষরযুক্ত শব্দের দ্বারা মিল দিয়াছেন,—এরূপ অবস্থায় পদকল্পতরুর ধৃত 'হেম-মণি' পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পদাবলী-সাহিত্যে 'এ'-কার বিকল্পে গুরু হয় বলিয়া—'হেম-মণি' শব্দের 'হে' অক্ষরটিকে লঘু অর্থাৎ এক-মাত্রাত্মক বলিয়া তর্কস্থলে স্বীকার করিলেও ছন্দোভঙ্গ নিবারিত হয় না; কারণ মিলের 'কামিনি' 'লাবণি' ইত্যাদি সকল শব্দগুলির মধ্যেই আগে একটি গুরু ও শেষে দুইটি লঘু—মোটে তিন্‌টি অক্ষর দৃষ্ট হয়; 'হেম-মণি' শব্দে তাহার অন্যথা হওয়ায় যে ছন্দোদোষ ঘটিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা ছাড়া 'উরহি দোলনি' বাক্যের সার্থকতা কোথায়? 'সঙ্গে রসবতি রঙ্গিয়া' ও 'সঙ্গে সঙ্গিনি মাতিয়া' বাক্যের পুনরুক্তি কবির শক্তির অভাবই প্রকাশ করে। অপভ্রংশ-ভাষায় ব্যাকরণের কড়াকড়ি না থাকিলেও 'মত্ত' অর্থ-বাচক 'মাতিয়া' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ 'সঙ্গিনি' শব্দের বিশেষণরূপে প্রয়োগ পদাবলী-সাহিত্যেও বিরল। 'রঙ্গিয়া' শব্দটিকে যদি 'রসবতি' শব্দের বিশেষণ ধরা যায়—তাহার সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে।

আর যদি 'রঙ্গিয়া' শব্দের 'রঙ্গী (শ্রীকৃষ্ণ)' অর্থ করা হয়, তাহা হইলে 'সঙ্গে রসবতি রঙ্গিয়া' বাক্যের অন্বয় ও অর্থ—উভয়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। মহাকবি গোবিন্দদাসের রচনায় গুণ-ছাড়া একত্র এতগুলি দোষের সন্নিবেশ সম্ভবপর নহে। এই কাশীদাসের ভণিতাযুক্ত পদটি আমরা বর্ত্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীযুক্ত গণেশ দাসের মুখে শুনিয়াছি। সুতরাং পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে পদটির রূপান্তর ও গোবিন্দদাসের ভণিতা থাকিলেও পদ-রস-সার পুথি ও কীর্ত্তন-গায়ক সমাজের ব্যবহার অনুসারে আমরা এই পদটিকে কাশীদাস নামক কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল পদকর্ত্তার পদ বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত বোধ করি। পদ-রস-সার পুথিখানার দ্বিতীয় প্রতিলিপি বৃন্দাবন কি বঙ্গদেশে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। ইহার সংগ্রাহক পদ-কর্ত্তা নিমানন্দের নাম বৃন্দাবন অথবা বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—এ অবস্থায় তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় পদ-রস-সার পুথির প্রভাব হেতু যে বঙ্গের ঘরওয়ানা কীর্ত্তন-গায়ক সমাজে এই পদটি কাশীদাসের নামে চলিত হইয়াছে এরূপ আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। কীর্ত্তন-গায়কদিগের অজ্ঞতা কিংবা অন্যায় পক্ষপাত হেতু অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ অনেক পদকর্ত্তার রচিত পদাবলী প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের ভণিতাযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের নামেই চলিয়া গিয়াছে, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু গোবিন্দদাসের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ কবির পদ এই অজ্ঞাত-কুল-শীল কাশীদাসের নাম-সংযুক্ত হওয়ার পক্ষে সে কারণ খাটে না; সুতরাং নানা কারণেই আমরা এই পদটিকে কাশীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

এই পদকর্ত্তা কাশীদাস যে বাংলা মহাভারতের রচয়িতা সুবিখ্যাত কাশীরাম দাস নহেন—তাহা একরূপ নিশ্চিত-ভাবেই বলা যাইতে পারে। কাশীরাম দাস বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়া থাকিলে—পদামৃত সমুদ্র কিংবা পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার অন্ততঃ ২।৪টি পদ উদ্ধৃত না হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়; বিশেষতঃ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পর-বর্ত্তী হইয়াও স্ব-কৃত মহাভারতে যে শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা সন্নিবেশিত করেন নাই—ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে তিনি বৈষ্ণব-পদ-কর্ত্তাদিগের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না।

দুঃখের বিষয় আমরা এই কাশীদাসের দেশ, কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তাঁহার এই একটি মাত্র পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা যায় না—তবে তাঁহার ছন্দ ও ভাষার উপরে বেশ দখল ছিল এবং তিনি নিশ্চিতই এরূপ আরও অনেক পদ-রচনা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে গুলি কাল-গর্ভে বিলীন হইয়াছে—এখন শত চেষ্টায়ও উহার আর নষ্টোদ্ধারের উপায় নাই; পদ-রস-সার পুথিখানা না পাওয়া গেলে শুধু কীর্ত্তন-গায়কদিগের স্মৃতি-রক্ষিত পাঠের উপর নির্ভর করিতে না পারায় বোধ হয় এই পদ-কর্ত্তা কাশীদাসের নাম পর্য্যন্ত এত দিনে বিলুপ্ত হইত—ইহা মনে করিয়া বাংলার এই বিলুপ্ত সাহিত্যিক সম্পদ্‌গুলির জন্য দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ না করিয়া পারা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

উদ্বোধন।

(ঢাকা "সাহিত্য সঙ্গতের" অধিবেশনে পঠিত)

কাহার চরণ-শতদল হ'তে
জ্ঞান-নির্ঝর পড়িছে ঝরি ?
মধুময়ী কম-মূরতি কাহার
রয়েছে বিশ্ব উজল করি ?
দেবতা মানব বন্দে যাঁহায়,
দীপ্তি যাঁহার তমসহারী,
প্রাচ্য প্রতীচী জ্ঞানবিজ্ঞান
নাই কিছু নাই তাঁহারে ছাড়ি।
যাঁহার বীণার মধু-ঝঙ্কারে
ঝরে সঙ্গীত অমৃতোপম,
ভারতীর প্রিয় উপাসক দল!
শুদ্ধহৃদয়ে তাঁহারে নম।

* * *

ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যা এসেছে
বহিয়া স্নিগ্ধ-পীযুষ-ঝারি,
বেদনা-বিধুর শ্রান্ত হিয়ায়
ঢালিতে শান্তি-শীতল বারি।
দিবা যামিনীর মিলন লগনে,
ভক্তি-কুসুমে ভরিয়া সাজি,
আমরা বাণীর পূজারিবর্গ
ঢালিতে অর্ঘ্য মিলেছি আজি।
তিনি নিষ্কল, তিনি নির্ম্মল,
তাঁহারি জ্যোতিতে লুকায় তমঃ—
ভক্তি-বিনত ভক্ত পূজারি!
শুদ্ধচিত্তে তাঁহারে নম।

* * *

শান্তচিত্তে এ শুভলগনে
এস ওগো এস সগৌরবে,
ধুয়ে মুছে যাক্ পঙ্ক-কালিমা,
প্রীতিরাখীডোর পরগো সবে।
তাঁহারি আলোকে জাগুক চিত্ত,
বিষাদ বেদনা হউক্ ম্লান ;
সাধনা মোদের সার্থক হউক্,
সার্থক হউক্ মোদের ধ্যান।
তিনি নির্ম্মল, তিনি উজ্জল,
তাঁহারি আলোকে লুকায় তমঃ ;
এসহে সাধক বাণী উপাসক!
অন্তরিক্ষে তাঁহারে নম।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

রঙ্গপুরের প্রাচীনতা

রঙ্গপুর পূর্ব্বে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে ইহা প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের অধিকারে ভগদত্ত ও নরকাসুরের রাজ্যভুক্ত ছিল। এ দেশ পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধ ও প্রাচীন সভ্যতার ধাম ছিল। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে আমরা দেখি—কাশ্মীর-রাজ মেঘবাহন প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতির কন্যার স্বয়ংবরে গমন করিয়া তাঁহার কন্যা অমৃতপ্রভার নিকট বর-মাল্য প্রাপ্ত হয়েন।

স যুবা পিতুরাদেশাৎ বৈষ্ণবাম্বর জন্মনঃ ;
রাষ্ট্রং প্রাগ্‌জ্যোতিষেন্দ্রস্য যযৌ কন্যা স্বয়ংবরে।
তত্র তং বারুণং ছত্রং ছায়য়া রাজসন্নিধৌ
ভেজে স্বয়ম্বরা রাজকন্যকা চামৃতপ্রভা॥

* * *

রাজা হি নরকে নৈতদ্বরুণাদ্বৃষ্ণ-বারণং
ত্যাগীত মকরোচ্ছায়াং নবিনা চক্রবর্ত্তিনং। ইত্যাদি।

ব্রহ্মপুত্র, ত্রিস্রোতা, করতোয়া, ঘর্ঘট ইত্যাদি নদনদী-বিধৌত দেশ বরুণের অনুগ্রহে যে গরীয়ান্ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এমন তরুশীতল শস্যশ্যামল দেশ যে জলাধিপতির ছত্রছায়া লাভ করিয়াছিল তাহা পৌরাণিক উপাখ্যান মাত্র নহে। এই মেঘবাহন ও অমৃতপ্রভার কাল উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের কিছু পূর্ব্বে—তখন

কামরূপ রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত, পূর্ব্বের দিকপাল্ ও প্রাচ্যের জ্যোতিঃ।

তারপর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময় আমরা প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার সাক্ষাৎ পাই। ইনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইনি মহারাজ শিলাদিত্যের করদ রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন প্রয়াগে যে সন্তোষক্ষেত্র উৎসব করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতেন সেই মহোৎসবে ভাস্করবর্ম্মা সসৈন্যে গমন করিয়া উৎসবভূমি রক্ষণ করিতেন। এ দেশের বিশেষত্ব এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের সময়ও এ দেশ বৌদ্ধমত গ্রহণ করে নাই—এ দেশে একটিও সংঘারাম, বিহার বা চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। Hiuen-Tsang এদেশকে অপধর্ম্মবিশ্বাসী বলিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও কুমার রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এ দেশে পদার্পণ করিতে চাহেন নাই—পরে কামরূপ-রাজের গভীর নিষ্ঠা ও বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া এদেশে আগমন করেন। কামরূপ-রাজ বুদ্ধের চরণে আপনার শস্ত্র সমর্পণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু শাস্ত্র সমর্পণ করেন নাই। হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধ রাজনীতি একই কালে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। নির্গ্রন্থেরা যখন ভারতের সর্ব্ব গ্রন্থ গ্রাস করিতেছিল ইনি সযত্নে হিন্দুর শাস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক যুগ হইতে এদেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যজ্ঞ, দেবদেবীর পূজা অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এদেশে ব্রাহ্মণ-শক্তির প্রভাব অধিকমাত্রায় চলিয়া আসিতেছে।

পালবংশের রাজত্বকালে এদেশের আরও শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ধর্ম্মমতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কুলতত্ত্বার্ণবে জানা যায় মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে কামরূপ তাঁহারই শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে প্রদেশ রাজধানীর যত সন্নিকটে স্থাপিত সে দেশ তত উন্নত। গৌড়ের প্রভাব যতদিন বর্ত্তমান ছিল ততদিন এদেশের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

এ দেশে বরাবর জ্ঞানচর্চ্চার ধারা যে চলিয়া আসিতেছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই দেশ হইতে রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। বগুড়া জেলা পূর্ব্বে রঙ্গপুরের অধীনে ছিল। কুসুমাঞ্জলিকার উদয়ন এ হিসাবে রঙ্গপুর অধিবাসী। এ দেশে মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম ও 'কৈবলিয়া' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। সেরসাবাদ সরকারের অন্তর্গত সোনাবাজু গ্রামে 'ভাষা রামায়ণ' রচয়িতার জন্ম হয়। এই গ্রন্থের আদিকাণ্ড রঙ্গপুর পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদক দ্বিজ কমললোচন এই জেলার মিঠাপুকুর থানার চড়কাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই কবির 'চণ্ডিকা-বিজয়' নামক মহাকাব্য উক্ত পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ গোবিন্দ মিশ্র, যিনি শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হনুমান, শ্রীধর ও রামানুজের পঞ্চটীকার সমালোচনা করিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তিনি এই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইংরাজ রাজত্বকালে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উন্মেষের দিনে কবিবর কালীচন্দ্র বঙ্গভাষার পুষ্টিকল্পে বহু সাধনা করিয়াছিলেন। ইঁহার বিঘোষিত পুরস্কার গ্রহণের প্রতিযোগিতায় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু বাঙ্গালা রচনায় উৎসাহিত হন এবং ইঁহার উৎসাহেই বাঙ্গালীর আদি নাট্যকার ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক রচনা করেন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের কর্ম্মক্ষেত্র এই জেলাতেই ছিল।

মহীয়সী মহিলার তপঃসংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের শত শত নিদর্শন এ দেশে বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান কাশীমবাজার-রাজের বাহারবন্দ পরগণার মধ্যে ধামশ্রেণী নামক স্থানে মহারাণী সত্যবতীর নিবাস ছিল—ইনি রাজা রঘুনাথের পত্নী ছিলেন—ইনি নয়টী পরগণার অধীশ্বরী ছিলেন। এখন ইঁহার জমীদারী কাশীমবাজার-রাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজ প্রদ্যোতকুমার, আমগ্রাতীর জমিদার হেমচন্দ্র, রাণী রাসমণি, বলিহারের রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ লচমীপত, ধনপত ইত্যাদি অনেক ভূস্বামীর জমিদারীর অন্তর্গত। রাজা রঘুনাথ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন, রাণী সত্যবতী দ্বাদশবৎসর

পর্য্যন্ত সধবা রূপে অপেক্ষা করেন—এই সময়ে তিনি দানধ্যান, পূজা উৎসব, অতিথিসেবা ইত্যাদি শত শত সদনুষ্ঠানে প্রজাপালন করিতে থাকেন। দ্বাদশবৎসর পরে ব্রহ্মচারিণী বিধবা বেশ ধারণ করিয়া কাশীবাসিনী হইতে মনঃস্থির করিয়া বিষয় ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে চাহেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সেজন্য যোগ্যহস্তে বিষয় সমর্পণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার গুরুদেবের শরণাপন্ন হন। তাঁহার গুরু এই বিভব গ্রহণের ভয়ে পলায়ন করেন। তৎপর তিনি তাঁহার পিতাকে অনুরোধ করেন। পিতা বলেন, "তুমি আমার কন্যা হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবে আর আমি তোমার পিতা হইয়া এই বার্দ্ধক্যে বিভবপঙ্কে মগ্ন হইব, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা? ইহা বড়ই লজ্জার কথা, আমি এই বিষয়-ভার বহন করিতে অক্ষম।" রাণী তখন এই পাষাণ-ভার নামাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি তাঁহার আত্মীয়া মহারাণী পুণ্যশ্লোকা বঙ্গজননী ভবানীর চরণ-তলে উপস্থিত হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন একমাত্র তাঁহারই করে ন্যস্ত করিলে বিষয়ের সদ্ব্যবহার হইবে—বিষয়ের বিষাংশ নষ্ট হইবে এবং ভগবানের কোষাগারে তাহা গচ্ছিত হইবে। যমুনা যেমন আপনার সকল বারিসম্পৎ জাহ্নবীতে অর্পণ করিয়া সার্থক, সফল ও ধন্য হয় সেইরূপ রাণী সত্যবতীও তাঁহার সকল ভূসম্পত্তি জাহ্নবীসমা ভবানীর করে অর্পণ করিয়া পরম পবিত্র ও সার্থক করিয়া তুলিলেন। তপস্বিনী মহারাণী ভবানী আপনার সকল বিভবের সহিত এই বিভব দেবদ্বিজ দীনদুঃখীকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। এই মহাত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের স্মৃতি বক্ষে বহন করিয়া এখনও এই জেলা ধন্য। মহারাণী সত্যবতীর প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী এখন কাশিমবাজার-রাজের দ্বারা মহাসমারোহে নিত্য অর্চ্চিত হইতেছে।

দেবী চৌধুরাণী, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে আজ অমরী হইয়া আছেন, তাঁহার সাধনাক্ষেত্র এই জেলার ত্রিস্রোতার দুই তীরে। বজরা নাম স্থানে তাঁহার বজরা বাঁধা রহিত। তাঁহার সম্বন্ধে এ দেশে অনেক প্রবাদ আছে। এই জেলার পাটওয়ারী নামক স্থান গোপীচান্দের পাট বলিয়া খ্যাত। তাঁহার দুই পত্নী অদিনা ও পদিনার সতী-জীবনের স্মৃতিস্বরূপ উদিনা পদিনা নামক দুটী বিল এখানে বর্ত্তমান। রাণী ময়নামতীর স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা এই দেশের প্রবাদ, প্রসঙ্গ ও প্রদর্শিত স্মৃতিস্থলগুলির বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

অতীতের গৌরবস্মৃতি এ দেশের বৃক্ষে, নগরে, পাষাণে, ধূলায়, বালুকণার মধ্যে পুঞ্জীভূত আছে। যাঁহারা পাষাণের অভিশাপ হরণ করিয়া নবজীবন দান করেন, যাঁহারা গুহাস্থিত সুপ্ত, গুপ্ত ও লুপ্তকে জগতের আলোকমেলায় জাগাইয়া তুলিতেছেন, যাঁহারা মৌনীব্রত ভঙ্গ করিতেছেন, মূককে মুখর করিতেছেন, তাঁহারা যদি এ দেশের ধূলা-মাটী পাথর লইয়া একটু নাড়াচাড়া করেন, তাহা হইলে অতীতের অনেক কথাই জানিতে পারিবেন। এ দেশের ত্রিস্রোতা-ব্রহ্মপুত্রের সিকতারাশির মধ্যে সাহিত্যের অনেক স্বর্ণরেণু বর্ত্তমান আছে, প্রত্যেক বল্মীকের মধ্যে অজস্র কবিত্ব-বৈভব বিদ্যমান, প্রত্যেক ভগ্ন দেউলের মধ্যে পাষাণ-কারায় পুণ্যধর্ম্মকাহিনী বন্দিনী হইয়া আছে, উর্ণনাভের লূতাতন্তু-বিজড়িত শতশত বেণুবীণা অন্ধকার গোপন কক্ষে রহিয়া প্রকাশ মাগিতেছে। অতীতে গৌরবের লুপ্তস্তরে রস পান করিয়া এ জেলার প্রত্যেক তরুলতা রসসাহিত্যের কথা কহিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ নদের তীরবর্ত্তী দেশ, যাহা একদিন ভারতের পূর্ব্বদিকের সর্ব্বপ্রধান স্বাধীন দেশ ছিল তাহার ইতিহাস যে সামান্য নহে তাহা ঐতিহাসিকেরা অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে রঙ্গপুর শিক্ষাসভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইতে দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সভ্যতা-লক্ষ্মীর পাদপদ্মের গন্ধ এখানে কচিৎ আসে। এ হিসাবে এদেশ বর্ত্তমান সভ্যতার সুফল ও কুফল দুইদিক হইতেই এক প্রকার বঞ্চিত বলিলেই হয়। অতীত গৌরব এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, বর্ত্তমান এখানে

এখনো প্রভাব বিস্তার করে নাই। এই সন্ধিক্ষণে রঙ্গপুর এখন বিরাজিত। রঙ্গপুরের উত্তোগী বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই জীর্ণ দেশকে নবজীবন দানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য ও সদনুষ্ঠানের মধ্যে রঙ্গপুরের সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা অন্যতম। রঙ্গপুরের সাহিত্য পরিষদের অক্লান্ত চেষ্টায় এ জেলায় জ্ঞানবিস্তার, লুপ্ত গৌরবোদ্ধার ও নবজীবনের জাগরণ হইতেছে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

(৪)

শচীশ বাবু বঙ্কিম বাবুকে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে সাজাইয়াছেন। যখন যেটা সুবিধা বোধ করিয়াছেন তখন তাহাই লিখিয়াছেন। ঔপন্যাসিকের কলম কিনা, সুবিধা পাইলেই ছুটিতে চায়, কিন্তু জীবনী-লেখকের সতর্কতাই লক্ষ্য। "মনে হয়", "অনুমান করি", ইত্যাদি জীবনী-লেখকের শ্রেষ্ঠ উপাদান নহে। তাহার উপর যেখানে পুত্রকে পিতার জীবন-চরিত লিখিতে হয়, সেখানে নানা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। অনেক কথা মনে আসিলেও বলিতে নাই। বৈষ্ণব কবিরা উপাস্যা দেবীর রূপ বর্ণনা করিতেও অনেক সময় চন্দনের ছিটা দিতে ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু সেটা কেমন কটমট্ করে না?

শচীশ বাবু সত্য সত্যই কোনও কোনও স্থানে সেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুই একটা উদাহরণ দিতে হইল।—বঙ্কিম বাবু যখন বিপত্নীক হন তখনকার একটা অজানা কথা ঔপন্যাসিকের লেখনী হইতে কি ভাবে বাহির হইয়াছে দেখুন; (৪৯ পৃষ্ঠা)—

"বঙ্কিম বাবু তখন যশোহরে। সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষকে তিনি অশ্রুজল দেখান নাই। বুঝি গর্ব্ব অন্তরায় হইত।

তিনি যৌবনে বা প্রৌঢ়ে মানুষকে কখনও নয়নাশ্রু দেখান নাই বলিয়া আমার মনে হয়।"

ইহার সবটাই "মনে হয়" হইতে উৎপন্ন। পত্নীবিয়োগে, পুত্রবিয়োগে, মাতৃবিয়োগে, পিতৃবিয়োগে গর্ব্ব আবার কেমন করিয়া অশ্রুপাতের অন্তরায় হয় তাহা বুঝিলাম না। তবে পত্নীবিয়োগে অনেক যুবককে লজ্জাবশতঃ গুরুজনের সম্মুখে অশ্রুদমন করিতে দেখিয়াছি বটে। আবার দেখুন, বঙ্কিম বাবু যখন প্রথম কর্ম্মস্থলে গমন করেন, সেই সময়ের একটী কথা তাঁহার পুত্র-প্রতিম ভ্রাতুষ্পুত্র কিভাবে লিখিতেছেন, (১৩৯ পৃষ্ঠা);—

"বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজনদের ছাড়িয়া সুদূর যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর একজনকে ছাড়িয়া গেলেন; আমি তাঁহার রূপযৌবনশালিনী সর্ব্বগুণময়ী সহধর্ম্মিণীর কথা বলিতেছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণ ফাটিয়া গেল।"

গ্রন্থকার "আত্মীয়স্বজন" মধ্যে তাঁহার মাতৃস্বরূপিণী বঙ্কিম-গৃহিণীকে স্থান না দিয়া আরও সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। তাহার উপর "রূপযৌবনশালিনী", সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছিল ইহা শচীশ বাবু না লিখিলে আর কে লিখিবে?

বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে একবার তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম; সেই সুযোগে জননী-স্বরূপিণী বঙ্কিম-গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তিনি দয়া করিয়া আমার সহিত সাংসারিক কয়েকটা কথার উল্লেখ করিয়া বড় দুঃখ করিয়াছিলেন। সেই দুঃখের প্রধান কারণ তদীয় কতিপয় আত্মীয়ের তাঁহার প্রতি অবহেলা, তাচ্ছিল্য আর অনুরাগহীনতা। ঈশ্বর তাঁহার সেই আত্মীয়-স্বজনকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া সেই দেবীস্বরূপিণী বঙ্কিম-গৃহিণীর শেষ জীবন কথঞ্চিত শান্তিময় করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বঙ্কিম বাবুকে ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার কিরূপ ভাল-বাসিতেন শচীশ বাবু তাহা (১৮৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়া গিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, তাঁহারা বঙ্কিম বাবুকে ছাড়িতে নারাজ ছিলেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে তথাপি ছুটী দিতেছেন না। আবার সেই শচীশ বাবু ২০২ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "তিনি (C. E. Buckland) বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, কেন না বঙ্কিম বাবু পুলিশ-চালানি মোকদ্দমাগুলি ছাড়িয়া দিতেন।" বঙ্কিম বাবুর মত লোক পুলিশ-চালানি মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিতেন বলিয়া তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, এ কথাটা কি যুক্তিসঙ্গত? বিচারকার্য্যে তাঁহার প্রকৃত সুনাম ছিল। তিনি একজন তেজী হাকিম ছিলেন। প্রমাণ প্রয়োগের অভাব না থাকিলে আসামী তাঁহার নিকট কঠোর শাস্তি পাইত। কিন্তু পুলিশ-চালানী মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিতেন, এ কথা লিখিত হইল কেন? গ্রন্থকারের কি এই ধারণা যে, পুলিশ-চালানী মোকদ্দমা মাত্রেই মিথ্যা, আর সেইজন্য বঙ্কিম বাবু সেগুলি ছাড়িয়া দিতেন? পুলিশের সহিত হাকিম-দিগের এতাদৃশ অসদ্ভাব থাকিলে দেশ রক্ষা হয় না, অরাজকতা আসিয়া পড়ে। তবে দুই একজন পুলিশ কর্ম্মচারী যদ্যপি মিথ্যা মোকদ্দমার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তজ্জন্য পুলিশ মাত্রেই নিন্দার্হ নহেন। শাসন ও বিচার দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ। এক যোগে থাকার জন্য সময়ে সময়ে গোল বাধে বটে, কিন্তু যে বঙ্কিম বাবু জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার উপযুক্ত ছিলেন, তিনি পুলিশের বিপক্ষ ছিলেন, ইহা শাসনকার্য্যকুশল বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের বিষয় নহে। তাহার উপর যে ফৌজদারী হাকিম পুলিশের নামে জলিয়া উঠেন, কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু বঙ্কিম বাবুকে অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট খাতির যত্ন করিতেন, ভাল বাসিতেন, তবে এমন কথাটা লেখা হইল কেন?

সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে যে বঙ্কিম বাবুর নামে লোক ভয় পাইত। শাসনকার্য্যে তেমন লোকেরই আবশ্যক। আমি বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম যে, হুগলীতে একটী প্রবীণ ব্রাহ্মণের নিকট ছয়ভরি আফিং পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হয়। বিচার বঙ্কিম বাবুর নিকট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বলেন, তিনি প্রত্যহ অর্দ্ধ ভরি আফিং সেবন করেন এবং বার দিনের পথ নৌকায় যাইতে হইবে বলিয়া ৬ ভরি আফিং কিনিয়াছিলেন। কিন্তু আইন মত তিনি পাঁচ ভরির বেশী আফিং রাখিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। তাঁহার কাকুতি মিনতি বা যুক্তিতে কোন ফল দর্শে নাই। তাই বলিতেছি, কর্ত্তব্যের প্রত্যবায় বঙ্কিম বাবুর নিকট ছিল না। শুধু বঙ্কিম বাবুর নয়, তৎকালের অনেক ডেপুটীর নিকটই ছিল না। শুনিয়াছি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় বাবু গুরুচরণ দাস নামে একজন ডেপুটী ছিলেন। তিনি চাষাদের মাঠ হইতে লাঙ্গল আনিতে দিতেন না, কাঁটাল গাছে কাঁটা বাঁধিতে দিতেন না; কিন্তু তাঁহার দাপটে চোর ত্রিসিমানায় আসিত না। বস্তুতঃ শাসনের পদ্ধতিই ভিন্ন, হাকিমের দবদবা না থাকিলে হয় না। বঙ্কিম বাবুর সে দবদবা ছিল।

আমাদের রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের C. I. E. উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে Hon'ble Rai P. N. Mukherjee Bahadur গুটীকত সুন্দর ও সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, যথা—

"He has retained to the end, the same serenity of temper and unruffled disposition in all weathers that distinguished him at the beginning. I well remember how the lack of it got me into trouble with my first Collector and secured me a transfer within less than six months in my first district. I was quite a youngster then and learnt to my cost that it does not always pay to have a temper or having one not to be able to keep it."

কিন্তু বঙ্কিম বাবু এরূপভাবে আত্মদমন করিতে জানিতেন না বা জানিলেও পারিতেন না। যেখানে উপরিতন কর্ম্মচারীর ব্যবহারে বা আদেশে তাঁহার

সম্মানের বিন্দুমাত্র হানি হইত, সেখানে তিনি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ফণা বিস্তারে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে কখন ভয় পাইতেন না। সেইজন্য দুই একজন নবীন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার বনিবনাও হয় নাই এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সময় সময় অল্পবিস্তর মনোবেদনাও সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উন্নত শির কখন অবনত হইত না।

তখনকার প্রবীণ ম্যাজিষ্ট্রেটরা সুবিজ্ঞ ডেপুটীদের খাতির করিতেন। সুতরাং তাঁহারাও সেই সম্মান কতকটা দাবির মধ্যে গণ্য করিতেন। পক্ষান্তরে কোনও কোনও নবীন ম্যাজিষ্ট্রেট আবার মনে করিতেন, পাকা ডেপুটীরা তাঁহার খাতির করেন না,—ইহাতেই গোল বাধিত। বঙ্কিম বাবু হাবড়ায় সম্ভবতঃ সেই গোলেই পড়িয়া থাকিবেন, আর তাহারই পরিণামফলে এই ঘটনাটীর উৎপত্তি, (১০২ পৃষ্ঠা);—"হাবড়া মিউনিসিপালিটী হইতে নোটীস জারি হইল, কেহ combustible পদার্থ দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করিতে পারিবে না; যদি করে, দণ্ডার্হ হইবে। এই নোটীস প্রথমে ইংরেজিতে লিখিত হয়, পরে বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া সহরময় প্রচারিত হয়। অনুবাদ করেন ডানিথরণ সাহেব। তিনি তখন মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটরী। অনুবাদটী অতি সুন্দর,—combustible শব্দের অর্থ করা হইল, জলীয়! তিনি 'জলীয়' কি 'জ্বলীয়' লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

এই 'জলীয়' নোটীস এক বুড়ীর মাথায় পড়িল। তাহার একখানি গোলপাতার আচ্ছাদনযুক্ত ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। বুড়ী লেখাপড়া জানে না; অনেক প্রতিবেশীকে দিয়া নোটীস পড়াইল। সে দিগ্‌গজ জাতীয় পণ্ডিত, বৃদ্ধাকে পরামর্শ দিল, জল দিয়া ঘর ছাইও না। বৃদ্ধা আশ্বস্ত হইল। তাহার এবম্প্রকার কোনও অভিপ্রায় ছিল না। সে তাহার গোলপাতার ঘরখানিকে কোনও রকমে জলযুক্ত হইতে দিল না। আচ্ছাদনটী তখন বেশ combustible।

কিছুদিন গত হইতে না হইতে মিউনিসিপালিটীর অনুচরেরা বুড়ীকে আসিয়া ধরিল। চেয়ারম্যান সাহেব সেই অশীতিপর বৃদ্ধাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা বিচারের ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন।

বিচার করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, বৃদ্ধাকে অনর্থক পীড়ন করা হইয়াছে। যে নোটিসের অর্থ বিচারক স্বয়ং বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সে নোটিসের অর্থ বুড়ী কিরূপে বুঝিবে? তিনি বৃদ্ধাকে অব্যাহতি দিয়া রায়ে লিখিলেন, "নোটীসের অর্থ বোধগম্য হইল না; নোটীস insufficient বোধে আসামীকে মুক্তি দিলাম।"

বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সে কি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছিল, কেন তাহাকে সরকার বাহাদুর ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেনই বা ছাড়িয়া দিয়াছিল? সে হয় ত ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, কোনরকমে এক আধ ফোঁটা জল চালের মাথায় পড়িয়া থাকিবে; অতঃপর জলবিন্দু রৌদ্রতেজে শুকাইয়া যাওয়ায় সে খালাস পাইয়াছিল।

বুড়ী খালাস পাইল দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাকল্যাণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে নথি তলব করিয়া তিনি রায়ের উপর মন্তব্য লিখিলেন,—"Bankim Chandra's vanity in the knowledge of Bengali language has misled the judgment."

শচীশ বাবু এ সম্বন্ধে যাহাই বলুন, দোষ উভয় পক্ষেই ছিল। বাকল্যাণ্ড সাহেবের বঙ্কিম বাবুর জজমেণ্টের উপর মন্তব্য প্রকাশ করা সে সময়ে ভাল না হইতে পারে,—কিন্তু হায়রে একাল আর সেকালের হাকিম!

যাহাই হউক সেকালের হাকিম "নোটিসের অর্থ বোধ হইল না এবং নোটিস insufficient বোধে আসামীকে মুক্তি দিলেন," ভালই করিলেন, কিন্তু আমার পাঠকদিগের মধ্যে কে বিশ্বাস করিবেন যে, বঙ্কিমবাবু এই নোটিসের অর্থ বোধে অসমর্থ হইয়া-

ছিলেন? সেকালের ইংরাজদের বাঙ্গালা বুঝিবার নানা ভ্রম হইত জানি এবং তৎসম্বন্ধে নানা রহস্যজনক গল্পগুজবও আছে। শুনিয়াছি, একজন উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার উপরিস্থ আর একজন উচ্চকর্ম্মচারীকে লিখিলেন, "পুলিশ সাহেবের আশায় দস্যুরা পলায়ন করিল।" বড় সাহেব অভিধান খুলিয়া দেখিলেন, "আশা" অর্থে "ইচ্ছা", অতএব সিদ্ধান্ত করিলেন, পুলিশ সাহেবের ইচ্ছাক্রমে ডাকাতরা পালাইয়াছে। অতএব পুলিশ সাহেব সাসপেণ্ড হইলেন, মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। এক "আশায়" লেখাতেই এত গোল; কিন্তু আমরা বাঙ্গালী হাকিমের নিকটও কি এই বিভ্রাটের প্রত্যাশা করিব? আদালতের বাঙ্গালা চিরদিনই অদ্ভুত, বহুপূর্ব্বে আরও ছিল। তখন মুলোআনা শব্দে পাঁচের উপর পাঁচ লাগানকে বুঝাইত। এক পৃষ্ঠা দরখাস্তে একটী সমাপিকা ক্রিয়া থাকিত। কিন্তু তাহাতেও বিচারকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে নাই, এখনও জন্মে না, তবে অবশ্য এখনকার ভাষা অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু ভাষার উপর লক্ষ্য করিয়া কি হাকিমের বিচার বা শাসন চলে? তবে বঙ্কিম বাবু এমনটা কেন করিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ একটা জিদ। সাহেবের বাঙ্গালা তরজমার উপর শ্লেষ। তাঁহার উপর গাত্রদাহ।

রোষপরবশ হইয়া যে বঙ্কিম বাবু এ কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা শচীশ বাবু নিজেই প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন, (২০৬ পৃষ্ঠা)। পাঠক দয়া করিয়া এই কথোপকথনটা পাঠ করুন।—

"Buckland. Have you seen, Bankim Babu, what remarks I have made about you in my annual report?

Bankim. It is not my habit to enquire what District Magistrates write about me in their reports.

Buckland. I have spoken very highly of you.

Bankim. I don't care to know that."

ইহাতে না আছে মিলের মায়াবাদ, না আছে হার্বার্ট স্পেনসারের সমাজতত্ত্ব। তাই এই সাদা কথাগুলি সাদা ভাবেই আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। এখন ইহার এনাটমিক্যাল ডিসেক্শান করিতে হয় করুন, একটু এসিড সংযোগে রাসায়নিক পরীক্ষা করিতে হয় করুন, কিন্তু আমি বলি,—

"দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

বঙ্কিম বাবুর সুবিচার করিবার স্পৃহা ছিল। সে উদ্দেশ্যে তিনি সাক্ষীদিগকে যথেষ্ট জেরা করিতেন, আর অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিয়াছিলেন, জেরার কি মহিমা! তাই তিনি সাক্ষ্য দিতে বড় ভয় পাইতেন। প্রথম ভয় পাইয়াছিলেন বঙ্গবাসীর মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে পেনাল কোডের যে ধারায় তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার বলে যে তাঁহাদের সাজা হইতে পারে না ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই মর্ম্মে অভিমতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার আইনজ্ঞানের প্রভূত পরিচয়।

বঙ্গবাসীর মোকদ্দমায় প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে নাকি তাঁহাকে কোন একটী প্রয়োজনীয় সংবাদ দিবার আবশ্যক হয়। সংবাদ দিতে যাওয়া হয় রাত্রি ৩টার সময়। সংবাদদাতা যাইয়া দেখেন সাহেব তখনও বঙ্গবাসীর কাগজপত্র অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠে নিযুক্ত। বঙ্কিম বাবু ইহা শুনিয়া সাহ্লাদে বলিয়াছিলেন, "এমন নিষ্ঠা না থাকিলে কি অতবড় হওয়া যায়?"

তিনি সাক্ষ্য দিতে কেন ভীত হন কোন লোক এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন যে, জেরায় ভদ্রলোকের সম্মান থাকে না, আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রশ্ন করিবার ভঙ্গিতে মিথ্যা কথা বাহির হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে একটী হাস্যজনক গল্পও করিয়াছিলেন।—হুগলীর তৎকালীন প্রসিদ্ধ ফৌজদারী উকিল ৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নাকি স্বয়ং এক সময়ে জেরার চোটে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

আর একবার তাঁহার সহিত আমার কলিকাতা পুলিশ কোর্টে দেখা হয়। সেবার "বঙ্গনিবাসীর" একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় তাঁহাকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছিল। আদালতের পূর্ব্বদিকের ঘেরা বারান্দায় তিনি, এবং মনে হয়, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কি, তুমিও সাক্ষী নাকি ?" আমি "আজ্ঞে না" বলায় তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে কি আমাদের দুর্দ্দশা দেখ্‌তে এসেছ নাকি ?"

আমি তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিতে যাই নাই সত্য, তবে সম্পাদক মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সহিত একটু বন্ধুত্ব থাকায়, মোকদ্দমার বিচারফল জানিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর হাসির পর আর সেখানে থাকিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

ভগবান যাহাদিগকে ভাবিবার বা লিখিবার ক্ষমতা দিয়াছেন তাঁহাদের না ভাবিয়া না লিখিয়া থাকিবার উপায় নাই। আমার অক্ষয় দাদা তাঁহাদেরই একজন। নাম তিনি কিনিতে চান নাই কিন্তু নাম তাঁহাকে না কিনিয়া থাকিতে পারে নাই। তিনি যৌবনে বহরমপুরে অবস্থানকালে সেই দ্বিতলের বারান্দা হইতে একবার দেখিতেন গঙ্গাবক্ষ, আর একবার বাটীর সম্মুখস্থ কদম্ব-বৃক্ষ, তাহাতেই তাঁহার ভাব আসিত, ভাব পশিত, ভাব প্রকাশিত হইত। সেই ভাবের পরিণাম ও পুষ্টিতে কতকগুলি কবিতার সৃষ্টি এবং সেগুলির অধিকাংশই ইংরাজি কবিতার অনুবাদ। তাহার মধ্যে Byron এর সুবিখ্যাত কবিতারও একটী অনুবাদ ছিল, যথা :—

Roll on thou deep blue ocean roll,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain.

—"সুনীল গভীর সিন্ধু কল্লোলিয়া চল,
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসি যায়।" ইত্যাদি।

বঙ্কিম বাবু এই অনুবাদের বহু প্রশংসা করেন এবং সেই সময় হইতে অক্ষয় দাদার প্রতিভার বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই "বঙ্গদর্শনের" বিজ্ঞাপন প্রচারকালে খ্যাতনামা লেখকদিগের তালিকা মধ্যে অক্ষয় দাদার নাম প্রকাশিত হয়। আমার অক্ষয় দাদা একথা স্বয়ং স্বীকার করিয়া আপনার মহত্ব আপনিই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা:—

আর সকলে নামজাদা, আমিই কেবল নামহীন; অথচ আমার নাম ছাপা হইল। ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, নানা পুস্তক ঘাটিয়া আমি "উদ্দীপনা" প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিম বাবু বড় খুসী।"

অক্ষয় দাদার "উদ্দীপনা", "গ্রাবু","গোচারণের মাঠ", প্রভৃতি না জানেন কে ? কিন্তু সাহিত্য-জগতের পনর আনা লোক বোধ হয় জানেন না যে, তিনি প্রথম জীবনে একটি উপন্যাস লেখেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন "শান্তা"। অক্ষয় দাদা একসময়ে আমায় রঙ্গ করিয়া বলিয়া-ছিলেন, "শান্তায় না ছিল কি ? তোমরা একটা ব্রহ্মচারী না আনিলে নভেল লিখিতে পার না, আমি তাহাতে ব্রহ্মদৈত্যের আবির্ভাব করাইয়াছিলাম। অথচ আমার "শান্তা" শান্তপ্রকৃতিসম্পন্না, বলিয়া পুস্তক আরম্ভ করি।"

আমি শান্তা পড়ি নাই। যখন একথা হয় তখন শান্তার অস্তিত্ব আর ইহজগতে ছিল না। ফল কথা, দাদার আমার সেখানি ছাপিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। একবার বঙ্কিম বাবু নাকি পুস্তকখানি প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করেন। অগত্যা দাদা পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান করিতে গিয়া শুনিলেন "শান্তা" বহ্নিকে পরিণতি লাভ করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব লোপ করিয়াছে। এই ধনরত্ন আমার বৌ-দিদির হেফাজতে ছিল। তিনি সুশিক্ষিতা বিদুষী রমণী ছিলেন; তথাপি যখন এতটা হইয়া গেল তখন মনে হয়, শান্তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বুঝি তাঁহারও ইচ্ছা ছিল না। যাক্‌, শান্তাও বাঁচিল, দাদাও বাঁচিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম বাবুও নিশ্চিন্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—বৈশাখ।— বিগত ফাল্গুন মাস হইতে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে দেশমান্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের "কর্ম্মযোগ" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার "ভক্তি-যোগ" দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। "মানসী ও মর্ম্মবাণী" তাঁহার "কর্ম্মযোগ" প্রকাশ করিবার অধিকারী হইয়া বিশেষ গৌরব লাভ করিয়াছে। "সঙ্গীতাচার্য্যের স্মৃতি-কথা"—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর মহাশয়ের আত্মকাহিনী, ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। দেশীয় সঙ্গীতের আব্‌হাওয়া সম্বন্ধে সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন, "এই রাধা-কৃষ্ণলীলায় আমাদের দেশীয় সঙ্গীত ওতপ্রোত হইয়াছিল। * * * * এখন বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, এই খাঁটি বাংলা সঙ্গীতের আব্‌-হাওয়া কোন্ দিক হইতে বহিতেছিল। শুধু বসন্তের অথবা বর্ষার সঙ্গীত নহে, শুধু প্রভাত-সঙ্গীত অথবা সন্ধ্যা-সঙ্গীত নহে, শুধু কৈশোর-সঙ্গীত অথবা যৌবন-সঙ্গীত নহে;—অনাদিকাল হইতে এই করুণ অথচ মধুর ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্বসঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের চারিদিকের আকাশ ও বাতাসের মধ্য দিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুতরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া বাঙ্গালী-জীবনের সমস্ত অপূর্ণতাকে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত।" "সমাজের স্থিতি ও উন্নতি"—শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের ক্রমশঃপ্রকাশ্য সুচিন্তিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "কিসে সমাজের পতন নিবৃত্ত হয়, এবং কিসে সমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা এখন আমাদিগের অবশ্যচিন্তনীয় হইয়াছে। নানাদিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না, আমরা এক্ষণে এমন এক সময়ে উপস্থিত হইয়াছি যে, বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক চলিতে না জানিলে আমাদিগের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত হইবে। * * * এই অতি গুরুতর বিষয়ে সময়োপযোগী দুই একটি মূল কথার বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।" শ্রদ্ধেয় লেখক প্রথমে সমাজের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া সামাজিক কর্ম্মপদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ ও কর্ম্ম লইয়া সমাজ এবং কর্ম্ম বংশানুক্রমিক না হইলেও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভাব এবং আদর্শ বংশানুক্রমিক। সামাজিক কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনটি মূলকথা তিনি বলিতে চাহেন,—১। সম্প্রদায় ভেদে কর্ম্মভেদ। ২। প্রত্যেক সম্প্রদায় মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের সহিত থাকিবে না। ৩। আপৎকালে সম্প্রদায়-ভেদ এবং কর্ম্মভেদ থাকিতেও পারে এবং না থাকিতেও পারে। লেখক যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, জাতিভেদ-প্রথা সমাজের স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে বিশেষ উপকার-জনক। কিন্তু আমাদের সমাজে উহার পুনঃসংস্কার হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন,—"সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে একতা না থাকিলে সমাজ আত্মরক্ষা করিতেই পারে না। পান-ভোজনে জাতিগত স্পর্শদোষ থাকা স্বীকার করিলে গুরুতর সমবেত-কার্য্য হইতেই পারে না। যাহারা নীচ জাতি বলিয়া সমাজে পরিচিত "তাহাদিগের মনে মনুষ্যত্বের গৌরব জাগাইয়া দিতে হইবে" এবং সমাজে "নীচজাতি গুণকর্ম্মদ্বারা উন্নত হওয়ার এবং উচ্চ জাতি গুরুতর দোষযুক্ত হইলে পতিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত।" "বৌদ্ধ কলাবিদ্যা" শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় জনৈক জাপানী অধ্যাপকের একখানা সম্প্রতি প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানার নাম,—Buddhist Art in its relation to Buddhist ideals, with special reference to Buddhism in Japan.—By M. Anesaki M. A., Litt. D. ডাক্তার আনেসাকী জাপানী শিল্পকলার আলোচনা করিয়া বৌদ্ধ কলাবিদ্যার মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা হইতেই বৌদ্ধ কলাবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং দেশবিশেষের শিল্পকলা ধরিয়া উহার আলোচনা করিলেও উহা যে মূলতঃ বৌদ্ধচিন্তার আদিভূমি ভারতবর্ষের প্রতিভা-প্রসূত তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। জাপানী সূক্ষ্ম আভাষ-চিত্র "বৌদ্ধ ধ্যান ধারণার

অতীন্দ্রিয় ভাবসম্পদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবিকাশ।" "গ্রন্থগত বৌদ্ধমত যাহার ছায়া, শিল্পগত কলাকৌশল তাহাকে কায়াদান করিয়াছিল। * * * তজ্জন্য তাহার প্রথম আত্মবিকাশচেষ্টা ভগবান্ শাক্যবুদ্ধের নরমূর্ত্তি নির্ম্মাণের আয়োজনে ব্যস্ত না হইয়া, তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের মূল অনুভূতিকে কায়াদান করিবার উপযুক্ত রচনাকার্য্যের অবতারণা করিয়াছিল।" স্তূপ-নির্ম্মাণ ইহারই প্রাথমিক পরিচয়। "দাদা" শীর্ষক গল্পটির লেখার ভঙ্গী প্রশংসার্হ হইলেও উহাতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের প্রবল ছায়াপাত লক্ষিত হইল। সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর দীর্ঘ কবিতা "শিবসপ্তক" তাঁহার লেখনীর অনুপযুক্ত হয় নাই, তবে মাঝে মাঝে কয়েকটি লাইন বড়ই গদ্যময় বলিয়া মনে হইল। "মোগল বিদুষী জহান্-আরা" শীর্ষক 'আগামী-সংখ্যায়-সমাপ্য' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়"—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুলিখিত ও সুচিন্তিত দার্শনিক প্রবন্ধ। মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত সুখানুভূতি হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এই সুখানুভূতির একটা চরম আদর্শ নির্দ্দেশ করা কঠিন, কারণ শিক্ষাদীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে; অধিকন্তু যাহা আপাতরমণীয়, পরিণামে তাহা সুখজনক না-ও হইতে পারে এবং যাহা বর্ত্তমানে দুঃখজনক তাহা ভবিষ্যতে প্রভূত সুখের প্রসূতি হইতেও পারে। তবে মোটের উপর যাহা অধিকতম সুখের সন্ধান দিতে সমর্থ তাহাই প্রধানতঃ অনুসরণীয়। কিন্তু এই সুখদুঃখ আমাদের জীবনে এমন ভাবে মেশামিশি করিয়া আছে যে, সময় সময় একে অন্যের মধ্যে সীমারেখা আঁকিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় না। মানবচিত্তের রহস্য প্রহেলিকাময়; তাহার বিচিত্র অনুভূতি ইন্দ্রধনুর বর্ণলীলার মত মিশ্রব্যঞ্জনায় বিকশিত, কিন্তু তাহা যে একটি অন্তর্নিহিত চরম একত্বেরই বহির্বিকাশ একথা জোর করিয়া বলা যায় না। যে সাধারণ নীতিজ্ঞান আমাদিগকে ভাল-মন্দ বিচারে সাহায্য করিবার স্পর্দ্ধা করে, তাহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড নাই—থাকিতে পারে না। আমাদের সহজজ্ঞান ও পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতার উপর ইহার ভিত্তি নিহিত, সুতরাং বিশ্বের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিধিনিয়মও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। সুখদুঃখ, ভালমন্দের সংজ্ঞা যখন এত জটিলতাপূর্ণ তখন প্রকৃষ্ট আদর্শের অনুসরণে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করা যে সুকঠিন তাহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাকে লক্ষ্যস্বরূপ ধরিয়া লইলেও গোল থাকিয়া যায়, কারণ কোথায় সেই পূর্ণতার আদর্শ যাহা আমাদের সহস্র প্রচেষ্টাকে একটি সাধারণ নির্দ্দেশে নিয়মিত করিবে? প্রকৃত শ্রেয়ঃ যাহা তাহা যদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত হয়, ভগবানকে যদি আমরা মহামানবের আভাষময় অলোক-মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হই, তবে জ্ঞান ও ধারণার অস্পষ্ট সীমারেখা হারাইয়া আমাদের শ্রেয়ের অনুসন্ধান কি অকূলে দিগ্‌ভ্রান্ত হইবে না? শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনের এই প্রবন্ধটির সম্যক পরিচয় বা আলোচনা প্রদান করা মাসিক সমালোচনার পৃষ্ঠায় সম্ভবপর নহে। "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র এই সংখ্যায় কবি কালিদাস ও "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রীর কবিতা দুইটি উল্লেখ-যোগ্য। মাসিক সাহিত্যে "মানসী ও মর্ম্মবাণীর" স্থান সর্ব্বোচ্চে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

শ্রীসমালোচক।

———

চাঁদ।

(১)

চাঁদরে! তোর মুখ চেয়ে কত শত কবি গাহিয়াছে কত গান,
কত মধুযামিনী শুধু কেটে গেছে নিরখি তোর কণক বয়ান।
হৃদি বীণা তারে ঝঙ্কার তুলি,
কবির অধীর চিত্ত আকুলি,
কোন্ দিন হ'তে নীল নভ গায়ে নিয়েছিস তুই আপন বাসা!
কোন্ দিন হ'তে শিখেছিস তুই অমল মধুর মোহিনী হাসা।

(২)

উপেক্ষি সকল বিরহ ব্যথা হাসির ফোয়ারা খুলেছ কবে?
বুঝি, পূর্ব্ব দুয়ার গর্ব্বে খুলিযা স্বর্গ হতে গো এসেছ এবে।
আজি রঞ্জিত করি সর্ব্ব গগন,
পুঞ্জিত করি কণক কিরণ,
পৃথ্বী করিয়া নন্দন বন ও গো চাঁদ! তুমি এসেছ,
বিশ্ব মাঝারে সুন্দর-সেরা বুঝি এই ভেবে তুমি হেসেছ।

(৩)

কত কবি এল কত কবি গেল কেহত হেরেনি ম্লান রূপরাশি,
বাল্মিকী কালিদাস ভারবী রবি, সকলি হেরেছে তব মধু হাসি।
লক্ষ বরষ চলে গেছে সখা,
দুঃখের কভু পাওনিক দেখা,
তোমার গগনে শুধু সুখ রাজে চিরবসন্ত বিরাজে সেথা,
শুধু কেঁদে মরে পৃথিবীর জীব বিরহ মৃত্যু ব্যথিত হেথা?

(৪)

না-না-না, আমি জানিয়াছি—আমি জানিয়াছি তব গোপন কথা,
তোমার হৃদয়ে শুধু দুখ রাজে শুধু হাহাকার করিছে ব্যথা।
সখারে! হাসি রাজে আঁখি জলে,
শুধু হাসি মাঝে হাসি—কে বলে?
কৃষ্ণবিরহ ক্লিষ্ট রাধার আঁখি জলে যত ফুটেছিল হাসি,
তুমি কি কখন হাসিয়াছ চাঁদ অমল মধুর হাসির রাশি?

শ্রীচারুভূষণ দেব চৌধুরী।

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A., D.L.

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
" Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. Donald, I. C. S.
" Mr. W. W. Hornell, M.A.
" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. G. Cumming, C. S. I.
" Mr. F. C. French I.C.S.
" Mr. W. A. Seaton I. C. S.
" Mr. R. B. Hughes-Buller, C.I.E., I.C.S.
" Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D.
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M. A.
" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
" T. T. Williams M. A., B. Sc.
" Egerton Smith, M. A.
" G. H. Langley, M. A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
" Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Shushung.
The " Maharaja Bahadur of Nashipur.

The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
" Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S
" Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
" Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
" Radha Kamal Mukerji, M.A.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra
" Jagadananda Roy.
" Binoy Kumar Sircar.
" Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College.

CONTENTS.

সূচী।

THE DACCA REVIEW.

VOL VII. APRIL, 1917. No. 1.

THE HINDU YOGIN.

I wish it first of all to be understood that my aim here is not to exaggerate or minimise the greatness of any religious system. Religion is one—although the methods of worship differ, to suit the tastes and needs of different people. I am quite content if I find the spirit of devotion in a man based on a strong common sense and a high order of moral principles—no matter under what name or in what form he worships God. All that is wanted is sincerity and earnestness; and any man of faith and devotion possessing these qualities is entitled to the respect of the world and grace of God. I have ventured in these pages only humbly to lay before my readers the considerations that have forced themselves upon me as to the best possible way of loosening the grip of materialism upon the heart of men.

Yogin means one who practises Yoga. But this Yoga has a double meaning: materially it means *addition*, and spiritually, *union and communion*. To the Hindu the second meaning is more substantial and he uses it to express union between the individual and the universal soul. In these pages an attempt will be made not at a critical study of the Yoga system and school but briefly to relate the possibilities of the Yogin's life—how high he can soar up and yet be in touch with this lowly world of ours. Methinks his life supplies the best possible solution for the greatest enigma of life, the most difficult problem of the modern world—the life and death struggle between materialism and spiritualism.

To the student of the world-philosophy one cause and only one will appear to be governing the trials of life, from the small troubles of our little worlds to the most sanguinary wars convulsing nations and ages. And that cause will be found in the most powerful attachment for the material

world that governs the life of man culminating in a never-ending struggle for existence, authority and sway. This however is no new unravelling of an old mystery. The soul of the thinker of all ages and climes has ever been conscious of this and essayed at supplying a solution for this evil. The suggested antidotes may, however, be divided into three principal classes Finding sordid lucre and love to be. the guiding principles of man's life one class has suggested a summary dismissal of these two things; and another, fully conscious of the futility of any such suggestion or attempt, has encouraged man to work for those two things alone, only insisting upon the observance of religious service at stated hours and the maintenance of the moral code necessary for the preservation of society. The philosopher however, who looked deep down into the soul of man and discovered its potentialities, could not accept any of these courses and laid down an intermediate way. And to this way belongs the Hindu Yogin; and proceeding along this he has discovered a world of life and light which is unknown to all others.

The blinding attachment for the world has never been so strong, especially in India. The Indian civilisation—science and philosophy, art and literature—always pointed to the spiritual development of man as the greatest goal of life, and holding it before the eye of its sons in all the splendour with which its Vedantic lore and religious imagination could clothe it, successfully suppressed materialism to a very great extent. In course of time, however, western civilisation with all its material glare made its way into the country of the Hindu. Spiritually paralysed by this he has now allowed his old life-principle—the basic principle of his religion—to be replaced by the fundamental theory of a material civilisation. "Struggle for existence and survival of the fittest"—the most potent and mishievous germ of all the present day unrest—has now obtained a greater hold on him than his own principle—A truly liberal mind looks upon whole mankind as his own kith and kin." Modern science and philosophy, history and literature, trade and commence, in short every item of the modern life, now forcibly reminds him, at every turn, of the keen struggle for existence in which he has got himself entangled. He finds no way out of it and cannot even look beyond it. He is now gradually losing his faith in the soothing transmigration of the soul and births and re-births and has generally begun to fix his eye upon the material aspect of existence. Even though he talks of it occasionally, he has no living and practical faith in the spiritual side of it; and even when faint glimmers of spiritual existence peep into his mind, he at once shuts his eyes against it under the spell of sensual appetite and he carries with him only a faint and dull

echo of it like the indifferent memory of a pleasant dream. In short, the spiritually alive Hindu has now forgotten to interpret and accept the "struggle for existence" spiritually. This change in the bent of national thought and in the national outlook of life--this undivided supremacy of worldliness—is not a negligible thing, considering what a firm faith the Hindu had in the life beyond the grave and also how even now he has to go through ceremonies, all the worth and significance of which depends upon his faith in this unseen life. It has unquestionably turned his mind away from the God of life and emancipation to the worship of Mammon and the goddess of beauty; and with such a violent force has this turning been effected that the Hindu is now scarcely able or even willing to believe that there can or should be any higher goal of life than the attainment of material glory, material wealth, material authority and sensual pleasure. And at the root of all his trials and tribulations and as the motive-force of all his aspirations will now be found beauty and wealth alone.

Turning our eyes for a moment to the older nations of the world, we do not find a better picture of human life, a better conception and better realisation of the goal of existance. All the advancement in Science and philosophy of modern civilisation has been retrograde, tending at every forward step only to throw the mind of man away from the service of God. "Unknown and unknowable", He has ceased to influence their life. Charity, universal brotherhood of man, self-abnegation and self-realisation have become to them simply meaningless jargons. All their faith and all their aspiration are now epitomised in the one phrase "struggle for existence and survival of the fittest" and the inevitable consequence is—the world-war, the din of which is as it were shaking modern civilisatian to its very foundation.

This being the influence of materialism upon the nations of the world, it would be foolish to expect that a simple warnning however true and wise it be, will awaken man to the sense of his degeneration and stimulate him to dwell in the spirit again. "To steal is a heinous offence"—is a truth that is impressed upon the child of man almost from the moment of his birth; yet he is found to steal and to continue in his vicious habit even after he has experienced jail-life. When he cannot give up stealing, he cannot be expected to shake off his allegiance to 'women and mammon; influenced by such a whisper as "It is the source of all our discontent and troubles" especially if we remember that it has a charm of its own—it has a pleasure to offer to its votary, a pleasure which again appears too real and too solid. Besides, this attachment being the real bondage of the world, it will be there as long as the world is a reality so long as one cannot withdraw himself from

his environment and retire into the soul. It is these considerations that led to the discovery of the "intermediate course". The worker along this line has neither to give the cold shoulder to 'woman and mammon' nor to be a slave to them.

This "intermediate course", may be summarised thus.—If you want to enjoy the pleasures of the world, do enjoy them to your heart's content but only beware that you have no bitter pills with sugared coatings. This pleasure may be earned in two ways. First, you may make it the only object of your life, as a worldly man does; and Secondly, you may devote yourself to the service of God. But who, in this age of scepticism, in this world of materialism, will not laugh in his sleeves to hear this, especially when he sees, scattered over the world, pictures of hermits and *Sannaysins*, dressed in rags and suffering the extreme verge of penury and distress?—However, all that can briefly be said here is this—the pleasure found in the first way is no happiness but only a distortion of it. It is accompanied by the pain of other yet unrealised desires and the fear of losing it and is followed by despression or a feeling of surfeit and often leads to a blunting of the conscience and moral and physical destruction. A strict adherence to the second course, however not only renders possible the attainment and enjoyment of worldly pleasure and prosperity but removes the sting from it and enables man to find undying peace and bliss and attain divinity itself. The heart is cleared of all impurities and enjoys beatitude; the eye of wisdom is opened revealing before it the mysteries of creation and government of the world; and last but not least, is attained the power of healing all heart-sores and phy sical disabilities. That all this is not a myth, that man is really the son of God the rightful heir to all this glory—of all His omnipotence, omniscience and omni presence, to show this and to suggest how all our national problems may best be solved by the establishment of an empire of religion, an humble attempot has been made in what follows

In the dark past when this solid world of ours was evolved out of chaos but still enveloped in mist and mystery, there shot out into the overhanging sea of darkness, since known as the sky, a huge brilliant orb of fire diffusing light and life around and dispelling the mist. At-once it called forth the awe and admira tion of the noblest of all creatures, the primitive man, created in the own image of God, and endowed with speech. And standing, with upturned eyes and folded hands, on the snow-clad summits of the Himalayas, he poured forth, with his whole soul into it hymns after hymns singing its glory and set himself to the endless task of reading the mystery. The world had just emerged into from nothingness and was quite unlike, both in form and spirit, what we now find it to be—the one scene of the struggle for existence and the survival of the fittest. "Like a mother just delivered of her

baby and forgetting all her troubles and travail in the lulling embrace of the delicate child, it also held fast to its bosom and had unbounded love for all the creatures that sprang upon it and transmitted this love, towards one another, through and permeating the hearts of all. And pure love is the most simplifying agency the moral world has ever known,—it simplifies the too complex relationship between man and man, and to crown all, makes the heart of man smooth, simple and pure like that of God Himself. Possessed of this simplicity and unknown to the wicked and selfish ways of the later world, the Himalaya man, in the first attitude of unsophisticated devotion, knelt down before the rising sun, called him the one light-giving and life-bestowing principle (ôṃ tat-tam-asi) and humbly prayed to be initiated into the mysteries of creation and the goal of life. His helpless simplicity, his spirit of sincere devotion and his absolute resignation moved the fountain-head of all knowledge, and as it were down the rays of the sun came to him, as the result and reward of his losing himself in the contemplation upon this mighty source of light and life—which is Yoga—true union —down came to him the best solution of the mystery enshrouding creation. His soul became inspired with celestial fire, and the inspiration found expression in the sweet and pithy sayings of the Vedas and the Upanisads. Like a beauteous bird just come down from the seat of God, his enraptured soul sang out to the world the most beautiful, the most true, the most life-inspiring song that has ever been sung. He sang aloud—The creator is one, without a rival. He is omnipresent, omniscient and omnipotent. He is all life, bliss and consciousness. Spirit and matter are both emanations from Him and in essence the individual soul otherwise called the ego and the universal soul are one, the former being simply a spark from the latter. The goal of life consists in the realisation of this truth and the consequent union of the individual with the eternal soul. Confined within the body, the individual soul is however influenced by it and becomes the *ego*, attributing to itself agency in reference to its enjoyments and sufferings. It now begins to think that it acts and enjoys and suffers according to its actions. It is now buoyed up by praise and depressed by censure. It is this self-importance assumed by the ego and pandered to by the body that stands resolutely in the way of the realisation of the eternal truth and the goal of life. The body of man with its senses enlivened by the infusion of the spark of the eternal soul, and with the life and the mind inside it, is a production of the five elements (earth, water, fire, air and ether). grosser forms of subtle matter. It is therefore too keenly alive to the influences of the material world around and thus casts a spell upon the ego, making it identify itself with the body.

Death is the disintegration of the body and means for those who have not attained emancipation only the beginning of another existence, but for those who have merged their ego in the eternal soul it means the cessation of all births and an indissoluble union with the creator. The elements claim the body of man in life and in death as being a resultant product of themselves; and the joint influence of the elements upon the body and through the body upon the subtler life and its more material aspect, the mind, creating and attracting them to their enjoyment is nature, the creative energy of God. The life of man may therefore be aptly described to be the scene of a continuous struggle between the individual soul which in its sober moments when it is not the ego is anxious to emancipate itself from the bondage of the body, and the attractive force of matter *i.e.*, nature. So great, however, is the charm of nature and with such untiring assiduity is she always spreading her treasures before the ego that she generally succeeds in keeping the soul of man confined down to the world of the senses. There are moments when however, like the flash of the lightning upon a dark cloud, there flashes upon the ego the sense of its downfall. "Sweet are the uses of adversity"—and in the shape of great calamities there come occasional warnings to the benighted soul from the benevolent Maker.

Having thus been purged of all dross and brought to a sense of its going astray, the individual soul is found to make spasmodic efforts to re-establish its lost union with its Master. If the bondage of the world has not enervated it to the extent of making it quite unfit for the struggle, it may repeat these efforts and ultimately gain its object. If however, the bondage has become too strong and the soul, reduced to the position of the ego, has become too weak to fight out its way unaided, mightier souls are found to come to its rescue. For individuals the helping soul appears in the form of *Guru*; but when a whole nation has allowed its souls to be thus captivated by matter, God assumes incarnation and shows the way out. Though fundamentally all incarnations are alike and their object is the same, yet different are the weapons, both in keenness and natures, wielded by them, these being determined by the necessity of the age. This is why Jesus, Muhammad, Buddha, Sri Krishna, Chaitanya and the other Lords, although preaching the same eternal truth, chose so different methods, they were fully conscious of the tastes and moral and religious culture of the people for whose salvation they came down.

Thus came to the Hindu Yogin the knowledge at first hand of the real nature of himself, *i. e.* of the soul within as well as of the body and the relation that should exist between these two. And he came to believe, not as we believe now, which is only another

name for doubting, but to really believe that living in the soul is the source of all bliss, while living in and for the body is the source of all our griefs and sorrows. Viewed from the stand-point of the soul, man is united with man, the soul within one having the same hopes and fears as the soul within another; while viewed from the stand-point of the body there is difference between man and man giving rise to a never-ending struggle for existence. So he lived in the soul and thereby established a solid union between himself and the universal soul. The result was a world of gain to him. The body is limited by time and space, and as such, the knowledge that we get through the body is also so limited. But the soul being a spark of the universal soul—the Fountain-head of all true knowledge, of all truth, union between these two enables man to see at a glance the whole field of what is to be known. Besides, the knowledge that comes to us through the senses is either partial or inaccurate; but the knowledge that springs up from the soul-union is all-round and complete. Hence it is that the contributions made by the primitive Yogin to the different branches of knowledge have been so varied, elaborate and complete that with all our boasted theories and experiments we are still far behind them. We have laughed at and still may laugh at many of his ideas and contributions; but has not the advance of modern science put us to shame over the foolishness of our laughter in many respects and directions? When we laugh at a thing we generally forget that the view points of observation may be different and that our own stand-point may be false and slippery. Have not many of our pet theories often the misfortune of being exploded in our very face? Who knows that some of the boasts of modern science will not even to-morrow call forth the loudest laughter even as the ravings of a mad man?

It seems almost yesterday that we most graciously pitied our ancestors upon their lack of common sense and thus indirectly congratulated ourselves upon an abundant possession of it. How foolish, simple and devoid of commonsense these people are, so thought we, that they believe in all that the imaginative poet has sung about! But, pray, what is their fault!—they believed, for instance, among other foolish things, in the aerial flight of man. But has not the present war proved to the entire satisfaction of the most fastidious critic that this flight was no flight of the poetic fancy? They believed the stars and planets to be peopled. Is not modern Science also tending towards that? And there are many other things also which our ancestors knew and believed in but we thought to be extremely ridiculous that have now taken their rank with the most Scientific truths. Take, for instance, the recent discovery of life in the

plant. Why only in the plant, in all things created by God, the primitive Yogin found not only life but also the reflection, however faint, of the Divine image. In his age the lower animals had a language of their own which could call forth an echo in his heart. And this wireless telegraphy of ours—is it not a more material way of sending speechless messages from heart to heart away from the material eyes of man? And are not there signs and proofs, as cogent as anything, that even in our days this has ceased to be looked upon as an absolute myth?—I am quite confident that further advancement of modern Science will go a long way to re-establish the Supremecy of the Yoja system by showing that the achievements of the yogin have never been pure products of unchecked fancy.

But the soul-union brought him another and a far greater wealth. The more he lost himself in the Supreme Being, and the more he withdrew himself from his environments, the more he forgot the body and retired into the soul within, the nearer he approached Godhead. The divine attributes now began to manifest themselves through him, to charm and attract the materially minded people, to show them the infinite superiority of spiritual wealth over material possessions. These attributes, without any conscious effort on his part, shone out like the rays of the sun, casting all around him peace, health, plenty and prosperity. The greatest King, the mightiest soldier, the prince of millionaires, the foremost philosopher, the most charming beauty—all were equally subject to griefs and sorrows, disease and death. Too often their hopes were not realised but, alas! too often their fears turned out true. No power, no chivalry, no wealth, no wisdom, no charm could avert any of the calamities to which the flesh is heir. His blessings, the simple modulated breath that escaped his lips electrified by his concentrated will and energy, were however, never fonnd to fail. He laid his soothing hand upon the dying head and said "Get up, you are all right;' and lo! to the astonishment of all, there sprang to his feet the apparently dead man—all hale and hearty. Innumerable cases like this, the help that the people received in numerous ways from his spiritual greatness, made the whole nation prostrate itself before him. If all these are myths, as many are disposed to remark, how is it then that of all the countries of the world in India alone and in the palmy days of its potent civilisation when its works on philosophy, science and literature reached a very high standard of human culture, the homeless Yogin and not the most powerful sovereign laid down inviolable rules for the guidance of society to which princes and peasants alike submitted? Was India an exception to the general order of the world? Were the people of India, so advanced

in scientific thought, philosophical reasoning, literary excellence and religious culture, so foolish and superstitious at the some time that even the most powerful sovereign among them felt no hesitation in standing with folded hands before the famished Yogin, in abdicating his throne in favour of him or in renouncing the world in the prime of life only to become a Yogin himself? There have been many incarnations of God, and all of them have with clear voice sung about the nothingness of material splendour and done their best, even with the help of miracles, to attract man to the side of God. Yet the followers of how many have really submitted in life to their commandments and injunctions? Unless the audience be highly imaginative and impressionable, simple lectures, however fiery the the language, unaided by practical proofs of uncommon spiritual superiority, can never succeed effectualy in shaking off its material grasp. Even death, the most eloquent of all preachers on the nothingness of the world cannot continue for any length of time to exercise the feeling of vague indifference that grows upon us when we witness a death scene. How then could the Yogin's life exercise so abiding and guiding an influence not upon one soul or two but upon a whole nation?

Is it not evident from the above that beside his theoretical exposition of the nothingness of the world and the worldly ways of attaining material success, the Yogin was in possession of some great secret whereby he could make a deep and permanent impression upon the heart of his country about the superiority of the spirit over matter and succeed in obtaining for his *Danda-Kamandalu* (the Yogin's staff and water-pot) a higher rank than the Royal crown? Had it not been so, why should the whole nation bow down to him?—And this secret lay, as remarked above, in his spiritual powers, especially the power of working miracles. Now, however, the question may arise—among the incarnations many are reported to have worked miracles. If this miracle-working, whether of the incarnations or of the Yogin, be not a myth, why even the staunchest followers of the great masters are found to refer to and accept the miracles with great emotion? —The answer is, Living in and surrounded by nature, man is generally, by his very constitution, unable to accept anything as fact or even a possibility, which is not warranted by the ordinary laws of nature, until and unless it is conclusively proved that, there are more things in heaven and earth then are dreamt of in our philosophy'. His Ego does not allow him to believe that there may be Subtler laws of nature which elude the grasp of the ordinary man and govern the working of what people are pleased to call 'miracles.' These great master-minds were acquainted with these laws and influenced matter in any way they liked. Either

fearing that their disciples and followers might misuse this knowledge, if they abstained from teaching these laws or their immediate followers had not the mind to go through the course of austere training necessary for the purpose and allowed the stories of the miracles to come to be gradually disbelieved as myths. The Yogin however, had many co-workers and also left a number of disciples at his departure from the world, who had witnessed his spiritual wealth, and, influenced by it, had gone through the necessary course of training, being now ready and able to continue his work. Thus miracles have come to be looked upon in quite a different light in India. The Hindu's faith in the manifestatation of divine attributes in and through man has always been strengthened by ocular demonstrations of this theory. Whenever religious life of the society has received any rude shaking, many Yogins have appeared on the scene, and proved the spiritual possibilities and potentialities of man and thus given the lie direct to the charge of myths, fables and superstitions that have been laid at the door of the miracles.

Even in these days of material supremacy and scepticism there are many such Yogins to be found among the Hindus. It is in fact they who have resisted till now all encroachments upon the Hindu national life by keeping alive the flickering flame of spiritual aspiration. The names of Tailanga swamin and Bhaskarananda have become household words with the Hindu world. They were masters of great spiritual wealth and were both of them subjected to hard practical tests, not only by sceptic Hindus but by many mighty minds of other creeds, and each time they simply astounded their examiners by the exhibition of superhuman powers. In Eastern Bengal there are still many among the living who can incontestably bear witness to the spiritual wealth of the famous Brahmacharin of Baradi. Among the recluses living their lives away in mountain-caves and dense forests, far-away from human habitation, among the Vagrant *Sannyasins* whom we find scattered over the country and upon whom we look down with contempt and suspicion as well, as among many others there will be found some atleast who are masters of uncommon spiritual work. Not even so far back as ten years ago there lived at Dacca (E. Bengal) a haggard cobbler, all alone in the world and earning a very miserable pittance with his awl, but having a mind that was a veritable store-house of Vedantic philosophy and a will that could work wonders. It may now be fairly asked—How is it than that he lived and died a a cobbler?—The answer is—Living in the spirit he had no mind to see how he looked or appeared before society nor did he mind in the least about the reception that was accorded him. Quite content with himself, he never felt a want and so his will and energy were never exercised on his own behalf.

Others, however who could find him out and fittingly appeal to him, received his infallible blessings. I hope, I shall not be misunderstood if I make some personal reference here. It is only on his own experience that a man can speak with the utmost confidence and the greatest emphasis. The first twenty-four years of my life were spent in the midst of people, who had sold themselves to materialism and looked upon every item of their national faith not only with an eye of suspicion but with positive contempt. Their spirit influenced mine also and to this was added the powerful influence of the University Education that I had received. Although a Brahmin myself by birth, (I should say, not by training and culture) I never hesitated in the least to denounce Brahmanism, to vilify with a feeling of great self congratulation pure and pious Brahmins and to speak (as if entitled to do so) on the nothingness, nay the mischievous character, of the Hindu faith. Once, to my extreme good fortune, I came across a genuine Brahmin well versed in religious literature and philoshphy, and having a living faith in his religion. Unlike the ordinary run of Brahmins who by their bigotry, narrowness, superstition and ignorance of the spirit of the Sartras which they quote by chapter and verse, have rendered the greatest disservice to the cause of Brahmanism, he had a very liberal mind, very solid brain and an unsusually broad heart. As was my custom, I jeered at him and denounced his creed. He never puckered his brows or bit his lips in displeasure but heard me out in grave silence occasionally lit up by a ray of faint smile playing about the córners of his mouth. When I had done, he said in sweet, unperturbed voice, "Do you think you are justified in blaming a time-honoured institution before yon yourself have proved its worthlessness? Is it because you cannot appreciate a thing that it should be cast off as ridiculous? Is this your logic? Now, tell me, are you even justified in pronouncing upon the sweetness or otherwise of a fruit before you yourself have tasted it:—Hear me, my child, in the name of logic or science, you are committing a mistake most illogical, and proceeding on a line most unscientific. When it is the nature of man to crave for pleasure and to try to avoid pain, how is it that these Yogins and Sannyasins are found to live a self-appointed life of want and misery, far away from human habitation —in deep forests or densely dark mountain-caves? could this be possible if they found no greater and counter balancing happiness? Again, do you think the people who contributed so richly to every domain of culture were so foolish in their religious beliefs and aspirations as to lay down for their sons and grandsons a system involving at least at the beginning a very rigid abstinence? Or do you think such a foolish and hard system' as you are pleased

to observe, would have come down to our days, if it had not in it real life behind? If you mean to prove scientifically and to your entire satisfaction whether religion is or is not a concoction of morbid imagination the most logical and scientific course would be to mix freely and largely, with an open eye and a critical mind, with these people who live and die for it. If then you find it is nothing, the hopes and aspirations it holds up before man are pure and simple empty promises, you will be justified in denouncing it before the world."—I found him quite right and reasonable and determined to follow his advice.

K. K. GANGULEE.

EAST BENGAL NOTES AND QUERIES.

NOTES ON ANTIQUARIAN REMAINS ON THE LAKSHYA AND THE BRAHMAPUTRA.

Kapaleswar.

Dr. Taylor writes (Topo-116) "Toke is distant but a few miles from the capital of Sisupal. This latter place lies inland in the heart of the jungle and like the town at Durdureah, it consists of mounds of bricks and earth with a fine tank in the vicinity. * * * Toke or Tugma was in all probability the port of Sisupal's country." Dr. Taylor seems never to have visited the place and probably he wrote from inaccurate information. Sisupal's capital is still shown some 4 miles west of Sripur near a village called Maona and the ruins that Dr. Taylor calls Sisupal's capital is locally known as the ruins of Kapaleswar. It is some 4 miles directly south of Ulusara west of Toke.

Kapaleswar, as the name implies must be the ruins of a Saiva temple and belongs to the pre-Muhammadan period. Four fine tanks two of which are still deep and retain water dug in a line and temples founded on their banks. The northernmost one is the most interesting. Its banks are as high as the ramparts of a fort and on its west bank are the foundations of a big temple, the position of the walls of which are still marked by thick layers of mouldering bricks in a continuous line. Big slabs of stone lie scattered in the compound us well as on the slope of the banks, and the local people affirmed that they had seen several others in their childhood, which have been covered up by silt by this time. The most striking feature of the ruins is the great number of loose bricks. They lie scattered for a considerable distance like a thick layer of big hailstones after a hailstorm, and nowhere in Bengal have I seen such a wild profusion, except in the ruins Debkot in Dinajpur. The people of the locality are mostly settlers and they know

nothing about the builder of these temples. Only an octogenerian Hajo told me that he had heard from the elders that Ballala Sena was the author of all these works. Ballala was a Saiva and the tradition may have truth behind it. The Hajo told me that he had seen the walls of the temples standing three or four feet high in his childhood. The Site deserves exploration.

The Lohadi Darga.

The Lohadi Darga is situated some two miles south of the ruins Kapaleswar. It is a line of natural growth of iron ores which are gradually floating up the surface of the ground. The line of these iron ores is continuous for nearly 20 yds. under a mango grove. There are at present three or four big boulders there from which I procured three pieces of excellent samples. But that the line is much longer is apparent from the fact that there is another smaller line of ores in the same direction some 200 yds. to the east of the main line. This small line has been named by the local people Nakkatir Darga, or the Darga of the severed nose. The story is told how a blacksmith took some ores from the main Darga and made a sickle with the iron extracted from them. But the sickle made of this holy iron severed the nose of the blacksmith at night and returned to the Darga, where it was refused a place on account of its degradation in contact with fire and it sought an asylum some yards off and formed the Nak katir Darga. All these iron growths are looked upon with awe by the local people and they never touch or remove any of the fragments.

Formation of such a long line of iron ores naturally leads one to suspect the existence of an iron mine beneath. The matter deserves to be reported to the Geological Survey Department for proper investigation.

Siddhiganj.

There is a Darga with an inscription on it at Siddhiganj, three miles up Narayanganj. It is not a very old one. There is also a mosque in the vicinity which is also not very old. The Brick-built spacious old ghat on the Lakhya on which the daily market sits, is remarkable.

Not far south from the market at Siddhiganj is a ruin called. Dilar Khan's Kot or the stronghold of Dilar Khan. Dilar Khan is said to be a descendant of Isakhan Masnadali. The old bund on the Lakhya, which still exists in the form of a massive continuous wall projecting into and throwing big fragments into the river, and an old arch overgrown by a big Bat tree are the only remains. The people of the locality informed me that a cannon was dug up from a place near these ruins some 8 or 9 years ago and it was taken to Narayanganj. Dewanbag, the find place of the cannons now in the Dacca Museum is on the opposite side of the river, and this cannon ought also to be searched for,

The Chapatali Bridge.

Chapatali is a village on the east bank of the Lakhya. Over a canal that starts from the Lakhya and connects it with the old Brahmaputra passing through the village of Chapatali is a bridge with three arches. It was built by one, Lala Rajmal the Dewan of Manoar Khan whose residence was at Dewanbag, two miles north of the place. The stone inscription on the bridge was removed some years ago by Mr. Lucas, the then S. D. O. of Narayanganj and was presented to the Museum last year by Mr. Bartley.

Except for some petty overgrowths of trees, the bridge is still in a fine state of preservation and can be repaired at a small cost.

Dewanbag.

It is also called Manoar Khan's Bag. It was, as the name implies, the residence of Manoar Khan, the grandson of Isakhan. A fine Dighi and an old mosque are the only remains. The cannons were found in the north-west corner of the Dighi by the side of a ditch which has been filled up. They were placed flat on the ground side by side and were in all probability the battery, protecting the gateway.

The mosque, whose central dome has partly fallen in, is a fine specimen of Muhammadan architecture of the 16th century. Restoration of this fine structure is very desirable.

The inscription of the mosque is reported to have been taken away by Mr. Lucas along with the Chapatali bridge inscription. The latter is now in the Museum and the former ought to searched for.

There is a mosque and a Darga at Kutubpur, on the river bank opposite Siddhiganj, both in good repair though the zeal of the local Muhammadans

The Quadan Rasul.

It is a much revered beautiful shrine standing on the Lakhya on its eastern bank opposite Hajiganj. There is plenty of rentfree land attached to it, but the Khadims, who are numerous, while enjoying the land, take little care of the building. The late Nawab of Dacca made periodical repairs to the building, but that has been discontinued and the last repairs were made ten years ago. Steps ought to be taken to save this fine building from ruin by (i) compelling the Khadims to make annual repairs (ii) or placing the properties of the shrine under a committee who will make arrangements for the annual repair of the shrine from the income from those properties (iii) or conserving the building under the Act.

Two inscriptions from two ruined gateways of the shrine are now in the *Dacca Museum.**

* The beautiful gateway of the Quadam Rasul, that was visible from the Lakshya collasped sometime ago through want of repair.

The Fort of Hajiganj or Khizirpur.

It is an octagonal enclosure, much smaller than either the Sonakanda or the Idrakpur forts. It was lately purchased by the Government from the E. B. S. R. and boundary pillars have been set up. But no repair of the fort has yet been undertaken. The fort is fast being overgrown by trees and the work of the repair ought not to be delayed.

The Khizirpur Maqbara.

The fort and the maqbara are on the two sides of a canal starting from Lakshya and there is a bridge over the canal over which the Trunk road passes. The maqbara is enclosed on all sides by a strong wall. The gateway was on the northern side. Inside the walls of the maqbara there is a mosque and another building of some elegance which contains a tomb of marble said to be that of Bibi Mariam, a daughter of a Badsha. This lady is said to have been religiously disposed and an underground room in the compound is still shown as the place where she retired for devotional exercises.

The owner of these buildings is a local Muhammadan and he has kept both the buildings in a decent state of repair. The roof of the Veranda which rested on all sides on black basalt basements, has fallen in but the main building is uninjured.

Sonargaon.

It is a much-described place and my notes shall be very brief.

1. *Azam Sha's Tomb.* This tomb was repaired by Government, but the work has been done in a rather haphazard manner. The few pieces of stone that were lying about were put together and cemented and that was all. No care has been taken to restore the original decorations and arrangement of stones, and the tomb, as it now stands is far from a pleasing sight. Attempt should be made to restore the original shape and decorations of the tomb.

2. *The Inscription of the Sadipur mound.* This inscription was noted both by Dr. Wise and General Cunningham (Reports Vol. XV. P. 144). It is the finest specimen of Toghra writing that I have seen in East Bengal. Sometime ago it was taken away by a Muhammadan Zeminder of Taraf, a pargana of Sylhet, who intended to fix it on a new mosque built by him. But he returned it owing to some reverses in his family and it lay for sometime uncared for, on the bank of the canal. It is now in the custody of a Muhammadan family called the Dewans of Mograpara. The inscription is dated 929 A. H. (1523 A. D.) in the reign of Nusrat Shah.

The mosque to which this inscription belonged has long disappeared and it was lying for the last 50 years or more on a mound at Sadipur with another loose slab till it was removed by the

Zemindar of Taraf. The latter one is a clumsy Tughra inscription now lying inside the mosque at Mograpara. I requested the present custodians to present the former one to the Museum but they proved refractory. It is unsafe to leave such important documents in private possession especially when they have no right to it; and no one knows when another forceful Zemindar may come and take it away for a second time.

3. *The Goaldi Mosques.* There are two mosques standing only a few yards apart. Both of them were noticed by Cunnigham in his reports (Vol. XV. P. 143). One is called the old majid of Goaldi. The old majid which is now forsaken and overgrown with jungle was built in the reign of Hossein Shah in 925 A. H. It is a strong one-domed structure with fine ornamental works inside. I took a photo of the inside, from which an idea may be had of the richness of its ornamentations. It is not much damaged and can be repaired at a little cost. The inscription which has fallen from its place has now been built into the south wall of the entrance door.

The new mosque of Goaldi was built in A. H. 1116 or A. D. 1704 and is not of much interest. It is in good state of repair.

4. *The Dulalpur Bridge.* It is a three arched bridge over a canal that separates Dulalpur from Panam. It stands strong and is in a good state of repair.

Panchamighat.

Here are five old ghats on the Lakshya, and in an akra there are three stone images of Vishnu found some 70 years ago in Nanakhi, north of Panchami ghat. One of the images is of Govinda variety. All of them are worshipped.

Mazumpur.

Mazumpur is situated on the old Brahmaputra, some 8 miles up the Nangalband Ghat. Here there is a massive three-domed mosque with excellent ornamental works within. The technique unmistakbly points to pre-Moughal period, though the inscription is lost. Stone pillars support the arches and big stone slabs were used to support door frames some of which have given way. It is unfortunate that neither Cunningham, nor Wise nor Taylor leaves a description of this mosque, as in all probability, the mosque was in a much better condition at that time and the inscription also had not been lost. The inscription is reported to have got broken into three parts, by fall from its original place. It was removed some years ago either to Dacca or Narayanganj and it ought to be found In the same compound on the east side of the mosque is the tomb of its founder. Outside, on the east of the compound is a buried mosque, the dome of which is only visible over the surface of the ground.

The Mozumpur mosque deserves to be conserved.

N. K. BHATTASALI.

OXFORD IN THE SEVENTIES.

By C. L. G.

There is no college at Oxford of such outstanding superiority in numbers as Trinity at Cambridge. The nearest approach to it is, or was, Christ Church; and when I went up to 'the House' in October 1875 there were about two hundred and thirty undergraduates in residence, as compared with one hundred and eighty or so at the next largest college. But the difference was one in kind as well as in degree. By a curious anomaly, Christ Church, the most ecclesiastical of all the Oxford foundations, attracted a large number of rich and fashionable young men than any other college. The Cathedral is also the chapel, the Head of the House is the Dean, and it came about that the canons and so theological professors lived in close proximity to undergraduates who did not exactly diffuse an odour of sanctity. For example, the house occupied by the saintly Canon Bright was a sort of annex of Peckwater, home of the gayest of the gay.

Again, at no other Oxford college was the cleavage between reading and non-reading men so marked. It was inevitable when one considers the sources from which the House drew its undergraduates. There were on the one side the open and Westminister scholars, the exhibitioners, and a limited number of commoners who read for honours. But the great majority were young aristocrats or plutocrats, Etonians predominating, who came to Oxford to have a good time and take a pass degree. The main end of their undergraduate career was conviviality. To a limited extent cricket and the river provided a common ground where they mixed with reading men; but the most athletic of the affluent public school men went to other colleges, while the intellectual *élite* of Eton were to be found at Balliol. At the House the young' bloods' or 'dogs,' as we called them forty years ago, found their most congenial sphere of activity in hunting and in the various dining or social clubs. Of these the largest and the most renowned was the Bullingdon Club, chiefly recruited from Christ Church, but including a certain number drawn from other colleges. The Bullingdon Club had a cricket-ground of its own, as well as a barge on the river. The members were distinguished from the common herd by wearing a blue stripe on their flannel trousers. They had also a special uniform for their dinners; but this habit was common at other wine and dining clubs. All these facts, however serve to indicate the sumptuary basis on which the social cleavage in the House was founded. The days of gentlemen commoners who wore a special tassel on their caps were long past, but the principle was there still. There were a few rare exceptions who belonged to both worlds, but such an

achievement bordered on the miraculous. The most notable example in my time was a strangely gifted youth, of winning manners, with no family influence or wealth to help him, who consorted with the fastest set in Bullingdon, of which he was a member, raced and hunted, and was never seen to do a stroke of work in term-time. But he was reported to slave at his books in the vacations, and anyhow he took a Double First and gained a fellowship. His undergraduate life reminded one of the types of Admirable Crichton familiar in the novels of Ouida or the author of *Guy Livingstone*, and his subsequent career was hardly less romantic or meteoric. But he stood alone, as the nightingale sings.

There was no hostility between the reading and the non-reading classes. We simply went our several ways. We seldom met, or very rarely in the lecture-room, though we had rooms in the same quad or on the same staircase but those of us who had to work derived no little amusement from the detached contemplation of these gilded youths, as they sailed forth in pink, or woke the midnight echoes with hunting-horns, or broke up each other's furniture in moments of hilarious expansion. Efforts at fraternisation were not always successful. A spectacled scholar was once invited to dine at one of the most fashionable of the clubs already alluded to by a member who knew him at home. But he felt like fish out of water during the revels, and his discomfort was not allayed when one of the company remarked in a loud voice during a pause in the conversation, 'Who is that d—d fellow in gig-lamps sitting next to Sandy'? The speaker was more renowned for his wealth than his breeding, and was probably the only member of the club capable of such discourtesy to a guest; but his resentment was not altogether unnatural. The d—d fellow in gig-lamps *was* out of his element. Personally I have met several of my gilded college contemporaries in after-life, and found them very much like other people, and not less friendly. One cannot help feeling, however, that the fusion of classes brought about by the upheaval of the last two years, and in particular by the altered conditions of military service, has broken down the social barriers which undoubtedly existed forty years ago, and probably a good deal later. A type of undergraduate a good deal in evidence of late years at Oxford was quite unknown in my time —the 'intellectual blood', who combines ambition for academic honours with a deliberate cultivation of dissipated habits and a contempt for weaker vessels, mental and physical. But this complex type has been probably humanised or simplified by the ordeal of the war. It was at worst a rather ugly pose, and there is no room for pose nowadays:

In dubiis hominem spectare periclis
Convenit, adversisque in rebus noscere
qui sit.

Nam veræ voces tum demum pectore ab imo
Ejiciuntur et eripitur persona, manet res.

It must not be supposed, however, that the life of the reading man at a non-reading college was a drab and uneventful existence, devoted to unremitting study, and only relieved by watching the extravagances of the 'dogs.' We rowed, or ran with the beagles, or played cricket or rackets. The rinking mania was in full swing, and three hard winters in succession gave us opportunities for skating such as were rare before the age of Swiss winter sports. In one of these winters we had seven weeks' frost; the river was frozen over, and I remember skating, for several days after the thaw had set in, on the flooded meadows beyond the farthest end of Norham Gardens. The floods were shallow, nearly all the water had drained off, and the ice practically rested on the grass. An Oxford skating club was founded. Monier-Williams and Pidgeon of Christ Church, Musgrave of Balliol, and Arthur Johnson of All Souls were, as well as I remember, the outstanding experts, and our badge was a little gilt orange; but the club did not maintain an independant existence for long, and was dissolved by a cycle of mild winters. Golf had not yet arrived, though Horace Hutchinson was in residence before I went down. But in one respect Oxford in the seventies was better equipped than the Oxford of to-day. The racket-courts at Holywell were extensively patronised and players of the second best of court games were not put to the expense of running up to London to keep their hand in. The running-path was another resource; and though the standard of performance has been raised in several departments by Rhodes scholars and others, Brooks's 'varsity record for high jump, made in my time, still stands. W. Bruce and M. R. Portal, both of Balliol, were a singularly handsome pair of quarter milers. Other heroes of the running track were Montague Shearman—now a Judge—a speedy sprinter and resolute finisher; Arnold Hills, afterwards director of the Thames Ironworks a miler; and Stanley Weyman the novelist, who represented Oxford in the three miles. Metcalfe, the South African railway engineer, shone in the half-mile; and Rochfort Maguire, another South African magnate, combined a taste for running with his other activities, social and intellectual. Grenfell of Balliol, now Lord Desborough, was a double Blue, for he began as a long-distance runner before concentrating on the river. Other rowing celebrities were Edward-Moss and H. P. Marriott Bankes (another Judge), and W. Ellison.

Heads of Houses forty years ago were, in the unthinking judgment of undergraduates, more distinguished for their longevity than for any other quality. But there were notable exceptions, Liddell at Christ Church was a majestic and commanding figure, and, apart from his

fame as a lexicographer, held in high repute in council. In his relations with undergraduates he never seemed at his ease, but his brusque manner was the result of a shyness which he never overcame. The first time I went to breakfast at the Deanery, with a batch of other freshmen, we were shown into the morning-room. Mrs. Liddell came in, and asked us our names, and when the Dean appeared introduced us to him, a curious but characteristic inversion of the normal roles. In Collections—the periodical college examinations—the Dean presided at the *viva voce*, which was held in Hall. It was rather a formidable ordeal, at least for those who were expected to do well and I remember the gruff rebuke which I earned when, stumbling into a pitfall which had entrapped others before me, I translated a word in a divinity paper as 'a colt the foal of an ass' instead of a 'millstone.' But the Dean did not always reserve his rebukes for scholars, or junior students, as we were then called. On one occasion, when a large, florid, and overdressed commoner was before him, and had made some unusually silly answer, he greatly diverted the other examiners by observing in a stage whisper, 'Great oaf!' Another Head was famous for his wit, but I can only remember his happy description of a notorious play of Aristophanes, of which he said that it was 'as broad as it was long.' A third, who presided over a college more renowned in those days for athletics than intellect, was credited with excessive leniency in dealing with promising oarsmen and cricketers when they came up for matriculation. With the most celebrated of all the Heads of Houses in my time, Jowett, I was only acquainted by sight and through the medium of anecdotes until the close of my undergraduate days. Most of these anecdotes depended chiefly on the imitation of the Master's high, incisive utterance. His sayings were chiefly of the nature of truisms—inspired truisms, undoubtedly—and reflected his habit of thinking aloud. Thus, when Professor Blackie had been rendering himself conspicuous in some controversy or other, and on meeting Jowett asked him, 'Well, Dr. Jowett, what are they saying about me in Oxford just now? the Master is said to have briskly chirped in reply, 'Nothing.' He could be really witty though, if the story is true of his comment on some undergraduates who stayed up during the Long Vacation, when the Master was in residence and wished to be undisturbed. So he first of all insisted on their regularly attending chapel, and when that failed to dislodge them, had their battels cut off at the buttery. As the last of the discomfited crew was driving to the station from the college gates Jowett is reported to have observed, 'This kind goeth not out but by prayer and fasting'. But these stories give a wholly erroneous impression of the Master's

generosity and kindness of heart. Of his hospitality my own experience may serve as an illustration which might be indefinitely multiplied. It was in Commemoration time, and my father, who was to receive a D. C. L., and many years before had been in official relations with Jowett, left a card on the Master at Balliol. The next morning Jowett walked out to the Iffley Road, where my father was staying with a married daughter, and invited all the members of the family to dinner, including myself. It was a large and interesting gathering, and it fell to my lot to sit between George Eliot and George Henry Lewes. Lewes was vivacious and communicative. I remember his telling me that although George Eliot had written the *Spanish Gypsy* before she travelled in Spain, she had only to make one or two trifling corrections in the poem as the result of her visit. Some story that I told him tickled his fancy, and he said, 'You must tell that to my wife;' and I was introduced to the Sibyl, and had to repeat it. Any alarm that I felt was immediately dispelled by her suave and gracious manner. I remember distinctly her telling me that she read very little fiction by her English contemporaries except the books of her friend Miss Thackeray; and when I made bold to express the difficulty I had always felt in tracing a family resemblance in the writings of father and daughter, she demurred but admitted that landscape counted for little with Thackeray—'a hedgerow and a spire were enough for him.' Sir James Lacaita was also of the company, and after dinner told us some curious stories of Louis Napoleon, whom he had visited in exile at Chislehurst. The Emperor was dying of a mortal complaint, but during their interview talked the whole time of Cæsar's campaigns.

Of professors and dons outside my own college I saw little except of Henry Nettleship, whose lectures I attended, and whose friendship lasted throughout his lifetime. Underneath a shy manner he concealed a very warm heart, and he was not merely interested in scholars. I remember his telling me once of a Latin epitaph which seemed to him the perfection of laconic eulogy—'*Neminem tristem fecit*;' and it might well have been applied to himself. Walter Pater, who was then in residence at Brasenose. was a familiar figure. They used to tell a story of his examining for scholarship at Brasenose; as there was some doubt as to the award, the examiners looked through the papers again. When Pater was asked for his verdict, all he had to say was that there was a candidate called Sanctuary. 'I liked his name.' The lean, gaunt figure of Robinson Ellis, the editor of Catullus, is still fresh in my memory. Early in the seventies a French officer who had been in the *debacle* at Sedan visited Oxford, and at some gathering at which they were both

present Robinson Ellis showed an unexpected interest in the stranger. But it turned out that it was solely due to the fact that one of the best manuscripts of Catullus was discovered at Sedan. It used to be told of him that on one occasion, when he had gone to Paris to collate manuscripts after leaving his baggage at the hotel he rushed off to the library, worked there all day, and then found that he had completely forgotten the name of his hotel. The authorities called in the aid of the police, who solved the problem by tracing the driver who had taken him from the station, Robinson Ellis having fortunately remembered that he was a one-eyed man. When reading for Greats I attended a couple of lectures of a series given by T. H. Green, then at the height of his fame. The lectures were crowded mostly by Balliol men, but they were far over my head, and I retired in respectful discomfiture. It brought me nearer to the philosopher to learn afterwards from a Balliol friend that Green's favourite hymn was Baxter's

> Lord, it belongs not to my care
> Whether I die or live ;

especially the last verse :

> My knowledge of that life is small,
> The eye of faith is dim ;
> It is enough that Christ knows all,
> And I shall be with Him.

Ruskin was in residence as Art Professor during my undergraduate days but, with a lamentable lack of enterprise, I failed to attend his lectures ; nor was I one of the band of devoted admirers who at his instigation, and to the amusement of the Philistines showed their adhesion to the gospel of manual labour by making a road at Hinksey. Ruskin was an honorary student of Christ Church, and used to attend the services in the Cathedral. I can see him now walking along the west side of Tom Quad with Sir Henry Acland, who used periodically to stop and hitch up Ruskin's hood as it kept slipping from his sloping shoulders. Pusey was in residence as one of the canons, and I heard him preach once—a weighty discourse, but with nothing in it to explain the fierce controversies that had made his name anathema to the extreme Evangelicals. Another of the canons was King, afterwards Bishop of Lincoln, who looked the saint that he was ; and another was Liddon, on the whole the greatest preacher that I ever heard, alike for matter, incisiveness of delivery, eloquence, and perfect articulateness.

Apart from the canons, we had some distinguished or interesting men on the staff of the college. Vere Bayne, the Senior Censor, was a perfect specimen of the old-fashioned don—dignified, courteous, rigorously precise, and yet with a good deal of humanity behind his starched exterior. A 'Limerick' which appeared in the seventies was generally supposed to have been aimed at him :

> There was an old don of the House
> Renowned for his wisdom and *nous*

When they said, You are wrong,
He replied, 'Go along,
We never are wrong at the House.'

But it was not a complete portrait. Bayne was an academic, but when you got to know him you found that he was not a pedant at heart, that he had a pleasing vein of dry humour, as well as a nice taste in music and a good judgement in wine. Francis Paget, ultimately Bishop of Oxford, took the honour men in classical composition; and for Greats work we had Macan, now Master of University College; Stewart, now Professor of Moral Philosophy; and Richard Shute, who enlightened us on the Pre-Socratics. Shute was a brilliant and delightful man, who crowned a wayward undergraduate career by getting a brilliant First from the Tavern as New Inn Hall, then the refuge of the irregular, was familiarly and not altogether unfairly known. That was a remarkable feat, but even more remarkable was his standing for and being elected for a studentship at Christ Church. As a matter of fact, he settled down into a most admirable don, a stimulating teacher, excellent on committees and as an administrator, and a most charming and humorous guide, philosopher, and friend to the undergraduates who came under his influence. Unfortunately he died young much beloved and deeply regretted. But undoubtedly the don whose fame stood highest with the world at large was 'Lewis Carroll' (the Rev. Charles L. Dodgson), the author of *Alice in Wonderland* and other immortal works. 'What a delightful sort of don he must have been!' I can imagine people saying. And he certainly could be delightful and highly entertaining in the company of his equals—in common Room, for example, whence echoes of his wit used occasionally to reach our ears. Some of us also read his clever squibs on university controversies. But the rest was practically silence so far as undergraduates were concerned. He lectured on mathematics; but I never came across any undergraduate who had ever been to his rooms or knew what manner of man he was. As a social influence he was *nil*; he seemed to lose all interest in people once they grew up. And yet all of us had read and adored his books, and would have been his devoted friends if he had let us. As it was, he stood wholly apart from the *fougue de vingt ans*, a mysterious and perplexing figure.

The æsthetic movement had already invaded Oxford, and a certain number of dons' wives, sisters, and daughters discarded fashion-plates and went about in shapeless sage-green garments, and were addicted to the cult of Botticelli, or 'Botter,' as he was called by the irreverent, for the Harrow slang was already in vogue, and we talked of 'toggers' (torpids), 'Bletcher Junker' (Bletchley Junction) 'Shakers' (Shakespeare Readings); indeed I remember

hearing a man once allude to the crack of doom as 'cracker.' A handful of undergraduates worshipped at the same shrine, and the vagaries of Postlethwaite, satirised by Du Maurier in *Punch*, had their origin in the studied eccentricities of one of the number. But the attitude of the majority was frankly and wholesomely Philistine. Some years afterwards, when the apostle of Neo-Paganism visited his old college, he was forcibly immersed in the Cherwell. The incident was discussed in the All Souls' Common Room, and one of the friends of the victim grew vocal in his indignation against the outrage. The offenders, he declared, ought to be prosecuted. 'I suppose you mean under the Rivers Pollution Act' was the immortal comment of one of the Fellows who had up till then remained silent. Emancipated intellectuals read and imitated Swinburne. Some parodied him; but the best efforts in the domain of travesty fell a long way short of the wonderfal 'Octopus' in the Cambridge *Light Green*. The *Light Green*, it may be mentioned, was in respect of its title a burlesque of a magazine called the *Dark Blue*, published in London in the early seventies, which suggested a connection with Oxford life and thought not borne out by the contents. Undergraduate literary activity found vent in a certain amount of occasional verse, emanating chiefly from Balliol, but both in quality and quantity inferior to that of later years. The *Oxford Magazine* was not yet in existence, and A. D. Godley, though a contemporary of mine, had not gained, or at least shown, that mastery of the serio-comic vein which has long entitled him to the command of Oxford metrical light horsemen. There were some good things in the *Shotover Papers*, to which the late Mr. Ivan-Muller was the chief contributor; but the wittiest Oxford rhymes in the late seventies and early eighties were the series of Balliol quatrains, miniature portraits of prominent dons and undergraduates which enjoyed a wide oral currency, and were composed by a brilliant group of undergraduates, distinguished in later years in literature, diplomacy, and the Church. I remember hearing Mackail recite his prize Newdigate poem in the Sheldonian; but the only line that stuck in my head was part of an enumeration of exotic unguents: 'Stacte, and tragacanth, and galbanum.'

The published contemporary lampoons and satires—with rare exceptions, such as those by Dodgson already mentioned—compared unfavourably with the old *Art of pluck* and Mansel's brilliant squibs, which still commanded a ready sale in the bookshops. Caricatures of university celebrities appeared in the windows, but were crude and amateurish, and for one volume of undergraduate verse published in those days Mr. Blackwell now probably publishes ten. Dress was on the whole more decorative. Battered caps and

gowns abounded, but rags were not *de rigueur* with eminent undergraduates. We were not 'all Socialists' in those days; and at the Union debates the advocates of conventional, orthodox and Conservative views were generally secure of a large majority when it came to the vote. Ruskin undoubtedly exerted an influence; but Ruskin College was yet to come, and the majority of the undergraduates who were marked out for distinction by their success at the Union were on the side of the established order of things. An exception was B. R. Wise, but his Radical views were somewhat modified in middle age. Wise was an all-round man, proving that 'he who runs may read,' as he won his Blue for the mile, besides taking a First in Laws. His subsequent career in Australia is well known; and he was Agent-General for New South Wales at the time of his death, which occurred between my writing this paper and correcting the proofs. Toward the end of my time Lord Curzon was one of the star speakers at the Union; but perhaps the highest expectations were formed of A. A. Baumann, who seemed equipped with all the qualifications for a resounding parliamentary success. In his recent book, which proves to be in full possession of his brilliant powers of criticism and expression, he attributes his failure in politics to the possession of a judicial mind. Lord Milner, Mr. Asquith, Mr. Herbert Paul, and Sir Thomas Raleigh had all taken their degrees; but the memory of their intellectual prowess, especially Lord Milner's, was still fresh, and their rise to eminence regarded as secure. They were the giants of the immediate past. In my own humble view the best brain and the keenest wit is that of Sir Thomas Raleigh, but his incorrigible diffidence, his lack of ambition and of the minor arts of success, have kept him out of the limelight, though they fortunately have not prevented him from doing excellent work both in India and at home.

Of the Union I have spoken above. Other debating societies were the Canning and the Palmerston, which were started in my time at Balliol, but were open to members of other colleges, and of which I was an obscure and silent member. At Christ Church there was a small debating society, the meetings of which were invested with the utmost secrecy. Its very name was only breathed in whispers by members away from the debates. In earlier days it had been glorified by the attendance and eloquence of Lord Dufferin and other notables; but in my day we had only one orator, and he has since remained mute. He also had another claim to distinction, for he was one of the first pioneers of that adventurous band who in later days practised mountaineering on the roofs of colleges and public buildings. At that time some architectural changes were in contemplation at Christ Church, and in order

to see how they looked a number of dummy pinnacles were put up on the roof of the Hall. Late one evening my friend came to my rooms and informed me that had 'got a little pinnacle,' which after much exertion, he had detached from its context, brought down as a trophy, and deposited in one of the canon's gardens. The kindred but more distinctive pastime of wall-pushing, which, has yielded startling results, was a much later development of these irregular activities. Among the mollifying arts was music; there were two societies, the Philharmonic and the Choral, afterwards amalgamated, besides the Musical Club for the practice of chamber music. Sir Walter Parratt was organist at Magdalen, and Taylor, who conducted the Philharmonic, at New College. We had a small male voice choral society at Christ Church, where we sang glees and Mendelssohn's *Œdipus Coloneus* music. But although I heard Rubinstein give a pianoforte recital, and Halle and Madame Norman-Neruda more than once, the musical experience that impressed me most during my stay at Oxford was the singing of the carol on May morning at daybreak on the top of Magdalen Tower.

The river was a delight as well as a discipline, or rather, one should say, the rivers, for the Cherwell has its tranquil charms as well as the 'silver sliding Thames;' and among the memories of successful entertainments few stand out more vividly than those of water picnics in Commemoration time. Oxford is more beautiful in Eights' week; but at all seasons her sons are proud to show off her glories to their guests, especially if they happen to be good-looking sisters and cousins of their freinds. One wonders sadly whether Oxford will ever renew the gaieties of Commemoration. To visit her now, with her handful of students, mostly weaklings, bereft of the noblest and best of her sons, is a humbling experience for elderly men who in their time were never called upon to make the great sacrifice, but have lived to see it made cheerfully and heroically by their sons. Truly this generation are entitled to use the Homeric vaunt, though they are the last to think of doing so; and when one compares our placid youth, in which the horseplay of a bump-supper, the bruises and occasional broken bones of the football field, ragging and making hay, represented the maximum of peril, with the long inferno of trench warfare, the pleasures of reminiscence are marred by the cruel violence of the contrast. And yet the old days, though they furnished little scope for heroism and endurance, were joyous and happy. One only resents the inscrutable decree of fate that has denied the innocent joys of early manhood to those who deserved them better than we did. Of the many lessons we elders have learned in the last two years none is greater than this —that we should exersise the privilege

of age more sparingly in our criticism of our juniors. The old saw, *Maxima debetur pueris reverentia*, takes on a new and overwhelming truth in view of what they have done and endure—of early errors nobly redeemed, of splendid promise fulfilled in untimely death. The trumpets nowadays are always sounding on the other side.

"CHAMBER'S JOURNAL."

VILAYATNAMAH.

The reasons of not delivering the letter of the Badshahs to the king of England and of returning without attaining the object.

To go on with my story, I waited in England for a year and a half when Lord Clive arrived with the presents sent by the Badshah, but presented them to the Queen of England in his own name and received favours in return. He made not the slightest mention of the letter and messages of Shah Alam Badshah. And the said Captain because of the belief he had in the words and promises of Lord Clive and because of the tie of nationality kept quiet but lost all hope. He spoke to me that whatever I had suspected had come to pass. Lord Clive had played us false.

As the Captain had not access to the grandees of the Royal Court and was afraid of the illfeeling of Lord Clive and of the leading men and the counsellors of the Company he saw no remedy: afterwards the reason of the secreting of the Badshah's letter came to be known thus:—At that time there was a dispute between the Royal officers and the officers of the Company and the subject of the dispute was the acquisition of the kingdom of Bengal. The Royal officers held that the Company being a trading body had nothing to do with Government. The country of Bengal having been acquired by the Royal fighting men, belonged to the king and that business and trading should remain with the Company. The officers of the Company said in reply to this that in the war with Sirajuddalah and Kasem Ali Khan the factories in Bengal had been plundered of their cash and goods and the money spent on the troops was considerable. And the officers of the Company had worked and laboured hard and thus acquired mastery over Bengal. This was therefore a sort of gain and loss in trade. According to the agreement between the English Company and the representatives of the Badshah that existed from before they were prepared to pay the revenue. Helping with troops was incumbent on the officers of the Government. Acting against the old promises was contrary to justice—In this way mutual recrimination went on between the parties. The members of the Royal court could bring forward no convincing documents

—As Lord Clive was a wellwisher of the company, acting on the advice of the counsellors of the company he did not consider it advisable to deliver the letter of the Badshah to the mighty King of England as it would have been a powerful document on the hands of the Royal ministers. After my return to Bengal I learnt that this dispute between the counsellors of the Company of the Royal ministers continued for a whole year and it was finally settled to leave the matter to the decision of the King himself—that whatever he would decide would to accepted by both the parties. The mighty King of England with his high-mindedness and sagacity gave his decision that as Shah Alam the Badshah of India had given Bengal as *Altamgha* to the English Company Bahadur and had also fixed an annual revenue, "I who am the King of England if I take the country with the aid of my officers it would in reality mean my becoming one of the charity-eaters and subjects of the Badshah. This would be degrading. When the whole of India would come under the sway of the heroes of England it would not then matter." But the Royal ministers fixed a few crores of Rupees as Royal present and also an amount as annual revenue, with the concurrence of the Company. Some people also say that a period of a few years was fixed at the expiry of which the Kingdom of Bengal would go out of the hands of the Company to the possession of the Royal officials. God knows the truth.

The said Captain tried hard to keep this humble one three or four years more in England but this humble one did not agree to it. In those days in England none knew Persian—and because of Bengal coming into the hands of the English and a knowledge of Persian bring necessary for conducting the affairs of that Kingdom it had become essential for the English to learn that language. Under these circumstances Captain Swinton, Dr. Bolton and Mr. Stabel and others together insisted that I should stay some years more in England and act as teacher of boys and young men,—for which I was to be adequately recompensed.

As the separation from my native country was pulling the collar of my heart in such a way as it was impossible to resist I did not agree. As it is well said, " The love of one's country is dearer than the throne of Solomon. The thorns of one's native land are dearer than the ferns and fragrant herbs of another place. Joseph whilst he was actually reigning in Egypt used to say that being a beggar in Canaan was dearer far."

At last I was given in charge of Mr. Majendie who was a member of the Council in Calcutta and allowed to depart. In 1183 Hejira corresponding to 1170 B. S. In the month of Kartick I returned to my dear home in Bengal.

I spent one year *en route* and stayed in England, Scotland and the University

of Oxford one year and seven months and 2 months in Madras.

THE GLORIES OF SANSKRIT LITERATURE.

(vii)

Reflections.

We would now pause for a moment to pry a little into the hidden meaning of the Vedantic theory of the interaction of life and matter as delineated in the foregoing pages of our article. As science is *just* entering the threshhold of the vast unexplored region of biology, there is just danger of the theory itself being regarded as a revolutionary one and the inferences that naturally follow from it are sure to sound strange to the ears of modern science and would probably be flouted as unworthy of belief. But is not every great scientific theory, by nature, a revolutionary one? The heliocentric theory, of Copernicus, the gravity theory of Sir Isaac Newton, the oxygenation theory of Dr. Priesttey, the atomic theory of Dalton and the 'ionic' theory of modern times were revolutionary in their nature and few will deny that every progressive theory has always been opposed by a certain class of people who would keep the wheel of time at a standstill if they could. Opposition or no opposition, the world has survived these cataclytic theories without a shock and the sun and the moon have retained their respective places in the interstellar space undisturbed. It is difficult and painful to part with an old companion, who has guided our footsteps so long, but can be of no further service owing to senility and and outgrowth but part we must from such a companion and follow the guide of a new one who promises to lead us further towards the promised land. What we demand is neither a blind faith in nor senseless opposition to the truth of the theory enunciated here, but a hearty co-operation of all scientfic researchers to a cautious examination of the theory and when convined of its truth to have the courage of conviction to say that it is a grand step towards unravelling the unfathomable mystery of creation.

Every body, even a stone, raises unanswerable questions as to whence it came and why? Why does anything exist at all? Has modern science ever seriously attempted a solution of these primary questions? Truth has many aspects and we have to look at them one by one and if modern science in its present stage of development cannot conform to the veiws of the Vedantists, it may at least be tender to those who cling to such old beliefs and try to find out the hidden truth underlying them. For old beliefs, that have survived the the cataclytic concussion of ages cannot

be devoid of a substratum of truth awaiting recognition through the hardest scrutiny of scientific knowledge. Already the discoveries of the youngest branch of science are filling the world with wonders and biology with its two great branches of bacteriology and proto-Zoology may after all prove the most important branch of science. The course of modern scientific discovery tends towards finding living beings everywhere, even the soil which was formerly regarded as so much dirt, is now found to be teeming with life. *

We have seen that with the vedantists everything commencing from the Great Hiranyagarbha or Brahma down to the minutest organism of the lowest scale, is included in the general appellation of 'Jiva.' The differentiation being due to differentiation of intelligence and organs. Thus Hiranygarbha is regarded as endowed with the highest possible intelligence that may be allotted to any Jiva and thenceforward a gradation of intelligence in the descending scale till the lowest organism is reached. † We have also seen that with the Vedantists, the word 'Jiva' is generally applied to the 'Linga-deha' or subtle or astral body; but as astral body cannot exist of itself for any length of time without a covering of 'Sthula-Sarira or visible body * it follows that the conception of Jiva includes that of the latter as well. The reason as to why the word 'Jiva' is specially applied to the 'Linga-Deha' being that it is more permanent, and more essential than the 'Sthula-Sarira'

* মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং।
অস্যাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ শ্রুতিঃ॥
অত্র মায়িনো মহেশ্বরস্যাবয়বভূতৈরংশরূপৈশ্চরাচরৈর্জীবৈঃ কৃৎস্নমিদং জগৎ ব্যাপ্তং। ইতি শ্রীমদ্রামকৃষ্ণরচিত পঞ্চদশী ব্যাখ্যায়াং॥

† বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা,।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে॥

অপ্রাণবৎসু স্বল্পাল্পা স্থাবরেষু ততোঽধিকা।
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু॥
পতত্রিভ্যো মৃগাস্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যা পশবোঽধিকাঃ।
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতিশক্ত্যা পুংসঃ প্রভাবিতাঃ॥
তেভ্যোঽপি নাগগন্ধর্ব্বযক্ষাদ্যা দেবতা নৃপ।
শক্রঃ সমস্তদেবেভ্যস্ততশ্চাতি প্রজাপতিঃ॥
হিরণ্যগর্ভোঽপি ততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ।
এতান্যশেষরূপাণি তস্য রূপাণি পার্থিব॥

বিষ্ণুপুরাণম্॥

vide also "Shiva-Puranam, Kailash-Sanhita, ch. 10. verses 112-113." Vachaspati Misra, in commenting on verse 53 of the 'Sankhyakarika' remarks :—ভৌতিকস্তু সর্গস্ত চৈতন্যোৎকর্ষনিকর্ষতারতম্যাত্যামূর্দ্ধাধোমধ্যভাবেন ত্রৈবিধ্যমাহ। ইতি তত্ত্বকৌমুদ্যাং বাচস্পতিমিশ্রঃ॥

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদঃ ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিষু চ হিরণ্যগর্ভে চেতনেঽপি মহানিতিশব্দো বুদ্ধ্যভিমানিত্বেনৈব। যথা পৃথিব্যভিমানি-চেতনে পৃথিবীশব্দবৎ। মহত্তত্ত্বস্য পর্য্যায়ো বুদ্ধিরিতি। ইতি বিজ্ঞানভিক্ষুরচিতে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে।

স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণম্॥

Brahma is but another name of Hiranyagarbha.

* স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন কাপি দৃশ্যতে।
বৈরাজো দেহ ঈশোঽতঃ সর্ব্বতো মস্তকাদিমান্॥

পঞ্চদশী।

or visible body as explained in the Sruti and the Smriti texts cited before.

From the verse quoted previously from Nilkantha's commentary on the Mahabharat with his remarks there on † it will be seen that the Sankhya classification of material principles into Prakriti or Primordial Matter, Mahat or Universal gravitation, Ahankara or Gravity, Tanmatras or ions, Mahabhutas or fundamental molecules, mind and the organs of sense and action, has been adopted by almost all sects of the Vedantists. These two systems of philosophy however differ in their explanation of the cause of change in matter. The Sankhyists maintaining that cosmic change is spontaneous in the presence of Purusha or soul, which is inactive ; the Vedantists on the contrary maintaining that such changes are really due to the activity of some sentient organism, matter being inert is incapable of changing its condition. In support of their contention the Vedantists cite some examples, amongst which the following are principal ones :—

(1) If we look at a well-furnished building it naturally occurs to us that some one acquainted with the rules and methods of architectural arts, must have built it. Just so, if we study deep this well-balanced universe with its tangled skein of machines and machineries—,which although complementary to and independent of each other, are subservient to the accomplishment of some grand object, too inscrutable for mortal brain to understand—we cannot but be struck with the idea that such an universe cannot be the creation of inert and insensible matter, but must be the work of some one having a mind and a brain and also well-acquainted with every quality of matter, patent as well as latent *.

(2) Another of their arguments is that in every case whether latent or patent, matter is entirely subservient to the activity of sentient organism for any kind of change and that it is of itself devoid of any incentive to such change. In support of their contention they cite the visible cases of the transformation of wood into chariot or cart and their activity through connection with horses and bullocks, superdirected by the charioteer or the carter. Wood of itself

† মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥
ইতি সাংখ্যোক্তানি তত্ত্বানি যোগে পাতঞ্জলীয়ে সাংখ্যে বেদান্তবিচারে চ তুল্যানি। ইতি ভারতভাবদীপে নীলকণ্ঠঃ॥
vide "Dacca Review, vol. III, No. 3, June 1913' Page 93.

* রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং॥ বেদান্তদর্শনম্ ২।২।১॥

Mr. Edison, one of the foremost scientists of the present day, in the course of his recent European tour thus remarked when questioned about his religion :—'I am not a non-believer in God. All scientists in getting nearer and nearer to the great First cause feel that about and through and in everything *there is the play of an Eternal Mind.*"

cannot change into chariot or cart unless and until handled by an expert carpenter, nor can the chariot or the cart change its position of rest or of motion until counected with horses or bullocks driven by the charioteer or the carter. *

(3) The third example is cited by the Sankhyists in support of their own theory of the spontancous change of matter. They say that although in such cases as the change of wood into chariot or cart, and of bricks and stones into palatial buildings, the active agency of expert carpenters or of masons is is visible, where is such agency visible when milk is turned into curd or rain-water into acid or saccharine juices, when it passes into the interior of the fruits of various trees. We have exhaustively dealt with this contention of the Sankhyists in another part of our article † but forgot to tell ‡ that with the Vedantists all members of the vegetable world are included in the general appellation of 'Jiva' or sentient being as in Chhandogya, Ch. VI. Pt. xi. Sec. 2 :—অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি, সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যতি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ॥ "If the Jiva stops the flow of vitality into one of its branches, that branch dries off, if in like manner it stops the flow of vital power into its second and third branches, those branches dry off and in case the Jiva of of the tree leaves it off, the entire tree dies away"—Chhandogyopanishad.

Sankaracharya in commenting on the passage quoted above remarks :—বৃক্ষস্য

* প্রবৃত্তেশ্চ ২।২।২ বেদান্তদর্শনম্ ॥

† Vide 'Dacca Review' vol. 6 Nos. 5 and 6, August and September, 1916 A. D. Pages 162-174.

‡ We also forgot to tell in this connection that as the Sutrakar, from the analogy of certain well-ascertained facts where the change of matter (অচিৎ) is brought about through the agency of *[illegible]* "Jivas" or conscious souls চিৎ, wants to establish the proposition that in the case of Mula-Prakriti or Primordial Matter also, the change is not spontaneous, but is brought about through the agency of the Paramatma or Omniscient soul, it cannot be the intention of the Sutrakar that, what is sought to be established would be taken for granted in explaining these well-ascertained minor changes of matter as these commentators would force us to believe. If, as these commentators say, that from the Sruti-text cited from the 'antarjami Brahman' (অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ) it should be taken for granted that these minor changes of matter (as of milk into curd and of water into acid or saccharine juices) are brought about through the agency of the incontrolling Paramatma were right, then it might equally be said that is the case of Primordial Matter also, which is insensible and inert (অচিৎ), the change is not spontaneous, but is brought about through the same agency ; as the 'antarjami Brahman mentions not only water, but every kind of matter, as well as individual.

Individual souls to be pervaded by the incontrolling Universal Soul and the Sutrakar might in that case have laid down the Sutra in the form usually adopted in such cases viz "পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি তথাহি দর্শয়তি।"

রসস্রবণশোষণাদিলিঙ্গাৎ জীববত্বম্। দৃষ্টান্তশ্রুতেশ্চ চেতনাবন্তঃ স্থাবরাঃ ইতি বৌদ্ধকাণাদমতম্-অচেতনাঃ স্থাবরাঃ-ইত্যেতদসারমিতিদর্শিতম ভবতি। শাঙ্করভাষ্যং॥ আদিশব্দো বৃদ্ধিমোদাদিসংগ্রহার্থঃ। স এষ বৃক্ষো জীবেনাত্মনা অনুপ্রভূতঃ (অন্তর্ব্যাপ্তঃ) ইতি দৃষ্টান্তশ্রুতিঃ। আনন্দগিরিঃ॥ That is to say 'from the facts that trees grow by drawing their sustenance from the soil and exude juices when struck by a cutting instrument it follows that they are sentient and endowed with life. From the sruti-text that thus this tree is endowed with life' it is to be inferred that even immoveable things are sentient sharers of the life-principle; hence the opinion of the atomists (কাণাদাঃ) and of the Buddhists (বৌদ্ধাঃ—বৈনাশিকা ইতি আনন্দগিরিঃ) that they are insensible and devoid of life is unworthy of credit"—Sankara and Anandagiri.

Also in Mahabharatam :—

ভূতানাং জন্মসর্ব্বেষাং বিবিধানাং চতুর্ব্বিধম্।
জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জ স্বেদজং চোপলক্ষয়েৎ॥

মহাভারতম্॥

When ভূতানাং is explained by Sankara in his commentary on a similar passage in Chhandogya, ch. VI Pt. iii Sec. 1 as meaning 'জীবাধিষ্ঠানং পক্ষ্যাদীনাং ভূতানাং।" That is to say birds and such like organisms that are endowed with vitality or life principle. The list includes members of the vegetable world. The great law-giver Manu also adopts the view of the Vedantist when he says that trees are sentient internally and have feelings of pain and pleasure.*

In commenting on the Vedanta-sutra "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" both Sankara and Ramanuja with their followers display a remarkable lack of scientific knowledge. The Sutra quoted above is connected with Sutra 24. ch. II Pada 1 of the Vedanta-Darsan, where it is said that as milk of itself curdles, so Almighty God created the world of his own power without the assistance of any external agency. Sankara, commenting on the above says that the phenomenon of curdling is an inherent quality of milk while warmth etc. only accelerates curdling. Further on, in commenting on the Sutra quoted above, he says that the two Sutras do not contradict each other for in Entra 24. ch. II. Pada i of the Vedanta-Darsan, the curdling of milk of itself means that the change takes place without the aid of any visible external agency but owing to some inherent power within it ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্ত

* অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ। মনুসংহিতা।
Vide also 'Mahabharatam, Cautiparva, chapter 184, verses 6—18 wherein an argumentative description is given as to why members of the vegetable kingdom are to be classified as sentient organic beings endowed with life-principle. Nilkantha in his ভারতভাবদীপে adds, that not only vegetables, but inorganic things like jewels and metals are also to be presumed, from the context of the text, as possessed of the life-principle :—পীর্থ্যেতে ইত্যাদেষু বস্তুষ্বেরপি চেতনত্বং ব্যাখ্যাতম্। এতেন ক্ষারাদি পার্থিবঃ পারদাদেরপি চেতনত্বং ব্যাখ্যাতম্।

নিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং কার্য্যং ভবত্যেতল্লোকদৃষ্ট্যা প্রদর্শিতম্। শাঙ্করভাষ্যং ॥ Vachaspati Misra explains লোকদৃষ্ট্যা in the commentary of Sankara thus :-স্থূলদর্শিলোকাভিপ্রায়ানুরোধেন তদুক্তং ন তু পরমার্থতঃ ইত্যর্থঃ। ভামত্যাং বাচস্পতিমিশ্রঃ ॥ That is to say, the fact that in Sutra 24th it has been said that milk curdles of itself is only for the belief of persons who take a superficial view of things, but really it is not so—Vachaspati Misra in Bhamati. Ramanuja Swami in commenting on the same Sutra remarks that milk has an innate power to curdle, while the addition of ferments such as sour curd etc. only accelerates curdling. ন সর্ব্বেষাং কার্য্যজননশক্তানাং উপসংহারসাপেক্ষত্বমস্তি ; যথা ক্ষীরজলাদের্দধিহিমজননশক্তস্য তজ্জননে। ক্ষীরাদিষু আতঞ্চনাদ্যপেক্ষা ন দধ্যাদিভাবায়, অপি তু শৈঘ্র্যার্থং রসবিশেষার্থং বা। ইতি শ্রীভাষ্যে রামানুজস্বামী ॥ While commenting on the Sutra quoted above Ramanuja Swami remarks that although it has been said that milk curdles without the aid of any visible agency, it does not preclude one from saying that the change is really brought abougt through the activity of some invisible agency. "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি" (ব্রহ্মসূ২।১।২৪) ইত্যত্র দৃষ্টপরিকর রহিতস্যাপি স্বাসাধারণ পরিণাম উপপদ্যত ইত্যেতাবদুক্তম্, ন প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বম্ পরাকৃতম্। 'যোঽপ্সু তিষ্ঠন্' ইত্যাদি শ্রুতে ॥ ইতি রামানুজীয়ে শ্রীভাষ্যে ॥ The quotation from the "Antarjyami Brahman" (অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মন) of Vrihadaranyak indicates that Ramanuja Swami is thinking of 'Paramatma' or universal Soul as the invisible agency here. We have, in a former part of our article, exhaustively dealt with the subject showing that it is jiva or individual soul which brings about these changes and not Paramatma or the universal soul. A slight acquaintance with the rudimentary principles of bacteriology would have prevented these commentators from laying down these ridiculous and self-deceptive explanations, which go against the principle enunciated by them. Hence two inferences are possible; either the existence, nature and functions of microbes, very well-known to the Vedic Rishis of India were forgotten at the time when the Vedantic Sutras were being compiled or these ascetic commentators in their eagerness to prove almighty God tobe the be-all of any thing and everything have shut their eyes to any independant enquiry on the subject. The latter inference is more probable than the former.

The fourth example that is put in the mouth of Sankhyists is very explicit on the point raised here on account of its successful refutation by the Vedantists. The Sankhyists say that granting that the first movement of "Primordial Matter" (Prakriti) is due to direct interference of omniscient God, it does not follow that the subsequent changes of Prakriti are not spontaneous, just as in the well-known example of grass which being once swallowed by the cow of itself changes into milk. অথ স্যাৎ যদ্যপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতায়ঃ প্রকৃতেঃ পরিস্পন্দপ্রবৃত্তিরপি ন সম্ভবতীত্যুক্তম্, তথাপ্যনপেক্ষায়া এব পরিণাম প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, তথাদর্শনাৎ ; ধেন্বাদিনোপযুক্তং হি তৃণোদকাদি ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণামমানং দৃশ্যতে। অতঃ প্রকৃতিরপি স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণংস্যতে। ইতি রামানুজীয়ে শ্রীভাষ্যে ॥ To this the Vedantists reply that even in the example cited, the change, far from being a spontaneous one is really brought about through the active agency

of a particular kind of 'Jiva' namely cow. Had the change equally taken place when grass is eaten by a bullock, a male goat or when standing on the pasture in the presence of the calf, the contention of the Sankhyists might have prevailed, but as no such change takes place unless and until grass is swallowed by a *particular* kind of sentient being, it must be inferred that such a change is not spontaneous, but the result of active interference of a special kind of Jiva, which can transform grass into milk. যদি হি তৃণোদকাদিকমনডুহাদ্যুপযুক্তং প্রহীনং বা ক্ষীরাকারেণ পর্য্যণংস্তত ততঃ প্রজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণমত ইতি বক্তুমশক্যত; ন চৈতদস্তি; অতো ধেন্বাদ্যুপযুক্তং প্রাজ্ঞ এব ক্ষীরীকরোতি। ইতি শ্রীভাষ্যে রামানুজস্বামী॥ Here also Ramanuja Swami lays stress on the word প্রাজ্ঞ or oinmiscient God * Sankaracharya is of opinion that the change of grass into milk is not spontaneous, but is somehow or other dependent on the activity of a particular kind of Jiva, but how the change is actually brought about is only known to the Gods. ভবেত্তৃনাদিবৎপ্রধানস্য স্বাভাবিক পরিণামঃ, যদি তৃনাদেরপি স্বাভাবিক পরিনামোঽভ্যুপগম্যেত। ন ত্বভ্যুপগম্যতে নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ। কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিরন্যত্রাভাবাৎ। ধেন্বৈব হ্যুপভুক্তং তৃনাদি ক্ষীরীভবতি। ন প্রহীণমনডুহাদ্যুপভুক্তং বা। যদি হি নির্ণিত্তমেতৎ স্যাদ্ধেনুশরীর সম্বন্ধাদন্যত্রাপি তৃনাদি ক্ষীরীভবেৎ। ন চ যথাকামং মানুষৈর্নশক্যম্ সম্পাদয়িতুমিত্যেতাবতা নির্ণিমিত্তং ভবতি। ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্য্যং মানুষসম্পাদ্যং কিঞ্চিদ্দৈব-সম্পাদ্যং। ইতি শারীরকভাষ্যে শঙ্করস্বামী॥ But the most rational explanation is given by Baladeva Vidyabhusan in his commentary on the same. Baladeva says that if the contention of the Sankhyists were true, then grass eaten by bullocks etc. would have undergone such a change or it might have spontaneously changed into milk in the mouth of the calf when it goes to graze in the pasture. But as in these cases no such change of grass into milk is brought about through connection with a particular kind of Jiva or sentient being and that such connection arises out of the omnipotent will of the Master? বলীবর্দ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকার-পরিণামাভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরত্মনা পরিণমতে তর্হি চত্বরাদি পতিতেঽপি তথা স্যান্নচৈবমস্ত্যতোন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধাৎ, সর্ব্বেশসঙ্কল্প এব ভবেতি। ইতি গোবিন্দভাষ্যে বলদেবস্বামী॥

GOVINDA CH. MUKHOPADHAYA.

* Ramanuja Swami in commenting on Sutras 1 and 2 of ch. II. Pada ii of the Vedanta Darsan uses the words 'তক্ষ' and 'প্রাজ্ঞ' in connection with the transformer of wood into chariot and of primordial matter (Prakriti) into the heterogeneous universe respectively. Both these words are used in the same of 'one who knows the nature of the matter to be changed: তৎস্বভাবাভিজ্ঞঃ। ইতি শ্রীভাষ্যে॥ In the case of the transformation of wood into chariot a particular kind of 'Jiva' called carpenter, who possesses the requisite knowledge of wood for that special purpoose (তক্ষ) is said to be the active agent who brings about the transformation, whereas in the case of the change of Prakriti or Premordial Matter into the heterogeneous universe Omniscient God (প্রাজ্ঞঃ) is said to be the transformer. Now, with this explaination of 'তক্ষ' and 'প্রাজ্ঞ' it is difficult to understand as to why he calls 'প্রাজ্ঞ' or God as transformer of grass into milk when the Sutrakar plainly lays down that it is a particular kind of 'Jiva' namely cow which brings about this change. If the carpenter is the 'তক্ষ' of wood for a special purpose then it may equally be said that cow is the 'তক্ষ' of grass for some special purpose, without any need of calling in the assistance of the 'প্রাজ্ঞ' or omniscient God.

SUMMER IN ENGLAND.

Summer is come to England. I can hear
The cuckoo daylong crying far or near
Through gentle weather. Now the June dog-rose
On may a bending bramble sweetly blows
About wild hedges, drinking every morn
The dew that drops from heaven with the dawn.
Now in the meadows deeper grows the grass
Ripening to haytime as the shadows pass
Skimming like swallows o'er the rippling fields,
Shade and gold sun, till day to evening yields.
And in that little brook I used to know
Gladly at noon the meadow cattle go
Deep to the knees to stand, beneath high banks
And leaning trees with shade for dappled flanks,
And hour on hour along the river reach
Past many a little bar and pebbled beach
(Making sweet shores for singing waterways)
Indolently with wide calm eyes they gaze
Untroubled of the beauty there unrolled
The gleaming of the silver and the gold
Where down the shadowy water, brokenly,
The sunlight falls through high green grass and tree
Showing brown trout, wrapt in a summer dream,
Oaring themselves against the running stream,
Or, when the evening falleth, quiet, cool,
Rising for flies from some still shadowed pool
Until the night is come, sweet summer dark
Jewelled with stars, and dogs begin to bark
From distant hills and now the cattle all
Have left the murmuring brook, heeding the call
Of fragrant pastures wet with falling dews
Where they will roaming be, till Day renews
His glittering reign, and Morning, as they feed,
Bursts like a golden blossom on the mead.

D. G. D.

৭ম খণ্ড। ঢাকা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ ২য় সংখ্যা।

ক্রোকাস্ Crocus. জাফরাণ।

N. O. Irideæ.

(মৎকৃত "উদ্ভিদের বিশ্বকোষ" নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্যহইতে উদ্ধৃত।

Special for Dacca Review

ইহারা জাফরাণ জাতীয় মূলজ উদ্ভিদ বিশেষ। ইহাদের মূল রসুনের মূলের আকার। পাতাও দেখিতে প্রায় রসুনের পাতার ন্যায়। ইহাদের জন্মস্থান ইউরোপ। এসিয়ার কোন কোন স্থানও ইহাদের কোন কোন জাতির জন্মভূমি। পারস্য, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও বাহ্লীক (Bulkh) দেশও ইহাদের কোন কোন জাতির আদিম অধিবাস। ইহাদের ফুলের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। ইহাদের ফুলের বর্ণচাক্‌চক্য মনোমুগ্ধকর। পীত, কমলারং, লোহিত, নীল, বেগুণে ও শ্বেতবর্ণ ভেদে ইহারা নানাবর্ণের হয়। নীল ও বেগুণে বর্ণের জাতি সত্বরই নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়। চান্‌কার ও রাস্তার ধারে, রকারীতে (Rockery*) ও উদ্যান-শয্যায় (Garden bed) ইহারা অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়া থাকে। তৃণমণ্ডলে (Lawn) ও তৃণশয্যায় (Grass bed), ইহাদের সৌন্দর্য্য অধিকরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পাত্রেও ইহাদের চাষ হইতে পারে। জল-পূর্ণ অগভীর গামলাতে বা পাত্রেও ইহাদের চাষ হইতে পারে। কেবল যদুআঁশেও (Jadoo fibre †) ইহাদের চাষ হয়। উষ্ণতাবিহীন সবুজ-গৃহেও ইহাদের চাষ হয়। উদ্যানে ইহাদের চাষ করিলে, যে সময়ে ইহারা ফুল ধারণ করে, সবুজগৃহে (Green house) চাষ করিলে উহার বহুদিন পূর্ব্বে ইহারা পুষ্পিত হয়।

ক্রোকাস (Crocus) ফুলের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত না হয়, জগতে এরূপ লোক দুর্লভ। সৌন্দর্য্যের জন্যই কেহ কেহ ইহাদিগকে স্বর্গীয় পুষ্প (Flower of Paradise) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ইহারা এদেশের নিম্নপ্রদেশে চাষের উপযোগী নহে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের

* কৃত্রিম পাহাড়কে রকারী কহে।

† প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে শৈবালবৎ একরূপ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাকে যদুআঁশ (Jadoo fibre) কহে। উহা উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট সার।

প্রয়োজন হয় না। নিম্নপ্রদেশে শীতকালে সবুজ-গৃহে দুই এক জাতির চাষ হইতে পারে। কিন্তু উহাদের মূল বর্ষাকালে পচিয়া যায়। অন্য মূলের ন্যায় শুষ্ক করিয়া, নিম্নপ্রদেশে উহাদিগকে রক্ষা করা সহজ নহে। আমি হোলণ্ড (Holland) হইতে ক্রমে ২ | ৩ বার ইহাদের মূল আনাইয়া নিজ বাগানে চাষ করিয়াছি। শীতকালে ইহারা ফুল ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু কোন সময়েই উহাদের মূল রক্ষা করিতে পারি নাই। গ্রীষ্মকালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উহারা মরিয়া গিয়াছে। মনসুন্ (Monsoon) নামক বাণিজ্য-বায়ু ইহাদের পরমবৈরী। এই বায়ুর উষ্ণতা দ্বারা ইহাদের মূল সহজেই পচিয়া যায়। বর্ষাকালে, কিছুতেই নিম্নপ্রদেশে ইহাদিগকে রক্ষা করা যায় না। পরীক্ষার্থ ক্রমে দুই তিনবার ইহাদের মূল আমদানী করিয়াও আমি উহাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হই নাই। নিম্নপ্রদেশে ইহাদের চাষ করিতে হইলে প্রতিবৎসরই শীতকালের প্রারম্ভে বিদেশ হইতে ইহাদের মূল আমদানী করিতে হয়। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে ইহাদের মূল ইউরোপ হইতে রওনা হইলে, আশ্বিন কি কার্ত্তিক মাসে উহা এদেশে পহুঁছে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসেই নিম্নপ্রদেশে ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। তদবস্থায় অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত, ইহারা ক্রমে পুষ্প ধারণ করিয়া থাকে। তুষার-বিধৌত শীতপ্রধান স্থান ইহাদের চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ইহাদের পরমবৈরী। নিম্নপ্রদেশে পাত্রে ইহাদের চাষ করাই সুবিধাজনক। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে, কমায়ূন, দেরাদুন, মশৌরী, কার্শিওঙ্গ ও নীলগিরির পাদদেশে ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। পাহাড়গুলিতেও কোন কোন জাতির চাষ হয়। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র ও সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই ইহারা জন্মিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে গৃহে ইহাদের চাষ করিতে হইলে, যে স্থানে আলো ও পরিষ্কার বায়ু সুলভ, এরূপ স্থানে পাত্রসহ ইহাদিগকে রাখিতে হয়। পাত্রে ইহাদের চাষ করিতে হইলে ইহাদিগকে সময় সময় প্রচুর পরিমাণ জল দিতে হয়। যে স্থানে ইহাদের চাষ করিতে হইবে, ঐ স্থান অতিশয় স্নিগ্ধ রাখা আবশ্যক হয়। ইউরোপে ঘাসযুক্ত স্থানেও ইহাদের চাষ হয়। ইহাদের মূলের উপরিভাগ ঘাসের চাপড়ার নীচে অবস্থিত থাকিলে মূল স্নিগ্ধ থাকে। তদবস্থায় ইহাদের গাছ সত্বর বর্দ্ধিত হয়। খোলা স্থানে ইহাদের চাষ করিতে হইলে, উদ্যান-শয্যায় একত্রে বহুসংখ্যক মূল রোপণ করিতে হয়। সারি (row or line) করিয়াও ইহাদের মূল রোপণ করা যায়। এক হইতে ২ | ৩ সারি করিয়াও কেহ কেহ ইহাদের মূল রোপণ করিয়া থাকে। তিন ইঞ্চি মৃত্তিকার নীচে এবং দুই ইঞ্চি দূরে দূরে ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। শীতপ্রধান দেশে সেপ্টেম্বর (ভাদ্র) মাসে ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। ইহাদের মূল তিন বৎসর পর্য্যন্ত একস্থানেই থাকিতে পারে। তিন বৎসর পরে ইহাদিগকে তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে হয়। এক স্থানে ইহাদিগকে দীর্ঘকাল রাখিতে হইলে সময় সময় ইহাদের গোড়ার মৃত্তিকা খোচাইয়া দিয়া, তদুপরি সার বা অন্যরূপ সার ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন জাতি এক স্থানেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কোন কোন জাতি বর্ষার বারিধারা সহ্য করিতে অক্ষম। বারিপাত দ্বারা উহাদের মূলের অপচয় হয়। এইরূপ জাতির মূলকে বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই উঠাইয়া ঘরে রক্ষা করিতে হয়। ইহাদের পাতা সম্পূর্ণরূপে মরিবার পূর্ব্বে মূল উঠাইতে হয় না। পাতা একবারে মরিয়া গেলে মূল উঠাইতে হয়। ইহাদের পাতা কখনই কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলিবে না। কাচা পাতা কাটিলে বা ছিঁড়িয়া ফেলিলে মূল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সসার দোয়াশ মৃত্তিকা ইহাদের চাষপক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্ভিজ্জ সারই ইহাদের পক্ষে বিশেষ সার। ইহাদের চাষে একটী গুপ্ত রহস্য আছে। ইহাদের মূলকে অধিক মৃত্তিকার নীচে রোপণ করিতে হয় না। মূলের আকার ও বয়সানুসারে, এক হইতে তিন ইঞ্চির অধিক মৃত্তিকার নীচে ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয় না। তাহা হইলে ইহারা আশানুরূপ সুন্দর ফুল প্রসব করিবে না। ভাষা (Shallow) রোপণদ্বারা সুফল লাভ হইয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশে, জাতি অনুসারে, শ্রাবণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। ইহার প্রধানতঃ চারিটী জাতিতে বিভক্ত :—

১। সাধারণ জাতি। ২। শরৎকালের উপযোগী জাতি। ৩। শীতকালের উপযোগী জাতি। ৪। বসন্তকালের উপযোগী জাতি।

ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন সময় রোপণ করিলে বৎসরের অর্দ্ধ ভাগের অধিক কাল ইহাদের ফুল লাভ করা যায়।

সাধারণ জাতির মূল আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে, শরৎ কালের জাতির মূল আগষ্ট মাসের শেষভাগে, শীতকালের জাতির মূল সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবর মাসে, এবং বসন্তকালের জাতির মূল ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ্চমাসে রোপণ করিলে, সমস্ত শরৎকাল ও বসন্তকাল ব্যাপিয়া ইহাদের ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময় অন্য ফুল দুর্লভ, সেই সময় ইহার প্রচুর পরিমাণে ফুল প্রদান করিয়া থাকে।

পার্শ্বাঙ্কুর (side-shoots or suckers) ও বীজ দ্বারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়। বীজোৎপন্ন গাছে তিন বৎসরের পূর্ব্বে ফুল হয় না। মূলোৎপন্ন গাছ যে বৎসর রোপণ করা যায় ঐ বৎসরই ফুল ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের চাষপক্ষে বীজোৎপন্ন গাছ অপেক্ষা মূলোৎপন্ন গাছই বিশেষ অগ্রগণ্য।

চড়ুই জাতীয় পক্ষী ইহাদের ফুলের পরম বৈরী। ইহারা চঞ্চুদ্বারা ইহাদের ফুল ছিঁড়িয়া ফেলে। ইন্দুর ও শশকও ইহাদের কম বৈরী নহে। ইহারা ইহাদের মূল খাইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল রিপুর উপদ্রব নিবারণের উপায় বিধান সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য।

ইহাদের সাধারণ জাতি বিশেষ আদরণীয় নহে। কেন না, ইহাদের ফুল অল্পকাল স্থায়ী হয়। শরৎকালীয়জাতির ফুল অতিশয় সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী। যখন অন্য ফুল দুর্লভ, তখন ইহাদের ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শীতকালীয় ফুল প্রায় শরৎ কালের জাতির অনুরূপ। বসন্তকালীয় জাতির ফুলের বর্ণ অতিশয় উজ্জ্বল এবং ফুলও দীর্ঘস্থায়ী। উপরে ইহাদের চাষ-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল উহা কেবল শীতপ্রধান দেশের জন্যই প্রযোজ্য, এদেশীয় নিম্নপ্রদেশে কদাচিৎ ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। সৌখীন ব্যক্তি সখের জন্য নিম্নপ্রদেশে ইহাদের চাষ করিতে ইচ্ছা করিলে, শীত ঋতুর আরম্ভের পূর্ব্বেই, আমদানীকৃত মূল টবে রোপণ করিবেন। ইহারা নানাজাতি। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী উৎকৃষ্ট জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(ক) সাধারণ জাতি।
Ordinary varieties.

১। ক্লথ্-অব্-গোল্ড—Cloth of gold. ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ; বহির্ভাগ শিয়ালী বর্ণের বিস্তৃত রেখাবৃত এবং ফুল ক্ষুদ্র।

২। লার্জ্জ-গোল্ডেন্ ইওলো—Large Golden Yellow. ইহার মূল অতিবৃহৎ, ফুল বৃহৎ, স্বর্ণবর্ণ এবং বহুসংখ্যায় ফুল হয়।

৩। গোল্ডেন-ইওলো—Golden yellow. ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ।

৪। এল্‌বিওন—Albion. ফুল শ্বেতবর্ণ ও ভায়ওলেট বর্ণের রেখান্বিত।

৫। ব্যারণ-ভন্-ব্রুনো—Baron Von Brunow. ইহার ফুল বেগুনে বর্ণ বা গাঢ় নীলবর্ণ।

৬। কোরিগিও—Correggio. ইহার ফুল নীলবর্ণ, পাপড়ির কিনারা শ্বেতবর্ণ।

৭। ডেভিড-রিজিও—David Rizzio. ইহার ফুল গাঢ় বেগুনে বর্ণ।

৮। নি-প্লাস্-আল্‌ট্রা—Ne plus ultra. ইহার ফুল নীলবর্ণ, উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ।

৯। পার্পুরিয়া-গ্রেণ্ডিফ্লোরা—Purpurea-Grandiflora. ফুল অতি জাঁকাল ও বেগুনে বর্ণ।

১০। লা-ম্যাজেষ্টিউস্—La Majestuesse. ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ, পদ্মরঙ্গের রেখান্বিত।

১১। ক্যেরোলাইন-চিস্‌হোলম্—Caroline Chisholm. ফুল শ্বেতবর্ণ, দেখিতে বড়ই সুন্দর।

১২। মণ্ট-ব্লাঙ্ক - Mont Blanc. ফুল শ্বেতবর্ণ।

১৩। কুইন্‌ভিক্টোরিয়া—Queen Victoria. ফুল শ্বেতবর্ণ।

(খ) শরৎ কালোপযোগী জাতি।

Autumn flowering varieties.

১৪। স্পিসিওসাম্—Speciosum. ইহার ফুল বেগুনে বর্ণ, পাপড়ির শিরা গাঢ় বেগুনে বর্ণ, পরাগকোষ-আবরক পত্র কমলাবর্ণ; ফুল বৃহৎ।

১৫। সিরোটিনাস্—Scrotinus. ফুল পাটলবর্ণ, বেগুনে বর্ণের ছায়াযুক্ত।

১৬। জোনেটাস্—Zonatus. ফুল সামান্যরূপে বেগুনে বর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ, তলদেশ কমলা রঙ্গে চিত্রিত

১৭। লঞ্জিফ্লোরাস্—Longidorus. Syn. odorus. অতিশয় সুন্দর জাতি; ফুল সামান্যরূপ বেগুনে বর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ; স্ত্রীপরাগকোষ লালবর্ণ; সুগন্ধযুক্ত।

১৮। অষ্টিউরিকাস্—Austuricus. ফুল বেগুনেবর্ণ।

১৯। অষ্টিউরিকাস্ এট্রোপার্পুরিয়াস্—Austuricus Attropurpureus. ফুল গাঢ় বেগুনে বর্ণ, তলদেশ গাঢ় বেগুনে বর্ণের দাগযুক্ত।

২০। পাল্‌চেলাস—Pulchellus. ফুল মলিন বেগুনে বর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ বা লেভেণ্ডার বর্ণ (Lavender color) মিশ্রিত নীলবর্ণ।

২১। আইরিডিফ্লোরাস্—Iridiflorus. Syn. Byzantinus. ইহার ফুল আইরিস (Iris) ফুলের আকার উজ্জ্বল বেগুনে বর্ণ; মধ্যভাগ সামান্যরূপ বেগুনে বর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ (lilac color) বিশেষ।

২২। ক্রাইসেন্থাস্—Chrysanthus. ফুল কমলা-বর্ণবৎ পীতবর্ণ, পাপড়ি শিরালীবর্ণে চিত্রিত।

২৩। ফাস্কোটিঙ্কটাস্—Fusco-tinctus.
২৪। বোরি—Boryi.
} এই উভয় জাতির ফুল শ্বেতবর্ণ; গলদেশ কমলাবর্ণ।

২৫। ইম্পেরেটি—Imperati. ইহার ফুল নীলাভ শ্বেতবর্ণ, বেগুনে বর্ণের দাগযুক্ত; গলদেশ পীতবর্ণ; অতিশয় সুগন্ধযুক্ত; জানুয়ারী মাসে ইহার ফুল হয়। ইহা অতিশয় সুন্দর জাতি। নিম্নপ্রদেশে ইহার চাষ হইতে পারে। শীত ও বসন্ত কালেও ইহার ফুল হয়।

২৬। নেভাডেন্‌সিস্—Navadensis. ইহার ফুল সামান্যরূপে বেগুনে বর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণবিশেষ (Lilac color), বেগুনে বর্ণের রেখান্বিত।

২৭। সাইবেরি—Sieberi (Nevalis). ইহার ফুল ভায়ওলেট্ বর্ণ; শীত ও বসন্তকালেও ইহার ফুল হয়। এই জাতি ও নিম্ন প্রদেশে চাষের উপযোগী।

২৮। ক্লিউসি—Clussii. ইহার ফুল বেগুনে বর্ণ; গলদেশ সামান্যরূপ বেগুনে বর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণবিশেষ (Lilac color) দ্বারা চিত্রিত; দাড়িযুক্ত।

২৯। সেটাইভাস্ জাতি—Crocus Sativus. Saffron Crocus. Real Saffron. আসল জাফরান।

ইহাই প্রকৃত জাফরান। উপরে যে সকল জাতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে, উহারাও এই পরিবারভুক্ত বটে। উহাদের কোন কোন জাতির ফুলেও সুগন্ধ আছে। ঐ সকল জাতির গর্ভকেশর, এই জাতির গর্ভকেশর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাঁটি জাফরাণকে কৃত্রিম করা হয়। কখন কখন কুশুম্ভ (কুশুম। Bastard Saffron) ফুল দ্বারাও খাঁটী জাফরানকে কৃত্রিম করা হয়। জাফরান নানা গুণ সম্পন্ন। গুণের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে ইহার নামের পরিচয় দেওয়াই সঙ্গত। সুতরাং অগ্রে আমি নামের পরিচয়ই দিতেছি।

ইহার সংস্কৃত নাম কাশ্মীরক, কুঙ্কুম, বাহ্লীক ও শোণিত।—

"কাশ্মীরকং কুঙ্কুমঞ্চ।
বাহ্লীকং শোণিতং বরং॥ (রত্নমালা)

বচনান্তর যথাঃ—

কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্।
সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্॥

অর্থাৎ ইহার নাম কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক এবং শোণিত-বাচক শব্দ মাত্র। ইহার অন্যনাম কাশ্মীরজ ও সুরভি।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা ইংরেজী ভাষায় সেফ্রো (Saffron), ফরাসী ভাষায় লরকিমাস্ বা সেফ্রান (Safran) ও সোফ্রান (Sofran), ইটালীয় ভাষায় জাফারেনো (Zafferano), স্পেন ভাষায় এজাফ্রান (Azafran), পর্টুগিজ ভাষায় একাফ্রাম্ (Acafram), ডেনিস্, জর্মান ও সুইডেনের ভাষায় সেফ্রান (Saffran), তুরস্ক ভাষায় জফিরান (Zaferan); আরব ও পারস্য ভাষায় জাফরান (Zaffran) নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে ইহা নানাবিধ নামে পরিচিত। হিন্দুস্থানে ইহা কেশর ও জাফ্রান, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কেশর, কর্ণাটে কুঙ্কুম ও তৈলঙ্গে কুঙ্কুম্পু্বু ইত্যাদি নামে পরিচিত।

দেশভেদে ইহার গুণভেদ।

"কাশ্মীর দেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধিতৎ।
সূক্ষ্ম কেশরমারক্তঃ পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতম্।
কেতকীগন্ধসংযুক্তগুমধ্যমং সূক্ষ্ম কেশরম্॥
কুঙ্কুমং পারসীকে যন্মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণং তদধমং স্থূল কেশরম্॥

(শব্দকল্পদ্রুম ও রাজনিঘণ্ট)

অস্যার্থঃ—কাশ্মীর দেশজাত কুঙ্কুমের কেশর সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধযুক্ত। ইহাই উৎকৃষ্ট জাতি। বাহ্লীক (বল্খ) (Bulkh) দেশজাত কুঙ্কুম পাণ্ডুবর্ণ, সূক্ষ্ম কেশর ও কেতকী ফুলের গন্ধযুক্ত। ইহাই মধ্যম জাতি। পারস্যজাত কুঙ্কুম মধুগন্ধযুক্ত, স্থূল কেশর ও পাণ্ডুবর্ণ। ইহা অধম জাতি।

দেশভেদে ইহার ফুলের বর্ণগত পার্থক্যও লক্ষিত হয়। শরৎ ও শীতকালে ইহার ফুল হয়। ইহার ফুল সাধারণতঃ ভায়ওলেট (Violet) বর্ণের; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপড়ি সকল বেগুনেবর্ণের ও পরাগকেশর কমলাবর্ণের হয়। ইহার ফুল অতিশয় গন্ধযুক্ত। কখনও কখনও ইহার পরাগকেশর গাঢ় লালবর্ণেরও হইয়া থাকে। এই বর্ণের কুঙ্কুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

জলবায়ুর ও ভূমির পার্থক্যানুসারে ইহার ফুলের ও উহার পরাগকেশরের বর্ণের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই পরাগে কেশর সকলই কুঙ্কুম। ইহাদিগকে শুষ্ক করিয়া রাখিলে উহাই কুঙ্কুম হয়। খাঁটী কুঙ্কুমের বর্ণ উদয়াচলাবলম্বী সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ। ইহার পরাগ-কেশর সকল প্রায় একইঞ্চি দীর্ঘ হয়। উহা পীতাভ-লালবর্ণ ও কুঞ্চিত। কুঙ্কুম পুষ্প ষট্‌দল বিশিষ্ট এবং প্রতি পুষ্পে ছয়টী কেশর থাকে। এতন্মধ্যে তিনটী কেশর ঘোর রক্তিম বর্ণ। ইহাই খাঁটী জাফ্রান। অপর তিনটী কেশর বাসন্তী বর্ণের। ইহা নকল বা অপ্রকৃত জাফরান। ইহা প্রকৃত কেশর হইতে কিঞ্চিৎ স্থূল ও ক্ষুদ্র। ফুলের গঠন এদেশী ভুমিচম্পকের ফুলের ন্যায়। এই সকল কেশরের পরাগরেণু (Pollen) অর্থাৎ ধূলিবৎ পদার্থসকলই ইহার সুগন্ধের সৃষ্টি করে। কেহ কেহ বলেন ন্যূনাধিক ৩০০০।৪০০০ ফুল হইতে কদাচিৎ অর্দ্ধ ছটাক খাঁটী কুঙ্কুম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অতিশয় মূল্যবান। খাঁটী কুঙ্কুমের মূল্য প্রতি তোলা ন্যূনাধিক ১০৲ টাকা। ইহাই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজকাল খাঁটী কুঙ্কুম অতিশয় দুর্লভ। ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া আসল কুঙ্কুম ভেজাল হয়। অধুনা প্রতি তোলা ১৲ হইতে ১॥০ টাকাতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা নিশ্চয়ই খাঁটী কুঙ্কুম নহে। কুঙ্কুম ফুলের কুঞ্চিত পুষ্পদলকেও কখন কখন খাঁটী কুঙ্কুমের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাকে ভেজাল করা হয়। নূতন সভ্যতার ফলে আজকাল এমন ঘটনা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। বিদেশীয় কুঙ্কুমমধ্যে ভেলেনসিয়া (Valencia) নামক স্থানের কুঙ্কুমই উৎকৃষ্ট।

কুঙ্কুমের কৃত্রিমতা পরীক্ষা করিতে হইলে যাহার পরাগ-কেশর পাকা লেবুর ন্যায় গাঢ় পীতবর্ণ উহাকেই খাঁটী কুঙ্কুম বলিয়া জানিবে। নিকৃষ্ট কুঙ্কুমের বর্ণ পাতলা বা কৃষ্ণাভ পীতবর্ণ। চর্ব্বি ও তৈল মিশ্রিত কুঙ্কুম চক্‌চকে দেখায়। উহা কদাচ ব্যবহার করিবেনা। কুঙ্কুম ঔষধে ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। কুঙ্কুম অতিশয় সুগন্ধ বলিয়াই ইহা খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার হয়। কুঙ্কুম গাছের মূল হইতে তৃণবৎ যে পত্র বহির্গত হয় উহাও সুগন্ধি। গাভী উহা খাইলে উহার দুগ্ধও কুঙ্কুমের গন্ধবিশিষ্ট হয়। মেষ, ছাগ ও হরিণাদি জন্তু ইহা খাইলে, উহাদের

মাংসেও কুঙ্কুমের গন্ধ বিশিষ্ট হয়। দেব-গাভী সুরভী ইহা খাইয়া সুরভী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে অমৃতপান নিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিতৃপ্তি হওয়াতে তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধি উদ্গার উদ্গীর্ণ হইয়াছিল। সেই উদ্গার প্রভাবে সুরভী গাভীর উৎপত্তি হয়। সুরভী কুঙ্কুমতৃণ ভক্ষণ করিত। সেইজন্য উহার দুগ্ধও অতিশয় সুরভি অর্থাৎ সুগন্ধযুক্ত ছিল। দেবগণ এই জন্যই এই গাভীকে সুরভী নাম প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই গাভীর দুগ্ধ পান করিতেন। পলান্ন (পোলাউ) ও ব্যঞ্জনাদি, কেলে ও কোপ্তা প্রভৃতির বর্ণ সুন্দর ও সুগন্ধ করার জন্য এদেশে বহু প্রাচীন সময় হইতে ইহার ব্যবহার চলিতেছে। মুসলমান জাতি কর্ত্তৃকই ইহা খাদ্যদ্রব্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। মুসলমান সম্রাটগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ সকল প্রকার ব্যঞ্জনে ও পলান্ন প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার করিতেন এবং অদ্যাপি মুসলমান পরিবারের মধ্যেই ইহার ব্যবহার অব্যাহত রহিয়াছে। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক কখন কখন ইহা খাদ্যদ্রব্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মুসলমান সম্রাটগণের অতি প্রিয় দ্রব্য ছিল।

কুঙ্কুম তিক্ত, কটুস্বাদ ও স্নিগ্ধ। ইহা শিরোরোগ, ব্রণ, বমি ও ত্রিদোষহারক এবং বর্ণ-প্রসাদক।

"কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরোগব্রণজন্তুজিৎ
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্।"

বচনান্তর যথা:—

"কুঙ্কুমং সুরভিতিক্তং কটুষ্ণ কাসবাতকণ্ঠরুজাঘ্নম্।
মূর্দ্ধশূলবিষদোষনাশনম্ রোচনঞ্চ তনুকান্তিকারকম্॥"
(রাজনিঘণ্ট)

অর্থাৎ ইহা তিক্ত ও কটুস্বাদবিশিষ্ট। ইহা কাস, বাত, কণ্ঠরোগ, মূর্দ্ধশূল ও বিষদোষনাশক, রোচক ও দেহের কান্তিবর্দ্ধক। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, শিরোরোগ, রক্তদোষ, শ্লেষ্মাদোষ, ত্রিদোষ (অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ), বমনরোগ ও শূল প্রভৃতিরোগের মহৌষধ।

নব্যমতে; কুঙ্কুম উষ্ণ, সুগন্ধি, বায়ুনাশক ও আক্ষেপ নিবারক। ঋতুদোষ, ক্ষীণ শুক্রতা, প্রদর, রজঃকৃচ্ছ্র ও বায়ুপিত্তজনিত শূলরোগেও ইহা মহোপকারী; শিশুর দান্তরোগ, হাম ও ক্ষত প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী। ইহা গর্ভাশয়ের যন্ত্রণানাশক।

নব্যমতে ইহার বৃন্ত সূক্ষ্ম ও সূত্রবৎ; অগ্রভাগ স্থূল ও তিন খণ্ডে বিভক্ত; সদ্‌গন্ধযুক্ত; পীতলোহিত বর্ণ; তিক্ত ও রুক্ষাস্বাদ। ইহা উত্তেজক ও বায়ুনাশক। কেহ কেহ ইহাকে রজোনিঃসারক বলিয়া বিবেচনা করেন। কৈশিক নাড়ীর ক্রিয়া বর্দ্ধন পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ক্রমে অধিকদিন ইহা সেবন করিলে ঘর্ম্ম ও মূত্র পীতবর্ণ হয়।

ইহার জন্ম বিষয়ে জনপ্রবাদ—ইহা কথিত হয় যে কাশ্মীরবাসী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভগবতীর উপাসক ছিলেন। তিনি এরূপ দরিদ্র ছিলেন যে দিনান্তেও তাঁহার একবার আহারের সংস্থান হইত না। তিনি অতি ক্লেশে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আবশ্যকীয় অর্থের অভাবে, তিনি তাঁহার দুইটী যুবতী কন্যার বিবাহ দিতে সক্ষম হন নাই। তজ্জন্য দুইটী কন্যাই বিবাহের উপযুক্তকাল অতিক্রম করিয়াছিল। বৃদ্ধব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া দুঃখ বিমোচনের আশায় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবতীর উপাসনা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল এইভাবে আরাধনা করিয়াও অভীপ্সিত বিষয়ে কোন ফল লাভ না হওয়ায়, তিনি বিফলমনোরথ হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী জলাশয়ে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় জীবনকে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হন। এই সময় এক মহাবিদ্যা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! তুমি কি জান না যে আত্মহত্যায় কি মহাপাপ সংঘটিত হয়?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হ্যাঁ তা জানি। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্য লোক আর জগতে কেহ নাই। অর্থাভাবে আমি আমার দুইটী যুবতী কন্যার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম। আমার পরিবার প্রতিপালনেরও উপায় নাই। এই অবস্থায় আমার এই অকর্ম্মণ্য জীবনকে রক্ষা না করিয়া উহার বিনাশ সাধন করিতেই সঙ্কল্প করিয়াছি।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-

লেন, 'মাতঃ, তুমি কে, আমায় পরিচয় দেও!' মহাবিদ্যা অমিয়-মধুর বচনে বলিলেন, 'বৎস! আমি এই পর্ব্বত-বাসিনী একজন সাধিকা।' এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'তুমি এই কয়েকটী বীজ গ্রহণ কর। ইহাদ্বারাই তোমার দারিদ্র্য ও দুঃখ দূর হইবে।' ব্রাহ্মণ সযত্নে ঐ বীজ গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, 'মাতঃ' ইহাদ্বারা কি করিব?' তখন মহাবিদ্যা একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন, 'বাছা! তুমি এই বীজ কয়েকটীকে ঐ স্থানে রোপণ কর। উহা হইতে যে গাছ উৎপন্ন হইবে উহারা রত্ন প্রসব করিবে এবং উহা দ্বারাই তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। ইহাদের পরাগকেশর বিক্রয় করিয়া তুমি যে অর্থ পাইবে উহাই তোমার জীবন-যাপন পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তোমাকে যে ক্ষেত্র দেখাইলাম, ঐ ক্ষেত্র ভিন্ন ভারতের আর কোন স্থানে উহা জন্মিবে না।' এই কথা বলিতে বলিতে ষোড়শী অন্তর্ধান হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার উপদেশানুযায়ী প্রদর্শিত স্থানে ঐ বীজ কয়েকটী রোপণ করিলেন। উহা হইতে কয়েকটী গাছ উৎপন্ন হইল। কালক্রমে উহারা পুষ্পিত হইল। ব্রাহ্মণ উহাদের ফুল হইতে পরাগকেশর সংগ্রহ করিয়া উহা শুষ্ক করিয়া রাখিলেন। উহার সৌরভে তাঁহার বাসগৃহ আমোদিত হইল। প্রতিবাসীগণ হঠাৎ ব্রাহ্মণগৃহে এরূপ সৌরভ বিস্তৃত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে স্থানীয় রাজা ও মহারাজাদের মহলে এই সংবাদ পঁহুছিল। তাঁহারা কুঙ্কুমের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া অতি উচ্চমূল্যে উহা খরিদ করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে অতি অল্প সময় মধ্যেই ব্রাহ্মণ ধনকুবের হইলেন। তাঁহার দারিদ্র্য ও চিরদুঃখ দূর হইল।

কাশ্মীরান্তর্গত পম্পুপুরের নিকটবর্ত্তী ১০০।১২৫ হাত উচ্চ এবং ২ কি ২½ ক্রোশ দীর্ঘ একটী ভূমিখণ্ডে জাফরাণের চাষ হয়। ভারতবর্ষের অন্যত্র ইহার চাষ হয় না। সম্ভবতঃ মহাবিদ্যা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যে স্থান দেখাইয়াছিলেন উহাই এই স্থান। অতি প্রাচীন সময়ে কাশ্মীর ভিন্ন অন্যত্র ইহার চাষ হইত কিনা বলা যায় না। কিন্তু পারস্য, বাহ্লীক ও আফগানিস্থানে ইহার চাষ হওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধুনা ইউরোপেও ইহার চাষ হইতেছে। কাশ্মীর হইতেই ইহার বীজ ইউরোপ নীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নানা স্থানে, ফ্রান্সে, স্পেনে, সিসিলিদ্বীপে, স্কটলণ্ডে ও জর্ম্মণীতে অধুনা ইহার চাষ হইতেছে। ভূমধ্য সাগরের নিকটবর্ত্তী বহুস্থানে অধুনা ইহার চাষ হইতেছে। ইহা কথিত হয় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপবাসী জনৈক ভ্রমণকারী কর্ত্তৃক কুঙ্কুমবীজ কাশ্মীর হইতে ইংলণ্ডে নীত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নানা স্থানে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড হইতেই ইহার বীজ ইউরোপের নানা স্থানে নীত হয়। ক্রমে ইহার চাষ ইউরোপের নানা স্থানে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ইউরোপজাত কুঙ্কুম গুণে কাশ্মীর, পারস্য ও বাহ্লীকজাত কুঙ্কুমাপেক্ষা নিকৃষ্ট। অধিকন্তু ইউরোপজাত কুঙ্কুমের সহিত প্রাণীর বসা ও অন্যান্য নানা পদার্থ মিশ্রিত করিয়া উহার ওজন বৃদ্ধি করা হয় বলিয়া উহা খাদ্যদ্রব্যে ও ঔষধে ব্যবহারের অযোগ্য হয়। এইজন্য বিদেশজাত কুঙ্কুম ব্যবহার করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। ইহাতে নানাবিধ জন্তুর বসা মিশ্রিত থাকায় হিন্দু বা মুসলমান কর্ত্তৃক ইহা ব্যবহার হইবার অযোগ্য। ঔষধে ইহা ব্যবহার করিলে ঐ ঔষধ ফলপ্রদ হয় না।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই খাদ্যদ্রব্যের বর্ণ সুন্দর ও সুগন্ধ করার জন্য ইহার ব্যবহার হইতেছে। মুসলমানগণই ইহা ব্যবহার করিতে বিশেষ অভ্যস্ত। মুসলমান রাজত্বকালে, কাশ্মীর জাত কুঙ্কুম বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিত না। কাশ্মীরজাত সমস্ত কুঙ্কুম কেবল সম্রাট-পরিবারের ব্যবহারেই লাগিত। কুঙ্কুমের ফসল সংগ্রহের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই উহা রক্ষা করার জন্য সরকারী কোন প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হইতেন। সরকারের তত্ত্বাবধানেই কাশ্মীরে ইহার চাষ হইত। কদাচিৎ অন্য লোকে ইহা পাইতে সক্ষম হইত। কুঙ্কুম যে সম্রাটদের অতি প্রিয় দ্রব্য ছিল তাহা প্রমাণ করার জন্য আমি নিম্নে একটী কিংবদন্তির উল্লেখ করিতেছি।

দিল্লির অধীশ্বর কোন এক সম্রাটের সময়, কিঙ্কর সেন নামে তাঁহার একজন মোসাহেব ছিলেন। ইনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন। ইহাকে সম্রাট অতিশয় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি সম্রাটের অভীপ্সিত কোন একটী অসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লক্ষ বিঘা ভূমি জায়গীর দিয়াছিলেন। জায়গীর দানের সনদে লেখা ছিল, কিঙ্কর সেন ভারত সাম্রাজ্যের যে কোন স্থান হইতে, নিজ ইচ্ছাধীন একলক্ষ বিঘা ভূমি গ্রহণ করিতে পারিবেন। সম্রাট এই সনদ খানি স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া জনৈক প্রধান মুসলমান অমাত্য দ্বারা কিঙ্কর সেনের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অমাত্যকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ঐ সনদে কেহ একটী অক্ষর সংযোগ বা বিয়োগ করিলে জালের অপরাধে তাহার হস্তচ্ছেদন দণ্ড হইবে। কিঙ্কর সেনকে সম্রাট বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া কিঙ্কর অন্যান্য কার্য্যকারকদের, বিশেষতঃ মুসলমান কার্য্যকারকদের চক্ষুশূল হইয়াছিলেন। বাদসাহের দরবারে তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে অপদস্থ করার জন্য সর্ব্বদাই বিশেষ চেষ্টাবান ছিলেন। সকল কার্য্যকারকই কিঙ্করকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন। সুযোগ পাইলে কিঙ্কর সেনকে জব্দ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এবার তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথ পরিষ্কার হইল। যে অমাত্য কিঙ্কর সেনকে সনদ দিতে গিয়াছিলেন, তিনি মুসলমান। তিনি কিঙ্কর সেনের হস্তে সনদ খানি দিয়া ঐ স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিঙ্কর সনদখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া উহার শেষভাগে "বেগরতক্ত জাফরাণ" এই কয়েকটী কথা সংযোগ করিলেন। সনদবাহক অমাত্য ভাবিলেন, এইবারেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এইবারেই কিঙ্করকে বাদসাহের কার্য্য হইতে অবসর করাইবার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। তখন তিনি তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়া দিল্লিতে পঁহুছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া সম্রাটকে বলিলেন, 'খোদাবন্দ! কিঙ্কর সেন সনদ জাল করিয়াছে।' সম্রাট্ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোমরা উহাকে এখনই ধৃত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর।' সম্রাটের আদেশ মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রতিপালিত হইল। কিঙ্কর সম্রাট্ দরবারে বন্দীস্বরূপ আনীত হইলেন। সম্রাট্ বলিলেন, 'তুমি আমার স্বাক্ষরিত সনদ জাল করিয়াছ ?' সে বলিল, 'না, বন্দে নেওয়াজ! আমি সনদ জাল করি নাই। যাহা করিয়াছি তাহা হুজুরের হিতের জন্যই করিয়াছি, সে কথা পরে বুঝাইয়া দিব। এইক্ষণ আমার একটী প্রার্থনা। হুজুর আমাকে যে একলক্ষ বিঘা ভূমি জায়গীর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন আমি উহা চাই। আমি আশা করি হুজুরের হুকুম নড়িবেনা।' সম্রাট্ বলিলেন, 'নিশ্চয়ই নয়, তুমি সনদ জাল না করিয়া থাকিলে, তুমি তাহা পাইবে। আমার হুকুম কখনই নড়িবে না।' কিঙ্কর বলিলেন, 'হুজুরের স্বাক্ষরিত সনেদ সর্ত্ত আছে যে, ভারত সাম্রাজ্যের যে কোন স্থান হইতে নিজ ইচ্ছামত আমি একলক্ষ বিঘা ভূমি গ্রহণ করিতে পারিব।' সম্রাট বলিলেন, 'হ্যাঁ!' কিঙ্কর বলিলেন, 'আমি দিল্লির তক্ত যেস্থানে অবস্থিত আছে উহা, উহার তলস্থ ভূমি ও রাজপ্রাসাদ সহ পাইতে ইচ্ছা করি। তদ্ভিন্ন কাশ্মীরের বিস্তৃত জাফরান ক্ষেত্রও আমি চাহিতেছি। এই দুই স্থানের ভূমি বাদে যাহা বাকী থাকিবে তাহা আমি অন্য স্থান হইতে লইব।' সম্রাট বলিলেন, 'আমি দিল্লির তক্ত ও জাফরাণ ক্ষেত্র কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।' কিঙ্কর বলিলেন, 'তাহা হইলে হুজুরের বাক্য ঠিক থাকে কৈ ?' সম্রাট বলিলেন, 'এই দুই স্থান ভিন্ন, অন্যত্র হইতে তোমার প্রাপ্য ভূমি গ্রহণ কর।' কিঙ্কর বলিলেন, 'হুজুর যে এই দুই স্থান ত্যাগ করিতে পারিবেন না তাহা আমি পূর্ব্বেই জানি এবং সেই জন্যই সনদ খানিতে কয়েকটী কথা সংযোগ করিয়াছি।' এই বলিয়া কিঙ্কর ঐ সনদখানি সম্রাটের হাতে দিয়া বলিলেন, 'হুজুর উহা পাঠ করিয়া দেখুন, আমি উহা জাল করি নাই। হুজুরের হিতার্থেই উহার শেষ ভাগে "বেগর তক্ত জাফরাণ" এই কয়েকটী কথা সংযোগ করিয়া দিল্লির তক্ত ও জাফরাণ-ক্ষেত্র বাদ রাখিয়াছি।' উর্দ্দু ভাষায় "বেগর" শব্দের অর্থ বিনা (except) বা ছাড়া এবং "তক্ত" শব্দের অর্থ সিংহাসন।

কিঙ্কর এই কয়েকটী কথা সনদে সংযোগ করিয়া সম্রাটের দুইটী অতি প্রিয় স্থান ত্যাগ করায় তিনি তৎপ্রতি আরও বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া তাহাকে আরও লক্ষ বিঘা ভূমি জায়গীর দিলেন। এই জনপ্রবাদ দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, জাফরাণ সম্রাটদের বড় প্রিয় দ্রব্য ছিল।

কুঙ্কুম যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণাদি দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। দেবীপুরাণের নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইতেছে।—

"কুঙ্কুমেন সমারম্ভে
চন্দনেন বিলেপিতে।"

তদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মজামল তন্ত্রেও ইহার উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। দেহ সুগন্ধ করার জন্য পূর্ব্বে কুঙ্কুম গুলিয়া চন্দনের ন্যায় ব্যবহার করা হইত। আয়ুর্ব্বেদের ভূরি ভূরি স্থানে ইহার উল্লেখ আছে।

জাফরাণ গাছের সকল ফুলেই স্ত্রী (Pistil) ও পুং ইন্দ্রিয় (Stamen) বিদ্যমান থাকে না। যে ফুলে এই উভয় ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে উহাকে দ্বিলিঙ্গপুষ্প (Hermaphrodite flower) কহে। অধিকাংশ গাছের ফুলেই এই উভয় লিঙ্গ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাল, পেঁপে ও জাফরাণ প্রভৃতি গাছের পুষ্পে কখন কখন উহার অভাব দৃষ্টিগোচর হয়। জাফরাণের কোন কোন গাছ বন্ধ্যা হয়। কোন কোন গাছের ফুলে কেবল পুং ইন্দ্রিয়ই বিদ্যমান থাকে, উহারা গর্ভ ধারণ করে না। জাফরাণ গাছ দ্বিবিধ, ক্ষেত্রিয় ও আরণ্য। আরণ্য (Crocus Sativus Cast Wrightiana ?) ও ক্ষেত্রিয় Crocus Sativus) জাতির গাছে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু আরণ্য জাতির পরাগসঙ্গম ভিন্ন ক্ষেত্রিয় (আবাদী) জাতি গর্ভধারণ করে না। সুতরাং একত্রে বা নৈকট্যভাবে এই উভয় জাতিরই চাষ করিতে হয়। তাহা অসম্ভব হইলে স্ত্রীজাতীয় কুঙ্কুম গাছের অনতিদূরে পুংজাতীয় গাছের চাষ করিতে হয়। আরণ্য জাতিই পুংজাতি এবং ক্ষেত্রিয় বা আবাদী জাতিই স্ত্রীজাতি। ইহাদের পুংজাতির পুষ্প-পরাগ বায়ু ও কীট-পতঙ্গাদি দ্বারা স্ত্রীজাতির পরাগের সহিত সংযুক্ত হইলেই উহাদের গর্ভাধান কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহা হইলেই শেষোক্ত জাতি গর্ভধারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়া দ্বারা পরাগ-সঙ্গম না হইলে, ইহার চাষ সুফল লাভ করা যায় না। কৃত্রিম উপায়েও পরাগ সঙ্গম করাইয়া ইহার ফুলের গর্ভাধান (fertilisation) কার্য্য সাধিত হইতে পারে। উহা ব্যয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার বটে। আজকাল স্ত্রী ও পুং জাতির চাষ একত্রে বা ভিন্নরূপেই করা হয়। একক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির ও নিকটবর্ত্তি অপর ক্ষেত্রে পুংজাতির চাষ করাই সুবিধা-জনক। কুঙ্কুমের চাষের গূঢ় রহস্য উপরে বর্ণিত হইল। এইক্ষণ ইহার চাষ সম্বন্ধে আরও ২ | ১টী কথা বলিবার আছে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কুঙ্কুমের চাষ হয়। কাশ্মীর, পারস্য ও বাহ্লীক দেশের নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী স্থান ভিন্ন অন্যত্র ইহার চাষ হয় না। এই গূঢ় রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। সম্ভবতঃ মৃত্তিকার গুণের তারতম্যের উপরেই ইহার মূল-ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে। যে ভূমি পীতাভ, প্রস্তর কঙ্কর মিশ্রিত ও কঠিন উহাতেই কুঙ্কুমের চাষ হয়। সাধারণ পার্ব্বত্য ভূমির উচ্চতাপেক্ষা জাফরাণক্ষেত্র আরও অধিক উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। যাহাতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইতে না পারে এবং বৎসরে অন্ততঃ একবার ঐ ভূমি তুষার দ্বারা বিধৌত হয়, এরূপ স্থানই কুঙ্কুম চাষের উপযোগী। এরূপ স্থান কাশ্মীর, পারস্য ও বাহ্লীকদেশে অনেক আছে। তথাপি সকল স্থানে ইহার চাষ হয় না। সুতরাং ভূমির ও জলবায়ুর উপরেই যে ইহার চাষ অনেকটা নির্ভর করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোকে বলে "হাত্‌কে রাং, হাত্‌কে সোণা" অর্থাৎ একই ভূমির এক অংশের এক হস্ত পরিমাণ স্থানে রাং ও অপর অংশের এক হস্ত পরিমাণ স্থানে সোণা উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, স্থলবিশেষে বা কারণাধীনে, একই ভূমির নানা অংশ ভিন্ন ২ গুণসম্পন্ন হইতে পারে। কাশ্মীরের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন, অন্যত্র ইহার চাষ কেন হইতে পারে না তৎসম্বন্ধে কাশ্মীরবাসীর অভিমত এই।—তাহারা বলে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের কুঙ্কুম-ক্ষেত্র

জগদীশ্বরের লীলাক্ষেত্র বিশেষ। সুতরাং ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্যত্র ইহার চাষ হইতে পারে না।

কুঙ্কুমক্ষেত্রকে ৬ ফুট বিস্তৃত, সমচতুষ্কোণাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া, উহাতে আলি বা সারি (row) করিয়া কুঙ্কুম-মূল রোপণ করিতে হয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য মাঝে ২ হইতে ৩ ফুট পরিসর পথ রাখিতে হয়। প্রতি বৎসর কুঙ্কুম-মূল রোপণের আবশ্যক হয় না। এক বৎসরের উপ্ত মূল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। উহা কখন কখন ১৫।২০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং প্রতিবৎসর উহারা কুঙ্কুম প্রদান করিয়া থাকে। পরে উহার গাছ অকর্ম্মণ্য হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু উহার পুরাতন মূল হইতে নূতন গাছ বহির্গত হইয়া মৃত গাছের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। উহারাই ইহাদের ভাবী বংশ-ধররূপে দাঁড়াইয়া পুনরায় কুঙ্কুম প্রদান করিয়া থাকে। কাজেই প্রতিবর্ষে ইহার মূল রোপণ করিবার আবশ্যক প্রায় হয় না। কোন্ সময়ে সর্ব্বাদৌ কুঙ্কুম বীজ কাশ্মীরে উপ্ত হইয়াছিল ইহা স্থির করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে যে মূল বা বীজ উপ্ত হইয়াছিল উহা ইহাতেই বংশপরম্পরাক্রমে নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। কুঙ্কুমের জমি হালদ্বারা কর্ষণের আবশ্যক হয় না। উহাতে সার দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতি দেবী প্রথম সময়ে ঐ ভূমিকে যে উপাদানে গঠিত করিয়াছেন, উহারাই অদ্য পর্য্যন্তও কার্য্য করিতেছে। তিনি কুঙ্কুম-ক্ষেত্রে অক্ষয় সারভাণ্ডার সঞ্চিত রাখিয়াছেন। সুতরাং উহাতে আর কোন সার দেওয়ার আদপে প্রয়োজনই হয় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মাঝে মাঝে কুঙ্কুম ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উস্কাইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার আর অন্য পাইট নাই। বর্ষাকালে কুঙ্কুম ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইতে না পারে এইজন্য উহাতে আবশ্যক-মত পয়নির্গমন পথ রাখিতে হয়। যে চৌকায় কুঙ্কুম মূল রোপণ করিবে উহার চতুর্দ্দিক ঢালু হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কুঙ্কুম-মূল বা বীজ প্রতি বৎসর রোপণ করিতে হয় না এবং প্রকৃতি-উপ্ত মূল হইতেই ইহার বংশবিস্তার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি তাহাই হয়, তবে ইহার নূতন চাষের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমি বলিব, ইহার চাষের বিস্তৃতি প্রসার জন্য কখন কখন নূতন ভূমিতেও ইহার চাষ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন একই ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ইহার চাষ না করিয়া সময় সময় ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার চাষ করিলে ফলন অধিক হয়। এইজন্যই নূতন ক্ষেত্রে ইহার চাষ করিবার আবশ্যক হয়। একবার উপ্ত মূল হইতে ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে ক্রমেই ফসল কম হইতে থাকে। গ্রীষ্মঋতুতে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে আলি বা সারি করিয়া, ৯ ইঞ্চি হইতে একফুট দূরে দূরে মূল রোপণ করিতে হয়। ১১ হইতে দুই ইঞ্চি মৃত্তিকার অধিক নীচে ইহার মূল রোপণ করিবে না। ভাসা রোপণই ইহার চাষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ইহার মূল রসুনের ন্যায়। উহা হইতেই কোরকসহ একটী পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয়। উহার অগ্রভাগেই পুষ্পকোরক অবস্থিত থাকে। ইহা বিকশিত হইলেই উহা হইতে কুঙ্কুম প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী মূল হইতে ক্রমে চারিটীর অধিক পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয় না। কাজেই একটী গাছ হইতে চারিটীর অধিক ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার গাছ ভূমির ৮।৯ ইঞ্চি উপরে উঠিয়া থাকে। পুষ্পদণ্ড প্রায় ১ ফুট উচ্চ হয়। কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভেই কুঙ্কুম পুষ্প বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। তিন সপ্তাহের মধ্যেই পুষ্পধারণ কার্য্য শেষ হয়। বৎসরে একবারের অধিক হয় না। ইহার মূল হইতে প্রথম যে পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয় উহার পুষ্প বিকশিত হওয়া মাত্রই উহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। উহাকে কর্ত্তন করার ৪।৫ দিন পরেই, উহার মূল হইতে পুনরায় আর একটী পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয়, উহার ফুল সংগ্রহ করিবার পরে ঐ মূল হইতে এইরূপে আর একটী ফুল উৎপন্ন হয়। এইরূপে অল্প সময় মধ্যেই প্রত্যেক মূল হইতে ক্রমে চারিটি ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুঙ্কুম পুষ্প বিকশিত হইলে উহা পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া থাকে। নিশি-সঞ্চিত শিশিরবিন্দু ইহাদের পুষ্পের গাত্রে সংলগ্ন থাকায় অরুণোদয়কালে ইহারা যে শোভা ধারণ করে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। আবার ইহাদের দেবারাধ্য সুরভি বা পরিমল, বায়ু-

তাড়নায় ইতস্ততঃ বিসৃত হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে তাহা অনুভব করা ধারণা-শক্তির অতীত।

ইহার পুষ্প বিকশিত হইতে আরম্ভ হইলেই কৃষকগণ ক্ষেত্রে পাহাড়াদিতে আরম্ভ করে, প্রাতঃকালে ইহার ফুল প্রস্ফুটিত হয়। প্রাভাতিক মরুত-হিল্লোল ইহার পুষ্পবিকাশ কার্য্যের প্রধান সহায়। প্রভাত-সমীরণ-প্রবাহ পুষ্পে পুষ্পে সংলগ্ন হইয়াই ইহার পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে। নিশাপতি যেরূপ কুমুদিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী প্রভাত-সমীরণও সেইরূপ কুঙ্কুমফুলের প্রণয়-পিপাসু। প্রাভাতিক সমীরণের অভাবে কুঙ্কুমপুষ্প পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না। শিশিরসম্পাতও ইহার প্রস্ফোটন কার্য্যের সহায়।

একসঙ্গে ইহাদের সমস্ত ফসল সংগ্রহ করা অসম্ভব, কেন না একই সময়ে ইহাদের সকল পুষ্প উদ্গত ও প্রস্ফুটিত হয় না। সেইজন্য যখন যে ফুলটী ফুটিবে তখনই উহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। ফুলটীকে তুলিয়া হস্তদ্বারা ঝারিলেই, পুষ্পদল সকল পৃথক হইয়া পতিত হয়। কিন্তু লোহিত ও পীত কেশরু সকল পুষ্পকোষের সহিতই সংলগ্ন থাকে। লোহিত বর্ণের কেশরই প্রকৃত জাফরাণ। ইহাকে জলে ভিজাইয়া ঐ জলদ্বারা পীতবর্ণের কেশরকে রঙ্গাইয়া উহাকে ভেজাল করা হয়। প্রকৃত ও ভেজাল কুঙ্কুমের পরীক্ষা করিতে হইলে একটী জলপূর্ণ পাত্রে উভয়কে নিক্ষেপ করিতে হয়। তাহা হইলে প্রকৃত কেশরগুলি জলে ডুবিয়া যায় ও অপ্রকৃত কেশরগুলি উপরে ভাসিয়া থাকে। উহাদিগকে পরে পাত্র হইতে উঠাইয়া আতপ-তাপে পৃথকরূপে উভয়কে শুষ্ক করিতে হয়। এই উপায়ে খাঁটী ও কৃত্রিম কুঙ্কুমকে পৃথক করা হয়। সংগৃহীত কুঙ্কুমকে চুষ কাগজের (Blotting) উপরে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়া, তদুপরি কাগজ বা কাপড় ঢাকা দিয়া তাহার উপরে কাষ্ঠের বা কাগজের ফলকের (pasteboard) চাপা দিয়া রাখিতে হয়। তাহার উপরে গুরু বা ভারীবস্তু স্থাপন করিতে হয়, তৎপর ২ | ৩ ঘণ্টা তীব্র সূর্য্যোত্তাপ ও তৎপর ১৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা মৃদু সূর্য্যোত্তাপ প্রদান করিতে হয়। তাহা হইলেই উহা চটা বাঁধিয়া যায়। তৎপর উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পিষ্টকাকার করিতে হয়। এই আকারেই ইহা বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আমি ৪ | ৫ বৎসর হইল ১২টী জাফ্রান-মূল, কাশ্মীর হইতে আনাইয়াছিলাম। আমি ডাকযোগে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ১২টী মূল আনাইতে আমার প্রায় ১২৲ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। ১২টী মূল মধ্যে মাত্র তিনটী বাঁচিয়াছিল। অবশিষ্ট ৯টীই পচিয়া গিয়াছিল। আশ্বিন মাসে আমি উহা আনাইয়াছিলাম। এই সঙ্গে কাশ্মীরের কুঙ্কুমক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকাও আনাইয়াছিলাম। আমার বাগানের একটী স্নিগ্ধ স্থানে, উক্ত মৃত্তিকাতে এই তিনটী মূল রোপণ করিয়াছিলাম। উহা হইতে তিনটী গাছ উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার একটীতে পৌষ মাসে একটী ফুলও হইয়াছিল। কিন্তু উহা গুণে নিকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে গ্রীষ্মারম্ভেই তিনটী মূলই পচিয়া গিয়াছিল। নিম্নপ্রদেশে ইহার চাষের চেষ্টা বৃথা। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহার চাষ প্রবর্ত্তন করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ইহার চাষে বিশেষ লাভও আছে।

এক বিঘা জমিতে প্রত্যেক ৬ ফুট বা ৪ হাত অন্তর অন্তর, ৩ ফুট বা ২ হাত পরিসর পথ রাখিয়া আয়তক্ষেত্রে বিভাগ করিলে ১৬৯টী বর্গক্ষেত্র পাওয়া যাইবে। উহার প্রত্যেক বর্গক্ষেত্রে ৬ ইঞ্চি অন্তর অন্তর লাইন বা সারি করিলে, ১৩টী লাইন পাওয়া যায়। উহার প্রত্যেক লাইনে, ৯ইঞ্চি অন্তর অন্তর গাছ রোপণ করিলে, ১০টী গাছ উপ্ত হইতে পারে। তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১৩০টী গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। এই হিসাবে ১৬৯টী ক্ষেত্রে ২১৯৭০টী গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছ হইতে ৪টী ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে এক বিঘায় ২১৯৭০×৪= ৮৭৮৮০টী ফুল পাওয়া যাইবে। উহার প্রত্যেক ৪০০০ ফুল হইতে অর্দ্ধ ছটাক কুঙ্কুম পাইবে। তাহা হইলে ৮৭৮৮০ ফুল হইতে ন্যূনাধিক ১১ ছটাক খাঁটী কুঙ্কুম পাইবে। ৬৪ তোলায় সের ধরিলে, ১১ ছটাক ৪৪ তোলা কুঙ্কুম হইবে। প্রতি তোলা কুঙ্কুমের মূল্য ১০৲ :

টাকা হইলে উহার মূল্য ৪৪০৲ টাকা হইবে। এতদ্ভিন্ন প্রায় ঐ পরিমাণ নিকৃষ্ট কুঙ্কুম পাইবে। উহার মূল্য প্রতিতোলা ৩৲ টাকা ধরিলেও ১৩২৲ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। ইহার চাষের ব্যয় অতি সামান্ত। যাহা হউক চাষের ব্যয় বাবদ এই ১৩২৲ টাকা বাদ দিলেও প্রতি বিঘায় ৪৩০৲ টাকা লাভ হয়। ইহা সামান্ত লাভ নহে। যে স্থানে সুবিধামত ইহার চাষ হইতে পারে, সেই স্থানে ইহার চাষ করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

৩০। সেটাইভাস কার্টরাইটিয়ানা—Satious bart wrightiana. ইহাই সম্ভবতঃ আরণ্য পুংজাতি। ইহার ফুল পীতবর্ণ; পরাগকেশর লালবর্ণ। ইহার পরাগসহ কেত্রিয় বা আবাদী জাতির পরাগসঙ্গম হইলেই আবাদী জাতির গর্ভাধান কার্য্য সম্পন্ন হয়।

(গ ও ঘ) শীত ও বসন্তকালের উপযোগী জাতি। Winter and Spring flowering varieties.

৩১। ভার্সিকলার ভায়ওলোসিয়া—Versicolor Violacea ইহার ফুল বৃহৎ; বেগুণে বর্ণ মিশ্রিত ভায়ওলেট্ বর্ণ।

৩২। ষ্টিলেরিস্—Stellaris. ফুল কমলাবর্ণের; পাপড়ি (petal) শিয়ালী বর্ণের নিম্নপ্রদেশে ইহার চাষ হইতে পারে।

৩৩। অরিয়াস—Aureus. ইহার জন্মস্থান হোলণ্ড; ফুল স্বর্ণবর্ণ।

৩৪। অরিয়াস্ সাল্‌ফিউরিয়াস্ কন্কলর—Aureus Sulphureus Concolor. ইহার জন্মস্থানও হোলণ্ড। ইহার ফুল বৃহৎ, কোমল ও গন্ধকের ন্তায় পীতবর্ণ।

৩৫। বাইফ্লোরাস্—Biflorus. ইহার জন্মস্থান স্কটলণ্ড। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ; বাহিরের তিনটী পাপড়ি (petal) পাতলা পীতবর্ণ।

৩৬। ঐ পুসিলাস্—Biflorus Pusillus. ইহার জন্মস্থানও স্কটলণ্ড, ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ; কণ্ঠদেশ (throat) কমলাবর্ণ।

৩৭। লিউটিয়াস্—Luteus. ইহা বহু সংখ্যায় ফুল ধারণ করে। ফুল স্বর্ণবর্ণ। নিম্নপ্রদেশে চাষের উপযোগী।

৩৮। ডেল্‌মেটিকাস্ নাইভিয়াস্—Dalmaticus Niveus. Syn. Wildeni. ইহার ফুল নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ।

৩৯। ডেল্‌মেটীকাস্ ভায়ওলেসিয়াস্—Dalmaticus Violaceus. ইহার ফুল দেখিতে প্রায় পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায়; ভায়ওলেট্ বর্ণের ছায়াযুক্ত।

৪০। এলাটাভিকাস্—Alatavicus. ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ; বাহিরের পাপড়িতে কৃষ্ণবর্ণের ছায়া থাকে।

৪১। রেটিকিউলেটাস-অরিয়াস্—Reticulatus-aureus. ইহার ফুল গাঢ় পীতবর্ণ; বহির্ভাগ শিয়ালী বর্ণের দাগযুক্ত।

৪২। টোম্মাসিনিএনাস্—Tomma Sinianus. ইহার ফুল মলিন নীলবর্ণ। অতি সুন্দর জাতি।

মন্তব্য—উপরে যে ৪২ জাতির বিবরণ লিখিত হইল, উহা ভিন্ন ইহাদের আরও শতাধিক জাতি ইউরোপে দৃষ্টিগোচর হয়। বাহুল্য বিবেচনায় উহাদের বিবরণ পরিত্যক্ত হইল, উপরের লিখিত কয়েকটী জাতিই উৎকৃষ্ট।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

গিরিডির কয়লার খাদ

গিরিডিতে অনেক কয়লার খাদ আছে। বেশীর ভাগ খাদের মালিকই ই, আই, আর, রেলওয়ে কোম্পানী। এখানকার কয়লা খুব ভাল বলিয়াই জাহাজের কাজে খুব দরকারী, সে জন্য দামও বেশী।

গিরিডির সেণ্ট্রেল পিট বা কয়লার খাদই সব চেয়ে বড়। এই খাদ ৬৩৫ ফিট গভীর।

খাদের ভিতর নামিলে পাতাল পুরীরমত এক আশ্চর্য্য সহর দেখা যায়। উপরে গাছপালা মাঠপাহাড়, আর মাটীর নীচে হাজারে হাজারে লোকজন কাজ করিতেছে!

আমরা একদিন এই সেণ্ট্রেল পিট বা কয়লার খাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। খাদ সহর হইতে ২॥ মাইল দূরে। খুব ভোরেই আমরা রওনা হই। সেখানে গিয়া শুনিলাম রাত্রির কাজ সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। নীচের লোক উপরে আসিলে নূতন লোক যাইয়া কাজ সুরু করিবে, তার পর আমরা খাদে নামিতে পারিব।

খানিকক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করিতে হইল। এই অবসরে আমরা উপরের সমস্তটাই দেখিয়া লইলাম। উপরে বেশী কিছু নাই। আফিসঘর, বয়লারে জল দিবার Pump House, ইঞ্জিন ঘর, খাদের কয়লা উপরে তুলিবার মঞ্চ। দুইটী লোক সেই মঞ্চের উপর কাজ করিতেছে, আর রাশিকৃত কয়লা উঠিতেছে।

কয়লা বোঝাই করিবার ছোট ছোট গাড়ী আছে। প্রত্যেক গাড়ীতে একটন কয়লা ধরে।

মঞ্চের উপরে দুইটী প্রকাণ্ড চাকা আছে। চাকার উপর দিয়া এক জোড়া তার ইঞ্জিনের সহিত জুড়িয়া দিয়াছে। চাকার মোটরে এক তার দিয়া গাড়ীগুলি উপরে উঠে, অন্য তার দিয়া খালি গাড়ীগুলি নীচে নামিয়া যায়।

কয়লা বোঝাই হইয়া গাড়ীগুলি উপরে আসিলেই দুইজন লোক সেগুলি সামনের মঞ্চের উপর ঠেলিয়া দেয়। গাড়ীগুলি একটু দূরে গিয়াই ধাক্কা লাগিয়া এক পাশের রেলের উপর দিয়া হটিয়া আসে। সেখানে গাড়ীগুলি হুকের সঙ্গে আটকাইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি একটা চলন্ত 'হুইলের, উপর দিয়া আসিয়া এক জায়গায় উপুর হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কয়লাগুলি আর একটা চলন্ত হুইলের উপর দিয়া মালগুদামে চলিয়া আসে। সেই মালগুদামের নীচেই বড় বড় মালের গাড়ী সাজান থাকে। নীচের ফাঁক দিয়া সেই কয়লাগুলি একেবারে মালগাড়ীতে আসিয়া বোঝাই হয়।

এই একটী কলে দুইশত লোকের কাজ অক্লেশে সম্পন্ন হইতেছে।

অল্পক্ষণ পরেই খাদের নীচের লোক দলে দলে উপরে উঠিতে লাগিল। লোকগুলির ভূতের মত চেহারা, চোখে মুখে সারা গায় কয়লার গুড়া, সারারাত্রি এই লোকগুলি কাজ করিয়াছে।

নূতন আর একদল লোক আসিয়া পুনরায় খাদে ঢুকিতে লাগিল।

সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নীচে নামিয়া গেলাম। অবশ্য সেজন্য দর্শনী এক মুদ্রা দিতে হইল, বলাই বাহুল্য।

কয়লার খাদে নামিবার প্রকাণ্ড বড় ইঁদারা প্রায় ৩।৪ শত হাত গভীর, দুদিক ঢাকা দোলনা উপরের তারের সঙ্গে ঝুলান থাকে। আমরা তাহার ভিতর যাইতেই ঠং করিয়া শব্দ হয়। অমনি হড়্‌হড় শব্দে ট্রেনের মত বেগে সেই দোলনা নীচে নামিতে থাকে। প্রথম ঝাকুনিতে মনে হইল আমরা যেন পাতালে প্রবেশ করিতেছি। তার পরেই আমরা ভয়ানক অন্ধকারের ভিতর ঢুকিয়া গেলাম। আমরা উপরে উঠিতেছি, কি নীচে নামিতেছি কতক্ষণ কিছুই বোঝা গেল না। তারপর মনে হইল, যেন আমরা উপরে উঠিতেছি।

ঘড়ঘড় শব্দে কিছুক্ষণ পরেই আমাদের চলন্ত ঘর (Lift) একেবারে নীচে আসিয়া হাজির। বাহির হইয়াই দেখি, চারিদিকে বিদ্যুতের আলো, চারিদিকে অনেকগুলি সরু ও লম্বা রাস্তা তাহার দুইপাশে কয়লার

দেওয়াল। উপরের দিকটা খুদিয়া পাথরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ঠিক যেন পাথরের ছাদের নীচে কয়লার রাস্তা। তাহাতে দুই সারি রেল পাতা, সেই রাস্তা ধরিয়া আমরা অনেক দূর গেলাম।

রাস্তার একদিকে বিদ্যুতের আলোক-তার। তার পাশেই খাদের এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় কথাবার্ত্তা বলিবার টেলিফোঁ তার, রাস্তার জায়গায় জায়গায় কয়লা বোঝাই গাড়ী। একজোড়া রেলের উপর দিয়া কয়লা-বোঝাই গাড়ীগুলি খাদের মুখে যায়, অন্য জোড়া রেলের উপর দিয়া খালি গাড়ীগুলি খাদের নানা জায়গায় চলাফেরা করে।

পথের পাশের নালা দিয়া ঝির ঝির জলের ঝরণা চলিয়াছে।

সেই পথ দিয়া আমরা অনেক দূর গেলাম, কিছুদূর গিয়া দেখি উপরের ছাদ ভয়ানক নীচু, হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয়, সেখানকার উপরের কয়লার চাপ এখনও কাটা শেষ হয় নাই। পথ ক্রমেই নীচের দিকে নামিয়াছে—যেন সুরঙ্গ-পথে পাতালে নামিতেছে। কতদূর যাবার পর দেখি কয়লা কাটিয়া একটি সুন্দর কোঠা তৈয়ার করিয়াছে। দেয়ালে পুরু চুণকাম ঠিক দালানের মত মনে হয়। সেখানে টেবিল চেয়ার পাতা, একজন সহেব কয়েক জন লোকজন সহ কাজে ব্যস্ত। বুঝিলাম সেটী আফিস-ঘর। রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখিয়াছিলাম শুনিলাম ঘোড়া লইয়া সাহেবেরা খাদের নীচে আসে।

তারপর একটা নীচু রাস্তা দিয়া চলিলাম। এতক্ষণ ঠাণ্ডা লাগিতেছিল। এখন গা দিয়া টস টস ঘাম পড়িতে লাগিল। সেই রাস্তায় আমরা ক্রমাগত নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম।

এক মাইলের পর আমরা প্রকাণ্ড একটা হলঘরে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে প্রকাণ্ড বড় কয়লার স্তূপ। কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ গাড়ীতে কয়লা বোঝাই করিতেছে। শুনিলাম ১০ জন লোকে সারা রাত্রিতে ৩২ গাড়ী কয়লা বোঝাই করিয়াছে। কাজ হিসাবে লোকেরা মজুরী পায়। এক এক গাড়ী কয়লা বোঝাই হইলে ৵১০ পয়সা মজুরী পায়। দৈনিক ।৶ | ॥০ আনার বেশী মজুরী বড় কেহ পায় না। কিন্তু কি অবিশ্রান্ত খাটুনী!

খাদের কোন কোন জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বালে নাই। সেখানে কি ভয়ানক অন্ধকার! আমাদের সঙ্গী কুলী-সর্দ্দারের হাতে রেড়ির তেলের বাতি ছিল। সেই অন্ধকারের ভিতর বাতি হাতে আরো অনেক লোকজন চলাফেরা করিতেছে।

খাদের মুখ দিয়া জায়গায় জায়গায় একটু জোরে জোরে হাওয়া আসে, বেশ টের পাওয়া যায়। উপরের হাওয়া যাহাতে খাদের সকল জায়গায় পাওয়া যায়, সেজন্য কোন কোন রাস্তায় দরজা আঁটিয়া হাওয়ার গতি আশপাশের রাস্তায় ঘুরাইয়া দিয়াছে।

কতদূর গিয়া আমরা বৈদ্যুতিক আলো-ঘরে পৌছিলাম। এখান হইতে খাদের সকল জায়গায় আলোর তার গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাস্তার পাশের নালায় ঝির ঝির জলের স্রোত, কিছুদূর গিয়া দেখি, ঝর ঝর শব্দে খুব জোরে নদীর স্রোত চলিয়াছে। একটা বড় গর্ত্তে আসিয়া সেই জল জড় হইতেছে। তার পাশেই বৈদ্যুতিক Pump House সেই Pump কলে খাদের নীচের সমস্ত জল উপরে তুলিয়া ফেলে।

এই Pump এ নীচের জল উপরে তুলিয়া না ফেলিলে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত খাদ জলে ভরিয়া উঠিত।

বৈদ্যুতিক Pump House এর সুরম্য ইঞ্জিন-ঘরটি দেখিলে মনে হয় না আমরা ৫০০ | ৬০০ হাত মাটীর নীচে আছি। সেখানে লোকজনের কাজকর্ম্ম চলাফেরা দেখিলে মনে হয় বুঝি এক নূতন জগতে আসিয়াছি। দিনের আলো, সবুজ গাছপালা, পাখীর সুমিষ্ট স্বর, উন্মুক্ত আকাশ, প্রাকৃতিক ঝড়মেঘের বিচিত্র শোভা, কিছুরই খবর তাহারা পায় না। সব যেন চাপা চাপা। চারিদিকে কয়লার দেয়াল, সরু রাস্তা আর পাতাল-পুরীর অন্ধকার, এই যেন সেখানকার সম্বল। ইহাতেও লোকজনেরা হাসে, গল্পগুজব করে, কাজে গাফিলী নাই। এই ভাবে তাহাদের দিন কাটে।

শুনিলাম ডিনামাইট পুরিয়া কয়লার খাদের কোন কোন জায়গা উড়াইয়া দেয়, তারপর সেই কয়লা সরাইয়া আস্তে আস্তে রাস্তা তৈরী হয়।

ছোট ছোট কোদাল দিয়া উপরের নীচের ও পাশের দেয়ালের কয়লাগুলি কাটিয়া সমান করিয়া দেয়।

আমরা পাতালপুরীর রাস্তা ছাড়াইয়া একটা বাঁক ফিরিয়া একটা সরু রাস্তা দিয়া পুনরায় উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম।

শুনিলাম আমরা যে ১নং কয়লার খাদে নামিয়াছিলাম তাহা ছাড়াইয়া ২নং কয়লার খাদে ঢুকিয়াছি।

দলে দলে লোক আসিয়া কাজে লাগিতেছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ কয়লার ঝুড়ি মাথায় করিয়া গাড়ী বোঝাই করিতেছে। কুলী-সর্দ্দারেরা কাজ দেখাইয়া দিতেছে।

পাশেই আফিস-ঘরে সাহেব ও কেরাণীর দল কাজে ব্যস্ত।

চলিতে চলিতে আমরা ২নং খাদের মুখে আসিলাম। ঠং করিয়া শব্দ হইতেই Lift নামিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক জন নামিল।

আমরা তাড়াতাড়ি সেই Lift এ গিয়া বসিলাম। অমনি হড় হড় শব্দে সেই Lift উপরে উঠিতে লাগিল। ভয়ানক অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। মনে হইল যেন আমরা আবার নীচে নামিতেছি।

খাদের মুখের কাছে আসিলে অল্প অল্প আলো দেখা গেল। হড় হড় শব্দে Lift উপরে উঠিতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা একেবারে খাদের উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

১নং খাদের মুখে আমরা ঢুকিয়াছিলাম। ২নং খাদের মুখ দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম।

১নং ও ২নং খাদে প্রায় ৮০০ হাত ব্যবধান। খাদের নীচে এক ঘণ্টায় আমরা প্রায় ২॥ মাইল রাস্তা ঘুরিয়া আসিলাম।

শুনিলাম, ১নং খাদে ৬০০ লোক কাজ করে। আর ২নং খাদে ১০০০ লোক কাজ করে।

৩৬ বছর যাবৎ এই কয়লার খাদের কাজ সুরু হইয়াছে। এখনও কয়লা কাটা চলিতেছে। ৩৬ বছরে ৪০০ হাত মাটীর নীচে অবিশ্রান্ত কয়লা তুলিয়া কতখানি জায়গা ফাঁকা হইয়াছে সহজেই বোঝা যায়। আরো কত বছর কাজ চলিবে কে জানে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

ময়ূরী

ওগো রূপগরবিনি, ভোগায়ত ললিতশরীরা,
ধনীবধূ সম তোমা মাতায়েছে দম্ভের মদিরা।
তারিমত অঙ্গে তব নানাবর্ণে দামী পেশোয়াজ,
স্বর্ণ অলঙ্কার আর হীরা মোতি জড়োয়ার সাজ।
তারি ভূষা সম, কণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ধরে,
দুলে কদম্বের শাখা গরবিণী তব পদ ভরে।
বেশভূষা রূপ জ্যোতি বিচ্ছুরিয়া সবার নয়নে,
বিস্তারি' রঞ্জিত পাখা নৃত্য করি ঘুরো বনে বনে।
রুক্ষকণ্ঠা কণ্ঠ তব নীলবর্ণ কালকূটে ভরা,
তোমার অপ্রিয় বাণী মুগ্ধ কভু করে নাক ধরা।
রূপের লাগিয়া তুমি আলো কর প্রদর্শনী গেহ,
মুখরা ভামিনী বামা লভনিক অন্তরের স্নেহ।
কাঙালের কালবধূ কোকিলা সে আভরণ হীনা,
নাহি রূপ নাহি গর্ব্ব লাজে রহে পত্রপুঞ্জে লীনা।
মাধুর্য্যে সে তুষ্ট করে কাননের সর্ব্ব পরিজনে,
নারীত্বের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লভে সেই নিখিলের মনে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সমশের গাজীর পুঁথি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২

গাজীর ক্রীড়াপুত্তলি মহারাজা লক্ষণ মাণিক্য অকালে কাল কবলিত হন।

"মনে ২ দহি দহি তিনটী বৎসর
অকালে কালের স্রোতে হইল লোকান্তর।"

লক্ষণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর গাজী রোশনাবাদের খাজানা নিজের লোক দ্বারা ঢাকার নবাবের নিকট পাঠাইতে লাগিল। এই উপলক্ষে ঢাকার নবাব মুর্শিদাবাদ এবং মুর্শিদাবাদের নবাব দিল্লীর সম্রাটকে

"ভাটিদেশ করিয়াছে গাজী অধিকার।"

এই সংবাদ জানাইয়া গাজীকে রোশনাবাদের "সুবাদারী সনদ" আনাইয়া দিল। গাজী রোশনাবাদের জমিদারী সনদ প্রাপ্ত হইয়া নানাস্থান হইতে হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া অতি সুবন্দোবস্তের সহিত জমিদারী শাসন করিতে লাগিল।

গাজীর কর্ম্মচারী নিয়োগ ও শাসন-সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমরা এইস্থলে মূল গ্রন্থের কতক অংশ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই স্থানের সুন্দর ইতিহাস টুকু মূলে যত ভাল লাগিবে অন্য প্রকারে তাহা হইবার আশা নাই।

"এথা মহানন্দে গাজী করেছে শাসন।
নাহি অত্যাচার কিছু তর্জ্জন গর্জ্জন॥
নানাস্থানে কর্ম্মচারী করি নিয়োজন।
খাজানা আদায় করে হরষিত মন॥
হাফেজ দেওয়ান আর আনিছ তিন ভাই।
মালের দেওয়ান ছিল তোমারে জানাই॥
দক্ষিণ মন্দিরা (১) ঘরবাড়ী তার।
কাড়াজোড়া সঙ্গে চলে ছোটা বরদার॥
আবদুল রজ্জাকের ঘর ছাগলনাইয়া মৌজা।
ত্রিপুরা (তিপ্রা) সকলে করে দেব তুল্য পূজা॥
ছনাউল্লা তার পুত্র লড়ায়ে প্রধান।
ফৌজের উপরে তারে করিল দেওয়ান॥
আবদুল বাকি দেওয়ান হল সর্ব্বকামে।
তার ঘর হল উত্তর মধু গ্রামে॥
আবদুল্লা আদায় করে পাহাড় খাজানা।
পুরায় সকলে মিলি গাজীর বাসনা॥
হরিহর দেওয়ান বাড়ী করিল খণ্ডলে। (১)
নায়েব দেওয়ান তারে সকলেতে বলে॥
দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ বসে ধর্ম্ম পুরে। (২)
প্রবীণ দেওয়ান বলি সকলে আদরে॥
আর ছিল কতজন দেওয়ান বেহিন্।
একজায় তের দেওয়ান গাজীর অধীন॥
ডোমন দেওয়ান ঘর ছিল বল্লভপুরে। (৩)
সদর দেওয়ান তিনি নবাব হুজুরে॥
আর আর কর্ম্মচারী বক্সী লস্কর।
তাহির উকীল আর আনিচ সরকার॥
হাফেজ আমীন দুই মাল জমাদার।
এই পঞ্চজন ছিল উত্তর পানুয়ার॥ (৪)
কাশীপুর বাসী ছিল এয়াজ নেয়াজ।
খেদমতে গাজীর ছিল আর যে খেগাজ॥
নিজ পানুয়াতে ছিল মনাগাজী চৌধুরী।
সদাগর নাছিম আর ভিখন মোহরী॥
নাছির মাহাম্মদ আর মোহরী চিকন।
নিজ পানুয়াতে ছিল এই পঞ্চজন॥
গোলাম আলী ও নছরত সরকার।
সাদ্দা মাহাম্মদ আর উর্দ্ধভ লস্কর॥
ভ্রাতুপুত্র চন্দ্রমুদী এই পঞ্চ নর।
পশ্চিম ছাগলনাইয়া ইহাদের ঘর॥

(১) দক্ষিণ মন্দিরা, ছাগলনাইয়া, মধুগ্রাম এগুলি দক্ষিণ শিক মধ্যে বর্ত্তমান।

(১) খণ্ডল পরগণা মধ্যে হরিহর দেওয়ানের নামে "হরিহরপুর" নামক একটী গ্রাম আছে। (২) ধর্ম্মপুর—(খণ্ডল)। (৩) বল্লভপুর—(দক্ষিণ শিক) এই গ্রামে গাজীর প্রথম বাড়ী ছিল। (৪) পানুয়া, কাশীপুর প্রভৃতি দক্ষিণ শিক। পানুয়া গ্রামটী মুহুরী নদীর তীরবর্ত্তী। পানুয়া ঘাটের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বাঁশপাড়ায় (১) খোয়াজ ছিল একজন।
খাজানা উশুল করি পাঠায় তখন॥
নাঙ্গলমোড়া (২) নাছির বাউয়া (৩) তার নাম॥
ফেণী গঙ্গা করে জেবা বাশ বিক্রিকাম॥
জয়পুরে (৪) ছিল হিন্দু মন্নু সরকার।
কাণুরাম লস্কর ফরজন্দ (৫) যাহার॥
জগন্নাথ সোনাপুরে (৬) শেক মনোহর।
মহাম্মদজান দারোগা সন্তান যাহার॥
গাজীর ফুফারা ভাই ছবির সমির।
মহাম্মদ রফি নবি এচারি সুধীর॥
আর যত কারকের (৭) অন্ত নাহি পাই।
বহুত কারক তার ছিল ঠাই ঠাই॥
কর্ম্মচারী ফর্দ্দ দেখি করিলে সুমার।
হাজার আশী জন ছিল কারক তাহার"॥

গাজীর তহশীল কাছারী সমুহে নিম্নলিখিত তহশীলদারগণ নিযুক্ত ছিল। খণ্ডলের তহশীল কাছারীতে বল্লীলস্কর ও তাহার পুত্র রফিজান; জগন্তপুরে (৮) গঙ্গাগোবিন্দ, তিসনা (তিস্বা) মোকামে আনিছ সরকার, চৌদ্দগ্রামে হরিহর, বগাসাইরে আমীর দেওয়ান, খাজানগর এবং বড় ছোট আমিরাবাদ রফি ও নবি; মেহারকুল, পাইটকারা, বলদাখাল (বরদাখ্যাত) কাদবা প্রভৃতিতে সেক মনোহর, নুর্ণগর ও গঙ্গামণ্ডলে আবদুল বাকী, বিশালগড়, আস্তজঙ্গলে ছনাউল্লা, সরহিলে ছবির ও সমির, ছিলেটে ও ভাটীদেশে শ্রীচাঁদ ঠাকুর তহশীলদার ছিলেন।

আর আর কর্ম্মচারী ছিল ঠাই ঠাই।
এক এক কাছারীতে শতেক ছিফাই॥
তহশীলদার সঙ্গে যুগল মোহরী।
হেনমতে রাজ্য করি গাজী অধিকারী॥

আমরা সমালোচ্য গ্রন্থে গাজীর জন্ম তারিখ পাইতেছি না, কিন্তু মৃত্যুর সময়টা পাইতেছি। লিখিত আছে, গাজী ৪০ বৎসর বয়ক্রমকালে ছাদুর ভগ্নীকে বিবাহ করেন; এবং সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে আরো দুইটী বিবাহ করেন। শেষোক্ত দুই স্ত্রীর গর্ভে চারি কন্যা ও এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে পর, ১১৫৯ সালে গাজী মুর্শিদাবাদ গমন করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। * দেখা যাইতেছে ১১৫৯—৪০=১১১৯ সাল এবং বিবাহের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুমান ১০ | ১৫ বৎসর বাদ দিলে, ১১০৪ সনে গাজীর জন্ম তারিখ বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাওয়া যায়। অতএব ১১০৪ হইতে ১১৫৯ সন পর্য্যন্ত ৫৫ বৎসর গাজীর বয়ক্রম হইয়াছিল। সেই সময়েই গাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোলাম আলীকে নোয়াখালী "ভাওপুর" এবং ছাদু যাহার ফুফারা (পিসতাত) ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

গাজী রোশনাবাদের সুবাদারী সনন্দ পাওয়ার পর একদা দিল্লি সম্রাটের † সমক্ষে ইদ পর্ব্বদিনে মৌলবীরা ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করিতেছিল।

ইদজ্জোহা (১) দিনে শুন পাদসা হুজুরে।
খতিবে (২) খতবা (৩) পড়ে উঠিয়া মিম্বরে (৪)॥
খোতবা ছানির (৫) এক মিম (৬) ছুটী গেল।
পাছে থাকি হোসেন হাজিয়ে (৭) হুস্কারিল॥

তখন হাজি হোরমান হোসেন নামক এক ফকির এই ভুল ধরিয়া বলিল—

আমার বচনে যদি না কর প্রত্যয়
কেতাপ কোরাণ খুলি দেখ মহাশয়॥

(১) বাঁশপাড়া—(খণ্ডল)। (২) নাঙ্গলমোড়া—(দক্ষিণ শিক)। (৩) যার বাঁহাত বেশী কার্য্যকারী। (৪) জয়পুর (নেজামপুর)। (৫) ফরজন্দ—পুত্র। (৬) জগন্নাথ সোনাপুর—(খণ্ডল) গাজীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থান। এখানে গ্রন্থকার (সেখ মনোহরের বাড়ী ছিল। (৭) কারক=কর্ম্মচারী। (৮) জগন্তপুর (খণ্ডল)।

* এই সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। † সম্ভবতঃ সে সময়ে মহাম্মদ সাহা দিল্লির সম্রাট ছিলেন (১৭১৯ হইতে ১৭৪৮ খৃঃ)। (১) ইদ পর্ব্বদিনে। (২) ধর্ম্ম উপদেশ দাতা। (৩) ধর্ম্ম উপদেশ। (৪) বেদী। (৫) ধর্ম্ম উপদেশ শ্লোক। (৬) অক্ষর। (৭) মক্কাতীর্থ হইতে যাহারা তীর্থ (হজ) করিয়া আসেন, তাহাদিগকে হাজি বলে।

বিচারে তাহার কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কত হজ "গুঞ্জারীয়া" আসিয়াছেন"। হাজি হোরমান হোসেন বলিল—

"তিনশ সাইট স্নান করি জেয়ারত।
সাইট হজ করি এনু নৃপতি সাক্ষাৎ॥"

সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিলে বলুন; আমি সাধ্যানুসারে তাহা পূরণ করিব"। হাজি হোরমান হোসেন বলিল—

"রোশনাবাদ এক উদয়পুর বংশ।
ধ্বংশ হয়েছে সকল দাও সেই অংশ॥
হুকুম হইল তবে দিলেন সনদ।"

হাজি হোরমান রোশনাবাদের রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দ গ্রহণ করিয়া মুর্শিদাবাদ নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় অবগত করাইল। তাহা শুনিয়া নবাব বলিল—

"ভাটীর বাঙ্গালাতে (১) গাজি ছানি যে নবাব॥
উদয়পুর রাজগণ বিরানা (২) হয়েছে।
সেই রাজ্য সমশের দখল করেছে॥"
তাহা আপনি দখল করিতে পারিবেন না।—
"লড়িলে ভেড়িলে (৩) তব প্রাণী হবে শেষ॥"
"আমার বচন যদি ধর মহাশয়।
উপসত্ব লক্ষটাকা পাইবা নিশ্চয়॥"

হাজি হোরমান তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ঢাকা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং গাজী হইতে প্রতিবৎসর উপসত্বের এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া ঢাকাতে "হোসনি দালান" (৪) নামক এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইল। সেই সঙ্গে আমুরার মঞ্জিল খানা ও জেয়াফত খানা প্রভৃতি ইমারতও তৈয়ারী হইয়াছিল হাজি হোরমান হোসেন মক্কা হইতে চারি খানা কদম মোবারক (মহাম্মদের পদচিহ্ন) পাথরে খোদাই করাইয়া আনিয়াছিলেন।

"মক্কা হ'তে এতে হাজি কদম মবারক। (১)
এনেছিল চারি পদ্দ খুদিয়া সানক॥" (২)

এই চারিখানা পদচিহ্নের এক খানা "পাদশা হুজুরে" দান করেন, একপদ উক্ত "হুসনী দালানে" রক্ষা করেন, একখানা চট্টগ্রামের নবাবকে (৩) ও অন্যখানা গাজী সমশেরকে প্রদান করেন।

"একপদ দিয়াছিল পাদশা হুজুরে।
আর পাও রাখিল দালান উপরে॥
চট্টগ্রাম নবাবেরে একপদ দিল।
সমশের গাজীর আগে অন্য পাঠাইল॥"

তন্মধ্যে দক্ষিণ দুই পদের একখানা দিল্লির বাদশাহের নিকট, একখানা ঢাকায় নিজ নির্ম্মিত "হুসনি দালানে" তাহা "চেরাগ" বাত্তিতে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়া থাকে।

(১) মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মেঘনার তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহকে "ভাটী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Mahamedon Historians call the cost strip from the Hugly to Megna" Bhati." H. Blochmanns' History & Geography of Bengal. (২) বিরানা রাজ্যশূন্য। কোন ব্যক্তিকে নিষ্কর্ম্মা ফিরিতে দেখিলে সাধারণ চলিত ভাষায় "বেরেণ্ডা" বলা হয়। এই "বেরেণ্ডা" শব্দ "বিরানা" কথারই অপভ্রংশ। (৩) যুদ্ধ জয় করিলে। (৪) হাজি হোরমানের নির্ম্মিত "হোসনি দালান" অদ্যাপি ঢাকা নগরীতে বিদ্যমান আছে। মহরমের সময় আজিও

(১) মহাম্মদের পদচিহ্ন। (২) পাথর। (৩) সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে এই কদম রসুল চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। চট্টগ্রাম রহমতগঞ্জ কদম মোবারক নামক মসজিদে উক্ত পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। এই সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অত্রত্য সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক বাবু ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী মহাশয় "সুপ্রভাত" পত্রিকায় ১৩২০ বাং ভাদ্র সংখ্যায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা বিশস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি উক্ত মসজিদে বর্ত্তমান সময়ে দুইখানা পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। কিন্তু হাজি হোরমান হোসেন একখানা প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। দ্বিতীয় খানা সম্বন্ধে এই জানিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্বে এক খানাই ছিল, অন্য কোন মুসলমান মহাত্মা দ্বিতীয়খানা আনায়ন করিয়া তথায় রাখিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী খানার প্রস্তরের রঙ্গের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এক খানা একটু লালচে কালো ও অন্য খানা মিশ কালো। এই রঙ্গের ও গঠন পার্থক্য দুই খানার স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক। উক্ত মসজিদের দ্বারস্থিত প্রস্তর-ফলকে একটী পারসী শিলা-লিপি বিদ্যমান আছে। তাহা আমরা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এবং বাম দুই পদের মধ্যে একখানা চট্টগ্রামেও একখানা গাজীর নিকট রহিল।

"ডাইন দুই পাও দিল্লি ঢাকায় রহিল।
চট্টগ্রাম সমসের বাম পদ পেল॥
যেই বেশে থাকে এই কদম রছুল।
সে দেশে বরকত (১) হয় খোদার কবুল॥ (২)

এইরূপে দিনে দিনে গাজী উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইল।

"গাজীর দোহাই পরে নগরে বাজারে।"

গাজী অতি সুশৃঙ্খলার সহিত ও অতি সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। গাজীর সুনাম ও সুযশ দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; কিন্তু গাজীর জন্য যে ভীম-পরাক্রম ছাদু এত যুদ্ধ জয় করিল, বাঘ ভালুক মারিল, রাজার রাজ্য কাড়িয়া আনিল, তাহার কোন নামযশ বা প্রতিপত্তি হইল না দেখিয়া এবং বিচারে আচারে গাজী ছাদুর আর কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতে ছিল না লক্ষ্য করিয়া তাহার মনে একটু ঈর্ষার উদয় হইল।

"ভাল ভাল যত কাজ গাজীবরে করে।
উলট করয়ে ছাপ নিজ গাও জোরে॥
তা দেখিযা গাজীর মনে উপজীল ভীত।
ঠাকুর (ছাদু) করিছে কেন হিতে বিপরীত॥"

গাজী ছাদুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল— তোমার এই ভাবের কারণ কি? কথায় গাজী ও ছাদুতে বেশ ঝগড়া হইল। ছাদু বলিল—

"বিচারে বসিব আমি তুমি যাও ঘর।
নাহত মারিব তোমা জানিও স্বত্বর॥"

এইরূপে আত্মকলহ বাড়িয়া চলিল। গাজী দেওয়ান বাছিরের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল—

"বাছিরে বলিল তাকে মারিতে উচিত।
নহেত তোমার পরে হবে বিঘটিত॥

* *

এক তক্তে (১) দুই নৃপ নহে আরোহণ।
এক মিয়ানে (২) দুই ছুরি না যায় কথন॥"

এই সময়ে খণ্ডল পরগণার সাতকুচি নিবাসী চাঁদ খাঁ চৌধুরীর বাড়ীতে বিবাহের মেজমাণীর নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। চাঁদখার সহিত গাজীও ছাদুর বিশেষ কুটুম্বিতা ছিল। গাজী ছাদুকে বিবাহ নিমন্ত্রণে যাইতে বলিল; ছাদু স্বীকৃত হইল। গাজীও ইহাই উপযুক্ত অবসর ঠিক করিয়া দশদিন পূর্ব্বে তথায় যাইবার জন্য ছাদুকে বলিয়া দিল; এবং বলিল "তুমি যাও পাঁচদিন পর আমি আসিতেছি"। এদিকে সৈন্যগণকে গোপনে

"দর আহ্‌দে মহাম্মদ সাহে গাজী
বেনা শোদ্ মছ্‌জিদ্ আজ এয়াছিন্ মহাম্মদ
কে বাসদ্ হুক্‌মে ওরা আদল তাছির
জে তায়াত্‌খানা শোধ তারিখে তামির।"

অনুবাদ।

পাতশাহ মহাম্মদ সাহা গাজীর সময়ে
এয়াছিন মহাম্মদে মসৃজিদ বানায়
সে বাদসাহ ছিল জ্ঞানী বিচারে বিষয়ে
মসৃজিদের তারিখ দেখ সংকেতে তেথায়।

আমরা আরবী পার্শি জানি না। আমাদের বিখ্যাত মৌলবী আবদুল লতিফ আমাদিগকে এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন ও তারিখ নির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। উক্ত শ্লোকের শেষ চরণের "জে তায়াত্‌খানা" শব্দটীর বিশ্লেষণ দ্বারা তারিখ নির্ণয় করিতে হইলে এইরূপ অর্থ হয়। উক্ত শব্দটীর মধ্যে এই সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, যথা:—

জে ৭+তোয়ে ৯+আলেফ্ ১+আইন ৭০+তে ৪০০+খে ৬০০+আলেফ্ ১+নু ৫০+হে ৫=১১৪৩ সন। এই হিসাবে ইহা ১৭৮ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতিহাস মতে, ১৭১৯ হইতে ১৭৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত মহাম্মদ সাহ দিল্লির সম্রাট্ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ১৭৩৬ খৃঃ যদি এই মসৃজিদ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ১৭৮ বৎসর হয়। অতএব দেখা যায়, উক্ত শ্লোকের উল্লিখিত মহাম্মদ সাহ যে আমাদের পূর্ব্বে বর্ণিত দিল্লির সম্রাট্ তাহাতে সন্দেহ নাই। ১১৬৯ সনে গাজীর মৃত্যু হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ইহাদ্বারাও সমসাময়িকতা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইয়া যায়। (১) শুভ-মঙ্গল। (২) ইহা ঈশ্বরের বাক্য।

(১) সিংহাসন। (২) খাপ বা খোল। অর্থাৎ একটী খাপের ভিতর দুই খানা ছুরী থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনি এক সিংহাসনে দুই জন রাজা থাকাও অসম্ভব। "একবনে দুই বাঘ" থাকিতে পারে না একটী প্রবাদ আছে।

কহিল যে ছাদু আমার বিশেষ অপমান করিয়াছে এবং সে আমার বিষম প্রতিদ্বন্দ্বি; অতএব পথিমধ্যে তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে।"

অথচ—"ছাদুকে পাঠায়ে আগে লাগ নিলা পিছে।
জগতপুরে গেলা যদি ঘুরিয়ার কাছে॥"

সেইখানে ছাদু হাতী হইতে নামিয়া হাঁটিয়া "বাঁশটেক" দিয়া "ঘুরিয়া ছরা" পার হইতেছিল। সেই স্থানে—

"বাইশ হাত উচা নিচা ঘুরিয়ার ছরা।
তে কারণে সেই স্থানে গাজী গেল মারা"॥

তখন সৈন্যগণ তাহাকে আক্রমণ করিল। ছাদু এ অবস্থাতেও দশজন আহদী বধ করিল।

"হেন কালে ছেল (শেল) এক পৃষ্ঠেতে হানিল।
পৃষ্ঠে ভেদি বুক ছেদি ছেল নিকলিল॥"

এই ভাবে একটী প্রতিভা নিবিয়া গেল। গাজীর শনি প্রবেশ করিল। ছাদুর চরিত্র কলুষিত ছিল; ছাদু গোঁয়ার গোবিন্দ ছিল, দস্যু-প্রকৃতির ছিল সত্য কিন্তু আমরা তাহার বীরত্বকে নমস্কার করি। এই মুসলমান বীর, এই "ভীম" আখ্যাধারী ব্যক্তি অমিত-শক্তিমান পুরুষ ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের, গৌরবস্থল ছিল, সন্দেহ নাই। শিক্ষার অভাবে, উপযুক্ত চালকের অভাবেই তাহার এই বীরত্ব-প্রতিভা অন্যায় পথে চালিত হইয়া কালিমারঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। ছাদুর মৃত্যুস্থান সম্বন্ধে একটু মতান্তর আছে—

"কেহ বলে ঘুরিয়াতে ছাদু গেল মারা।
কেহ বলে মারা গেল গতিয়ার ছরা॥

যাহাই হউক গাজী—

"গতিয়া উত্তরে এক পুষ্করিণী পাড়ে।
শাস্ত্র বিধানে মাটী দিলা ছাদবরে॥"

বলিয়া লিখিত আছে। এই নৃশংস কার্য্য করিয়া গাজী নিজকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল সত্য; কিন্তু এমন বীর্য্যবান ভ্রাতৃহারা হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় একান্ত নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁদ খাঁর বাড়ীর বিবাহ উৎসব হইতে সকলে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু ছাদু আসিল না দেখিয়া তাহার ভগিনী (গাজীর স্ত্রী) গাজীকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গাজী বলিল সে বিশেষ জরুরী কার্য্যবশতঃ তথা হইতে ঢাকা নবাব দরবারে গিয়াছে। তৎপর মাসেক সময়ের মধ্যেও যখন ছাদু প্রত্যাবর্ত্তন করিল না, তখন সে ভাইয়ের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। ছাদুর মৃত্যুর কথা গাজী স্ত্রীর নিকট গোপন রাখিলেও তাহার মনে আপনা আপনাই সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গাজীর কথায় আশ্বস্ত না হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল।

"তব সঙ্গে মনোবাদ ছিল তার জানি।
মোর মনে লয় তার বধেছ পরাণি॥"

গাজী স্ত্রীকে অত্যন্ত ভয় করিত; কেননা ছাদুর ভগ্নী বাঘের যোগ্যা বাঘিনী ছিল;—ভায়ের উপযুক্তা ভগিনী ছিল। তিনিও অত্যন্ত বলিষ্ঠা ছিলেন।*

"বলবন্ত বিবি দেখি গাজী উচাটন॥
সাবধানে রহে গাজী না জানি কি হয়।
আন্দরে না যায় গাজী শয়ন সময়॥"

ধর্ম্মের ঢোল বাতাসে বাজিল। দাসী সৈন্যদের কাণাঘুষায় ছাদুর ঘুড়িয়াছরাতে মৃত্যু-কাহিনী জ্ঞাত হইয়া বিবিকে জানাইল।

"এতেক শুনিল যদি জানিল নিশ্চয়।
শোকের সাগরে ডুবি বিলাপ করয়॥
সে সব সন্তাপে ঝরে পাষাণের পাণি।
অন্নজল ত্যাগ করি বিলাপয় ধনি॥"

শ্রীমোহিনীমোহন দাস।

* "ছাদু ভগ্নি গাজিপত্নী বলিষ্ঠা রমণী।"
"ছাদুভগ্নি" এই কথা ভিন্ন গ্রন্থমধ্যে আমরা কোথাও গাজীর স্ত্রীর নাম প্রাপ্ত হই নাই। তাই আমরা সর্ব্বত্র "ছাদুর ভগ্নী বা গাজীর স্ত্রী" এরূপ ব্যবহার করিলাম। গাজী ক্রমে আরো দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন জানা যায়; কিন্তু কোন স্ত্রীরই নাম প্রকাশ নাই।

ঢাকায় কবি কৃষ্ণচন্দ্র। *

(১)

(জন্ম—১২৪৪ | ৪৫ সন ; মৃত্যু—১৩১৩ | ২৯শে পৌষ)

পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী।

"সদ্ভাব-শতকের" গ্রন্থকার কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম আপনারা সকলেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই চিরপরিচিত কবির কথাই আলোচনা করিব।

কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মভূমি—খুলনা-সেনহাটী (২)। প্রায় ৮০ বৎসর কাল পূর্ব্বে, এক কুলীন, দরিদ্র বৈদ্যপরিবারে মজুমদার-কবি জন্ম গ্রহণ করেন। সেনহাটী কবির জন্মভূমি হইলেও ঢাকাই তাঁহার প্রধান কর্ম্মভূমিও শিক্ষাস্থল। শৈশবেই তিনি ঢাকায় আসেন—ঢাকাতেই তিনি পার্শীভাষায় ও সংস্কৃত-ব্যাকরণে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ন (৩);—প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে, ঢাকাতেই সাহিত্য-চর্চ্চায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের ঢাকা-প্রবাস ও শিক্ষা-লাভ।

নানা কারণে, কৃষ্ণচন্দ্রের সমগ্র জীবনে ১২৬৬ | ৬৭ বঙ্গাব্দ চিরস্মরণীয়—এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদকতায় ঢাকার প্রথম মাসিক পত্রিকা "মনোরঞ্জিকা", পদ্য-বহুলা মাসিক পত্রিকা "কবিতা-কুসুমাবলী" ও ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক 'ঢাকা-প্রকাশ' ঢাকার প্রথম ছাপাখানা 'বাঙ্গালাযন্ত্রে' যথাক্রমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়; "ঢাকা-প্রকাশ"-সম্পাদনকালেই ১২৬৭ সনে, প্রায় ৫৭ বৎসরকাল পূর্ব্বে, কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালা—অনুবাদ-সাহিত্যের অপূর্ব্ব কাব্যসম্পদ "সদ্ভাব-শতক" গ্রন্থ প্রচার করেন; ইহাতেই পরিণামে তাঁহার কবি-প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে। "ঢাকা-প্রকাশের" পরে তিনি ঢাকার "বিজ্ঞাপনী" পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াও, অতুল যশোভাগী হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্যিক কর্ম্মজীবন।

কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম ১৫৲ টাকা বেতনে ঢাকা-লালবাগ সার্কেল-পণ্ডিতের কর্ম্ম লাভ করেন। ব্রাহ্মনেতা ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমাণী-টোলা-ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়েও (১) তিনি কিয়ৎকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে তিনি মডেল স্কুলের শিক্ষকও ছিলেন।

বৈষয়িক কর্ম্ম।

কৃষ্ণচন্দ্রের মাতুলালয় ছিল—বাখরগঞ্জ-কীর্ত্তিপাশায়, কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকায় আসিয়া, ইঁহাদের রাজার দেউরীর বাসায় ছিলেন। তিনি বিবাহ করিয়া ছিলেন—মাণিকগঞ্জের সুয়াপুরের রায়বংশে। সুতরাং বলা যায়, ঢাকায় তাঁহার সম্পর্কের একটা মধুময় আকর্ষণও ছিল।

বৈবাহিক সম্বন্ধ।

কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম—রামচন্দ্র দাসের বা সংক্ষেপে রা, সের 'ইতিবৃত্ত'। কৃষ্ণচন্দ্রের একটা গুপ্ত নাম ছিল—রামচন্দ্র দাস বা সংক্ষেপে রা, স। রাসের ইতিবৃত্তে তিনি এই গুপ্তনামই ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার ঢাকা-প্রবাসের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ঢাকা বা তৎকালীন ঢাকার সাহিত্য-সম্পর্কে যাহারা অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের এই আত্মকাহিনী পাঠ করিয়া সর্ব্বপ্রকারেই পরিতৃপ্ত রহিতে পারিবেন না; তাঁহাদের নিকট ইহার অনেকস্থলই দুর্ব্বোধ্য বা অর্থহীন প্রতীত হইবে। কারণ, তিনি এই গ্রন্থে একপ্রকার আত্মগোপনই করিয়াছেন; অধিকন্তু, ইহাতে কোন দিন তারিখ বা কোন ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনার কথাও তিনি স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করেন

রা, সের ইতিবৃত্ত

* পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

(১) মতান্তরে, জন্মকাল ১২৪২ সন। "বঙ্গীয় কবি," ৫৫৪ পৃঃ।

(২) পূর্ব্বে সেনহাটী যশোহর জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৩) কৃষ্ণচন্দ্রের "পরমবন্ধু" শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—কৃষ্ণচন্দ্র কখনও ঢাকা-নর্ম্মাল স্কুলে পড়েন নাই; নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম সহকারী ৺ অভয়াচরণ রায় মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যাকরণ শিক্ষক ছিলেন—এই সূত্রে নর্ম্মাল স্কুলের তদানীন্তন ছাত্রবর্গের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

(১) এই ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ই পরিণামে 'জগন্নাথ কলেজে' পরিণত হইয়াছে। রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মৌলিক প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক বা লেকচারার ছিলেন।

নাই—ইহাতে ঘটনার পর ঘটনাই কেবল তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই তাঁহার বক্তব্য কৌশল-ক্রমে বা প্রচ্ছন্নভাবে লিখিত হইয়াছে।

ঢাকায় কৃষ্ণচন্দ্রের আকর্ষণ।

ঢাকায় সত্যসত্যই তাঁহার একটা সম্পর্কের মধুর বন্ধন এবং কর্ম্মক্ষেত্রের মধুময় আকর্ষণ ছিল; মনে হয়, ঢাকাই কৃষ্ণচন্দ্রের ভাবগঙ্গার প্রধান তীর্থ। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, সাহিত্যের হিসাবে, ঢাকাই যে প্রশস্ত ক্ষেত্র, আমরা ইহা সহজ বুদ্ধিতেও বলিতে পারি। সাহিত্যিক সকল ব্যাপারেই ঢাকায় কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় মজুমদার-কবি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান সঙ্গী, সহকর্ম্মী ও সহায় ছিলেন। (১)

কৃষ্ণচন্দ্রের ঢাকা-ত্যাগ

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর, ১৮৭৪ খৃঃঅব্দের সেপ্টেম্বার বা ১২৮০ বঙ্গাব্দে, প্রায় ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কৃষ্ণচন্দ্র "যশোর" বা যশোহর স্কুলে, ২৫৲ টাকা বেতনে, হেড পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, চিরতরে ঢাকা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী-গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ যশোহর ও জন্মভূমি সেনহাটীতে পরিসমাপ্ত হয়।

শেষজীবন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার শেষ জীবন সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোন কথাই বলিব না; ইহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থলও নহে। তবে, কবিকে বুঝিতে হইলে, কবির শেষ জীবনও বুঝিতে হয়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যবহির্ভূত হইলেও, এস্থলে আমরা কবির শেষজীবনের দু' একটী কথা যথা সংক্ষেপে বলিব।

শেষজীবনে সাহিত্য-চর্চ্চা।

১২৮৯ বঙ্গাব্দে (ঢাকা-পরিত্যাগের প্রায় নয় বৎসর কাল পরে) কৃষ্ণচন্দ্র "কৈবল্য"তত্ত্ব (২) এবং ১২৯৩ বঙ্গাব্দে "বৈভাষিকী"নাম্নী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার পর ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বা ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, তিনি যশোহর স্কুলের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, আমরণ সেনহাটীতে ছিলেন।

কবি-প্রতিভার লোপ।

ঢাকা-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কবি-প্রতিভার লোপ ঘটে (৩); এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। ফলতঃ জীবনের এ প্রদোষ-কালে তিনি আর কোনও স্থায়ী সাহিত্যিক যশের কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

রচনার ধারা।

কৃষ্ণচন্দ্রের রচনায় প্রধানতঃ দুইটী স্তর বিদ্যমান। ঢাকা-প্রবাসকালে, তিনি যে ভাবে গদ্য ও পদ্য লিখিতেন, ঢাকা-পরিত্যাগের পর, তাঁহার কবিতায় বা গদ্য-প্রবন্ধে আর সে ভাব—সে লিখনভঙ্গী, ভাষার সে ওজস্বিতা কিছুই আর পরিলক্ষিত হয় না। কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্য-রচনায় প্রথম স্তরের আদর্শ প্রাচীন "ঢাকাপ্রকাশ" ও দ্বিতীয় স্তরের আদর্শ "কৈবল্য-তত্ত্ব", অথবা পদ্য-রচনায় তাঁহার প্রথম স্তরের কাব্য "সদ্ভাব-শতক" এবং দ্বিতীয় স্তরের "বৈভাষিকী-পত্রিকার" কবিতাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা ভাষা-বিচার-পরিচ্ছেদে ইহার পুনরপি আলোচনা করিব।

আমাদের কবি-জীবনী-পর্য্যালোচনার আবশ্যকতা।

কবির জীবনীসম্পর্কে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছি, ভরসা করি, কৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে, এ স্থলে তাহাই অনেকাংশে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। এ প্রবন্ধে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নহে; ঢাকা-প্রবাসী কবি কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্যিক কাব্য-জীবনী আলোচনাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

(১) "সদ্ভাব-শতক" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, হরিশ্চন্দ্র তখন ঢাকায় উদীয়মান কবি—কৃষ্ণচন্দ্র তখন ঢাকার গদ্য-সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী; কৃষ্ণচন্দ্রের তখনও কবি-যশঃ লাভ ঘটে নাই।

(২) একজন লেখকের মতে, তখন কবি-জীবন-যাপনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।" "কবি যখন যশোহরে তখন তাঁহার পূর্ব্বের কবিত্ব-শক্তি লুপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বের কবি জীবন যাপন করাই তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল।" কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিত, ৩১পৃঃ।

(৩) "কৈবল্যতত্ত্ব" 'যশোর' জিলা স্কুল হেড পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিরচিত ও কুমারখালী মথুরানাথ-যন্ত্রে ১২৮৯ সনে মুদ্রিত"। ইহার অধিকাংশ স্থল কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ বা ৺ হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র সত্যসত্যই "ঢাকাই কবি" (১)। ঢাকার সাহিত্য-গগনেই কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্রত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—ঢাকার অন্ন-জলেই কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমজীবনে—বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে—পরিপুষ্ট হইয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসরকাল তিনি ঢাকা-প্রবাসী ছিলেন। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের হিসাবে, এই কালই তাঁহার জীবনের-প্রকৃষ্ট ভাগ। বস্তুতঃ ঢাকাই কৃষ্ণচন্দ্রকে গড়িয়া তুলিয়াছে—কৃষ্ণচন্দ্রও অনেকাংশে ঢাকার সাহিত্য, বিশেষতঃ সংবাদ-পত্র-সাহিত্য, গড়িয়া তুলিয়াছেন; ইতঃপূর্ব্বেও আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি—এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্যিক কর্ম্মজীবনে যাঁহারা প্রধান সঙ্গী, বা প্রধান সহায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই ঢাকার অধিবাসী। ইতঃপূর্ব্বে আমরা হরিশ্চন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছি। হরিশ্চন্দ্র ব্যতীত, কৃষ্ণচন্দ্রের শেষপার্শী শিক্ষক 'নওয়াবপুর' বা নবাবপুর-নিবাসী ৺ লালমোহন বসাক মহাশয়, ঢাকা সার্কেলের প্রথম ডিপুটী স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার, কৃষ্ণচন্দ্রের "পরমহিতৈষী বন্ধু" মাণিকগঞ্জ-নিবাসী ৺ দীনবন্ধু মৌলিক মহাশয়, পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত "সদ্ভাব শতকে"র গ্রন্থস্বত্বক্রেতা ঢাকার উকিল ৺ নন্দকুমার গুহ মহাশয়, কৃষ্ণচন্দ্রের "পরম বন্ধু" ৺ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, "ব্যাকরণ-সার" প্রণেতা ও কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালে "ঢাকা-প্রকাশে"র সম্পাদক ৺ গোবিন্দপ্রসাদ রায় মহাশয় ও বৈদান্তিক প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই ঢাকার অধিবাসী।

ঢাকার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র "বাঙ্গলা-যন্ত্রের" প্রতিষ্ঠাতৃ-স্বত্বাধিকারীবর্গের অনুগ্রহে ২৫৲ টাকা বেতনে কৃষ্ণচন্দ্র "ঢাকা-প্রকাশের" সম্পাদক-পদে বৃত হন। ইহাতেই সাহিত্য-চর্চ্চায় কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত সুযোগ লাভ ঘটে।

যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন, ঢাকা-বাসী প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর পক্ষেই কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী আলোচনা অত্যাবশ্যক। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ঢাকার সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, সেই যুগের সর্ব্বপ্রধান নায়ক কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের সাহিত্যিক কর্ম্মপ্রাণতার কথা সর্ব্বাগ্রেই উল্লেখ করিতে হয়। এই হিসাবেও ঢাকা-বাসী আমরা ঢাকা-প্রবাসী কৃষ্ণচন্দ্রের ঢাকা-প্রবাসের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে পারেন।

স্থূলতঃ, কবির শিক্ষাপ্রদ জীবনের আলোচনাতেও নিশ্চিতই লাভ আছে। এই গৌণ লাভের হিসাবেও, আমরা সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী-পর্য্যালোচনা করিতে পারি।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী-লেখক।

আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের দুইটী জীবনী-প্রবন্ধ ও একখানা জীবনী-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি (১)। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকাল,

---

(১) প্রাচীন-সাহিত্যের প্রবীণ লেখক ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে "উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি" বলিয়াছেন; আমরাও তদনুকরণে কৃষ্ণচন্দ্রকে 'ঢাকাই কবি' বলিলাম বসু মহাশয়ের উক্তি এইরূপ:—"ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাব-শতক অতীব মনোহর (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ৩০ পৃষ্ঠা)। এ সম্বন্ধে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও কিরূপ মত পোষণ করিতেন, তাঁহার আত্ম-জীবনীতেও আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

"অন্য কোন প্রদেশবাসী কয়েকজন সুশিক্ষিত তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাম বিবেচনা করিলেন তাহাতে তাঁহারাই পত্রের গৌরব ও যশের মূল বিবেচিত হইবেন। এক প্রদেশীয় পত্রে অন্য প্রদেশীয় লোকের প্রদীপকতা তাঁহার সহ্য হইল না।" কৃষ্ণচন্দ্রও আরব্ধ কার্য্যে ঢাকা 'প্রদেশের' বাহিরের কাহারও সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ। এই প্রদেশের অর্থ-বর্ত্তমান Province নহে; সম্ভবতঃ ইহা court শব্দেরই অনুবাদ। এই সময়ে সমগ্র দেশ মুর্শিদাবাদ কোর্ট, ঢাকা কোর্ট প্রভৃতি বিভিন্ন কোর্টে বিভক্ত ছিল। (পিয়ার্শন সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঢাকার কবি হরিশ্চন্দ্রকে "ঢাকা প্রদেশীয় অন্যতর বিখ্যাত কবি বলিয়াছেন।"

(১) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত-প্রণীত "বঙ্গীয় কবি," অষ্টমখণ্ড, ৫৫৪ পৃঃ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত চরিতাভিধান, পৃঃ ও ৺ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত "কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত"।

পিতৃনাম, সদ্ভাব-শতকের গ্রন্থস্বত্ব-মূল্য প্রভৃতি সাধারণ বিষয়েও, এই সকল গ্রন্থ-পত্রে পরস্পরবিরোধী অনেক কথা আছে (২)। জীবনী-গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে মত-প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা রহিয়াছে। সেই সকল মত কতদূর যুক্তিসিদ্ধ বা বিচারসহ, আমরা যথাস্থানে তাহা প্রদর্শনের চেষ্টা করিব।

ঢাকা-প্রবাসী কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের প্রধান উপকরণ রহিয়াছে—

(১) তৎকালীন সাহিত্যে বা সাময়িক পত্রে ও

(২) ব্যক্তিগত সাক্ষ্য-প্রমাণে।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের কোন কোন বিবরণ আমরা "কবিতা-কুসুমাবলী" পত্রিকায়, রাসের ইতিবৃত্তে ও ১ম বা ২য় সংস্করণের সদ্ভাবশতকে পাইতে পারি। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থ-পত্র লিখিত হইয়াছে। এক্ষণ ইহাদের অধিকাংশ গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্মজীবনীতেও কোন কোন স্থলে কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ আছে। ইহা দুষ্প্রাপ্য নহে। সৌভাগ্যক্রমে, কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ও সহকর্ম্মী কএকজন প্রাচীন সাহিত্যিক এখনও জীবিত আছেন। ইঁহাদের ব্যক্তিগত সাক্ষ্য-প্রমাণেও আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীর কোন কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আমাদের এ সভাক্ষেত্রেও ইঁহাদের কেহ কেহ উপস্থিত আছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের কোন নির্দ্দোষ ও নির্ভরযোগ্য জীবনী-গ্রন্থ এখনও প্রণীত হয় নাই। বাঙ্গালা-সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যই মানিতে হইবে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের ঢাকা-প্রবাসের কথাই প্রধানতঃ আলোচনা করিব। এই উদ্দেশ্যমূলে, আলোচনার সৌকার্য্যার্থে প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা আলোচ্য বিষয়ের নির্দ্দেশ ও শ্রেণী-বিভাগ করিয়া লইতেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয়াষ্টক, যথা—

(১) রাসের ইতিবৃত্ত (কবির আত্মজীবনী)।

(২) কৃষ্ণচন্দ্রের "কামিনীকুসুম-তরু।"

(৩) "সদ্ভাব-শতকের" পূর্ব্বকথা।

(৪) সদ্ভাব-শতকের গ্রন্থ-স্বত্ব।

(৫) কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র।

(৬) কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে তাঁহার সঙ্গী, সহকর্ম্মী ও শিক্ষকের প্রভাব।

(৭) ভাষা-বিচার ও

(৮) নানা কথা—(ক) হাফেজ-প্রসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীত।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রত্যেকটীই অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ঢাকার সাহিত্যের সংশ্রব রাখে। সুতরাং এ সকল বিষয়ে অতি সন্তর্পণে আমাদিগকে পদক্ষেপ করিতে হইবে। এ জন্য আমরা লিখিতপ্রমাণাদিও একটুকু বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত করিব।

(১) রা,সের ইতিবৃত্ত।

ঢাকা-প্রবাসকালেই কৃষ্ণচন্দ্র রা, সের ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং যতটুকু লিখা হইত, তখনই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বন্ধুবর্গকে তাহা পড়িয়া শুনাইতেন।

"রাসের ইতিবৃত্ত" প্রধান প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের একজন "পরম বন্ধু" বলেন—এসময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের একটু "পাগলামির ছিট" ছিল। "রাসের ইতিবৃত্তে" সাধারণতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের ঢাকা-প্রবাস-কাহিনীই বর্ণিত। ইহার প্রধান প্রধান কএকটী আলোচ্য বিষয়, যথা—

ঢাকায় "পারস্য-ভাষা অধ্যয়ন" "কোন সেরেস্তায় তাঁহার অনুকারিতা" (১৮ পৃঃ), ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্তির কারণ, সার্কেল পণ্ডিতের পদ লাভ ও পদোচিত শিক্ষা "কবিকীর্ত্তি-লাভের ইচ্ছা," ওকালতী পরীক্ষা প্রদান ও পরীক্ষায় অসাফল্য (৪১পৃঃ), (বিজ্ঞাপনী-পত্রিকায়)

(২) "বঙ্গীয় কবি"তে জন্মকাল ১২৪২ সাল, মৃত্যু ৭০ বৎসরে, পিতৃনাম মাণিকচন্দ্র, সদ্ভাব-শতকের গ্রন্থ-মূল্য একশত টাকা। "কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী"তে জন্মকাল-১২৪৪।৪৫ সন; মৃত্যু, ৭২ বৎসরে পিতৃনাম মাণিক্যচন্দ্র. সদ্ভাব-শতকের গ্রন্থ-স্বত্ব-মূল্য তিনশত টাকা। আমরা এই প্রবন্ধে ইন্দু বাবুর প্রদত্ত জন্মকাল ধরিয়াই হিসাব করিয়াছি।

সম্পাদকতা-গ্রহণের প্রস্তাব (৫৪পৃঃ)নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব,(৯২পৃঃ) বক্তৃতা প্রদানের সঙ্কল্প,(১১৯পৃঃ) ঋণের দায়, (১২৩পৃঃ) সম্পাদকীয় স্বাধীন বৃত্তি ও "রাজ-সমাজের আদেশ-লিপি" (সমন) (১৪১পৃঃ) এতদ্ব্যতীত, রা, সের ইতিবৃত্তে, তাঁহার পারিবারিক অবস্থা, স্ত্রীর প্রতি অযথা অবিশ্বাস. সঙ্গীতে অপটুতা, তাঁহার আত্মদোষ ও পানাসক্তি, স্বভাব-বর্ণনা, নৌকাপথে যাতায়াতের বিপদসঙ্কুল চিত্র রহিয়াছে। তিনি নৌকাপথে যাতায়াতকালে সময় সময় প্রবল বাত্যা বা ঝড়ের উৎপাত সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার অভিব্যক্তি রহিয়াছে—"বৈকালিক ঝড়ে"। (সম্ভাব-শতক, ২য় সংস্করণ, ৭৫ পৃঃ ও রাসের ইতিবৃত্ত ৭৫পৃঃ)। পারিবারিক দুর্দ্দশার চিত্রও তাঁহার কবিতায় পরিস্ফুট।

এ প্রবন্ধে, এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি, কৃষ্ণচন্দ্রের কথায়, আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা—কৃষ্ণচন্দ্রের গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্র, তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্ম বিশ্বাস, কবিকীর্ত্তিলাভের ইচ্ছা, স্বভাব-বর্ণনা এবং ঢাকার সংবাদ-পত্র-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ইহাতে ঢাকার সাহিত্য, তথা কৃষ্ণচন্দ্রকে, আমরা অনেকাংশে সহজেই বুঝিতে পারিব।

কৃষ্ণচন্দ্র দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন শিশু ; এই সময়ে শিশু কৃষ্ণচন্দ্রকে লইয়া 'অনাথা জননী অকুল পাথারে' ভাসিলেন। শৈশবেই কৃষ্ণচন্দ্র বিদেশে "অধ্যাশ্রয়ীর অনুকারী" হইলেন। এই দুর্দ্দিনের চিত্র তাঁহার হৃদয়-পটে চিরদিন পাষাণ-রেখার স্থায় অঙ্কিত ছিল। রা, সের ইতিবৃত্তে এই চিত্র এইরূপ—

গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র।

(রা, স) শৈশবকালে পিতৃহীন হ'ন। কোন আত্মসংসার হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। মধ্যে মধ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহার মাতা যাঁহার নিকট ঋণার্থনা করিতেন, তাঁহার হস্তে টাকা থাকিলে, তিনি তাঁহাকে নিরুপায়শোচিত করিতেন না। (রা, সের ইতিবৃত্ত, ১ম পৃষ্ঠা)। কাব্য-জীবনেও কবি এ মর্ম্মভেদ দুঃখের স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কবি লিখিয়াছেন—

"যখন পড়েনি আমি (শুনেছি) ছ'মাসে,
ছাড়িয়া গেলেন পিতা ত্রিদিব-নিবাসে।
অনাথা জননী কোলে করিয়া আমারে,
দিলেন সাঁতার ঘোর দুঃখের পাতারে।
ভাসিতেন দিবানিশি নয়নের জলে,
ছিল না এমন কেহ যে আমার বলে।
যে দিন জুটিত যাহা কপালের জোরে,
আপনি না খেয়ে কিছু খা(ও)য়াতেন মোরে।
ক্রমে ক্রমে জড়িত হলেন ঋণ-জালে,
হায় বিধি এত দুঃখ ছিল তার ভালে ?
নিরদয় নীচবৃত্তি উত্তমর্ণ যত—
বিধিঁয়াছে বুকে তার বাক্যশেল কত।
নিরখি নয়ন তাঁর অশ্রুপূর্ণ মুখ,
পাষাণেরো পরিতাপে বিদরিত বুক।"
(সম্ভাব-শতক, ২য় সংস্করণ, ৬৬ পৃঃ)

অন্যত্র—"হায়রে কোথায় সেই স্নেহ-স্বরূপিণী
জননী আমার দুঃখ-নিরধি-বাসিনী," ঐ ৬৫পৃঃ।

অপিচ—"পিতৃহীন বালকের মলিন বদন
ব্যথিত না হয়, যারা করি দরশন"
তাহাদিগকেই কবি লক্ষ্মীর "প্রণয় ভাজন" বলিয়াছেন। (সম্ভাব-শতক, ২য় সংস্করণ, ২পৃঃ)।

কৃষ্ণচন্দ্র পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ তিনটী—

(১) কৃষ্ণচন্দ্রের অমিতব্যয়িতা (১)
(২) কৃষ্ণচন্দ্রের পানাসক্তি (২) ও
(৩) স্ত্রী-চরিত্রে অযথা অবিশ্বাস (৩)।

রাসের ইতিবৃত্তে কৃষ্ণচন্দ্র বারংবার এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়। (৬৪ পৃঃ দেখুন)

(১) রাসের ইতিবৃত্ত ৪০পৃঃ, ৪৯ পৃঃ।
(২) ঐ ৩৩পৃঃ, ৯৪—৯৫পৃঃ, ১২১পৃঃ, ১৩২পৃঃ।
(৩) ঐ ৮৫পৃঃ, ১০৫—১০৬পৃঃ।

পারস্য-ভাষা।—কৃষ্ণচন্দ্র দেশে দুইবার এবং ঢাকায় দুইবার পারস্য-ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম তিনবার তিনি পার্শী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই (১)। শেষবার জগন্নাথ মুন্সী (বসাক) মহাশয়ের কৃতীছাত্র লালমোহন বসাক মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের পার্শীশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

শিক্ষা।

শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ।

ধরণীর পরিবার

(গিরি)

হে ধরাজননি, তুমি পাতিয়াছ' কি সুখ-সংসার—
শুধু প্রেম-করুণা ও স্নেহরসে সিঞ্চি বারি ধার;
দুর্দ্দম বিরাটপুত্র অভ্রভেদী তুঙ্গ গিরিবর
দিবস শর্ব্বরীশান্ত, ঘুমে শিশু সদা অকাতর;
মাথায় তুষারশুভ্র উত্তরীয় দিয়াছ জড়ায়ে
কটিতে কুটিল গ্রন্থি নির্ঝরের মেখলা পরায়ে।
হরিৎ বসনে ঢাকি সাজায়েছ সন্তানে সুন্দর
বক্ষে রাখি, স্তন্যদানে, করিতেছ শান্ত নিরন্তর।
রজনীতে আঁধারের আস্তরণে সন্তানে ঢাকিয়া
সুবর্ণ হীরক গোলা খেলিবারে দাও ঝুলাইয়া।
মর্ম্মর কাকলি রবে গাও ঘুম পাড়ানিয়া গান
প্রভাতে খেলার তরে বন-ফুলে রচিয়া উদ্যান।
নিদ্রা যায় শিশু, তুমি তালবৃন্ত করিছ বীজন—
সে-ই অগ্নি উদ্গারিয়া দগ্ধ করে তোমার জীবন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(১) রাসের ইতিবৃত্ত, ২পৃঃ, ১২ পৃঃ ও ১৪পৃঃ।

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণ।

কুবের-আনন্দ।

কুবের-আনন্দের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক শুধু একটিমাত্র পদ 'পদ-রস-সার' পুথিতে পাওয়া গিয়াছে; যথা—

সুহই।

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা রূপনিধি।
কত চান্দ নিঙ্গড়িয়া নিরমিল বিধি।
উগারয়ে সুধা যেন গোরা মুখের হাসি।
নিরখিতে গোরা-মুখ হৃদে রইল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে গাঁথি লব গোরা-রূপ খানি॥
মন-অভিলাষ ক্ষেমা নাহি হয় মোর।
কুবের-আনন্দ কহে মহি ভেল ভোর॥

এই পদটিই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে স্বর্গগত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সম্পাদিত "গৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে গোবিন্দ দাসের ভণিতাযুক্ত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুবের-আনন্দের অস্তিত্ব শুধু একটি ভণিতার পাঠান্তরের প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করিতেছে। এ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত ভণিতাদ্বয়ের মধ্যে কোনটি অধিক প্রামাণিক তাহা বিচার করা আবশ্যক। ভদ্র মহাশয়ের উদ্ধৃত পদটি এইরূপ, যথা—

শ্রীরাগ—দশকুশি।

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা রূপনিধি।
কতই চন্দ্র নিঙ্গড়িয়া যেন নিরমিল বিধি॥
উগারই সুধা জনু গোরা-মুখের হাসি।
নিরখিতে গোরা-রূপ হৃদয়ে রৈল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে থোব গোরা-রূপ খানি।
মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি কর মোর।
গোবিন্দদাস কহে বুঝি ভেল ভোর॥

এই পদটির আর একটী রূপান্তর আমরা পাবনা জিলার অন্তর্গত রায় দৌলতপুর গ্রাম নিবাসী সুকণ্ঠ

কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল অধিকারী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে পাইয়াছি; উহার প্রথম ছয়টি পংক্তির সহিত পদ-রস-সার পুথির উদ্ধৃত পদের প্রথম ছয় পংক্তির কোন পার্থক্য নাই; কেবল ভণিতায় একটু পার্থক্য আছে; যথা—

"মন অভিলাষ ক্ষমা না হইল মোর।
কুবীর-আনন্দ বলে হয়া গেনু ভোর॥"

এই পাঠান্তরগুলির তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবুর উদ্ধৃত পাঠ বিশুদ্ধ নহে। প্রথমতঃ খাঁটি বাঙ্গালা পদে উগারয়ে স্থলে 'উগারই' ও 'যেন' স্থলে 'জনু' শব্দের প্রয়োগ সন্দেহজনক। দ্বিতীয়তঃ, ২য় পংক্তিতে 'যেন' শব্দের ও ৪র্থ পংক্তিতে 'হৃদে' স্থলে 'হৃদয়ে' শব্দের অযথা প্রয়োগ দ্বারা উভয় পংক্তিতেই ছন্দঃপতন হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ভণিতার 'মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি কর মোর' পংক্তির নাহি কর পাঠে কোনই সদর্থ হয় না। অবশেষে 'গোবিন্দ দাস কহে' ইত্যাদি পংক্তির 'গোবিন্দ' শব্দের 'গো' অক্ষরটি গুরু উচ্চারণ না করিলে ঐ পংক্তিতেও ছন্দঃ পতন ঘটে। এই বাঙ্গালা পদটির কুত্রাপি দীর্ঘ-স্বরের গুরু উচ্চারণ বা ছন্দঃপতন লক্ষিত হয় না; সুতরাং ভণিতায় উহার ব্যতিক্রম যে নিতান্ত সন্দেহজনক, তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ কেবল ভণিতার, 'মহি ভেল ভোর' বাক্যের 'মহি' শব্দটি ব্যতীত পদ-রস-সার পুথির পাঠ সকল স্থলেই শুদ্ধ দেখা যায়। 'মহি' শব্দটি মূলে হয়ত 'মুহি' 'মুই' বা 'মুঞি' ছিল; লিপিকর প্রমাদে উহা মহি হইয়া গিয়াছে। অথবা 'মহী ভেল ভোর' পাঠ গ্রহণ করিলেও সুন্দর অর্থ হয়। পদ-কর্ত্তা যিনিই হউন না কেন তিনি বৈষ্ণবোচিত দীনতা পরিত্যাগ করিয়া নিজের ভাবোচ্ছ্বাসের কথা নিজে কেন ব্যক্ত করিতে যাইবেন? গৌরাঙ্গ-রূপ-মুগ্ধ ভক্ত 'মন অভিলাষ ক্ষেমা নাহি হয় মোর' বলিয়া আক্ষেপ করায় পদকর্ত্তা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—কেবল তুমি কেন মুগ্ধ হইবে? (শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-দর্শনে) পৃথিবীই বিমুগ্ধ হইয়াছে।

'মহি ভেল ভোর' বাক্যের প্রকৃত পাঠ ও তাৎপর্য্য যাহাই হউক না কেন, বর্ণিত কারণে এবং সুদূর শ্রীবৃন্দাবন-ধাম ও পাবনা জিলায় লিখিত দুই খানা বিভিন্ন পুথিতে প্রায় একই রকম পাঠ থাকায় 'কুবের-আনন্দ' বা 'কুবীর-আনন্দ' ই এই পদটির রচয়িতা—তাহাতে সন্দেহ না করিলেও চলে। 'কুবীর আনন্দ' নাম অর্থশূন্য; সুতরাং 'কুবের-আনন্দ' ই প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালায় মুশলমান-জাতির মধ্যে ক্বচিৎ 'কবীর' নাম দেখা গেলেও হিন্দু সমাজে এই নাম দেখা যায় না। দেখা গেলে—'কবীর আনন্দ' লিপিকর প্রমাদে 'কুবীর আনন্দে' পরিণত হইয়াছে মনে করিলেও করা যাইতে পারিত। বর্ত্তমান স্থলে সেরূপ মনে করার কোনও কারণ নাই। সুতরাং নানা কারণে আমরা এই পদটি 'কুবের আনন্দ' নামক কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল পদকর্ত্তার রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বিশেষত্বহীন একটি মাত্র পদ দেখিয়া পদকর্ত্তার কবিত্ব-শক্তির বিচার করা অসম্ভব। তবে যখন দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই একটি মাত্র পদের উপরই কুবের-আনন্দের সমস্ত নিন্দা বা প্রশংসা নির্ভর করিতেছে—তখন আমরা বেশী খুটি-নাটি না ধরিয়া যদি বলি যে, কুবের-আনন্দ এই পদে সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গোরা রূপের ভুবনমোহন মাধুর্য্যটি সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত বলা হইবে না। দুঃখের বিষয় যে, ইঁহার এই পদটি ব্যতীত আর কোন পদ পাওয়া যায় নাই—এবং এই পদটিও লিপিকর-প্রমাদে "গৌর-পদ-তরঙ্গিণীতে" এরূপ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে যে পদ-রস-সার ও রায় দৌলতপুরের পুথি আমাদিগের হস্তগত না হইলে—এই পদটির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার অসম্ভব হইত এবং পদকর্ত্তা কুবের-আনন্দের নামও বিস্মৃতির অতলগর্ভে চিরকাল বিলীন থাকিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

বঙ্কিম প্রসঙ্গ।

(৫)

আমি ১৮৭৯ সালের কথা বলিতেছি বলিয়া মনে হয়। আমার অগ্রজ ৺ অমৃতলাল বিশ্বাস মহাশয় একটু দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রিয় লোক ছিলেন। কি কারণে ঠিক মনে নাই, হুগলীর জমিদার ৺ ভূপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের সহিত দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। অনধিকার প্রবেশ, মারপিট, তস্করূপাত প্রভৃতি নানা অভিযোগে তাঁহাকে এবং তাঁহার কতিপয় কর্ম্মচারীকে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। বিচার-ভার অর্পিত হয় বঙ্কিম বাবুর উপর।

তখন কাছারী ছিল হুগলীতে। আমি সয়ের চাঁদের ঘাটে দাঁড়াইয়া আছি; দেখিলাম, গঙ্গা পার হইয়া বঙ্কিম বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিলেন। তিনি তখন হুগলীর স্পেশ্যাল সবরেজিষ্ট্রার। ঘাটে নামিবামাত্র চাপরাসী ছাতা ধরিল এবং তিনি ধীরগমনে আফিসে গেলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে বঙ্কিম বাবু আসিলেন। সেই গর্ব্বদীপ্ত, অথচ চিরসুন্দর মুখখানি দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। চাপরাসী তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিল; তিনি ছড়িটী হাতে করিয়া নৌকা হইতে নামিলেন। তখনও অনেক হাকিম নিজে ছাতা ধরিয়া মাথায় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তবে বঙ্কিম বাবু হাকিম হইবার পূর্ব্বেই এ প্রথায় অনুরাগী ছিলেন। তাহার একটু পরিচয়ও দিব। "পিতা-পুত্র" হইতে নিয়ের অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদের সহাধ্যায়ী পাইয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। কিন্তু এই গৌরবে একটা "কিন্তু" পড়িল। এখন যেখানে সিটিকলেজ, তাহার পশ্চিমধারের তেতালাবাড়ী হইতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়ী হইতে, আরদালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন শ্রেণীর গ্যালারীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সুন্দর, সুশ্রীগঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশে পাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমাজ্ঞান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। তৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেষ্টরী লইতেন। কৃষ্ণকমল বাবু প্রথম নামটী ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিম বাবু অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন "আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন, মহাশয়।" কৃষ্ণকমল বলিলেন "আচ্ছা"। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদিঘির ধার দিয়া, ছাতা ধরাইয়া, সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহার সহিত তখন বঙ্কিম বাবুর আলাপ হয় নাই। সেইটুকুই যা, কিছু কিন্তু। থাকুক "কিন্তু" তখন বুঝিয়াছিলাম, এখনও বুঝিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।"

যাক্। বঙ্কিম বাবু আমাকে দেখিয়া বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "আজ স্কুল যাস্ নি?"

আমি। "না, একটু কাজ আছে।"

বঙ্কিম। "বুঝেছি, অমৃতের মোকর্দ্দমা আজ বুঝি। তা বেশ বাপের নাম ডুবাতে বসেছিস। এইবার জেল-টেল খাট, তা হলেই মুখ উজ্জ্বল হবে।"

আমি। তা আমায় বক্‌চেন কেন, আমার দোষ কি?

বঙ্কিম বাবু ইহার কোন উত্তর না দিয়া কিছুদূর চলিয়া গেলেন। আমি পাছু পাছু যাইতেছি। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "দাদাকে ব'লো, এসব কাজ ভাল নয়। এবার বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু আর এমন না হয়।"

বঙ্কিম বাবু কোর্টে যাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই মর্ম্মে একটী স্লিপ লিখিলেন, "আসামী আমার বন্ধুপুত্র; সুতরাং এ মোকদ্দমা আমি করিতে পারি না। মোকদ্দমাটী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু শ্যামাধর রায়ের ফাইলে দেওয়া হয়।" তাহাই হইয়াছিল। মোকদ্দম

সেই দিনই নিষ্পত্তি হয়। কি একটী আইনের তর্কে আসামীরা বেকসুর খালাস পাইয়াছিল।

ইহাতে বঙ্কিম বাবুর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ের প্রতি সহানুভূতির বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এহেন বঙ্কিম বাবুর কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিতে সচীশ বাবু ৬৭৯ পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছেন শুনুন।

"বঙ্কিমচন্দ্রের একটী জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম রাখালচন্দ্র। রাখাল কাকা জিরেট বলাগড়ে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তথায় এক ব্যক্তি তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন। কুটুম্বের নাম—দ্বারিকাদাস চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি নৌকা করিয়া হুগলীতে প্রত্যেহ যাতায়াত করিতেন। দ্বারিকাদাস একদা আসিয়া বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, আজ আপনার নৌকায় আমি হুগলী যাইব।" বঙ্কিম বাবু, আহ্লাদে বলিলেন "বেশ"। উভয়ে নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা দুইজন ছাড়া নৌকায় আর কোনও ভদ্র আরোহী নাই। নৌকা যখন মধ্যপথে, তখন দ্বারিকাদাস একটী মোকর্দ্দমার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। মোকর্দ্দমাটী ফৌজদারী; ঘটনাস্থল জিরেট; তাঁহার কোনও বন্ধু বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি মোকর্দ্দমায় লিপ্ত। গল্পটী শেষ করিয়া দ্বারিকাদাস বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, আপনার হাতে মোকর্দ্দমা, আসামীকে কিছু শাস্তি দিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঝিদের আদেশ করিলেন, "নৌকা ভিড়াও!" নিকটে চর ছিল, মাঝিরা অবিলম্বে নৌকা লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চীৎকার করিয়া আদেশ করিলেন, "লোকটাকে নৌকা হতে ফেলে দে।" দ্বারিকাদাস নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কি রূপে তিনি গৃহে ফিরিয়া ছিলেন, তাহা অবগত নহি। কাঁটালপাড়ায় তিনি আর দর্শন দেন নাই বলিয়া শুনিয়াছি।"

বঙ্কিম বাবু কোপন প্রকৃতির লোক থাকিলেও একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য ছিলেন একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। তিনি জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও হৃদয়বান পুরুষ হইয়া একটী কুটুম্ব—যাহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে গঙ্গার চরে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন ইহা শুনিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। দ্বারিকাদাস বুদ্ধিমান ও বিবেচক ছিলেন না; থাকিলে সেরূপ অনুরোধ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। আর তাঁহার মত লোককে বঙ্কিম বাবু একটু সক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই একেবারে জড়সড় করিয়া ফেলিতে পারিতেন। তবে এতটা করিবার আবশ্যকতা কি ছিল, তাহা বলিতে পারি না।

একবার আমার মাননীয় বন্ধু মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয়কে আমার কি একটী অসুখের কথা বলি। তিনিও কি একটী ঔষধের ব্যবস্থা করেন। আমার কিন্তু সেটা মনে ধরে নাই; তাই বলিয়াছিলাম "এই সামান্য ঔষধে কি উপকার হইবে?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন "আরে ভাই, কেউ যদি দুধ খাইলে মরে, তবে আর তাহাকে বিষ খাওয়ান কেন?" তাই বলি, যিনি বঙ্কিম বাবুর একটী ভ্রুকুটি-ভঙ্গিতে কাঁটালপাড়ার 'তল্লাট' ছাড়িয়া পলাইবার পথ পাইতেন না, তাঁহাকে আবার গঙ্গার চরে হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া দেওয়া কেন?

গ্রন্থকার তবে এতটা লিখিলেন কেন? বিচার-বিভাগে যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে এমন অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা কখনও এরূপ নির্দ্দয় ও নির্ম্মম ব্যবহার করেন না। ঘৃণার চক্ষে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট হয়। সংসারে দেবতা তো নাই, মানুষ শতকরা ২।৫ টী, আর বাকী সব বাজে লোক। তাহারা ঘৃণার ও অবজ্ঞার সামগ্রী হইলেও কৃপার পাত্র।

বঙ্কিম বাবু কিরূপ স্নেহবান পিতা ছিলেন তাহা গ্রন্থকার (৬৬৫ পৃষ্ঠায়) একটী ক্ষুদ্র গল্পে সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন।

"বঙ্কিমচন্দ্রের দুইজন পাচক ছিল; কিন্তু তাহারা

প্রভুর আহার্য্য থালীতে সাজাইয়া আনিয়া দিত না। সে ভার কন্যা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃসেবায় তৃপ্তি, পিতার সে সেবা-গ্রহণে তৃপ্তি। একদিন রাত্রিতে কন্যা আহার্য্য আনিয়া যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পিতাকে ডাকিলেন, "বাবা, খাবার দিয়েছি এস।" পিতা উত্তর দিলেন না। তিনি ঘরের ভিতর মুদ্রিত নয়নে চেয়ারে উপবিষ্ট, কন্যা বারাণ্ডায় থালার কাছে দণ্ডায়মান। পিতার উত্তর না পাইয়া কন্যা আবার ডাকিলেন, "বাবা, এস!" পিতা নিরুত্তর। কন্যা পুনরায় ডাকিলেন। অবশেষে খুড়ীমা উঠিয়া চেয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুলে নাকি?" বঙ্কিচন্দ্র মৃদুকণ্ঠে তখন উত্তর করিলেন, "চুপ কর, শরৎ ডাকছে—আমায় শুন্‌তে দাও।" একখানি উপন্যাস লিখিয়া যাহা বুঝান যায় না, একটী ক্ষুদ্র কথায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ব্যক্ত করিলেন।"

কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে এই ভাব, এই মাধুর্য্য এই প্রাণের অতৃপ্ত পিপাসার কথা, তাঁহার নায়িকা রজনী একস্থানে দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—

"কে, রজনী।"

সব ভুলিয়া গেলাম। রাগ ভুলিলাম, অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম। কানে বাজিতে লাগিল—"কে রজনী।" আমি উত্তর করিলাম না,—মনে করিলাম আর দুই একবার জিজ্ঞাসা করুন, আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "রজনি! কাঁদিতেছ কেন?" আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল—চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না, আরও জিজ্ঞাসা করুন। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।"

পাঠক দেখিবেন বঙ্কিম বাবুর মনের ভাবের সহিত তাঁহার চিত্রিত চরিত্রের মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল। এখন ঐ রজনী হইতে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। সেটী অশিক্ষিত ষণ্ডা হীরালালের গুণ্ডামি। হীরালাল না বিবাহে, না কোন দিকেই দেশের উন্নতির 'এক জাম্পল সেট' করিতে না পারিয়া ক্ষুন্নমনে বিদায় হইল।" একথা বঙ্কিম বাবু স্বয়ং লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি একটী একজাম্পল সেট করিয়াছিলেন। তাহা এই—

তাহার পর, শেষ রাত্রে, হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল "এই খানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকা-তলে ভূমিস্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল, "নাম—আসিয়াছি।" সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।"

হীরালাল কাণা রজনীকে গঙ্গার চরে অসহায়া ফেলিয়া গেল। তবু হাতটী ধরিয়া নামাইয়াছিল, ফেলিয়া দেয় নাই। কিন্তু শচীশ বাবুর মতে বঙ্কিম বাবু দ্বারিকাদাসকে গঙ্গার চরে ফেলিয়া দিবার হুকুম দেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই প্রায় এক বটে, আর সেই জন্যই কি গ্রন্থকার সেই দেবচরিত্র বঙ্কিমের সহিত হীরালালের চরিত্রের সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন? দেখাইলেও আমরা দেখিব না। বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠা বোধ করিব। কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে এমন নৃশংস ব্যবহারের সমর্থন করিতে কেহই অভিলাষী হইবেন না।

কাঁটালপাড়ার রথের নাম এখনও আছে, তখন খুব জাঁক ছিল। একবার বঙ্কিম বাবু আমার পিতৃদেবকে রথের সময় কাঁটালপাড়ায় যাইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। তিনিও গিয়াছিলেন। তাঁহারা আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় আসিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি ভিক্ষুক তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। বঙ্কিম বাবু সম্মুখে ছিলেন, তিনি পকেট হইতে ২।৩টী টাকা বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন, যে পাইল কুড়াইয়া লইল, বাকী সকলে মহা হৈ চৈ করিতে লাগিল। তখন বঙ্কিম বাবু ইঙ্গিতে বাবাকে দেখাইয়া দিয়া বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আর তাহারা ছাড়ে কি?

বঙ্কিম বাবু তখন বৈঠকখানার জানালায় দাঁড়াইয়া মৃদু মধুর হাস্যসহকারে মজা দেখিতেছেন। পিতা সমাগত কাঙ্গালিদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া হৃষ্টমনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তখন বঙ্কিম বাবু সহাস্যে বলিলেন,

"আজ একটু নষ্টামি করিতে গিয়া দেখিতেছি সৎকাজই হইয়া গেল।"

এখনকার বাবুরা আর এমন সৎকাজের পক্ষপাতী আছেন কি? বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া কাঙ্গালি বিদায়ের ব্যবস্থা করিতে কয়জন প্রস্তুত?

তখন সত্যসত্যই লোকে দরিদ্রকে কিছু দিতে পারিলে যেন আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তখনকার বাবুরা কোথাও যাইতে হইলে হিসাবমত টাকা লইয়া বাহির হইতেন না। ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিব।

আমার পিতামহীর শ্রাদ্ধ একটু জাঁকজমকের সহিত হইয়াছিল। আমাদের আদি বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত বালোড় গ্রামে এই শ্রাদ্ধ হয়। সহরাঞ্চলে অভাবের চিন্তা থাকে না; কিন্তু পল্লিগ্রামে তাহাই বেশী।

কাঙ্গালি প্রচুর হইয়াছিল। বিদায় আরম্ভ হইয়াছে; এমন সময় কে আসিয়া বলিল—কাঙ্গালি বিদায়ের ৩০০৲ টাকার পয়সা চুরি গিয়াছে। পল্লিগ্রামে মনে করিলেই তিনশত টাকার পয়সা পাওয়া যায় না, সুতরাং একটু চিন্তার কারণ উপস্থিত হইল। দাদা আমার পয়সা আনাইবার চেষ্টা না করিয়া চোরের তদন্তে নিযুক্ত হইলেন। বাবা এই কথা শুনিয়া বলিলেন "কাহাকেও কোন কথা বলিও না, কাঙ্গালি বিদায়ের ধনে কাঙ্গালিরই অধীকার। কাঙ্গালী ভিন্ন কে আর সে পয়সা লইবে।"

দাদার রাগ তখন সপ্তমে উঠিয়াছে, তিনি বলিলেন "তবে কেমন করিয়া কাঙ্গালি বিদায় হইবে, তাহার ব্যবস্থা করুন। পয়সায় কম পড়িবে।" তখন একটী ভদ্রলোক সহাস্যে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "অমৃত ভয় নাই, আমি পাঁচশো টাকার দোয়ানি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, এই নাও। এসব বৃহৎকার্য্যে এমন গোল হইয়াই থাকে।"

সকল অভাব পূর্ণ হইল। লোকটীর নাম মনে নাই, তিনি আমার পিতৃবন্ধু। সাহাগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমিদার নন্দী বাবুদের কে একজন।

বঙ্কিম বাবু স্বহস্তে পয়সার ব্যবহার করিতেন না, সেই জন্য ভিক্ষার্থী একটী পয়সা চাহিয়া হয় তো টাকাটা সিকাটা পাইয়া যাইত। তখন এ সকল আমিরী, সাহেব সুবাদের মধ্যেও খুব ছিল। কমিশনার সি, টি, বাকল্যাণ্ড সাহেব টাকা পর্য্যন্ত ছুঁইতেন না। নোটেই কারবার চলিত। ঠিকা গাড়ীতে চাপিয়া তিনি বার আনার পরিবর্ত্তে পাঁচ টাকার একখানি নোট দিতেন। আর আমির ছিলেন—বঙ্গের ছোটলাট ইডেন সাহেব। তিনিও টাকা ছুঁইতেন না। টেবিলে নোটের তাড়া সাজান থাকিত। একবার পিতা ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে বাগানের আম পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে যায় একটী সরকার ও দুইটী নগদা মুটে। সাহেব তাহাদিগকে একখানি দশ টাকার নোট বক্‌সিস্ দিয়াছিলেন।

বঙ্কিম বাবু কখন ট্রামে চাপেন নাই। সঞ্জীব বাবুর যখন অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তখনও তিনি ট্রামে চাপিতেন না। জানি না, পূর্ণ বাবু চাপিয়াছেন কি না? বঙ্গদর্শন আফিস যখন বৌবাজারের মোড়ে, তখন সঞ্জীব বাবু নৈহাটী হইতে যাতায়াত করিতেন। দুইবেলাই দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকা গাড়ীতে আসিতেন।

বঙ্কিম বাবু অনেক সময় অনেক কথার উত্তর দিতেন না। কখন বা অন্যমনা থাকিতেন, কখন বা কাহারও প্রতি স্থিরদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতেন। কিন্তু তাহাতেই কথার উত্তর প্রদত্ত হইত। একটী দৃষ্টান্ত দিব।

হাইকোর্টের বিচারপতি নরীশ সাহেব একবার আদালতের অবমাননা জন্য বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারাবাসের আদেশ দেন। সঞ্জীব বাবু নৈহাটী যাইবার সময় ট্রেণে সুরেন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে দেখিতে পান; কিন্তু তিনি সেই আদর্শ মহিলার মুখভাবে বিন্দুমাত্র বিচলতা না দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, এবং সেই কথা বঙ্কিম বাবুকে বলায় বঙ্কিম বাবু "বটে" এই কথাটী মাত্র বলিয়া ভ্রূযুগল ধনুকাকারে পরিণত করিয়া সটকার ধুম মুহুর্মুহু বাহির করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু সেই "বটে" কথাটীর মধ্যে অনেক কথার আভাস পাইয়াছিলাম।

বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে একটী বড় মজার গল্প আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বঙ্কিম বাবু নাকি এক-

বার লুপলাইন দিয়া সস্ত্রীক ট্রেণে আসিতেছিলেন। তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন। ট্রেণ একটী ষ্টেশনে থামিলে রেলের একটী ছোক্‌রা বাবু তাঁহার কামরার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাঁহার স্ত্রী অবশ্য তখন প্রৌঢ়া ও অবগুণ্ঠনবতী।

বঙ্কিম বাবু নাকি এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া যুবকটীকে গাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া নিকটে বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কি করবাবু?"

"রেলে চাকরী করি।"

"কত বেতন পাও?"

"ত্রিশ টাকা।"

"বেশ, তা তুমি এই স্ত্রীলোকটীকে দেখ্‌বার জন্য অত ঝাঁটু বাঁটু কর্‌ছিলে কেন? এই আমি ঘোমটা খুলে দিচ্ছি, তুমি ভাল করে দেখ।"

এই বলিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিয়া বলেন "আমার নাম বঙ্কিম চাটুর্য্যে। ডেপুটী গিরি চাকরী করি, বেতন পাই আটশো টাকা। অনেকগুলি পুস্তকও আছে। তা থেকেও বেশ টাকাকড়ি পাই। সেই সব এঁর হাতে সঁপে দিয়েও মন পাইনে। এখন চেষ্টা করে দেখ, যদি তুমি কিছু কর্‌তে পার।"

যুবক শেষ পালাইতে পথ পায় না। এ ঘটনার সত্যাসত্যসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার আমার কোন কথা ছিল না। তবে জানিবার কৌতূহল হইত, কেন না কথাটা তখন খুব 'চাউর' হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্কিম বাবু কোন কোন লোককে নাকি বলিয়াছিলেন ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর তাই সম্ভব। এতটা বাচালতা আমরা বঙ্কিম বাবুতে দেখি নাই; কিন্তু কথাটা উঠিল কোথা হইতে তাহা এখনও জানি না।

কথাটা বঙ্কিম বাবুর না হইলেও ইহাতে কল্পনার স্ফূর্ত্তি আছে। সমাজের উপর একটু তীব্র কটাক্ষ আছে। অনেক রেলের বাবু, পথের বাবু প্রকৃতই রেল বা ষ্টীমারে ভদ্র মহিলার প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাতে এখনও বিরত নহেন। তবে অনেক কমিয়া আসিতেছে। মধুপুর দেওঘর প্রভৃতি স্থানে ভদ্র মহিলারা অবাধে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, আর ভদ্রসন্তানগণ তাঁহাদিগকে দেখিলে ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু অন্যত্র সে ভাব নাই। এটা কি স্থান মাহাত্ম্য? দার্জ্জিলিং, কার্সিয়ং প্রভৃতি স্থানেও কিন্তু এই সাধু প্রথার প্রবর্ত্তনা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে।

বঙ্কিম বাবুর কথাবার্ত্তায় যে মাধুরী ছিল, তাহা তাঁহার নিতান্ত বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; অপরের ভাগ্যে তাহা জুটিত না। তিনি কাহারও বাটীতে গেলেও দুটা প্রাণের কথা কহিতেন না, একটু প্রাণের হাসি হাসিতেন না। চাই তাঁহার প্রাণের বন্ধুবান্ধব। তবে তাঁহার স্ফূর্ত্তি জাগিত; তখন বঙ্কিম একাই একশো হইয়া দাঁড়াইতেন। দীনবন্ধু বাবু, গঙ্গাচরণ বাবু (সরকার), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কোন মজলিসে উপস্থিত হইলে যেন সভামধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিত, সকলেই উল্লাসিত হইতেন। বঙ্কিম বাবুতে তাহার অপ্রতুলতা ছিল না; কিন্তু অন্তরায় ছিল সেই "কিন্তু"।

সামান্য বস্তুও বঙ্কিম বাবুর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত না, ইহা আমরা পরে দেখাইব। এখন একটী সামান্য বিষয় হইতে বঙ্কিম বাবুর ভাবুকতার যৎসামান্য পরিচয় গ্রহণ করুন দেখি, আর ভাবিয়া দেখুন সেই সাহিত্য-সম্রাটের কল্পনাপূর্ণ বিশালচিত্তে কখন কোন ভাবের সমাবেশ হইত।

মহাষ্টমীর রাত্রিতে পূর্ণ বাবু মহামায়ার দিকে চাহিয়া আছেন, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র। অসুরের মাথায় একটী বিল্বপত্র ছিল। দূরে থাকা প্রযুক্ত তাহা কি বুঝিতে না পারিয়া, পূর্ণ বাবু প্রশ্ন করিলেন—"অসুরের মাথায় ওটা কি?"

বঙ্কিম। উহা গণেশের ইন্দুর।

পূর্ণ। গণেশের ইন্দুর অসুরের মাথায় কেন?

বঙ্কিম। ক্ষুদ্র জানোয়ারেরা অসুরের ঘাড়ে উঠিবার এই উপযুক্ত সময় পাইয়াছে। ঐ দেখ কার্ত্তিকের ময়ূর অসুরকে ঠোকরাইবার নিমিত্ত ঘাড় বাঁকাইয়াছে—আর ঐ দেখ,প্রতিমার চারিধারে যে সোনার পক্ষীগুলা আছে,

উহারা ডানা ঝাড়িতেছে, এইবার উড়িয়া আসিয়া অসুরের ঘাড়ে বসিয়া ঠোকরাইবে।

পূর্ণ। অসুরের অপরাধ ?

বঙ্কিম। অপরাধ কিছুই নয়—যাহারা প্রবল প্রতাপান্বিত, অপরাজিত, যাহাদেরে সকলে ভয় করে, তাহাদের মুমূর্ষু অবস্থায় ক্ষুদ্র প্রাণিগণ তাহাদের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করে।

পূর্ণ। অসুরের ত এখনও মুমূর্ষু অবস্থা নয়। ঐ দেখুন, ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া দেবীকে তরওয়াল উঠাইয়া মারিতে উদ্যত।

বঙ্কিম। বটে বটে! বীর পুরুষেরা—তেজস্বী পুরুষেরা শত্রুহস্তে ঐরূপেই মরে, মরেও মরে না। কিন্তু অসুরের আর কি আছে? অসুর ত মরেছে। সিংহী ভীষণ দন্তদ্বারা উহাকে দংশন করিতেছে; আর দেবী একটা ভয়ানক সাপ উহার গায়ে ছাড়িয়াছেন। সে মুহুর্মুহুঃ উহাকে ছোব্‌লাইতেছে, আর তিনি স্বয়ং দক্ষিণের এক হস্তে বর্শাদ্বারা সজোরে উহার বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছেন। আর বাকী অষ্ট হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাকে নানা অস্ত্রদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন—অসুর মরেছে—ক্ষুদ্র প্রাণীদের ঘাড়ে চরিবার এই ত সময়।

ধন্য কল্পনা! এটা বঙ্কিম বাবুর ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমের কথা। (সাহিত্য, ২৪ ভাগ।)

আবার এই বঙ্কিমচন্দ্রই একদিন গাইয়াছিলেন—

"আমার আঁটা ঘরে সিঁধ মেরেছে
কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেলখানাতে রাখ্‌বো তারে দিবারাতি॥
মন বা তার লজ্জা তালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গবো ডালা,
লুটে নিবো প্রেমনিধি তার
ভাঙ্গা বাক্সে মেরে লাতি॥"

বঙ্কিম বাবু "দেবী চৌধুরাণীতে" লিখিয়াছেন "আ! ছিছি বাইশ বৎসর।" আমরাও বলি "আ! ছিছি বাইশ বৎসর!"

বাস্তবিকই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর মানসিক উন্নতি ও প্রতিভার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা ক্রমে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, বঙ্কিম বাবু সকল বয়সেই অশ্লীল বা গ্রাম্য রসিকতার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ইয়ারকিতেও একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইত। তিনি বিচারকালেও সময়-বিশেষ একটু নির্ম্মল, সংযত হাস্যের অবতারণা করিতেন। আমরা নিম্নে তাহার দুই একটী উদাহরণ দিলাম।

একবার একজন নালিশ করে যে, একটী বাবু জানালা খুলিয়া তাঁহার স্ত্রীকে দেখে। বঙ্কিম বাবু মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিয়া বলেন—"হাওয়া আর চোখ কি কারও মানা মানে গা?"

আর একটী এই ধরণের মোকর্দ্দমায় বলেন—"আসামী যে তোমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে, তা জান্‌লে কি করে?"

উত্তর "স্ত্রীর মুখেই শুনিয়াছি।"

বঙ্কিম। তা হলে বুঝতে হবে যে তোমার স্ত্রীরও চেয়ে দেখা রোগটা আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

গান।

কি গান গাহিব আমি ?—সব গেছি ভু'লে,
মনে ত পড়ে না আর সাধের সে গান !
বেড়াতেম গে'য়ে গে'য়ে মরা নদী কূলে
ছল ছল জল গুলি বহিত উজান।
ভে'ঙ্গে গেছে বীণা মোর, ছিড়ে গেছে তার
কে'টে গেছে হা হুতাশে কত দীর্ঘ দিন!
বহিতে পারিনে সেই যাতনার ভার,
কে দিবে যুড়িয়ে মোর সাধের সে বীণ!
প্রতি তানে কে জানি সে ছাড়িত নিশ্বাস
আকুল হৃদয় মোর হইত অধীর!
ফুল গুলি ফু'টে ফু'টে বিতরিত বাস
ঝরিত নয়নে তার নিশির শিশির!
কে জানি সে পাছে থে'কে দিত এ'সে মান
ভু'লে গেছি সে রাগিনী—ভু'লে গেছি গান!

কায় কোবাদ

আশ্চর্য্য ঔষধ।

(গল্প)

নন্দপুরের গোবিন্দ ঘোষের পত্নী স্বীয় পুত্র গোপালের জন্ম রূপকথার রূপসী রাজকন্যার মত টুকটুকে বৌ আনিবেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন। কাজেই পুত্রটী মা সরস্বতীর কৃপায় এম্‌এ-বিএল্ পাশ করিলেও বহুদিন তাহার 'আইবুড়ো' নাম ঘুচিল না। পঙ্গপালের ন্যায় ঘটকের দল রূপসী রাজকন্যার তালাসে দেশ বিদেশে ঘুরিতেছিল; কিন্তু 'কুচবরণ কন্যা, মেঘবরণ চুল' কোথাও মিলিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়া ঘটকের দল সরিয়া পড়িল, বেচারা গোপাল বিষম ঘাব্‌ড়াইয়া গেল; কারণ (যদিও লোকে বলে, বয়সের গাছপাথর নাই) বয়স ক্রমশঃই বাড়ে, কমে না, এবং যৌবন একবার গত হইলে আর ফিরিয়া যায় না। ক্রমে গোপাল একটু একটু করিয়া সংসারে বীতস্পৃহ হইতে লাগিল, মুখে মুখে বলিত 'কুমার জীবনের মত সুখের জীবন আর নাই, কারণ দুনিয়াতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ হচ্ছে স্বাধীনতা'; কিন্তু তাহার অযত্নরক্ষিত লম্বা রুক্ষ চুল, দাড়ি গোঁফ নখ প্রমাণ করিয়া দিল যে তাহার অন্তর এরূপ স্বাধীনতা অপেক্ষা 'অধীনতার' ই অধিক কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমশঃ তাহার শরীর রোগা হইতে লাগিল, শাস্ত্রাদি ধর্ম্মগ্রন্থে অসম্ভব মনোযোগ দেখা গেল, এবং পাঠক বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে বলি, কোকিলের উদাস-করা তান ও রাধাকৃষ্ণের বিরহ শ্লোক পড়িয়া সে কাঁদিয়া বুক ভাসাইত এবং বিরলে বিজনে বসিয়া মেলাই বিরহের কবিতা লিখিত।

দেখিয়া শুনিয়া মাতা অধীর হইয়া পড়িলেন, মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে গোপালের কল্যাণের জন্ম ধন্না দিয়া পড়িলেন, পূজা মানিলেন, এবং কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে স্বামীকে ধরিয়া পড়িলেন—"তিন মাসের মধ্যেই গোপালের বিবাহ দেওয়া চাই-ই।"

গোবিন্দবাবু হাসিয়া বলিলেন "'মেঘবরণ চুল, কুচবরণ কন্যা' 'সোনারূপার কাঠির' স্পর্শে কোনও জমিদারের ঘরে ঘুমাইয়া আছে—এরূপ খবর ঘটকেরা ত আজিও দিতে পারিল না। তবে মেঘবরণ কন্যা ঘরে ঘরেই আছে। তিনমাস কেন, বলত আজই যোগার করা যায়।" পত্নী বলিলেন—"তোমার ও হেঁয়ালী রাখ। এখন যাতে গোপালের ভাল বৌ পাওয়া যায়, তাই দেখ। বাছা যে কালি হয়ে গেছে।"

গোবিন্দ বাবু। "একি বৌ বৌ করে ?"

পত্নী। "কি জানি কেন ? খাচ্ছে দাচ্ছে, তবুও দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, কণ্ঠের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বাছা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।"

গোবিন্দবাবু। "কিন্তু কোনও জমিদারের ঘরে ত অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে মিলে না। গরীবের ঘরে দুএকটী আছে, তা—"

পত্নী। "না না, গোপালকে গরীবের ঘরে বিয়ে দোব না। আদর যত্ন পাবে না, কিছু না, কিছু না। বিয়েতে কিছু দেবে থোবে না, ধূমধাম করবে না, তেং তেং করে বিয়ে দিয়ে দেবে। ও কি আবার বিয়ে নাকি, ওতে আবার সুখ আছে?"

গোবিন্দবাবু হাসিয়া বলিলেন "কেন তোমার আমার ত গরীবানা ভাবেই বিয়ে হয়েছিল, তাতে কি আমরা সুখী হই নাই; বিয়েতে লাখ টাকা খরচ হলে কি আমরা আরও বেশী সুখী হতেম?"

পত্নী। "তা কি হয়? তবে কি জান্লে, সাধ আহ্লাদ সবারই আছে। একটী মাত্র ছেলে, বড় বড় পাশ দিয়েছে, তার বিয়েতে আত্মীয় বান্ধব দশজন আসবে, আমোদ-আহ্লাদ কর্ব্বে, তা না ঢেংঢেঙিয়ে বিয়ে হয়ে যাবে, কেউ আসবে না, এটী কি কাজের কথা বল? লোকেই বা কি বলবে?"

গোবিন্দ বাবু। "কেন আমরা সাধ্যমত খরচ কর্ব্ব। যে কশ টাকা নগদ আছে—"

পত্নী গাল হাত দিয়া বলিলেন—"ওমা সে কি গো, ছেলের বিয়েতে ঘরের টাকা খরচ কর্ব্ব!"

গোবিন্দ বাবু। "কেন তাতে দোষ কি?"

পত্নী। দোষ কি? খুব দোষ, তোমাকে সে বোঝাতে পার্ব্বো না। ছেলের বিয়েতে মা তার সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে পাঁচজন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করে আমোদ করে,—তুমি তাতে বাধা দিও না। গরীবেরা দিতে পার্ব্বে না বলেই ত আমি গরীবের মেয়ে আনতে চাচ্ছি না। বড় বড়লোকের টাকা দিতে কিছু কষ্ট হবে না, তাই জমিদারের মেয়ে চাই।

তুমি ঘটককে বলে দিও—ছেলে এম এ বিএল্ পাশ, নগদ পাঁচ হাজার চাই, তাহারা সোণার ঘড়ি, চেন, সাইকেল, রূপার দানসামগ্রী, যা দেবার তা'ত দেবেই, আর মেয়েকে তিনশ ভরির গয়না দেবে। তা যিনি এ দিতে পার্ব্বেন, তার মেয়েই আনব, আমরা জোর কচ্ছি না ত"।

গোবিন্দ বাবু কাজেই ঘটকদের তাহাই বলিয়া দিলেন। টিকি ঝাড়িয়া, কোমরে চাদর জড়াইয়া, সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া ঘট-কচুড়ামণিরা দেশ বিদেশে ছুটিল। গোপাল নিশ্চিন্ত হইয়া নবপ্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে রাশি রাশি প্রেমের কবিতা লিখিতে লাগিল; দু'একটা মাসিক পত্রিকাতে ছাপাও হইল। বিবাহের পর কোন্ কোন্‌টী প্রণয়িনীকে পাড়িয়া শুনাইবে, গোপাল তাহা স্থির করিয়া রাখিল।

(২)

দেশী ও বিলাতী বাজনার খিচুরী রাগিণীর ভিতর সুসজ্জিত, আলোকোজ্জ্বল আসরে গোপালের সহিত মনোহরপুরের জমিদার শশীশেখর দত্তের কন্যা জ্যোৎস্নার বিবাহ হইয়া গেল। জ্যোৎস্না চাঁদের জ্যোৎস্নার মতই সুন্দরী—নাক, চোখ, মুখ, বর্ণ সবই অনিন্দ্য, যেন একটী জীবন্ত ও ফুটন্ত ফুল অথবা শাপভ্রষ্টা দেবতা কন্যা। কাজেই গোপাল শুভদৃষ্টির সময় অপাঙ্গে নবোঢ়া পত্নীকে দেখিয়াই খুব ভালবাসিয়া ফেলিল। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা 'বিবিধ' উপন্যাসই সে পড়িয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছিল, প্রথম দর্শনে কি করিয়া ভালবাসিতে হয়, শিখিয়া রাখিয়াছিল; কাজেই শুভদৃষ্টির সময় ব্রীড়াসঙ্কুচিত আধফোটা ফুলের মত ঐ মুখখানি দেখিয়া অমনি ভালবাসিয়া ফেলিবে তাহাতে বিচিত্র কি, দোষই বা কি?—পাঠক মহাশয় বিনা কারণে হাসিতেছেন। বিবাহ-বাসরেই গোপালচন্দ্র তাহার হৃদয়, প্রাণ, মন, দেহ, আত্মা ইত্যাদি—অর্থাৎ তাহার নিজস্ব যাহা কিছু ছিল সবই—পত্নীকে দান করিল; এবং দান করিয়া দাতা যেরূপ অনাবিল তৃপ্তি লাভ করে, তদপেক্ষা ঢের ঢের বেশী তৃপ্তি লাভ করিল; কারণ উপযুক্ত গৃহীতা সচরাচর কেউ বড় একটা পায় না।

ঐ মুখচন্দ্রমার প্রতি অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকিবার অদম্য ইচ্ছা থাকিলেও দারুণ লজ্জায় গোপাল তাহা পারিল না; কারণ বিবাহ-সভায় এক পাল যুবক-যুবতী বর কি করিতেছে, কেবল তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। তবে ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় গোপালের মনে হইতেছিল, সত্যযুগের মুনিঋষিদের মত ক্ষমতা থাকিলে সে সহসা সভার লোকগুলিকে সে সময়ের জন্য দৃষ্টিহীন করিয়া দিত। বাহিরে রসনচৌকী বড়ই মিঠা সুরে

বাজিয়াছিল, কাজেই হৃদয় যমুনার প্রেমের উজ্জ্বল তরঙ্গ জাগিয়াছিল, এবং উপন্যাসের বাছা বাছা সম্বোধনগুলি গোপালের কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল।

বিবাহের পর বর কনে বাসর ঘরে নীত হইল; কিন্তু এমনই মেয়েদের কাণ্ড, তাহারা আর ঘর ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না। গোপালের ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিতে চাহিল। মানুষের বিশ্রাম চাই ত। সমস্তটা রাত্রি পুরোহিত বেটার সঙ্গে বিং বিং করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে,—ওর নাম কি, এর নাম কি, এর সঙ্গে একটু আলাপ করিয়া পরিশ্রমটা দূর করিবে, তা না মেয়েগুলি বাতি জালিয়া ঘরে বসিয়া আছে। কেনরে বাপু তোদের চোখে কি ঘুম নাই,—তোদের কি স্বামী নাই? রাত্রি তিনটা বাজে, বেচারারা ত হা করিয়া ঘরে বসিয়া আছে, বা না। কিন্তু মেয়েরা নড়িল না। অগত্যা গোপাল বিছানায় সটান পড়িয়া গঁ গঁ করিয়া নাক ডাকিতে লাগিল। মেয়েরা বহুচেষ্টায় তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে অপারগ হইয়া একে একে প্রস্থান করিল। তখন গোপাল ধীরে ধীরে উঠিয়া জ্যোৎস্নার নিকটে গেল। শয্যার এক প্রান্তে জ্যোৎস্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গোপাল তাহাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইল; এবং জাগাইয়া বেশ একটা রসাল সম্বোধন করিল। বেচারা জ্যোৎস্না সমস্ত দিন উপবাসী ছিল, রাত্রিশেষে ঘুমটা বেশ আসিয়াছিল, কাজেই সে সম্বোধনটার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না, বলিল "আঃ বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া গোপাল বলিল—

"প্রিয়তমে, আজি জীবনের অতি মধুর সময়;
হেসে কও দুটী কথা,
জুড়াও মরম ব্যথা,
উভয়ের হৃদি আজি হ'ক বিনিময়"।

বলিয়াছিত গোপাল কবিতা লিখিত। এহেন কবিতা শুনিয়া জ্যোৎস্নার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সে বলিল "চুপ, চুপ, আস্তে; ও পাশে সবাই আড়ি পেতেছে।"

কিন্তু তখন গোপাল প্রেমে ডগমগ, হৃদয়ে প্রেম উথলিয়া উঠিলে আত্মা পার্থিব জগত ছাড়িয়া এক অজানা অপার্থিব রাজ্যে চলিয়া যায়, ঘৃণা লজ্জা, ভয় কিছুই থাকে না,—গোপাল বলিতে লাগিল, "জীবিতেশ্বরী (কিছুদিন পূর্ব্বেই গোপাল দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়াছিল) বাহিরের জগত ছাড়িয়া চল আমার প্রেমের রাজ্যে, কল্পনার মধুময় প্রদেশে প্রবেশ করি; সেখানে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—"

জানালার পাশ হইতে রমণীকণ্ঠে কে বলিল "এবং আড়ি পাতা নাই—" আর একজন বলিল—"শুধু কবিতা আবৃত্তি করা আছে"—তৃতীয়া বলিল "চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজান আছে। ননীগোপাল ছাদেযাবে"?

শ্রীমান্ গোপাল—এম্ এ, বি এল্ গোপাল এতটুকু হইয়া গেল. এবং বালিশে মুখ গুজিয়া অসারের মত পড়িয়া রহিল। রমণীরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বেচারা সে রাত্রি আর পত্নীকে সম্ভাষণ করে নাই। বিবাহের পর নববধূরূপে জ্যোৎস্না শ্বশুরগৃহে গিয়াছিল। আজন্ম সুখের ক্রোড়ে লালিতা সে, শ্বশুরের পর্ণকুটির তাহার ভাল লাগিল না। কদিন পর পিতৃগৃহে ফিরিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মাকে বলিল "মা তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমাকে আর সেখানে পাঠিও না।"

মাতা হাসিয়া বলিলেন "কেন?"

জ্যোৎস্না বলিল—"বাবারে, সেখানে আবার মানুষ থাকতে পারে। চারিদিকে বনজঙ্গল, তারই মাঝখানে মাটির ছোট ছোট কখানি ঘর, স্যাঁৎ স্যাঁতে,—অন্ধকার। সন্ধ্যা হ'লে মাগো চারিদিকে শেয়াল ডাকে, তখন কি ভয় করে! পুকুরের জল খেতে হয়, বামুন নেই, চাকর নেই।"—মাতা বলিলেন "তবে কাজ করে কে?"

জ্যোৎস্না বলিল "শাশুড়ী।"

মাতা। "বয়স হয়েছে, তা কাজ কত্তে পারে?"

জ্যোৎস্না। "তোমাদের মত ত আর চাকর বামুন নেই, কি কর্ব্বে?"

মাতা। "তা বটে।"

জ্যোৎস্না বলিল—"অমন গরীবের ঘরে আমি আর যেতে পার্ব্ব না।"

মাতা। "বিয়ের পর মেয়েদের আজীবন শ্বশুরবাড়ীই থাক্‌তে হয়।"

জ্যোৎস্না। "তাই নাকি? তবে আমাকে বিয়ে দিলে কেন?"

মাতা। "মেয়ে আইবুড়ো থাক্‌লে নিন্দা করে।"

জ্যোৎস্না। অমন পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দিলে কেন?"

মাতা বুঝিলেন কাজটা কাচা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিয়াছেন; মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন জামতা উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েকে স্বামীগৃহে পাঠাইবেন না। মেয়েকে বলিলেন "আচ্ছা, আর তোকে সেখানে পাঠাবো না।" তারপর কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গোপাল কেমন রে?" বালিকা বলিল "মানুষটি মন্দ নয়, তবে বড্ড বেশী বকে, ঘুমুতে দেয় না, কেবল কবিতা শোনায় মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝি না। আর ঘুমালে রাগ করে।"

মাতা হাসিয়া বলিলেন "সত্যি নাকি? তুইও এবার কবিতা শিখে যাস্, শোনাবি জব্দ হবে।" 'পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল' জানিস্ ত? জ্যোৎস্না বলিল "যাও।"

জ্যোৎস্না একেলে মেয়ে হইলেও একটু সেকেলে ধরণের—নাটক নভেলাদি পড়ে নাই, স্কুলে যায় নাই, কাজেই তের বছর বয়সে ইচরে পাকে নাই; সেজন্য বিবাহের পরই—'হা প্রাণনাথ, হা জীবিতেশ্বর' করিয়া ক্ষেপিয়া উঠে নাই। স্বামীর সহিত কথা কহিতে তাহার বড়ই লজ্জা করিত। গোপালচন্দ্র তাহাকে প্রত্যেহই একখানি চিঠি লিখিত,—তাহাতে কত প্রেমের ফোয়ারা, কত কবিতা থাকিত, কিন্তু হায় সবই ব্যর্থ হইত; কারণ, সে চিঠি পড়িয়া যতটুকু বুঝিত তাহাতেই সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত এবং তাহার উত্তর দিত না। প্রেমিক গোপাল কাজেই বড়ই দুঃখিত ও হতাশ হইল;—প্রেমিকগণ প্রেমের প্রতিদান চাহে। যদিও প্রেমিক কবি বলিয়াছেন—"ভাল যদি বাসহে সখা, দূরে দূরে সরে থেক দিও না দেখা।"

গোপাল স্থির করিল, কাছে আনিয়া না রাখিলে ঐ অরসিকা ও অপ্রেমিকা পত্নীর কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। জীবনের এই কাণ্ডটা ব্যর্থ হইলে হায় সবই যে ব্যর্থ হইল!

কাজেই একদিন দুপুরে যখন মাতা পাক করিতেছিলেন, তখন সে রান্না ঘরে ঢুকিয়া, কাশিয়া গলা পরিস্কার করিয়া বলিল "এ বয়সে রান্না করাটা মা তোমার আদৌ সাজে না।" মাতা বলিলেন "তা স্বামী-পুত্রের জন্য রান্না করা তার আর সাজা না সাজা কি?"

গোপাল। "তা আমাদের ত একটা কর্ত্তব্য আছে? লোকে যে আমার বড় নিন্দা কচ্ছে?"

মাতা বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তোর নিন্দা কচ্ছে?"

গোপাল। "হঁা, তা কর্ব্বে না, লোকের দোষ কি? তুমি বুড়ো মানুষ রান্না কচ্ছ। আর আমি জোয়ান বৌকে তার বাপের বাড়ীতে রেখেচি; নিন্দা কর্ব্বার কথাই ত। তা তুমিত গরজ করে আনবে না, আমি নিজে কি বলব।"

মাতা। "হাঁ বাবা, তাইত, তাইত। বেয়ান যে দিতে চান না; দুবার লোক ফিরিয়ে দিয়েছেন, বলেন মেয়ে আর একটু বড় হলে পাঠাবেন। পাড়াগাঁয়ে থেকে অভ্যাস নাই। আর বড় আদুরে মেয়ে, কাজকর্ম্ম শিখে নি—এই"।

গোপাল রাগিয়া বলিল—"বড়লোকের মেয়ে হইতে পারে; কিন্তু গরীবের বৌ ত। এখন তাকে গরীবানা ভাবেই চলতে হবে। এখন বাপের বাড়ী ফেলে রাখ্‌লে ভবিষ্যতে বড় খারাপ হবে।"

মাতা বলিলেন "তা যা ভাল বোঝ কর।" স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি বৌ আনিতে গোপালকে পাঠাইলেন।

শ্বশুর-গৃহে আহারাদির পর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গোপাল বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিল। গোপাল এবার আর কোনওরূপ রসাল সম্বোধন করিল না; কারণ, সে একটা বহিতে সম্প্রতি পড়িয়াছে "অরসিকেষু রসকথনং শিরসি মা লিখ।" বলিল "তোমাকে নিতে এসেছি, জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নাও।" জ্যোৎস্না নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল,

তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল গোপাল বলিল "যাবে কিনা বল ?"

জ্যোৎস্না বলিল" আর একটু বড় হ'লে যাব।"

গোপাল। "তুমি এখন ছোট নাকি ? তোমার এ বয়সে—সে যাক্, হাঁ কি না একটা বল, আমি শুন্‌তে চাই

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া জ্যোৎস্না ভীত হইল বলিল "আর দু'দিন পরে যাব ?"

গোপাল। "কাল যেতে আপত্তি কি ?"

জ্যোৎস্না। "মা বাবার জন্য বড় কষ্ট হয়।

গোপাল। "আমার জন্য হয় না বুঝি ? বল হয় না কি ?" জ্যোৎস্না নীরব। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক বলিতে লাগিল "বল, বল হয় না কি ? তুমি বল, কেন তুমি এমন চুপ করে থাক ? একটী কথা বল না, একটী কথার উত্তর দাও না, চিঠি লিখনা, কাছে আস্‌তে চাও না,—এই কি পত্নীর কর্ত্তব্য, এই কি প্রেম ? প্রিয়তমে এই কি ভালবাসার প্রতিদান ? বল, আমায় ভালবাস, বল বল" উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক বাহু প্রসারিয়া প্রেমিকার দিকে অগ্রসর হইল। বালিকা পত্নী বিস্ময়েও লজ্জায় অধীর হইয়া ঘর হইতে চম্পট দিল। একটা কৌচের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া গোপাল বড় মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।...ইহা স্বাভাবিক

এ অবস্থায় প্রেমিকেরা আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, গোপালও আত্মহত্যা করিবে কি না ভাবিতে লাগিল। বুক ভাসাইয়া কাঁদিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্বশুর গৃহ এখন তাহার কাছে যমপুরীর ন্যায় ভীষণ ; আর কি আশায় সেখানে থাকিবে ? পরদিনই সে বাটী ফিরিয়া চলিল। অবশ্য সে ইচ্ছা করিলেই পত্নীকে লইয়া যাইতে পারিত ; কিন্তু ভাবিল মনটা যদি না যায়, দেহটা লইয়া কি হইবে ? হায়! জোৎস্নায় মন যে তাহার নয়।

যাইবার সময় (উপন্যাসের নায়কেরা যেমন চিঠি লেখে তেমন) দীর্ঘ একটী পত্র লিখিয়া জ্যোৎস্নার বালিশের নীচে রাখিয়া গেল। আমরা সে চিঠির কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না,— তুমি আমার সব, কিন্তু হায়! আমি তোমার কেউ নই। কুক্ষণে তোমায় দেখিয়াছিলাম, কুক্ষণে তোমায় ভাল বাসিয়াছিলাম, কুক্ষণে তোমাকে আমার সব অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পাষাণী তুমি, তুমি আমার সব ব্যর্থ করিয়াছ! জীবনের প্রথম প্রভাতেই আমার প্রেমের পুষ্প ঝড়িয়া শুষ্ক হইল ; কে শুষ্ক করিল ? তুমি।

জীবনের প্রথম বসন্তে হৃদয়োদ্যানে কোকিল পঞ্চমতানে গাইয়া উঠিয়াছিল, সহসা সে তান বন্ধ হইয়া গেল। কে বন্ধ করিল ?—তুমি। পাষাণী, তোর হৃদয় কি পাষাণে গড়া ? একটুকু প্রতিদান পাইলাম না।... জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গেল।

পাষাণী, পাষাণী—আমাকে কাঁদাইয়া তুই সুখে থাকিবি, তাহা দিব না।......কিন্তু প্রেমের যে রীতি নহে। তুমি সুখে থাক।...আমি আত্মহত্যা করিতেছি। আমার মৃত্যুতে তুমি সুখী হইবে জানি। তুমি সুখে থাকিও"। ইত্যাদি।

পরদিন চিঠীখানি পড়িয়া জ্যোৎস্না বেচারা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া মাকে চিঠীখানি দেখাইল। মাতা বুদ্ধিমতী ; চিঠী পড়িয়া এবং জ্যোৎস্নাকে ২।১ টা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার বুঝিলেন। এ রোগের ঔষধ কি জানিতেন সে দিনই জ্যোৎস্নাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন গোপাল দড়ি ও কলস কিনিতে বাজারে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল জ্যোৎস্না আসিয়াছে। শান্ত, শিষ্ট, লজ্জাশীলা জ্যোৎস্না আজ নিজ হইতে যাইয়া স্বামীকে সম্বোধন করিল, এবং তৃষিত চাতককে প্রেমের পানীয় দানে তৃপ্ত করিল।

গোপালের আর মরা হইল না, সে দড়ি ও কলস দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পত্নীকে কবিতা শুনাইতে বসিয়া গেল। আজ পত্নী গভীর মনোযোগ সহকারে শুনিতে বসিল, আকাশে চাঁদ হাসিয়া উঠিল। কিন্তু পাঠক হাসিবেন না, তাহা হইলে গোপাল রাগ করিবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. J. Donald, I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, M.A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
Mr. J. G. Cumming, C. S. I.
Mr. F. C. French I.C.S.
Mr. W. A. Seaton I. C. S.
Mr. R. B. Hughes-Buller, C.I.E., I.C.S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D.
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.SC.
Dr. P. K. Roy, D.SC.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.SC. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.SC. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M. A.
" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
" T. T. Williams M. A., B. SC.
" Egerton Smith, M. A.
" G. H. Langley, M. A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
" Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Shushung.
The " Maharaja Bahadur of Nashipur.

The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan.
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
" Radha Kamal Mukerji, M.A.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra.
" Jagadananda Roy.
" Binoy Kumar Sircar.
" Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College.

CONTENTS.

সূচীপত্র

H. E. Lord Ronaldshay.

Sreenath Press, Dacca.

HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR OF BENGAL.

It is our pleasant duty to offer a very hearty welcome to His Excellency Lord Ronaldshay who now for the first time visits the loyal and ancient City of Dacca. We feel sure that all our readers will agree with us when we respectfully state that we are heartily glad to see him and that the longer he and his Government stay in this part of the Province, the more delighted we shall be.

His Excellency has not been in Bengal for many months and yet we have all discovered that he possesses qualities which will earn for him the respect and interest of those whose good fortune it is to dwell under his rule. We have in the past had the privilege of seeing many men of great abilities and of varied tastes occupying the proud position which he occupies to-day; it is a position, second perhaps to none, in opportunity and responsibility in the British Empire. So that when we say that we are sure that His Excellency will leave a broad and clear mark on the Government of Bengal we are not praising him lightly, for no task is harder than that of following talented predecessors in a high post.

Lord Ronaldshay belongs to the ancient and powerful family of Dundas, and as his name implies, he has many and close connections with North Britain. The Dacca District has sometimes been called the Scotland of India, and certainly those born here will be found occupying important posts in every part of the peninsula, we believe, with credit and satisfaction. The problems of Eastern Bengal are, in the main, land problems and will appeal to one who is himself a great landowner; at the same time the condition of our great towns will, we are sure, attract the attention of a gentleman whose experience has been of so varied a character.

Writing in Dacca itself we need hardly press upon His Excellency the urgent need that exists for the foundation of a University. It is a need that events not only here but in other places have repeatedly and recently demonstrated; and whilst we are grateful for the measure of direction and control which we have enjoyed in the past, we feel that the time has come when we should cease to receive our educational stimulus from a distant agency. These matters, highly controversial in their nature, we feel that we can safely leave in the hands of one who is a scholar as well as a statesman.

We need hardly say that in welcoming our new Governor we would wish also to present our respectful greetings to Her Excellency Lady Ronaldshay whose kindly interest in the many social problems of Bengal has already endeared her to its people. May both of them succeed in the great task which lies before them.

// THE DACCA REVIEW.

VOL VII.	MAY, 1917.	No. 2.

THE INDIAN MARKET.

In theoretical studies English Economists have not given to markets so prominent a place as they now increasingly deserve, and as the German economists now give to them; nor do British businessmen and commercialists seem to spend as much energy and money in securing, keeping and extending markets as those of some other countries, Germany and Japan, notably. The functions of the British Government are thus obviously less thorough and less comprehensive in these matters than are those of the governments of the other industrially advanced countries. A study of British economic theory and history, would, therefore, lead one to believe that success in production alone would secure success in industries, and that a special and separate study of market conditions and marketing problems would be superfluous.

Even in the case of goods produced on a large scale under a monopoly and protected in the home market by a high tariff wall, or produced under special conditions for localised markets, e. g., made to order, meeting special tastes, of a heavy or perishable nature, etc.,—market conditions are no longer stable, due to lowering cost of transport, discovery of substitute articles, rapid changes in fashion, etc. In the case of nearly all other industries success depends now more on marketing than on the work of simple producing. And why? The answer in one word is competition. In the marketing of products growing competition is being felt, necessitating frequent changes in conditions of production. Constant research, rigorous experimentation on results of research, bold and quick adoption of proven improvements in methods, processes, implements, etc, judicious employment of the different factors of production, and healthy changes in their proportions by substituting more efficient factors for less efficient ones,—these are the ways in

which changes in production and reduction of cost are effected. Thus the necessity of changes in production is brought home to producers, and the lines of such changes are ascertained, by the study of the market. Again, the activities of producers are now more powerful than ever in changing the nature of old wants and creating new wants, among consumers. But the success of all such activities in production depends on the organization of the market. Thus, the market first and the market last. Competition, by creating changes in the market, necessitates changes in production conditions, without any further touch with and arrangements for meeting, the altered conditions of the market, would lead to failure. The wonderful success in recent years of the foreign goods in the Indian markets is due, first, to a careful study of our markets, secondly, to production of goods of such a nature as to meet Indian tastes and at such cost as to suit the Indians' pockets, in the light of the experience gathered already, and, thirdly to the many additional minute arrangements for conquering our markets.

Production and marketing are organically related, interdependent subjects, and a full study of the one is impossible without some scientific study. The present article, will deal with markets and marketing alone.

How do the industrially advanced countries (1) study market conditions and (2) solve marketing problems?

1. For studying market conditions in the different countries the methods pursued by Germany, Japan and America are substantially similar; yet the German method is more searching and thorough, and Japan is a close follower of her example, with this difference that her Government is more active, she having been a late beginner. A careful study of the German method is highly necessary in India now for obvious reasons. German producers mostly associate together, engage travelling agents, trade representatives and correspondents in foreign countries and send out salesmen acquainted with foreign customs, tongues and tastes. These work both independently and in co-operation and with the advice and aid of the German Consuls posted in the principal cities of foreign countries. These men gather information regarding prices at which articles are sold in the different parts of a country, quantities sold at particular prices, their qualities, etc.,—and report all these to home—authorities. They also collect samples of goods finished, half-finished, and raw,—and send them home where they are preserved in museums. Sources of raw goods, freight rates, etc., are also studied. German Chambers of Commerce, too, are ever alert in securing information regarding foreign markets, in facilitating, co-ordinating and directing the work of the above bodies, and in throwing suggestions to, and securing advantages for, producers. German

consular reports on foreign markets are more valuable sources of information than those of any other country. Investigation and work on the above lines suggest to the German manufacturers lines of production, articles to be produced, prices at which to sell, where to sell, and how much and of what qualities, etc.

2. For marketing their manufactures the German producers resort to the following ways :—

(a) They 'pool' products at home and dispose of a definite quantity in the home-market at a rather high price—when the articles are produced for both home and foreign markets. Protection duties free them from foreign competition in their home-market and enable them to reap there prices higher than the expenses of production. They then export the surplus to foreign markets, grant out of their general fund created out of the excess profits at home, bounties to the exporters according to quantity—with a view to stimulating production and exports,—and dump foreign markets with these growing surpluses at prices very low, and previouly calculated.

(b) When an article is produced mainly or wholly for exportation, the producers collect a certain sum from amongst themselves, and formerly often used to have special grants or subsidies from Government in addition. They spend the whole sum in securing markets abroad, and continue, besides, (if need be) selling the article below cost price. Ultimately they recoup themselves when the market is conquered and extended, and more economical production on larger scales is rendered possible.

(c) When pretty sure of controlling the market within a calculated period by selling their wares from the beginning at a certain price, and in order to make sales at this price possible by reduction of cost, they produce, from the beginning on large scales, quantities far in excess of the existing demand, in anticipation of a future remunerative increase in demand.

(d) Having extensive sales they can throttle competition in particular localities by abnormally reduced price, and make good the loss by raising the price slightly at other places.

(e) In these operations they enjoy specially low freight rates from their country's shipping companies, and specially favourable credit at very cheap interest rates and for pretty long terms from their country's banks having agencies or branches abroad, and are thus enabled to induce foreign wholesale buyers to buy their goods on most agreeable terms.

(f) They publish price lists, catalogues and advertisements in the languages of the buyers and take prices from foreign importing houses that include freight and all other charges and yet are low. Again, for payment for the goods these houses are allowed a pretty long time.

(g) Museums of German goods are kept up in foreign markets at which foreign buyers know which things they can buy from Germany and at what prices. The German salesmen travel with samples of many German goods in their bags, and have the qualification and the knack of mixing with foreign buyers. These museums and these salesmen thus vigorously push sales of German articles in foreign lands.

(h) The travelling salesmen and canvassers are not discouraged by petty demand for a particular commodity at any place because they can effect sales of many things at one spot, and, as they travel from place to place, they 'pool' orders for the same thing from different places, and supply it anywhere cheaply along with many other things.

Thus the Germans are ever in close touch with market conditions, modify production and prices accordingly, and change market conditions by their efficient production and marketing arrangements to suit their ends.

Besides all this Germany has, alike with other advanced countries, numerous State-managed and State-aided commercial institutes of all grades—where students are taught, besides elements of economics, banking, accountancy and foreign trade and exchanges,—important foreign languages, physiogrophy, history, Geography and practical economics of commerce of all the countries of the world, as also of all articles of commerce, and reliable, up-to-date, co-operative statistics of trade. In course of theoretical study students are taken to the museums of commercial products to see the varieties of articles in all their stages, and to banks, factories and shops. They are also to study specially commercial atlases, year-books, reports of various Government Departments, consider Reports, Reports of bureaus of manufacturers, special reports on foreign markets, magazine literature, trade journal, etc. Students thus trained are then employed by particular firms or industries in the commerce of their products and requirements.

After the present World-War industrial warfare of the bitterest type, and commercial competition of a most keen and killing nature are sure to commerce in as much as particular products in some of the belligerent countries, now accumulated and accumulating, would be 'dumped' into foreign markets, millions of discharged soldiers would have to be given occupations in existing and new industries, the heavy War expenditure would necessitate greater production all round in order to make its burden bearable and gradually reducible, and the pre-war markets would, therefore, have to be reconquered and extended, if possible, and new markets found out.

On the other hand, the countries (e. g. Japan) now temporarily successful in ousting from a market (e. g. in India) its previous occupants (e. g. Austria

Hungary and Germany), would strive hard to retain it. Again, the present War has demonstrated to the world, and especially to the Allies the supreme need of self-sufficiency regarding the supply of important articles of production and consumption and the vital importance of driving Germany out of their own markets and the markets of the countries under their control, and of possessing and extending these in their own interests,—because they have been rudely convinced that economic efficiency is the basis of German militarism, and that commercial supremacy was its aim. The Free Trade shibboleth of Great Britain will have to be either thrown over-board or partially given up. Already England has strengthened her Board of Trade by introducing into its membership industrial and commercial experts. Government have begun spending more and energising more than hitherto to help her trade and industry, and a special colossal bank with a capital of 10 millions sterling has been started with the two-fold purpose of helping 'diversified' industry in the country and trade abroad with credit at a cheaper rate and for longer periods than is now available. Already has Japan been sending to Australia, China, India, etc., her trade representatives, further enriched her trade-houses, in India, notably and is going to start a special Bank in Bombay; besides, her Government is going this year to budget 8 millions sterling for the markets of her products to be spent in subsidising industries and shipping, in concession granting and propaganda work abroad, and in all other manner thought suitable and necessary.

India, too, has not been sitting idle all this time. During the period of two years since the declaration of the war her registered companies have had an additional paid-up capital of crores, which is highly encouraging and quite a record. Some Provincial Governments have meanwhile employed their Directors of Industries; a few Provincial Governments and the Central Government have caused a preliminary enquiry into the industries and have organised exhibitions and circulating museums temporarily. The Indian Government the other day appointed a Trade Commissioner in England who would work in co-operation with the British 'Board of Trade.' Enquiries into Japan's industrial methods and into market possibilities for Indian goods in Russia and France, have been made. The Industries' Commission has begun its operations and from its Reports much of the nature of a radical change, is being naturally expected.

Nor can the people of India be said to remain unconcerned. Resolutions and questions in the Legislative Councils, evidences before the Industries' Commission, writings in newspapers magazine articles, speedily growing recognition of the need for industrial

and commercial education, increased questionings to Government to the part of the people engaged in industries, the Bengal Home Industries' Association, all these show growing interest among the people in matters industrial. The lines on which Government should aid industries, arrangements for studying the market, survey and selection of industries, etc., are being worked out. In this connection the experience of the recent business failures has been of immense help in indicating the proper path of progress. Failures occur in all countries and at all times. In the beginning of any country's industrial career failures are unavoidable, and rather too many. It is failures that teach us caution and serve to elevate our business morality. These failures, more than any other thing, have proved the necessity of government sympathy and support to our nascent industries. Among the many causes of failures absence of the study of market conditions and presence of difficulties in marketing material played a great part.

The Indian products in pre-railway days were mostly made for localised markets, and the few simple wants of the villagers were almost wholly satisfied with articles produced within the village or not very far off. Only certain specialities manufactured at particular places e. g. Dacca muslin, Benares brass ware, etc. enjoyed wider markets. Marketing products was not at all a problem then. The cutting of the Suez Cannal and the linking up of the different parts in the interior of India together and with the ports made it possible for foreigners increasingly to send their cheap, machine-made goods to the distant Indian villages in the interior to the disad vantage and consequent growing decay, of her indigenous industries. Thus gradually, and in many cases, rapidly, grew up among Indian consumers a taste for foreign goods in preference to the relatively dear but superior art products of their country's cottage industries. The transports facilities provided by the railways and the steam-ships jointly extended the internal and external demand for, and raised the price of her raw materials and food grains thus compelling people more and more to resort to agriculture and making it worth their while, too, at the same time. With the growth, in this way, in the purchasing power of the people their standards of living have rapidly risen, and their use of many foreign goods hitherto unknown (e. g. watches, bicycles, cigarettes, Dietz lanterns, celluloid goods, gramophone, pottery articles, etc. etc.) is growing. The foreigners are ever alert and quick in creating new wants among them, and satisfying these wants with cheap, and mostly shoddy goods. Urban growth, spread of education, facilities for travelling, etc., are also vigorously and quickly introducing new fashions among us. What we were and what we are becoming can be best seen by

comparing the dress, habits, etc., of an orthodox, untravelled villager with that of his grandson who is a college boy, or grand son-in-law who is a Kerani Babu or, even his servant's son who is an operative in a factory in some town. In whatever else we may yet be conservative, in our tastes we are no longer so. Now, if India continues overwhelm ingly and growingly agricultural as at present, her demand for foreign manufactures will grow yet further and yet more rapidly. It must be realised that the ancient Indian market is no more, that the modern transport facilities have introduced the modern European market conditions, and that the keen foreign competition has created new marketing problems in India. All tendencies now seem helpful to increasing importation of manufactures, and, with the cessation of the War, this importation, if unchecked, will grow enormously. Our dependence on agriculture is growing and our agriculture is closely dependent on the Monsoons. Agriculture alone should not be the sole occupation of the agricultural classes, and it cannot provide occupations to the rapidly growing middle-class, especially of urban life.

We should get ready and commence action now. The Industries' Commission has been understood to mean in many quarters that we should meanwhile simply watch, and wait. But after the War England may be a greater competitor of India than she has so long been; while the Indian Government's hands are not, and will not easily and in all cases, and without any effort on our part, be fully free. The enquiries of the commission up to-date have left many things to be desired; the Commission will take some time to submit its final report; and then, Government action, will take some further time; again, importing and setting the necessary plant for an industry will take some more time; finally, the War, at its end, will have Government without adequate resources for some years. Should we so long simply wait, without caring to know, and trying to do, our duties in these respects,—while Japan has been sending to us growing quantities of a growing number of articles?

Hence comes pertinently the question of the respective spheres and duties of (1) Government, (2) Producers, (3) Consumers and (4) others:—

1. For ensuring marketing of Indian products at home and abroad Government should do, among other things, the following:—

(a) Modification of the existing fiscal policy of India. Without a protective tariff no country has been able to industrialise herself. Competition is now keener than before and India is very weak industrially; Protection, therefore is more necessary to her now than to any other country previously; while her powers of retaliation, in case of need, are perhaps second to those of

no other country,—she being mainly an exporter of raw goods over many of which she enjoys practical monopoly (e. g. hides, jute, rice, tea, manganese and other mined products). Foreign competition in the Indian market is often unequal and unfair, as it consists in cutting price thin, offering higher commissions to wholesale dealers on condition that they would not stock goods of other firms, initial selling below cost price, imitating brands and marks of others etc. Protection, therefore, is specially needed in India not against British goods so much, which are mainly the products of big firms, which at first did harm to Indian industries of course, but now supplement them to a greater extent than compete with them, and which, by taking certain broad lines of production have left ample scope for the development of many small industries in India. Even after the War the chances of England's supplying to India many of the goods hitherto supplied by Germany and Austro-Hungary seem remote. Yet we should like protection against England too, if we could get it. British goods should be taxed to such an extent only that their prices in India may not be lower than prices of similar Indian-made goods, and imports from other countries should be generally taxed at a higher rate. This is the system of the British colonies.

Again, we should have our imports divided into ordinary, dutiable, and prohibited classes,—the first class comprising what we need from abroad, e. g. raw materials, machinery, scientific instruments, many semi-manufactured goods to be further utilised in India, etc., and paying only ordinary or specially low *revenue duties* ; the second class consisting of goods we could do without or, make at home,—e. g. mainly finished goods, articles of luxury, etc ; and the third class including things we should do without, or should specially produce at home, e. g. tobacco manufactures, alcoholic drinks, dyes, etc. We should, besides, have export duties, preferably *graded* according to the countries of destination, on some of our exports, e. g. hides and skins, raw cotton, raw jute, oilseeds, some metallic ores etc,—and spend part of the proceeds on the the manufacturing and exportation of the finished goods out of them. Writing in this strain might look ludicrous as attempting the unattainable, and inexcusable, as preaching a foolish quarter-truth ill-suited to the best of India's economic interests. But Free Trade is to cease with the War if the Paris Economic Conference means anything, as an Imperial Conference is going to sit in London to consider, among other things, what commercial policy to adopt alter the War, and as England, the strong-hold of Free Trade, has now been convinced that her fiscal policy should no longer be determined by purely economic considerations alone. For future safety and well-being of the

Empire must be self-sufficient regarding her basic industries, and must conquer markets lost or lessened during the War, and extend markets after the War. Now, therefore, it is not untimely or of purely academic interest to try to think out what India's place should be in an inter-Imperial or inter-allied Preferential Tariff arrangement, and whether any such arrangement, even if practicable, would be in her best interests.

(b) *Bettering and cheapening transport facilities*:—Some industries have perished, some more cannot flourish and many cannot come into existence at all, for absence of adequate transport facilities. Existing railway lines are more helpful to the export trade in our raw materials and food-grains. For the growth of our industries we want yet many more feeder lines and our navigation facilities to be improved, instead of, as hitherto, being allowed to be blocked and left to decay. Foreign goods can now be shipped to Indian ports over thousands of miles *more quickly, and at a less cost* than that incurred by the Indian trader in transporting indigenous goods over a few hundred miles of railway. This retards the distribution of Indian manufactures inter-Provincially. Lower minimum rates for our manufactures, and specially low rates for the raw materials needed by our industries should be enforced. In India goods' freight is 58 p. c., above passenger freight per mile; this is not the case in Japan or any other country. 'Block rates should cease, or, at any rate, be lowered; and the whole country's rolling-stock supply should be judiciously spread over, and utilised in the different seasons and lines. *India suffers from the evil effects of both competition and monopoly of her Railways*, which have hitherto rendered to her industries and *internal trade* much less help than they could and should have done. Government is the only competent agency to remedy this.

(c) *Standardisation of weights and measures*:—The diversity of these in different Provinces, districts and even in different parts and trades of the same town is only too notorious. With increase in communications and trade a growing demand for a greater uniformity in marketing, and, therefore, a more uniform system of weights and measures applicable to larger areas, is being felt. The present diversity renders trade uncertain, and fraud on the part of retail sellers easy and difficult of detection; it exposes strangers and poorer men to the constant liability of being cheated. In cases of purchase from different places good many agents, each familiar with a local variety of weights, are required, and they have, and can easily resort to, infinite opportunity of deception. Thus the risk and expense of such trade are great. Yet such trade is growing, and our chances of fighting foreign competition are being needlessly restricted. Government have

already caused an enquiry to be made into this, and in 1914, the 'Weights and Measures Committee' recommended, regarding weights, a uniform system for all India based on the Bengal or Railway maund.

(d) *Greater Government purchase of goods made in India*:—This is highly and imperatively necessary. Government being the greatest consumer in a country can materially help many industries; besides Government purchase would serve vigorously to advertise the goods, and educated Indian consumers, too, would then begin patronising the indigenous industries. It will thus partly achieve the end sought to be realised through tariff modifications over which Government hands are not free now. Government purchase ought to be initially even at a sacrifice. The law on this has been already modified as desired, but the practice should be strictly according to the letter of the law, and Indian producers should be acquainted with the quality and the price, given samples of foreign goods now bought by the Government spending Departments, and helped in producing identical goods.

(e) *Commercial museums and exhibitions*:—The Provincial head quarters should have central commercial museums *started and maintained by Government* co-operating with one another, pushing inter-Provincial trade, and having attached to them fully equipped chemical laboratories. In these should be preserved specimens of raw materials with detailed information regarding their sources, values, processes of manufacture, etc. There should also be kept, side by side, finished goods, *imported and home-made*, and of a similar nature, with statements regarding their relative prices, the defects of the home-made goods, and the ways of their improvement worked out in the laboratories on strictly business principles and under expert chemists.

Every district town—and, if need be, important sub-Divisional head-quarters, too—should have *State-aided* museums *without a laboratory*, as laboratory work to be efficient and to prevent over-lapping, should be centralised. In smaller museums, should be kept carefully selected raw materials of the district (and of other places, too, in consultation with the museum authorities of those places) that can be economically manufactured within the district, and *imported* finished goods made out of these.

A searching industrial survey and a critical study of markets should precede the starting of museums. The museums being fixed institutions are of limited utility of a more or less special nature, and their collections will require to be periodically renewed. Industrial exhibitions can extend and supplement the work of the museums, and supply the necessary experience as to the lines on which replenishments of the collections of the museums from time to time should be made. Exhibitions,

in fact, perform the functions of a circulating museum more economically and no less thoroughly. These should annually be held by rotation at all the important places of a Province. They are a most powerful means towards familiarising consumers with new goods and their prices; and they should be made materially helpful to producers by organising demonstration work to shew the use and utility of improved implements, processes and methods. Regarding the nature of the exhibits, the demonstration work, and the award of prizes, the advice and assistance of the Provincial Museum and of the Provincial Industries Department are indispensable. Price and quality *both* should determine rewards. The holding of amusements can then, and only then, be wholly left to the local organisers. Thus Government connection and co-operation are necessary to increase the utility of the exhibitions.

(f) *Commercial colleges, schools and classes*:—These are of immediate and utmost need, as commerce has become more difficult than production everywhere, as commerce, dissociated from production and left in the hands of middlemen of other places and peoples, as now, would seriously block our way to industrial success. In Bengal, especially, we ourselves produce very few of the growing number of articles we consume; our producers have no organised ways of selling their articles; and people other than the producers and the consumers are fast becoming our middlemen. These middlemen, again, deal in many foreign products that compete with our goods, and enjoy from the foreigners higher commissions, cheaper and longer-term credit, regular supplies in adequate quantities and other attractive advantages which our producers are not in a position to offer. Besides our shopkeepers and other sellers are generally untrained in salesmanship and too often unscrupulous, and our industries, instead of getting any patriotic consideration from them, suffer at their hands. If, instead, our gentlemen's sons get proper commercial training and take to commerce they can earn more than now in the few over-crowded avocations and the profession of the middleman can be elevated in the public eye, and be more serviceable to society. These may find many occupations in commerce, suited to their individual capacities and conditions. They may work as independent shop-keepers or whole-sale agents; or as dependent employees they may act under single firms or under a guild of producers, on a combined pay and commission system as travelling salesmen and canvassers. In commerce they can also earn as trade-representatives, correspondents, accountants, etc.

Need for commercial training being supreme, and opportunities of commercially trained men being many and growing,—Govt. initiative and popular

exertion are immediately and pressingly necessary. There should be in each Province a highgrade, Govt. or University, commercial College-with, as in Japan, a Professional Department to give further special instruction in particular higher branches of commerce. This College should train and turn out efficient agents, trade-representatives, and correspondents, accountants actuaries and statisticians, bankers, brokers, railwaymen, etc. There should also be numerous commercial schools and classes in different, selected trade contres, and enjoying State-aid, for imparting secondary and primary knowledge of commerce. The pupils of these institutions should be sent while undergoing training, to factories, banks, shops and museums to have their studies facilitated and to gain practical konwledge. Arrangements for their travels to different places to observe commercial conditions and for their working as ambulant traders should also be made.

Co-operation between Government and Universities is essential in these matters for securing and maintaining proper efficiency in the training received, providing all requisite facilities for the training imparted, and healthy spread of such education.

(g) *More efficient work of a more varied nature done by and through the commercial Intelligence Department:*— It should select men for Govt. to work as Trade-Commissioners (in co-operation with the British consuls in other countries) *permanently* in countries with which our foreign trade is already great or has chances of a quick and great development, and as *itnerant* commissioners in the other countries. These men should be kept in constant intimate touch with the Indian industries having markets abroad. Our Government cannot, now at least, grant us full fiscal rights to regulate our foreign trade, and, through this, to develop our industries. Government should, therefore, do fully all else in this connection, especially because in exploiting the foreign market our dependence on Government must necessarily be greater than in the case of the home market. Museums of Indian art-products should be established at convenient foreign centres by the Indian Government with the aid of the British embassies abroad. Forcing market conditions should be studied by the Trade Commissioners; and Indian producers should jointly send out their trade-representatives to co-operate with them in this study. The results should be published by the Commercial Intelligence Deparment. The Government plan of appointing such Trade-Commissioners *abroad*, as also a permanent staff of Surveyors and Trade-Correspondents *in India* should at once be given effect to. The Surveyors would indicate the lines on which, and the amounts up to which, Government aid to industries and

concerns should be given. Government should publish *occasional* monographs on particular industries embodying results of researches regarding raw-materials and their sources, suitable machinery methods of production, etc. The paid correspondents would then take the matters up, study trade conditions in the local markets, the prices at which competition is being experienced from foreign articles, the particular qualities in local demand, the qualities of each quality demanded, etc; and their information should be *regularly* published. A Central Information Bureau should be started in connection with the Commercial Intelligence Department. The Chambers of Commerce should be more utilised. The Provinces should have efficient Trade Departments so that information of the right type may reach the right men at the right time. The commercial Intelligence Department should take the lead in right earnest and make the necessary preparations even from now. The Central Information Bureau and the Provincial Trade Department ought to remove the characteristic tardiness of Government operations. Thus the duties of Government are many, onerous and urgent,—more so than in any other country, and far more so now than in the past.

DUTIES OF PRODUCERS:

Some of these have already been hinted at above; but they require elaboration and addition. Our manufacturers have very little working capital; commercial banks for advancing them credit *on the security of their products* are not many, they often discriminate between producers in granting them credit, and a great many of the producers fail to get any credit at all. This credit, again, is not so cheap or convenient; nor can it be so unless there is sufficient banking devolopment and co-ordination among banks, and until the risks of production are reduced. Wholesalers, on the other hand, do not anywhere pay down cash to the producers of the goods they take from them; the goods are to be always given to them on credit, and payments postponed until these are disposed of. But our producers cannot sell goods on credit for as long periods and at as cheap rates as the foreigners in our market can. Our wholesalers, thus, in self-interest, buy more foreign goods, which, besides being cheap, are also supplied regularly and adequately. Our producers, again, have no union among them, but compete with one another in offering higher commissions to the middle-man. This is one important cause of the high prices of our goods, and of their low quality. Now, to remedy this, (1) union among producers of the same article, (2) patriotic wholesalers or their elimination by producers themselves organising sales, and (3) good many commercial banks, are necessary. On the first depend greatly the second and the third;

when stable condition of production on proper lines will have been reached and when producers, in mutual interest, will unite into a guild, selling difficulties will be materially reduced, and banks be more bold in their operations and more liberal in granting advances. Government, and the general public, too, may be expected to do much regarding these latter.

A question may be asked here as to the chances of the producers' combining when naturally they compete, having mutually antagonistic interests. But foreign producers do combine in selling their products abroad, and they are our greater rivals. Besides, competition now among Indian producers having a strong common enemy in the foreigner will only weaken them all instead of strengthening any of them. Under similar circumstances competition has yielded place to combination widely in other countries. In our country too, tea gardens, have combined in forming the 'Tea-Cess' committee for extending markets for Indian tea; and if the tea industry having no foreign competition to meet in India, and holding the first place in the world's tea market, can succeed in combining, other industries ought to succeed more. Also, combination for a common purpose does not completely shut out healthy mutual competition, as is evidenced, again, in the case of the Indian Tea industry. Our producers will be helped by foreign competition into uniting, and unless they associate and co-operate, they will help foreign competition in accounting for them speedily and effectively. Thus, by union alone producers can live and thrive, can settle convenient terms with the wholesalers, can lower advertising and marketing expenses, can engage trade-representatives and correspondents for gathering information, and can conveniently employ salesmen for pushing sales and extending markets. A very big firm can do these alone; but Indian concerns are likely to be overwhelmingly small. Association among them therefore is a religious necessity.

In spite of difficulties, innumerable and great, Indian producers in the Indian market ought to expect and get at least two, not negligible, advantages:—a favourable attitude among buyers,—and easier and greater chances of success on the part of their commercial travellers. These men may already know, or, at any rate, for more easily and quickly learn, the tongues, tastes and customs of the people among whom sales are to be effected. Like the Germans these travellers should 'pool' orders from different places. Arrangements must be made to see that goods do not pass through numerous middlemen in which case their prices would unnecessarily group: and to Indian consumers cheapness is the chief consideration. Simple dependence on retailers would raise prices, cause delay in sales, and ruin the concern thus

depending. Many firms producing the same thing spring up in the same locality not for nothing. The instance of the Bengal jute and Bombay cotton mills is significant in this connection. On the marketing side this ensures more favourable prices in buying and selling, quick dispatch, lower freight rates, rapid sales, and, as far as possible, direct sales to consumers. The necessary joint operation thus becomes easy, and resisting power against foreign competition, increases thereby. Localisation and grouping together are indispensable to industries suffering from foreign competition. The future of the match, paper, cigarette and other industries lies only in this.

Smaller producers, especially those in rural areas, can by 'co-operation' lower their costs and be more able to retain and extend their markets. Starting of co-operative wholesale depots by producers of a particular commodity jointly in important trade-centres should be of immense help in marketing and conveniently stocking their product. Producers then, instead of depending on the middle man for favour of his purchase on credit and on his own terms, may get advances against their stocks deposited, from the 'wholesale', and depend upon it for the market. Of course, producers would in this case be members of local Societies. and the 'wholesale' will transact business with the 'locals' as its members. People producing goods individually on petty scales and in different places, can do very little themselves in the way of joint operations; and if their articles be not so much for local consumption, and have to meet foreign competition, their saving lies only in the consumers' hands; Govt. cannot always be of much help to them.

(3) DUTIES OF COUSUMERS.

We, Indians, are repidly getting denationalised in our tastes. Englishmen in India, before our very eyes are bright examples of true patriotism; they never cease to patronise their country's goods and to keep up their own standards of living, even at a sacrifice of money and comforts. The Japanese and Germans are, in these respects, patriotic to a fault: while we will not care to produce things ourselves, nor trouble ourselves to know and use our country's goods, but recklessly go on increasing our use of foreign goods.

This attitude will have to be given up in the interests of ourselves, our progeny and our country. Salesmen and canvassers should be men from amongst the consumers. Consumers' Associations should be started to guide consumption, to regulate and help production and to eliminate unnecessary middlemen. Associations, on the lines, of the newly, inaugurated 'Bengal Home Industries' Association, can also do a world of good by starting stores, and by granting advances to scattered producers, render incalculable benefits to trade and production. Leading men of the country may also establish at

trade-centres 'sale-depots' for the products of our cottage industries, and continue paying small sums until they are self-supporting. The Sale-depots should charge small commissions on variety of articles stocked, and find out markets for these. The producers will thereby be saved the worries and much of the expenses of direct marketing, and may continue in uninterrupted production, getting capital at much lower rates than now from a local co-operative or *industrial* bank, as convenient. This scheme will also raise and standardise the qualities of the goods produced. Initiative from the Co-operative Depots in works of this nature is highly necessary, as the selection of articles for the depots and the acquaintance between its organisers and the producers would them be easy, and as the starting and maintenance of these depots would require, at least for some time in the beginning, the advice of co-operative experts, and the work of co-operative enthusiasts.

(4) DUTIES OF OTHERS.

Our newspapers ought to advertise things at low rates. Advertising has now become indispensable, and a knowledge of the art of advertising is necessary for effecting sales. Besides, they ought to invite and publish special articles from commercialists, and by all means, to aid propaganda work. Our Indian Chambers of Commerce should stir up now in the matter for they exist for no other purpose than that of aiding Indian Industries.

Our Universities, too, can change the outlook, tastes and the very stand points of our rising and coming generations by creating ample facilities for their training in commerce, banking technical and industrial skill, general economics, and such other subjects as will induce us to think, and enable us to work in more varied and profitable directions.

The present stage of economic India is rapidly transitional, and she is bound to be more industrialised than now, and at a quicker pace than hitherto, in the best interest, both of herself and of the British Empire. Her market questions must therefore to studied thoroughly, and such study, to be fully effective, should be prior to, and preparatory to, all actions with regard to her industries. This article may wrongly present the lines of work, and be unhappy in good many other respects, but certainly is not inopportune in point of time. Further, its aim being to promote discussion, its shortcomings may seem excusable.

KAUSIK NATH BHATTACHARYYA

PUBLIC HEALTH—A NATIONAL PROBLEM.

Health and Hygiene has been looked upon as an important factor of our human civilization from very ancient times. The marvellous benefits which our present day science has conferred on humanity have resulted from a prolonged succession of triumphs achieved by man in his age-long battle against the enemies of life and health. The service rendered to the Western World by Public Health movements for the last half century is wonderful. Statistics show that the average length of life in Europe and America is about 40 years, while, that of India is about 23 years. The length of life in the United States for the last 50 years has been increased by 7 years and that of Europe perhaps more, while, in India it has not only remained stagnant for a long time but is gradually on the decrease. This degenerated condition of our nation urges us to consider the public health question of our Indian community which has come to its crisis at present. The main purpose of this paper is to call attention to the facts that have caused the degradation and degeneration of our national vitality and stamina and to offer some suggestions by way of practical remedy.

Although, numerous writers both native and foreign, have called particular attention to the facts that have caused the deterioration of the Indian nation as a whole, yet our public health authorities have not put forth sufficient efforts to mitigate the evils that have been ruining the health and prospect of millions of human souls. Indeed, the public health department has accomplished a good deal of work in certain directions, but, it has not done so much as it ought to do, considering the vast country and the enormous number of its population. There are hundreds of diseases and deaths which can be avoided if the custodians of our health understand the situation and adopt scientific remedial measures by a well-organised compaign throughout the length and breadth of each province. In fact, the unnecessary mortality and morbidity rates in India evidently show that neither the Board of health nor the Municipal authorities take adequate measures to control the causes of death of thousands of innocent lives.

The health and sanitation of our children is an indubitable evidence of our national degeneration which ought to attract the attention of our authorities in the first place. A simple observation shows that a large number of children, both mentally and physically defective are found in our schools, while, at the same time the rate of infant mortality is very high, both in urban and rural areas. Very often, in schools, the children are found to be defective in hearing, vision, teeth etc. A large

number of children suffer a great deal from malnutrition, while, adenoids, enlarged tonsils and other physical defects are very common. (The writer himself is a victim to defective hearing, of adenoid (mouth breather) and at present even has defective teeth and vision). In fact, ¾ of our school children who are known to be the sons and daughters of our so-called educated gentlemen, have such preventable physical defects which threaten their health, usefulness and even life in later years.

The public health work in India, in comparison with that of the Phillipine Islands, has not only failed to control the causes of diseases which are leading to degeneracy of the nation but it has actually tended in the neglected and misguided ways to accelerate the rate of decay. It is a pity that there is no regular arrangement of quarantine, water supplies, food control and general improvement of environment of the common people. To save them from darkness, disease and death, our public health authorities ought to have a well-regulated movement by which they could win the good will and sympathy of the people and thus fulfil their duty and mission. In their remedial measures they may adopt the following means :—

1. A systematic campaign of education should be started to educate men, women and children and teach them the general principles or rather the gospel of health and hygiene by the appointment of trained men of both sexes who will travel from place to place and teach the people both in the city and in villages by lectures, demonstrations, moving picture exhibitions, educational plays and other suitable means, as need be.

2. A number of scientific experts may be appointed as inspectors or field agents who will take charge of the work in different parts of a district, having one in each subdivision. The travelling teachers should be guided by them.

3. There should be a close co-operation between the Board of health, the Municipal officers and the Board of Education. The latter will not only employ trained teachers to educate the children in hygiene and sanitation but should allow from time to time the demonstration work of the inspectors in the schools to teach the boys and girls.

4. Organization of a Co-operative body of prominent educated men to start an all-round campaign in a Province seems to be a practical means to solve the problem.

5. Circulation of papers and pamphlets dealing with various topics of health and hygiene is very important. Agitation in newspapers is another factor. Besides, a vernacular magazine on health and hygiene may be started to give information to the people.

6. Funds may be collected by

subscriptions, donations and other possible means.

The teachers of hygiene should travel from village to village or meet the children at their schools or the parents in suitable places by arrangement. They should make the people understand in plain vernacular the methods of food and water contamination, the germ theory, and particularly how to avoid them. They should teach the people the causes of diseases and the method of transmission of the disease germs by agents like insects or other vermin and direct contact and also teach them how to control them. They will also teach the people the manner of cleanliness and how to form such habits. Besides, they will make the people understand by concrete examples the evil effects of opium, alcohol, ganja and other evil habits. In addition to this the people in general should be encouraged to out-door life and healthful sports, especially for the boys and girls who should be provided with a spacious free play-grounds and best equipments possible, in every village or city school.

It is true that the public do not understand the relation of a right environment and natural life to vigor and efficiency in regard to the needs and advantage of their children, as they are not educated enough to appreciate them ; so, it seems inevitable that the public health officers should make the neccessary arrangements for them in co-operation with the Board of Education. In fact, movements of all sorts which seek to promote physical as well as mental welfare of the people should be encouraged.

It would not be very needless to point out here a few items of necessary working functions of our public health department for which they are responsible and which may be stated as follows :—

1. Vital statistics. (Statistics of population, marriages, birth, diseases and death).

2. Communicable diseases. (Plague, Cholera, Small pox, Typhoid, Tuberculosis, Leprosy, Malaria, Dengue fever, Kala Azar, Rabies (Hydrophobia), Diphtheria, Whooping cough, syphillis, Gonorrhoea, Measles, Yellow fever, Dysentery and a few others).

3. Disposal of waste and refuse.

4. Sanitary water and milk supply.

5. Control of foods by laws.

6. Housing, sanitation and air.

7. School hygiene or child hygiene.

8. Control of insects and vermin of all sorts.

In our present stage of degeneracy which may be called as "race suicide", it seems advisable and feasible to establish a *national board of health* in every province to work in co-operation with the municipal or government health boards and thus unify the scientific work and put it into practice and perfection. Why, if we can arouse the interest of the public by a systematic

educational campaign, we can have every province under scientific direction with experiment stations at each district for the practical demonstration and testing of the methods of living i. e., how to live, where to live and on what to live.

In conclusion, I have this much to say that our health authorities should appreciate the necessity of a reformation in their line of activity throughout the whole country. It seems advisable that the government board of Health, the municipal health department and other health agencies should make it a very essential part of their duty to inquire into the nature and causes of maladies so as to control them and thus save the people from the clutches of evils which are destroying the capacities of men and women to live out the normal span of human life.

In fact, what we need at present, is the improvement of health of our individual communities, both urban and rural, by a well-organised campaign on a co-operative basis. We want happiness not only in the individuals but in the community as a whole. In such a work of public utility, if there be any objection from any religious sect which may be ascribed to traditional superstition, I think, laws should bind the people to do their duty as the citizens of India. It is health and hygiene that will give a perfect body and mind and develop a better type of men that will cope with the problems of the twentieth century and above all which is destined to change the grey monotony of the life of the Indian people.

S. K. MITRA.

THE KEA, THE KAKA, AND THE KAKAPO.

NEW ZEALAND PARROTS WHICH HAVE CHANGED THEIR CHARACTERS.

By L. B. Thoburn-Clarke, Author of *Prawns and Prawners.*

Perhaps in no country in the world are the weird forms of bird-life more pronounced than they are in New Zealand. Not only are many of these bird-forms of an almost prehistoric type, survivals of early life on this globe, but two of them (the kea and the kakapo) have undergone a complete change to suit their environment. In other lands birds have shown extraordinary developments, both in form and feathering, under the restraining hand of man; but these New Zealand parrots have, in a wild state and absolutely without man's interference, developed in unexpected ways.

The kea (*Nestor notabilis*, probably lived, before the British settlers arrived in New Zealand, upon the same food as its sole living relative, the kaka

(*Nestor meridionalis*)—the berries and honey from the blossoms of the rata and other flowering shrubs and trees found in the New Zealand bush, varied by insects that lived under the bark. Its brush-fringed tongue would suggest such a diet; but under the civilising influence of the settler it first became a flesh-eater, then finally developed a full carnivorous habit, and preyed upon the living sheep; this being the only case where a parrot in a wild state has adopted a flesh diet, although in captivity parrots frequently grow very fond of cooked meat, and eat it readily.

No one knows when the kea first become a 'hanger-on' to the sheep-station, or what first induced the bird to eat flesh. Perhaps, during a time of great scarcity, hunger may have compelled it to try the new diet; and, the taste once developed, the habit continued for ever afterwards. It is quite a usual custom on a sheep-station for one or more sheep to be killed daily. Only the best portions are eaten, the rest, with the head and offal, being thrown down for the dogs to eat. The head being hard and covered with wool, is frequently refused by the dogs; consequently there may be quite a number of sheeps' heads lying about the killing yard or paddock, rotting in the sun. No doubt the sight of the dogs feeding on offal may have suggested the first taste, and afterwards the bird continued eating the food which was always lying ready at hand.

I have had no experience of tame keas, nor have I ever heard of anybody who possessed one; but the great brown night-parrot, the kaka, its only relative is without a rival in its uncanny intelligence so why should not the kea have equal intelligence and sagacity? The kea, 'perching itself on the sheep's head or offal', relates an eye-witness, 'proceeds to tear off the skin and flesh, devouring it piecemeal, after the manner of a hawk; or at other times holding the object down with one foot, and with the other grasping the portion it is eating, in the fashion of the ordinary parrot'.

Several of these great parrots eating offal were quite a common sight in the killing-yards, and created no comment. The dogs might object, but they had too wholesome a fear of the porrot's formidable beak to interfere with its feeding. As no one can tell just when the kea first commenced to eat flesh, so no one knows just when it developed a taste for the kidney fat of a sheep, and how it learnt to secure the tit-bit. This must always remain a mystery, although there are many theories to account for it. Perhaps the kea, tearing to pieces a sheep that had died on the mountains, found out the fat around the kidneys, and with diabolical intelligence attacked the living sheep, and, clinging fast with its claws to the wool, dug deeply into the skin and flesh of its living victim, and ate its fill of the fat. This appears the most probable

theory. Many observers, however, consider that the practice, common on sheep-stations and large forms in New Zealand, of having the sheep's carcass on the flagstaff, or on a pole raised for the purpose, may have taught the kea just where to find the fat. But in this case the carcass would have been skinned and ready for cutting up before being hung up, and the kea would have had no necessity to tear its way down to the fat.

The discovery of dead and dying sheep with great yawning holes in their backs first astonished the sheep-owners then worried them, for no one had the remotest idea that the kea was the culprit. The sheep were mysteriously attacked and mortally injured, the bird being content to eat the fat and leave the unfortunate animal to die a lingering death. When, however, the kea was found to be the culprit, it was no longer allowed to have the run of the killing-yards, but was shot or trapped. But this did not stop the ravages upon the sheep. It is quite probable that the keas which attacked the sheep in the first instance were parrots that were not in the habit of coming down to the slaughter-yards to to feed on the offal, but were birds that had not discovered this easy method of obtaining food. The clinging to the wool of the terrified animal, as it rushed about seeking to get rid of its tormentor could have been no easy matter, although the kea is quite as large as a raven, with claws that fit it for hanging on to anything that it has once gripped hold of. In the face of this change of habit, it seems extraordinary that our own birds of prey have not developed equally astounding tactics in securing their food. But apparently the British birds of prey still feed in the same manner as their ancestors have done for generations.

No doubt the kea, in its attacks upon its victims, uses its powerful wings to buffet and worry the sheep. Any one who has felt the force of the wings of even a small bird when it is battling with a foe must realise that the force behind the kea's wings is not to be despised. The sheep is not renowned for its resourcefulness under danger, and no doubt the attack of the winged marauder simply makes it crowd among its fellows, thus offering an easy victim to the merciless foe crouching on its back.

It is a pity that this large and interesting bird has become so injurious to the sheep, as it will probably be exterminated within a very short time, and follow in the wake of the many wonderful forms of bird-life which have already disappeared before the march of man's destroying footsteps. Its sole remaining relation, the kaka, has developed no new traits under the changed conditions of life introduced by the settler into New Zealand. Far rather does this parrot avoid the haunts of man. Its habits are nocturnal; and, although

many birds may be living in the depths of the densest bush. it is rarely seen by the bushman. I have lived for months in the bush, and have never seen one in a wild state. Yet as soon as the twilight and sudden dusk of the southern hemisphere set in, the night would be full of their shrill, piercing cries, as they winged their way to their favourite feeding-grounds. Sometimes at night, we would hear them in the tall trees; but as a rule they are silent, except when on the wing, and then they are extremely noisy. Even when living at Takapuna, near Auckland, although there were no tall forest-trees very close at hand, I have heard them night after night passing over, their harsh screams weirdly suggestive of uncanny proceedings up among the clouds, for even on moonlight night I could never catch a glimpes of the flying night-parrots.

My first experience of the great brown kaka was gained from a tame one belonging to a neighbour. This bird was possessed of almost fiendish intelligence and a capacity for mischief only equalled by a small monkey. When he had accomplished anything particularly wicked he would fly on to my shoulder, and, leaning forward, would stare up into my face with a look of impish mischief that was almost humanly evil in its expression. I was only a small child at the time, and the kaka constituted himself my principal torment, and I was terrified by the uncanny impishness of the bird. He would fly over to our place in the twilight and seek me through every room until he found me; then, watching for an unguarded moment, he would fly on to my shoulder and nip my ear with his powerful beak. My scream of pain would be echoed by a wild whoop of delight as he flew away to await another chance of torturing me. The very sound of his pattering feet on the veranda would send me seeking frantically for safety behind locked doors; while the kaka would patiently wait on the doormat watching for me, until some one, answering my frantic appeals, seized the bird and carried him off. He never attacked any one else in the same way, so I suppose my terror amused him. He was very knowing; and although he pattered all over the garden and house from early twilight until ten o'clock at night, he would vanish mysteriously the instant the clock struck, so that he should not be locked up in his cage. He was quite friendly with the numerous animals, and would visit the big duck-yard and amuse himself waddling up and down, and never attempted to touch the ducklings and he was quite to be trusted with cats and kittens. But every skin hearthrug was torn to scraps; and, if he could manage it, he would in the course of a night have the window-frames bitten through and the glass in pieces on the ground. Cups and saucers were pushed to the edge of the table and knocked over just to hear

them break with a crash on the kitchen floor. He fully realised that he was doing wrong, for he would screech with delight.

Another kaka which I owned a few years later was a most amusing bird, and loved walking, following me about like a small dog; but he invariably slept during the day, only waking in the late afternoon. He loved climbing the tall blue-gum-trees in the garden, and would scream defiance to our entreaties to him to come down. He climbed straight up the trunk after the usual parrot manner, but always came down backwards. Gripping with his beak a piece of bark or a projection of wood, he would drop his feet straight down, then catch hold, and cling while he twisted his head down as low as possible, taking another grip with his beak, and repeating the process until he had reached the ground; then he waddled after me. No calling would make him come down; but the sight of me opening the gate would bring him scrambling down, as he dearly loved a walk in the twilight.

We fed him on fruit, and during the summer he would gather and eat all he required in the orchard. I never saw him attempt to find insects; nor did he trouble to suck the honey from the flowers. He was exceedingly fond of sweets and sugar, and was very mischieveous. One of his favourite tricks was to come in very quietly, and remain hidden until the middle of prayers, when he would suddenly fly on to my shoulder with a screech which was most startling. If shut out of the room he would go round to the window and endeavour to get into. He loved to catch hold of anything that was being shaken, and would sit on a sack, almost asking to have it dragged over the ground. When he wanted anything, he would catch hold of my dress, and try to drag me in the direction he wished. At night he was shut up in a large outhouse with the dogs, and when he got dissatisfied with his own kennel, he would drive out a dog, and take possession of the kennel he coveted. He was very quiet, but sometimes he would call to his relatives as they flew past: and one day, when he was about eighteen months old, he flew off to join them, and I never saw him again. He was much missed, for he was always amusing, and his mischief had such a thought-out element about it that it was interesting to try to fathom the reasoning power of his brain.

The kakapo (*Strigops habroptilus*), another large parrot, has changed, not its food, but its physical habits, owing to the difference in its sorroundings. A noctural bird, always feeding on the ground, and admirably concealed by its protective colouring of freckled green so closely resembling the moss on which it feeds, the lack of ground vermin big enough to attack so large a bird has made this parrot lose the use of its wings. Sir Walter Buller, in speaking

about this, states that the wings are apparently large and strong; but, although the muscles are developed, they are overlaid with a quantity of fat, and the bird never attempts to use them.

The kakapo appears to have been very plentiful in the days when Sir Julius Haast observed its habits while he was exploring the west coast of New Zealand in the early sixties. He speaks of the true habitat of the kakapo as being the 'mossy fagus forest near mountain streams, with occasional grassy plots; but it also lives on the hillsides, amongst great masses of rocks in which it has its holes or burrows.' These immense rocks were mostly overgrown with roots of trees and a deep covering of moss. He saw 'one sitting on a fuchsia-tree, feeding upon the purple berries; but as soon as it saw him advancing it threw itself off the branch as if it had been shot, and disappeared amongst the huge fragments of rocks strewed along the hillside.' Apparently it never attempted to use its wings. In order to experiment with the kakapo, he took one which his dog had caught, and, selecting a wide flat which had sufficient open space for his purpose, he liberated the bird. It made no attempt to fly, or even to open its wings, but ran with extraordinary rapidity towards the nearest trees, its gait resembling that of a hen.

The aspect of the kakapo is peculiar, and has gained for it the name of 'owl-faced parrot,' but in captivity it is intelligent, social, and affectionate. Sir George Grey described its behaviour towards its owner as more like that of a dog than of a bird. It would run from the corner of the room and seize hold of his hand with bill and claw, and roll over and over like a kitten. It would then let go the hand and retreat to the corner, only to run out again and repeat the performance. The approach of a dog towards its cage was greeted with outspread wings and a pretence of anger. When the dog retreated it showed its pleasure by the most absurd antics and postures. When extremely pleased it would nestle down on its master's hand, ruffling its feathers and lowering its wings, fluttering first one and then the other, at the same time shaking its head from side to side

At that time the kakapo was evidently very plentiful, for the old Maoris repeat legends of its having been very numerous in the North Island; but the cause of its complete disappearance from that part of New Zealand remains a mystery. After the extermination of the moas and the kindred birds, the Moaris, essentially a flesh-eating people, must have been in sore straits for animal food. Eels certainly abounded in the lakes and swamps, but other fresh-water fish were not to be had. The only animal reared by themselves and eaten was the woolly-haired yellow poa dog; consequently, when the annual shark-fishing proved a failure, there was no flesh-food to be had. Probably the

kakapo, which burrowed in the ground and was easy to capture, was soon exterminated in the North Island, where the greatest number of Maoris lived. These times of food scarcity were often prolonged, and I have heard old Maoris say their ancestors, after they had killed and eaten all their slaves, and exhausted all their food, had to fall back upon the roasted roots of the bracken. I have never tasted a more unpalatable food, and wonder that the Maoris did not exterminate all the ground-feeding birds of New Zealand rather than partake of such fare.

What the Maoris' lack of flesh-food did in the North Island, the settlers' dogs and cats did in the South Island Unfortunately dogs have run wild, and these packs of animals soon destroyed the guileless kakapo, and it has become very rare ; so that the report that Mr. R. E. Clouston, a mining engineer, has discovered a colony of kakapo on the Gouland Downs, south of Colling wood, will be received by naturalists as being very important news. Most of Mr. Clouston's work was done at night, by the aid of strong acetylene lamps, and he was thus able to observe the habits of these night parrots fully, and to discover many things which were not previously known. The fact of the kakapo having been found on the Gouland Downs is interesting, as this, being a bird sanctuary, is controlled by Government, and these curious and interesting parrots will be protected in the future. Perhaps. too, the controversy about the bones and muscles of their wings will be finally settled.

In the early days of the Commonwealth the kakapo trails were often taken by the settlers for tracks made by human beings. These are frequently fourteen inches wide. Mr. Reischek, an Austrian naturalist, who observed the habits of the kakapo, stated that these tracks were usually made along the spurs of the hills. He found that when the hills were covered with snow the birds still travelled over the surface keeping to the same route. Where however, the dense scrub, consisting of silver-pine, ake-ake, and alpine vegetation, prevented the snow from penetrating to the ground, the birds lived in their burrows during the winter, the darkness under the snow apparently making no difference in their obtaining the food they required. When the snow began to melt in the spring the kakapos emerged and crouched in the sunshine, evidently enjoying the warmth They were no doubt sleeping, for Mr. Reischek found some, after the snow had melted, sitting on the low branches of a silver-pine. He approached quite close to them without their evincing any alarm ; only when he had caught them did they attempt to free themselves by bitting and scratching. This naturalist, like so many others who had observed the kakapo in the days when it was plentiful, stated that the flesh was delicious, and far better eating

than any other of the native birds; so, now that the kakapo has been rediscovered, it is just as well that it is in a protected area, or perhaps it would be exterminated by the settlers who might wish to taste a dish of roast kakapo.

THE "GITA" OR THE SONG OF SONGS

CANTO II.

The Philosophy of the Sankhya Yoga. *

"Hands o'er knees Arjun lay, eyes wet with tears,
And heart sore torn by conscientious fears.
"Ah! (Keshav cried), "whate'er deludes thy mind,
Dhananjoy! now betwixt these hosts confined?
It ill-becomes thee to indulge thy fears
While missiles whistle close about thine ears.
Shake off, O Parth! this faintness of the heart
Inglorious, and act well a hero's part."
"Yet, (said Dhananjoy thus)," I dare not slay
"The reverend Vishma and Drone, hap what may.
Rather than spill their blood, fain would I bear
A beggar's bowl, and live on humble fare.
For me no joy e'er blood-stained arms could buy
Were I made Sovran of the gods thereby!
The fate of wars, again, none can foresee.
Who shall win in the end?—our foes, may—be!
Which better is—*to slay*? or *to be slain*?
But, ah! with kinsmen slain life shall be vain,
In battle, therefore, I dare not engage,

* In the verses on the opening passages of the "Gita," the Printer's devil made the line—
"Midway between the rival armies *twain*"--run as follows: "Midway between the armies' *train*," altering "Twain" to "train."

And slaughter kith and kin in savage rage,
What grave doubts, Hrishikesh ! my heart do rend
—Be thou my "Guide, Philosopher and Friend !
"Wisdom then talk'st, yet griev'st unlike the wise,
Sulk not thus, Aryun ! (Madhav cried)—"Arise !
"Grieve not, then Arjun," (Madhav, smiling, said)
"Grieve not then for the living, nor the dead.
Thou dost confound the *Self* with the *Not-self*—
The *Sat* with th' *Asat*—ay, through blinding pelf.
The *Body* dies, the *Self* endures for aye *
Eternal, infinite, past all decay.
"*I ne'er was not, nor having e'er been, ceased*
Nor e'er shall cease to be, from births released.
The same, know ye, with Vishnu and every.
Arise, O Parth ! fight, nor indulge thy grief.
Through infancy, and youth, and senile age
The self remains, unchanged, through every stage,
And parts at death but to unite again.
With brand-new frame, (so, Arjun ! cease to plain).
As one casts off clothes out-worn or frayed,
And in new ones, behold ! appears arrayed ;
So "shuffles off" the self "its mortal coil"
And puts on flesh and blood for further toil.
Thou think'st, *as slayer*, of the self in vain,
Or *as slain* ; *for it slayeth not, nor is slain.*
The self by weapons never can be cleft ;
Nor ever by fire burnt till naught is left ;
Nor dried up by winds ; nor turned to clay
By water !—such the self beyond decay
Eternal, ancient, changeless and unborn,
It is not *slain*, though of the body shorn,
Thought cannot grasp the self *unmanifest*,
Immobile, firm (as saints of old expressed).
Sensations of heat and cold, joy and pain
Abide *these* not, but e'er change—'tis so plain,
What *is*—the *self*—can never *cease* to be.
What ne'er was—th' *sat*—cannot *be*, know ye.
Let to this dual truth thy mind be bent.

Learn to part Essence from pure Accident.
The Wise are not perturbed by Joy and Pain ;
Nor of these fleeting things care to complain.
Now then know'st what is meet for thee to know.
Arise, O Parth ! and fight thy kindred-foe.
But shouldst thou think the self is born and dies,
O Mighty-armed ! Vain are thy moans and sighs ;
For death awaits each of these chiefs on Earth,
And each must, as sure, spring to birth.
Unseen before birth, after death *unseen*
But whilst they breathe, then only are they seen,
Waste not thy tears on such as come and go—
Now here and gone next—since this *must* be so,
The Path of duty, mark ! through duty lies—
A Warrior *fights* and, fighting, nobly dies.
Think of *that*, for what warrior would not fight
For a *just* cause, in a *just* was of Right ?
Who would not fight a battle such as *this*—
An open door to fame and heavenly bliss ?
But shouldst thou hold back from this glorious war,
Eternal calumny thy fame shall mar—
From age to age the stigma shall remain.
And, worse than death itself, thy fair name stain.
You Warrior-chiefs shall ever brand thy name
Ah, with rank cowardice, and proclaim thy shames
If thou care naught, O Parth ! for name and fame
At least attend to Dharm's imperious claim.
Warrior thou art and canst not choose but *fight,*
Or thou wouldst *sin*, and soil thy honour bright.
Victor—thine shall be the Imperial reign !
Slain—straightway shall thy soul to heaven attain !"

(To be continued)

N. MUKERJEE, M. A. B. L.

GLORIES OF THE SANSKRIT LITERATURE.

As we have said before these commentators in their eagerness to avoid any semblance of dualism have many a time and often forgotten the contexts, proceeding to interpret it with a preconceived notion or in support of particular theories of their own. Indeed, they have lamentably confused the functions of Jiva or individual soul and of Brahma or Universal Soul. Brahma or Universal Soul is devoid of any activity, is the inmost controller of everything subjective or objective, is in fact identical with the Law of creation. The identity of Paramatma or Universal Soul with the 'antarjami atma' of Virhadaramjak 5/8/3 has been definitely settled in Sutra 19, Ch. I. Pada ii of the Vedanta-Darsan* Ramanuja Swami concludes his remarks on the above Sutra thus :—যোঽয়ং অন্তর্য্যামী শ্রূয়তে স কিং জীবাত্মা? উত পরমাত্মা ইতি সংশয়ে প্রত্যুচ্যতে-পরমাত্মৈব অয়ং অন্তর্য্যামী ন তু জীবঃ। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ পরমাত্মধর্ম্মোহ্যয়ং—যদেকঃ সন্ সর্ব্বলোক-সর্ব্বভূত-সর্ব্বদেবাদীন্নিয়ময়তীতি। শ্রীভাষ্যে রামানুজস্বামী ॥ That is to say, if a question arises as to whether 'antarjami' of the Upanishad referred to above, is identical with individual or universal soul, the answer is that it is identical with Universal soul and not individual soul, because the function of 'antarjami' enumerated in the Sruti belongs to Paramata—because it is He, who being one, controls all worlds, all elemental things and all the Gods—Ramanuja Swami in Sreebhashya. As 'Paramatma' pervades everything from beginning to end, if the change of grass into milk or of milk into curd were due to its active interference, then their first and last possible changes would have been identical and any scientific process to prevent the curdling of milk would have been out of question. On the contrary, there are numerous texts both Srauta and Smarta, besides those quoted before, which support the theory enunciated here. Some of them are quoted below :—

(১) তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ। ইতি কৌষীতকী ৩।৯। ইতি ভূতমাত্রাশব্দেন অচেতনবস্তুজাতমভিধায় প্রজ্ঞামাত্রাশব্দেন তদাধারতয়া চেতনবর্গঞ্চাভিধায় তস্যাপ্যাধারতয়া প্রকৃতং ইন্দ্রপ্রাণশব্দাভিধেয়ং নির্দ্দিশ্য তমেব "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যুপদিশতি। তদেতচ্চেতনাচেতনাত্মক কৃৎস্নবস্ত্বাধারত্বং জীবাদর্থান্তরভূতেঽস্মিন্ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যত ইত্যর্থ। ইতি শ্রীভাষ্যে রামানুজস্বামী। The sum and substance of the Sruti text and its commentary being that all inanimate things are controlled by sentient beings and the latter by Paramatma or Universal soul, which is here identical in meaning with Prana or 'Indra.' It may be asked that as

* The Sutra referred to being :—অন্তর্য্যাম্যধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ।

Indra is said to be a particular kind of Jiva, how can he be identical with Paramatma or Universal Soul? The reply is given in the next sutra of the Vedanta* where it is said that when an individual soul as the Rishi Vamadeva having an insight into the all-pervading, omniscient and omnipotent nature of the Universal soul identifies himself with It, he may so far forget his "jivatwa' or individuality as to call himself in every respect equivalent to Paramatma of or Uuiversal soul. †

(২) এবমেব এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে। শ্রুতিঃ। Just so, this omniscient soul enjoys Itself through these individual soul—Sruti. In the 'Brihadaranyaka' Ch. IV. Brah iii. sec 21, the words প্রাজ্ঞেন আত্মনা and পুরুষঃ (Purusha) occur. The latter is explained as 'kshetrajna (ক্ষেত্রজ্ঞ) or 'Jiva' and the former as Paramatma or Universal soul in which kshetrajna or individual soul merges, on the falling off of its material environment.

(৩) সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্ত ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১৭)-যাভিয়ং নামরূপব্যাকরণাত্মিকা প্রপঞ্চব্যষ্টিসৃষ্টিঃ সা কিং সমষ্টিজীবরূপস্য হিরণ্যগর্ভস্যৈব কর্ম্ম? উতত্তেজঃ প্রভৃতি শরীরকস্য অবাদিসৃষ্টিবৎ হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্য ব্রহ্মাণঃ। ইতীদানীং চিন্ত্যতে। "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছান্দোগ্য ৬।৩।২) ইতি জীবকর্ত্তৃকত্বশ্রবণাৎ। সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিঃ নামরূপব্যাকরণম্, ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মাণঃ, তস্যৈব নামরূপব্যাকরণোপদেশাৎ। কথং তর্হি 'অনেন জীবেন' ইতি সংগচ্ছতে? 'আত্মনা জীবেন' ইতি সামাণাধিকরণ্যাৎ জীবশরীরং পরংব্রহ্মৈব জীবশব্দেনাভিধীয়তে, যথা—'তৎ তেজ ঐক্ষত,' 'তদপোঽসৃজত' ইতি তেজঃ প্রভৃতি শরীরকং পরমেব ব্রহ্মাভিধীয়তে। অতো জীবসমষ্টিভূতহিরণ্যগর্ভ শরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মাণঃ কর্ম্ম নামরূপব্যাকরণম্। চতুর্ম্মুখশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণেঃ কর্ম্ম দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টিরিতি চতুর্ম্মুখকর্ত্তৃকসৃষ্টিপ্রকরণে নামরূপব্যাক্রিয়োপদেশশ্চোপপদ্যতে। ইতি রামানুজীয়ে শ্রীভাষ্যে।

The sum and substance of the Sutra, as commented on by Ramanuja Swami may be briefly stated thus:—Whether this universe with its heterogeneity of names and forms is the creation of Hiranyagarbha—the totality of all kinds of Jivas—alone* or of Para

* The Sutra referred to being:—শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ। বেদান্তদর্শনম্ ॥১।১।৩১॥

† "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্" ইত্যেবমাদিনা ত্বাষ্ট্রবধাদিভিঃ প্রজ্ঞাতজীবভাবস্য (ইন্দ্রস্য) স্বাত্মন এবোপাস্যতাং প্রতর্দ্দনায়োপদিশতি। অত উপক্রমে জীববিশেষ ইত্যবগতে সতি "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যাদিভিরুপসংহারস্তদনুগুণ এব বর্ণনীয় ইতি চেৎ (তত্র) "য আত্মনি তিষ্ঠন্, আত্মনোঽন্তরো, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যেবমাদিনা শাস্ত্রেণ জীবাত্মশরীরকং পরমাত্মানমবগম্য জীবাত্মবাচিনাম্ অহংত্বমাদিশব্দানং পরমাত্মন্যেব পর্য্যবসানং জ্ঞাত্বা "মামেব বিজানীহি, মামুপাসস্ব" ইতি স্বাত্মশরীরকং পরমাত্মানমেবোপাস্যত্বেনোপদিদেশ ইতি। যথা. বামদেবঃ পরস্য ব্রহ্মাণঃ সর্ব্বান্তরাত্মত্বং সর্ব্বস্য চ তচ্ছরীরত্বং শরীরবাচিনাং চ শব্দানাং শরীরিণি পর্যবসানং পশ্যন্ "অহং" ইতি স্বাত্মশরীরকং পরং ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্য তৎসামানাধিকরণ্যেন মনুসূর্য্যাদীন্ ব্যপদিশতি। ইতি রামানুজীয়ে শ্রীভাষ্যে॥

* We should rather say the sum-total of all kinds of 'Linga-dehas' or subtle (astral) bodies.

হিরণ্যগর্ভ ঈশোঽন্তঃ লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ। পঞ্চদশী।

তস্য হিরণ্যগর্ভস্য কিংরূপমিত্যাত আহ—লিঙ্গদেহেনেতি। মায়োপাধিকঃ পরমাত্মা লিঙ্গশরীরসমষ্ট্যভিমানেন হিরণ্যগর্ভ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। শ্রীরামকৃষ্ণবিরচিত ব্যাখ্যায়াং॥

সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।

তদভাবাত্ততোঽন্যেতু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া॥ পঞ্চদশী।

Brahma (the Supreme Lord) with the body of Hiranyagarbha. For it is said in the Srutis that He the Supreme Lord assuming the form of 'Tej' or light created water. On the other hand there is another Sruti-text which says that such heterogeneity was brought about through the agency of "Jivas." Hence Hiranyagarbha who is a kind of Jiva † is the creator of the heterogeneity of the universe, consisting of names and forms. Ramanuja says that this is untenable, as there is an express text of the Sruti which ascribes the creation of the heterogeneous universe to the Supreme Lord and not to Hiranyagarbha. How then the two Sruti-texts—one of which ascribes such creation to the Supreme Lord and the other to Hiranyagarbha—are to be reconciled to each other? Ramanuja Swami says, that the words 'আত্মনা জীবেন' connoting the same thing refer to the Supreme Lord in the guise of a Jiva and therefore Himself a 'Jiva.' For example, in the Sruti-text which says 'Light saw' and 'Light created water,' it really means that God assuming the body of light created water; so here also the supreme Lord assuming the guise of Hiranyagarbha—who is represented to be the totality of the subtle bodies of all kinds of Jivas or sentient beings—created this universe of names and forms. "This explanation" says Ramanuja Swami "accords with the Pauranic tradition which ascribes such a creation to four-faced Brahma* for, the Supreme Lord assuming the body* of four-faced Brahma (ব্রহ্মা) evolved out this universe of heterogeneous names and forms." It must be

ঈশঃ—ঈশ্বরো হিরণ্যগর্ভঃ। Vide also verse 200 of chaitra-dipa-prakara—nam of Panchadasi, where 'Sutratma' is the same as Hiranyagarbha.

†(১) তদিদং ব্রহ্মণোযোনিরেতদণ্ডং ঘনং মহৎ।
ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে॥
শিবপুরাণম্।

(২) প্রাকৃতেঽস্মিন্ বিবৃতেষু ক্ষেত্রজ্ঞঃ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
কূর্মপুরাণম্।

Vidyaranya Swami in verse 12 of chitra-dipa-prakaranam of Panchadashi denies the 'Jivatma' of Hiranyagarbha, because he is devoid of nescience, desire and action. But this is in opposition to almost all the authoritative opinions on the subject. Nilkantha in his commentary on the Mahabharat says that when the Supreme Lord under the influence of Maya forgets his own self a little he is called 'Sutratma or Hiranyagatbha,' when this forgetfullness becomes somewhat overpowering, he is called 'Virat,' when very great he is called an individual মায়োপাধীশ্বরোঽল্পবিস্মৃত্যা ব্রহ্মাণ্ডবোধে সূত্রাত্মা, অধিকবিস্মৃত্যা প্রাবল্যে বিরাট, অতিপ্রাবল্যে ব্যষ্টি দেহমাত্রাভিমানী। ইতি ভারতভাবদীপে নীলকণ্ঠঃ। So the diffence between Hiranyagarbha and individual Jiva is a difference of degree of intelligence only.

* (a) নামরূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনং।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥
বিষ্ণুপুরাণম্।

সঃ—ব্রহ্মা, ধাতা ইত্যর্থঃ।

(b) হিরণ্যগর্ভো জগদন্তরাত্মা।
ত্বত্তোঽস্তি জাতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
স জায়মানো ভবতা নিসৃষ্টো
যথাবিধানং সকলং সসর্জ॥ কূর্মপুরাণম্।

said that four-faced Brahma is but another name of Hiranyagarbha †.

Even the great Sankara who discards away all distinction between Para Brahma (supreme soul) and Jiva (individual soul) concludes his commentary on the same Sutra with the following remarks :—ন চ গিরিনদী সমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেষ্বনীশ্বরস্য জীবস্য ব্যাকরণসামর্থ্যমস্তি। যেষ্বপি চাস্তি সামর্থ্যং তেষ্বপি পরমেশ্বরমায়ত্তমেব-তৎ। ন চ জীবো নাম পরমেশ্বরাদত্যন্তভিন্নশ্চার ইব রাজ্ঞঃ। আত্মনেতি বিশেষণাৎ। উপাধিমাত্র-নিবন্ধনাশ্চ জীবভাবস্য। তেন তৎকৃতমপি নাম-রূপব্যাকরণং পরমেশ্বর কৃতমেব ভবতি। ইতি শারীরকভাষ্যে শঙ্করস্বামী॥ That is to say 'Jivas' unless superdirected by the Supreme Lord cannot of themselves evolve out such heterogeneous names and forms as the mountain, the river and the ocean. Even in these cases where they can evolve out some cosmic changes, it is to be presumed that their activities are under the perfect control of the Supreme Lord. Nor is there any essential difference between the Supreme Lord and the Jiva—the relation between the two being like that of a king and his favourite spy, as indicated by the qualificatory word 'atmana' (আত্মনা) or ownself. When then Supreme Lord assumes a guise or form, He is called 'Jiva.' Hence even admitting that this universe of names and forms was evolved out by a Jiva, it is not untrue to say that the Supreme Lord is the real evolver of such an universe, for whatever a 'Jiva' does is to be inferred as the doing of the Supreme Lord—Sankara Swami in Shariraka Bhashya.

We do not think it necessary to say anything about the Prime evolver of this heterogeneous universe, so long as these learned commentators agree in holding that the Prime Evolver or the Supreme Lord assuming the guise or form of 'Jivas' brought about these cosmic changes. The fact is, that these commentators in their eagerness to avoid the least tincture of dualism and to interpret the texts in accordance with some preconceived theories of their own, have passed by all minor enquiries which might have enabled them to give a more rational explanation of the Sruti-texts—laying stress under all circumstances on the fact that everything is evolved out of and controlled by the Supreme Lord and that there is nothing else whose existence and function is worth consideration. This being their ideal notion, ever and anon occupying their mind, they have discarded with every enquiry smacking of dualism, forgetting that it was by keeping their minds open and by cautious enquiries from the visible to the invisible, from the known to the unknown, that the vedic Rishis arrived at those conclusions which are the wonders of

† (a) প্রজাপতির্বিরাট্ প্রোক্তো ব্রহ্মা সূত্রাত্মনামকঃ।
পঞ্চদশী।

(b) এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণ ইতি চোচ্যতে সর্বানুস্যূতত্বাৎ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া শক্তিমদ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাভিমানিত্বাচ্চ। ইতি বেদান্তসারে।

the mordern world.* In short, these commentators were born at a time when *apriori or synthetic* method of reasoning was so much in vogue that it may safely be asserted that the *aposteriori or analytic* method of the Vedic Rishis of India had fallen into a hopeless quagmire to be extracted at a later period by the unremitting toil and laborious researches of scholars from the West. Although it must be admitted that the western system of education has not as yet lifted the veil of ignorance and superstition that shrouds nearly ninety per cent of our people, it cannot be denied that the dawning spirit of enquiry and criticism which is characteristic of the Indian Savants of the present day, is principally due to the eye-opening influence of scientific knowledge imported from the West. It must also be said that at the time these commentaries were being written, the inferences of the Vedic Rishis based on scientific observation and experiment, had assumed the character of dogmas and it would have required a good deal of moral courage and stamina to go over the field again. for, although there was no fear of any Inquisitory Institution of the kind introduced in Europe during the middle ages, the cramping influence of undue conservatism had dried up in them every incentive to independent enquiry savoring of the frying pan.

(৪) দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো
অভিচাকশীতি॥
মুণ্ডকোপনিষৎ।

"Lo, on the self-same tree two gracious birds
What friendship keep, what constant union!
See, one of them looks on approvingly
The while the other a sweet fruit doth eat,
(The one eats not, he is content to see
For very joy in love's sufficiency!)
So sweet a bond subsists, my son, where God
And man within the self-same body dwell
"Mundakopanisher"
Late Mohit Sen's Translation.

The two birds represent the universal and the individual souls. The tree stands for the physical body. That which eats the fruit is the individual soul while the on-looker is the universal soul.

(৫) যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥
গীতা॥

* Vide 'Dacca Review' Vol III. No 1, April 1913, pages, 26-27, especially note to line 17 of page 26 of the journal. The fourth example of the note taken from chhandogya (ছান্দোগ্যোপনিষৎ) Ch. VI pt. 8 sec. 4, is clearly illustrative of the aposteriori or analytic method of reasoning prevailing in the time of the Vedic Rishis. Indeed, the entire chapter is worth persual as the arguments advanced therein and the conclusion arrived at are mainly based on the inductive method of reasoning, analogous to that of modern times, in which experiment and observation play an important part.

O' best of the Bharatas, know that all things, moveable and immoveable, arise from the union of matter with knowing soul—Geeta.

It is regrettable that the Geeta does not more explicitly explain the nature of the connection of soul and matter. It may either mean that the change of matter is spontaneous in the presence of life or that it is brought about through the active agency of life. But if we try to explain it in connection with verses 5 of ch. 7, 3 of ch. 13, 3-4 of ch. 14 and 7 of ch. 15th of the Geeta, it is very probable that the underlying meaning of the verse is that these heterogeneous changes are brought about through the active influence of 'kshetrajna' or life or 'kshetra' or matter. The use of the names 'kshetra' and 'kshetrajna' as explained in a preceding part of the article* is also suggestive. Nilkantha in commenting on verse 3. ch. 13 of the Geeta remarks :—এতেন চিৎপ্রতিবিম্ব সাপেক্ষত্বোপপাদনেন প্রকৃতেঃ সাংখ্যাভিমতং স্বাতন্ত্র্যং নিরস্তং ॥ নীলকণ্ঠঃ।

The late Swami Vivekananda in his free commentary on Sutra 12. ch. II. of Patanjal-Darsan thus remarks :—"There are various kinds of bodies or forms in the universe. All these are made of five kinds of Tanmatras. The differentiation is owing to the differentiation of quantity and quality of the Tanmatras. If you can bring the arrangement of the Tanmatras under your control you can create any form you like. Who else than you, has made this body? Who, but you, eats food? If any other person would have eaten food in your place, you would not have lived long. Who but you transforms the food into blood and flesh? You have built your own body and is living within it, only the knowledge as to how it is made has been forgotten by you. With the knowledge thus forgotten, we have become machines only. That which we are doing like machines shall have to be done with self-conscious knowledge and power. We are the creators of this heterogeneous universe and therefore shall have to control this creation. If successful in this, we shall be able to create bodies according to our own will and then and then only death, disease or birth would cease to have any fear for us."

We shall now proceed to describe another theory of the Rishis. The Sankhyists say that 'Prakriti' or Primordial matter being a composite body,

* Vide 'Dacca Review' Vol. V. No. 4. July, 1915, pages 139-146, where an eleborate discussion is given of the meaning of the terms 'kshetra' and 'kshetrajna' as used in the scriptural and the philosophical writings of the Hindus. In commenting on verse 2. ch. 13 of the 'Geeta' where the terms 'kshetra' and 'kshetrajna' are used in a restricted sense. Nilkantha Pandit explains 'kshetra' as matter where the seed of action may be fructified through the agency of the individual soul or 'kshetrajna.'

it may be said that matter in its every stage is composite also. Prakriti or Primal matter is said to be composed of things which are classified under the three general headings of "Sattwa" (সত্ত্বং) "Rajas" (রজঃ) and "Tamas" (তমঃ).* That is to say all kinds of matter in their *super-fines* stage constitute the homogeneous product called 'Prakriti' or Primordial matter. As the Sankhyists maintain that all kinds of matter were evolved out of this root-element and have their existence in it, hence they also partake of the nature of their origin, that is to say they are also composite or compound bodies.

(To be continued.)

GOBINDA CH. MOOKHOPADHAYA.

* With the Sankhyists 'Prakriti' or Primordial Matter is a homogeneous root element represented by the three *entities* called Sattwa (সত্ত্ব), Rajas (রজঃ) and Tamas (তমঃ) in a state of equilibrium. These three entities are said to be matter (দ্রব্যপদার্থ) in its superfinis stage. সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন বৈশেষিকাঃ গুণাঃ। সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ। লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদি ধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষাং সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থাহন্যূনানতিরিক্তাবস্থা ন্যূনাধিকভাবেনাসংহতাবস্থেতি যাবৎ। ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুরচিত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে। Although represented by these three entities, Prakriti is a homogeneous element pervading all space, all material forms however minute, however subtle. These three entities though ideally infinitely divisible, have never been and can never he separated from each other. On an ultimate analysis of all matter and material forms, it will be found that they are resolvable into these three entities লঘুত্বাদিধর্ম্মৈঃ সর্ব্বাসাং সত্ত্বব্যক্তীনাং সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং চ রজস্তমোভ্যাম্। এবং চলত্বাদিধর্ম্মৈঃ সর্ব্বাসাং রজোব্যক্তিনাং সাধর্ম্ম্যং সত্ত্বতমোভ্যাম্ চ বৈধর্ম্ম্যং। এবং গুরুত্বাদিধর্ম্মৈঃ সর্ব্বাসাং তমোব্যক্তীনাং সাধর্ম্ম্যং সত্ত্বরজোভ্যাম্ বৈধর্ম্ম্যং। অত্র সূত্রে (১ম অধ্যায় ১২৮ সূত্রং)। সত্ত্বাদীনাং কারণদ্রব্যানাং প্রত্যেকমনেকব্যক্তিকত্বং সিদ্ধং। ইতি সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে। The Sankhyists do further maintain that although Prakriti occupies all space, each of these three entities occupies limited space only. পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্। সর্ব্বোপাদানম্ প্রধানং ন পরিচ্ছিন্নং ব্যাপকমিত্যর্থঃ। সর্ব্বোপাদানত্বমত্র হেতুগর্ভবিশেষণম্। পরিচ্ছিন্নে তদসম্ভবাদিতি। ননু প্রকৃতেরপরিচ্ছিন্নত্বং নোপপদ্যতে। প্রকৃতিহি সত্ত্বাদি গুণত্রয়াদতিরিক্তা ন ভবতি। সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাদিত্যাগামিসূত্রত্বাৎ। তেষাং চ সত্ত্বাদীনাং লঘুত্ব চলত্ব গুরুত্বাদয়ো ধর্ম্মা বক্ষ্যমাণা বিভুত্বেসতি বিরুদ্ধাস্তে স্পষ্টাদিহেতবঃ সংযোগবিভাগাদয়শ্চ নোপপদ্যন্তে ইতি। অত্রোচ্যতে। পরিচ্ছিন্নত্বমত্র দৈশিকাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেবেতি প্রকৃতের্ব্যাপকত্বমিতি পর্য্যবসিতম্। ইতি সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে। Some one asks, if these three entities occupy limited space (পরিচ্ছিন্ন), although infinite in variety, then what differentiates it from the vaisheshik (বৈশেষিক) system? The answer is given below:—নন্বেবং মূলকারণস্য (সত্ত্বাদি গুণত্রয়াণাং প্রত্যেকস্য) পরিচ্ছিন্নাসংখ্যব্যক্তিকত্বে বৈশেষিকমতাদত্র কো বিশেষ ইতি চেৎ। কারণদ্রব্যস্য শব্দস্পর্শাদিরাহিত্যমেব। "শব্দস্পর্শ বিহীনং তু রূপাদিভিরসংযুতম্। ত্রিগুণং তৎ জগদ্যোনিরনাদি প্রভবাপ্যয়ম্।" ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ। এতচ্চ পাতঞ্জলেহস্মাভিঃ প্রপঞ্চিতম্। ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুরচিতে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে। In sutra 39, ch. VIth of his Sankhya Darsan Vijnanbhikshu discusses the relationship of these three entities with Prakriti. The discussion is too long for quotation here. Briefly stated it amounts to these that these entities are neither qualities nor actions of Prakriti but representatives of Prakriti and may be her parts. সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতি কার্য্যত্বাদিবচনানি চাংশতঃ প্রকাশাদি কার্য্যোপহিততয়াভিব্যক্ত্যাদিকমেব বোধয়ন্তি। যথা পৃথিবীতোয়োৎপত্তিরিতি। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে।

THE CLIFFS OF ENGLAND.

I love those places high above the sea
Where hawthorn bushes strain their wind-whipped arms
Inward toward the land as if to flee
The ocean's gusty breath and wild alarms,
Those rugged heights thick-strewn with rocks and fern

And heather bells with many a hue besprent
Where in the spring the blazing gorse doth burn,
Loading the wind's soft palm with clinging scent.
There at the eventide the rabbits come
Shyly from their deep holes, in quiet play
At mellow eve, when all the world is dumb

Laved in the last rich glories of the day.
Softly the great sea heaves on far below
In placid majesty, slashed with a belt
Of rippling gold, rising and falling slow.
Then are the greater mysteries faintly felt

To stoop from heaven and sanctify the wave,
Roaming unseen the silken drowsy deep
In each lone bay and every darkling cave,
Till all things hover at the Gates of Sleep.

D. G D.

৭ম খণ্ড | ঢাকা—আষাঢ়, ১৩২৪ | ৩য় সংখ্যা

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্তমধুপ বঙ্গের উজ্জ্বল রবি।
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুসূদন কবি।

বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ কবিভূষণ ও সমবেত সভ্যবৃন্দ, যে মহাকবির স্মৃতিবাসরে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, শুধু বঙ্গের নহে, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের বরণীয়, ও প্রেমিক কবিশ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাকবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার কবিতারূপিণী মন্দার-মালায় বঙ্গভাবা আচন্দ্র দিবাকর সুশোভিত হইয়া থাকিবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবিগণের বহুযত্ন-কল্পিত কবিত্ত্ব-কাননে মধুময় মধুসূদনের মধুমতী ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গদেশকে যেন চিরদিনের মত সরস করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলের এমনই একটা মাহাত্ম্য, বাঙ্গালার শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রের, সুনীল বনাবলীর এমনই একটা মাধুরী, এমনই একটা উন্মাদকতা, যে অতিবড় নীরস পাষাণেও এখানে নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমরা সত্যই,

"পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে"

তীর্থস্থানে উপনীত হইলে যেমন হৃদয়ে কেমন একটা স্পৃহণীয় ভাবের উদয় হয়, অরুণোদয়ে নীলাম্বুরাশির বেলাভূমিতে উপবিষ্টের মনে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশ হয়, সায়ংকালে পল্লী প্রান্তরে সমাসীন ব্যক্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দয়েল শ্যামার তানে নয়ন ও মনে যেমন একটা আনন্দময়ী জড়তার আবির্ভাব হয়,—এই বাঙ্গালার পল্লী-কুঞ্জে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতই ঐরূপ ভাবাবেশ জন্মিয়া থাকে। যাঁহারা আবার ভাগ্যবান্, বিধাতার অনুগ্রহ যাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত, তাঁহারা ঐ ভাবাবেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হন, নর-জীবন সার্থক করেন। দিবাবসানে, যখন পল্লী-পাদ-বাহিনী তটিনী কুলকুল গীতিকায় পথিকের প্রাণে কেমন

একটা উদাস ভাব জাগাইয়া বহিয়া যায়, তটবর্ত্তী বটবৃক্ষের মূলে সমাসীন পথিকের হৃদয় সান্ধ্য-সমীরণে যেন কেমন বিভোর হইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তখন, সেই আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের সুপ্ত বীণা আপনিই অনুরণিত হইয়া উঠে। যদি তাহার চিত্তে প্রেম থাকে, যদি তাহার জন্মান্তরের পুণ্য থাকে, তবে তখন সে পাগলের মত গাহিতে থাকে, তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী কল্পনাময়ী প্রতিমার চির-প্রসন্ন-মুখের দিকে মুদ্রিত-নেত্রে চাহিয়া বলে—

"মধুর-মুরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।"

(সারদামঙ্গল)

তখন সে যুক্তকরে তাহার আদরিণী প্রতিমাকে স্তব করিতে আরম্ভ করে, কখনো ধ্যান করে, কখনো আবার দুই হাত বাড়াইয়া সেই সস্মিতবদনা জ্যোতির্ম্ময়ীকে ধরিতে যায়, সত্যই সেই করুণাময়ীর সকরুণ নয়নের দীপ্তিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া তখন ঐ ব্যক্তি কত কি বলিতে থাকে,—কখনো শোকাশ্রুতে ধরণী ভাসাইয়া দেয়, আবার প্রেমাশ্রুতে কখনো বা মরভূমি অমরধামে পরিণত করে,—তখন তার—

সে শোক-সঙ্গীত কথা
শুনে কাঁদে তরু লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী ছবি,
গদ গদ আদি কবি,
অন্তরে করুণাসিন্ধু উথলিয়া যায়।

(সারদামঙ্গল)

যথার্থই তখন সেই বিশ্বনন্দিনী প্রতিমার প্রতি নিশ্বাসে জগৎ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ সাধক কবি তখন বুঝিতে পারেন না, বা জানিতেও পান না যে, তিনি কি করিতেছেন, কি গাহিতেছেন? তাঁহার অপ্রবুদ্ধ কণ্ঠের "মা নিষাদ" গীতিকা যে জগতে এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিবে, নূতন রাগের প্রবাহ বহাইবে, ইহার বিন্দুবিসর্গও তিনি তখন ঘুণাক্ষরে জানিতে পান্ না। কবি তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী বিলাস-বিহ্বলা কমলার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পুরোবর্ত্তিনী করুণাময়ী বাগ্‌দেবতার দিকে অনিমেষে চাহিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে বলেন,—

এস মা করুণ-রাণী
ও বিধু-বদন খানি,
হেরি হেরি আঁখি ভরি, হেরি গো আবার;
শুনে সে উদার কথা,
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার!
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর।

(সারদামঙ্গল)

কবির তখনকার সেই উন্মাদনা-সঙ্গীত যে, কালে এক নব-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন না। এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরের কবি মধুসূদন একদিন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন। আদি কবি বাল্মীকি যখন আপনার গানে আপনিই বিমুগ্ধ ও কদাচিৎ "কি গাহিলাম" বলিয়া সংশয়িত, তখন চতুর্ম্মুখ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রত্নাকরকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—"ঋষিবর, তুমিই জগতের আদি কবি হইলে, অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত হইবে, তোমার গানে মর-জীব অমরতার সুখ উপলব্ধি করিবে।" হায় এ বাঙ্গালার রত্নাকর মধুসূদনের ভাগ্যে ঠিক ইহার বিপরীত ফলিয়াছিল। অথবা শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশের মহাকবিদের ভাগ্যেই লাঞ্ছনা! দুর্জ্জন সমালোচকের মর্ম্মঘাতিনী কথায় মহাকবি কীট্‌সের হৃদয় শতধা-ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল!! হায়, অকালে ক্ষয়রোগে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল!!!

বঙ্গের কবিতাসুন্দরীর রাতুল-চরণ শৃঙ্খলিত দেখিয়া, মধুসূদনের প্রাণে বাজিয়াছিল, উপাস্য দেবতার দুর্দ্দশার

ভক্তের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই কাঁদিতে কাঁদিতে মধুসূদন বলিয়াছিলেন,—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে,
মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি, কত ব্যথা লাগে,
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে!

প্রেমে হউক, শোকে হউক, আদরে হউক, উপেক্ষায় হউক, মানুষ যখন পাগল-পারা হয়, তখন তাহার সকল বিষয়েই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, সে তখন উদ্দামভাবে বিচরণ করিতে চায়, তাহার সমক্ষে তখন বিশ্বের তাবৎ পদার্থই ঐহিক রীতিনীতির শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, পুরাতন সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, এক অতি মনোরম নবীনতায় সাজিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

এই কবিবাক্যের তখন প্রকৃত সার্থকতা জন্মে। মহাকবি মধুসূদন বীণাপাণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন,—আপনার ইহকাল পরকাল, সুখদুঃখ, সম্পদ-বিপদ, পুত্রকলত্র,—সমস্ত ভুলিয়া কবিতার সেবা করিয়াছিলেন, যথার্থই "ক্ষিপ্তগ্রহের ন্যায়" দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া, কবিতা-সুন্দরীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছিলেন,—একাগ্রহৃদয়ে ধ্যানে বসিয়াছিলেন,—তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার "অনন্য-পরতন্ত্রা" ভারতীকে মানস-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়! সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণ-পদ্ম, পদ্ম-বাসিনি! ভারতি!
কর পরিমল-ময় এ হিয়া সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মাগো, এ মোর মিনতি!"

তাঁহার "মিনতি" সফল হইয়াছে। শুধু "হিয়া" নহে, ভারতীর করস্পর্শে তাঁহার দেহ মন—সমস্তই "পরিমলময়" হইয়াছিল, তাই তাঁহার সংস্পর্শে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি চিরদিনের মত পরিমলময়ী হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গভাষার "রাঙা চরণে মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি" দেখিয়া, মধুসূদনের হৃদয়ে যে কি ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহা উপরিধৃত কয় পঙ্‌ক্তি হইতেই বেশ বুঝা যায়। আমি যাঁর সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিব, যাঁহাকে মা বলিয়া প্রাণ শীতল করিব, কানন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যাঁহাকে ডাকিব, আমার সেই ডাকে সমগ্র গৌড়ভূমি চমকিয়া উঠিবে, আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিবে,—আমার এমন যে মা, এত সাধের, এত আদরের যে মা, তাঁহার চরণে শৃঙ্খল! পুত্র আমি, আমার সমগ্র সামর্থ্য ব্যয় করিয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিব। মা আমার উন্মুক্ত-চরণে, বন-কুরঙ্গীর মত স্বৈর-চরণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন, আর পুত্র আমি মা মা বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইব। যদি মায়ের চরণ-নিগড়-মুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে কিসের পুত্র আমি, কুপুত্র আমি। তাই বাণীর বরপুত্র মধুসূদন সজলনয়নে বলিলেন,—

ছিল নাকি ভাব-ধন কহলো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে,
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে!
কি কাজ রঞ্জনে রাঙ্গি কমলের দলে?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!

লৌকিক ভাষায় অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের প্রবর্ত্তনের ন্যায় বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন বাঙ্গলা কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে। অনেকের কবিতা পাঠাকালেই হৃদয়ের ওজস্বিতা যেন কর্পূরের মত ক্রমে উপিয়া যায়, ক্রমে শরীর ঝিমাইতে থাকে, দেহে অহিফেনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর মধুসূদনের তরঙ্গিনী কবিতা পাঠ করিয়া—

"উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।"
(নবীনচন্দ্র)

মধুসূদন চাহিতেন যে, তাঁহার স্বজাতিকে, তাঁহার চিরপ্রিয় গৌরজনকে এমন সুধাপান করাইবেন, যাহাতে তাহারা মানুষের মত হইবে। একেই ত নানা ভাবে

সকলে ক্রমে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর আবার ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ কেন? এখন জাগ্রত করিতে হইবে; তাই মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত। তাহাতে বিদেশীয় মসলা নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-জগতের ভাল মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রতিমা বসান নাই। জাতীয়তার বিসর্জ্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্যরাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতারাণীর ললাট মাজ্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ রাগে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। উপবৃক্ষই কালে শুকাইয়া যায়, মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোজা কথায় ইউরোপের নানা কারুকার্য্যখচিত সুন্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু জাতীয় কবিতাও যদি বিজাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে হয়, তবে আর রহিল কি? এরূপ দুষ্কার্য্যের ফল জাতীয়তার ক্রমিক ধ্বংস। মহাকবি মধুসূদন সে পথে যান নাই। তিনি ইউরোপের মিত্রাক্ষরে এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন। তিনি গৌড়কে প্রাণময় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গের কবিতাকে মদালসার পরিবর্ত্তে বীরাঙ্গনার ভূষায় বিভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাটক প্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাফল্য তর্কের বিষয় হইলেও, অমিত্রচ্ছন্দের সম্পর্কে তিনি যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মধুসূদনের পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অমিত্রছন্দ অল্পভাবে কদাচিৎ পারদৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু তাহার কোনরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল না। মধুসূদনের যে কম্বুনাদে বঙ্গসাহিত্য গগন মুখরিত, তাহার এক ভগ্নাংশও ঐ সব প্রাণহীন কবিতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। শুধু তাঁহার নয়নের নহে, তাঁহার কবিতার "হিরণ্ময় জ্যোতিতে"ও বাঙ্গালা ভাষা চিরদিনের মত জ্যোতিম্মতী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্যে এবং কবিতায়, উভয়ত্রই একটা উৎকট আবেগ দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষেত্রে যেমন তিনি কদাচ জড়তার অধীন হইতেন না, কখনো একভাবে, একটা বিষয় লইয়া থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই চাহিতেন, যাহা করিতেছেন তাহা ছাড়া আরও একটা কিছু; কবিতার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। যখন যেখানে গিয়াছেন, ভালমন্দ যেমন অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের টান কিন্তু কবিতার প্রতি সর্ব্বদাই সমান। কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই তাহার ন্যূনতা ঘটে নাই। বরঞ্চ বাহ্য বিশৃঙ্খলা, সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কবিতার সেবায় তিনি অধিকতররূপে নিবিষ্ট হইতে পারিতেন। আত্মসত্তায় তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তাই যখন একটা নূতন কিছু করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন দৃঢ়তার সহিত বন্ধু বান্ধবকে তাহার সাফল্যের কথা বলিতেন। সর্ব্ব প্রথম যখন চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন, তখন তিনি প্রথম কবিতাটী, তদীয় প্রিয় ও অকৃত্রিম সুহৃদ রাজনারায়ণ বাবুকে পাঠাইয়া লিখিয়াছেন,—

What say you to this my good friend. In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী তিনিই সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সনেটটী কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল জীবনীতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই:—

কবিমাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা'সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন শয়ন ত্যজে ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।

বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা,—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি!
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে!

এই কবিতা রচনার অনেক পরে মাইকেল চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী নাম দিয়া যে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন, এইটী তাহার তৃতীয় কবিতা; মনে হয়, ঐ প্রথম কবিতাটী মাজিয়া ঘসিয়া কবিবর "বঙ্গভাষা" এই নামে বাহির করেন, কেন না প্রথমের কথা ভোলা বা প্রথমের মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন।

বঙ্গভাষা।

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা' সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে, সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি।
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

তিলোত্তমা রচনার পর চতুর্দ্দশপদী কবিতায় মাইকেল হাত দেন। তিলোত্তমা অমিত্রচ্ছন্দের এক প্রকার প্রথম কাব্য। বোধ হয় বঙ্গের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী তিলোত্তমার প্রতি প্রথম প্রথম তত সদয় ব্যবহার করেন নাই। মাইকেল যদিও কখনো আত্ম-মতানুযায়ী কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, বা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কবিতা লেখেন নাই, তবুও কিন্তু বঙ্গের নূতন ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার আদরিণী তিলোত্তমাকে অন্যে আদর করিতেছে, দেখিয়া, আনন্দে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tillottoma. The renowned Vidyasagore has at last condescended to see 'great merit' in it, and the 'Shome Prokash' has spoken out in a favourable manner.

বঙ্গভাষার প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদ বধ প্রকাশ বিষয়ে রাজা দিগম্বর মিত্র অর্থ সাহায্য করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া, বঙ্গ-কবিকুল কেশরী মধুসূদন নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন। হায়,—বাণীর বরপুত্রের এই সময়ের উক্তিতে নয়ন সজল হইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন,—In this respect. I must thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my *idle* things find Patrons and customers. * * *

তাঁহার 'idle things' গুলি আজ বঙ্গভাষার উজ্জ্বলরত্ন, বঙ্গবাণীর কিরীটমণি এবং বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর অশেষ গর্ব্বের কারণ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যাবলীর প্রত্যেক খানিই যেমন নিজের নিজের এক অতি অসাধারণ ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন, মধুসূদনের কবিতা গ্রন্থগুলিরও প্রত্যেক-খানি সেইরূপ এক একটী অসাধারণ ধর্ম্মে বিমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন। সেইরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম বাঙ্গালার অন্য কোন কাব্যে আছে কি না, বা কালে থাকিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা যখন পড়ি,—দ্বারকানাথের উদ্দেশে রুক্মিণীর সেই পত্র—সেই:—

"শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা। চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কান্দি দিবানিশি!—
নীরবে দু'জনে কাঁদি সভয়ে বিরলে।

লইনু শরণ আজি ও রাজীব পদে ;—
বিঘ্ন বিনাশন তুমি, ত্রাণ দিয়ে মোরে।
কি ছলে ভুলাই মনঃ, কেমনে বে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব শ্রীপতি !
বহে প্রবাহিনী এক রাজ-বন-মাঝে,
"যমুনা" বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি। কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল কদম্ব—তুমি হাসিবে শুনিলে!!
পুষিয়াছি সারি শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত,
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজি।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে !
কহ কুঞ্জবিহারীরে হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া ;
কিংবা মোরে লয়ে দেব দেহ তাঁর পদে।"

এই অনুপম পঙ্‌ক্তিগুলি যখন পাঠ করি, তখন যথার্থই আত্মবিস্মৃত হই, কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টিচাতুর্য্য দর্শনে ও শব্দ গ্রন্থনের অনুপম কৌশলে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ি। তখন—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াপিবা।
পাদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া॥

আলঙ্কারিকের এই উক্তির প্রকৃত অর্থাববোধ হয়। এমন সুন্দর কবিতা, সুন্দর পদরচনা, সুন্দর ভাবাবেশ যে ভাষায় আছে, যে ভাষায় হইতে পারে, সেই ভাষা আমার মাতৃভাষা, সেই ভাষা আমার জন্মভূমির ভাষা, আমার বাঙ্গালার ভাষা, ইহা যখন ভাবি, তখন সত্যই একটা শ্লাঘা অনুভব করি। যখন—

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাথন !
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন !
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধা-বিনোদন ?
কি কহিলি, কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
মধু,—যার মধুধ্বনি— কহে, কেন কাঁদ ধনি !
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনার বিষাদ-গীতিকা শ্রবণ করি, তখন এই সকল কবিতার প্রতি চরণে, প্রতি অক্ষরে, মধুধ্বনি, মধুসূদনের নবনীতকল্প হৃদয়ের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাই। আবার

কি কহিলি বাসন্তি পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কা'র হেন সাধ্য বল রোধে তার গতি !
দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ! ভিখারী রাঘবে ?

প্রমীলার এই মেঘমন্দ্রধ্বনির সহিত ব্রজাঙ্গনার ঐ মধুধ্বনি মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যায় যে, বিধাতা কি অপূর্ব্ব উৎকটে-মধুরে, কঠোরে-কোমলে, রৌদ্রে-জ্যোৎস্নায় মধুর কল্পনাপ্রতিমার গঠন করিয়াছিলেন। কল্পনা সহচরীর ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত। কোথাও কল্পনার মন্দতায় বা ভাবের অল্পতায় তাঁহার কবিতার অঙ্গহানি ঘটে নাই। তাঁহার যে কোন কবিতা যখনই পাঠ করি, দেখি, তাহাতে তদীয় হৃদয়ের দৃঢ়তার একটা ছাপ্ যেন স্বতই লাগিয়াছে। বঙ্গকাব্যকাননে তিনি দৃপ্ত সিংহের ন্যায়, মদগর্ব্বিত নাগেন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, কোথাও কদাচ কোন কারণে তিনি স্খলিত হন নাই। বিশ্বের কে কি বলিল, কে কি করিল, যে পথে চলিয়াছি, ইহাতে কোথায় কতদূরে যাইয়া পান্থশালা পাইব, যে পাথেয় আছে, তাহাতে কুলাইবে কি না, এই সব ঐহিক হিসাব নিকাশের তিনি কোন ধারই ধারিতেন না। তাঁহার পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। তাঁহার পৃথিবী যথার্থই

"নিয়তি-কৃত-নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী,
অনন্য-পরতন্ত্রা এবং নবরসরুচিরা" ছিল।

(কাব্যপ্রকাশ)।

মহাকবি তাঁহার সেই কল্পিত জগতের কল্পনাসাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেন, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমের ন্যায় নিজের ভূমায় নিজেই ডুবিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে আনন্দালস-নেত্রে স্বদেশবাসীদের দিকে চাহিয়া প্রেমভরে মধুবর্ষণ করিতেন, "যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে" কহিতেন; "শুন যত গৌড়চূড়ামণি"—বলিয়া যে অমৃতে নিজে আত্মহারা, তাহা বিলাইবার জন্য স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিতেন।

"বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা?"

এই কবিবাক্যে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াই যেন গন্তব্য পথ চিনাইয়া দিয়াছিল। যখন তিনি আদি কবি বাল্মীকির ন্যায় দিব্যচক্ষু পাইলেন, তখন ধ্যানভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার বড় সাধের "মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণি জালে।" তদবধি কি এক উন্মাদনা তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিল, সেই উন্মাদনার অঙ্গুলি সঙ্কেতে কবিবর দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বকীয় স্বৈরচারিণী কল্পনাকে লইয়া ছুটিলেন। অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্য্য নাই, ঐ এক ধ্যান, এক জ্ঞান। কাব-ভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত মাইকেল-জীবনীতে, কবিবরের যে সকল পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মহাকবি মধুসূদনের চিত্তে দিবা-রজনী বঙ্গভাষার এবং বঙ্গ কবিতার চিন্তা কিরূপ প্রকট-ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঐ সকল পত্রের প্রত্যেক-খানির গড়ে প্রতি ত্রিশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সাতাইশ পঙ্‌ক্তি কেবল বঙ্গ কবিতার কথায় পূর্ণ। বিধাতা দেবদুর্লভ প্রেমরত্নে তাঁহার হৃদয় বিমণ্ডিত করিয়া-ছিলেন, অপার্থিব কবিত্ব সম্পদে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তিনি দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা, কহিতেন কবিতা। কখনো তিনি ভারত সাগরে ডুবিয়া তিলোত্তমারূপ মুকুতা তুলিতেন ও তাহার মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কমকণ্ঠে পরাইয়া দিতেন,—কখন আবার

গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল কেমনে
নাশিলা সুমিত্রাসুত লঙ্কার সমরে,
দেবদৈত্য নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র নন্দনে :—

কখন বা—

"কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে

গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি" শুনিতেন, ও সেই বিরহে বিহ্বলা বালার" করুণকণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের বাণায় বিরহসঙ্গীতের আলাপ করিতেন। কত সাগর মহাসাগর পার হইয়া দেশ-বিদেশে তিনি ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার কেমনই একটা আকর্ষণ ছিল, যে, তিনি উদ্দাম যৌবনেও ডুব দিলেন "ভারত সাগরে" অন্য সাগরে নহে। পাশ্চাত্য কবিকুলের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তিনি তিলার্দ্ধের জন্য প্রাচ্য কবিকুলের সেবা করিতে বিস্মৃত হন নাই। "কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদ" পাথেয় লইয়া তিনি দুর্গম-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কবিজীবনের দুইটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথমটি কবির ইউরোপ গমনের পূর্ব্বকাল, দ্বিতীয়টি ইউরোপ যাত্রা হইতে তাহার পরবর্ত্তী কাল। তদীয় যে সমুদয় কাব্য-রত্নাবলীতে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত, সেগুলি ঐ পূর্ব্বকালে গ্রথিত, আর হেক্টর বধ, মায়াকানন এবং কবিতামালা তাঁহার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শক্তি থাকায় তিনি "পূর্ব্বে ভারতসাগরে" ডুবিয়া রত্ন তুলিতে পারিয়া-ছিলেন, ভারতসাগরের পারে যাইয়া তাঁহার সে শক্তির তিনি উপচয় করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত অপচয়ই ঘটিয়াছিল। যদিও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রকাশ ফরাসীর ভারসেলস্ নগরে, কিন্তু তাহার জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। রাজনারায়ণ বাবুর নিকট কবি নিজেই সে কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ইউরোপে গমন করেন তখন তাঁহার ঐ প্রথম সনেটটী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা রাজনারায়ণ বাবুর নিকট লিখিত সেই সনেট আমরা বর্ত্তমান চতুর্দ্দশপদী কবিতাপুস্তকে ঐরূপ সংশোধিত আকারে দেখিতে পাইতাম না। তিনি ইউরোপে যাইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি গিয়াছেন, তাহার সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি আইন কানুন যাহাই পড়ুন বা যাহাই করুন না

কেন, প্রাণ কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই মাতৃভাষার জন্য কাঁদিত। তিনি নিজেই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন,—

পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি॥

বাস্তবতঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়াছিল। কবে বাঙ্গালায় শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চনা, কবে বিজয়া দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ভাগ্যবান্ ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল,—সুদূর ফরাসীতে বসিয়া, বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিতপ্রায়, সেই স্থানে বসিয়া তিনি বঙ্গের এই সমুদয় সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন, ও না জানি কত আনন্দই পাইতেন। বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভারসেলেসে বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন। জন্মভূমি যশোর-সাগর-দাড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিব-মন্দির নিশাকালে পর্য্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। "বাঙ্গালার ফুল, বাঙ্গালার ফলে, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে" তাঁহার অন্তর বাহির ভরপূর হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীতে বসিয়া তিনি যমুনার কথা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন,—

"আর কি কাঁদে লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর নীরে খসি
অশ্রুধারা, মুকুতার কমরূপ ধরি?

বলিয়া তাঁহার মধুর বাঁশরী বাজাইতেন। কতকাল হইল বঙ্গের কবিকুঞ্জ মধু-হীন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপিও যেন সে বাঁশীর সুর বাঙ্গালার বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। "শ্যামা" বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

"মধুহীন করোনাক তব মনঃ কোকনদে।"

তাঁহার সে প্রার্থনা সফল হইয়াছে। বঙ্গভূমি বক্ষের উপর মধুর স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যত দিনের পর দিন যাইতেছে, ততই মধুর মধুর কবিতার রসে বঙ্গ অধিকতররূপে নিমগ্ন হইতেছে। সভ্যবৃন্দ, কৃত্তিবাস, কাশীদাসের দেশে, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের দেশে, জয়দেব, মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসের দেশে মধুসূদনের জন্ম, যে দেশের নির্ম্মল আকাশে বলাকার খেলা, শ্যাম বনানীতে শ্যামাদোয়েলের সঙ্গীত, সুনীল-তটিনীতে দাঁড়িমাঝিদের সারি গান, সেই দেশে মধুসূদনের জন্ম, যেখানে সায়ংকালে নদীতীরে বট-বৃক্ষের মূলে বসিয়া রাখাল বালক—

"হরি, বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
পার করো আমারে"

বলিয়া গান ধরে, নদীর কুল কুল গীতিকার সহিত সেই রাখাল-সঙ্গীত মিশিয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া যায়, মধুর সেই দেশে জন্ম,—তাহার উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশের অবতংস, ধনে মানে, কুলে শীলে সর্ব্বাংশে তদানীন্তন সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সকল রকমেই স্পৃহণীয় অবস্থায়, অভিজাত ও অবস্থাপন্ন পিতামাতার আদরের পুত্র মধুসূদন পরিবর্দ্ধিত। সর্ব্বোপরি, বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ, বাগ্‌দেবতার কৃপামৃত তাঁহার উপর বর্ষিত; রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডারেও যে রত্ন নাই, শত শত সাম্রাজ্য বিনিময়ে যে রত্নের লাভ করা যায় না, সেই সর্ব্বোত্তম কবিরত্নের অম্লান মালা বীণাপাণি স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন,—সুতরাং তাঁহার সমকক্ষ কে?

শুভক্ষণে মধুসূদন ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বাগ্‌দেবতার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

* * * মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে!
ভারতি! যেমতি মাতঃ, বসিলা আসিয়া,

বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)।
তেমতি দাসেরে আসি দয়া কর সতি!
————তব বরে চোর রত্নাকর,
কাব্য-রত্নাকর কবি!
উর তবে, উর দয়াময়ী!
গাইব মা! বীররসে ভাসি
মহাগীত, উরি দাসে, দেহ পদ-ছায়া।

মধুসূদনের প্রার্থনায় বীণাপাণি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মায়ের বীণায় পুত্র স্বরসংযোগ করিতে পাইয়াছিল। পুত্রের জীবন সার্থক হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে তদ্দেশ-বাসী বলিয়া এবং সেই কবি যে ভাষার দিবাকরকল্প, সেই ভাষার সেবক বলিয়া আমরাও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার বিরচিত মধুচক্রে গৌড়জন দিবারজনী আনন্দে মধু পান করিতেছে ও করিবে। বঙ্গভাষাকে তিনি যে অনর্ঘ সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে "কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভায়" বঙ্গভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মহিমা কোনদিন ক্ষুন্ন হইবে না। বঙ্গ-কবিতা-সাম্রাজ্যে তিনি সম্রাটের ন্যায় আসিয়াছিলেন, সম্রাট্-জননীর যেমন হওয়া উচিত, তেমনই ভাবে, বুঝি বা ততোধিকরূপে বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া গিয়াছেন। কালের নিরঙ্কুশ বিধানে কত কি ভাঙ্গিবে, কিন্তু মধুসূদনের কবিত্বপ্রতিমার জ্যোতিঃ দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইবে বই ম্লান হইবে না। মধুসূদনের জন্মে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে। আর তাঁহার ন্যায় একজন জাতীয় মহাকবিকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একটি দিনও আমরা পূজা করিতে আসি বলিয়া, আমরাও ধন্য হইতেছি।

আহা!

বঙ্গভাষা সুললিত কুসুম কাননে
কত লীলা করি,
কাঁদাইয়া গৌড় জন, সে কবি মধুসূদন
গিয়াছে,—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি।
যাও তবে কবিবর, কীর্ত্তিরথে চড়ি!
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।
যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা ভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়মন মধুকরে,
পান করি, করিবেক যশস্বী তোমারে।
(নবীনচন্দ্র)

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার যেরূপ সাহিত্য ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

মানবজাতির শৈশবজীবনে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বাহ্য প্রকৃতির কার্য্যই প্রথম চিন্তার বিষয় হয় স্বতঃই তাহার কারণানুসন্ধানে মন নিযুক্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানের নিতান্ত অস্ফুটাবস্থাবশতঃ প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মন ভৌতিক শক্তি সকলেই অতিভৌতিক সত্বার বিকাশ বলিয়া কল্পনা করিয়া লয়। আপনার কৃতকার্য্যের উপর নিজকর্ত্তৃত্ব জ্ঞান হইতে নৈসর্গিক দুরবগাহ ব্যাপার সকলের কর্ত্তৃত্ব যে অতিপ্রাকৃতব্যক্তি সকলে আরোপিত হইবে ইহা মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই প্রকারে মনুষ্য, বিশ্বের অদৃষ্ট অজ্ঞাত প্রদেশ প্রাকৃতিক শক্তি সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবাস বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছে। ইহাই বহুদেব-বাদসৃষ্টির মূল। ইহাতেই বায়ু কোন দেবতার নিঃশ্বাসরূপে বর্ণিত হইয়াছে ও বিদ্যুৎ কোন দেবতার হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে ২ একেশ্বরবাদ বহু দেবতাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত এই পার্থক্য বিদূরিত হয় নাই। মনুষ্য উন্নতচিন্তাদ্বারা বাহ্যপ্রকৃতির যে ২ ব্যাপারে এক সাধারণ নিয়মসূত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রত্বহেতু প্রাকৃতিক বলিয়া গণ্য করিয়াছে। কিন্তু যেখানে এই প্রকার নিয়ম সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহাই অতিপ্রাকৃত ব্যক্তিকৃত কল্পনা করিয়া অতিপ্রাকৃতিক বলিয়া গণ্য করিয়াছে। এইভাবে বহু শতাব্দী গত হইলে যখন মনুষ্যের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রখরতর ও বিচার শক্তি উচ্চতর হইল তখন অতিপ্রাকৃতের বিলোপ হইয়া সমস্তবাহ্য ব্যাপার নিয়ম শৃঙ্খলায় বদ্ধহেতুঃ প্রাকৃতিক রাজ্যের একাধিপত্য স্থাপন করিল। প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা প্রথম যে সকল রহস্যের উদ্ভেদ হইয়াছে জ্যোতিস্তত্বই ইহাদের অন্যতম। নভশ্চরগণের জটিল অথচ সুসম্বদ্ধ গতি এপর্য্যন্ত মানববোধের অনায়ত্তছিল। ইহার জন্য অনেক দৈবশক্তির কল্পনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার এই সমস্ত জটিলতাকে অতি সরল করিয়া দিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মাবিষ্করণ দ্বারা সমস্ত নভোরহস্য মনুষ্যের সহজ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রকৃতি যন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া সমস্ত নভোরহস্যই প্রাকৃতিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

প্রকৃতি রাজ্যের অপরাপর বিভাগের ইতিহাস ইহারই অনুরূপ। কি রাসায়নিক বিজ্ঞান কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সর্ব্বত্রই প্রাকৃতিক শক্তি সাধারণ নিয়মের অধীন ইহা উপলব্ধি হওয়ার সঙ্গে ২ ই অতিপ্রাকৃতের রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপরে প্রাকৃতের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে বিজ্ঞানরহস্যের রাজ্য হইতে নিয়মের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রসায়ণ শাস্ত্র ও প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ নিরূপণে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিলেও এক শ্রেণীর প্রাকৃতিক কার্য্য কোনরূপেও ইহাদের আয়ত্ত হয় নাই। ইহারা অতি প্রাকৃতিক ও দুর্বোধ বলিয়াই স্বীকৃত হইতে লাগিল। সজীবপদার্থ বিষয়ক জ্ঞান পূর্ব্ববৎই রহস্যপূর্ণ রহিয়া গেল। জীবন ধারণ প্রকৃতির জটিলও দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে সকল শক্তিও নিয়মদ্বারা প্রকৃতি রাজ্যের অপরাপর বিভাগের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার কোনটীই এই নৈসর্গিক কার্য্যের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইল না। তখন, জীবিত অবয়ব সমূহ (living organism) এক অনন্য সাধারণ শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। ইহাদের আকার ও গঠনে চতুষ্পার্শ্বের সহিতও এরূপ সংযোগ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে এই অত্যোহক্ত সংযোগবুদ্ধিকল্পিত, অর্দ্ধশক্তির কার্য্য নহে। প্রাণীও উদ্ভিদমাত্রেই অবস্থার সহিত উপযোগিতা দেখা যায় অর্থাৎ প্রকৃতিকে অবস্থার

অনুরূপ করিয়া লওয়া ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্যবিশিষ্ট অবয়ব সংস্থান লক্ষিত জীবিত প্রকৃতি কেবল বাহ্য শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। অতএবই ইহা সাধারণ চিন্তাপ্রণালীর অবিষয়ীভূত হইয়া রহিল।

পূর্ব্বোক্ত কারণে জীবিত পদার্থের জীবিত প্রকৃতির আলোচনা না হইয়া তাহার জড় প্রকৃতিরই মাত্র আলোচনা হইতে লাগিল। ইহা সচল সচেতন বলিয়া বিবেচিত না হইয়া অচল অচেতন বলিয়াই বিবেচিত হইতে লাগিল। যতদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই পথে চালিত হইয়াছিল, ততদিন সজীব পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানের অতি অল্প উন্নতিই হইয়াছে। এই সময় পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে আমরা "জড়বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করিতে পারি। তৎপর যখন সজীব পদার্থের জীবিত প্রকৃতিকে নির্জ্জীব পদার্থের মূলীভূত শক্তির দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা হইল, যখন বিশ্ব প্রকৃতির অঙ্গরূপে সাধারণ ইতিহাসের অংশবিশেষরূপে ইহার আলোচনা আরব্ধ হইল তখনই একটী নূতন চিন্তাপ্রণালীর সৃষ্টি হইল ও নূতন বিজ্ঞানের অভিষেক হইল। পূর্ব্বপ্রণালীর সহিত স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্ম ইহাকে আমরা "জীবনবিজ্ঞান" আখ্যা দিব। এই বিজ্ঞান উনবিংশ শতাব্দীর, উনবিংশ শতাব্দীর কেন, পৃথিবীর সমস্ত যুগের অতি মূল্যবান্ সম্পত্তি। ইহার অভ্যুদয়ে অতি প্রাকৃতের রাজত্বের বিলোপ হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানরাজ্যে একটী যুগবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা জ্ঞানের সমস্ত বিভাগ নবপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। আমরা এই বিজ্ঞানের উৎপত্তি ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

চারিটী মহান্ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই বিজ্ঞানের উপাদান প্রদান করিয়াছে ইহারা যথাক্রমে ঐতিহাসিক, ভূতত্ত্ব, শক্তির নিত্যত্বতত্ত্ব, ক্রমবিকাশতত্ত্ব, সূক্ষ্মজীব বীজতত্ত্ব।

ভূস্তরে পৃথিবীর ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এই তত্ত্ব অষ্টাবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণও অবগত ছিলেন। গত শতাব্দীর প্রথমভাগে এই তত্ত্ব আরও পরিস্ফুট হইতে আরব্ধ হয়। কিন্তু এই ইতিহাস রহস্যময় ভাষায় লিখিত ইহা পাঠকরা সহজ বিষয় নয়। সুতরাং এই ইতিহাস পাঠের সঙ্কেত আবিষ্কারে বহু বৎসর আবশ্যক হইল। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মনিষী লায়েলের ভূতত্ত্ব-বিষক গ্রন্থপ্রভাবে এই প্রতীতি জন্মিতে লাগিল যে চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রতি দিবসের প্রাকৃতিক কার্য্য লক্ষ্য করিলেই এই সঙ্কেতের অবরোধ হইতে পারে। এইরূপ অসাধারণ ও মহান্ আবিষ্কার আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কারণ এই সময় হইতে যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে তাহাদের সমস্তেরই মূলে এই একমাত্র আবিষ্কার। এই আবিষ্কার প্রচার করিয়া দিল যে, যে সকল শক্তি এখনও পৃথিবীপৃষ্ঠে কার্য্য করিতেছে, এবং যাহারা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া কার্য্য করিয়া আসিয়াছে ইহারাই ভূস্তরের এবং তৎসঙ্গে ২ পৃথিবীর ইতিহাস উন্মোচিত করিবে। বর্ত্তমানই অতীতের সাক্ষী, বর্ত্তমানের মধ্যেই অতীতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

পরন্তু ভূতত্ত্ব যেমন একদিকে ভূস্তরের ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছে অন্যদিকে আবার সজীবপদার্থেরও ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছে। বস্তুতঃ সজীব পদার্থের দেহাবশেষ ভূস্তরে নিহিত থাকাতে সজীব পদার্থের ইতিহাসের সহিত ভূস্তরের ইতিহাস অনুস্যূত রহিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর স্তর সকলের বোধগম্য ইতিহাস আছে ইহা প্রতীতি হওয়া মাত্রেই সজীব প্রকৃতিরও অনুরূপ ইতিহাস আছে, ইহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। বর্ত্তমান যদি পৃথিবীর ইতিহাস ব্যাখ্যা করিতে পারে তবে সজীব প্রকৃতিরও ইতিহাস ব্যাখ্যা করিতে কেন পারিবে না? এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইল। ইহার অবশ্যম্ভাবী এই ফল হইল যে, জীবন সমস্যা সর্ব্বাগ্রে স্থান গ্রহণ করিল। এক্ষণে স্থিতিশীলতার পরিবর্ত্তে গতিশীলতার বিচারে জীবনের আলোচনা হইতে লাগিল। এই প্রকারেই নূতন জীবনবিজ্ঞান ঐতিহাসিক ভূতত্ত্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু কেবল ঐতিহাসিক ভূতত্ত্বই বর্ত্তমান জীবন বিজ্ঞানের গতিবিষয়ক শাখার উৎপাদন করে নাই আরও

তিনটী উপকরণ তদপেক্ষাও অধিক মাত্রায় ইহার বিকাশে সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের প্রথম তত্বটী শক্তির নিত্যত্ব ও শক্তির পরস্পর আপেক্ষিকতা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত আছে। এই শক্তির কখনও ধ্বংস হয় না। যাহা আপাততঃ ধ্বংস বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা রূপান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি বই আর কিছুই নহে। রূপান্তর প্রাপ্তিকে শক্তির আপেক্ষিকতা বলা যায় এবং অবস্থান্তর প্রাপ্তিকে ইহার অব্যক্তভাব বলা যায়। শক্তিমাত্রেই আবিষ্কৃত অবস্থায় কোন না কোনপ্রকার গতির আকার প্রাপ্ত হয়। উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ, রাসায়ণিক প্রক্রিয়া প্রকৃতি শক্তিরই গতিরূপে বিকাশ মাত্র। এই সকল ভিন্ন ২ প্রকৃতির শক্তি একই বিশ্বশক্তির বিকাশ বলিয়া ইহাদের পরস্পর রূপের বিনিময় হইতে পারে। তাহাতেই একটীর তিরোভাবে অন্যটীর আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। একটী সবেগে নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল হয়। এখানে বেগের ধ্বংস হয় নাই, বেগ উত্তাপে পরিণত হওয়ায় গোলার শক্তি রহিত হইয়াছে অর্থাৎ গোলার গতিরূপ ধর্ম্ম এমন গোলা ও তৎপ্রতিবন্ধক বস্তুর উত্তাপধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া পুরাতন গুণেরস্থলে মাত্র অপর একটী নুতন গুণের উৎপাদন করিল।

শক্তির দ্বিতীয় রূপ অব্যক্ত বা বিশ্রাম অবস্থা। দালানের ছাদের প্রস্তর খণ্ডসকল নিশ্চল অবস্থায় থাকিলেও ইহাদের মধ্যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে। কারণ ইহারা স্থানচ্যুত হইলে যখন ভূপতিত হইবে তখন সেই শক্তি হইতেই ইহাদের গতি উদ্ভূত হইবে। বিশেষতঃ ইহাদিগকে উত্তোলিত করিতেও শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই শক্তিই প্রস্তরের মধ্যে আশ্রিত থাকিয়া ইহার গতিরোধ করিয়াছে। সুতরাং পতন সময়েও পূর্ব্বশক্তির তুল্য শক্তির আবির্ভাব হইবে। এই প্রকারে দেখা যাইবে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার্য্য শক্তিও কার্য্যোন্মুখশক্তি উভয়ের যোগফল সকল সময়ে ও সর্ব্বাবস্থায়ই এক।

এই শক্তির নিত্যস্বরূপ মহসত্য দ্বারাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূলপত্তন হইয়াছে। এই তত্বটীর অবধারণ মাত্রেই প্রকৃতির সমস্ত শক্তিই বিজ্ঞান আপনার আয়ত্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। মূলে ইহা বাহ্যপ্রকৃতির তত্ব হইলেও এবং বাহ্য বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ইহার উৎকর্ষ হইলেও সজীব ও নির্জ্জীব প্রকৃতির সম্ভাবনীয় সম্বন্ধ ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে। সজীব অবয়বব্যূহও গতি ও উত্তাপের পরিচয় দেয়। যদি শক্তির নিত্যত্বতত্বটী অভ্রান্ত হয় তবে সজীব প্রকৃতির শক্তি অবশ্যই অন্যান্য শক্তির সহিত সাপেক্ষ বা সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবে। ইহা হইতে এই অনুমান লব্ধ হইয়াছে যে সজীবও নির্জ্জীব প্রকৃতি একই নিয়মের অধীন এবং যে প্রণালীতে আমরা নির্জ্জীব প্রকৃতির উত্তাপ গতি প্রভৃতির তথ্য নির্ণয় করিতে পারি সেই প্রণালীতেই আমরা যে সজীব যন্ত্রের ও তথ্য নির্ণয় করিতে পারি তাহারও সম্ভাবনা এই তত্ব হইতেই জন্মিয়াছে।

দ্বিতীয় তত্বটী "ক্রমবিকাশ" মতবাদ। জীবন বিজ্ঞানের প্রকর্ষের উপর ইহার প্রভাব প্রথমটী অপেক্ষাও অধিকতর। ইহাসত্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'ক্রমবিকাশ' তত্বটী অপরিচিত ছিল না কারণ ইহার পূর্ব্বেই ইহা অস্পষ্টভাবে বৈজ্ঞানিকদিগের পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক ভূতত্ব গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে, এবং এক মূল প্রকৃতির জ্ঞান, বৈজ্ঞানিকদিগের মনে প্রতিভাত হওয়ার পূর্ব্বে 'ক্রমবিকাশ' তত্বের গুরুত্ব অতি অল্পই অনুভূত হইয়াছিল। জীবিত অবয়বব্যূহ যে পর্য্যন্ত প্রকৃতির অপরাপর কার্য্যশীলতার সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া প্রকৃতির স্বতন্ত্র অঙ্গরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছিল সে পর্য্যন্ত জীবিত অবয়বব্যূহ স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়াই বিবেচিত হউক বা পরস্পর হইতে উৎপন্ন বলিয়াই বিবেচিত হউক ইহাতে বিজ্ঞানের বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য সম্পাদিত হয় নাই।

কিন্তু যখনই দেখিতে পাওয়া গেল যে পৃথিবীস্তরের অবস্থা যে সকল শক্তিবলে সংঘটিত হইয়াছে তাহারা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যখনই ইহা বুঝিতে পারা গেল যে জীবিত প্রকৃতির বহির্ভূত সমস্ত শক্তিই যথা জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়ণ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্ত শক্তিই পরস্পর সাপেক্ষ তখনই সজীব পদার্থের উৎপত্তি জিজ্ঞাসা নুতন আকার ধারণ করিল;

সজীব পদার্থ প্রকৃতির একঅঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং প্রকৃতির অন্যান্য অঙ্গের সহিত একই সাধারণ নামে অভিহিত হইতে প্রস্তুত হইল। যে নিয়মের রাজত্বে সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার অতি প্রাকৃতের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত শক্তির কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছিল সেই নিয়মের রাজত্বই সজীব পদার্থের উৎপত্তি রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক হইল। সুতরাংই মনস্বী ডারুইন্ যখন যৌননির্ব্বাচন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রভৃতি নূতন ব্যাখ্যা প্রণালীর দ্বারা সজীব প্রকৃতির কার্য্য সকলকে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিবার পথ প্রদর্শন করিলেন তখন বিজ্ঞান সাগ্রহে তাঁহার মত গ্রহণ করিল।

আধুনিক জীবন-বিজ্ঞানগঠনে যে তৃতীয় তত্ব উপাদান প্রদান করিয়াছে তাহা জীবিত প্রকৃতির সূক্ষ্মকারণ ঘটিত ব্যাপার হইতে উপপাদিত।

জীব-কোষ ও জীবাণু জীবিত প্রকৃতির সূক্ষ্ম উপাদান রূপে আবিষ্কৃত হওয়াতে প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধীয় সমস্যা-সকল জটিলতা বিবর্জ্জিত হইয়া অবিসংবাদিতভাবে সরলতা প্রাপ্ত হইল। যে সকল অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ জীবতত্ব নির্ণয়ে প্রয়াস পাইতেছিলেন তাঁহাদের নিকট এই সরলতা অসাধারণ উৎসাহের কারণ হইল।

শেষোক্ত আবিষ্কার হইতে জীবন-বিজ্ঞানের নূতন রূপের প্রকাশ হইল। ইতঃপূর্ব্বে সৃষ্টিতে স্রষ্টার নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রদর্শন করাই জীবন-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্যছিল সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টার বিপুলজ্ঞান অনুমান করাই সৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণের প্রধানফল বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এক্ষণে কঠোর বৈজ্ঞানিকভাবে সৃষ্টির আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইল। প্রকৃতি সজ্ঞান কি অজ্ঞানশক্তির কার্য্য তাহা বিচার করা বিজ্ঞান আবশ্যক বোধ করিল না, পরস্পর উপযোগিতা আবিষ্কার করাও সৃষ্টিরহস্যের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিল না, কিন্তু কি প্রকারে এই উপযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে কোন্ নিয়ম ও শক্তিবলে জীবও উদ্ভিজ্জের বর্ত্তমান অবস্থাপরিণতি ঘটিয়াছে এই সমস্ত নির্দ্ধারণই এক্ষণে প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। অভিপ্রায় (উদ্দেশ্য) পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান এক্ষণে কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। বিজ্ঞান এক্ষণে কার্য্যমূলক না হইয়া কারণ-মূলক হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বর্ষা-প্রভাত।

বৃষ্টি নাই, মেঘাচ্ছন্ন গগন-বিতান
বর্ষণের পূর্ব্বাভাস করিছে সূচনা;
নীড়-ভ্রষ্ট বিহঙ্গম ভুলে গেছে গান,
গুমরিছে কবি-বক্ষে করুণ কল্পনা!

আর্দ্র শ্যাম তৃণপুঞ্জ, আর্দ্র তরুলতা,
প্রকৃতির অশ্রুধারে নির্ম্মল কোমল;
শীতল সমীর প্রাণে কয় কার কথা
সকল হৃদয় করে পাগল চঞ্চল।

পরিপূর্ণ যৌবনের কান্তির উচ্ছ্বাস
জাগিছে সরসী-চিত্তে সোহাগে বর্ষার;
কুমুদ কহ্লার দেয় মধুপে আশ্বাস
নিরখি বিকচ আস্য নীরে বারংবার।

তরুণ তপন-কর লুপ্ত মেঘদলে
ধরার বিরহ-ব্যথা বয় নেত্রজলে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

(৬)

কবিতা একটা ভাবের উদয় না হইলে হয় না, কিন্তু সে ভাবটী সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ না করিলে আর তাহা থাকে না। সেই জন্য দেখা গিয়াছে যে মধ্য বা শেষ রাত্রে কবি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আপনার ভাবের মালা আপন মনে নির্জ্জনে বসিয়া গাঁথিতেছেন। এখানে কবি কল্পনার অনুবর্ত্তি। আবার কখন কখন

কল্পনাও কবির অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। কিন্তু যখন কবি-হৃদয় কল্পনায় উদ্বেলিত হয়, তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, যেমন করিয়া হউক তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে।

রবি, হেম, নবীন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্বভাব কবিদিগের মধ্যে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। একদা নবীন বাবু কাছারিতে বসিয়া কল্পনা দেবীর ইঙ্গিতে খাস কামরায় যাইয়া কবিতা লিখিতে বসিলেন। তখন তিনি পুরীতে। কবিতাটী তাঁহার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত মহানন্দ গুপ্তকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"এদিকে ক্ষীরোদ বর,
তুলিয়া অসংখ্য কর,
করিছেন, আশীর্ব্বাদ করুন বিহার ;
ক্ষীরোদ বাসিনী নিত্য গৃহেতে তোমার।"

* * * *

"সে আনন্দ—মহানন্দ—অনন্ত অসীম।"

ইহার ভাব ও ভঙ্গি দুইই সুন্দর। "ক্ষীরোদ বাসিনী" শব্দে লক্ষ্মী আবার "ক্ষীরোদ বাসিনী" গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রীর নাম। "মহানন্দ" আনন্দের মাত্রা বাড়াইবার জন্য যত না হউক, বন্ধুর নামটীর উল্লেখ জন্য লিখিত হইয়াছে। এ বিষয়ে বায়রণেরই বাহার বেশী। দেশীয় কবিরাও বাদ যান্ নাই; তবে কোন্ কবিতাটী কাহাকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত—তাহা সকলের পক্ষে জানা সম্ভবপর নহে। আর না জানাই ভাল। জানা দূরে থাক্, সন্দেহেও অনেক সময় "রুচি বিকারের" নিগ্রহ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হয়। রাম বসু, নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, দাশরথী, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কাহার কথা বলিব, কেহই বাদ যান নাই। তবে কাহারও সাম্য কাহারও বৈষম্য। প্রভেদ এই। প্রাণের তৃপ্তিতে ভাব আসে, ঈর্ষায় আসে, গাত্র দাহেও আসে। বিলাতেও ইহার অভাব নাই—ইহারাই Spiteful poets. কবিতার দু-চার ছত্র লোকে বড় ধরেনা, কিন্তু উপন্যাসের লোক বিশেষে, যখন লোক বিশেষ আপনার ভিতরের ছবি, আপনার লুকান কার্য্যকলাপ দেখিতে পান, তখন কেহ হাসেন কেহ কাঁদেন, কেহ বা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং স্থল বিশেষে রহস্য আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। কিন্তু আর এক রকম লেখা আছে, উহা যাহাকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত, তাহারও পাঠে তৃপ্তি হয়। এইরূপ লেখাই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের উপাদান।

শুনিতে পাওয়া যায় অনেক উপন্যাসে গ্রন্থকার ও তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে ইহা স্বাভাবিক। Pickwick papers এ নাকি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সাহেব অনেকের চরিত্র চিত্রন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের সে প্রথার প্রবর্ত্তনা দেখা যায়। অনেকে বোধ হয় জানেন যে ৺ দিনবন্ধু মিত্র "সধবার একাদশী" ও "জামাই বারিকে" অনেক পরিচিত লোককে পুরিয়া গিয়াছেন। অনেকেই জানেন সধবার একাদশীর নিমেদত্ত, কাঞ্চন, অটল বা ঘটীরাম ডেপুটী কে? বিশেষতঃ কাঞ্চন যে স্বর্ণ বাইজী এবং নিমে দত্ত যে মধুসূদন দত্ত তাহা বোধ হয় কাহারও জানিতে বাকী নাই। মাইকেল "একেই কি বলে সভ্যতা।" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" লিখিবার পর "সধবার একাদশী" প্রকাশিত হয়। অনেকে মনে করেন উহা ঠিক অনুকরণ না হউক, টক্কর দিয়া লেখা বটে। হউক অনুকরণ বা পরবর্ত্তী রচনা কিন্তু নাম ডাকে উহা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। তখনকার ছোক্‌রা বাবুরা মজলিস করিয়া নিমে দত্তের "দত্ত কারো ভৃত্য নয়" প্রভৃতি পাঠ করিতেন। আর সেই নর্দ্দামায় পড়ার দিনে নিমে দত্ত নর্দ্দামায় পড়িয়া পাহারাওয়ালার লণ্ঠন দেখিয়া মিল্টন আওড়াইয়া বলিয়াছিলেন—

" Hail holy light ! the offspring of Heaven-
first born !
Of the eternal coeternal beam."

এই দুই ছত্র অনেকেরই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ইহার তীব্র সমালোচনা

করিয়া লিখিয়াছিলেন "If this trash ever be put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons." কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সোনাগাছিতে ইহার অভিনয় না হইয়া ন্যাশনাল থিয়েটারে মহাসমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। যাঁহারা প্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺ মতিলাল বসু কর্ত্তৃক নিমে দত্তের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজে তাহা ভুলিতে পারিবেন না। নিমে দত্ত ও নীল দর্পণের তোরাফের অভিনয়ে তাঁহার তুলনা ছিল না। যাহাই হউক দীনবন্ধু, লালবিহারীর বিদ্রূপের প্রতিশোধ দিয়াছিলেন "জামাই বারিকে।" তাঁহার তোতারাম ভাটই লালবিহারী। আর জামাইদিগের লিষ্ট দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে দীনবন্ধুর সকল বন্ধুদের নামই তাহার মধ্যে আছে। "আবদুল্ লতিফ্‌টী" পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই।

তোতা অর্থাৎ টিয়া পাখীর মত মুখস্থ করিয়া ভাটের মত বলিতে পারে বলিয়া এই নাম। তৎকালিন বিলাতি সাপ্তাহিক রিভিউতে সাময়িক সাহিত্যের তীব্র সমালোচনা থাকিত দীনবন্ধু বাবুর মতে মুখস্থ বিদ্যা পটু লালবিহারী তাহারই অনুকরণে তৎসময়ের Friday Reviewতে সমালোচনা বাহির করিতেন। সমদর্শী বঙ্কিমবাবু এ প্রথার অনুমোদন না করিয়া বলিয়া গিয়াছেন "তোতারাম ভাট—দীনবন্ধুর কলঙ্ক।"

অনেকে বলেন বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থেও এরূপ পরিচিতের চিত্রসংযোজনার অভাব নাই। আবার কেহ কেহ বলেন অনেক নায়কচরিত্র বঙ্কিম বাবুর আত্ম চিত্র; নায়িকা তাঁহার সহধর্ম্মিনী। অক্ষয় দাদা নাকি বলিয়াছেন "বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের আধখানা তাঁহার স্ত্রী।" তাহার উপর গ্রন্থকারের স্বীকার উক্তি আছে। তিনি বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের অনেক ছবি বিষবৃক্ষে আছে সত্য, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে। বিষ-বৃক্ষ নাকি জগদীশ বাবুর বাটীতেই লিখিতে আরম্ভ করা হয়।

অনেকে বলেন বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্র, হরদেব ঘোষাল তাঁহার প্রিয় বন্ধু স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র রায়; অধিক কি হরদেব ঘোষালের যে পত্র দুই খানি বিষবৃক্ষে ছাপা হইয়াছে তাহা জগদীশ বাবু কর্ত্তৃক বঙ্কিম চন্দ্রকে লিখিত হয়। তবে কি বুঝিতে হইবে যে বঙ্কিম চন্দ্রের এতটা পদস্খলন হইয়াছিল, স্বভাব কবি ভাবময় বঙ্কিম, ভাবের ঘোরে আত্মহারা হইয়াছিলেন? বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন "যাহার চক্ষু স্ত্রীলোক দেখিলে নামিয়া পড়ে তাঁহার উপন্যাস লেখা বিড়ম্বনা? উচ্চ অঙ্গের ভাস্কর—চিত্রকর—সজীব চিত্র না দেখিলে আদর্শ সৃজন করিতে পারেন না। যাহাকে সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্যের আভাস দিতে হইবে তাঁহাকে সে সকল সৌন্দর্য্য দেখিতে হইবে। ঘরে জোটে না বলিয়া দেখার খাতিরে বাহিরে দেখিতে হয়।"

কথাগুলি খুব সত্য। শুনিয়াছি ইউরোপের বড় বড় চিত্রকরেরা, যে সুন্দরীর যে অংশটুকু সুন্দর, পয়সা খরচ করিয়া তাহার সেই অংশের আদর্শ গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কট যেখানে বসিয়া নভেল লিখিতেন, সেই কক্ষ মধ্যে নানাবিধ ও নানা ভাব ও ভঙ্গির অনেক ছবি টাঙ্গান থাকিত; প্রাকৃতিক দৃশ্যের (scenery) অভাব ছিল না। সম্মুখে একখানি মুকুর থাকিত। আবশ্যক মত তিনি নানাবিধ মুখভঙ্গি করিয়া সেই ভাব সংগ্রহ করিতেন। একদিন তাঁহাকে এবম্বিধ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার একটী বলিকা দৌহিত্রী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিল। গ্রন্থকারের হাস্যকর মুখভঙ্গির কারণ বালিকা বহুদিন পরে বুঝিতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় বঙ্কিম বাবু কি লিখিয়াছেন দেখুন:—"মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সম্বন্ধে যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহার শীতল স্বচ্ছ সলিল ধৌত—কম্পিত-কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, দেখি দেখি কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধের বসন লইয়া বিব্রত,

তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।” বঙ্কিম চন্দ্র যুবতীরূপ দর্শন পিপাসা চরিতার্থ জন্য ঈশ্বরের অনেক উপরে যাইতেন। আর যাইতেন বলিয়া তাঁহার উপন্যাস পাঠকের হৃদয়ের উপর এত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে প্রকৃত কবির প্রকৃতি উদার ও অকপট বঙ্কিম কথায় ও কাব্যে সমান ভাবে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

উপন্যাস লেখকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, সামাজিক আচার ব্যবহার ও উপযোগী শব্দ প্রয়োগের প্রতিও তাদৃশ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাহার উপর সামান্য কথায়, সামান্য উপমায় হৃদয়স্পর্শী ভাবের অবতারণা। এ সকল বিষয়ে বঙ্কিম চন্দ্রের পটুতা অতি অদ্ভুত রকমের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা আজ দেবীচৌধুরাণী হইতেই দুই এক ছত্র তুলিয়া দিলাম:—

সাগর বল্‌চে “আমার অদৃষ্ট মাটীর আঁবের মত—তাকে তোলা থাক্‌বো। দেবতার ভোগে কখন লাগ্‌বে না।”

* * * *

“খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চকমকি সোলা, দিয়াশালাই সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোয়াল উচাইয়া বিচালী লইয়া আসিল।” চক্‌মকির কথা এখনও অনেকের জানা আছে কিন্তু “গোয়াল উচাইয়া” কথাটী যে কি তাহা অনেকের জানা নাই। এই কথা দুইটীর প্রয়োগেই গ্রন্থকারের সর্ব্বদর্শী দৃষ্টি শক্তির প্রভূত পরিচয়।

প্রফুল্ল খাইতে পায় না। মা তাহাকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাইবে, তাই বলিতেছেন “আয় তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।”

প্রফুল্ল বলিল, “থাক্‌।”

মা ভাবিল “থাক্‌, আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।”

মেয়ে ভাবিল “থাক। সেজে গুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!”

এক “থাক” কথায় কি সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন দেখুন।

পোড়ার মুখী নয়ান বলিল “দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুইছিলি?”

সাগর। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা মুখে বলে না।

এমন বিনয় নম্র সুন্দর উত্তর আর দেখা যায় না। কানে ইহার অর্থ বোধ হইবে না। তখন তীর্থ করা ধর্ম্মার্থ যত না হউক কাঁকার্থ হইবে।

* * * *

দেবীর চক্ষের জল আর থামিল না—বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, জল নাড়া দিলে জল ছড়্‌ ছড়্‌ করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চক্ষে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া গেল।

কি সুন্দর উপমা! কি সুন্দর ভাব!

লোকে কুন্দনন্দিনীকে, তাহাও ইঙ্গিতে দেখাইয়া দেয়, কিন্তু এ সকল কথার মিমাংসা ত সহজ নয়।

বিষবৃক্ষের নায়িকা সূর্য্যমুখী; আর এই চরিত্র যদ্যপি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর চিত্রানুকরণে লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বঙ্কিম চন্দ্রই ধন্য। সূর্য্যমুখীর তুল্য আত্মবলি দিতে কে পারে—এত স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত কোথায়? বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখীও কলঙ্ক বিবর্জ্জিতা নহেন—আদর্শ নহেন, কেননা তিনিও গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা ঠিক যে আদর্শ অপেক্ষা অনুকরণ হীনই হইয়া থাকে। তাই বলিতে হইতেছে যে বঙ্কিম যে আদর্শ মহিলাকে অবলম্বন করিয়া এই সৌন্দর্য্যভরা অভিনব চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই নিখুঁত! আর এহেন স্ত্রীর স্বামী হইয়াছিলেন বলিয়া বঙ্কিম বাবু ভাবের ঘোরে বিভোর হইয়া স্ত্রী যে কি তাহার উত্তর চরিত্রের সমালোচনায় বলিয়া গিয়াছেন।

“যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রধান শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার

সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক না বাসুক কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু—আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা, ভাল বাসুক বা না বাসুক কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে?"—ইহার আর উত্তর দিবার আবশ্যক নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের গুণবতী ভার্য্যা ছিল বলিয়াই তিনি এতটা সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ভাবের সমাবেশ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কিন্তু এই কথাগুলির মধ্যেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাই। বাল্য বিবাহ জন্য বঙ্কিমস্ত্রীকে "বাল্যকালের ক্রীড়ার-সঙ্গিনী" লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার পর স্ত্রীকে "ধর্ম্মে গুরু" এবং "রোগে ঔষধ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহারই প্রাণের কথা বলা হইয়াছে। এমন স্ত্রী না থাকিলে বঙ্কিম যে বঙ্কিম সেই বঙ্কিমই থাকিতেন। তাঁহাকে আর "কৃষ্ণ চরিত্র" লিখিতে হইত না।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন "আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ। সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে, কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্ম্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চার্য্য রকমের। কেমন করিয়া হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। কুসংসর্গটা ছেলে বেলায় বেশী ছিল। বাপ্ থাকৃতেন বিদেশে, মা সে-কেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ্ দিতে কেন শিখিনি, বলা যায় না।" তাই বলি স্ত্রী যে রোগে ঔষধ তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। এমন ঔষধ না থাকিলে বঙ্কিম কেন, অনেকের অনেক কঠিন পীড়ার উপশম হইত না।

বঙ্কিমবাবু দেবী চৌধুরাণীতে নিশির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "পুরুষ-মানুষ স্ত্রীলোকের তেজসের মধ্যে না থাকিলে ঘর সংসার চলে না, তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় "সক্ড়ি" হয়—মাজিয়া ঘসিয়া ধুইয়া ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়।" এমন সোজা কথায় বিশাল ভাবের অভিব্যক্তি আর কোথাও আছে কি? ভাবুন দেখি কতনিরভিমানিনী হিন্দুমহিলাকে নিত্য "সক্ড়ি" মাজিয়া অন্তঃসার শূন্য ঘড়াগুলিকে মাজিয়া ধুইয়া জলে ভরিয়া পূর্ণকুম্ভ রূপে তুলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু তাহারা যে মৃৎপাত্র সেই মৃৎপাত্রই থাকে। সতর্কতার জন্য সক্ড়ি হয় না, যদি হয় তখনি ফেলিয়া দিতে হয়।

এত গেল পরের কথা, এখন বঙ্কিম চন্দ্র স্বয়ং—স্বীয় গুণবতী ভার্য্যা সম্বন্ধে কি বলিতেছেন শুনুন—"এক জনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি যে কি হইতাম তাহা বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ, তিনি জানেন আর আমি জানি।" এখন পাঠক ভাবিয়া—দেখুন ধন্য হইলেন কে—বঙ্কিম, না তাঁহার গৃহিণী?

এক সক্রেটিস্ ছাড়া অধিকাংশ বড়লোকেরই আমারা গুণবতী ভার্য্যা দেখিতে পাই। (এখানে "বড়লোকের" কেহ পয়সাওয়ালা লোক অর্থ করিবেন না) একমাত্র ভার্য্যার কল্যাণে মহামতি গ্লাডেষ্টোন অশীতিপর বৃদ্ধা-বস্থায়ও লেক্চার দিতে পারিতেন। স্ত্রী বক্তৃতার সময় কাহার পর কি বলিবেন তাহার নোট রাখিতেন। বক্তৃতাকালে স্বামীকে মধ্যে মধ্যে সুরুয়া বা ক্লারেট পান করাইতেন। মাইকেলের পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী আদর্শ স্থানীয়।

পাঠক বিষবৃক্ষে বঙ্কিমকে কি পরিমানে দেখিতে পান তাহা জিজ্ঞাসা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কিন্তু দেবী চৌধুরাণীতে বঙ্কিম বাবুকে পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাই। একথা বলিবার পূর্ব্বে আমাকে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি সম্বন্ধে শচীশ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক দয়া করিয়া পাঠ করিবেন।

"একবার পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের শরীর একটু অসুস্থ হইয়াছিল। তিনি খট্টালোপরি শয্যায় শয়ান ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতার নাড়ী পরীক্ষা করিবার বাসনা করিলেন। যাদবচন্দ্রের একপার্শ্বে গৃহ প্রাচীর অপর পার্শ্ব উন্মুক্ত। যাদবচন্দ্র প্রাচীরের নিকট শয়ান ছিলেন। শয্যার উপর না উঠিলে যাদবচন্দ্রকে স্পর্শ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বিপদে পড়িলেন, শয্যার উপর উঠিতে পারেন না, পিতাকেও সরিয়া আসিতে বলিতে পারেন না। অবশেষে তিনি এক পাশের বিছানা উঠাইয়া খাটের উপর পা রাখিয়া পিতার হস্ত স্পর্শ করিলেন। পিতার শয্যা, পিতার বসন, পিতার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পবিত্র জ্ঞান করিতেন। পিতার কক্ষে কখন চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিয়া আসিতেন না পিতার ব্যবহৃত বস্ত্র কখন ব্যবহার করিতেন না।

আর এক দিনের কথা বলিব। একদা বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দালানে দাঁড়াইলেন। যাদবচন্দ্র তখন নিম্ন দৃষ্টিতে বস্ত্রদর্শনের হিসাব লিখিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি কাণে কম শুনিতেন। পদ শব্দ শুনিতে পাওয়া দূরে থাক, নিকটে দাঁড়াইয়া সহজ কণ্ঠে কেহ কথা কহিলেও তিনি শুনিতে পাই-না। বঙ্কিমচন্দ্রের পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল না। পিতৃভক্ত সন্তান পিতার কার্য্যে বাধা দিতে পারেন না, শিক্ষিত ভদ্র সন্তান পিতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারেন না। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া চলিয়া যাওয়াটা তিনি যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; তাহাতে পিতার প্রতি একটু যেন অবজ্ঞা দেখান হয় যেন একটু অধৈর্য্য, একটু বিরক্তি প্রদর্শন করা হয়। জানি না কি ভাবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে, নিঃশব্দে পিতার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। অবশেষে যাদবচন্দ্রের একজন বৃদ্ধা দাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঈদৃশ বিপদাপন্ন দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল "কর্ত্তামহাশয়, ও কর্ত্তামহাশয়, সেজ বাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন যে।"

কর্ত্তামহাশয় তখন মাথা তুলিয়া দেখিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া বসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি জননীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদোদক একটা শিশিতে করিয়া লইয়াছিলেন। যে জলটা জননীর পদস্পৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা গঙ্গোদক; জননী বলিলেন, "করিলি কি গঙ্গাজল আমার পায়ে ঠেকালি?"

বঙ্কিম ছল্ ছল্ নয়নে বলিলেন, "মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড়?"

মাতৃভক্ত সন্তান চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার কক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কক্ষ বাহিরে পাদুকা খুলিয়া, লোকে যেরূপে দেবালয়ে প্রবেশ করে, বঙ্কিম চন্দ্র সেইরূপে ভক্তিপ্লুত চিত্তে পিতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে প্রণাম করিলেন, পিতার চরণ ধূলি মাথায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না,—তিনি পিতার চরণ সমীপে বসিয়া রহিলেন। ইচ্ছা, পদোদক গ্রহণ করেন। কিন্তু বলিতে সাহসে কুলাইলনা। একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন, দেখিলেন, অদূরে আমার জননী ও পিতামহী নীরবে ম্লানমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের পিছু পিছু আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাতরদৃষ্টিতে জননীর পানে চাহিলেন। তিনি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন; এবং ঝটীতি একটা জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পাত্র আনিয়া যাদবচন্দ্রের চরণ সমীপে রক্ষা করিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র অবনত বদনে নীরব রহিলেন। যাদবচন্দ্র পা বাড়াইয়া দিলেন ভক্তপুত্র তাহা সযত্নে ধৌত করিয়া লইলেন এবং অন্তরালে গিয়া সেই পাদোদক একটা শিশিতে পূর্ণ করিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বঙ্কিম চন্দ্র পাদোদক পূর্ণ সেই শিশি দুইটী সম্বল করিয়া বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।"

বঙ্কিমবাবুর পিতৃভক্তির কথা পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি। আবার তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইলাম মাত্র। এখন দেখুন ব্রজেশ্বর চরিত্র তাঁহারই ছাঁচে ফেলিয়া গড়া কিনা?

বঙ্কিম অন্যমনস্ক পিতার সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান, বাবা বলিয়া ডাকিতেও সাহস করিলেন না। আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা কি বলেন? আবার অপর দিকে দেখুন ব্রজেশ্বর হরবল্লভের নিকট দণ্ডায়মান। সহস্র কথায় এক উত্তর দিয়াছিলেন "যে আজ্ঞা।"

বঙ্কিম লিখিতেছেন—

"ব্রজ নীরব বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে হীরার ধার হইলেও সে কালে কথা কইত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।"

তাঁহার ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয় তবু তিনি কি করিলেন "দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে ধরিয়া মুখ খানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখ খানা প্রফুল্লের মত দেখিল। বিবশ, বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রু সিক্ত বিম্বাধরে—আ ছিছি! ব্রজেশ্বর! আবার!"

কুলিন সন্তান কিনা, তার বয়স বাইশ বছর, বেশী আর কি করিয়াছিল। এখনও ক্রিষ্টমাসইভে (Christmas eve) মিসেল্‌টোর দোহাই দিয়া "আছি ছি" হইলে জিতেন্দ্রিয়তার প্রত্যবায় হয় না। হয়ত বঙ্কিম বাবুর মতে ও হয় নাই।

ব্রজেশ্বর যখন বুঝিলেন হরবল্লভ দেবীকে কোম্পানীর সিপাহীদিগকে ধরাইয়া দিতে সচেষ্ট তখনও পিতার উপর বিরক্তি নাই—তখন মনে হইতেছে সেই শাস্ত্রের বচন "পিতা ধর্ম্ম।" তখনও তিনি প্রফুল্লকে বলিতেছেন "তোমার আত্মরক্ষার আগে আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

পিতৃভক্ত সন্তানের উপযুক্ত কথা বটে।

আবার বঙ্কিমি চরিত্র। ব্রজেশ্বর লেপ্‌টেনেন্ট সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত করিল। যে কালে বাঘ, ভালুক, সাহেব, সব এক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল সেকালের ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে এক চড় বসাইয়া দিল। সাহসদাতা স্বয়ং বঙ্কিম। আনন্দমঠে শান্তি-কাপ্তেন টমাস্‌কে রূপী বাঁদর সাজাইতে চাহিল। বলিল "আমাদের বাগানে বেশ কলা হয়।" চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী ভীমা পুষ্করিণীতে একাকিনী লরেন্সের সঙ্গে কেমন রসিকতা করিল। শেষে অর্থ করিল লরেন্স শব্দের অর্থ বাঁদর। এত সাহস সেকালে ছিল কি না জানি না। তবে মনে হয় বাল্যকালে পিতার সহিত শারদীয়া পূজাবকাশে বহরমপুর হইতে বজরা করিয়া দেশে আসিতাম। বজ্‌রা তখনকার দিনে সাহেবরাই ব্যবহার করিতেন; আজকালের মত ছড়াছড়ি ছিল না। বজরা দেখিলেই মনে হইত ইহাতে সাহেব আছে সুতরাং বজরা কোন ঘাটে ভিড়াইলে কত কুলমহিলাকে ঘড়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়াছি। আবার সেই সকল ঘড়া সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে চাকর দ্বারা পাঠাইয়া দিতে হইত। লাঞ্ছনা এত ছিল। বঙ্কিম বাবুর ঘটনা তাহার অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বের বলিলেও হয়, তখন সাহেবের গালে চড় মারা, বা স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার গলায় শিকলি বাঁধিয়া বাঁদর নাচাইবার বাসনা কতদূর সাহসের কথা তাহা উল্লেখ অপেক্ষা অনুমান করাই সঙ্গত। এ সব মেয়েগুলা গেল কোথায়?

তাহার পর ব্রজেশ্বর সুরসিক ও নির্ভীক। বঙ্কিম বাবুও তাই। ব্রজেশ্বর বন্দী দেবীর বজরায় আসিয়াও যেন শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে। যখন পাঁচকড়ি বলিতেছে "আচ্ছা, একটা কাজ জান? পা টিপিতে জান?" রসিক ব্রজেশ্বর উত্তর দিল "তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপিব, সে ত ভাগ্য—"

"তবে একবার টেপনা" করিয়া পাঁচকড়ি আলতা পরা রাঙ্গা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর অমনি সুরু করিয়া দিলেন।

আজকাল ছেলে খাওয়ান, ছেলে শোয়ান, টিপুনীর উপর নির্ভর করে। তেমন খাওয়াও খাই নাই, শোয়াও শুই নাই। তখন দিদিমার মাথায় হাত বুলানর সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন বা বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী কখন বা বার

হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। তাঁহার মুখে এমনি প্রতিজ্ঞাজনিত পা টেপার গল্প শুনিয়াছিলাম। বঙ্কিম বাবুর এই পা টেপার এত সাধ কেন হইল তাহা বুঝা যায় না। কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে না কি?

তখনকার রমণীরা কিছু অতি মাত্রায় রসিকা ছিলেন। আপনি "মহাশয়ের" ধার ধারিতেন না। সাগর দেবীচৌধুরাণীকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল "তুমি কেগা?" ঘোমটার খুব ঘটা ছিল কিন্তু সুবাদের লোক পাইলে দুটা রঙ্গরস করিতে ছাড়িত না। তথাপি তাঁহারা লজ্জাহীনা ছিলেন না। প্রাণে স্নেহ মমতা ছিল, আত্মপর প্রভেদ জ্ঞানে মূর্ত্তিমতী হইতে পারে নাই। আজকাল গম্ভীরামূর্ত্তি—বেয়াই মহাশয়ও দুটা ঠাট্টা তামাসার মুখ দেখিতে পান না। সে সব বুঝি উঠিয়া গিয়াছে—হায় হায় তার সঙ্গে আরও কত ধনরত্ন কোথায় গিয়াছে তাহা লিখিতে কষ্ট হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সেকালের কথায় কি লিখিয়াছেন শুনুন "তখনকার মা যে শুধু আমার বা তোমার মা ছিলেন, তাহা নহে, বিশ্ব-সংসারের মা ছিলেন, এখনকার মা শুধু তার পেটের ছেলেটীর। অন্য ছেলেরা হাঁ করিয়া দেখিতেছে; এখনকার মা লজ্জার মাথায় বাজ হানিয়া নিজের ছেলের মুখে অনায়াসে মিষ্টান্ন গুঁজিতেছে; হায়! কি ছিল, কি হইল! সোণার বাংলা ছাই হইয়া গিয়াছে। গৃহলক্ষ্মীদেরই যখন এতটা পতন, আমরা স্বার্থপর পুরুষ, আমাদের কথা ছাড়িয়াই দাও।"

বঙ্কিম বাবু দেবীচৌধুরাণীর উপসংহারে বলিয়াছেন "এখন এস প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি! একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র। কতবার আসিয়াছি তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ তাই আবার আসিলাম—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আমরাও দেবীকে দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। স্বার্থ ত্যাগরূপ মহা যোগসাধনা না করিলে গৃহলক্ষ্মী আর কুললক্ষ্মী হওয়া যায় না। প্রফুল্লের মত বলিতে শিক্ষা কর "তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না, তাতে আমি সুখী হইব না।" লেখকের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। মনের ভাবের এমন উন্নত অবস্থা না থাকিলে কি দেবী হওয়া যায়!

ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির উচ্চ সোপানে আরোহণের কারণ হরবল্লভের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুরোহিত মুখে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ; পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এই মন্ত্রটী শ্রবণ করা। বাইশ বছরের ব্রজেশ্বর কথাটী কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন "পিতা ধর্ম্ম" ইত্যাদি। তা বেশ করিতেন, কিন্তু শাস্ত্র পড়িয়া পিতৃভক্তি শিক্ষা, আদর্শ শিক্ষা নহে। সেই গালভরা "বাবা" নামের এমনি মহিমা যে আপনা আপনি প্রাণ নাচিয়া উঠে। আপনা আপনি ভক্তি আসে। একটী ক্ষুদ্র গল্প বলি আমি তখন জলপাইগুড়ির স্পেশাল সব্‌রেজিষ্ট্রার। হলদিবাড়ী ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে একটী কমিশন করিতে গিয়াছি। পথে গাড়োয়ানের সহিত গল্প করিতেছি। তাহার সাংসারিক নানা পরিচয় দিবার পর সেই নিরক্ষর ব্যক্তি কি বলিয়াছিল শুনুন "আমার বাপ আমায় বহু কষ্টে মানুষ করিয়াছিলেন। আমি যখন উপায় করিতে শিখিলাম তখন তিনি মারা গেলেন। হায় এখন যদি তিনি থাকিতেন প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়া, তাঁহাকে ভাল মন্দ সাধ্যমতে খাওয়াইয়া প্রাণের তৃপ্তি সাধন করিতাম।" সে শাস্ত্র পড়ে নাই কিন্তু প্রকৃত পিতৃভক্তি তাহার প্রাণে ছিল। আজকালকার ছেলেরা কেহ কেহ নাকি বলেন যে, পিতার যে ভক্তিটুকু পাইবার অধিকার তাহা ওজন করিয়া দিতে পারি। ধন্য শিক্ষা! এখন ঘরের শশুরীরি মা অন্ন পান না কিন্তু যাহাদের মাতৃভূমির দুঃখে অবিরল নয়ন ধারা প্রবাহিত হয়।

পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করিয়া বিবাহ করেন, সমাজের আদর্শ হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে। হায়রে কর্ত্তব্য জ্ঞান! কর্ত্তব্য কি তাহাই বুঝিনা, তবে কর্ত্তব্য সম্পাদন কিরূপে হইবে!

ভক্ত, কালী কপালিনীর সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিন্তু প্রাণের কানাইকে মনে হইলেই সেই চাঁদ মুখে একটু ক্ষীর ননী দিবার ইচ্ছা হয়। পিতা পূজ্য, পিতা প্রণম্য, পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ ইহা ঠিক, কিন্তু পিতার শয্যা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠার মাত্রা বড় বেশী। পিতৃপদ সেবায় পুত্র কন্যার পূর্ণ অধিকার। পিতৃ-শয্যায় উপবিষ্ট হইয়াই তাহা সম্পন্ন হয়।

চাণক্য বলিয়াছেন ষোড়ষ বর্ষ বয়ক্রম পূর্ণ হইলে পুত্র মিত্র বদাবরেৎ। সে মিত্র ভাব দিবা নিশ জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কেমন করিয়া সম্পন্ন হয় তাহা বুঝি না। আমার পিতৃভক্ত অর্ক্ষয় দাদা পিতার সহিত কি ভাবে পূর্ণমাত্রায় "পুত্র মিত্র বদাচরেৎ করিয়াছিলেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিলাম :—

"আমাদের পিতা পুত্র মধ্যে সমবয়স্ক সুহৃচরের মত বিশুদ্ধ রসাভাবেরও অভাব ছিল না। একদিনের একটা গল্প বলি। তখন আমি বহরমপুরে ওকালতি করি। বঙ্কিমবাবুও বহরমপুরে থাকেন। পিতা বহরমপুর একবারে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল পূজার সময় বাড়ীতে দেখা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিম বাবুতে আমাতে দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতী নাটক কাটাকুটী করিয়াছিলাম। কিন্তু এই গল্পের একটু পূর্ব্বে পীঠিকা আছে। সেটুকু আগে বলিতে হইতেছে। সেই সময়ে বহরমপুরে আমাদের সবজজছিলেন রাইট সাহেব নামক একজন শ্বেতকায় ফিরিঙ্গি। তিনি একরূপ কিম্ভূতকিম্ভবিশ্রুতি রূপ পদার্থ ছিলেন। একটী মোকদ্দমার দাবি ডিক্রী দিলেন। উকীল আমলারা এজলাস হইতে চলিয়া গেল, বিশ মিনিট পরে তাঁহাদিগকে ডাকাইলেন; পেস্কারকে বলিলেন "পার্ব্বতিপুরা হুকুম লিখা যায়।" উকিল দিগকে বলিলেন "আপনারা শুনুন" পার্ব্বতি লিখ।" টেবিলে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন "দাবি তার ডিক্রি।" এই গল্প পিতার সমক্ষে আমি টাট্‌কা টাট্‌কি করিয়াছি। সেদিন তখন আমাদের বাহিরের বৈটকখানার মজলিসে লীলাবতী সংশোধনের সমালোচনা চলিতেছিল। দৃশ্য বরাহনগর, সেই স্থানের একজন স্ত্রীলোকের উক্তিতে দীনবন্ধু বাবু লিখিয়া-ছিলেন "গ্যাদরী" আমি কাটিয়া করিয়াছিলাম "ঠ্যাকারি।" পিতা বলিলেন "গ্যাদারী, ঠ্যাকারী" দুই হয়; তুমি গ্যাদারী কাটিয়া ঠ্যাকারী করিলে কেন? আমি বলিলাম "আমাদের এতদঞ্চলে গ্যাদারী স্ত্রীলোক বলে না, ঠ্যাকারী বলিয়া থাকে।" পিতা বলিলেন "তুমি আমার চেয়ে বেশী জানিলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম "আপনি বহুকাল বিদেশে থাকেন, নদে জেলায় বহুকাল ছিলেন, সেখানে গ্যাদারীই বলে, সেই জন্যই আপনার ভ্রম হইতেছে।"

(পাঠক লক্ষ্য করিবেন আমি পিতার সহিত কিরূপ ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতাম।) পিতা বলিলেন "তবে ইহার মীমাংসা হয় কিরূপে? তোমার মা ত আমার সঙ্গে বিদেশে প্রায়ই যান না। তিনি যদি বলেন গ্যাদারী ঠ্যাকারী দুই হয়, তবে তুমি ত হারিবে?" আমি বলিলাম "অবশ্য হারিব।"

(সহৃদয় পাঠক আবার লক্ষ্য করিবেন, আমাদের পিতা পুত্রের সাহিত্য বিবাদে, সালিসির ব্যবস্থা কিরূপ) বৈঠকখানায় একঘর ভদ্রলোক হাস্যবদনে উৎফুল্ল নয়নে উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমরা পিতা পুত্রে উঠিয়া অন্দরে মহাবিচারক মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "স্ত্রীলোক অহংকারী হইলে তাহাকে কি বলে?" আমার মাথা খাইতে; মা একেবারে বলিয়া ফেলিলেন "ঠ্যাকারীও বলে, গ্যাদারীও বলে।" আমরা হাসিতে হাসিতে বহির্বাটিতে আসিলাম। সকলে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল? কি হইল?" পিতা সটানে মজলিসের মাঝখানে গিয়া রাইট সাহেবের অনুকরণে মেঝেতে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, বলিলেন "দাবি তার ডিক্রি। গৃহিণী বলিলেন ঠ্যাকারী গ্যাদারী দুই হয়।" হাস্যের তরঙ্গ উঠিল, হাসির ফোয়ারা

ছুটিল। এখনও আমার হাসি আসে, হাসির সঙ্গে একটু কান্নাও পায়; পিতা নাই বলিয়া নয়, পিতা কাহারও চিরদিন থাকেন না। কিন্তু এরূপ রসাবোধ বাঙ্গলা হইতে, যে লোপ পাইতে চলিল, সত্য সত্যই তাহাতে কান্না আসে। সার বার্ণিস পীকক তখন হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস্। তিনি বিজ্ঞ; বিদ্বান, প্রবীণ, কিন্তু অনেকগুলি ফুল বেঞ্চের বিচারে তিনি একলা একদিকে মত দিলেন,। আর অন্যদিকে অন্য সকল জজ জুটিয়া বিপরীত মত দিলেন। আমাদের সংসার ধর্ম্মের গৃহস্থালি কথায়, তখন আমরা পাঁচ জন জজ ছিলাম। আমি, আমার সহধর্ম্মিণী, আমার বিধবা পিসতুত দিদি, মাতা ঠাকুরাণী ও পিতৃদেব। এমন সময়ে সময়ে হইত যে তত্ত্বতাবাস প্রভৃতি আহার ব্যবহারাদি, কোন গৃহস্থালি কথায় মাতা ভগিনী আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী, আমরা চারিজনে এক মত হইলাম, কিন্তু পিতা আমাদের মতে মত দিলেন না। আমাদের বুদ্ধি সাধ্যমত তাঁহাকে বুঝাইলে ও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না, ক্ষুব্ধ হইতেন না, ক্ষুণ্ণ হইতেন না; হাসিতে হাসিতে বলিতেন "আমরা বাঙ্গলার বিচারক সার বার্ণিস পীককের জাতি; তাহার অনুকরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমি এ বাড়ীর চীফ্ জষ্টিস্, তোমাদের সকলের হইতে আমার মত বিভেদ হওয়াই ঠিক, আর তোমাদের মতানুসারে কার্য্য হওয়াও ঠিক। তোমরা এককাট্টা এবং অধিকাংশও বটে।" কাজেই পিতা কর্ত্তা হইয়া অকর্ত্তা হইয়া থাকিতেন, আমরা কোন কোন স্থলে কর্ত্তৃত্ব করিতাম।"

বলি লাগ্‌লো কেমন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারক নাথ বিশ্বাস।

মহামান্য
বঙ্গেশ্বর লর্ড রোনাল্ড্‌সের প্রতি।

স্বাগত।

বঙ্গের উদয়-নভে নব গরিমায়
তুমি আসিয়াছ নবরবির মতন,
ঘুচায়ে জড়িমা প্রাণে নবীন আশায়,
আনন্দের কলছন্দে জাগায়ে কানন।
আনিয়াছ আঁখি ভরি' করুণা অপার,
প্রসন্ন কোমল হাসি সরল মধুর,
সুনীল গগনসম অন্তর উদার
দুখীর নয়নজলে বেদনা-বিধুর।

হে সম্রাট-প্রতিনিধি! এস এস আজ
প্রাচীনা এ নগরীর ভবনে তোমার,
এস লুপ্ত গৌরবের পুণ্যপীঠ মাঝ
সঞ্চিত ধূলায় শত কাহিনী যাহার।
লহ প্রীতি, লহ পূত ভকতি-চন্দন,
আনন্দে পূরব তোমা করিছে বরণ।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম্-এ।

বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদপত্রের জীবন-সংগ্রাম।*

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে শান্তিপ্রদ জীবনের ইতিহাস ইতঃপূর্ব্বে এই পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা) প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাকেই যদি সেকালের সাময়িক পত্র বা মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে বলা যাইতে পারে যে, সাময়িক পত্র অথবা মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন বিষয়ে কোম্পানীর আমল শান্তির যুগ ছিল।

*"বাঙ্গালায় সাময়িক সাহিত্য" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের এক অধ্যায়।

বাস্তবিক বাঙ্গালা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি যে কোম্পানীর শাসনকালে শান্তিপ্রদ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তাই আমরা সেকালের সাময়িক পত্রের আলোচনায় মুদ্রাযন্ত্র আইনের বিভীষিকার কথা উল্লেখ করিয়াও তাহার আলোচনার অবসর পাই নাই।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের এই শান্তিময় জীবন যাপনের একমাত্র কারণ, রাজভক্ত বাঙ্গালীর শান্ত স্বভাবে ও রাজভক্তিতে সেকালের রাজপুরুষগণের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল। দেশীয় সাময়িক পত্র পরিচালকগণের প্রতি রাজপুরুষগণের এ বিশ্বাস মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথমার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রগুলি শান্তিসুখে জীবন অতিবাহিত করিলেও ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক পত্রগুলি কোম্পানীর শাসনকালে শান্তিপ্রদ জীবন অতিবাহিত করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজ বাঙ্গালীর স্থায় শান্তিপ্রিয় নহে।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কথা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের কথার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি; এই অধ্যায়ে এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষে বাঙ্গালায় ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক-পত্রের জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ-পত্রের অভাব।

মুদ্রাযন্ত্র এবং সাময়িক পত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার দুইটী শ্রেষ্ঠ উপকার হইলেও ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই দুইটীকে এ দেশে আনিয়া প্রচলন করিবার চেষ্টা করেন নাই।* তাহা না করিবার কারণ তখন রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সত্ত্বেও সুশাসকের অভাবে দেশে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছিল† এবং দেশময় অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বিরাজ করিতেছিল। শাসনকর্ত্তাদিগের এইরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতির সময় এবং প্রকৃতিপুঞ্জের ভয় ও উত্তেজনায় সময়, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন এবং সাময়িক পত্রের পরিচালন ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন না। তাই ভারত-প্রবাসী ইংরেজগণের পক্ষে এই দুইটী জিনিসের অভাবের প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন ব্যতীত আর উপায়ান্তর ছিল না।

কিন্তু যাহার প্রয়োজন নিত্য তাহার অভাব সভ্যজাতি অধিক দিন ভোগ করিতে পারে না। ইংরেজ দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াই মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন।

মিঃ বোল্টস্‌এর মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন চেষ্টা।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিঃ বোল্টস (পরিশিষ্ট)। কাউন্সেল হাউসে ও নানা প্রকাশ্যস্থানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অবগত অবগত করাইতে চেষ্টা করেন যে, যদি কেহ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁহাকে সম্যক প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। মিঃ বোল্টস্‌এর সেই দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের বিজ্ঞাপনটী ছিল এইরূপ:—

"To the Public. Mr. Bolts takes this method of informing the public that the want of a printing press in this city being of great disadvantage in business and making

---

* ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র পরবর্ত্তীকালের আমদানী হইলেও দক্ষিণ ভারতের গোয়া (Goa) নগরে পর্ত্তুগীজেরা বহুপূর্ব্বেই মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া স্থাপন করিয়াছিল। W. H. Carey লিখিয়াছেন— "It is known that the Hindoos and the Chinese contend for the invention of the Press. It is first brought into use in India by the Portuguese, who established some presses at Goa" The Good Old Days of Hon'ble John Company.

† সেকালের অশিক্ষিত ও আইন-অনভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাদিগের একটী চিত্র কোলব্রুক সাহেব (Sir H. T. Colebrooke) তাঁহার পিতার নিকট লিখিত একখানা চিঠিতে যেরূপ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার একাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল:—

"These harpies were on sooner let loose upon the country, than they plundered the inhabitants with or without pretences...Justice was dealt out to the highest bidders by the Judges, and thieves paid a regular revenue to rob with impunity. C. R. No 25

extremely difficult to communicate such intelligence to the community as is of the utmost importance to every British subject, he is ready to give the best encouragement to any person or persons who are versed in the business of printing to manage a press, the types and utensils of which he can produce. In the meantime he begs leave to inform the public that having in manuscript many things to communicate which most intimately concern every individual, any person who may be induced by curiosity or other more laudable motives will be permitted at Mr. Bolts' house to read or take copies of the same. A person will give due attendance at the hours of from ten to twelve any morning." *

বোল্টস্ সাহেবের এই বিজ্ঞাপনে কোন ফল হয় নাই। তাঁহার এই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল দেখিয়া বাঙ্গালার তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর কর্ম্মচারী উইলকিন্স সাহেবকে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। † উইলকিন্স গবর্ণরের অনুরোধে নিজে অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে একটী বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইহাই বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। কিন্তু তখনও কোন ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র বৃটীশ ভারতে স্থাপিত হয় নাই।

উইলকিন্সের মুদ্রাযন্ত্র।

এই সময় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিত। ইহাতে ব্যয় এবং সময় উভয়ই অত্যন্ত অধিক লাগিত। এই অসুবিধা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ওয়ারেন হেষ্টিংসের কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে সরকারী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই।

গবর্ণমেণ্টের মুদ্রণ-ব্যবস্থা।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজত্বের শেষভাগে ১৭৮০ অব্দে কলিকাতায় কয়েকটী ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার একটীর স্থাপয়িতা ছিলেন হিকি সাহেব; ইঁহার সম্পূর্ণ নাম ছিল James Augustus Hicky. *† এই হিকি সাহেব তাহার মুদ্রাযন্ত্রে ১৭৮০ অব্দের ২৯শে জানুয়ারী শনিবার হইতে "বেঙ্গল গেজেট" (Bengal Gazette) নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র।

* Echoes from Old Calcutta.
Calcutta Review. 1909, January

* (১) হিকির প্রেসে গবর্ণমেণ্টের ৬০০০ ছয় হাজার টাকার মুদ্রন-কার্য্য হইয়াছিল। এই ছয় হাজার টাকার কার্য্যের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া রবার্ট কিড্ (Robert Kyd) নামক কর্ম্মচারী ১৭৮৮ সনে গবর্ণমেণ্ট সমীপে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ—হিকি Sir Eyre Coote হইতে অনেকগুলি মুদ্রিতব্য বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং তাহা ছয় সপ্তাহে অথবা দুই মাসে শেষ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হিকি অনেক গোলমাল করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই গোলমাল হইতেই ক্রমে রাজকর্ম্মচারী দিগের সহিত তাহার বিরোধ বাঁধিয়া যায় এবং ক্রমে তাঁহাদের বিরুদ্ধে হিকি লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করেন।

† As an example of the scurrilous attack against Governor General and his friends, we shall quote the *dramatis personæ* of a "Playbill Extraordinary' inserted in its (Bengal Gazette) columns. There Warren Hastings figures as "Don Quixote fighting with windmills, by the great Mogul, commonly called the Tyger of War"; Impey as "Judge Jeffreys, by the Ven'ble Poolbudy"; 'Chambers as "Sir Limber by Sir Viner Pliant"; Justice Hyde as "Justice Balance by Cram Turkey"; and the Rev. W. Johnson the Senior Chaplain of the Settlement as "Judus Iscariot touching the forty pieces, by the Rev. Mr. Tally Ho !" etc. etc.

—The Good Old Days of Hon'ble John Company Vol. I.

হিকির এই Bengal Gazetteই ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র "বেঙ্গল গেজেট" বোধ হয় এই নামের অনুকরণেই বাহির হইয়াছিল। হিকির "বেঙ্গল গেজেটের" নামের নীচেই লেখা ছিল—" A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none." অর্থাৎ কাহারও প্রভাবে পরিচালিত নহে অথচ সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাজনীতি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্র।

বাঙ্গায় প্রথম সাময়িক পত্র হিকি বেঙ্গল গেজেট

"বেঙ্গল গেজেট" জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে বেশ শান্তভাবেই পরিচালিত হইতেছিল। হিকিও তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন কোন বিভাগের মুদ্রণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন, সে কার্য্যও বোধ হয় কিছু দিন সুনিয়মেই চলিয়াছিল। (১) কয়েক মাস ভদ্রভাবে চলিয়া "বেঙ্গল গেজেটের" সুর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—তাহাতে তখন নাটক, কবিতা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা সে সময়ের সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাদিগের নিন্দা ও কুৎসা বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর জেনারেলের পত্নী, প্রধান বিচারপতি, তাঁহার পত্নী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের সম্বন্ধেও আপত্তিজনক ইঙ্গিত প্রকাশিত হইল।

হিকিম যন্ত্রে গবর্ণমেণ্টের মুদ্রন কার্য্য।

বেঙ্গল গেজেটের সুর পরিবর্ত্তন।

এই সময় সিমন ড্রোজ (Simeon Droze) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সম্বন্ধে ও আরও কতিপয় প্রবাসী ইংরাজের নামে গেজেটে গ্লানিজনক উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত কর্ম্মচারী সিমন ড্রোজ সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইয়া আবেদন করেন। এই আবেদন পাইয়া ১৪ই নবেম্বর গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস হিকির গেজেট যাহাতে আর পোষ্টাফিসের মারফত প্রচারিত হইতে না পারে তাহার আদেশ প্রদান করেন।

হিকির বিরুদ্ধে প্রতিকার।

হিকির "বেঙ্গল গেজেট"কে প্রশ্রয় দিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস যথেষ্ট বিপন্ন হইয়াছিলেন, শেষে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য ও সরকারী পক্ষ সমর্থন জন্য তিনি "ইণ্ডিয়া গেজেট" বাহির করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাহার অতিরিক্ত আব্দারও মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিকির গেজেট বন্ধ হইয়া গেলে পর "ইণ্ডিয়া গেজেট" আর কত দিন জীবিত ছিল তাহার বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। বোধ হয় ইহার পর "ইণ্ডিয়া গেজেট"ও উঠিয়া গিয়াছিল। অতএব ১৭৮৪ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি গবর্ণমেণ্টের সিনিয়ার সিভিলিয়ান ফ্রেনসিস গ্লেডুইন সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল নিকট গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও উপদেশ প্রচার করিবার জন্য একখানা গেজেট বাহির করিবার অনুমতি এবং ঐ পত্রিকা প্রচলিত মাশুলের অর্দ্ধ মাশুলে চালাইবার অধিকার প্রার্থনা করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ওয়ারেন হেষ্টিংসের গবর্ণমেণ্ট এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে, ৪ঠা মার্চ্চ হইতে গ্লেডুইন সাহেব একটী নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহা হইতে "কলিকাতা গেজেট" বাহির করিতে আরম্ভ করেন।

গ্লেডুইন সাহেবের কলিকাতা গেজেট।

এই গেজেটে গবর্ণমেণ্টের আদেশ, উপদেশ ও বিজ্ঞাপনসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকিলেও ইহা গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত পত্রিকা বলিয়া গণ্য ছিল না। সুতরাং ইহাতে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ ও নানা বিষয়ের স্বাধীন আলোচনা থাকিত। ১৭৮৪ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর এই পত্রে কোন বিলাতি পত্রের আপত্তিজনক অংশ উদ্ধৃত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট সম্পাদক গ্লেডুইনকে ইহার জন্য দায়ী করেন এবং তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। সিভিলিয়ান সম্পাদকের উপর এই কড়া হুকুমের সংবাদ ১০ই ফেব্রুয়ারীর "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত

"কলিকাতা গেজেটে"র উপর গবর্ণমেণ্টের কড়া হুকুম।

হইলে * অনেকেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ফলে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে আর কোন নূতন পত্রিকা প্রকাশের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

১৭৮৫ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তিনি স্বদেশে পঁহুছিতে না পঁহুছিতে সেই ফেব্রুয়ারী মাসেই "বেঙ্গল জার্ণাল" নামে এক খানা সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল এবং ইহার অল্পদিন পর "ওরিয়েনণ্টাল এডভাইসার" নামে আর একখানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

"বেঙ্গল জার্ণাল "ও" ওরিয়্যান্টাল এডভাইসার"।

এই সময় সার জন মেকফারসন অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি অস্থায়ী অবস্থায় কোন বিষয়ে কোন কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে অগ্রসর না হওয়ায় সুযোগ বুঝিয়া এই সময় আরও কয়েকখানা সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলির মধ্যে "ওরিয়্যান-ণ্টাল ম্যাগাজিন বা কলিকাতা এমিউজমেণ্ট" (Oriental Magazine or Calcutta Amusement" ও "কলিকাতা ক্রণিকালের" নাম প্রাচীন "কলিকাতা গেজেটের" বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৮৫ অব্দের ৬ই এপ্রিল "Oriental Magazine or Calcutta Amusement" বাহির হয় ও পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে ক্রনিক্যাল † বাহির হয়।

"ওরিয়্যান্টাল মেগাজিন" ও "কলিকাতা ক্রণিক্যাল"।

১৭৮৬ অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর লর্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। হিকির অন্যায় আচরণ হইতেই রাজ-পুরুষদিগের মনে সংবাদ-পত্রের প্রভাব দমনের উপায় নির্দ্ধারণের ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। ১৭৯১ অব্দে "বেঙ্গল জার্ণেলে" কলিকাতা-প্রবাসী ফরাসী রাজ-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় লর্ড কর্ণওয়ালিস বেঙ্গল জার্ণালের সম্পাদককে আটক করিয়া বিলাত প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন * এবং

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সংবাদ-পত্র পরিচালন বিধি।

---

* "We are directed by the Honorable the Governor General and Council to express their entire disapprobation of some extracts from English newspapers which appeared in this paper, during a short period when the Editor was under the necessity of entrusting to other hands the usperintendence of the Press." Good Old Days Vol. I 246.

† এই সময় মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন ব্যাপার বহু ব্যয়সাধ্য ছিল। অনেকেই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া শেষ বিপন্ন হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাচীন "কলিকাতা গেজেট" হইতে একটী বিজ্ঞাপন দিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। "কলিকাতা ক্রনিকেলের" এক অংশীদার প্রেস পরিচালন ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত হইয়া ১৭৯২ সনের "কলিকাতা গেজেটে" মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয়ের এই বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ করিয়াছিলেন।—

TO BE SOLD BY PUBLIC AUCTION.

By Dring, Rothman and Co. at their Auction Room On Wednesday next 31st instant one-sixth share in the "Calcutta Chronicle" and business of the Chronicle Press, together with a proportionable part of the outstanding debts, presses, types, foundry for types (which includes several complete sets of matrices for casting the neatest and most perfect Persian, Nagri and Bengalee Types and other materials Ipertaining thereto. The debts due to to the concern now exceed sicca Rupees 51,000. A particular statement of the monthly collection and expenses for the last twelve months may be seen at the Auction Room.

N. B. The share will be positively sold to the highest bidder, it being the property of Mr. Up. John, and sold by order of the mortgagees.

Selections from Calcutta Gazette, Vol II. Page 541.

এই বিজ্ঞাপন হইতে অবগত হওয়া যায় যে পার্সী, নাগরি এবং বাঙ্গালা অক্ষরও তখন কলিকাতায় প্রেসে ছিল এবং অক্ষর ঢালাই কারখানাও তথায় ছিল।

* "বেঙ্গল জার্ণেলের" সম্পাদক সুপ্রিম কোর্টে এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া "হবিয়াস কর্পাস" বলে মুক্তিলাভের আদেশ প্রাপ্ত হন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রিম কোর্টের তর্ক-

সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে নূতন রাজবিধান বিধিবদ্ধ করিতেছিলেন তাহাতে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের বিরুদ্ধেও গুরুতর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন*। ১৭৯৪ অব্দের এই নূতন রাজবিধি অনুসারে গবর্ণমেণ্টের যে কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।† যে সংবাদপত্র সম্পাদক বা পরিচালক এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পত্রিকা পরিচালন করিবেন, তিনি দেশীয় হইলে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হইবেন এবং ইয়োরোপীয় হইলে ভারতবর্ষ হইতে বহিস্কৃত বা নির্ব্বাসিত হইবেন।

এই সময় দেশীয় লোকের দ্বারা কোন সংবাদপত্রই পরিচালিত হইত না। তখন যে কয়েকখানা সংবাদপত্র পত্রিকা পরিচালিত হইতেছিল, তাহা সকলি ইংরেজদিগের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজি সংবাদপত্রিকা ছিল।

এই সময় মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা কলিকাতায় এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল যে তাহা হইতে কোন পত্রিকা বাহির না করিয়া প্রেস পরিচালন করা প্রেস-অধ্যক্ষগণের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং এইরূপ কঠোর আইন বিধিবদ্ধ হইলেও পত্রিকা পরিচালনে ও নূতন পত্রিকা উদ্ভবে বিরতি দেখা যাইতেছিল না। ইতিমধ্যে ১৭৯১ অব্দের ৩রা অক্টোবর "কলিকাতা ম্যাগাজিন" ও "ওরিয়্যাণ্টাল মিউজিয়াম" বাহির হইয়াছিল। ইহার পর ১৭৯৪ অব্দে "ইণ্ডিয়া জার্ণাল"; ১৭৯৫ অব্দের ২০শে জানুয়ারী "বেঙ্গল হরকরা";* ৪ঠা অক্টোবর "ইণ্ডিয়ান এপোলো" এবং অতঃপর "এসিয়াটিক মিরার," "কলিকাতা কিউরিয়ার," "টেলিগ্রাফ," ও "ওরিয়াণ্টাল ষ্টার" প্রভৃতি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল।

"ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড" ও অন্যান্য পত্রিকা।

"বেঙ্গল গেজেটের" অপরিণামদর্শী সম্পাদক হিকির ন্যায় "Indian World" এর সম্পাদক ডুয়ানিরও পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উইলিয়ম ডুয়ানি (William Duane) একজন আইরিশ আমেরিকান ছিলেন। ১৭৯৪ অব্দে তিনি ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড বাহির করেন। ১৭৯৫ অব্দের ১লা জানুয়ারী ডুয়ানি পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগের আয়োজন স্থির রাখিয়াছিলেন; ইতিমধ্যে ২৭শে ডিসেম্বর তিনি গবর্ণর জেনারেল সার জন সোরের প্রাইভেট সেক্রেটরী কাপ্তেন কলিন্সের এক চিঠিদ্বারা গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হইতে অনুরুদ্ধ হন। ডুয়ানি নিজের কোন অপরাধের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না সুতরাং তিনি সানন্দ মনে কাপ্তান কলিন্সের আহ্বানকে তাঁহার ভারতবর্ষ ত্যাগ উপলক্ষে গবর্ণর জেনারেলের সহিত একত্র ভোজের নিমন্ত্রণ বলিয়া বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ডুয়ানিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত পাইয়া কাপ্তেন কলিন্স বলিলেন—আপনি ঠিক সময়ে আসিয়াছেন ইহাতে বড়ই সুখী হইলাম।

মিঃ ডুয়ানি—"আমিও সুখী হইলাম, আশা করি গবর্ণর জেনারেল কুশলেই আছেন।"

কাপ্তান কলিন্স—"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেনা এবং—

বিতর্কে যে আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার পথে গোলযোগ ঘটে। শেষ সেই করাসী রাজকর্ম্মচারীরই মধ্যস্থতায় সম্পাদক সে যাত্রা রক্ষা পান।

J. Malcolm's History of India.

† নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল :—

All observations respecting the public Revenues and finances of the country; all observations respecting the embarkations on board ship of stores or expeditions and their destination whether they belonged to the Company or to Europe; all statements of the probability of war or peace between the Company and the native Powers; all observations calculated to convey informations to the enemy and the republication of paragraphs from the European papers which might be likely to excite dissatisfaction or discontent in the Company's territories.

The Old Good Days &. Vol. I. P. 248 (old), 319 (new).

* "বেঙ্গল হরকরা" ১৮৬৪ অব্দের ১৮ই আগষ্ট হইতে "The Indian Daily News" এর সহিত মিলিত হইয়া যায়।

মিঃ ডুয়ানি—"আমি মনে করিয়াছিলাম—আমি তাঁহা দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছি।"

কাপ্তান—"হাঁ, তাই, আমি গবর্ণর জেনারেলের আদেশক্রমে আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি নিজকে এখন একজন কয়েদী বলিয়া বিবেচনা করুন।"

এই সময় কাপ্তানের ইঙ্গিতে এক দল সঙ্গিনধারী সিপাহি আসিয়া সাঙ্গন খুলিয়া ডুয়ানির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করতঃ দাঁড়াইল। ডুয়ানি খোলা দরজা দিয়া দেখিলেন গবর্ণর জেনারেল তাঁহার দুইজন পারিষদ সহ (Members of the Supreme Council) বসিয়া আছেন। ডুয়ানি বলিলেন, "যেরূপ কার্য্য করিলেন, আমার মনে হয় না, এরূপ নীচ ও অবিশ্বাসের কার্য্য স্থর জন সোর কিম্বা আপনি করিতে বা চিন্তা করিতে পারেন।"

কাপ্তেন—"চুপ করুন, মহাশয়। রক্ষিগণ, ইহাকে লইয়া যাও।"

তখন ডুয়ানি সৈনিক পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মৃদু ব্যবহার হউক, আমি নিজেই যাইতেছি।" তৎপর কাপ্তেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইহার পর কি শূল না ফাঁসি?"

কাপ্তেন—"বেয়াদব!" (সৈন্যগণের প্রতি) "লইয়া যাও ইহাকে।"

ডুয়ানি—"দেখিতেছি, কলিকাতা কনষ্টাণ্টিনোপোল হইয়া দাঁড়াইল।—স্থর জন সোর সুলতান, আর আপনি তাঁহার উজরের কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বর্ষা-সন্ধ্যা

সারাদিন বর্ষি' বারি থেমেছে সন্ধ্যায়,
ধূসর জলদ-দল অম্বরের গায়
এখনো রয়েছে লাগি ধূর্জ্জটি-জটায়
নিবিড় বেষ্টন হেন! তরু-লতিকার
বৃষ্টিধৌত পত্রশীর্ষে মুক্তাবিন্দু প্রায়
এখনো সলিল-কণা অপূর্ব্ব শোভায়
দুলিতেছে মৃদুতর,—কানন লক্ষ্মীর
আঁখি-কোণে অশ্রু হাসে! চঞ্চল সমীর
প্রশান্ত সুধীর এবে; দ্রুত নৈশরাণী
নেমে আসে ধরাবক্ষে ত্রস্ত-করে টানি'
অসিত-গুণ্ঠনখানি, বিধবার মত
বিষাদ-মলিনা আজি! পঙ্কভরা পথ
গোখুর-আঘাত-চিহ্ন করিয়া ধারণ
পথিকের ভীতি শুধু করে উৎপাদন!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

মুসলমান ঐতিহাসিক। (৬)

[ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনের দ্বিতীয়খণ্ডে ১৩১৯ সালের বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্র পর্য্যন্ত ৫ মাসে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের সম্বন্ধে ৫টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বৈশাখে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সম্বন্ধে ভূমিকা, জ্যৈষ্ঠে ফেরিস্তার জীবনী, আষাঢ়ে ফৈজীর কথা, শ্রাবণে বদাউনীর বিষয় ও ভাদ্রে আবুল-ফজল সম্বন্ধে আলোচনা করি। উক্ত ভূমিকায় অসংখ্য মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সুবিখ্যাত দ্বাদশজনের বিষয় আলোচনা করিব বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ঐ বৎসর ৪ জনের মাত্র বিবরণী প্রকাশিত হয়। নানাবিধ অপরিহার্য্য কার্য্যে লিপ্ত থাকায় অবশিষ্ট আটজনের কথা সম্মিলনে প্রকাশিত করিতে পারি নাই। পুনরায় সেই আটজনের কথা লিখিব, ইচ্ছা করিয়াছি। ঐ আটজনের নাম:—(১) আল্‌বিরুণী, (২) মীনহাজ-উস্ সিরাজ, (৩) আমীর খসরু, (৪) মীর্জা হাইদর, (৫) নিজামুদ্দিন বক্সী, (৬) ইনায়েৎ খাঁ, (৭) মহম্মদ হাকিম কাফি খাঁ ও (৮) সৈয়দ মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন খাঁ, তন্মধ্যে গোলাম হোসেনের কথাই সর্ব্ব প্রথম আরম্ভ করিলাম। এ সম্বন্ধে কতক তথ্য পূর্ব্বে "ভারতী" ও "ঐতিহাসিক চিত্রে" প্রকা-

শিত হইয়াছিল। তাহাই পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত আকারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে অঙ্গীভূত হইল। গোলাম হোসেন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে:— (ক) মুতাক্ষরীণ সম্বন্ধে সাধারণ কথা, (খ) উহার ইংরাজী অনুবাদক হাজি মুস্তাফার পরিচয় (গ) মুতাক্ষরীণের মত বিরাট পুস্তক হইতে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সম্বন্ধে যাহাকিছু তথ্য জানা যায়। এই তিন অংশ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইতে পারিবে।— শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র]।

(ক) সৈয়র মুতাক্ষরীণ।

"সৈয়র মুতাক্ষরীণ" নামক পারস্য গ্রন্থ ভারতবর্ষের খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি সুশিক্ষিত ও প্রমাণিত ইতিহাস। ইহার সরল ও সতেজ ভাষা, সূক্ষ্ম তথ্যানুসন্ধান এবং অকুণ্ঠিত সমালোচনা ইহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। মিল, ইলিয়ট, ব্রীগস্ ষ্টুয়ার্ট ও মেকলে প্রভৃতি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এই পুস্তক হইতে স্বীয় স্বীয় ইতিহাসের জন্য প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে "সৈয়র মুতাক্ষরীণের" গ্রন্থকার সৈয়র গোলাম হোসেন খাঁর আসন অতি উচ্চ।

এই গ্রন্থে খৃষ্টীয় ১৭০৭ হইতে ১৭৮৩ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল হইতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালের শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অধিকাংশ ঘটনা সুন্দর ও সুবিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই যুগ নানাবিধ রহস্য ও সমস্যাময় ঘটনায় পূর্ণ; এই যুগে সমগ্র ভারতে যে ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, যে বিপ্লবে ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত হইয়াছে, অন্য কোন যুগের ঘটনাবলীর সহিত তাহা তুলনীয় নহে। এই যুগেই এদেশে ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, ইংরেজ জাতির গৌরব প্রাচ্যভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু, তাঁহার বংশধরগণের অকর্ম্মণ্যতা, মারহাট্টা জাতির অভ্যুদয়, নাদির ও আহম্মদ শাহের প্রবল আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়। গৃহবিবাদে মারহাট্টা সম্প্রদায়ের পতন হইতে থাকে; অবশেষে আহম্মদ শাহের উপর্য্যুপরি ভীষণ আক্রমণের পর পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারহাট্টা বীর্য্য অস্তমিত হয় (১৭৬১)। তখন নবাগত ইংরাজ ও ফরাসী উপনিবেশিকদিগের মধ্যে ভারতক্ষেত্রে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা লইয়া তুমুল বিবাদ চলিতেছিল; এমন সময়ে আরকট ও বন্দীবাসের যুদ্ধক্রীড়ায় ফরাসী গৌরব বিলুপ্ত হওয়াতে ইংরাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মোগল ও মারহাট্টার পতনে, পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধফলে এবং সর্ব্বোপরি ইংরাজ সৈনিকের অদম্য সাহস ও অসম সহিষ্ণুতায় সেই প্রাধান্য ভারতক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারত পরিত্যাগের প্রাক্কালে ইংরাজবিজয়ের রক্ত-রঙ্গে ভারতবর্ষের মানচিত্রের বহুস্থান সুরঞ্জিত হইয়াছিল। সৈয়র মুতাক্ষরীণে এই যুগের বহু ঘটনার প্রামাণিক ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শেষ সাতজন মোগল বাদশাহের রাজত্বকাল, বাঙ্গালা দেশে আলিবর্দ্দী ও সিরাজউদ্দৌলার নবাবী আমল, অযোধ্যায় নবাব সুজাউদ্দৌলা ও আসফ উদ্দৌলার শাসনকাল এবং বঙ্গবিভাগে ইংরাজগণের যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক অভিযান—এইসকল বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু এই সকল রাজত্ব বা প্রভুত্বের বর্ণনা অপেক্ষা এই পুস্তকে ভারতবর্ষের ও বাঙ্গালা দেশের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠ করিলে, দেশের ও দশের অবস্থার যে সুন্দর ও সজীব আভাস পাওয়া যায়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই গ্রন্থে যে ভাবে নবাব সরকারের অসংখ্য নিগূঢ় রহস্য সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, নবাবগণের নিভৃত অন্দর মহলের উন্মুক্ত জীবন্ত চিত্র যেরূপ ভাবে লোকলোচনের পথবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে, তাহাতে পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। যেখানে নির্ভিক লেখকের তীব্র সমালোচনায় কোন নৃপতি বা ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যেখানে সুনিপুণ ঐতিহাসিকের সূক্ষ্মানুসন্ধানে অনেক দুর্ব্বোধ্য ঐতিহাসিক

সত্য সরল ও সতেজ ভাবে প্রতিকৃত হইয়াছে, যেখানে উন্নতমনা লেখকের সরল ও সহৃদয় বর্ণনায় উচ্চভাব ও উচ্চভাষার সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে সে সকল স্থান পড়িতে পড়িতে বিস্মিত ও বিমোহিত না হইয়া পারা যায় না। যে স্থানে গ্রন্থকার বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে ইংরাজগণের রাজ্যশাসন প্রণালীর সুবিস্তৃত সমালোচনা করিতে গিয়া, একে একে দ্বাদশটি কারণ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ইংরাজশাসনের অবিচার, অত্যাচার ও প্রকৃত কার্য্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে প্রদত্ত বিবরণীর সম্পূর্ণ প্রামাণিকতার না হউক, গ্রন্থকারের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

এই পুস্তকে দেখি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে লোকের অবস্থা কিরূপ হীন হইতেছিল; আর যদি বর্ত্তমান সময়ের সহিত তৎকালীন সমগ্র বঙ্গবিহারের সাধারণ প্রজার অবস্থা তুলনা করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের অপেক্ষা কত সমৃদ্ধ ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারি। মুসলমান শাসকেরা বিশৃঙ্খলভাবে রাজস্ব আদায় করিয়াও তখন যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, বর্ত্তমান সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সুনিপুণ ও সুপরিচালিত বিরাট-শাসন প্রণালী দ্বারাও তাহার শতাংশের একাংশ রাজস্ব আদায় হয় না। এক্ষণে যেরূপ সোরা, লবণ, গাঁজা, আফিঙ, ডাকবিভাগ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি পন্থা হইতে গবর্ণমেন্টের অর্থ ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, তখন কিন্তু এ সকল বিষয় হতে এক কপর্দ্দক ও সংগৃহীত হইত না। তবে তখন জমির উৎপাদিকা শক্তি, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ, অর্থাগমের সুবিধা বঙ্গদেশে ধনাধিক্য এত ছিল যে, লোকে স্বল্পায়াসে স্বল্প আয় করিয়া, তাহারা বহুবিলাসে, সমৃদ্ধভাবে ও পরমসুখে জীবন যাপন করিত। রাজায় রাজায় বিবাদ, বিদ্রোহীর বিদ্রোহ ও নানাদেশে সৈন্য পরিচালনা প্রভৃতি অপ্রীতিকর ব্যাপার নিত্য সংঘটিত হইলেও, সে সব ব্যাপারে প্রজাকুলের ব্যাকুল হইবার আবশ্যক ছিল না, বা তদ্দ্বারা তাহাদের শান্তি বা বিলাস ভঙ্গ করিত না। রাজধানীর উন্মুক্ত সমুদ্রে বিদ্রোহপবনে যে প্রচণ্ড সমরতরঙ্গ সমুত্থিত করিত, নিভৃতপল্লীর দূর প্রান্তে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই তাহার ক্ষীণরেখা শান্ত সলিলের সমতলে বিলীন হইয়া যাইত। সৈয়র মুতাক্ষরীণের পত্রে পত্রে এই সকল বিষয় পাঠ করিলে, মনে মনে যে হর্ষ হয়, তাহাতে গ্রন্থকারের সামান্য দুই একটি দোষ ঢাকিয়া ফেলে এবং তাঁহার প্রতি আমাদের যুগপৎ ভক্তির প্রীতির সমুদ্রেক করিয়া দেয়। অসংখ্য অসংযোজ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া বিরাট ঐতিহাসিক পুস্তক প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকারকে কত কষ্ট ও কত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহাও আমাদের বিবেচনার বিষয়ীভূত না হইয়া পারে না।

সৈয়র মুতাক্ষরীণের গ্রন্থ কর্ত্তার নাম মীর গোলামহোসেন খাঁ। তিনি "সৈয়দ" বংশীয়। মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের বংশধরগণ "সৈয়দ" নামে পরিচিত হইয়া মুসলমান জগতে কিরূপ সম্মানিত হন, বঙ্গদেশে তাহা অবিদিত নাই। গোলামহোসেন উচ্চবংশসম্ভূত ও সুশিক্ষিত। বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহার সংস্রব থাকিলেও তাহার জীবন প্রধানতঃ সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। রাজকার্য্য সম্পর্কে তিনি মীর বা সেনাপতি উপাধি লাভ করেন বটে, কিন্তু তরবারি অপেক্ষা লেখনী পরিচালনাতেই তাহার অধিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং সেই সময়ের ঘটনাবলিই প্রধানতঃ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সৈয়র মুতাক্ষরীণ (View of Modern times) বা "আধুনিক সময়ের চিত্র" নামক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যে সকল ঘটনায় বিস্তৃত বিবরণ মুতাক্ষরীণে স্থান পাইয়াছে, তাহার অধিকাংশই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, কতকগুলি ঘটনায় নিজেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অবশিষ্ট তথ্য স্বীয় আত্মীয় বা বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। পুস্তকের দুই একস্থলে মাত্র কোন কোন পারস্য গ্রন্থের বা বৈদেশিক গ্রন্থোক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পারস্য গ্রন্থগুলি নিজে পড়িয়াছেন, বৈদেশিক প্রসঙ্গসকল ইংরাজ বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। বিবৃত ঘটনাবলীতে সর্ব্বত্র সত্যতার

সুন্দর প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই জন্যই মুতাক্ষরীণ পাশ্চাত্যজগতে অত্যধিক আদরণীয় হইয়াছে।

গোলামহোসেন তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বস্থলেই একজন ধীর, সুবিজ্ঞ, সরল ও সুনিপুণ ঐতিহাসিকরূপে পরিচিত হন। সাধারণতঃ এতদ্দেশীয় প্রাচীন ঐতিহাসিকের ভাষা যেরূপ রূপক ও কল্পনাময় হয়, গোলাম হোসেনের ভাষা সেরূপ নহে। তাহার ভাষা অধিকাংশস্থলেই সহজ, প্রাঞ্জল ও আড়ম্বরশূন্য। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও কথায় সত্যতা ও স্বদেশভক্তির সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতঘটনাবলী নিরপেক্ষ এবং অনতিরঞ্জিত ভাষায় প্রতিকৃত করাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য; মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে আমরা গোলামহোসেনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখি।* তিনি ঘটনা সকল যেরূপ দেখিয়াছেন বা জানিয়াছেন, অবিকল সেইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক স্থলেই তিনি নিজে অবিচলিত হইয়া, নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা স্বীয় গ্রন্থের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহা মুসলমান লেখকের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। এজাতীয় ইতিহাস ইয়োরোপেও যে ধরণে লিখিত হয়, মুতাক্ষরীণও সেই ধরণে লিখিত। ইয়োরোপীয় কোন ঐতিহাসিক তিনি যতই বিখ্যাত হউন না কেন, মুতাক্ষরীণের গ্রন্থকার হইলেও তাঁহার লজ্জিত হইবার কোন কারণ ছিল না।* কেহ কেহ বলেন গোলামহোসেন তেজস্বী লেখক হইলেও সময় বুঝিয়া লেখনী সংযত করিয়াছিলেন। ওয়ারেণহেষ্টিংসের সহিত তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল; যাহার কূটকৌশলে ও কঠোর শাসনে উদীয়মান বৃটিশ প্রভুত্ব এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, তাহার কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলে সৎসাহসের পরিচয় দেওয়া হইত কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয় বটে; কিন্তু জীবিত কালের ইতিহাস রচনা সব সময়েই ভ্রমসঙ্কুল ও সমস্যাপূর্ণ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তাহার স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে অনেকেই তাহার কার্য্যপ্রণালী সেরূপ চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। অবস্থা বুঝিয়া এবং আত্মরক্ষার জন্য গোলামহোসেন যদি বন্ধুর দোষোদ্ঘাটন না করিয়া থাকেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে নিতান্ত দোষী মনে করা যায় না। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক পাশ্চাত্য তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত মুসলমান ঐতিহাসিকের বিস্তীর্ণ পুস্তকে কোনদোষ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন, তাহাহইলে গ্রন্থকারের দেশ, কাল, পাত্র ও বিদ্যাবত্তা এবং ঘটনা সংগ্রহের সুবিধা বা অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করিয়া সে সকল বিস্মৃত হইতে পারেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

* এসম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই :—It is the faithful historian's duty to bring to light whatever he knows with certitude. I shall take the liberty to assemble such events as are come to my knowledge and to speak of them precisely as they have happened, without being biased by either envy or love, and without flattering either side or party. * * * They (my readers) shall overlook all the blemishes of this history in favour of its sincerity and exactitude."

Seir Mutaqharin, Vol. 1 p. 16

* "It is written in the style of private memoirs in the most useful and engaging shape which history can assume, nor, excepting in the peculiarities which belong to the Mahomedan character and creed, do we perceive throughout its pages any inferiority to the historical memoirs of Europe. The Duc de Sully, Lord Clarendon or Bishop Burnet need not have been ashamed to be the author of such a production."

GENERAL JOHN BRIGGS

সমশের গাজীর পুঁথি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"সেক মনোহরে কহে সন্তাপে কি পায়।*
যার যে নিবন্ধ ফল করে বিধাতায়॥
এই রূপে ছয়মাস দহিয়া দহিয়া।
ভ্রাতৃ শোকে গেল ধনি দুনিয়া ছাড়িয়া॥"

গাজীর লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল। শোকসন্তপ্ত গাজী বাছির লস্কর ও মণু খাঁ সরকারের † চেষ্টায় নেজামপুর কাটঘরের জমিদার দানিয়াল মহাম্মদের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পণ দশ সহস্র টাকা।

"আষাঢ় মাসের চাঁদ রজ্জব আছিল।
পোনর তারিখ তান বিবাহ হইল॥"

এই বিবাহে এত 'জুলুষ' হইয়াছিল যে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"ঝলকে পতাকা দণ্ড বিদ্যুৎ সঞ্চারে।
বাঙ্গালাতে হেন রঙ্গ কেহ নাহি করে॥"

দানিয়াল মহাম্মদের প্রথমা কন্যাকে সফি মহাম্মদ বিবাহ করেন। তাহার নিবাস কোথায় ছিল গ্রন্থমধ্যে এ প্রসঙ্গ কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইনি দানিয়ালের নিজ পরিবারস্থ কেহ হইবেন; ভ্রাতৃপুত্র হওয়াও বিচিত্র নহে। এই জন্যই বোধ করি তাহার কোন বিশেষ পরিচয় প্রদান করা হয় নাই।

"দনিয়াল মহাম্মদের দুই কন্যা ছিল।
এক রাত্রে দুইজনে পরহস্তে দিল॥
মহাম্মদ সফি সঙ্গে বড় কন্যা দিল।
ছোট কন্যা গাজী বরে অর্পন করিল॥"

ইহার কিছুকাল পর গাজী শিকার করিতে গিয়া জয়পুর বন্দিয়া নিবাসী মণু খাঁ সরকারের এক বিবাহিতা যুবতী সুন্দরী কন্যাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনে। এই কন্যাকে মীরেশ্বরী কোন কুলীন জামাতার নিকট বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

"পঞ্চসখি মিলি তারা পুকুরের ধারে।
গিয়াছিল সেই দিন স্নান করিবারে॥
নুতন বয়সি বামা জলে যেন উড়ে।
দেখিয়া গাজীর চিত্ত ধরাইতে নারে॥"

"গজ মোটাইয়া গাজী তুলি নিল ধনি।
রাজপথে ভেক ধরি যেন নিল ফণি॥"

মণু সরকারের কন্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়া গাজী বিবির নিকট (মধ্যমা স্ত্রী) হাজির করিল।

"আসিতে স্বীকার (শিকার) করে পথে দৈবগতি।
পাইলাম রত্ন এক সুন্দরী যুবতী॥
যদি কৃপা কর মোরে হয় মম কাজ।
দেশাচার আছে ইহা নাহি ইথে লাজ॥"

বিবি গাজীর আরজী মঞ্জুর করিল এবং বলিল—

কিন্তু হিন্দু সুতা ধনি তুমি মুসলমান।
কালেমা পরাই তারে আনাও ইমান॥
পূর্ব্ব স্বামী বশ কর আল্লা হবে রাজী।
তাহার পিতারে আনি রাজি কর গাজী॥
এমনি রাখিল কন্যা করিয়া যতন।
হারামী করিতে গাজী না পারে যেমন॥"

গাজী অতঃপর মণু সরকার ও তাহার জামাতাকে

* আমরা গ্রন্থ মধ্যে এই একটী ছাড়া গ্রন্থকারের কোন ভনিতা পাই নাই। সেখ মনোহর গাজীর একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

† মণু খাঁ সরকার সেক মনোহর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহাও একবার দেখান হইয়াছে। তিনিও গাজীর সচীবগণের মধ্যে একজন। তিনি হিন্দু ছিলেন, গাজীর অত্যাচারে কন্যার জন্য জাতিচ্যুত হইয়া কি প্রকারে মুসলমান হন, তাহা আমরা কয়েক ছত্র পরেই দেখিতে পাইব। এই জন্যই গ্রন্থকার প্রথমতঃ তাহার নামের পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে 'হিন্দু' কথাটী যোগ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে তাহার নামের সহিত খাঁ শব্দটী যোগ করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি, কোন হিন্দু মুসলমান হইলে তাহার মুসলমান নামের সহিত খাঁ যোগ করিয়া দেওয়া হয়। খাঁ শব্দটী সম্মান সূচক। "জয়পুরে ছিল হিন্দু মণু সরকার। কাছুরাম লস্কর করজন্দ যাহার।" তার পরেই তাহাকে "মণু খাঁ" লিখা হইয়াছে।

বশ করিয়া হিন্দু-কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব-স্বামীকে পুনঃরায়—

"বিবাহ করাই দিল ভুলুয়া নগরে।"

এই দুই স্ত্রীর গর্ভে ৪ কন্যা ও ১ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। মুসলমানী স্ত্রীর গর্ভে—

"মণু বিবি নামে কন্যা প্রথম হইল।
তণু বিবি (১) নামে অন্যা দুহিতা জন্মিল॥"

আর—"হিন্দুর নন্দিনী ঘরে হীরা আর জিরা।
দুই ঘরে চারি কন্যা অতিশয় ধীরা॥
তার শেষে নুরবক্স (১) চৌধুরী হইল।
এই চারি ফরজন্দ (২) গাজী ঔরসে জন্মিল॥"

গাজী অনেক দীঘি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিল। দক্ষিণশিক "বল্লভপুরে" গাজীর নিজবাড়ী ছিল। তাহা একবার বলা হইয়াছে। সেখানে—

"বাড়ীর সম্মুখে এক দীঘি দিলা যবে।
আপনা মাতার নামে উৎসর্গিলা তবে॥
খণ্ডলেতে এক দীঘি আটাই (৩) তীরে দিলা।
আপনা পিতার নামে উৎসর্গ করিলা॥"

তারপর গাজী এই পুরাতন বাড়ীর উত্তর দিকে এক নূতন বাড়ী (৪) নির্ম্মাণ করাইয়া সেই বাড়ীর সম্মুখেও পশ্চাতে দুইটী দীঘি খনিত করাইয়াছিল। (১) তাহা দুই স্ত্রীর নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। "নেজামপুরের" কাটাগঙ্গার (২) দক্ষিণে এক দীঘি মণু বিবির নামে খনিত হইয়াছিল। কৈয়ারা বাজারের দক্ষিণে এক বৃহৎ পুষ্করিণী দিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোলাম আলীর নামে খোদিত হইয়াছিল। এবং উক্ত কৈয়ারা গ্রামে "কৈয়ারা সাগর" (৩) নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া

রাস্তা ঘাট পোল আদি বান্ধাইলা।
পোস্তা দীঘি পুষ্করিণী মসজিদ দিলা॥
পোক্তা করাই গাজী কেলা তালা কাম।"

এই বাড়ীও দীঘি পুষ্করিণী ইত্যাদি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কিন্তু গৃহাদির কোন চিহ্ন নাই। ত্রিপুর রাজগণ গাজীর মৃত্যুর পর তাহাদের হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া গাজীর ভিটামাটী উচ্ছন্ন করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এজন্যই বোধ হয় গৃহাদির চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু স্থানটী ইষ্টকবহুল। এই বাড়ীর ভূমি পরিমান ৩।৪ দ্রোন হইবে। ইহার চতুর্দ্দিকে গড়খাতের চিহ্নাদি এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বেও এই গড়খাতের ভিতর নামিতে লোকে ভয় পাইত। লোকের বিশ্বাস ছিল, ইহার নীচে বহুতর অস্ত্র-শস্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত আছে। এই গড় বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থলে ধান জমিতে পরিণত হইয়াছে। গাজী পাকা ইমারত ও মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু ইহার কিছুই বিদ্যমান না থাকার কারণ যে রাজরোষ তাহা বলাই বাহুল্য। পুঁথির এক স্থানে "দোতাল্লা" (দোতালা) বাসভবনের কথাও পাইতেছি। এই বাড়ী সম্বন্ধে ও দীঘি পুষ্করিণী সম্বন্ধে যদি কোন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কোন প্রকার নূতন তথ্য প্রদান করিতে পারেন, তবে তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। আমরা সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। এই স্থানটী পদ্মাপুরাণের প্রসিদ্ধ চাঁদ-সওদাগরের বাড়ী "চম্পকনগরের" অতি নিকটবর্ত্তী। পশ্চাৎ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

লেখক।

(১) তণুবিবির বিশেষ সৌন্দর্য্য খ্যাতি ছিল বলিয়া মনে হয়। গাজীর ঢাকাস্থ মোক্তার ডোমন ও তাহিরের নিকট নবাব তণু-বিবির রূপমাধুরীর কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য গাজীর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান।

"গাজী বাহাদুর শুনি হৈল হর্ষমতি।
পাঠাল দুহিতা বড় সুন্দরী শ্রীমতি॥"

ঢাকার নবাব তাহাকে বিবাহ করেন এবং

"গাজীর লাগিয়া বহু তঙ্কা পাঠাইলা।"

(১) গাজীর একমাত্র পুত্র। (২) ফরজন্দ—পুত্র, বংশধর। (৩) আটাই খণ্ডল পরগণা মধ্যে একটী পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদী বিশেষ। (৪) গাজী তাহার নব নির্ম্মিত বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কালের ডাক পাইয়াছিল।

"বাড়ীর উত্তরে নব বাড়ী পরিমান।
জঙ্গল কাটিয়া তবে করিল ময়দান॥
* *

(১) বাড়ীর দুই দিগে দুইটী দীর্ঘিকা; একটী পাকা সুরঙ্গদ্বারা একযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদ্বারা এক পুষ্করিণীর জলও অন্য পুষ্করিণীতে যাতায়াত করিতে পারিত। সুরঙ্গটী এখনও আছে। (২) মুহুরী নদীর বাঁকবিশেষ। (৩) কৈয়ারা গ্রামে এই দীঘি অদ্যাপি বিষ্ণুবক্ষঃস্থিত কৌস্তুভ মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও সুস্বাদু। সাধারণ

তাহাতে নিজ নাম সংযুক্ত করেন। তথায় বাজার বসাইয়া থানের কাছারী স্থাপন করেন। (৪)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমোহিনীমোহন দাস)

লোকের এরূপ ভক্তি বিশ্বাস যে ইহার জল পান করিলে নানা প্রকার দুরারোগ্য রোগও আরোগ্য হয়। এবং জল এত নির্ম্মল যে ১০। ১২ হাত দূর হইতে জলের তলদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দেশে একটী প্রবাদ আছে যে—

"জলের জন্য কৈয়ারা দীঘির মধ্যে জগন্নাথ (১)।
পাড়ের জন্য বিজয় সিংহ (২) পথের মধ্যে বড়হদ্ (৩)॥"

প্রসিদ্ধ। ইহার ভাবার্থ এইরূপ—

জলের পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং সুস্বাদুতার জন্য "কৈয়ারা সাগর", দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্যের বিস্তারের জন্য "জগন্নাথ দীঘি" পাড়ের উচ্চতার জন্য "বিজয় সিংহ দীঘি" এবং পথের দৈর্ঘ্যতার জন্য "বড়হদ্" অর্থাৎ বৃহৎ রাস্তা, বিখ্যাত। (৪) গাজীর স্থাপিত কৈয়ারা বাজার এখন বিদ্যমান আছে। এ, বি, আর, কাজিলপুর ষ্টেসন হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে গেলে তাহা দৃষ্টিগোচর হইবে।

(১) "জগন্নাথ দীঘি" দৈর্ঘ্যে এক মাইল। ইহা ত্রিপুরাজ কল্যাণ মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র ঠাকুর জগন্নাথ নামক মহাত্মার খনিত। (২) "বিজয় সিংহ" দীঘি নোয়াখালী জেলায় বিদ্যমান। সম্ভবতঃ ইহা ভুলুয়া রাজ্যের কোন নরপতির অমরকীর্ত্তি। ইহার তীরে একটী পরিত্যক্তমানমন্দির রহিয়াছে। ইহার বিশেষ অনুসন্ধানের ইচ্ছা রহিল। যদি কোন মহাত্মা ইহার কোন বিশেষ তথ্য প্রদান করিতে পারেন তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। (৩) "বড়হদ্"=বড় রাস্তা=দীর্ঘপথ। ত্রিপুরা পর্ব্বতের পাদমূল হইতে আরম্ভ হইয়া সুর্ণপুর, বরদাখ্যাত পরগণার মধ্য দিয়া বারানসী পর্য্যন্ত যে পথ চলিয়া গিয়াছে তাহারি নাম "বড়হদ্"। ইহা এতদ্দেশে "পোড়া রাজার জাঙ্গাল" নামে খ্যাত; কিন্তু বরদাখ্যাত পরগণার মধ্যে ইহা অদ্যাপি "হদ্" নামে প্রসিদ্ধ। এতদঞ্চলে ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ পথ অতি বিরল। প্রাচীন-কালে ত ছিলই না। "হদে হদে যাও" এই কথাটিই "হদ্" শব্দের "পথ" অর্থ পরিস্ফুট করিতেছে। দুঃখের বিষয় অনেকেই এই হদের পার্শ্ববর্ত্তী খালটীকে হদ্ বলিয়া ভুল করিয়া থাকে।

শোক-সংবাদ।

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বজনপ্রিয় কবি, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ উপাসক কুলচন্দ্র দে আর ইহজগতে নাই। কলিকাতা নগরীতে জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। "সম্মিলনের" পাঠকবর্গের নিকট কবি কুলচন্দ্রের পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার এই আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের—বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের—যথেষ্ট ক্ষতি হইল। কুলচন্দ্র মানভূম ঘাটশিলায় পুলিশ সব্-ইন্সপেক্টারের কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার পুত্র, উদীয়মান চিত্রশিল্পী শ্রীমান মুকুলচন্দ্র দে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। আমরা আশাকরি মুকুলচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেবের কবিতাগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। এই নিদারুণ শোকে আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. J. Donald, I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, M.A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
Mr. J. G. Cumming, C. S. I.
Mr. F. C. French I.C.S.
Mr. W. A. Seaton I. C. S.
Mr. R. B. Hughes-Buller, C.I.E., I.C.S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini KantaBannerji Bahadur, M.A
„ Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M. A.
„ W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
„ T. T. Williams M. A., B. Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M. A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Shushung.
The „ Maharaja Bahadur of Nashipur.

The Hon. Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
„ Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
„ Radha Kamal Mukerji, M.A.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra
„ Jagadananda Roy.
„ Binoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

সূচীপত্র।

The Hon'ble Sir Satyendra Prasanna Sinha, Kt.

A WELCOME

To His Excellency

THE RIGHT HONOURABLE JOHN LUMLEY DUNDAS, EARL OF RONALDSHAY, G. C. I. E.,

Governor of Bengal.

I.

Welcome, My Lord, to this historic town
Whose sun of glory, tho' for ever set,
Has not made her forget her duty yet,
The duty that she owes to England's Crown.

II.

Great is the sacrifice that you have made
In coming over to this distant land
Of sun and rain, where, by the bounteous hand
Of God, you will, my Lord, be richly paid.

III.

Sweet will your welcome be Lord Ronaldshay,
Tho' all within is dark, as dark as night,
And all looks desolate for want of light,
The light you will supply throughout your stay.

IV.

You have come here, My Lord, with us to dwell,
And tho' the work is hard that you will do,
Much harder than that done at Waterloo,
Yet are we confident you'll do it well.

V.

And tho' I'm not a prophet, I can say
You'll earn, My Lord, an everlasting fame
That will immortalise your noble name,
And all will say 'Long live Lord Ronaldshay.'

DACCA,
The 5th July, 1917.

BAHAR-UD-DIN AHMAD.

Sreenath Press, Dacca.
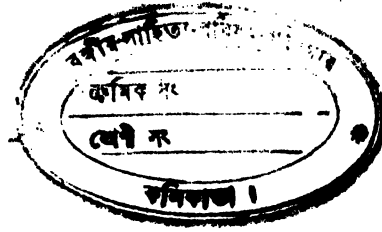
THE DACCA REVIEW.

Vol. VII.	JUNE, 1917.	No. 3.

ASTRONOMY OF THE HINDU ALMANAC. *

The subject of my discourse is so vast in importance to the Hindu, so complicated in detail, and so hoary in antiquity that I am afraid I have to content myself with giving the barest outline. For, a Hindu almanac is a history of Hindu astronomy in a nutshell. It is indispensable to us. It guides the daily routine of sacred duties of two hundred millions of our countrymen. Its importance will be evident when we remember that it embodies to a large extent the connotation of the term, Hindu. For, one is a Hindu not because he professes a certain religion as the word is understood in the West; but because his life is regulated by a set of rules which often elude definition. It is not *vichara* or exercise of the intellect which distinguishes a Hindu from a non-Hindu so much as *achara* or the practice of life leading to ethical and spiritual development.

The rules require the determination of proper time for the proper performance of the duties enjoined by Hindu sages. Bhaskaracharya has well described the place of astronomy in Hindu sacred literature. He says that "the Vedas enjoin sacrificial rites; these are to be performed at proper times. Astronomy determines time. Hence it is the eye of the Vedas."

But, do not the Sastras tell us that Time ('Kala') is infinite, without a beginning, middle, or end? "Yes," replies the Hindu astronomer. "Time destroys worlds. But there is another time. Since it is a fraction ('Kala') of the infinite time, it is also called time. The sun by his motion determines the day and night, the equinoxes, the solstices, and the beginning of every solar month. He measures the year. So do the moon, the stars, and Jupiter."

* Substance of a lecture delivered at the Rammohun Library, Calcutta. Feb. 1916.

A calendar is thus discernible in the Rig-Veda, the earliest book extant in the world. Unfortunately, the book has not been studied for the purpose of astronomical history with that care which it deserves. Suffice it to say that the Vedic Rishis had a calendar. For it may be taken to be coeval with the earliest civilisation of every race. It is therefore impossible to trace the origin of any of the simple astronomical facts on which the ancient calendar was based.

We may, however, imagine how astronomical knowledge grew in ancient times. Let us, therefore, forget for a moment that we are living in this year of grace nineteen hundred and sixteen, and imagine ourselves transported back to a very remote age, sixty seventy centuries ago. Let us imagine ourselves born and brought up in a simple society in a fine country far away from the hot and humid plains of Bengal, in a country situated in the north temperate zone with a clear blue sky above, and a broad expanse of land some four or five thousand feet above sea-level. The horizon is well defined all round; the sun is seen most days, and the rains, autumn and winter occur in regular succession. The moon never appears dull; the stars are never dim, except on the few days when the rain clouds envelope the sky. The atmosphere is free from haze even in summer; it is so clear and dry that the stars cast shadows of trees in the darkest nights. They look so bright, yet are motionless, like the dead eyes of departed souls. They are the abodes of gods. So are those that move among them. What a glorious sky under which the Rishis of yore laid the foundation of astronomy! There were 'nakshatra-darsa's,—observers of stars in the vedic times. There were 'Kalajna's—computers of time, and there was a 'Nakshatra-vidya (a vedic word), or science of Astronomy. We need not therefore ask in wonder, were the planets known? It is difficult to point to difinite verses in the Vedas in which the planets can be distinguished from the Devas or gods. In the Rigveda, however, there is distinct mention of the planet Jupiter ('Brihaspati'). We read, *Brihaspatih prathamam jayamano mahojyotishah parame vyoman.* "Brihaspati was born first in the highest region of the extensive sky." A passage in the Taittiriya Brahmana, first brought to notice by Mrs. Ketkar of Bombay removes any possible doubt as to Brihaspati being Jupiter. It is, *Brihaspatih prathamam jayamano tishyam nakshatra-mabhisamvabhuva.* "Brihaspati was first born. He was born in tishya nakshatra." 'Tishya' is the old name of 'Pushya,' the group of stars containing the Præsepe of the Greeks. If Jupiter happens to be there among the stars its slow separation from them cannot but excite wonder. Such an event happened and once only, some-

forty centuries before Christ, and became famous in the Purans.

The sun marked the 'savana' day, the day for sacrifice. The moon measured the month consisting of nights, the 'tithis.' We still count days by nights, and the importance of this reckoning is evident in every Hindu almanac. As the observation of the passage of the moon in the sky continued, the stars became familiar objects. There are groups of stars; and those which mark the path of the moon were given names. Thus we have the name 'Krittika,' the Pleides consisting of seven stars visible to the naked eye: 'Rohini,' the Hyades in the form of a triangle, and so on. But the 'nakshatra's or the constellations are not situated at equal distances along the path of the moon, scientific astronomy demanded equal divisions. Further, the path of the moon, is not invariable like that of the sun. The ecliptic or the sun's path was therefore divided mathematically into twenty-seven equal parts, the number of nights the moon takes to start from one and return to it. The term nakshatra now denoted 13⅓ degrees of the ecliptic. The twenty-seven divisions were named after the nakshatras situated close by, and that in which the moon happens to remain in any day was briefly called the nakshatra of the day. Similarly the word, tithi, which at first denoted a day commencing with sunset came to have an artificial meaning and measured the time the moon takes to separate from the sun by 12 degrees after conjunction.*

Like the moon the sun also moves from west to east among the stars. For the nakshatra which rises in the eastern horizon when the sun sets, or is seen in the west after sun-set seems to approach the sun day by day. The same nakshatra rises or sets with the setting and rising of the sun after the lapse of 366 days. In this period the rains and severe winter occur once, and no more. The seasons mark the annual course of the sun, during which the moon appears full twelve times. The Rishis came to count twelve "months" in the year. These had names such as 'madhu' and 'madhava,' the spring months, 'sukra and 'suchi' the summer months. They were also named after the nakshatra in which the moon happened to be full. Thus the name, 'Chaitra,' is the month of the full moon in the nakshatra, 'Chitra', and so on. These names are therefore of the lunar month. In recent times they have come to denote solar months as well in Bengal.

The day, and even the dawn which must have been long where the Rishis lived used to be divided into many parts. They had therefore some means of measuring the parts. They observed that at the beginning of the sun's turning

* For details and many topics dealt herein the reader is referred to "the Days of the Hindu Calendar" in the July number of this Review, 1916.

to the south the days are longest and nights shortest, and the opposite is the case when the sun turns to the north. In the middle of each of the two courses of the sun lies 'Vishuva', the equinox, when the day and night are of equal duration.

When the length of the year was made out, it was found that in the period of the seasons there happen twelve Full or New moons, and twelve days remain over. The adjustment of the lunar and solar calendar was always a perplexing problem in every country, and we can imagine it was not less so with the Rishis. But the year is 'Prajapati', presiding over creation and producing harvest in the proper seasons. The seasons are *rita*, periodical and right, never failing to appear in regular order. The lunar months were therefore subordinated to the year whose beginning could not be altered. It is, however, obvious that if we measure the year by lunar months we have occasionally to count thirteen such months in the year. This thirteenth month then becomes additive. On the other hand if we divide the year into twelve solar months, the thirteenth lunar month becomes excessive and must be ignored. In the Vedas there is mention of this thirteenth month, which like a robber ('malimlucha') disturbs the even counting of the months. I believe the Rishis counted twelve months which must therefore have been solar, and regarded the excess month as sinful. In five years or sixty solar months there are thus sixty-two lunar months. The two excess months were ignored, and at the beginning of every fifth year the sun and moon began their courses together. The cycle of the five years was therefore called a 'Yuga', *i. e.* the yoke to which the sun and moon are fastened together.

The division of the ecliptic into equal parts implies a tremendous advance in astronomy. Herein was laid the foundation of Hindu astronomy which gradually became more and more accurate with the accession of fresh measurements. We have no means of knowing when the sidereal zodiac was invented. In the Taittiriya Samhita (Jayur veda) the names of the nakshatras are given, Krittika heading the list. The seven stars of the Pleiades were not only named but worshipped in the Taittiriya Brahmana. For various reasons it is admitted that Krittika was the first of the series, because the vernal eyninox happened in it. We know that it occurred in the Pleiades about 2500 B. C. Therefore a sidereal system has been in use since this remote antiquity, if not still earlier times. The division of the ecliptic into twelve equal parts appears to be of equal age.

The early history of the Hindu calendar must have been one of natural evolution of astronomical knowledge, and was probably what I have sketched above. Certain Sanskrit tracts purporting to have been the Vedic calendar

have been found. They are not wholly intelligible. It is, however, just possible to obtain a general idea of the calendar. It is to be noted that the name of the tracts is not 'Jyotisha' (astronomy) but 'Kalajnanam', a calendar. It begins with mentioning the day, the seasons, solstices, months, and the five-year cycle. The cycle or yuga begins when the sun and moon come together *i. e.* at the beginning of the Dhanishtha nakshatra (the 21st from the Krittika). The sun begins his northerly course in the month of Magha and his southerly course in the month of Sravana at the middle of the Aslesha nakshatra (the 7th from the Krittika). The day then becomes too long by one 'prastha' of water, and the night short. And so on. There are rules for computing the tithi. and the Nakshatra of the sun and moon. In five years are counted 1830 Savana days, 1860 tithis, 1809 nakshatras, 62 lunar months, 60 solar months, 2 excess months, and 67 sidereal months.

It is seen that there is a mention of solar months, but not of 'Rasis, the signs of the solar zodiac. The ecliptic must have been counted. The sidereal zodiac was also there ; but it commenced with Dhanistha instead of Krittika of the earlier times. The day used to be divided into thirty equal parts, each being called a 'muhurta' ; each 'muhurta' into two 'Nalikas,' and so on. The elapsed portions of a day used to be measured by means of water-clocks.

These 'Kala-jnanams' were not astronomical treatises as some have supposed but they were short rules for computing the calendar. It appears that there was a long interval of time between the compilation of the Vedas and these tracts, during which the 'kalajnas' changed the earlier methods of reckoning divisions of time. Form the facts mentioned in the tracts relating to the sun's course we place them in the 14th century B. C., and find that the country at the time of their composition lay somewhere about Lat. 35°, say Kashmir.

How long the poet-vedic calendar based on the Kala-jnanams, usually known as the Vedanga Jyotisha, was current, we have no means of knowing now. It appears that the practical affairs of life did not countenance great miceties of calculation. For instance we find in the Artha-sastra of Kautilya (4th century B.C.) that the calendar in use was exceedingly simple. The day was divided into parts measured in terms of volumes of water. We read that fifteen days (and nights) make a 'paksha' (half a lunar month), two 'pakshas' a month (a lunar month), 30 days 'prakarma-masa' (a business month), 30½ days a solar month, 29½ days a lunar month, 27 days a sidereal month, 2 months a season, 3 seasons an 'ayana', 2 'ayana's a 'sambatsara' (a year), and 5 years a juga. In every 32 lunar months there is an excess month, the

demanded a simple calendar which could be understood followed and by every one. There was the reckoning of a business month consisting of 30 days. In the Rig-veda too, 360 days used to be counted in a year. In ordinary village life people still count 360 days, though our almanacs 5 days 6 hours and some minutes and seconds more. Similarly, we may be sure that the Kala-jnanams did not profess to be treatises of astronomy embodying the knowledge of the Hindus of the time. This is an aspect of the question which has not been appreciated. For instance the tracts do not refer to planets nor to eclipses. Yet the Hindus must have known the planets, and eclipses of the sun and moon were as frequent then as they are now. In the Rig-Veda itself there is a remarkable passage bearing on a solar eclipse. The sun is thus addressed. "When, O sun, the asura Svarbhanu covered you with darkness, and the people could not make out their places, and became bewildered, Atri by his fourth Brahma discovered you." Again, "when Asura Svarbhanu covered the sun with darkness, the sons of Atri recovered him, no other could." It is to be noted that the people felt be wildered, as they do now, but there was no panic. They we familiar with the phenomenon, and knew the cause to be darkness. But only the family of Atri knew how to determine the time of occurrence and duration of a solar eclipse. In the Purans the moon is 'adhimasa,' which falls in the middle of every third year.

The practical genius of the people described as born of the eyes of Atri." Possibly Atri discovered some cycle of eclipses like that of Saros, and the knowledge was handed down to his sons. In later times an eclipse was called a 'grahana,' meaning seizing, as if the sun and moon are seized, not by a Dragon as was fancifully described in the Purans, but by darkness, 'tamas.' The word, 'grahana' has been current in Bengal and many other parts of India; but even a rustic in Orissa calls it a 'paraga' from Sanskrit 'Uparaga,' which means covering or eclipsing.

The words, 'graha' and 'grahana' are the same in meaning; though in astronomy a 'graha' signifies a planet including the sun and moon. Some say that the planets are called 'graha's because they have motion, while others say because they exercise influence on natural objects including ourselves. I think both are right. The moon's nodes ('Rahu' and 'Ketu') are 'grahas' because they are moving, and not fixed. In the Maharya-Siddanta of the 10th cent A.D. the solstices have been styled 'ayana graha,' and a new term, 'saptarshi graha' has been invented to denote an imaginary line passing through 'Saptarshi,' the Great Bear, by means of which the backward motion of the solstices was expressed.

We may be sure astronomers were busy in building up their science. A

host of names has been handed down to us, but unfortunately their works are lost. Varaha (6th Cent. A. D.) of Ujyayini collected together five of these and wrote: "Having paid reverence to the Munis among whom Surya and Vasishtha are foremost, and to my father and teacher, I shall state, according to the opinions of *earlier teachers*, that correction of the planetary motion which is most excellent, easy, clear, and a wonderful mystery, and that subject which is the greatest mystery and which perplexes the writers of astronomical works, viz., the eclipses of the sun." Aryabhata of Patna, a contemporary of Varaha, concludes his work thus: "In former times the astronomy made known by Brahma from the Vedas was right. I am publishing the same in the name of Aryabhatiya." •Similarly, Brahmagupta of Rewa in the 7th Cent. A. D. begins his work thus: "Portions of the astronomy of the planets described by Brahma have been rendered barren by lapse of time. I am making the same clear and fruitful." From these repeated statements of famous astronomers it is plain that there had been complete systems of astronomy before they wrote their own. We do not know what these were like, but have no doubt as to the continuity of the knowledge first revealed in the Vedas. The successor followed the foot-steps of the earlier teachers, of whom Brahma was the first. In passing I may abserve that whenever in any Sanskrit work Brahma is mentioned as the originator of a Sastra, we may assume for certain that the Sastra is as old as the Vedas, hence co-eval with the origin of man. Brahma is the creator of the world, and therefore also of the Sastras. For, a world without a Sastra, without the necessary knowledge required by man to maintain himself is absurd. It is thus futile to trace the origin of the Sastras, as futile as to theorise on the will of the Creator. It is not likely that the missing links will be ever discovered. It is the fittest that survive even in the domain of knowledge. The astronomy of Brahma and other Munis merged into later works. Each successive generation depends upon its predecessor for facts and ideas to make an advance. Bhaskara of Bombay in the 12th cent. A. D. built his treatise upon the foundation laid by Brahmagupta, as much as Chandra Sekhara of Orissa did the other day upon those of Bhaskara. And so in Europe Kepler made a Newton possible, and Tycho Brahe and Copernicus, a Kepler.

As a consequence of the advance in astronomy certain changes were introduced into the calendar. Three were important. The year was made to begin with the vernal equinox, and the initial Nakshatra was consequently changed; the ecliptic was definitely divided into twelve parts, and the parts were given names; and the division of time into the week was introduced.

In the Vedic period the Nakshatras Mrigasira, and then Rohini marked the beginning of the sidereal zodiac. Then came Krittika. It appears to have long enjoyed the first place. The next nakshatra, Bharani, headed the list for an uncertain length of time. Reference to this is found in the Mahabharata. Then came Asvini in the 5th century, B. C. The changes became necessary on account of the precession of the equinoxes. But they were tremendous changes, involving as they did the shifting of the beginning of the year backwards, and the re-adjustment of calendar.

Connected with Asvini marking the vernal equinox was the introduction of the solar zodiac commencing with 'Mesha' or Aries. There was the sidereal zodiac, and no advantage was gained by an additional system. The latter was however, not a foreign innovation. We have seen that the year had already been divided into twelve solar months at least as early as the 14th century, B. C., and we suspect the months had been given names. The names, Mesha, Vrisha &c., for the divisions of the zodiac did not therefore imply a new conception, and I think it is this fact which led to their introduction. As regards the question of 'Lagna' (the point of the ecliptic where it is cut by the eastern horizon), it could be as easily solved with the Nakshatras as with the 'Rasis,' the signs of the solar zodiac. Not merely this, the determination of 'Lagna would have been more accurate with 27 divisions than with 12. The introduction of the names, Mesha, Vrisha, &c., could not have been much earlier than the 5th century, B. C., and the country where the conception of the twelve signs arose might have been the Indus-Ganges plains as well as the Tigris-Euphrates. It is to be further remembered that the India of ancient times was not as isolated as it is now, but extended far towards the west, and that there was free intercourse by sea and land between India and the countries beyond, the country of of the Yavanas. A vast amount of astrological lore came from the West and swelled the stock already existing, and I believe the Rasis were introduced in connection with horoscopy, in which 'Lagna' plays an important part.

The origin of the division of time into the week is equally involved in mystery. But it is certain that it was astrological, and based on a belief in the influence of the planets on the hours of the day. The day and night are divided into twenty-four equal parts, called 'horas,' the same as hours; and there is a vast literature in Sanskrit in the name of Hora-tantra, the science of horoscopy, in which the opinion of Yavana professors occupies a prominent place, not that the ancient Indo-Aryans did not believe in the maleficent or beneficent influence of the Nakshatras and planets. In the Vedanga-Jyotisha

of the Rig-Veda there are found indications of such beliefs, but more copiously in that of the Atharva-Veda, a Veda not recognised as an authority in ancient times. But I maintain that the small stock was enormously increased by contact with the Yavanas, who were praised for their knowledge of astrology by Garga, himself an astrologer; and our forefathers have bequeathed to us a legacy which even the true follower will find too extensive to maintain We can well understand the reason why Manu and Vyasa looking to the well-being of the Aryan community denounced 'Nakshatra-suchakas' who pretended to predict evil times from particular aspects of the heavenly bodies. Chanakya, the shrewd politician, took advantage of the people's belief in evil portents and advised kings to employ spies as astrologers, and fortune-tellers, to deceive even prime ministers of inimical kings.

The division of time into the 'paksha' (half a lunar month) is for many purposes too long, and we know that since very remote times, probably from the Vedic times, the eighth day (the 'Ashtami tithi' was regarded as a 'parva,' which divides the 'paksha' into two equal portions of seven days each. In the time of Chanakya, there was a division called the 'pancha-ratra,' literally pent-night. It was a convenient division, three of this going into a 'paksha'. The week of seven days with its multiple of a fortnight does not divide the 'paksha' into two equal portions, nor the year without a remainder. The only ground for the adoption of the week seems to have been the fact of the planets being seven. The word, hora, is said to be of Greek origin. The division of the day into 24, instead of the Indian 30, parts together with the fact of authoritative quotations from Yavana professors appear to prove the foreign origin of the week. It is not a little remarkable that the word, 'vara,'—the week-day, does not occur in the voluminous Mahabharata, and none of the incidents related there were supposed to have any connection with auspicious or inauspicious 'vara' or its moments. It is doubtful if Amara Sinha, the Sanskrit lexicographer, knew the word. At any rate, Chanakya is silent on the week, and the week-days. Similarly, the origin of the list of twenty-seven 'yogas' found in our almanacs is purely astrological, and appears to have been introduced later than the 7th century, A. D. The week-days have use in astronomy in checking dates, but the 'Yogas' have absolutely none. The term implies the sum of the longitudes of the sun and moon. But given the tithi and nakshatra of a day it is easy to find the 'Yoga.' For, the latter gives the longitude of the moon, and the former the difference between her longitude and that of the sun. The 'Karana,' another item of our almanacs, is more useful in as much as it

specifies either the first or the second half of a tithi.

The object of an almanac is to calculate and record time. The Bengali word for our almanac is Panjika, doubtfully derived from a Sanskrit word, Panchanga. It is so called because it specifies time by means of five elements, viz., the vara, tithi, nakshatra, yoga, and karana. In this enumeration neither the date of the solar month nor the year finds a place. These are included in the current almanacs, which are therefore really 'saptanga,' having seven elements.

We see then that the earliest calendar dimly visible in the Vedas has gradually developed into the present form. It has grown bulkier in the astrological portion, each successive belief, indigenous or imported, adding its quota to what was there already. The object of the calendar being the determination of the time for the performance of religious, social and domestic rites, addition is inevitable as years roll by. In the purely astronomical portion, however, the almanac is practically the same as in the days of Varaha and Brahmagupta. As has been said above, the object is to define the days of the year by astronomical events. For example, we read under date 25th December last (1916) the following entries:—"It is the 9th day after the sun passed the sign of Scorpion in his 1838th revolution since the beginning of the Saka era." Now this is enough to define the day. For convenience, the week-day, Saturday, is also mentioned. In old days the definition would have run thus: "It is the 19th day after the New moon in the lunar month of Margasirsha, when the moon is in the ecliptic division, named Aslesha. This is, however, insufficient, for the same phenomena happen several times in the course of a few years. Therefore the five-year cycle of the sun and moon served somewhat to limit the occurrence. But the period of five years is not long enough, and the definition is not precise. Jupiter takes nearly twelve years to revolve round the earth, and in sixty years there are twelve luni-solar cycles and five revolutions of Jupiter. The period of sixty years forming a Jovian cycle was, and is even now in many parts of India, used as an astronomical era. This again is not long, especially for the purpose, of astronomy. The cycle of the Great Yuga with its four minor yugas was invented. It is based on astronomical facts, and the beginning of the Great yuga, and that of each of the minor yugas are used as epochs. The smallest minor yuga is the Kaliyuga, which has for its duration 4,32,000 years. Suppose we use this epoch. We should then say that the day in question is so and so, immediately after 5016 revolutions of the sun since the beginning of the epoch. It is, however, obvious that the mention of the year

of a cycle, however large it may be, necessitates the employment of still larger cycles of which the given cycle is a part. The Europeans have solved the difficulty by counting years backwards and forwards since the supposed time of the birth of Jesus. The Hindus took the bold but perfectly scientific step to calculate the beginning of the world before which there was no time, and after which all events can be easily chronicled till dissolution. It is beside my purpose to examine the accuracy of the World-epoch. But there is no gainsaying the marvellous depth of the Hindu imagination. But suppose we are required to define a given moment of the day, say, the instant at sun-rise. It is clear, this can be done in various ways. One way is to state the hours, minutes and seconds of the clock elapsed since the last mid-night or mid-day. A second way is to state the fraction of the tithi or the nakshatra which will have elapsed by the time. A third way is to state the 'lagna' at the time. We do not say *on* such an hour or day or *in* such a year or yuga, but *after* so and so. Precision can go no farther. A still more complete definition of a given moment is obtained by describing the whole aspect of the heavens presented by the planets.

Now I shall conclude; considering the age of Hindu astronomy its progress appears to have been very slow. Perhaps the reason was that ancient Hindus did not care for astronomy as pure science but had recourse to it to serve as a guide in the performance of their religious duties. Knowledge for the sake of knowledge is a meaningless jargon to the Hindus. The ancients were more practical than their modern descendants, and valued knowledge so far as it served as a hand-maid in their higher quests. Look at any branch of Hindu knowledge. There is no sign of feverish restlessness, characteristic of modern Europe. There are truths for which they willingly and patiently underwent severe austerities. But they declined to be slaves of the means for the attainment of the truths. I believe this attitude of mind explains a great deal of the absence of what is called astronomical research in ancient India. For instance, the Hindus did not care to name and determine the places of stars, and even the bright stars, other than those required for their purpose. We cannot imagine that they could not invent names for the stars, while they were adepts in naming the hundreds of snakes that were killed by Parikshit in the Mahabharata. They had a purpose in enumerating these names, but none in cataloguing the stars. I have tried to shew that they were not afraid of changes if these were useful. Can we say the same of ourselves who are consulting almanacs of the model prepared eight hundred years ago at a time when the world moved slower than it does now?

The model served the purpose then; does it serve our purpose now?

JOGESH CHANDRA ROY.

SOME ASPECTS OF HINDU SOCIETY AT THE TIME OF MANU.*

II. THE LAW OF CRIMES AND TORTS.

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাং চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥

—মনু।

Viewing the Manava Dharma Sastra as a graphic picture of the manners of a somewhat advanced state of society, and as a combination of religious precepts and human laws which to a certain extent supply the materials for history, we think that a good deal of valuable knowledge may be gathered from the work, if tested only by the legitimate rules of philosophical enquiry. It is not a mere code of jurisprudence, for it deals with the private economies of domestic life. It displays all the elaborate arrangement of the Pandect with an equally elaborate provision for those household duties which other legislators have deemed unworthy of notice.

But that portion of the Institutes of Manu which deals with crimes and punishments is probably the most interesting. The Hindu penal code however may be said to differ more from archaic than from modern criminal law. In tracing the growth of penal law in ancient codes, Sir Henry Maine notices some broad characteristics which distinguish it from systems of mature jurisprudence. One of these is the great disproportion between criminal and civil law. "It may be laid down" he says, "the more archaic the code the fuller and minuter is its penal legislation. In the Teutonic codes, the civil part of the law has trifling dimensious as compared with the criminal. The traditions which speak of the sanguinary penalties inflicted by the code of Draco, seem to indicate that it had the some characteristic. In the twelve tables alone, produced by a society of greater legal genius, and at first of gentler manners, the civil law has something like its modern precedence; but the relative amount of space given to the modes of redressing wrongs though not enormous appears to have been large." Hindu Law however does not present this precedence of criminal over civil law. The law of persons, the law of property, and of inheritance and the law of contract which make up, in the words of Sir H. Maine, "nine-tenths of

* For "Introduction" of the subjects see The Hindustan Review. July, 1214.

the civil part of the law practised by civil societies" cover a very large amount of space in Hindu jurisprudence. But it is chiefly in the character of Hindu criminal law, that it differs more from archaic than from modern systems. In the ancient codes, the law was not true criminal law. It was the law of torts (delicta) rather than the law of crimes. If the commentaries of Gaius be opened at the place where the writer treats of the penal jurisprudence founded on the twelve tables, it will be seen that at the head of the civil wrongs, recognised by the Roman Law stood furtum or theft. Offences which we are all accustomed to regard exclusively as crimes are treated exclusively as torts; and not theft only but assaults and violent robbery are associated by the juris consult with trespass, libel and slander. All alike give rise to an obligation or *vinculum juris* and were all requited by a payment of money. This peculiarity again is strongly brought out in the consolidated laws of the Germanic tribes. Under Anglo-Saxon law a sum was placed on the life of every freeman according to his rank and a corresponding sum on every wound that could be inflicted on his person, for nearly every injury that could be done to his civil rights, honour or peace, the sum being aggravated according to adventitious circumstances. In the Hindu Law on the other hand the law of Torts seems almost wholly merged in the law of crime. Punishment alone is the end of all justice.

"If the king" say the Institutes, "were not without indolence to punish the guilty, the stronger would roast the weaker like fish on a spit; the crow would taste the clarified butter; ownership would remain with none; the lowest would overturn the highest. The whole race of men is kept in order by punishment; for a guiltless man is hard to be found; through fear of punishment indeed this universe is enabled to enjoy its blessings; deities and demons, heavenly songsters and cruel giants, birds and serpents are made capable by just correction of their several enjoyments. All classes would become corrupt; all barriers would be destroyed, there would be a total confusion among men, if punishment either were not inflicted or were inflicted unduly. But where punishment with a black hue and a red eye, advances to destroy, and there if the judge discern well the people are undisturbed." But this idea propounded by Manu is only subordinate to the higher teaching that Brahma formed in the beginning of time the genius of punishment with a body of pure light, his own son, even abstract criminal justice, the protector of all created things. This genius or as he is Varuna, is the lord of punishment; he holds a rod even over the king, who though the chief Magistrate is subject to him. "Where therefore

another man of lower birth would he fined one *pana*, the king shall be fined a thousand and he shall give the fine to the priests or cast it into the river, this is a sacred rule." All infringements of right therefore are crimes and not torts. There are however a few exceptions to this rule. In all cases of hurting a limb, or drawing out blood the assailant shall pay the expense of a perfect cure ; or on its failure both full damages and a fine to the same amount. He who injures the goods of another, whether acquainted or unacquainted with the owner of them, shall give satisfaction to the owner and also pay a fine to the king equal to the damage. With these few exceptions all infringements of right, which according to the modern system of jurisprudence, are punished by the State as crimes, and also entitle the sufferer to civil damages, are treated in Hindu Law exclusively as crimes. Torts are almost wholly unknown. Punishment therefore and not money compensation is the only method prescribed for redressing wrongs. But punishment enters so largely into the Hiudu scheme of legal remedies, that it will be found to invade a class of cases, which in modern law, falls neither under the head of crimes nor that of torts. Breach of contract, for example, is punished as crime. The non-performance of moral and social duties and sins also fall under the rod of the Magistrate. Many of the sins fall under the heading of offences mentioned in the secular laws of the Brahmans. Thus the killing of a cow is a punishable offence as well as a crime. The commission of a heavy sexual offence is to be visited with punishment by the king and at the same time, the stain caused by such sin is to be removed by religious atonement. Many eccentricities of the criminal law of ancient India are due to the religious element entering largely into it. The sanctity with which Brahmins are invested has led to establishing the principle that no corporal punishment should ever be resorted to in the case of a criminal of the Brahmin caste. Nor could the banishment of a Brahmin be connected with confiscation of his property—the ordinary consequence of banishment. The Sudras on the other-hand were treated very harshly. Thus a Brahmin who abuses a Sudra is condemned to pay no fine ; a Sudra on the contrary, undergoes corporal punishment if he only assumes a position equal to the position of the twice-born. Money-lending is viewed as an unholy act ; Brahmins are therefore forbidden to practice usury. Gambling is stigmatised as a sinful practice, though some legislators do not object to gambling in a public gaming-house, where the king may raise a certain percentage on the stakes. False witnesses were designated as thieves of words. Heaven is the reward of a witness who speaks truth ; in the contrary case, hell will be his portion. The punishment meted out in some offences against the person

as also the state in the Brahminical code, savour of oriental despotism e. g. the forgerer of a royal document is visited with capital punishment, a drunkard is branded with the flag of the distillery shop. The *jus talionis* which is so universally represented in archaic legislations becomes conspicuous in some punishments awarded under the Hindu code.

The modes of punishment under Hindu Law do not betray that excessive amount of barbarity and cruelty which characterise the sanguinary codes of Greece and early Rome. Although the scale of penalties is rigidly fixed and scarcely any discretion is left to the judge, nothing is more striking than the merciful provision in the code of Manu, which directs that the criminal shall be dealt with, first by gentle admonition, afterwards by harsh reproofs thirdly by deprivation of property and finally by corporal punishment. The punishment of death is applied to a comparatively limited class of cases. The sentence of capital punishment is prescribed only in the case of adultery, when the adultress is to be devoured by dogs and the adulturer burnt on an iron bed; (2) in the case of misappropriating property, when the offender is to be trampled to death by an elephant. It is somewhat remarkable that with one exception the punishment of imprisonment is nowhere prescribed in the Institutes for any particular offence. "As Varuna most assuredly binds the guilty in fatal chains, thus let the king, keep offenders in close confinement"—a passage which alone mentions this form of punishment.

But apart from what may be inferred from this general and vague direction, it would seem that imprisonment, as with the early Romans, was not a mode of punishment, to which the Hindu legislators gave much encouragement. There is more distinctness however, in the punishment of banishment, as spoken of in the Hindu Criminal Law. Of this there are three kinds (1) where the offender retained his possessions, but was obliged to go away from the country; (2) where all his possessions were confiscated and he himself was exiled and (3) where he was branded on the forehead or some visible part and wandered away both homeless and friendless. The first form of banishment under the Hindu Law has its counterpart in Roman and Greek legislation. But neither Athenian nor Roman jurisprudence furnishes anything like the third form of banishment mentioned above. Corporal punishment by whipping is also prescribed in some cases; while branding and mutilation of the limbs and other degrading punishments are inflicted with that wantonness, which is observable not only in the archaic systems of law, but in systems of comparatively recent times and in highly civilised Countries.

GAURANGA NATH BANERJEE.

WHAT ARE THE TANTRAS AND THEIR SIGNIFICANCE?

A very common expression is "The Tautra"; but its use is often due to a misconception and leads to others. For what does Tantra mean? The word denotes injunction (Vidhi), regulation (Niyama) Shastra generally or treatise. Thus Shangkara calls the Sangkhya, a Tantra. We cannot speak of "The Treatise" nor of "The Tantra" any more than we can or do speak of the Purana the Samhita. We can speak of the Tantras as we do of the Puranas. These Tantras are Shastras of what is called the Agama. Then what is the Agama? In a review of one of my works it was suggested that the Agama is a class of Scriptures dealing with the worship of Saguna Ishvara which was revealed at the close of the age of the Upanishads and introduced partly because of the falling into desuetude of the Vaidik Achara and partly because of the increasing numbers of persons entering the Hindu fold who were not competent (Adhikari) for that Achara. I will not however deal with this historical question beyond noting the fact that the Agama is open to all persons of all castes and both sexes and is not subject to the restrictions of the Vaidika Achara.

The Agamas are divided into two main groups according as the Ishtadevata worshipped is Shiva or Vishnu or into three, if the Shakta Agama be counted as a separate division. The first is the Shaivagama and the second the Vaishnava Agama or Pancharatra. This is the Scripture to which the Shrimad Bhagavata refers as Sattvata Tantra in the lines.

Tenoktang sattvatang tantram
Yat Jnattva muktibhag bhavet
Yatra strishudradasanang
Sangskaro vaishnavah smritah

According to a quotation which has been given me from the Vayu Samhita the latter speaks of a twofold Shaivagama namely one which is based on Shruti and another independent of it

Shaivagamopi dvividha shrauto' shrautashcha sangsmritah
Shrutisaramayah shrautah svatantrastvitaromatah.

We must however in all cases distinguish between what a School says of itself and what others say of it. So far as I am aware, all Agamas, whatever be their origin, claim now to be based on Shruti though of course as different interpretations are put on Shruti those who accept one interpretation are apt to speak of differing Schools as heretical. These main divisions again have subdivisions. Thus there are several schools of Shaivas; and there are Shaktas. There is for instance the Northern Shaiva School called Trika of Kashmir in which country at one time the Tantra Shastra was very prevalent. There is again the Southern

Shaiva school called Shaivasiddhanta. The Shaktas who are to be found throughout India are largely prevalent in Bengal and Assam. The Shaktas are rather allied with the Advaita Shaiva than with the others though in them also there is worship of Shakti. Shiva and Shakti are one and he who worships one necessarily worships the other. But whereas the Shaiva predominantly worships Shiva, the Shakta predominantly worships the Shakti side of the Ardhanarishvara murti which is both Shiva and Shakti. A common philosophical basis of those Shaktas who are Agamavadins is the Shaiva doctrine of the thirty six Tattvas. These are referred to (Ch. VII) in the Tantra so well known in Bengal which is called Kularnava. They are also referred to in other Shakta works and their commentaries such as the Anandalahari. The Sharada Tilaka a great authority amongst the Bengal Shaktas is the work of Lakshmanacharyya an author of the Kashmir Shaiva school. The latter school as also the Shaktas are Advaitins. The Shaiva Siddhanta and Pancharatra are Vishishtadvaita. There is also a great body of Buddhist Tantras of differing schools. Now all these schools have Tantras of their own. The original connection of the Shaiva schools is shown amongst other things by the fact that some Tantras are common such as Mrigendra and Matanga Tantras. It has been asserted that the Shakta school is not historically connected with the Shaivas. No grounds were given for this statement. Whatever be the historical origins of the former the two appear to be connected at present as any one who knows Shakta literature may find out for himself. In fact Shakta literature is in parts unintelligible to one unacquainted with some features of what is called the Shaiva Darshana. The Shaktas have again been divided into three groups. Thus Pandit R. Ananta Shastri in the Introduction to his edition of the Anandalahari speaks of the Kaula Shastras with sixty four Tantras; the Mishra with eight Tantras; and the Samaya group which are said to be the most important of the Shakta Agamas of which five are mentioned. This classification purports to be based on the nature of the object pursued according as it belongs to one or other of the Purushartha. As so explained the classification seems too neat and artificial to be altogether historically accurate. I express here no opinion on the point. Pancharatra literature is very considerable, one hundred and eight works being mentioned by the same Pandit in Vol. XIII. p. 357-363 of the " Theosophist ". I would refer the reader also to the very valuable and recent edition of the Ahirbhudhnya Samhita by my friend Dr. Otto Schrader with an Introduction by the learned Doctor on the Pancharatra system where many Vaishnava Tantras and Samhitas are cited. The

Trika school has many Tantras of which the leading one is Malinivijaya Tantra. The Svachchhanda Tantra comes next. My friend Jagadisha Chandra Chattopadhyaya Vidyavaridhi has written with learning and lucidity on this school. The Shaivasiddhanta has twenty eight leading Tantras and a large number of Upagamas such as Taraka Tantra, Vama Tantra and others which will be found enumerated in Nallasvami Pillai's "Studies in Shaiva Siddhanta (p. 294) and Sivajnanasiddhiyar (p. 211). There is thus a vast mass of Tantras in the Agamas belonging to differing schools of doctrine and practice.

When these Agamas have been examined and are better known it will be found that they are but variant aspects of the same general ideas and practices. As instances of general ideas I may cite the following:—the conception of Deity as a supreme Personality (Parahanta), and of the double aspect of God in one of which He really is or becomes the Universe; a true emanation from Him in His creative aspect; successive emanations (Abhasa; Vyuha) as of "fire from fire" from subtle to gross; doctrine of Shakti; pure and impure creation; the denial of unconscious Maya such as Shangkara teaches; Doctrine of Maya Kosha and the Kanchukas (the six Shaiva Kanchukas being represented by the possibly earlier classification in the Pancharatra of three Samkocha): the carrying of the origin of things up and beyond Purusha-Prakriti; acceptance at a later stage of Purusha-Prakriti, the Sangkhyan Gunas, and evolution of Tattvas as applied to the doctrine of Shakti; affirmance of reality of the Universe; emphasis on devotion (Bhakti); provision for all castes and both sexes.

Instances of common practice are for example Mantra, Bija, Yantra, Mudra, Nyasa, Bhutashuddhi, Kundaliyoga, construction and consecration of temples and images (Kriya); religious and social observances (Charya) such as Ahnika, Varnashrama, Dharma, Utsava; and practical magic (Mayayoga).

Where there is Mantra, Yantra, Nyasa, Diksha Guru and the like there is Tantra Shastra. In fact one of the names of the latter is Mantra-Shastra. With these similarities there are certain variations of doctrine and practice between the schools. Thus as I have already said neither the Southern Shaivasiddhanta nor the Pancharatra are Advaita whereas the Northern Shaivagama and the Shakta doctrine are; for both hold that Jivatma or Paramatma are one as Shangkara's school also teaches. Necessarily also even on points of common similarity there is some variance in terminology and exposition which is unessential. Thus when looking at their broad features it is of no account whether with the Pancharatra we speak of Lakshmi, Shakti, Vyuha, Samkocha or whether in terms of other schools we speak

of Tripurasundari and Mahakali, Tattvas and Kanchukas. Again there are some differences in ritual which are not of great moment except in one and that a notable instance. I refer to the well-known division of worshippers into Daksninachara and Vamachara. The antinomian Sadhana of some of the latter, (which I may here say is not usually understood) has acquired such notoriety that to most the term "The Tantra" connotes this particular worship and its abuses and nothing else. I may here also observe that it is a mistake to suppose that such doctrines and practices are aberrations peculiar to India. A Missionary wrote to me some years ago that this country was "a demon-haunted land." There are Demons here but they are not the only inhabitants; and what is found here has existed elsewhere. The antinomian doctrines and practices of the extremist schools are similar to those of certain Western sects notably views and practices attributed to the Brethren of the Free Spirit. Antinomianism as an universal phenomenon is the extremist application of so called "Pantheistic" doctrines which as doctrines are held even by those who reject such practical application of them. For though this does not seem to be recognised it ts nevertheless the fact that these rites are philosophically based on doctrines which are the common property of all monistic schools. The difference consists in the fact that these common doctrines are practically applied in extremist fashion contrary to the ordinary forms of Dharma which under certain conditions these Sadhakas claim to surpass. Even on this antinomian side it seems to me that there are differing schools. Now it is this extremist doctrine and practice limited at all times to comparatively few which has come to be known as "The Tantra". Nothing is more incorrect. This extreme or "left wing" is but one division of worshippers who again are but one section of the numerous followers of the Agamas, Shaiva Shakta and Vaishnava. Though there are certain common features which may be called Tantrik one cannot speak of "The Tantra" as though it were one entirely homogeneous doctrine and practice. Still less can we identify it with the particular practices and theories of one sect only. Further the Tantras are concerned with Science, law, Medicine and a variety of subjects other than spiritual doctrine or worship.

According to a common notion the word "Tantra" is (to use the language of a fairly well known work) "restricted to the necromantic books of the later Shivaic or Sakti mysticism" (Waddell's Buddhism of Tibet p. 164). As charity covers many sins so "mystic" and "mysticism" are words which cover much ignorance. "Necromancy" too looms unnecessarily large in writers of this school. It is however the fact that Western authors generally so understand

the term "Tantra." They are however in error in so doing as explained in a previous article. In this I shortly deal with the significance of the Tantra Shastra which is of course also misunderstood being generally spoken of as a jumble of "black magic," and "erotic mysticism" cemented together by a ritual which is "meaningless mummery." A large number of persons who talk in this strain have never had a Tantra in their hands and such orientalists as have read some portions of these Scriptures have not generally understood them otherwise they would not have found them to be so "meaningless." The use of this term implies that their content had no meaning to them. Very likely; for to define as they do Mantra as "mystical words," Mudra as "mystical gestures" and Yantra as "mystical diagrams" does not imply knowledge. These erroneous notions as to the nature of the Agama are of course due to the mistaken identification of the whole body of the Scripture with one section of it. Further this last is only known through the abuses to which its dangerous practices as carried out by inferior persons have given rise. It is stated in the Shastra itself in which they are prescribed that the path is full of difficulty and peril and he who fails upon it goes to Hell. That there are those who have so failed and others who have been guilty of evil magic is well known. I am not here concerned with this special ritual or magic but with the practices which govern the life of the vast mass of the Indian people to be found in the Tantras of the Agamas of the different schools which I have mentioned.

In order to understand the significance of the Agama composed of Tantras of varying schools some preliminary observations are necessary. Western writers (and some Indians influenced by their views) regard the Vedanta as a mere metaphysic, that is speculation. They suppose it to be like those philosophical systems of their own which were evolved after orthodox Christianity had ceased to govern thought as it did in the Middle ages. Let us picture in our minds for the moment such a philosopher. We think of a man who has passed through the usual academic curriculum in which he has been taught that previous speculation was a highly meritorious though unsuccessful search for truth. Having obtained his doctor's degree he sets out himself on the same apparently futile quest either in the amiable if foolish belief, that he will discover for the world this treasure or with the less exalted motives supplied by the desire for intellectual amusement, personal fame or daily bread. In the course of this search it is probable that subscription will be made to the usual moral principles. It is however not generally felt that the moral nature of the philosopher affects the value of his speculation. Good mental endowment and learning are considered

sufficient. With this and access to the works of the illustrious seekers of old who are made to supply the instruments of their own destruction the philosopher in his study proceeds to evolve a "system" of his own and to gather round him disciples who remain faithful to their master until a rising sense of their own superiority, ambition, or mere bread and butter prompt them to desert him and to start a "system" of their own. This last holds precarious sway until displaced by another which appears in the course of the unending cycle of speculation. Something is doubtless gained in this process if only it be the discarding of manifest error and the more extensive circulation of philosophical ideas. The mental instrument is also sharpened for the uses to which a true spiritual doctrine will put it. Nothing happens without a purpose.

But according to Hindu notions it is not in this way that truth is found, Tarkapratishthánát. A deeply read and powerful minded Western friend of mine was not disconcerted by the maxim. He confessed to me that he had no desire to discover the truth as he got so much amusement out of trying to find it. I told him he need be under no apprehensions of losing his pleasure. Hindu philosophy is of a different character and rests on a different basis. Its counterpart in the West is to be found in the works of the great Mediæval Scholastics of Catholicism. Neither they nor the orthodox Hindu sought by reason and inference to discover truth as if it were something not known. It was already in their possession having been communicated to them by the revealed Word. Their duty was limited to co-ordinating, explaining and (so far as this was possible) making the Word understandable by the reason which also supplied its own grounds for their acceptance. For what is irrational can never be spriritually true. This Word (Shabda) was to the Christian Scholastics the Old and New Testaments and the living voice of the divinely inspired Church holding the deposit of tradition. To the Indian it was Veda and the tradition or Smriti which was based on it. Veda is spiritual experience. It is by Veda that the truth is known; it is on Veda that philosophy is based. The Vedanta is not a mere metaphysic in the Western sense as even Professor Duessen who so highly appreciates it takes it to be. He asks the people of India to adhere to it. But why should they do so if it be a mere speculation? Why should they accept it rather than any other, for he does not allow the possibility of Yoga which verifies the doctrine.

Some Western writers are of opinion that the Tantra Shastra was, at least in its origin, alien and indeed hostile to Veda. One of them has said "We are strongly of opinion that in their essence the two principles are fundamentally opposed and that the Tantra only uses

Vedic forms to mask its essential opposition." I will not argue this question now. It is however the fact now as it has been for centuries past that the Agamavadins base their doctrine on Veda. The Vedanta is the final authority and basis for the doctrines set forth in the Tantras though the latter interpret the Vedanta in various ways. The real meaning of Vedanta is Upanishad and nothing else. Many persons however speak of Vedanta as though it meant the philosophy of Shangkara or whatever other philosopher they follow. This of course is incorrect. Vedanta is Shruti, Shangkara's philosophy is merely one interpretation of Shruti just as Ramanuja's is another and that of the Shaivagama or Kulagama is a third. There is no question of competition between Vedanta as Shruti and Tantra Shastra. It is however the fact that each of the followers of the different schools of Agama contend that their interpretation of the Shruti texts is the true one and superior to that of other schools. I have thus found a dislike of Shangkara's Mayavada amongst Sadhakas of the Northern Shaiva and Shakta Schools which more nearly approach Shangkara's standpoint than the Shaivasiddhanta and Pancharatra which, as is well known, dispute the truth of Shangkara's interpretation of Shruti. I am not here concerned to show that one system is better than the other. Each will adopt that which most suits him. I am only stating the fact. As the Ahirbudhnya Samhita of the Pancharatra Agama says, the aspects of God are infinite and no philosopher can seize and duly express more than one aspect. This is perfectly true. All systems of interpretation have some merits as they have defects, that of Shangkara included. The latter by his Mayavada is able to preserve more completely than any other interpretation the changelessness and stainlessness of Brahman. It does this however at the cost of certain defects which do not exist in other schools which have also their own peculiar merits and shortcomings. The basis and seat of authority is Shruti or experience; and the Agama interprets Shruti in its own way. Thus the Shaiva-Shakta doctrine is a specific interpretation of Vedanta which differs in several respects from that of Shangkara though it agrees (I speak of the Northern Shaiva School) with him on the fundamental question of the unity of Jivatma and Paramatma and is therefore Advaita. Agama then is one interpretation of Vedanta; an interpretation doubtless influenced by the practical ends which this Shastra has in view. From the highest standpoint all schools may be reconciled.

The next question is how Vedantic experience of which the Agama speaks may be gained? This is also prescribed in the Shastra in the form of particular Sadhanas. In the first place

there must be a healthy physical and moral life. To know a thing in its ultimate sense is to *be* that thing. To know Brahman is to *be* Brahman. One cannot realise Brahman the Pure except by being oneself pure (Shuddha chitta). But to attain and keep this state as well as for progress therein certain specific means, practice, rituals or disciplines are necessary. The result cannot be got by mere philosophical talk about Brahman. Religion is a practical activity. Just as the body requires exercise, training and gymnastic so does the mind. This may be of a merely intellectual or spiritual kind. The means employed are called Sadhana which comes from the root "sadh" to exert. Sadhana is that which leads to shiddhi. Sadhana is the development of Shatki. Man is consciousness (Atma) vehicled by Shakti in the form of mind and body. But this Shakti is at base consciousness just as Atma is; for Atma and Shakti are one. Man is thus a vast magazine of both latent and expressed power. The object of Sadhana is to develop man's Shakti whether for temporal or spiritual purposes. But where is this Sadhana to be found? Seeing that the Vaidik Achara has fallen into practical desuetude we can find it nowhere but in the Agamas and in the Puranas which are replete with Tantrik rituals. The Tantras of these Agamas therefore contain both a practical exposition of spiritual doctrine and of the means by which the truth it teaches may be *realised*. Their authority does not depend as Western writers and some of their Eastern followers suppose on the date when they were revealed but on the question whether Siddhi is gained thereby. This too is the proof of Ayurved. The test of medicine is that it cures. If Siddhi is not obtained the fact that it is written "Shiva uvacha" or the like counts for nothing. The Agama therefore is a practical exposition and application of Vedanta varying according to its different schools.

The latest tendency in modern Western philosophy is to rest upon intuition as it was formerly the tendency to glorify dialectic. Intuition has however to be led into higher and higher possibilities by means of Sadhana. This term means work or practice which in its result is the gradual unfolding of the Spirit's vast latent magazine of power (Shakti), enjoyment and vision which everyone possesses in himself. The philosophy of the Agama is, as a friend of mine very well put it, a practical philosophy, adding, that what the intellectual world wants to-day is this sort of philosophy, a philosophy which not merely *argues* but *experiments*. The form which Sadhana takes is a secondary matter. One goal may be reached by many paths. What is the path in any particular case depends on considerations of personal capacity and temperament, race and faith. For the

Hindu there is the Agama which contains forms of discipline which his race has evolved and are therefore prima facie suitable for him. This is not to say that these forms are unalterable. Others will adopt other forms of Sadhana suitable to them. Thus amongst Christians the Catholic Church prescribes a full and powerful Sadhana in its sacraments (Sangskara) and worship (Puja, Upasana), meditation (Dhyana), rosary (Japa) and the like. But any system to be fruitful must experiment to gain experience. The significance of the Tantra Shastra lies in this that it claims to afford a means available to all, of whatever caste and of either sex, whereby the truths taught by Vedanta may be practically realised.

A. A.

THE CAPTIVE.

Is all my ocean-faring sped?
Shall all the cunning slip my hand?
Ah, hungry eyes with nothing fed
But league on weary league of land!

If I ride not, as I have rode,
The fighting snarling seas again,
If I tread not, as I have trode,
The wet sea-beaches wild with rain,

Nor ever feel beneath my feet
The thrill that shakes the spoiling sea
When the dull drums to battle beat
The ocean's heavy cavalry,

Then give me to this river deep
That seaward strongly passeth by,
That I may find my final sleep
By the broad bosom when I die.

D. G. D.

VISUAL INSTRUCTION IN SCHOOLS AND COLLEGES.

It has always been a traditional principle of our Teachers and Professors in the schools and colleges to teach the boys from the text books set in the University Curriculum from time to time. Such an abstract method of teaching in many cases is not only uninteresting to our young pupils but even tedious and life-less. This has been the cause of a great deal of discouragement on the part of many of our promising students to get adequate liberal education.

It is a fact that knowledge based on personal experience of a man is more definite, accurate and lasting than that obtained from the text-books alone. The young mind of a boy or girl is not only inquisitive to learn everything it sees or hears but it always enjoys more the concrete subjects in respect to the various phenomena of nature as taught in the text-books and lectures. The thirst for knowledge of a pupil is never satisfied by a mere understanding of the various facts that underlie the laws of nature but he wants really to look into the things themselves and thus satisfy the curiosity of his eyes and ears. It is to facilitate the methods of both instruction and learning and also to make our school-houses, books and lectures more and more attractive to our young students that we are in need of adequate supplies in *Steriographs* and *Lantern slides* for a systematic visual instruction.

During the past few years the educational progress in Europe and America has been on the line of concreteness in the presentation of subjects in the various courses of study both in schools and colleges. Every school is well provided with enough materials both in Steriographs and Lantern slides to teach Geography, History and other branches of natural science. Besides, the various Industrial enterprizes as mining, Iron works, Dairying etc., are are also pretty well illustrated by such visual methods.

The great value of such visual instruction is really appreciated by any one who has ever attended any lecture illustrated by steriopticon views. For a concrete material as that of a good picture, is always ready for immediate use and suggestive of original ideas. As for instance, a good photograph of Japan showing a Japanese working in a hand-loom gives the student a real idea of what a Japanese looks like, what kind of hand-loom he uses and also many other details of the ways they manufacture clothes. Besides, in a class to illustrate the Geography of a given region as Germany, in connection with the study of the text, a series of steriographs or lantern slides will call for a closer observation and more originality of expression on the

part of the pupil. Thus such a visual instruction increases the interest, extends the knowledge and leads to a greater accuracy in understanding, thinking of the young boys and girls.

In conclusion, it may be said that our educational authorities should consider the need of Visual instruction in the schools and colleges and supply enough materials to work with, so that it may open the eyes of our young boys and girls more and more to original things and thus further the cause of liberal education in general.

S. K. MITRA.

JULY.

Gone are the bluebells, and the frail dog-rose
Has withered, but to beauty's gracious round
Their fragrance is not lost, but still is found
Incarnate where the honey-suckle blows.
And still an incense on the evening drives
Wind-lifted lightly from the fields of hay
That have been toss'd and scatter'd all the day
With quick-plied forks, or cut with whirring knives.
Yea, but the voice of June hath ceased to speak,
The flush of new-blown beauty at the prime
Pales from the wood, for every freshness cloys
And every maid must know, past wooing-time,
The pride a little bated from her poise
The bloom a little wither'd on her cheek.

D. G. D.

SOME FALLACIES ABOUT EDITORS.

BY ONE OF THEM.

Perhaps the commonest is the misconception about the Editor's functions. Very many people seem to be quite unaware of the existence of a manager, a publisher, or a cashier. Any sort of communication is addressed to the Editor. Does the proprietor of the village shop at Drumtochty wish to add the *Daily Grumbler* to his stock? He writes to the Editor. Does Mrs Gummidge, who keeps a boarding-house. at Slocum-on-Sea, desire to advertise her eligible apartments? She writes to the Editor. People even write to him for back-numbers. I believe it is no uncommon thing at the *Times* office to receive a letter like this addressed to Lord North-cliffe: 'I understand you had in the *Times* of last Thursday an article on the Yorkshire coal trade. Please send me a copy. Twopence in stamps enclosed.' It is needless to say that Lord Northcliffe does not sit at the receipt of custom, dropping coppers into the till and addressing newspaper wrappers. Nor, as a matter of fact, is Lord Northcliffe the Editor; but the moral of the incident is the same—that the public identifies the paper with the man on it who bulks most largely in its eye, and that in nine cases out of ten is the Editor. People have as hazy a conception of the functions of a publisher as of a stevedore; but the Editor is a familiar and friendly figure, and they calmly hold him ultimately responsible for all the varied activities of a newspaper office. Perhaps it it would be unkind to disturb an illusion which has, in many cases, little correspondence to reality.

Another deep-rooted fallacy is that the Edltor is in perpetual want of things 'to fill up.' I suppose the popular picture of an Editor is of a distracted man who comes to the office about seven in the evening without an idea as to how his columns are to be filled next morning, trusting that some kindly Providence will come along during the evening with a sufficient supply of battles and tragedies and law-cases to enable the paper to come out. He is growing desperate when, by the last post, arrives Mr. C. Scribendi's article on the state of politics in Patagonia. With muttered thanks to a merciful Providence, he grasps the manuscript and rushes it to the printer; and the readers of the *Morning Molehill* are spared the humiliation of finding a vacant column on the back page next morning. No, Editors do not live on casual manna in the wilderness like that. They are not in want of copy, not even in what used to be called the 'silly seasons' till the war had reduced all the months of the year to a dead-level of wisdom.

If you ever have anything to send to an Editor, do not send it from eleemosynary motives, 'to fill up an odd corner.' Well-conducted newspapers do not have odd corners.

Another erroneous conception of the Editor is largely entertained by ladies on charitable committees, to whom an Editor is a nice old gentleman who sits at a desk with a pen behind his ear, waiting to write down nice little paragraphs for every caller with an axe to grind, especially an axe she is grinding gratuitously. The sober fact that in most large newspaper offices the Editor either does not write at all or writes less than almost anybody else on the staff is one which they flatly refuse to credit. So they would the fact that as soon as their backs are turned he passes over their 'story' to the junior reporter, probably with imprecations, and certainly without any trace of the enthusiasm which would be expected of one in his position.

And this touches what is probably the most widespread of all errors concerning Editors: that he welcomes visitors. There is probably no such rooted misanthropist in the world as the Editor. Visitors are the plague of his life, especially those who think themselves important, and who really are so important that they cannot be handed over to a subordinate. They take up valuable time and pay no attention to printed placards urging ytiverb of discourse. Their requests are frequently absurd or impossible, and their manners vary between blandishment and intimidation. The telephone is nowhere a greater boon than in newspaper offices; and yet one of the commonest of telephone messages is from people with paragraphs, who think they can best promote their object by coming to 'see the Editor,' not because they have anything more to say to him than can be sent by letter, but simply, as they think, so secure his good graces. It is a dreadful mistake. The people an Editor likes best are, as a rule, those whom he sees least, whether proprietors, contributors or readers.

As a matter of fact, most Editors are disappointing when you meet them. One's abstract concept of an Editor is so influenced by the tradition of dignity and omniscience that the revelation of an average human being is bound to be a disillusionment. His journal is so full of varied information, he so clearly shares all the State secrets with the Censor, he reproves (or encourages) Governments with so stern and unrelenting a vigilance, that it is incredible he should be made of the same clay as the ordinary ignoramus. The belief in his wisdom is quite touching. Morning after morning letters arrive in quest of the most curious and miscellaneous scraps of knowledge: what was *really* the cause of the *debacle* in Roumania; whether it is true that the Crown Prince is bigamously

married to Miss Higginson of Buffalo, N. Y.; how many more acres there are in Yorkshire than letters in the Bible; what is the best way of softening the plates of false teeth. Legal and domestic problems of the most intimate sort are laid before him for his arbitrament; and I have even known an entirely secular Editor consulted by one in trouble about the state of his soul.

All letters are not so flattering, and few ideas about an Editor are so baseless as that he is susceptible to letters of abuse. He is far too habituated to them; and he is much more likely to think that he has failed in his duty if his letter-bag does not contain a certain proportion of scurrility. Most of these are founded upon childish errors; but, as they are usually anonymous, it is impossible to make the neccessary correction. The rest are either ill-temper or political mania, which used to be a very common form of epistolary hydrophobia. It is curious that so many of these critics are periodical in their ululations. One would think they would give up a paper which apparently caused them so much anguish of spirit; but no, they keep the pricks in order that they may have the meagre satisfaction of kicking against them.

The Editor is in his way a scapegoat. Though, as I have said, he as a rule writes little himself, he is held responsible for every word in his paper, and readers do not fail to call him to account for the misdemeanours of the sub-editor, or the reporter, or even of the printer. One well-known paper has quite lost caste with the musical world because of its proof-reader's habit of regarding 'Brahms' as the possessive case of a composer called 'Brahm,' and because it once mentioned a sonata by Beethoven in D sharp. An Editor, of course, exercises a general supervision over the paper; but it is physically impossible for him to study every line of it, and to check from his own knowledge the accuracy of every paragraph submitted by every correspondent or every item of news transmitted by a news agency. Many thousands of people all over the world are engaged, directly and indirectly, in the production of every daily paper published in this country; and the remarkable thing is that in all the circumstances the average margin of error is so small.

Editors, like Prime Ministers and Generals in the field, are supposed to require no holidays. This is especially the case with those Editors who have a personality not wholly merged in their paper. One recalls the comedy which occurred recently when, in the temporary absence of the Editor of a well-known London paper, the editorial gap was filled with an article markedly different in tone from the customary pronouncement. In response to the outcry, it had to be explained in the remaining issues of the hiatus that the article in

question was supplied by a contributor in the absence of the Editor. As a rule, greater precautions are taken to preserve consistency; but most newspapers can tell tales of dilemmas and embarrassments caused by the paper's taking one line when the Editor is at home, and another, through inadvertence when he is away.

And thereby hangs the whole problem of editorial psychology—a complicated psychology somewhere between that of a human being with a soul and that of a limited company without one. What are the contributing causes when a paper changes its opinions—say on Ireland, or Tariffs, or Woman Suffrage? The cases are few in which it is simply a matter of individual judgment. As a rule there are several people to be consulted, proprietors as well as Editor (there have been cases, strange though it may seem, where the Editor was overruled); and the probability must be considered of the contemplated change being acceptable to the readers. Not many papers were so rash (and not many so peculiarly situated in respect of the unity of proprietorial and editorial responsibility) as to start a campaign of denunciation against Lord Kitchener at a time when he was still the idol of the man in the street. So the relations of an Editor to his own policy are not always so direct and *simple* a matter as might appear. Not of course, that any conscientious Editor will professionaily advocate a policy of which he disapproves personally; but the policy, as announced, may be subject to reservations and qualifications which are not present to the mind of the Editor as an individual. The distinction is not peculiar to Editors. A man may say one thing of Mr. Winston Churchill to his wife, but if he has to write an article on him for the *Fortnightly Review* he will choose a different, and possibly a suaver, form of words.

It is possible, too, to exaggerate the the interest for Editors of a good cause, as such. So many people are apt to think that if they have invented a new sort of Garden City, or started a society for supplying hot-water bottles for the natives of Uganda, or have discovered how to live happily off boiled bracken and onion sauce, it is the immediate duty of every newspaper to place its columns at their disposal. But a newspaper is a commercial and not a philanthropic undertaking; and the Editor's business is not to bring about more of the Millennium than is compitible with a sound balance-sheet. It may seem a hard saying, but an Editor's concern is just as much to please his readers as a grocer's is to please his customers. He is compelled, therefore to balance the ethical with the "interesting', and to bear in mind (if he is the Editor of an evening paper) that a case of wife-beating may thrill his readers where the destitution of Borrioboolah-Gha may leave them cold. You have no more right to blame an Editor in the

circumstances than you have to blame a bookseller who sells a Nat Gould novel to a youth who would obviously be the better for one of the works of the late Samuel Smiles.

CHAMBERS' JOURNAL.

YESTERDAYS AND TO-MORROWS.

AH, our eyes are ever turning,
Filled with some unfathomed yearning,
Turning back along the pathway where time flings its
mellow haze;
And we count the frets and sighing,
In the silence unreplying,
In the silence that has fallen over all our yesterdays.

Memory would fain be bringing
Echoes of our golden singing,
Brings us melodies that cheered us when the light was
on the wane;
But our senses always falter
At some old deserted altar
Where we sacrificed to sorrow and bitterness and pain.

Step by step we foot the highways,
Or we fare along the byways,
Where the shadows were the longest and the path was
rough and steep;
And we catch the sound of sobbing
Through the mystic stillness throbbing,
And we wonder what of happiness our yesterdays
may keep.

But the morrows beckon to us,
Call us from the paths that knew us,
Lure us on with smiles and sunshine down new roadways
broad and fair;
And they coax us with the promise

That they never will take from us
All the goodness and the gladness that we thought we
lost back there.

Then with fingers swift and certain
We draw close the velvet curtain
That swings down across the present in the sunset's
golden haze ;
And we turn to our to-morrows,
That still sweetness from the sorrows
Which we thought were sent to sadden all our olden
yesterdays.

OWEN E. M'GILLICUDDY.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন
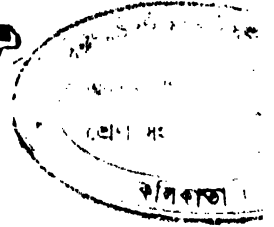
৭ম খণ্ড। } ঢাকা—শ্রাবণ, ১৩২৪। { ৪র্থ সংখ্যা।

বাংগাল ও বাংগালী।

কথায় বলে 'একদেশের বুলি, আর একদেশের গালি'। দেশভেদে ভাষাভেদ হয়। আগে দেশ, পরে ভাষা। লোক না থাকিলে কথা বলে কে? দেশ না থাকিলে লোক থাকে কোথায়? লোক-বিহীন দেশ হইতে পারে, কিন্তু, লোক বিনা ভাষা সম্ভবে না।

বঙ্গভাষা কি? বঙ্গের ভাষা—'বঙ্গ'-বাসীর ভাষা। 'বাংগালা' ভাষা কি? 'বাংগাল'এর ভাষা বা 'বাংগাল' দেশ, অর্থাৎ 'বঙ্গ'-দেশের ভাষা—বাংগালীর ভাষা।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' এইরূপ বলিয়াছেন:—

"দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ভাষাভেদকে দেশভেদেরই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

বাচো যত্র বিভিন্নন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥

(উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্মনুবচন।)

—যে দেশের ভাষার বিভিন্নতা হয়, গিরি বা মহানদী যাহাতে ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহা যায়।

সুতরাং, যৎকালে বঙ্গদেশে কোনওরূপ প্রাকৃত ভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তৎকালে এদেশে যে একটী আদিম ভাষা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় সেই ভাষার সহিত প্রাকৃত ভাষার সর্ব্বতোভাবে মিশ্রণ হওয়ায় এই বাংগালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। অদ্যাবধি এই ভাষায় ঢেঁকি, কুলা, ধুচুনি প্রভৃতি এমত কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যে, সে সকল না প্রাকৃত, না সংস্কৃত, না পারসী, না আরবী। তদ্ভিন্ন, বাংগালার ক্রিয়া, কারক, বিভক্তি প্রভৃতি এপ্রকার ভিন্ন রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাকে কোনমতেই কেবল প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, একথা বলিতে পারা যায় না। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইবার যেরূপ প্রণালীবদ্ধ নিয়ম-পদ্ধতি পাওয়া যায়, প্রাকৃত হইতে বাংগালা উৎপন্ন হইবার সেরূপ নিয়মাদি কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং, কি প্রণালীতে ও কি ক্রমে প্রাকৃত হইতে বাংগালা হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বোধ হয়,

কেবল প্রাকৃতই বর্ত্তমান বাংগালার উপাদান নহে। বাংগালার মূলে যে আদিম ভাষা ছিল, তাহার কথা দূরে থাকুক, বাংগালা ভাষারই অতি প্রাচীন গ্রন্থ একখানিও পাওয়া যায় না। তাহার কারণ সংস্কৃতের প্রাধান্য।”

বস্তুতঃ ধরিতে গেলে, বাংগালা ভাষার উন্নতি মুসলমানদের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গে হিন্দু-রাজত্বের সময় বিদ্বান উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতেন, বাংগালা ভাষার ধার ধারিতেন না। মুসলমানদের আমলে হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা অনেক কমিয়া যায়, অপরন্তু সংস্কৃত ও বাংগালা ভাষা অল্লাধিক পরিমাণে বাদসাহী সুনজরে পতিত হয়। আকবর বাদসাহের সময়ে হিন্দুগণ ফার্শী ভাষা শিখিবার জন্য অগ্রসর হন। কয়েকজন মুসলমানও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে ফৈজি ও আবুলফজলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজন রামায়ণ ও মহাভারতের ফার্শী অনুবাদ করিয়াছিলেন। পঞ্চতন্ত্রেরও ফার্শী তর্জ্জমা হইয়াছিল। বাংগালা ভাষার উৎসাহ-দাতাগণের মধ্যে হুসেনসাহ ও পরাগলখাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় হইতেই বাংগালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ ঢুকিয়া উহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইংলণ্ড নরমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইলে ইংলণ্ডের ভাষায় যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, মুসলমানগণ বঙ্গ অধিকার করিলে পর বঙ্গীয় ভাষায় কতকটা সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পুরাতন এংলোসাক্সন নরমান প্রভাবে যেরূপ বর্ত্তমান ইংরাজি ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ পুরাতন 'সাধুভাষা' মুসলমানী প্রভাবে বর্ত্তমান বাংগালা ভাষা হইয়াছে।

ভাষাটা জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বা আলোকচিত্র (photograph) এবং প্রতিধ্বনি (gramophone) বিশেষ। ভাব প্রকাশের জন্যই ভাষা—ভাব না থাকিলে ভাষার কার্য্য থাকে না। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রসার। ভাব লইয়া ভাষা। যে পরিমাণে ভাষা জাতীয় জীবন প্রকাশ করিতে সমর্থ—সে পরিমাণে সে ভাষা সভ্য—সে সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য।

যে ভাব যে অভিজ্ঞতা যে জাতিতে নাই বা ছিল না, সে জাতির তদ্বোধক ভাষাও নাই বা ছিল না। ভাবের অভাব বশতঃই ভাষার অভাব। সময়ের গতিতে নূতন ভাব আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরিভাষা সৃজন করিতে হয়।

দুই একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। যথা—'ভক্তি'। এই ভাবটী ভারতের আপামরসাধারণের আবাল্য-পরিচিত বস্তু, কিন্তু, পাশ্চাত্য জগতের অপরিচিত—তাই ইংরাজিতে 'ভক্তি' প্রকাশক শব্দ নাই। কোন এক উচ্চবিদ্যালয়ে দেখিলাম সম্রাটের ছবির নীচে লেখা আছে—'রাজাকে ভক্তি কর'—'honour the king'—ইহার অধিক সুন্দরতর ভাষান্তর ইংরাজিতে সম্ভবে না।

অপরন্তু, patriotism এই ভাবটী পাশ্চাত্য জন-সাধারণের আবাল্য মজ্জাগত এবং সুখ-বোধ্য ভাব, কিন্তু, ভারতে নূতন। তাই, অনেক ঘুরাইয়া আমাদিগকে 'দেশ-প্রেম', 'স্বদেশ-প্রীতি' ইত্যাদি বলিতে হয়।

তদ্রূপ Local Self-Government—ইহার বঙ্গা-নুবাদ লইয়া চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিম বাবু, স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি বিদ্যারথী মহারথীগণের মধ্যে বহু বাদানুবাদ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন 'আত্ম-শাসন'। অনেক গবেষণার পর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের 'স্বায়ত্ত-শাসন' কথাটী গৃহীত হয়। তাহা আজও চল আছে।

বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক পরিভাষা গঠনের যে আয়োজন হইয়াছে তাহাও নব নব অভাব পরিপূরণার্থ সময়োপযোগী চেষ্টা মাত্র। আমাদের দেশে ইতিহাস বলিয়া বর্ত্তমান কালের ইতিহাসরূপী কোন স্বতন্ত্র জিনিষ ছিল না। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ধর্ম্মসমাজ, লোকনীতি ইত্যাদি সকলই একত্রে সন্নিবেশিত থাকিত। প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ, মন্দির, মঠ, মূর্ত্তি, স্তম্ভ, প্রস্তরফলক, তাম্রশাসন ইত্যাদি নানা আকারে চতুর্দ্দিকে জাতীয় ইতিহাসের উপাদান ছড়ান আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা ঐতিহাসিক উত্তম নিদর্শন জাতীয় প্রাচীন সাহিত্য এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত ভাষা-ভঙ্গী। ভাষাটা মুখের নিশ্বাসমাত্র নহে। ইহা সঙ্গীতের মত হাওয়ায়

উৎপন্ন হইয়া যাওয়াতেই লীন হইয়া যায় না কিংবা রামধনুর মত আকাশে বহুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ক্ষণকাল মাত্র লোকচক্ষুতে প্রকাশিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় না।

ভাষাতত্ত্ব ভূগঠন-ধারার মত। স্তরের পর স্তরে স্মরণাতীত যুগ হইতে অতীতের চিহ্ন, দাগ, ছাপ, বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত গৌরব-বাহিনীর সাক্ষী-স্বরূপা ধরিত্রী বিরাজমানা। তদ্রূপ ভাষাতত্ত্ব। অতীতের ঠিক কোন ছেদ হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি কেহ বলিতে পারে না। সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফার্শী, হিন্দি, নানা অনার্য্য ভাষা—এই-রূপ কত কি সংমিশ্রিত হইয়া বাংগালা ভাষা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। এক একটী শব্দ-ভঙ্গিমা বা বাগ্‌ধারার (idiom) সঙ্গে কত কালের স্মৃতি বিজড়িত—এক একটী উক্তি, প্রবচন, কিম্বদন্তী যেন এক একটা প্রাচীন তথ্যের জীবন্ত কাহিনী, এক একটা গ্রাম্য কথা, উপকথা, রূপক, হেঁয়ালি, গীতি বা গাথা—প্রত্যেকেই যেন এক একটী আলোকবর্ত্তিকা, অতীতের এক একটা বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, প্রত্যেকেই যেন এক একটা প্রাচীন ইতিহাস-কণিকা।

প্রত্যেক ভাষারই একটা অনন্যসাধারণ নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, একটা আদর্শ (type) নির্দ্দিষ্ট আছে, একটা প্রাচীন কাঠাম (frame) ঠিক আছে, একটা অতীত ইতিহাস আছে। জাতীয় সভ্যতার মতন ভাষাও একটা জীবন্ত বস্তু। উভয়েরই একটা মূল আছে—ক্রমবিকাশ আছে—ক্রমিক ইতিহাস আছে। উভয়েরই একটা গোড়াপত্তন আছে, পীঠস্থান (base) আছে, একটা ভার-কেন্দ্র আছে, একটা প্রাণবস্তু বা core আছে, একটা প্রকৃতি বা ধাত আছে, একটা স্ব-ভাব আছে—আগাগোড়ার একটা ধারাবাহিক যোগাযোগ আছে। যে বস্তুরই হউক, ভাবকেন্দ্রটী ধৃত হইলে, পত্তন-ভূমি স্থির থাকিলে, পূর্ব্বাপরের যোগ বজায় থাকিলে উহা প্রতিষ্ঠিত থাকে, নতুবা নয়।

ভাষাটা জাতীয় সভ্যতার আলোক-স্তম্ভ বা মনুমেণ্ট সদৃশ; অতীত জীবনের সাক্ষীস্তম্ভ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সেকালের আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার, জাতি-প্রণালী, দ্রব্যাদি ব্যবহার-প্রণালী ইত্যাদি নানা বিষয় সুন্দররূপে জানা যায়। বস্তুতঃ, লেখকগণ ফটোগ্রাফার বা গ্রামোফোন-রেকর্ডার স্বরূপ—chronicler মাত্র। তাঁহারা যেমন দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন, তেমন লিখিয়াছেন; সংস্কারক বা নির্ম্মাতার স্বাধীনতা তাঁহাদের ছিল না—"যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখকস্য দোষো নাস্তি"—মাছিমারা কেরাণী বা নকলনবিশ মাত্র। তাঁহারা নিজ নিজ সুযোগ এবং সামর্থ্যানুসারে সেই সময়কার জাতীয় দৃশ্যপট আঁকিয়াছেন। ফটোগ্রাফারের কাজ ছবিখানি খুব ফুটাইয়া তোলা, গ্রামোফোন-কর্ত্তার কাজ ধ্বনিটী খুব সুস্পষ্ট বাজান। তদানীন্তন সভ্যতার পূর্ণ আলোক যেখানে পড়িয়াছিল সেই স্থানটা focus করিয়া তাঁহারা ছবি তুলিয়াছেন। প্রাচীন লেখাগুলি সমসাময়িক মজ্জাগত জাতীয় ভাবের প্রতিচ্ছবি মাত্র, সমসাময়িক সভ্যতার প্রকাশক এবং প্রতিধ্বনি মাত্র। সর্ব্বাপেক্ষা আলোকিত অংশের ছবিই লোকে তোলে—উহাই ভাল ওঠে এবং উহাই বহুদিন পরে সুস্পষ্ট থাকে এবং সমাদৃত হয়। ক্ষীণালোকে ছবি কেহ তোলে না বা উহা বেশীদিন টিকে না। চতুর্দ্দিকস্থ সীমানাপ্রান্তে ছবি তেমন উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে না যেমন ফোকাসের নিকট হয়।

কয়জন প্রাচীন লেখক বঙ্গে, কয়জন রাঢ়ে বা বরেন্দ্র ভূমিতে জন্মিয়াছিলেন এইরূপ সঙ্কীর্ণ গণনা অনাবশ্যক। কারণ, প্রাচীন 'বঙ্গ'-সভ্যতা অতিক্রম বা খর্ব্ব করিয়া রাঢ় বা বাগরীতে অন্য একটা সভ্যতা বা culture স্বতন্ত্র ভাবে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া ইতিহাস বলে না। লেখক, চিত্রকর, Historian, Chronicler বা ভাটের রচিত বিষয়, বিবরণ বা চিত্রের সত্যাসত্য বা মূল্যের সহিত তাঁহার জাতি, কুল বা নিবাসের সংস্রব নাই। মেগাস্থিনিস, হিউয়েনথসাং, আবুল ফজল প্রভৃতির লিখিত বিবরণের দ্বারা তাঁহাদের স্ব স্ব নিবাস-ভূমির গৌরবের বেশী-কমি হয় না।

১৪ শতকে বীরভূম-বাসী চণ্ডীদাস "নান্নুরের মাঠে, বাশুলী আদেশে" লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যেসব চিত্র আঁকিয়াছেন এবং তদানীন্তন জাতীয় জীবনের যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কি

সেই মগন্ত গণ্ডগ্রামের বা বীরভূমের স্থানীয় চিত্রমাত্র, না, উহা তদানীন্তন সভ্যতার পূর্ণ আলোক যেখানে পড়িয়াছিল তাহাকেই ফোকাস করিয়া তোলা একখানি চিত্রের আভাস মাত্র? চণ্ডীদাসের লেখাতে এবং অন্যান্য প্রাচীন মহাজন-পদাবলীতে এমন সব শব্দ-প্রয়োগ আছে এবং বীরভূমে থাকাকালীন লক্ষ্য করিয়াছি যে, সে অঞ্চলে এখনও এমন বহুতর বাগ্ভঙ্গি এবং শব্দাবলী প্রচলিত আছে, যাহা নিকটবর্ত্তী রাঢ় বা বাগ্‌ড়ী অঞ্চলে অপরিজ্ঞাত, কিন্তু বাংগলা দেশের চিরপরিচিত।

পুনশ্চ দেখিতে পাই যে, ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কবি কবিকঙ্কণ রাঢ়দেশে বসিয়া লিখিলেও তাঁহার চণ্ডীতে এমন বহুতর শব্দ এবং বাগ্ভঙ্গিমার প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা তাঁহার নিজের দেশস্থ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য টীকা টিপ্পনির প্রয়োজন হয়, অথচ, ঐ গুলি বাংগালা দেশে আপামরসাধারণের নিকট চির-পরিচিত এবং সুখবোধ্য। ১৩১৩ সালে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে কয়েকটী মাত্র উল্লেখ এখানে করি। রাঢ়ে কোন এক পল্লীগ্রামে প্রাপ্ত হাতের লেখা কবিকঙ্কণ চণ্ডী আমার নিকটে আছে, সময় এবং সুযোগ অনুসারে উহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এখন উদাহরণ কয়টী দেখান যাউক :—

অথল (থই বা স্থল রহিত), ইচলী (মাছ), উজবক, উদাম (বন্ধনমুক্ত), উধার (হাওলাত, ধার), উনা (কম), কই (কোথায়), কর্জ্জ, কাউয়া (কাক), খরা (রৌদ্র), খেদান, চৈত (চৈত্র), ছাওয়াল, ছই (নৌকার ঘর), জুখিয়া, ঝট (শীঘ্র), ঝি (কন্যা), টঙ্গ (মাচা), তেসনি (তিন বৎসরের), তেহাই (এক তৃতীয়াংশ), দাপে (দর্পে), দাপট, নফর, নাইয়া (মাঝি), নাট (নৃত্য), নিরালা (নির্জ্জন), নীত (নীত), ন্যাশা, পাখালিয়া (ধুইয়া), পাতি (পত্র), পানা (সরবৎ), পো (পুত্র), ফজর (প্রাতঃকাল), বক্‌রী (ছাগল), বাজা (বন্ধ্যা), বীড়া (পানের), বেগর (ব্যতীত), মইল (মাদল), মোচ (গোঁফ), লড়ে (দৌড়ে), লড়ালাড়ি (দৌড়াদৌড়), মালজমি, খিল, লোর (চক্ষের জল), শিথা (শিয়াল), শুতিল (শয়ন করিল), শুয়া (শুকপক্ষী), সাঁঝ (সন্ধ্যা), সাবাসী (ধন্য), সিনান (স্নান), সীপ (কোশা), হকল (সকল), হরবখ্ত (সরবখ্ত), হাজাম (নাপিত) ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলিও দৃষ্ট হয়ঃ—

লোটিয়্যা, পাল্য (পাইল), বন্দোঁ (বন্দনা করি), দেখাইল্য, বাজায়্যা, কৈলুঁ, পায়্যা, হৈলা, কৈলা, থুইল, কৈল, দিলা, দিল, লয়্যা, বসাল্য, খায়্যা, ইত্যাদি।

জলপান, জলপীড়ি (জলযোগ—বাংগালায় এখনও আহার সংশ্রবে 'পাতপীড়ি' প্রয়োগ আছে; 'জলপান' শব্দেরও যথেষ্ট প্রচলন আছে), মাজা (কোমর), সভাকার (সকলের), লেখাজোখা, কুপী (তৈলপাত্র) নৈরাকার, তৈল, বাগ্যন (বেগুন), তিত (তিতা), ঝারি (গাড়ু), ইনাম, পানী (জল) ইত্যাদি।

অন্যান্য প্রাচীন বাংগালা পুঁথিতেও এইরূপ অসংখ্য, প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। একটু গবেষণা করিলেই দেখা যাইবে যে, সমস্ত প্রাচীন বাংগালা লেখাই বাংগাল ভূমের আবহমান কাল হইতে প্রচলিত শব্দবিন্যাস এবং বাক্‌ধারার জীবন্ত সাক্ষ্যমাত্র। লেখকেরা রাঢ় বা বগড়ী ও অন্য ভূখণ্ডবাসী হইলেও বাংগালা ভাষায় যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা বাংগালা ভূমের ভাষাপদ্ধতির সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের লেখাতে নিজ নিজ গ্রাম বা প্রদেশের সঙ্গে যোগ পরোক্ষভাবে মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন তবে প্রশ্ন এই—বাংগালীর বাংগালা ভাষার আদর্শ কি? বঙ্গের প্রাচীন ভাবকেন্দ্র, পীঠস্থান (base) কাহাকে ধরিব? বাংগালার মূল বা গোড়া পত্তন—core বা প্রাণবস্তু কোথায় নিহিত? প্রাচীন লেখকদের চিত্রের ফোকাস স্থান কোনটা ছিল? প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে সভ্যতার পূর্ণ আলোক কোন্ অংশে পড়িয়াছিল? বাংগালীর বাংগালীত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে পরিস্ফুট এবং বিকশিত কোথায় হইয়াছিল? এখনও উহার ক্রমিকধারা এবং পূর্ব্বাপর যোগাযোগ এবং নিজস্ব বিশেষত্ব অধিকতর স্পষ্টরূপে কোথায় বজায় রহিয়াছে—রাঢ়ে, বগড়ীতে, না বাংগাল ভূমে? পদ্মাপারে (ফরিদপুর, নদীয়া, রাজসাহী, যশোহর, খুলনা সহ), না সেদিনকার

কলিকাতার আশেপাশে? জাতীয় সভ্যতার প্রাচীন মহামহীরুহের মূল প্রোথিত হইয়াছিল কোথায়? বাংগাল ভূমে, না রাঢ়ে বাংগালীর জাতীয় প্রাচীন ভারকেন্দ্র—বাংগালীর বাংগালীত্বের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন বনিয়াদ-প্রোথিত ভাগীরথীতীরে, না পদ্মাপারে? জগতের আসরে প্রাচীন-সভ্যতা-বিচার-সভায় কৌলীন্যের মর্য্যাদা আদায় করিতে হইলে বাংগালী দোহাই দিবে কাহার, বঙ্গের, না রাঢ়ের, না বগড়ীর, না মিথিলার, না কলিঙ্গের, না উৎকলের, না কামরূপের? বাংগাল ভূমি অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুজাতীয় সভ্যতার এবং নানা ঘাতপ্রতিঘাতের আলোড়ন আন্দোলনের লীলাক্ষেত্র হইয়া আছে। একদিকে যেমন ইহা গঙ্গা-প্রবাহিত দিগ্‌দেশান্ত হইতে সমাগত উর্ব্বর পলিমাটীর সন্নিবেশস্থল, অপরদিকে তেমনই ইহা আদিমকাল হইতে নানাজাতীয় সভ্যতার এবং শিক্ষাদীক্ষার শেষ লয়স্থান বা স্থির আবাস-ভূমি হইয়াছে। তাই, বাংগালার মাটীর, বাংগালার জলের এত উর্ব্বরতা শক্তি। বঙ্গভূমি প্রকৃতই রত্নপ্রসূ। গৌড় মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্তও বাংগাল ভূমি তাহার নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে বাংগালী জাতি নানা ঐতিহাসিক কারণ সমবায়ে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত সুদৃঢ়-প্রকৃতি-ঘটিত অথবা Tempered steelএর ন্যায়।

এখন প্রশ্ন এই, বাংগালাভাষায় রাঢ়, বগড়ী এবং বর্ত্তমান কলিকাতার স্থান কীদৃশ?

রাজকার্য্যের সৌকার্য্যার্থ অপেক্ষাকৃত অধুনাতন সময়ে রাঢ়, বগড়ী, বরেন্দ্র এই ভূভাগ-চতুষ্টয় বঙ্গের অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে ঐ ভূভাগগুলি বঙ্গের উপরে প্রাধান্য পাইয়াছিল। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়ীয় কবিকঙ্কণ বঙ্গেরই জয়গান করিয়াছেন—"ধন্যরাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।" তিনি 'কলিঙ্গ-মহীপাল,' 'কলিঙ্গ-ভূপতির' কথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু, কই, তিনিও আর বিশেষ করিয়া রাঢ় বা বাগড়ির প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন নাই। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে, চির-প্রসিদ্ধ উক্তি এইরূপ—"যশোর নগর ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।" ২৪ পরগণা জিলা তো সেদিনকার সৃষ্টি—আলিবর্দ্দির্খা কিংবা মিরজাফরের সময়। রাঢ়ের বা বগড়ির কোনও একটা স্থানের প্রাচীন উল্লেখ কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। এক 'তাম্রলিপ্তি' (তমলুক), সেও তো কলিঙ্গান্তর্গত। তারপর, 'সপ্তগ্রাম' সেও তো বেশীদিনের কথা নয়। সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম), হুগলী এবং চাটিগাঁ (চট্টগ্রাম) একই সময়ে সমৃদ্ধিশালী বন্দররূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সেই সময়ে নৌবাণিজ্য উপলক্ষে বাংগালা দেশের সহিত সাতগাঁ অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। রাঢ়ীয় কথাবিকৃতি এবং সুরভঙ্গিকে লক্ষ্য করিয়া 'সাতগেঁয়ে বুলি' নামক বিদ্রূপাত্মক সংজ্ঞা প্রচলিত হয়। অপরন্তু বাংগাল মাঝমাল্লার বিদ্রূপাত্মক উল্লেখ কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আছে।

মোগল শাসনের সময়ে বাংগালা দেশকে ২২টা 'সরকার' বা রাজস্ববিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সাতগাঁ সরকার নামক একটা বিভাগ ছিল। বর্ত্তমান ২৪ পরগণা উহার অন্তর্গত। যাহা হউক এ সকলই আধুনিক প্রমাণ। মেগাস্থিনিসের বর্ণিত 'গঙ্গ-রীডিয়' দেশ এবং বর্ত্তমান রাঢ় দেশ এক, এইরূপ কেহ কেহ বলিতে চান। প্রকৃতই ঐ শব্দটা 'গউড়ীয়' বা 'গৌড়ীয়' দেশবোধক যে নহে ইহার অকাট্য প্রমাণ কেহ দিয়াছেন কি? তাহার পর, দেশটা প্রাচীন ত বটেই; রাঢ় নামেই হউক কিংবা 'সুহ্ম' কিংবা নামহীন রূপেই হউক, ভূখণ্ড হিসাবে উহার প্রাচীন অস্তিত্ব কে অস্বীকার করিবে? দেশমাত্রই একটা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সভ্যতার পীঠস্থান কিংবা একটা অনন্যসাধারণ শিক্ষাদীক্ষার (culture) বিকাশক্ষেত্র হইয়া থাকে ইতিহাসে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং ২৪ পরগণা প্রাচীন বঙ্গসভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল এবং আছে। ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের কথা। বঙ্গ অবয়ব বা মূলদেহ (parent stock) এবং এই প্রত্যঙ্গ বিভাগগুলি সেই অঙ্গের প্রত্যঙ্গ বিশেষ বা মূল বৃক্ষের শাখাপল্লবস্বরূপ; পরস্পর পরস্পরের

সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, একে অন্যের সাহায্যকারী ও পুষ্টিকারক ; একই বংশের জ্ঞাতিকুটুম্ব এবং আত্মীয়। বঙ্গের স্থান, জ্যেষ্ঠের স্থান-রাঢ়, বগড়ী অনুজ, কনিষ্ঠ। বিচ্ছেদ বিভাগের দিন আর নাই। মূলতত্ত্ব অস্বীকার করিয়া, অতীতকে অবজ্ঞা করিয়া স্বাভাবিক ভারকেন্দ্রকে স্বস্থান হইতে সরাইয়া লইয়া base or পীঠস্থান হইতে দূরে সরিয়া কলিকাতায় বসিয়া হাল আমলের একটা কৃত্রিম আদর্শ খাড়া করিলে চলিবে না। 'সাতগেঁয়ে বুলি', 'আলালী' ভাষা বা "বাবু"-ভঙ্গিমা এত বড় একটা বিরাট ক্রমবর্দ্ধনশীল জাতির উপরে স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করিতে পারিবে না। খিচুড়ীতে প্রাণরক্ষা হয় না—প্রাচীন ইতিহাস এবং অতীতের যোগচ্ছিন্ন করিয়া ভুঁইফোঁড় বস্তু উত্থিত হইতে পারে, কিন্তু উহা বেশীদিন বাঁচে না। বটগাছে পরগাছা জন্মিলেও উহা মূলবৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র।

'পূর্ব্ব'-বঙ্গ, 'পশ্চিম'-বঙ্গ, এইরূপ কাল্পনিক বিভাগ করিবার অধিকারই কি আবশ্যকতাই বা কি? বিশেষতঃ, কলিকাতায় বসিয়া রাঢ়ীয় এবং বগড়ীয় শব্দ-বিকৃতি বঙ্গভাষা নামে চালাইবার সনন্দ কে দিয়াছে?

বঙ্গদেশ—বাংগাল-ভূমি, যাহা চিরকাল ছিল তাহা এখনও বর্ত্তমান। আদিম বাস্তুভিটায় সেই আদিম বাংগালী বংশের বংশধরগণ সশরীরে বর্ত্তমান—দুইজন পাঁচজন নহে—একটা শাখা বা সম্প্রদায় জাতিবিশেষমাত্র নহে, কিন্তু, সর্ব্বজাতীয় সকল শ্রেণীর লোক, সংখ্যায় সর্ব্বসমেত ২।৩ কোটী হইবে।

মুঘল সময়ে, বঙ্গদেশ ভাঁটিমুলুক বা 'বাংগাল' নামে পরিচিত ছিল। ইংরাজ কবি মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাব্যে 'Bangala' নাম আছে। ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণও ইতিহাস-প্রচলিত প্রাচীন নামই বজায় রাখিয়াছেন। 'Bengal', 'Bengalee', 'বাংগাল' এবং 'বাংগালী'র রূপান্তর মাত্র। ১৭৬৫ সালে যখন দেওয়ানী গ্রাণ্ট হয়, তখন বঙ্গবিহার উড়িষ্যা লইয়া যে দেশ-বিভাগ তাহারই সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল, উহাই Bengal Presidency। কই রাঢ় বাগড়ী ত স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত হয় নাই, কিংবা "পূর্ব্ব"-বঙ্গ, "পশ্চিম"-বঙ্গ এইরূপ বিভাগ ত ছিল না। তাই, আবার প্রশ্ন করি, পবিত্র বাণী-মন্দিরে "পূর্ব্ব"বঙ্গ ও "পশ্চিম"-বঙ্গ এইরূপ ঘর-ভাঙান বিভেদের জন্য দায়ী কে, এবং বাংগাল বলিতেই যে একটা অবজ্ঞামিশ্র ভাবের সূচনা হয় ইহার জন্য দায়ী কে? মানুষ আমরা কি এতই অন্ধ এবং ভ্রান্ত! রাঢ়েরই হই কি বগড়িরই হই বা সেদিনকার প্রাধান্যপ্রাপ্ত কলিকাতাসহরবাসীই হই—বঙ্গেতর নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহাসিক গৌরব আমাদের কিছু আছে কি? আমি বাংগালী—বঙ্গের লোক ইহা ব্যতীত আমার অন্য গৌরব করিবার কিছু আছে কি? আমি 'বাংগালী', 'বাংগাল', 'বঙ্গ'বাসী ইহাই ত গৌরব। সকলেই একই মায়ের সন্তান—একই দেবীর উপাসক। 'বাংগাল', বাংগালী' ইহাতে অবজ্ঞা বা নাসিকাকুঞ্চন কারণে আমি নিজের প্রতিই অবজ্ঞা প্রয়োগ করি। চিন্তাহীনতা এবং বালোচিত চপলতা-বশতঃ এরূপ ঘটে সন্দেহ নাই। চিন্তাশীল বিজ্ঞব্যক্তিগণের ভিতরেও যদি "পূর্ব্ব"-বঙ্গ "পশ্চিম"-বঙ্গ এইরূপ দ্বৈত ভাব স্থান পায় তাহা হইলে উহা জাতীয় উন্নতির পক্ষে নিতান্তই হানিকর সন্দেহ নাই।

যতদূর স্মরণ হয়, ৺ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাংলা ভাষায় কলিকাতা অঞ্চলের প্রাধান্য স্থাপিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অতি চিন্তাশীল এবং স্থির ধীর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অন্যান্য ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষারও একটা বাঁধাবাঁধি আদর্শ (type) অক্ষুণ্ন রাখা চাই। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, জাতীয় বাগ্‌ধারা (idiom style) একটা বই দুইটা হইলে চলিবে না। তিনি কলিকাতার পক্ষ হইয়া সেই অঞ্চলের বাগ্‌ভঙ্গিমাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং মুরুব্বিয়ানাভাবে পূর্ব্ববঙ্গ-বাসীদিগকে অনেকটা এই সুরে উপদেশ দিয়াছিলেন—"দেখ ভাইরা, তোমাদের বাংগালদেশেরই দাবী অধিক বটে ; তবে কি না, কলিকাতা রাজধানী হওয়া বশতঃ ইহারই প্রাধান্য স্বতঃসিদ্ধ? অতএব গোলযোগ করিও না কিংবা বাংগাল বলিয়া খেপাইলে রাগ করিও না,—দুঃখিত হইও না—এ অঞ্চলের বাগ্‌ভঙ্গীভাষায় প্রচলিত

হউক ইত্যাদি"। তাঁহার যুক্তির সমর্থনে প্রধান উক্তি ইহাই ছিল যে, কলিকাতায় এবং কলিকাতা অঞ্চলের ছাপাখানায় এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয় পূর্ব্ববঙ্গে তত হয়না। এই যুক্তির অসারতা স্বতঃসিদ্ধ। কোনও সহরে নানাকারণে মুদ্রাযন্ত্রাধিক্য হইতে পারে সেই হেতুতে ভাষার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লিতে যদি সমস্ত বাংগালা পুস্তকও প্রকাশিত হয়, অথবা কলিকাতা সহরে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হয় তাহা হইলেই দিল্লির আদর্শ বঙ্গভাষার নজীর হইবে না কিংবা কলিকাতার আদর্শ মহারাষ্ট্রের হইবে না। বঙ্গের অতীত গৌরব এবং প্রাচীন ইতিহাসের বিজয়ধ্বজা বংগালভূমেই প্রোথিত আছে এবং থাকিবে। বাণী-মাতৃকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দিব্যপ্রতিমা গড়িতে হইলে আবশ্যকীয় উপাদান উপকরণ বঙ্গদেশ হইতেই লইতে হইবে। রাঢ়, কলিকাতা প্রভৃতি প্রত্যন্ত বিভাগ-গুলি নিজ নিজ সাধ্যমত সরবরাহ করিবে—সকলে মিলিয়া একই মাতৃচরণে অর্ঘ্য জোগাইবে।

দ্বিতীয় কথা। কলিকাতার রাজধানী হওয়া না হওয়ার উপরে বাংগালার খাঁটি আদর্শ কি হইবে না হইবে তাহা নির্ভর করে না। রাজধানীমাত্রেই কোন আদর্শ-বিশেষের নিরেট বিশুদ্ধি বজায় রাখিবার পক্ষে অনুকূল নহে। কারণ, রাজধানীর প্রাধান্য রাজ্য-প্রয়োজনে এবং এই প্রয়োজনের ফলেই রাজধানী অসংখ্য বিপরীতভাব এবং আদর্শের সংমিশ্রণ-ক্ষেত্র। সহরে—বিশেষতঃ কলিকাতার মত সহরে—স্ব স্ব প্রধান ভাব এবং স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি ফুটিবার এবং প্রশ্রয় পাইবার সুযোগ যথেষ্ট। নিত্য-নূতন এবং নানা অদ্ভুত ভাবের সূচনা এবং বিকাশ বড় সহরে খুব সহজে হয়।

কলিকাতাতেই 'আলালী' ভাষার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। ইহার সহিত 'সাতগেঁয়ে বুলি' এবং বর্ত্তমানে একরকম একটা খিচুড়ী ভাষা—যাহাকে 'বাবু' ভাষা বলিলেও চলে—সংমিশ্রিত হইয়া বঙ্গভাষা নামে এক অপরূপ নূতন বস্তু অবাধ গতিতে চলিয়াছে। উহা 'সাধু'-ভাষা ত নহেই, বরং উহা ভাষা-বিকৃতি বা অপ-ভাষা নামে নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। 'হ্যাঁথা', 'হোঁথা', 'গেনু'. 'খেনু', চনু', 'মনু', 'গ্যাছলুম', 'ছ্যালো' (ছিল), 'কোচ্ছ্যালো' (করছিল), 'আসচেলো' (আসছিল), 'হাঁ গা' (হাঁ ওগো), 'চ্যান', 'দুকুর', 'ভেতর সেঁদোনো' (ভিতরে প্রবেশ), 'মদ্দ' (পুরুষ), 'বাস্ক', 'টেস্ক', 'মুচে', 'নাউ', 'পেন্নাম' (প্রণাম), পেরকাশ (প্রকাশ), পেরবোধ (প্রবোধ), হ্যাঁলা (হ্যাঁলো), রেত্তে (রাত্রে), শাউরী, জেঠাই, কাকী (খুড়ী) ইত্যাদিরূপ অসংখ্য প্রয়োগ শুধু যদি 'ইতর' 'Vulger' শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে বলিবার কথা থাকে না।

তারপরে—বর্ত্তমানে একদল লোক জুটিয়াছেন যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত 'ইতর' প্রয়োগ-গুলিকে একটু রূপান্তরিত করিয়া 'গেলুম' 'মলুম' 'খেলুম' ইত্যাদিরূপে অতিমাত্রায় চালাইবার পক্ষপাতী। কোনও ব্যঙ্গ-রসিক পত্রী-সম্পাদক ইহার নাম থুইয়াছেন 'ব্যাঘ্রী' ভাষা। 'ব্যাঘ্রী'ই হউক আর মানুষী বা অমানুষীই হউক, শিক্ষিত 'বাবু' আমরা কলিকাতায় বসিয়া লেখাতে, কথাবার্ত্তায় এবং বক্তৃতাদিতে বঙ্গভাষার নাম দিয়া একটা অদ্ভুত ভাষা-ভঙ্গী চালাইতেছি তৎপ্রতি অচিরে সাহিত্যসেবীমাত্রেরই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছে। কতকগুলি নমুনা দেই। যে কোনও একখানা পুস্তক কিংবা সংবাদপত্র ধরিলেই উদাহরণের অভাব হইবে না। এমন কি 'প্রবাসীর' মত কাগজ, যাহার সুপরিচালনা এবং আদর্শের একটা বিশিষ্টতার খ্যাতি আছে, তাহা হইতেই রাশি রাশি উদাহরণ দেওয়া যায়। যে কোনও মাসের কাগজ লইলেই দেখা যাইবে যে, রামানন্দ বাবুর স্বকীয় লেখা ব্যতীত অন্যত্র বহুস্থলেই আধুনিক বিকৃত প্রয়োগ নিরঙ্কুশভাবে চলিতেছে। গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী' ধরিয়া কয়েকটা উদাহরণ দেই। স্মরণাতীত যুগ হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শব্দগুলি যে আকারে বাংগালায় আপামরসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা বন্ধনীর মধ্যে দেখাইলাম। উদাহরণগুলি এই:—যাক্ (যাউক), তৈরি করিয়া (তৈয়ার করিয়া), দেখানো, কোনো, মতো, কালো, ভালো, পরো, বলবো, খাটো, বানানো, পাঠানো, খোলো

(এই শব্দগুলি 'ও'কারবিহীনরূপে বাংগালায় প্রচলিত), ছুটো (ছুটা), ঝোলানো (ঝুলান), জলো (জলা), ধূলো (ধূলা), সুতো (সুতা), তুলো (তুলা), একশো (এক শ), নৌকো (নৌকা), ভালোবাসা (ভালবাসা), শেখা (শিখা), মেলেনা (মিলেনা), বুড়ো (বুড়া), নেই (নাই), উঁচু (উচা), নীচু (নীচা), ডান (ডাইন, ডাহিন), চ্যাটাই (চাটাই), অভ্যেস (অভ্যাস), ফেরা (ফিরা), দোর (দুয়ার), জিজ্ঞেস (জিজ্ঞাসা), খিদে (খিদা), ইংরেজ (ইংরাজ), দুঃখু (দুঃখ), ব্যায়রাম (ব্যারাম), ওপর (উপর), এক্ষুণি (এক্ষণি, এক্ষণ, এক্ষণই) পেন্নাম (প্রণাম), জিনিষপত্তর (জিনিষপত্র), হিংসে (হিংসা), গহনাগুলো (গহনাগুলা, গহনাগুলি), দেবো (দিব), ভদ্দর (ভদ্র), মাইনে (মায়না, মাহিয়ানা), ধর্ম্মপুত্তুর (ধর্ম্মপুত্র, ধর্ম্মপুত্র), টেপা (টিপা) টেপা-টিপি (টিপা-টিপি), দেবে (দিবে), আকাট (আ-কাঠ), মন্নু (মরলাম, মল্লাম, মৈলাম), পালুনুম (পারলাম, পাল্লাম), দেখলুম (দেখলাম), মেলনুম (মেল্লাম), পারতুম (পারতাম), উঠতুম (উঠতাম), হতুম (হৈতাম), লাগাতুম (লাগাতাম), থাক্‌তোনা (থাকতনা), হোক (হউক), কেতাব (কিতাব), টুক্‌রো (টুকরা), কাটানো (কাটান), সত্যিকার (সত্যকার), আপিস (আফিস), বুনো (বুনা), ওঁচা (ওছা), সাধা-সিধে (সাদাসিধা), নেবে (নিবে), কেনে (কিনে), সবুজে (সবুজ), শুকিয়ে (শুখায়ে), কুঁজো (কুজা), ওষুধ (অষুধ), বেঁধে (বেন্ধে), চাঁচিলে (চাছিলে) 'বাঁধা-কপি (বান্ধা-কফি)' বুলোন (বুলান), আস্পর্দ্দা, কোরোনা, পেয়েচে, করেচি, পরেচে, হয়েচে, লিখেচেন, পাচ্ছি, খিতিয়ে (২), বড় নিতাম না—ইত্যাদি। এই ত গেল 'প্রবাসীর' কথা এবং তাহাও মোটে এক মাসের হিসাব।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরিয়া কত শব্দ-বিকৃতি এবং অশুদ্ধ বাগ-ভঙ্গি নানা সংবাদপত্র, প্রকাশিত পুস্তক, চিঠিপত্র, কথাবার্ত্তা এবং বক্তৃতাদির ভিতর দিয়া দেশময় সাধুভাষার নামে প্রচারিত হইতেছে, তাহার লেখা-জোখা নাই। রাশীকৃত উদাহরণ অনায়াসেই দেওয়া যায়। আরও গোটাকয়েক মাত্র এখানে দেই। ঐ শব্দগুলির বাংগালার প্রচলিত রূপ ব্রাকেটের মধ্যে দিলাম। যথাঃ—

চাল (চাউল), ডান (ডাইন), সূয্যি (সূর্য্য), মদ্দ (মরদ), সোমত্ত (সমর্থ), বাক্স (বাক্স), টেক্স (টেক্‌স), টেঁকসই (টিঁকসই) নিরিমিষি (নিরামিষ), হবিষ্যি (হবিষ্য), পথ্যি (পথ্য), বাকাড়ী (বাখাড়ী), যজ্ঞি (যজ্ঞ), দস্যি (দস্যু), দৈত্যি (দৈত্য), বিলিতি (বিলাতি), দিশি (দেশী), দিব্বি (দিব্য), কথাবাত্রা (কথাবার্ত্তা), রাত্তির (রাত্রি, রাত্র), দুকুর (দুকর, দ্বিং দুপহর, সং দ্বিপ্রহর), চ্যান (ছান, ছিনান, সিনান, স্নান), আঁব (আম), নেবু (লেম্বু), সুচি (লুচি), ছুঁচ (সূচ), মাচ, (মাছ) মাচি (মাছি), কাটি (কাঠি), কাট (কাঠ), মদু (মধু), সাদু (সাধু), কাঁটাল (কাঠাল), পাত্তর (পাথর), শুদু (শুধু), আঁঠা (আঠা), আটাশ (আটাইশ), মাতা (মাথা), মুণ্ডু (মুণ্ড), সৌকীন (সৌখীন), মুকোস (মুখস), এগারো (এগার), পোচানব্বই (পাঁচনব্বই, পঞ্চানব্বই), শাশুড়ী (শাশুরী), তাড়াতাড়ি (ত্বরা-ত্বরি), জ্যাটাইমা (জেঠিমা), কাকিমা (খুড়িমা), কোনে (কন্যা), বিছে (বিছা), বামুন (বামন, ব্রাহ্মণ), ভেতর (ভিতর), বেড়াল (বিড়াল), মূলো (মূলা), গো'লঘর (গোহাল ঘর, গোয়াল ঘর), গয়লানী (গোয়লানী), শে'ল (শিয়াল), দোর (দুয়ার), দোবো (দিব), রাঁধুনি (রান্ধনী), দুদ্ (দুধ), কাঁদা (কান্দা, ক্রন্দন, কন্দন), চাঁদ (চান্দ), ধাঁদা (ধন্ধা), ফাঁদ (ফান্দ), বন্দ (বন্ধ), কলসী (কলস), বোস্ (বসু), বোস্ (বৈস), হেঁদুয়ানী (হিন্দুয়ানী) ইত্যাদি।

কথ্যভাষা স্বভাবতঃই অনেকটা সহজ তরলগতিতে ধাইতে চায়। কথ্য-প্রয়োগে কতকটা অশুদ্ধি এবং বাগ্-বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী এবং সহনীয়, কিন্তু, লেখ্য ভাষায় একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম এবং নির্দ্দিষ্ট আদর্শ মানিয়া চলা প্রয়োজন। কথ্য এবং লেখ্য ভাষার গড়মিল যত কমে ততই ভাল। এ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় সংস্কারের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু, খামখেয়ালি বিকৃতি অমার্জ্জনীয়,

অভিচার, ব্যভিচার প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। মানুষের ন্যায় ভাষাকেও নিয়মাধীন রাখা প্রয়োজন। নইলে, মনুষ্য সমাজে যেমন অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়—মহা অনর্থ ঘটে—ভাষারও তেমনই যা-ইচ্ছা-তাই দশা ঘটে।

যেসব ভাষা বিকৃতির উদাহরণ দেওয়া হইল তাহার সমর্থনে 'আর্ষ' প্রয়োগ অর্থাৎ প্রাচীন লেখকদিগের প্রমাণ কেহ দিতে পারিবেন কি? বোধ হয় না। প্রাচীন মহাজন-পদাবলীর অনুসন্ধানে গত কয়েক বৎসর যাবত নিযুক্ত থাকিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে, কথ্য বাংগালা ভাষা যে আকারে আজ পর্যান্তও বঙ্গভূমে আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা রাঢ় বগড়ীয় অঞ্চলে প্রচলিত কথা অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধ। এই ত গেল এক কথা।

আর একদিকে এক বিভ্রাট লক্ষ্য করিতেছি তাহা এই—বহুতর শব্দ বঙ্গভূমে প্রচলিত আছে যাহার মূল হয় সংস্কৃত, নয় ফার্শী, নয় প্রাকৃত, নয় হিন্দি। শব্দগুলি সুন্দর ভাব প্রকাশক এবং চিরকালের পরিচিত। তত্রাচ উহারা কলিকাতার লেখাতে এবং কথাতে কুত্রাপি স্থান পাইতেছে না।

কয়েকটি উদাহরণ দেইঃ—

অন্দর, অছিলা (উপলক্ষ), আউয়ল (প্রথম শ্রেণীর), আক্কেল; আওয়াজ, আখেজ (শক্রতা), আখের (শেষ), আচম্বিত (হঠাৎ), আচংগোবি (আশ্চর্য্য), আনাজ (শাক সব্জি), আদত, আবরু, আবাদ, আমানত, আমেজ (আভাস), আয়মা (নিষ্কর), আয়েন্দা (আগামী), আরজি, আসল, আসমান্, ইনাম, ইজারা, ইস্তাহার, ইস্তক, ইসারা, উসুল, উমেদার, উজবগ (বির্ব্বোধ), আহম্মক, একুন (মোট), একতিয়ার, এমারৎ, এজমালি, ইজ্জৎ, এলাকা (সম্বন্ধ), বরখাস্ত, ওজর, ওক্ত (সময়, যথা, পাঁচ ওক্ত নমাজ, হোটেলে কয় ওক্ত খাইয়াছে), ওয়ারিশ, আলাদা, কাবু (কাহিল, দুর্ব্বল), কেরামত, কিনারা, কম-বেশ (ন্যূনাধিক্য), কসুর, কবুল, কায়েম, কামাই (অনুপস্থিত), কাবার (শেষ), কদর, দরদ, খয়রাত, খাতির, খামাখা (অকারণ), খাসা (উৎকৃষ্ট), খাস, খাতিরজমা (নিশ্চিন্ত), গোস্বা (রাগ), গরহাজির, গাফিলতি (শৈথিল্য), গুজরান, গুজব, চসমখোর (চক্ষুলজ্জাহীন), চৌহদ্দি, তরাতরি, দেওয়ার, তাজব, খেদান, খেজুর, ওসারা, চুলা, ইষ্টকুটুম্ব, আবখোরা, উদলা (অনাবৃত), পাতপীড়ি, রুসীঘর, হবিষ্যেরঘর, পাকের ঘর, জববন্ধ (বাকরুদ্ধ), বস্তানি, দস্তখত, ইস্তাফা, বেতরিবৎ, বেগুন, ঠাকুরদাদা, ঠাকুর কাকা, ঠাকুরমামা ইত্যাদি, ঠাইনদিদি, ঠাইনমাসি ঠাইনখুড়ি, ঠাইনপিসি, ঠাইনমাসি ইত্যাদি, খরার দিন, তরের পথ (স্থলপথ), বরাত (অদৃষ্ট), তামাম (সমস্ত), ফিকামারা, বিহান (প্রভাত) ইত্যাদিরূপ অসংখ্য শব্দ রহিয়াছে, যাহার যথেষ্ট প্রয়োগ হইতেছে না।

এইরূপ বহুতর শব্দ আছে।

এই সব শব্দগুলি অবজ্ঞাত হইয়া ক্রমশঃ শিক্ষিত সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবার পথে বসিয়াছে। এই শব্দগুলির ভিতরে অনেকগুলির মুসলমানী মূল, অনেক গুলি মিথিলার এবং অনেকগুলিই এমন যে, আসাম ও উৎকলবাসীরাও তাহাদিগের সহিত নিতান্ত অপরিচিত নহে। এই গুলিকে বাদ দেওয়াতে বঙ্গভাষার শক্তি এবং ব্যাপকতার হানি হইতেছে। বাংগালীর লেখায় এই সকল শব্দের বহুল প্রচলন থাকিলে, বঙ্গবাসী মুসলমানগণ, ওড়িয়া, আসামীগণ এবং বেহারীরা অনেক পরিমাণে তাঁহাদের সহিত বঙ্গভাষার রক্ত-সম্বন্ধের পরিচয় পাইয়া অন্ততঃ অংশতঃও বাংগালীর সহিত তাঁহাদের নিজেদের জাতিত্ব স্বীকার করিবেন। এটা একটা কম লাভ নহে। বঙ্গভাষাকে রাঢ় বা বগড়ী বা কলিকাতার গণ্ডীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উহার ব্যাপক প্রভাব থাকিবে না।

রাঢ়ের কবিকঙ্কণের (১৬শ শতক) উদাহরণ আগেই দিয়াছি। মিথিলার বিদ্যাপতি, এবং নান্নুরের চণ্ডীদাসের (উভয়েই ১৫শ শতক) লেখা হইতে কতকগুলি উদাহরণ দেই। বঙ্গের সর্ব্বত্র আপামর জনসাধারণ এই-গুলির সহিত (স্থলবিশেষে এক আধটু রূপান্তরিত ভাবে) চিরপরিচিত—অথচ এই গুলির যথেষ্ট সমাদর নাই—যথাঃ—

সিনান, পুছা (জিজ্ঞাসা), জীয়া (বাঁচা), সুত (সূত্র), টুটা (ছিন্ন) ভর, কান্দ, চান্দ, চন্দা, ধন্দা, ছান্দে, বন্ধ বান্ধা, ধাধিতে, (দঁ এবং ধঁ নহে) পরমাদ, পিরীতি, বৈরব, জীব, জীউ (প্রাণ), মাগে (চাহে), থির, ভরাস, ঝাঁপা (আবৃত করা), পেয়ান, পহিল (প্রথম), সমাধা (শেষ), মরম, বাত (কথা), মূল (দাম), পাতল (সূক্ষ্ম), পরণাম (প্রণাম), পানী (জল), সাথ (সঙ্গে), লোর, শুতি, শুতায়ল (শোয়ান), ঝি (মেয়ে), শেজ (শয্যা), বেরী (বার), বেলি (বেলা), নাকি (কি?), সরম, দোসর, শাঙন (শ্রাবণ), ত্বরিতে, তরিতে (শীঘ্র) ঝাট (শীঘ্র), সমঝান (বুঝান), ঝুট (মিছা), খত, খুইতে, আইল, কুটা (তৃণ) চিন (চিহ্ন), বিহান (প্রভাত), আছিল, থরহরি, নিন্দ (নিদ্রা), হাস, কলস, দিবস, কলম, আচম্বিতে, বাউরী (উন্মত্ত), থোর (অল্প), সোয়াস, পাসরিতে (ভুলিতে), ব্যাভার, ছাতি (বুক), তিত (তিক্ত), সাঁচ (সাচ্চা), মাজা (কোমর) সাঙাতি (মর্ম্মবন্ধু), জুয়ায়, বাম (প্রতিকূল), গোয়া-লিনী, লাগি (জন্য), উধার (কর্জ্জ), সেয়ানা (চতুর, বয়স্ক), সায়র, জোর (যুগ্ম), বাপুটা (বাউটী), আজবটী, অনুপাম, অকাজ, কুঁদন, ভিতল (ভিজিল), দীঘল, না (নৌকা), চাকু, জুদা (পৃথক), লখিতে, পিন্ধন, তারে (তাহাকে), থুইয়া, ছলা, পুত (পুত্র), তেনা (ছিন্নবস্ত্র), কেনে (কেন), দেখালো, ভেটিবারে, ফিরা (পুনর্ব্বার), সুঝে (বুঝে), গাহক (গ্রাহক), বৈস, চুরিদারি ইত্যাদি।

মোট কথা এখন এই:—

(১) কলিকাতার সাহিত্য-পরিষৎ, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, কামরূপ সাহিত্য-সভা একযোগে অনুসন্ধান-পর হইয়া বঙ্গভাষার একখানি সম্পূর্ণ বাংগালা শব্দকোষ তৈয়ার করুন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কৃত শব্দকোষ এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক এবং বিশেষ সাহায্যকারী হইবে সন্দেহ নাই।

(২) উপরোল্লিখিত পরিষৎ-চতুষ্টয় একী-ভূত হইয়া পত্রসম্পাদক এবং গ্রন্থকারকগণকে সমগ্র বঙ্গের পরিভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতে এবং খামখেয়ালী ভাষা-বিকৃতি যথাসম্ভব পরিহার করিতে অনুরোধ করুন।

(৩) বাংগালা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচক কমিটিতে যাহাতে এই পরিষৎ-চতুষ্টয়ের অন্ততঃ একজন করিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি স্থান পান তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক।

সাহিত্যসেবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের সূচনা, বিস্তারিত আলোচনা ক্রমশঃ হইতে পারিবে।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ

বিজ্ঞান ও ইন্দ্রধনু।

(Keats' Lamia হইতে)

কর্কশ বিজ্ঞান-তত্ত্ব-পরশন লভি'
মিলাইছে একে একে বিশ্ব হতে মাধুরীর ছবি।
গগনে আছিল রামধনু,
জানিতাম কি মোহন উপাদানে গড়া তার তনু,
আজি সে যে রাজে
অবজ্ঞাত সাধারণ বস্তুপুঞ্জ-তালিকার মাঝে।
বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ কাঁচিখানি
ছেঁটে দিবে পক্ষগুলি স্বর্গদূতগণে টেনে আনি'।
বিজ্ঞানের বিধান নিদেশ
সকল রহস্য-স্বপ্নে একে একে করিছে নিঃশেষ।
ধরণীর কোষাগার খুলি'
রত্নবেদী ভগ্ন করি' মণিমুক্তা করি' চূর্ণ ধূলি
নিখিল জীবনময় পবনেরে শূন্য করে তুলি'
বিশ্লেষিছে হায়,
আখণ্ডল-ধনুখানি খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্রতায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

পূষা

আমরা ঋগ্বেদে পূষা নামে এক দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই পূষা দেবতা কে? প্রাচীনকালে মানব অনেক স্থলে দেবতার আবির্ভাব দর্শন করিতেন। তন্মধ্যে আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীমধ্যে বিশেষভাবে তাঁহারা নানা দেবতার কল্পনা করিতেন। আমাদের মনে হয়, বৈদিক পূষাদেব গ্রহদিগের মধ্যে একটী। কোন্ গ্রহ সেকালে পূষা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার সন্ধানই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আকাশে গ্রহনক্ষত্রদিগের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহাদের একপ্রকার গতি আছে, সেজন্য উহারা পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে গমন করে। উহাদের মধ্যে অল্প কতকগুলি আছে, যাহারা এই গতির বিপরীত দিকেও ভ্রমণ করে। এই গুলিকেই আমরা গ্রহ বলিয়া থাকি। চন্দ্রকে এক্ষণে উপগ্রহ বলা হয়। কিন্তু হিন্দু-জ্যোতিষ মতে চন্দ্র একটী গ্রহ। চন্দ্রের এই বিপরীত অর্থাৎ পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে গতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই লক্ষিত হইয়াছে। চন্দ্রের গতি যে অপর গ্রহ হইতে দ্রুত তাহাও লক্ষিত হইয়াছে। (১) গ্রহদিগের আর এক লক্ষণ এই যে তাহারা মিট্ মিট্ (Twinkle) করেনা। ইহাকে প্রাচীনকালে অনিমেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। গ্রহগণকে সেকালে বৃহৎ-দেব, জ্যোতির্ম্ময় রথযুক্ত, অমর, অনিমেষ, মঙ্গলকারী গতিশীল এবং দেবতাদিগের চর বলিয়া বর্ণনা করা হইত। (২)

পূষা সূর্য্যের প্রসবে গমন করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে উদিত হন। নিম্নোদ্ধৃত ঋকে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত দেখি।—

সূর্যা রশ্মি হরিকেশঃ পুরস্তাৎ
সবিতা জ্যোতি রুদায়ন অজস্রম্।
তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্
সংপশ্যন্ বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ। ১০ ১৩৯।১

অর্থ:—পীতকেশ সূর্য্যরশ্মি পূর্ব্বদিকে (উঠিতেছে); সবিতা তাহা হইতে অজস্রজ্যোতি (উঠাইতে গমন করিতেছেন); বিদ্বান (ও) পালক পূষা বিশ্বভুবন দেখিতে দেখিতে তাঁহার (সূর্য্যের) প্রসবে গমন করিতেছেন।

আর একটী ঋকে পূষাকে ভগিনীদিগের জার বলা হইয়াছে। সায়ন বলেন ভগিনীগণ অর্থে উষাগণ। ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

পূষণং। নু। অজাশ্বং। উপ। স্তোষাম। বাজিনম্।
স্বসুঃ। যঃ। জারঃ। উচ্যতে। ৬। ৫৫। ৪

সায়ন:—যঃ পূষা স্বসু রুষসো জারঃ উপপতিরিতি উচ্যতে।

কিন্তু সায়ন ১০। ৪২। ২ ঋকের ব্যাখ্যায় 'জারম্' অর্থে 'ভূতানাং জরয়িতারং' অর্থ করিয়াছেন। যথা—

দোহেন। গাং। উপ। শিক্ষ। সখায়ম্
প্র। বোধয়। জরিতঃ। জারং। ইন্দ্রম্।

হে জরিত ত্বং গোরূপং সখায়ং প্রিয়ং ইন্দ্রং বশং নয়। কিংচ জারং ভূতানাং জরয়িতারং ইন্দ্রং প্রবোধয় স্তুতিভিঃ প্রবুদ্ধং কুরু।

অতএব জারঃ অর্থে জরয়িতারঃ হইতে পারে; এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা উদ্ধৃত ঋকের এইরূপ অর্থ করি;

অর্থ:—ছাগবাহন, অন্নবান বা বলবান পূষাকে অদ্য স্তব করিব। যিনি ভগিনীদিগের জরা প্রদান করেন।

(১) চন্দ্রমাঃ। অপ্সু। অন্তঃ। আ। সুপর্ণঃ। ধাবতে। দিবি ১। ১০৫। ১ অর্থ:—দিব্যলোকে সুপর্ণ চন্দ্রমা জলসকলের মধ্যে ধাবমান হইতেছেন।

(২)
নৃ চক্ষসো অনিমিষন্তো অর্হণা
বৃহদ্দেবা সো অমৃতত্ব মানশুঃ।
জ্যোতিরথা অহিমায়া অনাগসো
দিবো বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে। ১০। ৬৩। ৪

মনুষ্যদিগের দ্রষ্টা, নিমেষহীন, পূজনীয়, মহৎ দেবগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময় রথযুক্ত, অহিমায়াযুক্ত (অর্থাৎ শত্রুযারা অহননীয় জ্ঞানযুক্ত), পাপরহিত, দিব্যলোকের উচ্চস্থানে মঙ্গলের জন্য বাস করেন।

ন। তিষ্ঠন্তি। ন। নিমিষন্তি। এতে
দেবানাং। স্পশঃ। ইহ। যে। চরন্তি। ১০।১০।৮

দেবতাদিগের এই চর সকল, যাঁহারা এইস্থানে বিচরণ করিতেছেন, (তাঁহারা) থামেন না, নিমেষ ফেলেন না।

পূষার উদয় হইলে উষাগণ জরাগ্রস্ত হয়—অর্থাৎ উষা ম্লান হইয়া যায়। পূর্ব্বে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান গিয়াছে, সূর্য্যের উদয়ের অল্প পূর্ব্বে পূষার উদয় হয়। অতএব জারঃ অর্থে জরয়িতারঃ গ্রহণ করিলে দুইটী ঋকের মধ্যে সামঞ্জস্য হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কোন্ গ্রহের উদয়ে উষা ম্লান হইয়া থাকে? আমরা জানি বুধ গ্রহের উদয়ে এইরূপ হয়। অতএব অনুমান করি বর্ত্তমান কালের বুধ গ্রহই বৈদিক যুগের পূষা। আমাদের অনুমান সমর্থন করিবার জন্য অপরাপর ঋক্ উদ্ধার করা যাইতেছে।

> যা স্তে পূষণ্ নাবো অন্তঃ সমুদ্রে
> হিরণ্যয়ী রন্তরীক্ষে চরন্তি।
> তাভি র্যাসি দূত্যাং সূর্য্যস্য
> কামেন কৃত শ্রব ইচ্ছ মানাঃ॥ ৬। ৫৮। ৩

অর্থঃ—হে পূষা! তোমার যে সকল সুবর্ণ-নির্ম্মিত নৌকা অন্তরিক্ষের সমুদ্রের মধ্যে ভ্রমণ করে, তাহাদিগের দ্বারা, স্বর্গকামীর কৃত (যজ্ঞের) হবি ইচ্ছা করতঃ, সূর্য্যের দৌত্যে গমন কর।

এই ঋক্ হইতে জানা যাইতেছে যে পূষা সূর্য্যের দূত। সেই জন্য সময়ে সময়ে সূর্য্যের দৌত্যকার্য্যে গমন করেন। অতএব পূষাকে সকল সময়ে সূর্য্যের অগ্রে উদিত হইতে দেখা যাইত না। ইহার কারণ ঋষি এই মনে করিতেন যে পূষাকে সূর্য্য মাঝে মাঝে দৌত্য কার্য্যে প্রেরণ করেন। আমরা জানি বুধগ্রহ কখন কখন সূর্য্যের অগ্রে উদিত হয়; আবার কখন কখন সূর্য্যের উদয়ের পরে উদিত হয়। সূর্য্যের পরে উদিত হইলে বুধ গ্রহকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূষা যে সূর্য্যের নিকটে নিকটে অবস্থান করে তাহা আমরা আর একটী ঋক্ হইতে জানিতে পাই। ঋগ্বেদের একটী সূক্তে, সূর্য্য সোমের সহিত তাঁহার কন্যা সূর্য্যার বিবাহ প্রদান করেন বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যাকে স্বামীগৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনেক দেবতা আগমন করেন। শেষে সকলের সম্মতিক্রমে অশ্বিদ্বয় এই কার্য্যে প্রাপ্ত হন। যখন অশ্বিদ্বয় তাঁহাদের তৃতীয় চক্রে আগমন করিয়া সূর্য্যে প্রবেশ করিতে যান, তখন পূষা অশ্বিদ্বয়কে বরণ করিয়া লন।

পুত্রঃ। পিতরৌ। অবৃণীত। পূষা। ১০। ৮৫। ১৪
অর্থঃ—পুত্র পূষা পিতাদ্বয়কে (অর্থাৎ অশ্বিদ্বয় কে) বরণ করিলেন।

পূষাকে পথপতি বলিয়া বর্ণিত দেখি। (১) পূষা দেবই-মৃতাত্মাকে স্বর্গে লইয়া যান। (২) পূষা দ্যা বা পৃথিবীর বন্ধু, ইড়ার পতি, দাতা ও দর্শনীয় রূপবান। (৩) ইড়া অর্থে পৃথিবীর বাক্‌দেবী। পূষাদেব অশ্ব, গো প্রভৃতি পশু রক্ষা করেন এবং পশু নষ্ট হইলে তাহা তিনি উদ্ধার করিয়া দেন। (৪) পূষা পনৎকার দিগের ও

---

(১) অতি। নঃ। সশ্চতঃ। নয়। সুগা। নঃ। সুপথা। কৃণু। পূষন্। ইহ। ক্রতুং। বিদঃ॥ ১। ৪২। ৭
আমাদিগকে শত্রু (বা বাধা) হইতে অতিক্রম করিয়া লইয়া যাও! হে পূষা। সুন্দর পথের দ্বারা আমাদিগকে সুগগামী কর। এই গমনে (আমাদের) প্রার্থনা অবগত হও।

(২) পূষা। ত্বা। ইতঃ। চ্যবয়তু। প্র। বিদ্বান্
অনষ্ট পশুঃ। ভুবনস্য। গোপোঃ।
সঃ। ত্বা। এতেভ্যঃ। পরি। দদৎ
পিতৃভ্যঃ। অগ্নিঃ। দেবেভ্যঃ। সুবিতি ত্রিয়েভ্যঃ॥ ১০। ১৭। ৩
তোমাকে (অর্থাৎ মৃতকে) পূষা এই লোক হইতে (উত্তম লোকে) লইয়া যান। (তিনি) বিদ্বান্ অবিনশ্বর পশুযুক্ত, ভূতসমূহের রক্ষক। তিনি তোমায় এই সকল পিতৃদিগের নিকট প্রদান করুন; অগ্নি (তোমায়) সুন্দর জ্ঞানবান্ দেবতা-দিগের নিকট (প্রদান করুন)।

(৩) পূষা সুবন্ধু র্দিব আ পৃথিব্যা। ইড়স্পতি র্মঘবা দস্ম বর্চাঃ॥ ৬। ৫৮। ৪
পূষা দ্যুলোক এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বন্ধু, ইড়ার পতি, দাতা, দর্শনীয় রূপবান্।

(৪) পূষা গা অন্বেতু নঃ পূষা রক্ষত্বর্বতঃ। পূষা বাজং সনোতু নঃ॥ ৬। ৫৪। ৫
হে পূষা। আমাদিগের গো রক্ষার্থ আগমন কর; হে পূষা! অশ্ব সকল রক্ষা কর। হে পূষা। আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর।

পরি পূষা পরস্তাৎ হস্তং দধাতু দক্ষিণম্। পুনর্নো নষ্ট মাজতু॥ ৬। ৫৪। ১০
হে পূষা। দ্যুলোক হইতে দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দাও। পুনরায় আমাদিগের নষ্ট (পশু) আনিয়া দাও।

দেবতা ছিলেন। (৫) পূষার হস্তে অষ্ট্রা বা আরা নামে একটী দণ্ড আছে, তাহার দ্বারা তিনি পশুসাধন করেন। (৬) ইহার অর্থ আমরা, আর একটী প্রবন্ধে, পশুচিত্র দ্বারা লিখনের আদিম অবস্থা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। (৭)

বেদের পূষা দেবতা, গ্রীকদিগের হার্মিসদেব, রোমানদিগের মার্করিদেব এবং মিসরীয়দিগের দদ দেবতার মধ্যে অত্যন্ত মিল দেখা যায়। আমরা অনুমান করি বুধগ্রহ আবিষ্কৃত হইলে উহা পশুরক্ষাকারী দেবরূপে পূজিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন দেশে এই সকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। (৮) পূষা, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বা সূর্য্য অস্ত যাইবার পরে দেখা যায় বলিয়া, উহা পশুরক্ষাকারী দেবরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে, অনুমান করি। রোমানদিগের মার্করি নামে বুধগ্রহকেই বুঝায়।

আমরা বেদ হইতে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বুধগ্রহকেই পূষা নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাও দেখান গেল যে এই দেবতা গ্রীক রোমান ও মিশরীয়দিগের মধ্যেও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে কোন্ জাতি কাহার নিকট ইহাকে গ্রহণ করেন তাহা বলা যায় না।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

প্রতীক্ষা।

মিশ্র ইমণ—তাল একতালা।

(গান)

আশার আশ্বাসে রয়েছি বসে গো!
বিরল বিজনে কোথা সে আসে গো!
(তার) নয়ন চঞ্চল, কনক অঞ্চল
বদন উজ্জ্বল নয়নে ভাসে গো!
প্রেম-সিঞ্চিত কুসুম-দলে,
গেঁথেছি মালা পরাতে গলে;
ব্যাকুল বাসনা বাঁধিবে যতনে
প্রেম ভালবাসা, প্রণয়-পাশে গো!
গাহিবে প্রেম-গীতি গিয়াছে কহিয়া,
যাইবে সুরধুনী হৃদয়ে বহিয়া;
ডুবে সে বিশ্বাসে রয়েছি বসিয়া—
বুঝি সে লুকাল সুদূর দেশে গো!
ভেবেছি অন্তরে "সে আমার আমি তার",
"বিরহে আঁখিবারি, মিলনে উপহার",
কেন সে আসিল না, ভালো যে বাসিল না,
প্রাণে ত মিশিল না মধুর হেসে গো!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

---

(৫) সমু পূষ্যা গমেমহি যো গৃহান্ অভিশাসতি।
ইম এবেতি চ ব্রবৎ॥ ৬। ৫৪। ২

পূষা দ্বারা অনুগৃহীত আমরা যেন (সেই রূপ লোক) প্রাপ্ত হই যিনি (নষ্টপশু) যে সকল গৃহে (আছে) তাহাদের অভিমুখে (যাইতে) উপদেশ করেন। এবং ইহারাই (সেই পশু) তাহা বলিতে পারেন।

(৬) যা। তে। অষ্ট্রা গো ও পশা। আঘৃণে। পশু সাধনী।
তস্যাঃ। তে। সুম্নং। ঈমহে॥ ৬। ৫৩। ৯

হে জ্যোতিষ্মান্ (পূষা)। গো শয্যা ও পশু সাধনী তোমার যে অষ্ট্রা তাহা হইতে তব সম্বন্ধীয় সুখ প্রার্থনা করি।

যাং। পূষন্। ব্রহ্মচোদনীং। আরাং। বিভর্ষি। আঘৃণে।
তয়া। সমস্ত। হৃদয়ং। আ। রিখ। কিকরা। কৃণু॥ ৬। ৫৩। ৮

হে জ্যোতিষ্মান্ পূষন্। যে স্তোত্রপ্রেরণ কারীআরাকে ধারণ কর, তাহার দ্বারা সবের হৃদয়ে লিখিয়া কিকিরা কর।

(৭) সম্মিলন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২০।

(৮) Hermes was a Greek god indentified by the Romans with Mercury. Both in literature and cult Hermes was constantly associated with the protection of cattle and sheep....As a pastoral god he was often closely connected with deities of vegetation, especially Pan and the nymphs....In the Odyssey, however, he appears mainly as the messenger of the gods and the conductor of the dead to Hades. Hence in later times he is often represented in art and mythology as a herald....As a messenger he may also have become the god of the roads and doorways; he was the protector of travellers and his images were used for boundary marks. Certain forms of popular divination were under his patronage, notably the world-wide process of divination by pebbles.

Encyclopaedia Britannica.

মুসলমান ঐতিহাসিক। (৭)

(খ) অনুবাদক হাজি মুস্তাফা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সৈয়র মুতাক্ষরীণ দুর্ব্বোধ্য ও দুষ্প্রাপ্য বিরাট পারসীক গ্রন্থ। সে মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু উহার ইংরাজী অনুবাদ এত বিশুদ্ধ ও মূলানুবর্ত্তী যে মূল গ্রন্থের সাহায্য লইতে না পারিলেও কার্য্যহানির সম্ভাবনা নাই। এমন কি, পারস্য ভাষাভিজ্ঞ সুবিখ্যাত ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বকীয় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনাকালে মূল গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। ‡

উক্ত অনুবাদ যিনি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হাজি মুস্তাফা। ইহাঁর প্রকৃত নাম হাজি মুস্তাফা নহে। তাঁহার জীবনলীলা একান্ত রহস্যময়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি ফরাসী পরিবার ঘটনাচক্রে তুর্ক-রাজধানী কনস্তান্তিনোপলে বাস করিতেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার প্রাক্কালে এই পরিবারে মুঁসো রেমণ্ড (M. Raymond) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে ফরাসীদেশীয় খৃষ্টান হইলেও তুর্ক সংস্পর্শে কতকাংশে মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। যখন রেমণ্ডের বয়স ত্রিশবৎসর, তখন তিনি একদা ভাগ্যমৃগয়ান্বেষণে ভাগ্যভূমি ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। তিনি যে জাহাজে আসিতেছিলেন, তাহা দৈবক্রমে বিনষ্ট হয়; কিন্তু কয়েকজন সহৃদয় ইংরাজের সাহায্যে সে যাত্রা রেমণ্ডের জীবন রক্ষা হয়। রেমণ্ড ঘটনাক্রমে বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তত্রত্য নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্বীয় অধিষ্ঠান নির্দ্দেশ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতা হইয়াছেন। রেমণ্ড মুর্শিদাবাদে পীলখানা বা হস্তিশালার দারোগা ছিলেন। * নবাবের রাজধানীর জলবায়ু দোষে রেমণ্ড অল্পদিনমধ্যে বিলাস-স্রোতে ভাসমান হন এবং জনৈক মুসলমান-রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন। মুসলমান হইয়া তিনি মুস্তাফা নাম ধারণ করেন। মুস্তাফা বিলাসী হইলেও অলস ছিলেন না। তিনি অল্পদিনমধ্যে পারসীক ও ইংরাজী ভাষায় সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমন কি এক সময়ে বৈদেশিকদিগের মধ্যে মুস্তাফা, হেষ্টিংস ও ভান্সিটার্ট ব্যতীত আর কেহই পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। † এই সূত্রে মুস্তাফার সহিত হেষ্টিংস ও ভান্সিটার্টের মত তৎকালের দুইজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্টতা হয়। মুস্তাফা নানা কার্য্যে নানাভাবে মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, পাটনা ও লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করেন। তিনি পারসীক পুঁথি ও ভারতীয় বিচিত্র দ্রব্যসমূহের বিশেষ সমাদর করিতেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মুস্তাফা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া মক্কা, মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ যাত্রা করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জেড্ডা ও মক্কানগরে তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়; ধনরত্ন অপেক্ষা কতকগুলি দুর্ল্লভ পুস্তকের অপহরণে তিনি অধিকতর দুঃখিত হইয়াছিলেন। মক্কা বা হজ্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুসলমানগণ হাজি নামে পরিচিত হন; এজন্য রেমণ্ডের নাম হইল হাজি মুস্তাফা। তিনি ফিরিয়া আসিয়া এবার লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করিলেন এবং পুস্তকাদি সংগ্রহরূপ দুষ্কর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরী মহিলা পরিবৃত অন্দরমহল গঠনে অধিকতর মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনাকাশে তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়; প্রৌঢ় বয়সে, যুবতীসঙ্গে প্রেমলীলায় যে ফল হয়, তাঁহার ও সে ফল হইয়াছিল।

‡ "It bears such strong evidence of being a literal translation, that I did not think it requisite to search for the original." Stewart's History of Bengal, pp. XIII-IV.

* মহারাজ নন্দকুমারের পত্র, "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" (দ্বিতীয় সংস্করণ) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

† "At a time, when Governor Vansitart and Mr. Hastings excepted, I was the only European that understood a little Persian"

Seir Mutaqheria, Vol. I, Translator's Preface, p. I.

তাঁহার নিজের কথায় এ বিষয়ের আভাস আছে। * তিনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন নাই বটে, তবে তিনি যে মগুপায়ী তাহা স্থানান্তরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। † হেষ্টিংসের শাসনকালে নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁর সহিত মুস্তাফার এক ভীষণ বিবাদ হয়, তৎসময়ে তিনি দুর্ব্বৃত্ত রেজা খাঁর কুচরিত্র কাহিনী বিস্তৃত বিবরণীতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করেন। ক্রমে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু ফুটিলে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের লোমহর্ষণ দৃশ্যে উহার কারণসমূহের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, রেজা খাঁ পদচ্যুত হন। এই সময়ে মুস্তাফা স্বীয় সন্তানদিগকে ইয়োরোপে পাঠাইয়া স্বয়ং কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন।

মুস্তাফা পারসীক, ইংরাজী ও ফরাসী এই তিন ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত ইংরাজ রাজ্যে, ইংরাজ-সংস্পর্শে নানা রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া মুস্তাফা উক্ত ভাষায় এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যে স্যর উইলিয়ম জোনস্ প্রমুখ মহাত্মগণও তাঁহার ইংরাজী অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মহামতি জোনস্ দুই একস্থল নিজেই অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। ‡ পারসীক ভাষায় মুস্তাফার অধিকার কত বেশী ছিল, তাহা যাঁহারা মুতাক্ষরীণের মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবেন না। মূল মুতাক্ষরীণ তখন মুদ্রিত হয় নাই; হস্তলিখিত পুঁথিও তখন দুষ্প্রাপ্য ছিল। লক্ষ্ণৌ সহরে মুস্তাফা একদিন এক বৃদ্ধার দোকানে নানাবিধ দ্রব্যাদির সঙ্গে একখানি হস্তলিখিত পুঁথির কয়েকটি ছিন্নপত্র দেখিতে পান; পড়িয়া দেখিলেন উহার মধ্যে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের প্রশংসা ও বঙ্গীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসন বিষয়ে মন্তব্য রহিয়াছে। পারসীক পুস্তকে বৃটিশ রাজনীতির আলোচনা দেখিয়া মুস্তাফা একেবারে চমকিত হইয়া যান। অনেক চেষ্টায়ও তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে সে বিরাট গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। ইহার পরে যখন তিনি মুর্শিদাবাদ আসিলেন, তখন সমগ্র গ্রন্থখানি হস্তগত করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। সেই দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত প্রকাণ্ড গ্রন্থের অবিকল ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা একজন বৈদেশিকের পক্ষে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরই বিবেচ্য বিষয়।

মুস্তাফা কয়েক বৎসরের কঠোর সাধনায় বহুকষ্টে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়াছেন; এই বৎসরই সুবিখ্যাত বাগ্মীকুলগৌরব মহামতি এডমণ্ড বার্ক ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারতশাসনের সমস্ত দোষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে এক ভীষণ অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। মুস্তাফা হেষ্টিংসের নিকট নানাভাবে সাহায্য প্রাপ্ত ও অনুগৃহীত হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি অনুবাদ পুস্তক তাঁহারই নামে উৎসর্গ করেন। *

গোলাম হোসেন ইংরাজদিগের নিকট সময় সময় যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া তাঁহাদের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হন; সম্ভবতঃ এইজন্যই ব্যক্তিগতভাবে হেষ্টিংসের কার্য্যপ্রণালীর কোনও তীব্র সমালোচনা তাঁহার পুস্তকে স্থান পায় নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকের প্রামাণিক গ্রন্থের অনুবাদ পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইলে,

---

* মুস্তাফা নিজেই বলিয়াছেন :—

"Men on the decline of life who after abandoning the scheme of making a collection of books, jump at once into the project of making a collection of female beauties, must lay their account with cutting now and then a capital figure in certain adventures which never fail to spring up in a house where youth and beauty are jumbled together with old age and wrinkles." Vol. I. Preface, p. 2.

† *Ibid* p. II.

‡ Vol. I. (Golam Hossein's Preface) p. 23.

* "That gentleman (Hastings) had been one of my oldest acquaintances among the English and he had proved in the sequel the principal author of my well-being." Vol I. Preface p. 5.

মুস্তাফা স্বীয় নাম গোপন করিয়া "Nota manus" এই গুপ্তনামে সৈয়র মুতাক্ষরীণের অনুবাদ বা Review of Modern Times নামক পুস্তক ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে উৎসর্গ করেন।

তৎসাহায্যে হেষ্টিংস স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইবেন মনে করিয়া মুস্তাফা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই স্বকীয় অনুবাদ পুস্তকের তিনখণ্ড হস্তলিখিত প্রতিলিপি ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এই তিনখণ্ড প্রতিলিপিতে ৭৪০০ পৃষ্ঠা হইয়াছিল এবং তাহাতে দুই সহস্রেরও অধিক টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। পরবৎসর হইতে কলিকাতার কুপার কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়া ১৯ মাস পরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাণ্ড তিনখণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন মুদ্রাযন্ত্র বর্ত্তমান সময়ের মত উন্নত বা সুলভ হয় নাই; এজন্য উক্ত পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য গ্রন্থকারকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, তিনি উক্ত ব্যাপারে যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিশোধের জন্য তাঁহাকে পুস্তক, বাসন ও অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মুস্তাফার দুর্ভাগ্য এত বেশী যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যে জাহাজে মুদ্রিত পুস্তকগুলি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহা পথিমধ্যে জলমগ্ন হওয়ায় ইংলণ্ডে উহার একখণ্ড পুস্তকও যায় নাই। যে স্বল্পসংখ্যক পুস্তক কলিকাতায় বিতরিত বা বিক্রীত হইয়াছিল, তাহাই মাত্র মুস্তাফার গুরুতর পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থব্যয়ের স্মৃতি রক্ষা করিল। ইংলণ্ডে মুতাক্ষরীণের অনুবাদের বহুল প্রচার জন্য মান্দ্রাজের সৈনিক বিভাগের কর্ণেল বিখ্যাত ঐতিহাসিক জন্ ব্রিগস্ সাহেব পুনঃ-সংস্করণের সম্পাদন করিতে থাকেন; ১৮৩২ অব্দে জন্ মারে কোম্পানিদ্বারা উহার একখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়। ব্যালফোর নামক জনৈক সাহেব অন্য এক অনুবাদ প্রকাশ করেন বলিয়া শুনা যায় জোনাথন স্কটস্ সাহেবও কতকাংশ মাত্র অনুদিত করিয়াছিলেন। এতন্মধ্যে মুস্তাফার পুস্তকই সম্পূর্ণ, সুন্দর ও মূলানুবর্ত্তী। তাঁহার পুস্তক পড়িলে অনেক স্থলে অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহার ভাষা কিছু কঠিন ও আড়ম্বরপূর্ণ। তিনি বিনীত ও অকুণ্ঠিতভাবে নিজ পুস্তকের দোষগুণ সকল কথাই খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন তাঁহার পুস্তকের ভাষা কিছু কঠোর হইলেও অনুবাদের মূলানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। * অনুবাদ-পুস্তকে ভাষা একটু জটিল বা অদ্ভুত না হইয়া পারে না এবং বিশেষতঃ মুস্তাফা স্বয়ং ইংরাজ নহেন।

মুস্তাফার গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব আছে; তাঁহার পুস্তক শুধু অনুবাদ নহে। তিনি নিজেও বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া, তদানীন্তন অনেক ঘটনার বিশেষ সংবাদ জানিতেন এবং তাঁহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসাও কম ছিল না। তিনি গোলাম হোসেনের বর্ণিত প্রকৃত ঘটনা প্রকৃত তথ্যের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন এবং অনেক স্থলে পুস্তকের নিম্নে যে টীকা বা টিপ্পনী সংযোগ করিয়াছেন, তাঁহাতে অনেক নিগূঢ় রহস্য উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি স্বয়ং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজের অনেক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এজন্য গোলাম হোসেনের পুস্তকের কোনও স্থলে সামান্য মাত্র সাম্প্রদায়িক একদর্শিতা প্রকাশিত দেখিলেই মুস্তাফা উপযুক্ত সমালোচনা দ্বারা তাহা সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। যেখানে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখা গিয়াছে, সেই স্থানেই মুস্তাফার সংযোজিত অংশে বহু সন্দেহ অপনীত করিয়া দিয়াছে। ঐ টীকাগুলি যেমন মৌলিক, তেমনই ইহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুতরাং মুস্তাফা কেবল অনুবাদক নহেন, তিনি ঐতিহাসিকও ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকের পর্য্যায়ে তাঁহারও নাম ধরা যাইতে পারে। ভ্রমপ্রমাদ মানুষমাত্রেরই থাকে। মুস্তাফার বর্ণনা স্থানে স্থানে একটু অতিরঞ্জিত হইলেও সাময়িক ও দৈশিক অবস্থার বিষয় ভাবিয়া তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ক্যাম্বে কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় মহোদয় মুস্তাফার অনুবাদ

---

* "Upon the whole then I can assure the public that this translation, awkward and inadiquate as it shall probably come out to be, is in general a faithful and a literal one."

Vol. I. Preface, p. 19.

পুস্তকের এক নূতন সংস্করণ সুবৃহৎ চারিখণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যূন সার্দ্ধ দ্বিসহস্র পৃষ্ঠায় এই বৃহদাকার পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক সম্পদের এক অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে এবং তজ্জন্য প্রকাশক সকলেরই অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই পুস্তকের প্রচার হওয়া প্রার্থনীয়।

এতক্ষণে আমরা গোলামহোসেনের বিখ্যাত গ্রন্থ ও তাহার অনুবাদক হাজি মুস্তাফা সম্বন্ধীয় মন্তব্য শেষ করিলাম। এক্ষণে আমরা গোলামহোসেনের আত্ম-জীবন চরিতের আলোচনা করিব। তিনি স্বীয় পুস্তকে কোথায়ও নিয়মিতভাবে আপনার জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থখানিও সময়ানুক্রমিক ভাবে লিখিত হয় নাই। তবুও সেই বিরাট গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অধীত করিয়া তাহার নানাস্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে গোলাম-হোসেনের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, আমরা ক্রমে সহিষ্ণুপাঠকবর্গকে তাহা উপহার দিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণ।

কৃষ্ণানন্দ।

পদকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দের রচিত ৬টি পদ "পদরসসার" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে—"প্রাবৃট সুখদ মনমোহন" ইত্যাদি পদটি শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক বাকি পদগুলি ব্রজ-লীলাবিষয়ক ঝুলন-লীলার পদ; পদগুলি "পদরসসার" গ্রন্থের "হিণ্ডোলা ঝুলন-বিলাস" নামক পঞ্চাশৎ রস-পরিচ্ছেদে প্রায় এক স্থানেই সন্নি-বেশিত হইয়াছে। আমরা ঐ পদগুলি নিয়ে আমাদিগের মন্তব্যসহ যথাক্রমে উদ্ধৃত করিব।

কামোদ।

প্রাবৃট (কাল)　সুখদ মনমোহন
　সুরধুনি-তীর উজোর।
চলত সমীর　ধীর অতি শীতল
　বরিখত থোরাই থোর॥
　উলসিত গৌর কিশোর।
ঝুলত রঙ্গে　সঙ্গে সব সহচর
　পুরব-ভাবে পহু ভোর॥ ধ্রু।
রঙ্গ বিরঙ্গ　সময় সুরঙ্গ
　চিত্রময় চারু হিণ্ডোর।
তা পর ঝুলত　গৌর সুনাগর
　প্রিয়হি গদাধর কোর॥
চৌদিগে ভকত　ভাব বুঝি গায়ত
　বাজায়ত যন্ত্রহি জোর।
কৃষ্ণানন্দ ভণ　শ্রবণ-মন-লোচন
　না পায়ে আনন্দ ওর॥

তুড়ী।

ঝুলত ধনী　চন্দ্রাননী
　জিনি সৌদামিনি ছটা।
ঝুলত রঙ্গে　নাগর-সঙ্গে
প্রেম-তরঙ্গে　পুলক অঙ্গে
　কাদম্বিনী-পটা॥ ধ্রু॥
সুন্দর অলকে　সিন্দুর ঝলকে
মৃগমদ-তিলকে　অলকা ঝলকে
　মোতিকমে ঘটা।
বিপুল-নিতম্বা　জিত-উরু-রম্ভা
কুচ-করি-কুম্ভা　পুলক-কদম্বা
　প্রয়োশ কুম্ভারটা (?)॥
সুখ ছালি (?) তালি　দেয়ত আলি
ভালি ভালি বলি　রছালি রছালি (?)
　বনমালী নিকটা।
সাঙন ঝম্পে　মেঘ আরম্ভে
পবন আড়ম্বে　ঘন মদকে
　মনমথ উলটে ঝটা॥

কোকিলা কোকিলি মরণ-ব্যাকুলি
ভেকনবলীয়লী (?) কৃষ্ণানন্দ বলী
উঠত ভালী লপটা ॥

এই পদটির ছন্দ ও ভাষা কিছু বিচিত্র; ত্রিপদীর চরণের তিনটি থাকের স্থলে এই পদের প্রায় সকল চরণেই পাঁচটি করিয়া থাক আছে; কেবল ধুয়ার প্রথম চরণে তিনটি থাক দেখা যায়; এইরূপ ছন্দ পদাবলি-সাহিত্যে অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এই পদের কয়েকটি বাক্যের অর্থবোধ হয় নাই; উদ্ধৃত পদের ঐ দুর্ব্বোধ্য স্থলগুলি প্রশ্ন-চিহ্নিত করা হইয়াছে। একাধিক প্রাচীন পুথি না পাইলে, ঐ সকল স্থলের পাঠে লিপিকর-প্রমাদ-জনিত কোন ভ্রম-প্রমাণ আছে কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। "সুখ ছালি" ও "রছালি রছালি" শব্দ দুইটি "সুখশালি" ও 'রসালি রসালি' শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া অনুমান হয়; প্রাচীন পুথিতে অনেক স্থলে 'শ'কারের পরিবর্ত্তে 'স'কার ব্যবহৃত দেখা যায়; 'স'কারের হিন্দী ও মৈথিল উচ্চারণ ইংরেজি S অক্ষরের মত; বাঙ্গালাভাষায় 'স' অক্ষরটি 'শ' অর্থাৎ ইংরেজি 'Sh' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় বলিয়া পদাবলি-সাহিত্যে হিন্দী ও মৈথিল 'স' অক্ষরের পরিবর্ত্তে উহার কিঞ্চিৎসাদৃশ্য যুক্ত 'ছ' অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা—যৈছে (হিং—জৈসে) 'বছু' (হিং—বসু,) 'তছু' (হিং—তস্য) ইত্যাদি। 'তদ্ভব' ও অপভ্রংশ অনেক শব্দের সম্বন্ধে পদাবলি-সাহিত্যে এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলেও 'রস' 'বশ' 'শালী' প্রভৃতি 'তৎ-সম' অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দগুলির 'স' বা 'শ' অক্ষরের পরিবর্ত্তে পদাবলি-সাহিত্যে 'ছ' অক্ষর প্রয়োগ করার রীতি নাই; আমাদিগের বিবেচনা হয় যে কোন অনভিজ্ঞ লিপিকর উদ্ধৃত পদটি কোন গায়কের মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া উচ্চারণ-অনুসারে ভ্রমবশতঃ "সুখশালি" ও "রসালি" শব্দের পরিবর্ত্তে "সুখছালি" ও "রছালি" লিখিয়া লওয়াতেই এই ভ্রমমূলক পাঠবিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। উদ্ধৃত পদের "পবন-আড়ম্বে" শব্দটি অশুদ্ধ নহে; সংস্কৃতে 'ডম্ব' ও 'ডম্বর' উভয় শব্দই প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং "আড়ম্বর" অর্থে 'আড়ম্ব' শব্দও প্রযুক্ত হইতে পারে।

গান্ধার।

তোরহি মুলত নবিন কিশোর।
কালিন্দি-কুল কুসুম-কানন
আনন্দে মন ভোর ॥ ধ্রু ॥
হেম-কমলিনী নওল নাগর
বান্ধে জোরহি জোর।
সুখদ সাওন বিন্দু বরিখত
মেঘ ঘোরহি ঘোর ॥
সঘন দামিনি দাম দমকত
করত চাতক সোর।
চলত শীতল মন্দ মারুত
নাচত আনন্দে মোর ॥
সুঘড় গুঞ্জনা (?) বরনাগর
নাগরী করু কোর।
জলদ দামিনি এক ঠামহি
যৈছে চান্দ চকোর ॥
রসবতী-মুখ রসিক হেরত
আনন্দে নাহি ওর।
কৃষ্ণানন্দ মন সফল জীবন
নিরখে যুগল-কিশোর ॥

এই সুললিত পদটির 'সুঘড় গুঞ্জনা' ইত্যাদি পংক্তিটিতে লিপিকর-প্রমাদ সুস্পষ্ট। 'গুঞ্জনা' শব্দটির স্থলে প্রকৃত পাঠ যে কি হইবে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমাদিগের বোধ হয় যে, "বরনাগর" স্থলেও "বরজনাগর" বিশুদ্ধ পাঠ হইবে; কেননা 'বরনাগর' পাঠ গ্রহণ করিলে এই পদের প্রত্যেক যুগ্ম-চরণের ব্যবহৃত (৩+৪)+(৩+৪)=১৪ মাত্রার স্থলে একটি মাত্রা কম পড়ে; 'বরজনাগর' পাঠে ঐ মাত্রার ত্রুটি সংশোধিত হয়, অথচ অর্থের কোন অসঙ্গতি হয় না।

ধানশী।

ঝুলত রাধামাধব গোরি।
ঝুলহি ঝুলহি দোহ দোহা বেড়ি ॥

ললিত ঝোকায়ত ভুবন (?) ভোরি।
চামর ঢুলায়ত বিশাখা প্যারি॥
চিত্রা চম্পকলতা দেয়ত তারি।
রঙ্গদেবী বোলে বলিহারি॥
নীল নীরদ রহু অম্বরে ঘেরি॥
ঝুলত বেন (?) সম শীতল বারি॥
বাজত যন্ত্র মধুরস ঝারি।
বোলে রসাল হংস শুকসারি॥
ফণিবেণি লোলে ললিত মণিধারি।
রুণুঝুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণিসারি॥
কৃষ্ণানন্দ করহি কর জোড়ি।
অনিমিখে হেরত কিশোরা-কিশোরি॥

এই পদের দুইটি স্থলের অর্থ বুঝা নাই,—উহা প্রশ্নচিহ্নযুক্ত করা হইয়াছে। "বিশাখা প্যারি" বাক্যের অর্থ "প্রিয়া বিশাখা প্যারি" "শব্দের" "প্রিয়া" অর্থ হইতেই "শ্রীরাধা" অর্থ আসিয়াছে—যেমন "প্রিয়াজি" বলিলে প্রধানতঃ শ্রীরাধাকেই বুঝাইয়া থাকে। "তারি" শব্দের অর্থ "তালী;" ব্রজভাষা ও হিন্দীতে অনেক স্থলে অন্ত্য "ল" অক্ষরের পরিবর্ত্তে "র" ব্যবহৃত হয়; যথা—বাঙ্গালা "কাল"—হিন্দী "কার;" বাঙ্গালা "কোল" —হিন্দী "কোর" বাঙ্গালা "ধুল"—হিন্দী "ধুর;" ইত্যাদি। "ঝারি" শব্দটি বোধ হয় "নিয়ড়" (নিকট শব্দজাত) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ব্রজভাষা ও হিন্দিতে অন্ত্য "ড়" এর পরিবর্ত্তে "র" অক্ষরের ব্যবহার বিরল নহে; যথা—বাঙ্গালা "বাড়ী"—হিন্দী "বাড়ি" ও "বারি"; বাঙ্গালা "বাদুড়"—হিন্দী "বাদুর" ইত্যাদি।

"কিঙ্কিণিসারি" শব্দের অর্থ "কিঙ্কিনী-শ্রেণী"; বাঙ্গালার "শ্রেণী" অর্থে "সারি" শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়; যথা—"সারি সারি বালক" ইত্যাদি।

যথা রাগ।

নিকুঞ্জ বনমে—ঝুলত যুগলকিশোর।
নবরুত কাঞ্চন নীলম বৈছন
কিয়ে দুহুঁ চান্দ চকোর॥ ধ্রু॥
নয়নে নয়নে ঘন করত বিলোকন
সরস পরশ দুহুঁ ভোর।
দুহুঁ মুচকায়ত আধ আধ বোলত
ঝুলত থোরহি থোর॥
হেন নব জলধর প্রেমভরে গরগর
বহে ঝর ঝর তহি লোর।
রূপহি গুণ হেরি অলি গুণ গুণ করি
গুণ গায় না পায় ওর॥
পবন মন্দগতি হেরি দুহুঁ মূরতি
উলসিত নাচত ছন্দ।
নব বৃন্দাবন ত্রিভুবন-মোহন
নব নব কুসুম সুগন্ধ॥
নওল কিশোরে নওল নাগরি সঙ্গে
ঝুলত গোকুল-চন্দ॥
রাধাকানু-মুখ হেরি নাচত কত সখি
গায়ত মধুকর-বৃন্দ॥
গগনে মনোহর জগমগ জলধর
গর গর গরজই ধীর।
তড়িত-ঘটা কত চাতক বোলত
মন্দ পবন মৃদু নীর॥
সহচরি গায়ত মধুকর ঝুকত
ঝুলত যুগলকিশোর।
কৃষ্ণানন্দ হেরি রসিক কলাবতি
কেলি কলানিধি কোর॥

যথা রাগ।

ঝুলিতে ঝুলিতে কানু চান্দমুখে লয় বেণু
বোলে আলাপ মল্লার।
ভাল বলি আলাপিতে রাইয়ের কটাক্ষ-পাতে
ভুলি গেও নন্দকুমার॥
দেখি হাসে যতেক আহিরী।
মল্লার আলাপিতে গান্ধার গৌরী খেনে
সুহই খেনে আশোয়ারি॥
তহি রসবতী হাসি আপনে বাজান বাঁশী
বিবিমতে আলাপে মল্লার।
গগন ঢাকিল মেঘে সভে চমৎকার দেখে
সখীগণে বোলে বলিহার॥

রাই-মন বুঝি শ্যাম নিজকণ্ঠ মণিদাম
ভালি বলি রাই-গলে দিল।
দেখিয়া রাধার জয় ললিতা আনন্দময়
কৃষ্ণানন্দ নাচিতে লাগিল॥

শ্রীরাধার সখীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাধারণতঃ অনুরক্তা হইলেও, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় ও প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধার জয় দর্শনেই যে আনন্দিত হইবেন ইহা স্বাভাবিক। সখীগণমধ্যে ললিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা বলিয়া, শ্রীরাধার জয় দর্শনে ললিতার আনন্দ আরও সুসঙ্গত। গুরু ও পুরোহিতের দ্বন্দ্বের ন্যায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের এই সঙ্গীত-প্রতি-দ্বন্দ্বিতার লীলা-দর্শক পদ-কর্ত্তা যে কোন পক্ষের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করিবেন, তাহা কিছু সমস্যার বিষয় সন্দেহ নাই; তাই সুচতুর পদকর্ত্তা বাক্যে কিছু না বলিয়া, তখন শুধু নৃত্য করিতে লাগিলেন। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, সখীর "অনুগা" না হইলে ব্রজলীলা-দর্শন কাহারও ভাগ্যে ঘটে না; সুতরাং যে ললিতার প্রসাদে পদকর্ত্তার এই লীলা-দর্শন ঘটিয়াছে, তিনি গুরুস্থানীয়া সেই ললিতার আনন্দে নৃত্য দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া পারেন না। কিন্তু যদি তাঁহার সেই আনন্দ প্রকাশে তাঁহার সাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণের অসন্তুষ্টি হওয়ার কিছুমাত্রও আশঙ্কা থাকিত, তাহা হইলে তিনি প্রাণ খুলিয়া এই ভাবে আনন্দপ্রকাশ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহের বিষয় বটে। কিন্তু পদকর্ত্তা এস্থলে নিজের "কৃষ্ণানন্দ" নাম নির্দ্দেশ দ্বারা কি ইহাই ইঙ্গিতে বুঝাইতেছেন না যে, তাঁহার আনন্দ জনিত নৃত্য প্রেমিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রীতিকর না হইয়া বরং তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধনই করিয়াছিল? কেননা, আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে ভক্তের নিকট—প্রেমের পাত্রের নিকট পরাজিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের অধিক আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ঈশ্বরত্বই এখানে।

পদ-কর্ত্তা কৃষ্ণানন্দের জীবন-বৃত্তান্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন। তবে তাঁহার রচিত গৌরচন্দ্র ও ঝুলিতে 'ঝুলিতে কানু' ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্গালা পদটি দেখিয়া; তিনি যে গৌর-ভক্ত বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা—ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। ভরসা করি পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে কৃষ্ণানন্দের আরও অনেক বিলুপ্তপ্রায় পদাবলি আবিষ্কৃত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

(১)

বহুদিন পূর্ব্বে মওলাবক্স নামক জনৈক গায়ক কলিকাতায় আসিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেই মওলাবক্স সাহেবের গান বর্দ্ধমানে। মনে হয় মহারাজা মহতাপচন্দ্র বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাটীতে মজ্‌লিস হইয়াছিল। গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিই গান শুনিতে গিয়াছিলেন। তখন আমি একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক। কালোয়াতি গানের কি বুঝি—(সত্য বলিতে হইলে বলিব এখনও তাই) তথাপি আগ্রহের সহিত গান শুনিতে গিয়াছিলাম। আমার মনে হয় গান যেমন বালকে বুঝে তেমন অপরে নহে। আমি সত্য সত্যই তাঁহার গান শুনিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম।

রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে কালোয়াতি গান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে "It is nothing but cutting geometrical figures in one's mouth" কথাটা অনেকটা সত্য, অত মুখভঙ্গি দন্ত বিকিরণ ও বদন বিদারণ আর বুঝি কিছুতে নাই। কিন্তু মওলাবক্স সাহেবের তাহা আদৌ ছিল না। সহাস্যবদনে বিনা গর্ব্বঅহঙ্কারের ঝঙ্কারে তাঁহার গান বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল।

ভাল গায়কেরা অনেক সময় বলিয়া থাকেন "আজ আমার গলাটা ধরিয়াছে" অনেক পত্র লেখক সেইরূপ অভ্যাসবশতঃ পত্র সমাপ্তি করিয়া লিখিয়া বসেন "In haste" অথবা "Excuse haste" হয়ত তাঁহারা মনে করেন যেন তাহার মধ্যে একটু বাহবার প্রত্যাশা

আছে। আহা ধরা গলায় এমন গান গা! আর in hasteএ এমন সুন্দর পত্র!

শুনিয়াছি এক সময় কবি দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারীর গান শুনিয়া তাঁহার বহু প্রশংসা করেন। ইহা শুনিয়া গোবিন্দ বলিয়াছিলেন "আজ গলাটা ভাঙ্গায় বড় সুবিধা হইল না।" রসিক চূড়ামণি দাশু রায় তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "আপনার ভাঙ্গা, অপরের নৈকস্ত।" আগে সেই "নৈকস্য" প্রশংসাবাদ শুনিতে গায়ক ও লেখক উভয়েই প্রত্যাশী।

আমি যখন জাহানাবাদে ছিলাম, তখন তথায় ঢাকার নবাব বাহাদুরের একটী কালোয়াত গাহিতে আসেন। আমরা চাঁদা তুলিয়া তাঁহার গান শুনি। গায়ক বাঙ্গালী। তিনি তো মুখ যতদূর বিকৃত ও হাস্যজনক-করা যায়, তাহা করিতে বাকী করেন নাই, কিন্তু আমরা সভ্যতার খাতিরে আর সত্বগুণের প্রাচুর্য্যে একটুও হাসি নাই। গান Sub Divisional Officerএর বাসায় হয়। কালোয়াত মহাশয় গলা ভাঙ্গার কথা তুলিয়া দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা-কাল রাগিনী ভাঁজিলেন। কিন্তু আমরা কোন কথা বলিলাম না, ভয় পাছে তিনি বে-সমজদার বলিয়া ফেলেন।

এইবার একটী গল্প বলিব। আমার পিতৃব্য স্থানীয় পরম ভক্তিভাজন রায় ৺ গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর বড় সুরসিক ছিলেন। ৩০ সালের বন্যার বৎসর তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন তাই রঙ্গ করিয়া বলিতেন "ওহে! তোমরা যদি কেহ আমার জীবনী লিখিতে চাও, তবে তোমাদের আরম্ভ করিবার বড় সুবিধা হইবে। সচ্ছন্দে লিখিতে পারিবে, যে দামোদর নদ ও ভাগিরথীর যুগপৎ ভীষণ প্লাবনে যখন সমগ্র বঙ্গভূমি জলে জলময়, অধিবাসীরা যখন স্বীয় স্বীয় ধন প্রাণ আবালভবন লইয়া মহা ব্যাকুল তখন সেই কূলপ্লাবিনী সুরধুনীর তটভূমি হইতে অতি নিকটে খ্যাকশিয়ালির একটা কুটীরে একটা সদ্যপ্রসূত কৃষ্ণবর্ণ শিশু তদীয় কৃষ্ণবর্ণা মাতার অঙ্ক শোভিত করিয়া বিকট ক্রন্দন করিতেছিল।"

এ হেন কৃষ্ণবর্ণ গঙ্গাচরণবাবু দশের মাঝে "ফর্‌সা" সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। সেটী সুরতি খেলার সময়। তাই হাস্য বদনে তাঁহার পুত্র, আমার অগ্রজ দাদাকে, বলিয়াছিলেন "তোমরা এত সাবান টাবান মাখ অথচ ফর্‌সা হইতে ত পারিলেনা, কিন্তু আমি একটা পয়সা সুরতি খেলায় দিয়া দশের মাঝে ফর্‌সা সাব্যস্ত হইয়াছি।" হায়রে সে সব দিন, আর সে সব লোক!

ভাগ্যক্রমে আমারও এমনি একটী ঘটনা হইয়াছিল। জাহানাবাদে ময়ূরভঞ্জ মহারাজের গায়ক যদুনাথবাবু (বোধ হয় "পাঠক") দেশে আসিলে মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে গান শুনাইয়া অনুগৃহীত করিতেন। তাঁহার গান গানের মত ছিল। সে কালোয়াতি গানও অতি মধুর লাগিত। আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সাহ্লাদে তাঁহার মধুর কণ্ঠের গালভরা গান শুনিতাম। জানিনা কেন তিনি আমার প্রিয় সুহৃদবাবু অচিন্ত্যনাথ মিত্র (অধুনা বরিশালের সবজজ) মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "তারকবাবু বড় সমজদার লোক।" আর আমার এই গুণে বশীভূত হইয়া তিনি বাটী যাইয়া (তাঁহার বাটী ঐ এলাকার মধ্যে) একটী বারদের মৎস্য উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। আমি সহসা এইরূপ মৎস্য প্রাপ্তির লালসা বা সমজদারী গৌরব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই যতদূর সম্ভব গায়কের রাগিণী আলাপন শুনিয়াছিলাম কিন্তু আর সহ্য হইল না। শুধু আমার নয় আমাদের সকলেরই। তাই আমার একটা বন্ধু বলিলেন "আমার নয়, গান গাহিতে বল।"

আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি কালোয়াতি রাগ রাগিণীর বড় ধার ধারিনা, এটা মনের কথা, কিন্তু সেদিন সেটী প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম "মহাশয়, এইবার রাগিণী ছাড়িয়া একটা গান ধরুন না।"

আর কোথা আছে, তিনি গরম হইয়া বলিলেন "এমন মজলিসে আমরা গান করিব না, আমার গুরুর নিষেধ সমজদার লোক না থাকিলে গান গাহিতে। গান আবার কি রাগিণী শুনিয়াই ত লোকে মোহিত হইয়া থাকে।

আমি আবার বিনীতভাবে বলিলাম "আজ আপনার গলাটা ভাল বোধ হয় সেই জন্ম আমরা তত মোহিত হইতে পারিতেছি না।

দেখিলাম তাঁহার রাগ আরও বাড়িয়া উঠে, সুতরাং তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইল যে One who pays the piper has a right to call the tune. তখন তিনিও বাঁচিলেন, আমরাও বাঁচিলাম।

এখন এ কথা যাক্ আমার মওলাবক্স সাহেবের কথা বলি শুনুন। তাঁহার গান আরম্ভ হয় প্রায় ৮টার সময়, কিন্তু আমি সাজিয়া বসিয়াছিলাম ৫টা হইতে। সন্ধ্যার পরই সঞ্জীব ও বঙ্কিমবাবু আসিলেন। ভাবিলাম এইবার যাইব, কিন্তু তাহা হইল না, তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন আর এক জনের, তিনি বাবু দুর্গাদাস বসু মল্লিক। ইনি জজসাহেবের translator ছিলেন। মান সম্ভ্রম ও মর্য্যাদায় বর্দ্ধমানে কাহারও দ্বিতীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আমার পিতাঠাকুর বলিতেন ইংরাজিতে নাকি তিনি ভারি পণ্ডিত ছিলেন। জজ বার্ট সাহেব তাঁহাকে জ্যেষ্ঠসহোদরের ন্যায় সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তিনি আমার পিতৃদেব অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন, বেশ প্রবীন বয়স, মাথার চুল ভাল করিয়া খুঁজিলে দুই এক গাছি কাল বাহির হইত। বর্ণ কিন্তু স্বর্ণোজ্জ্বল—তাহার উপর উজ্জ্বল চক্ষু দুটীতে করুণার ধারা যেন ঝরিতে থাকিত।

দুর্গাদাস বাবুর নাক বুদ্ধির ভাণ্ডার ছিল, কেহ কোন দায়ে ঠেকিলে একটু বুদ্ধির জন্ম সেই ভাণ্ডারের সাহায্য লইতে ছুটিত। কন্যা দায়, মাতৃপিতৃদায় হইতে উমেদার প্রভৃতি কেহ বাকী থাকিতেন না। আর দারিদ্র্যতাড়নে অভুক্তকে অন্ন দিতে তিনি অকাতর ছিলেন। তাহার উপর তাঁহার সুন্দর বেশ ভূষা ছিল, বড় বড় ওয়েলারের জুড়ি ছিল। সে জুড়িতে তাঁহার পুত্রদের সহিত আমার সমান অধিকার ছিল। সেই প্রকাণ্ড জুড়ি তখন গম্ গম্ করিয়া আসিয়া আমাদের দরজায় উপস্থিত হইল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সেই গাড়িতে চড়িয়া আমরা সকলে গান শুনিতে গেলাম। হিন্দি গানই হইল। হিন্দি গান কয়জন বুঝিয়া ছিলেন জানি না; কিন্তু রাগিণীর ঝঙ্কারে তন্ময়ত্ব আসিয়াছিল। আমি যত বুঝি না বুঝি বঙ্কিম বাবু যখন বাহবা দিলেন, তখন বুঝিলাম গান ভালই হইতেছে। শেষে ফরমাইস হইল বাঙ্গলা গান। গায়ক সহাস্যে বলিলেন যে তাঁহার বাঙ্গলা গান জানা নাই তবে একটী ব্রাহ্ম সঙ্গীতের দুই একটী কলি আয়ত্ব করিয়াছেন মাত্র। তাহাই গাহিলেন তাহার প্রথমাংশ এই—

"অকুল ভব সাগরে তারহে তারহে।"

বালকের ন্যায় আধ আধ উচ্চারণ সহকারে সেই বাঙ্গলা গানের বড় বাহবা পড়িয়া গেল। শেষে হইল জলতরঙ্গ বাজনা। আমি সেই সর্ব্ব প্রথম জলতরঙ্গ বাদন শুনিয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবুর পরিচয় পাইয়া মাওলাবক্স বড়ই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আমার আজ বড় সৌভাগ্য যে এমন মজলিসে গাহিলাম। আপনারা আমায় একটী সার্টিফিকেট দিন।" তখন মুখ চাওয়া চাহি হইল। বঙ্কিম বাবু দুর্গাদাসবাবুরদিকে চাহিলেন। সম্ভবতঃ সেই বুদ্ধির ভাণ্ডারের সাহায্য প্রার্থনায়। বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই বিতরিত হইল। দুর্গাদাসবাবু বলিলেন "এখন বলুন দেখি যে সার্টিফিকেট কে কাকে দিবে। আপনার ন্যায় লোকের গান শুনিয়াছি বলিয়া আমরাই সার্টিফিকেট পাইতে পারি, আপনাকে আবার কি দিব।" তখন হাসির সঙ্গে সার্টিফিকেট দেওয়ার কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

দুর্গাদাস বাবু বড় জমিদার ছিলেন, চাকরী ছিল তাঁহার সখ। চাকরীর বেতনে তাঁহার কিছু হইত না। তাঁহার পুত্রগণের অনেকে অধুনা "মল্লিক" উপাধি ছাড়িয়াছেন। তাহার জাজ্বল্যতম প্রমান আমাদেরই ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের পার্শনাল এসিসটেণ্ট রায় অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর। শিক্ষায় এম, এ (রায় চাঁদ প্রেম চাঁদ) কার্য্যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, সম্মানে রায় বাহাদুর আর বাকী কি রাখিয়াছ, কিন্তু সেই দেব চরিত্রের, আর সেই অতুল সম্মানের কতটুকু অংশ

পাইবার অধিকারী হইয়াছ, তাহা সত্য করিয়া বল দেখি ভাই ?

একদিন ৺ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আমাদের অতিথি। রবিবার মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছেন, রাত্রের মেলে পশ্চিম যাইবেন। বঙ্কিম বাবুও সে দিন বৰ্দ্ধমানে। বৰ্দ্ধমানে তখন একটী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নামটী মনে নাই। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাহার উপর তিনি আমাদের বড়ই প্রিয় পাত্র ছিলেন, কেননা তিনি আমাদিগকে অনেক রং তামাসা ও হস্ত চালনার কৌশল দেখাইতেন। টাকা উড়াইয়া দিতেন, মন্ত্র পাঠ করিয়া সন্দেশ আনিতেন এবং আরও অনেক রকম করিতেন। বলিতেন তিনি মনে করিলে অৰ্দ্ধমণ সন্দেশ খাইতে পারেন। খাইতে বলিলে বলিতেন যে আমাদের বাড়ী নয়, আর কোথাও দেখাইব। যাহাই হউক তাঁহার সে বিদ্যাটা আমার দেখা হয় নাই। তাঁহার আর একটী বিদ্যা ছিল। অঙ্গুলির সাহায্যে বিনা কলমে লেখা। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে সকল অঙ্গুলিতে কালি জোবড়াইয়া লিখিতেন, যেন ছাপার লেখা। কনিষ্ঠাঙ্গুলির লেখা প্রায় পেন কলমের লেখার মত দেখাইত। দুষ্ট লোকে বলিত তিনি পরের নামের অবিকল প্রতিকৃতি দেখাইতে পারেন। আর তাহাতেই নাকি তাঁহার বিশেষ অর্থাগম হয়। আমি, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রতিম (সবজজ) স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ মিত্র (শ্রীমান যামিনী মোহন মিত্র রায় বাহাদুরের পিতা) আমরা এই কয়জনে বসিয়াছিলাম। এমন সময় আমাদের সেই আদরের ব্রাহ্মণ ঠাকুরটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাগ্রহে বলিলাম "ঘরের ভিতর ভারি মজলিস একটু নূতন কিছু দেখাইতে পারেন ?" তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম শুনিয়া বলিলেন "তবে একটু দেখাই এস।"

তিনি ঘরের ভিতর গেলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া একটী পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। বাবা দেখিয়াই বুঝিলেন ব্রাহ্মণ একটু রঙ্গ করিতে আসিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে চিনিতেন না।

তিনি তখন কানা সাজিয়াছেন। বলিলেন "আজ নাকি কে একজন বড় ডাক্তার এখানে আসিয়াছেন তাই শুনিয়া আমি চক্ষু দেখাইতে আসিয়াছি। হ্যাঁ ডাক্তার বাবু কাণার চক্ষু হয় কি ?"

সরকার মহাশয় বলিলেন "আপনি কি জন্মান্ধ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে আর উপায় কি ?"

"তবু একবার দয়া করে চক্ষু দুটী দেখুন না।"

ডাক্তার মহাশয় চক্ষু দেখিলেন। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "এ যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি। চক্ষের পশ্চাৎ ভাগ সম্মুখে।" তিনি ক্ষণেক চক্ষু দুটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন "আমি এরূপ চক্ষু কখন দেখি নাই।"

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন "কোন উপায়ই কি নাই ডাক্তার বাবু ?"

"আপনার চক্ষের তারা গড়িতে যখন ভগবানের ভুল হইয়াছে, তখন আর উপায় কি ?"

ব্রাহ্মণ তখন দুই চক্ষে ক্ষণেক হস্ত বুলাইয়া চক্ষু চাগিয়া ফেলিলেন এবং সহাস্যে বলিলেন "দেখুন আপনাকেও ঠকাইয়াছি, আমার খুব মস্ত তারা।"

সত্যই তাঁহার সুন্দর চক্ষু। পার্শ্বগুলিতে যেন মাকড়সার জাল রক্তে ভিজাইয়া বসাইয়া দেওয়াছিল। তখন ডাক্তার বাবু আবার তাঁহার চক্ষু দেখিলেন। বলিলেন "আমি এতটা বুঝিনাই। আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা।"

আমি বঙ্কিম বাবুর নিকট তাঁহার গুণ জাহির করিয়া দিলাম। তখন বঙ্কিম বাবু বলিলেন "টাকা ওড়ান, কাঁকীর বিদ্যা জানি; কিন্তু সন্দেশ আনিবেন কি করিয়া ?"

তিনি বলিলেন "কি করিয়া তা বলিব না, তবে আনিয়া দেখাইব।"

সেই দিনই দেখান হইল। সন্ধ্যার সময় পুরামজলিস্ মধ্যে তিনি ক্ষণেক মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া একটী থালা পাঠাইলেন এবং তাহার উপর হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া কি বলিতে লাগিলেন, আর থালায় টপ্ টপ্ করিয়া সন্দেশ পড়িতে লাগিল। সন্দেশ বৰ্দ্ধমানে যাহাকে

যোড়া সন্দেশ বলে তাহাই। নিতান্ত কম নহে প্রায় দুই সের। আমি সন্দেশগুলি লইয়া বাটীর মধ্যে গেলাম। মা পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলেন আজ ভুতুরে ঠাকুর ভুতের সাহায্যে সন্দেশ আনাইবেন। সুতরাং সন্দেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "ও সন্দেশ এখানে কেন, ছুঁসনে, ছুঁসনে।" আমি কিন্তু হাসিতে হাসিতে তাহার গোটাকত উদরস্থ করিয়া, তাঁহার আরও ভীতি সঞ্চারণ করিয়া দিলাম। বঙ্কিমবাবু সর্ব্বপ্রথম একটী সন্দেশ ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু খান নাই।

ধীরাজ কথায় কথায় গান বাঁধিতে পারিতেন। আমি খুব বাল্যকালে তাঁহার গান কাশীমবাজারের রাজবাটীতে শুনিয়াছিলাম, তাহার পর শুনি বর্দ্ধমানে। এবার ধীরাজ আশ্রয় লইয়াছিলেন কুঠিবাড়ির শ্রীযুক্ত বিনোদলাল বর্দ্ধণের বাটীতে। এখানেও দুই একটী মজলিসে নাকি তিনি গান করিয়াছিলেন কিন্তু আমি শুনি নাই; শেষে যখন সঞ্জীব বাবুর বাসায় গান হয় তখন শুনিতে যাই। দেখিলাম তিনি পরিণত বয়স্ক ছিপছিপে লোক, মজলিসে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গান করিতেছেন আর সেই সঙ্গে গানের উদ্দেশ্য, কেন রচিত হয় তাহার পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার মামুলি দুই একটী গান হইবার পর ফরমাইসী গান আরম্ভ হইল। ধীরাজ সঙ্গে সঙ্গে অনেক মজাদার গান রচনা করিয়া গাহিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ধীরাজ মহাশয়ের নামটী আমার মনে নাই।

এখানে বেশী লোকের সমাগম হয় নাই। দুই পাঁচটী চেনা লোক মাত্র। তাহার মধ্যে ছিলেন বঙ্কিম বাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ বাবু আর পূর্ণ বাবু ছিলেন কি না ঠিক মনে পড়েনা। এই সময় তাঁহারা সকল ভ্রাতাএ মিলিয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়াছিলেন শুনিয়া ছিলাম দল বাঁধিয়া নাকি সকলেরই মাথা ঘোরা হইয়াছিল। ধীরজ মহাশয় ইহা লক্ষ্য করিয়া একটী গান রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন "দেখিতেছি আপনি এখনও কত ধানে কত চাল হয় তাহা জানেন না।" ধীরাজ অমনি করজোড়ে বলিয়া উঠিল "কথাটা ঠিক।" এই বলিয়াই গান। তাহার প্রথমাংশটী মনে আছে—

"আমি কত ধানে কত চাল না জানি,
গাঁজা খাই ওড়াই মজা দিবস রজনী।"

শেষাংশটা খুব রংদার কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা আমার স্মরণ হয় না। গান শুনিয়া বঙ্কিম বাবু বড় প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং ধীরাজ মহাশয়ের প্রাপ্যের উপর স্বয়ং দশটি টাকা দিয়াছিলেন।

দৈবে ও প্রেত যোনিতে বঙ্কিম বাবুর বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন ওসব কিছু বুঝা যায় না, কি থেকে কি হয় তাহা বলা কঠিন। তিনি স্বীকার করিতেন এমন অনেক ঘটনা তিনি দেখিয়াছেন যাহা লোকের কাছে বলাও ঠিক নয়' অবিশ্বাস করাও ঠিক নয়। কেহ বুজরুকি দেখাইলে, এবং তাহা দেখিবার উপযুক্ত হইলে তিনি সাগ্রহে তাহা দেখিতেন। কোন কিছু দেখিয়া কখন আশ্চর্য্যের ভাবও প্রকাশ করিতেন না, ঘৃণার ভাবও দেখাইতেন না। বহুবিধ ইতিহাস পাঠের আগে তাঁহার এইরূপ ধারণা জন্মিয়া ছিল, এবং তাহারই পরিণামে তাঁহার জ্যোতিষ শাস্ত্রে আস্থা জন্মে এবং পরিশেষে ঘোর অদৃষ্টবাদী (fatalist) হইয়া উঠেন।

একবার একটী কিম্ভূত কিমাকার ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন, তিনি ইট পাথর প্রভৃতি গিলিয়া ফেলিতেন আবার সেগুলি মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিতেন। পাঁচটী টাকা দিলেই তিনি এইরূপ নানাবিধ কৌতুক দেখাইতেন। আমাদের বাসায় তিনি দিন কয়েক ছিলেন। সেই কয়দিনই বঙ্কিম বাবু তাহার কার্য্যকলাপ নিবিষ্টভাবে দেখিতেন, কিন্তু কোন কথা কহিতেন না।

একদিন আমরা তাহাকে একটী ঘরের ভিতর টেবিলের সঙ্গে বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলাম। কিন্তু ক্ষণেক পরেই তিনি বাহিরে আসিলেন। তাহার পর বঙ্কিম বাবু তাহাকে একটী চেয়ারে বসাইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। দুই হাতে দুই মুঠা ময়দা দেওয়া হইল। ভাবিলেন নিজে খুলিবার চেষ্টা করিলে ময়দা হস্তচ্যুত হইবে। কিন্তু মুষ্টিবদ্ধ ময়দা যেমন

তেমনি আছে অথচ তিনি বাহিরে আসিয়াছেন। লোকটী বলিতেন আমি ইঞ্জিনসমেত ট্রেন পেটের মধ্যে পুরিতে পারি। সে বিদ্যাটা দেখি নাই, কিন্তু একদিন একটী সজীব পাঁঠা নাকি গিলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ব্যাপারখানা এই। তিনি আমাদের সঙ্গে শ্যামসায়েরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। একটি ঘাটে নামিয়া দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে। তিনি তাহাকে অন্য ঘাটে যাইতে বলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাহা আমলে আনিল না। এই দেখিয়া তিনি ছুটিয়া ঘাটের উপর উঠিলেন। সেখানে একটী পাঁঠা চরিতেছিল তিনি সেইটীকে দুই হস্তে তুলিয়া মুখের কাছে ধরিলেন, আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিলাম, কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটী দেখিল যে আস্ত পাঁঠা তাঁহার পেটের মধ্যে চলিয়া গেল। তখন সে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলাইল এবং বলিতে লাগিল "ও বাবা এ যে রাক্ষস, আস্ত পাঁঠাটা গিলে ফেল্‌লে গা।" হয় ত এই ভাবে তিনি এঞ্জিন শুদ্ধ ট্রেন পেটে পুরিতেন। তাঁহার আর একটী কাজ ছিল চাহিলেই ছোট এলাইচি দেওয়া।

এই লোকটীকে টাকা দিলেও তিনি তাহা পেটের মধ্যে রাখিয়া দিতেন। আবার বলিলে বাহির করিতেন। একদিন বঙ্কিম বাবু ৫টা টাকা চিহ্নিত করিয়া তাহাকে দিলেন। দিবামাত্র উদরস্থ হইল। তাহার পর সহাস্যে বলিল "এইবার আপনার মার্কা করা টাকা আপনাকে দেখাইতে হইবে নয়?"

"হাঁ।"

"ভাল, কিন্তু আমি বলি সব কটা বাহির করা অপেক্ষা কোন চিহ্নের টাকাটী অগ্রে বাহির করিব বলুন না।"

বঙ্কিম বাবু "তবে থাক" বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলে হাসিতে লাগিলেন।

এখন বুঝিতে পারি যে ইহা যাদুবিদ্যা, mesmerism, আমাদের দেশে এই সকল বাজীকরদের প্রেতসিদ্ধ বলিত। অনেকে বলেন ভানুমতীর বাজিও hypnotism দ্বারা সম্পন্ন হয়। পাশ্চাত্য উক্ত বিদ্যা বিশারদগণ তাহা অধুনা স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার ভিতরের ব্যাপার কি তাহা জানা না থাকিলেও আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোকেও সুকুমার মতি বালক বালিকাদিগকে বশীকরণ করিতেন। আমি একদিন দেখিলাম আমার একটী আত্মীয়া আমার একটী সন্তানকে এই অভিনব উপায়ে ঘুম পাড়াইতেছেন। জ্যৈষ্ঠমাসের দিন বালক হুড়াহুড়ী করিতেছে। তাহাকে কেহ শোয়াইতে পারিতেছেন না। কে দুই এক ঘা বসাইয়া দিলেন, তাই দেখিয়া তিনি বলিলেন "আহা মারিস্ নে। আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্চি।" তখন তিনি আদর করিয়া বালককে ক্রোড়ে শোয়াইয়া বলিলেন "গল্প শুন্‌বি?" সে আগ্রহসহকারে সম্মতি-জ্ঞাপন করিলে তিনি "দুয়ো সুয়ো" রাণীর গল্প আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন "ঐ যে টবের উপর গাছটী আছে ঐ দিকে চাহিয়া থাক্, একবার অন্যদিকে চাহিলে আর আমি গল্প বলিব না।" বালক গল্পের মায়ায় তাহাই করিল। তখন তাহার স্থির দৃষ্টি নিবন্ধন জন্য তন্দ্রাবিভুত হইল, ইংরাজি মতে সম্ভবতঃ ইহাই Self-hypnotism আমার মনে হয় গল্প শুনিবার সময় যে "হুঁ" দিবার প্রথা ছিল, তাহাও ইহার অন্তর্গত।

বঙ্কিম বাবু সাধারণ পাঠাগারে বিনামূল্যে পুস্তকাদি দিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। প্রায় দিতেন না। বলিতেন উহা বড়ই নিন্দনীয় প্রথা। চাঁদা তুলিয়া যাহারা লাইব্রেরি চালায় তাহারা গ্রন্থকারের স্বার্থে হানি করে কেন? একখানি পুস্তক ভিক্ষা করিয়া লইয়া দেশশুদ্ধ লোককে পড়ান কেন? বিলাতে এমন ঘৃণিত প্রথা নাই। তাহারা গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিতে পিতা পুত্রে পুস্তক ক্রয় করে, আর আমাদের দেশে ঠিক তাহার বিপরীত।

আমি একবার যশোহরের একটী অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের পুস্তকাগারের সাহায্যার্থে আমার প্রণীত পুস্তকও দিয়াছিলাম তাহার উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিম বাবুকে তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকগুলি উপহার দিতে অনুরোধ পত্র দিই। লোকটী বড় মিষ্টভাষী একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের

প্রদত্ত পুস্তকাবলী আমায় দেখাইয়া গেলেন এবং আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু দেখিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" "কথামালা" প্রভৃতি পুস্তকও আনিয়াছেন। তখনই কেমন একটা খট্‌কা লাগিল, তাই তাঁহাদের দেশের পোষ্টমাষ্টারকে এক পত্র লিখিলাম। উত্তরে জানিতে পারিলাম সমস্তই মিথ্যা, পুস্তক সংগ্রহ ও বিক্রয় করা উক্ত বাবুটীর এক প্রকার ব্যবসা। বঙ্কিম বাবুর কাছে এ গল্পটী করিবা-মাত্র তিনি বলিলেন "আমি তা জানি, আমি তাহাকে দু চার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই বুঝিয়াছিলাম লোকটা ভাল নয়। কিন্তু কি করি তোমরা ছোক্‌রা বাবু, দয়ার সাগর। পুস্তক না দিলে রাগ করিবে, তাই দিয়াছিলাম। যাহাই হউক এখন উমাচরণকে বলিয়া দিতেছি যে তুমি ভবিষ্যতে পত্র দিলে আর যেন কাহাকেও পুস্তক না দেয়। হুকুমজারি হইল। উমাচরণ বাবু তাঁহার পুস্তকবিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

মিসর রমণী।

ইউরোপ যখন তমসাচ্ছন্ন ভূমধ্যসাগরের অপর পারে, নাইল উপত্যকা সর্ব্বপ্রথম সভ্যতার কিরণে উদ্ভাসিত হয়। সে আজ অনেক কালের কথা—খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে। এই প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট বিশেষ সমাদৃত। মিসরের পীরামিড, মিসরের শিল্প, মিসরের গণিত জ্যোতিষ এককালে জগতকে বিস্মিত করিয়াছে।

নীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন সমাজে নারীমর্য্যাদা দ্বারা দেশের জাতিগত সভ্যতা অনেকটা নির্ণীত হয়। এই আদর্শে মিসর সমাজ পরীক্ষিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন কেন আধুনিক জগতে মিসর অতি উন্নত স্থান অধিকার করে এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারেনা। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

সর্ব্বদেশের সর্ব্বসমাজের মত মিসর সমাজ ও বিভিন্ন পরিবার দ্বারা গঠিত; এবং এক একটি পরিবার স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণ দ্বারা পুনর্গঠিত। জগতের অন্যান্য জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাজে অন্ততঃ শৈশব অবস্থাতে স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীই অধিকতর প্রভুত্বশালী—পরিবারে স্বামীর প্রাধান্য ও স্ত্রীর বশ্যতাই সামাজিক প্রথা। কিন্তু মিসর সমাজের সমস্ত স্তরেই, সমাজের অভ্যুদয় হইতে পতন পর্য্যন্ত পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী একই স্থান অধিকার করিত। পারিবারিক সমস্ত বিষয়ে স্ত্রীর মতামত কদাচ উপেক্ষিত হইত না। বলিতে কি স্ত্রীর প্রতি স্বামী যথোপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিত। স্ত্রী স্বামীর সম্পদে বিপদে চির-সঙ্গিনী এবং গভীর দাম্পত্য প্রণয়ের ছবি তৎকালীন প্রস্তর স্তম্ভে খোদিত আছে। এইরূপ সমাজে নারীমর্য্যাদা মিসর ইতিহাসকে অলঙ্কৃত করিয়াছে৭ রাজকীয় পরিবারে 'Harem' প্রথার প্রচলন ছিল এবং রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী নারীই রাজ্ঞী ও তাহার গর্ভজাত পুত্র যুবরাজ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই প্রাচীন কালে 'Harem' প্রথা প্রাচ্য দেশে কোনমতেই নিন্দার্হ ছিল না।

মিসরের বিবাহ পদ্ধতিতে কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। সমাজের সকল অবস্থাতেই ভগ্নী বিবাহ প্রথা ছিল। কাজে কাজেই শৈশব হইতে উভয়ের ভিতর ভালবাসা জন্মিত। ভগ্নী বিবাহের উদাহরণ ইতিহাসের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়। এমন কি পৌরাণিক কাহিনীতে Osiris তাহার ভগ্নী Isis কে বিবাহ করিয়াছিল। Osiris তাহার নিষ্ঠুর ভ্রাতা Set কর্ত্তৃক রাজত্বের প্রলোভনে হত হইলে শোকবিহ্বলা Isis স্বামীর মৃতদেহ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া পুত্র Horus কে পিতার অমানুষিক মৃত্যুর হেতু পাপিষ্ঠ পিতৃব্য Set কে

উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য প্রণোদিত করে এবং আজ্ঞাধীন পুত্র মাতার উপদেশ পালন করিয়াছিল। এই Isis মিসর সমাজে আদর্শরমণী-স্নেহশীলা জননী ও প্রিয়তমা ভার্য্যা। অষ্টাদশ বংশীয় সম্রাট Amenhotep ভগ্নী Ah-hotepu কে, প্রথম Thutmosis (১) তাহার ভগ্নী Ahmasi ও তৃতীয় Thutmosis ভগ্নী Hatshepsut (২) কে বিবাহ করিয়াছিল। Nepetilli প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক Ikhnaton এর ভগ্নী ও পরিশেষে ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহ হয়। শুধু ভগ্নী বিবাহ নহে উনবিংশ কুলে পিতা ও কন্যাতে বিবাহ হইয়াছিল। সম্রাট দ্বিতীয় Ramses এর ১১১ পুত্র ও ৫৫ কন্যা ছিল এবং কতিপয় কন্যাগণকে সম্রাট পত্নী স্বরূপে গ্রহণ করে। এইরূপ বিবাহ পদ্ধতির প্রচলনে অনেকেরই মনে হইতে পারে যে মিসর সমাজ অত্যন্ত কলুষিত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। কিন্তু এবম্বিধ মত পোষণ করা ভ্রান্তিমূলক। খ্রীষ্টিয় ও মুসলমান সমাজে 'consin' বিবাহ প্রথা প্রচলিত কিন্তু হিন্দুসমাজে এইরূপ বিবাহ কোন মতেই আইন-সঙ্গত নহে। মিশর সমাজ 'incest' কাহাকে বলে জানিত না, কাজেই ভাই-ভগ্নীর বিবাহ চলিত ছিল। উচ্ছৃঙ্খল বিবাহ সমাজে নিন্দার্হ ছিল এবং নীতি ও ধর্ম্মের প্রতি সমাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অনেক প্রস্তর-ফলকে যুবকের প্রতি বৃদ্ধের হিতোপদেশ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। জনৈক বৃদ্ধ যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—"নগরে অপরিচিতা নারীর প্রতি সাবধান হও, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিওনা, তাহাকে জানিতে অভিলাষী হইও না। নারীর চিত্ত গভীর জলধির মত তরঙ্গায়িত (তোমার মগ্ন হইবার সম্ভাবনা)। যে নারীর স্বামী অনুপস্থিত সে তোমার সঙ্গে পত্রালাপ করিবে এবং পরিশেষে (মায়া) জাল বিস্তার করিবে" (৩)। এই স্থলে বাইবেলের Solomon এর উপদেশ উল্লেখযোগ্য; Solomon বলিতেছেন—"(প্রভু তোমাকে) অপরিচিতা নারী হইতে উদ্ধার করিবেন। যেনারী তোমাকে বাক্য দ্বারা তুষ্ট করিতে চায়, যে যৌবনের আদর্শ ত্যাগ করে এবং প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করে তাহার আশ্রয়ে তুমি ক্রমশঃই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছ।" (৪)

বিবাহে ঘটকের আবশ্যকতা হইত না; বর কন্যার মত হইলেই বিশেষ সমারোহের সহিত বিবাহ সম্পাদিত হইত কিন্তু ইউরোপীয়ানদের মত পত্নী-ত্যাগ বা divorce চলিত ছিল। পারিবারিক জীবন সাধারণের অতীব সুখকর ছিল। পুত্রকন্যাগণ পিতামাতার আজ্ঞাবহ এবং পিতৃমাতৃ-স্নেহ গৌরবের বিষয় গণ্য হইত – প্রস্তর ফলকে ইহা প্রমাণিত হয়। পুত্র প্রস্তর স্তম্ভে লিখিয়াছে; "আমি পিতা দ্বারা আদৃত ও মাতা দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছি, ভ্রাতা ভগ্নীদের ভালবাসার ভোগ্যছিলাম।" (৫) মাতাই পরিবারের প্রকৃত বন্ধন ছিল এবং মাতৃস্নেহ, মাতৃ-ঋণ ও তদ্‌বিনিময়ে সন্তানের কর্ত্তব্য তদানন্তীন নীতিজ্ঞের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল।

মিসরের উত্তরাধিকার বিধিও কিছু বিভিন্ন ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইত; যে কন্যার উভয় কুলই রাজকীয় এবং পুত্রের এক কুল রাজকীয় এমত অবস্থাতে কন্যাই সম্পত্তি ভোগ করিত। Hall বলিয়াছেন "(বেবিলোনে) প্রাচীন সুমেরিয়ান (Sumerian) আইনানুসারে পুরুষ নারী অপেক্ষা পরিবারে অধিকতর ক্ষমতাশালী কিন্তু মিসর প্রথা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মিসর পরিবারে স্ত্রীরই অধিকতর প্রভুত্ব ছিল—মিসর স্ত্রী "গৃহকর্ত্রী" Lady of the House) এবং স্বামী "শুধু পুরুষ" (mere male) নামেই অভিহিত হইত।" (৬) মধ্যযুগে মিসর ভূম্যধিকারীর সম্পত্তি দুইভাগে বিভক্ত ছিল, একাংশ তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন এবং বংশ পরম্পরায় তাহাতে অধিকার থাকিত, অপরাংশে রাজার দান স্বরূপে শুধু ভোগের জন্য

(১) অনেক ঐতিহাসিকগণ Thutmosis কে Ahurasi র ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন না, এখানে Mesperoর মতই উল্লিখিত হইল।

(২) Hall বলেন যে Hatshepsut তৃতীয় Thutmosis এর ভ্রাতা, কিন্তু Breasted এর উল্লিখিত মত।

(৩) Breasted's Hist. of Egypt পৃঃ ৮৬।

(৪) Solomon's Proverbs, verses 16—19। (৫) Breasted's History of Egypt পৃঃ ৮৫ (৬) Hall's The Near East পৃঃ ২০৫

গ্রহণ করিত; উহার মৃত্যুর পর রাজা এই সম্পত্তি সাধারণতঃ ঐ পরিবারেই ন্যস্ত রাখিত কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যার আইনানুসারে উত্তরাধিকার কখনই উপেক্ষা করিত না। Siut এতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতার মৃত্যুর পর কন্যাই পুত্রের শৈশবস্থাতে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিত। অষ্টাদশ কুলের সম্রাট প্রথম Ahmenhotep ও সম্রাজ্ঞী Ahhotepauএর একই মাত্র কন্যা Ahmasi, Thutmosis সম্রাটের এক উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র। Ahmasi ও Thutmosis এতে বিবাহ হইল। আইনতঃ উভয়কুল রাজকীয় বলিয়া Ahmasi সম্রাজ্যের অধিকার পাইল। কিন্তু স্বামীর জন্য Ahmasi আপন অধিকার ত্যাগ করিল। মিসর ইতিহাসে Ahmasiএর স্বামী সম্রাট প্রথম Thutmosis নামে খ্যাত। Ahmasiর মৃত্যুর পর Thutmosisএর সিংহাসন রক্ষা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। Ahmasiর Hatshepsut নাম্নী কন্যা ছিল, সম্রাট প্রথম Ahmenhotep এর ন্যায় প্রথম Thutmosis এরও এক উপপত্নীর গর্ভে দ্বিতীয় ও তৃতীয় Thutmosis নামক দুই পুত্র জন্মে এবং Hatshepsut তৃতীয় Thutmosis কে বিবাহ করে। তৃতীয় Thutmosis পত্নীর অধিকার সূত্রে রাজত্ব প্রাপ্ত হয় প্রথমতঃ পত্নীর অধিকার অবহেলা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সমাজ ঘোরতর বিরোধী হওয়াতে সম্রাট কিয়ৎকাল পরেই Hatshepsut কে সম্রাজ্ঞী স্বীকার করিল। ঊনবিংশকুলের Horemhab অষ্টাদশকুলের সম্রাট Ikhnotonএর মহিষীর ভগ্নী রাজকুমারী Mutneymet কে বিবাহ করিয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। (৭) নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষ সম্পত্তির অধিকার লাভ করে এইরূপ দৃষ্টান্ত মিসরে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়।

মিসর রমণী আপন প্রতিভাবলে সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইতিহাস তাহাদের অমর কীর্ত্তির বিবরণ দিতেছে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় বংশীয় রাজা Khasikhemuiএর রাজ্ঞী Nemathep এর নাম আজও ইতিহাসে স্থান পাইতেছে। ষষ্ঠবংশীয় রাজ্ঞী Nitocris ইতিহাসে নানারূপ কৌতুহলোদ্দীপক উপাখ্যানের বিষয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; দ্বাদশবংশে Sebek-nefru-Re নাম্নী আর এক বিখ্যাত রাজ্ঞী ছিল কিন্তু অষ্টাদশ বংশীয় Hatshepsut সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী ও প্রভুত্বশালিনী সম্রাজ্ঞী তৃতীয় Thutmosis ও Hakshepsut এর একত্র রাজত্বকালে রাজত্বের গুরুভার সম্রাজ্ঞীর উপরই ন্যস্ত ছিল। মিসরসমাজ Hatshepsut কে 'রমণী-Horus' বলিত। সম্রাজ্ঞী রাজকার্য্য কোন সময়েই অবহেলা করিত না। এবং সর্ব্ববিষয়েই তাহার বুদ্ধিচাতুর্য্য ও অসাধারণ দক্ষতা প্রতিভাত হইত। Der-el-Bahri র প্রসিদ্ধ মন্দির অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি ধ্বনিত করিতেছে তাহার পিতার প্রধান শিল্পী Ineni বলিয়াছে "(Hatshepsut) adjusted the affairs of the Two Lands by reason of her designs ; Egypt was made to labour with bowed head for her,...... The bowcable of the South, the morning stake of the Southeners, the excellet stem cable of the Northland is she ; the mistress of command, whose plans are excellent, who satisfies the Two Regions when she speaks." (৮) শিল্পে ও বাণিজ্যে তাহার অপরিসীম উৎসাহ ছিল এবং শিল্পী Senmut কে সর্ব্বদাই পারিতোষিক দ্বারা উৎসাহিত করিত। অনর্থক যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে ধন নষ্ট ও সমাজকে ক্লিষ্ট করা Hatshepsut কখনই পছন্দ করে নাই— সাম্রাজ্যে সুখশান্তি স্থাপন করাই চরম উদ্দেশ্য মনে করিত। তাহার সুশাসনের ফলে প্রজাপুঞ্জের ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। Karnakএর মন্দির তাহার অক্ষয়কীর্ত্তি। ত্রয়োদশ বৎসরাধিক রাজত্বের পর আপনাকে গৌরবান্বিতা করিয়া সম্রাজ্ঞী মানবলীলা সংবরণ করে। তাহার মৃত্যুর পর Thutmosis স্ত্রীর কারুকার্য্যপূর্ণ মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া Hatshepsut

(৭) Hall. Horemhab কে অষ্টাদশকুলের শেষ সম্রাট ও Breasted ঊনবিংশ কুলের প্রথম সম্রাট বলেন।

(৮) Breasted's Hist of Egypt পৃঃ ২১১।

এর নাম জগত হইতে লোপ করিবার জন্ম শত চেষ্টা করিয়াও বিফল হইল। Breasted সত্যই বলিয়াছেন "Hatshepsutএর ভগ্নমন্দিরগুলি শুধু Thutmosis এর বিদ্বেষের প্রধান সাক্ষীস্বরূপ আজও জগতে দণ্ডায়মান। প্রসিদ্ধ Karnak মন্দির ভূতলে পতিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার খ্যাতি ও অমরকীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিতেছে।"(১) এই বংশীয় তৃতীয় Ahmenhotepএর সম্রাজ্ঞী Tiir নামও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। Ahmenhotepএর উপর Tiir যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং পুত্র Ikhnatonএর শৈশব অবস্থায় মাতাই রাজত্বের ভার গ্রহণ করে। ধর্ম্মসংস্কারক Ikhnaton যখন মিসর সমাজকে Aton ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের জন্ম আন্দোলিত করে তখন জননী Tii ও ভার্য্যা Nefr-etitti কিয়ৎকালের জন্ম রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ Iknaton এর মত্ততাকে তিরোহিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু যুবক সম্রাটের প্রতিভা পরিশেষে উন্মাদের মত্ততাতেই পরিণত হয়, রমণীদ্বয়ের চেষ্টা বিফল হইল। রাজকার্য্যে ঔদাসীন্ম আসিল এবং সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ইহার বিষময় ফল সহজেই প্রতীত হয়। Hall বলেন যে এই নূতন Aton ধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক সম্রাট তৃতীয় Ahmenhotep ও Tii, Tii রাজত্বের হিতসাধনের জন্যই স্বার্থান্ধ Thebesএর Amon পূজারকদের স্বার্থ বিনাশ করিতে এই Aton ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে স্বামীর সহায়তা করে। কিন্তু পুত্র Ikhnaton উন্মাদের ন্যায় এই ধর্ম্মপ্রচারে সতত রত হইয়া রাজত্বে অরাজকতা আনয়ন করে।

শুধু সামাজিক রাজকীয় কার্য্যে নহে, ধর্ম্মবিষয়ক কার্য্যেও মিসর রমণীর প্রতিভা বিশেষ লক্ষিত হয়। Thebesএর Amon দেবতার প্রাধান্য সমাজ স্বীকার করে তখন মিসর রমণীই মন্দিরের শাসনকর্ত্রী ছিল এবং তৎকালীন রাজ্ঞীকে 'Divine Consort' বলা হইত। যখন সমাজে পৌরহিত্য এক শ্রেণীতেই আবদ্ধ হইল সেখানেও রমণীর উত্তরাধিকার বিধি গণ্য হইত। এবং পূজারকগণ স্বকীয় মাতা, ভগ্নী বা স্ত্রীর উত্তরাধিকারসূত্রে পৌরহিত্য প্রাপ্ত হইয়া Amon দেবতার অতুলসম্পত্তি ভোগ করিত।

সমাজে স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। তৃতীয় Thutmosis আপন শিক্ষক Senmutকে রাজকুমারী-গণের শিক্ষার জন্ম ও নিয়োজিত করে। নৃত্যগীতে ও রমণীগণ অপারগ ছিল না। দ্বাদশ বংশীয় হতভাগ্য Sinhueর আত্ম-জীবনী হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রথম Senusertএর অনুরোধে যখন Sinuhe সিরিয়া হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে রাজা Sinuheর মনস্তুষ্টির জন্ম রাজকুমারীগণকে নৃত্য করিতে আদেশ করিল এবং Sinuhe উহাদের নৃত্য-দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়াছিল। মিসর স্বামী আপন অবসর সময়ে অন্তঃপুরে মনমুগ্ধকর অলঙ্কার ভূষিতা রমণীগণের নৃত্যগীত সম্ভোগ করিত। Breasted স্পষ্টই স্বীকার করেন যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে Amenemhetএর পরিবারস্থ রাজকুমারী গণ যে অলঙ্কারে ভূষিতা হইত ইউরোপের স্বর্ণকারগণ নির্ম্মিত অলঙ্কার সৌন্দর্য্যে অথবা নৈপুণ্যে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সমাজের নিম্নস্তরেও রমণীগণের সর্ব্ববিষয়ক কার্য্যে দক্ষতা প্রমাণিত হয়। "প্রাচীন রাজ্যে" অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মিসর রমণী স্বহস্তে যে বস্ত্র বয়ন করিত উহা এত মসৃণ ও সূক্ষ্ম যে Breasted বলেন পুঙ্খানুরূপে দৃষ্টিগোচর না করিলে 'সিল্ক' হইতে উহার পার্থক্য বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

সমাজে স্ত্রীজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। একাদশ-কুলের এক প্রস্তর ফলকে এইরূপ লিখিত আছে—'আমি বিধবা ও তাহার পুত্রের খাদ্যের সংস্থান করিয়াছি,' 'কাহারও কন্যা অন্যায়রূপে গ্রহণ করি নাই,' বিধবাকে কখনই অত্যাচার করি নাই……কন্যাগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করি নাই।' উল্লিখিত প্রস্তর ফলক হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সমাজে নারীমর্য্যাদা গৌরবের বিষয় ছিল এবং বাস্তবিকই 'accomplished' বলিতে যাহা বুঝায় মিসর রমণীই জলন্ত দৃষ্টান্ত। মিসর সভ্যজাতির ইতিহাসে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে—

(১) Breasted' Hist Egypt পৃঃ ২৮০।

রমণীপ্রভিতা ইহার বিশেষ কারণ ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে ও সত্যের সহিত বলিতে পারা যায়।

শ্রীসুশীলকুমার দত্ত।

বীর পঞ্চ সহস্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শান্তিপ্রিয় নবাব সুজাউদ্দীন স্বর্গলাভ করিলে পর পুত্র সরফরাজ রাজসিংহাসনে সমাসীন হইলেন। ধর্ম্মকর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান লইয়া ব্যস্ত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার সময় যাইত, রাজকার্য্য বন্ধুবর্গের আদেশ ও উপদেশ মত চলিতে লাগিল। সরফরাজ তাহাদের কুটিল চক্রভেদ করিতে পারিলেন না, হাজি আহম্মদের সহিত তাঁহার কলহ ঘটিল।*

অপমানিত হাজি স্থির করিলেন বাঙ্গালার সিংহাসন হইতে নবাব সরফরাজকে অপসৃত করিবেন। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন উপাসনাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য, আমি রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইয়া বাঁচিয়াছি! তবে যখনই প্রভুর আবশ্যক হইবে, আমি তখনই রাজসভায় উপস্থিত হইব।

হাজির কৌশল জাল ছিন্ন করিয়া সত্য উদ্ঘাটনের সাধ্য সরফরাজের ছিলনা তিনি মনে করিলেন ভালই হইল। সরফরাজের পিতা বাঙ্গালার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র আনিয়াছিলেন, হাজির পরামর্শে সরফরাজ তাহাদিগকে বিদায় দিতে লাগিলেন! অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মহীন সেনাদল হাজির গুপ্ত অনুরোধে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নবাব আলিবর্দ্দীর দলপুষ্টি করিয়া বেহারাঞ্চলে অবস্থান করিতে লাগিল। এই আলিবর্দ্দীই হাজি আহাম্মদের ভ্রাতা।

সুজাউদ্দিনের শাসনকালে আলিবর্দ্দী বেহারের নায়েব সুবেদার হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা হইতেই পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি বেহারে গমন করিয়াছিলেন। এই সকল সৈন্যের মধ্যে বাঙ্গালীও যে ছিল, তাহা সৈন্যসংখ্যা দেখিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার কিছুকাল পর তিনি দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক পঞ্চ হাজারী মনসবদার রূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। কয়েকজন রোহিলা সর্দ্দার ও আফগান সামন্ত সদলে আলিবর্দ্দীর অধীনে থাকিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ বিগ্রহে সাহায্য করিত।

আলিবর্দ্দীর সৈন্যসংখ্যা যখন সরফরাজের অবসর প্রাপ্ত সেনাকুল দ্বারা বর্দ্ধিত হইল, তখন তিনি ভ্রাতার অপমানের প্রতিশোধ লইবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। উৎকোচের শক্তি চিরদিন অপ্রতিহত। সেই মহাশক্তিবলে আলিবর্দ্দী অচিরে দিল্লীর দরবার হইতে বঙ্গ বেহার ও উড়িষ্যার সনন্দ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দুর্দ্ধর্ষ নাদিরশাহ তৎপূর্ব্বেই দিল্লীর রাজকোষ মধুশূন্য করিয়াছিলেন। সুতরাং আলিবর্দ্দীর মনোবাসনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইলনা। নবাব সরফরাজ সকল শুনিলেন, পিতার সময়ে যে পঞ্চসহস্র বঙ্গ সৈন্য বেহারে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। আলিবর্দ্দীর অর্থ ও সদয় ব্যবহার তাহাদিগকে বেহারেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

ক্রমেই হাজির কপোল-কল্পিত অত্যাচার কাহিনী আলিবর্দ্দীর নিকট যাইয়া পৌঁছিতে লাগিল; শেষে শুনিলেন ভ্রাতার পরিজনবর্গেরও সেখানে রক্ষা করা দুরূহ হইয়াছে, তখন ভোজপুরের বিদ্রোহী জমীদারকে দমন করিবার ভাণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পাটনার অদূরে আসিয়া আলিবর্দ্দীর যে সামরিক সভা বসিল তাহাতে হিন্দু তুলসীপত্র ও গঙ্গাবারি স্পর্শে এবং মুসলমান কোরাণ স্পর্শে শপথ করিল—প্রাণান্তকাল পর্য্যন্ত আলিবর্দ্দীর পতাকা বহন করিবে।*

নবাব সরফরাজ জীবনে এই একবার রাজকর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন ঘোর অসময় হইয়াছে। সেনা নাই—অস্ত্র নাই—তোপখানায়

---

* তারিখ্ ইউসুফী।

* History of Bengal Stewart.

গোলা-বারুদের পরিবর্ত্তে ইষ্টক প্রস্তর সংগৃহীত হইয়াছে! অবিলম্বে তোপখানার দারোগা কার্য্যচ্যুত হইল—ফিরিঙ্গী আণ্টনীর বাঙ্গালী পুত্র পাঁচু সরফরাজের তোপখানার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

আলিবর্দ্দীর সৈন্যদল তখন বর্ত্তমান জঙ্গীপুরের সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে। আলিবর্দ্দীর অতি বিশ্বাস-ভাজন হিন্দু সেনাপতি নন্দলাল তখন সেই সেনা কটকের অর্দ্ধেক লইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত—তাঁহার মাহীপতাকা পর্য্যন্ত তখন এই হিন্দু সেনাপতির তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত। নাম দেখিয়া মনে হয় নন্দলাল বাঙ্গালী ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলিবর্দ্দীর রোহিলা ও আফগান সামন্ত বন্ধু ছিলেন। ভোজপুর তখন বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে। সুতরাং ইহাই অনুমান হয় যে আলিবর্দ্দীর অধিকাংশ হিন্দু সৈন্য বাঙ্গালীই ছিল। নন্দলাল তাহাদিগের নেতা ছিলেন।

আলিবর্দ্দী ও সরফরাজে যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে গিরিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। সে সময়ে বাঙ্গলার সিংহাসন আলিবর্দ্দীর জন্য শূন্য হইল—নবাব সরফরাজ নিহত হইলেন; উভয় পক্ষের নিহত সেনাবৃন্দের রুধির স্রোতে জলস্রোত রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নন্দলাল বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আলিবর্দ্দীর জয়ডঙ্কা মুর্শিদাবাদে নিনাদিত হইতে লাগিল।

নবাব হইয়া আলিবর্দ্দী যাঁহাকে সমরসচিব করিলেন তিনি বাঙ্গালী। তাঁহার নাম জানকীনাথ সোম। ইঁহার পুত্র দুর্লভরাম পরবর্ত্তীকালে ইতিহাসে নানাকারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রায়-রায়াণ রাজবল্লভ এই দুর্লভরামেরই পুত্র। তখন রাজস্ববিভাগের ভার যিনি পাইয়াছিলেন তিনিও বাঙ্গালী চিন্ময় রায়।

বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করিবার কিছুদিন পরই কটকের বিদ্রোহ দমনের জন্য আলিবর্দ্দী সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। উড়িষ্যার যে যুদ্ধ কাহিনী ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বিদ্রোহ দমন করিয়া আলিবর্দ্দী মাত্র পঞ্চ সহস্র সৈন্য নিজের সঙ্গে রাখিয়া মন্দগমনে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অন্যান্য সেনাগণ বিদায়-প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বেই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিল।

নানাস্থানে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক নবাব আলিবর্দ্দী শিকারে চিত্তবিনোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। রণশ্রান্ত সেনাকুল নিশ্চিন্ত হৃদয়ে নবাবের দেহ রক্ষা করিয়া অনায়াস গতিতে আগমন করিতেছে। এমন সময় বন্যার জলস্রোতের ন্যায় বর্গী আসিয়া দেখা দিল! তাহারা গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিল, গৃহের পর গৃহ ভস্মীভূত করিল, শস্যক্ষেত্রের পর শস্যক্ষেত্র অশ্ব পদদলিত করিল!

নবাবী সৈন্য ক্ষিপ্রচরণে বর্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিল। বর্গীর তীরগামী অশ্ব নবাবের পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া নগরের এক প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করিল। বর্গীসর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত বিদ্রূপ করিয়া সংবাদ দিলেন—আমরা সুদূর মহারাষ্ট্র হইতে নবাবের রাজ্যে অতিথির বেশে আসিয়াছি। অতিথিকে তুষ্ট করিবার জন্য অধিক নহে, দশলক্ষ মুদ্রা দান করিলেই হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিব।

বর্গী ও বাঙ্গালীতে তখন ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল হতাহতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নবাবী সৈন্য কোনরূপে বেগমকে রক্ষা করিল বটে, কিন্তু শিবিরের দ্রব্যসম্ভার বর্গীর হস্তগত হইয়া গেল! নবাব এখন দশলক্ষ মুদ্রাই দিতে চাহিলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত ভাস্কর পণ্ডিত কহিলেন—না, আগে তাহাতে হইতে পারিত। এখন কোটী মুদ্রার কমে কিরূপে অতিথি সৎকার হইবে। সন্ধি হইল না। যুদ্ধের বিরাম রহিল না। ক্রমেই আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য ও শত্রুকরতলগত হইতে লাগিল। ক্ষুধা-খিন্ন, একান্ত পরিশ্রান্ত বঙ্গসৈন্য প্রতি পদে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। পটমণ্ডপ নাই শয্যা নাই আহার্য্য নাই! তাহারা মহাব্যোম আচ্ছাদন করিয়া বৃক্ষনিম্নে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে দিন কাটাইতে লাগিল। কেহ বা বৃক্ষপত্র আহার করিল!

তখন বর্ষা সমাগত। বর্ষার অবিরত বারিপাত শিরে ধরিয়া কর্দ্দমে সিক্ত হইয়া বঙ্গ সৈন্য তখন যে অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল, বাঙ্গালার ইতিহাসের অভাবে তাহা অপরিচিত রহিয়াছে।

বর্গী দুর্দ্ধর্ষ রণজয়ে গর্ব্বস্ফীত—লুণ্ঠন লব্ধ দ্রব্যসম্ভারে পরিপুষ্ট। এদিকে নবাবের কামান পর্য্যন্ত তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। আমির ওমরাহগণ তিনদিবসের চেষ্টায় তিন পোয়া মাত্র খিচুড়ীও সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না! কিন্তু এত ক্লেশেও বঙ্গসৈন্য রণে ভঙ্গ দিলনা পশ্চাতে হটিলনা পরাজয় মানিল না।

বঙ্গসৈন্যের এ কাহিনী আজ শুনিলে মনে হইবে ইহা আরব্যোপন্যাসের অলিক কাহিনী মাত্র। দশ সহস্র গ্রীক বীরের প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী ঐতিহাসিকের কৃপায় সাহিত্যে ও ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়া, আজিও সবিস্ময়ে পঠিত হইতেছে, কিন্তু এই পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

গুণগ্রাহী ইংরাজ এই ব্যাপার দেখিয়া মুগ্ধ চিত্তে লিখিয়াছেন—

If we consider the retreat of these veterans —in all its circumstances it will appear as amazing an effort of human bravery as the history of any age or people have chronicled and we think it merits as much being recorded and transmitted to posterity as that of the celebrated Athenian General and historian.*

এই বীর পঞ্চ সহস্রের মধ্যে কতসৈন্য বাঙ্গালী ছিল, কেহ কি তাহার সন্ধান করিবেন! বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীর গৌরবকাহিনীর তত্ত্ব না লয় তবে আর কে লইবে?

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* Interesting Historical Even s—Holwell.

বরষা-সুন্দরী

সলাজ-মাধুরী-চির জড়িত চরণে,
আবরিত প্রীতি-স্নেহে বক্ষখানি ভরি,
পুঞ্জীভূত ব্যথা ভরা শ্যামল ভুবনে
আজিকে এসেছে পুনঃ বরষা সুন্দরী।
বিশ্বের সকল ব্যথা, পরম হরষে
রাখিয়াছে আপনার বুকের মাঝারে;
প্রতিদানে, মধুময় সজল পরশে
সাজাল বসুধাখানি ফুলফল ভারে।
মালতী মল্লিকা বেলী চারু ফুলহারে
বরিল কুসুমকুঞ্জে আকুল উচ্ছ্বাসে,
তটিনী হিল্লোল তুলি অনুরাগ ভরে
সৈকতে বাঁধিল তার স্নিগ্ধ বাহুপাশে।
ধূলি-ধূসরিত-রুক্ষ ধরণীর' পর,
করুণ কোমল আভা আহা কি সুন্দর!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

দেশবিদেশের কথা (১)

তিব্বতের উৎসব।

তিব্বতে ননীর উৎসব এক চমৎকার ব্যাপার। তিব্বতের লোকেরা ইহার নাম দিয়াছে ফুলের উৎসব; কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে ননী মাখনেরই ছড়াছড়ি। সে সময় তাহারা মাখনের নানারকম সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি তৈরী করে। মাখন দিয়া ঘর বাড়ী বানায়, বাগান তৈরী করে, সেই বাগানের ফুল-লতা পাতা সবই মাখনের তৈরী—এমনি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

এই উৎসবের মাস তিনেক আগেই এই সব কাজের ধুমধাম লাগিয়া যায়। তিব্বত ও তাতারের নানা জায়গা থেকে দলেদলে লোকজন সহরে এই উৎসব দেখিতে আসে। যে সব জায়গায় বড় বড় লামার মঠ বা মন্দির আছে সেখানেই এই সব উৎসবের বেশীর

ধুম। উৎসবের সময় সহরের রাস্তা ঘাট একেবারে লোকে লোকারণ্য থাকে।

উৎসবের অনেক দিন আগেই লামারা এই সব কাজের সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ ঠিকঠাক করে। তাহারা প্রদর্শনীর জন্য মাখনের বড় বড় সব মূর্ত্তি তৈরী করে। তখন দিনরাত লামাদের কাজের বিশ্রাম নাই। মূর্ত্তিগঠনের জন্য মাখন গুলিকে বারবার ঠাণ্ডাজলে চুবাইয়া লইতে হয়। ভরা শীতের সময় সেই উৎসব সুরু হয়, কাজেই ঠাণ্ডাজলে হাতের আঙ্গুল ফাঁটিয়া দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। আর এই মূর্ত্তি গঠনে পরিশ্রম ও বড় কম নয়! মূর্ত্তি তৈরী হইলে রং দিয়া তাহাতে নানারকম সুন্দর চিত্রি করিতে হয়। তারপর সেগুলি নানারকম সাজ পোষাকে সাজাইয়া রাখে।

যেদিন উৎসব সুরু হয় সেদিন সহরে আর লোক ধরে না। সহরময় লোকের ঠেসাঠেসি। চারিদিকে উট আর ষাড়ের চিৎকার। যে সকল যাত্রীর সহরে স্থান হয় নাই, তাহারা বাইরে খোলা মাঠে তাবু খাটাইয়া অবস্থান করে।

তাতার দেশের প্রায় সকল রকমের জাতি নিজেদের নানারকম সাজ পোষাকে সেই উৎসবে হাজির হয়। যাত্রীরা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে, আবার উঠিয়া এক পা গিয়াই মাটীতে গড় হইয়া পড়িতেছে। সে এক চমৎকার দৃশ্য।

উৎসবের সব আয়োজন শেষ হইলে মূর্ত্তিগুলি মন্দিরের সম্মুখে একটী মঞ্চের উপর আনিয়া সাজাইয়া রাখে। সামনে সারি সারি ফুলের পাত্র। রাত্রিবেলা চারিদিকে উজ্জল মশালের আলোকে সমস্ত প্রদর্শনীতে দিনের মত ফুটফুটে আলো হয়।

মূর্ত্তিগুলি সবই মস্ত বড় বড়। বাঘ, নেকড়ে বাঘ মেষ ও অন্যান্য প্রাণীর মূর্ত্তিগুলি ঠিক জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

অনেক সময় এগুলির শরীরের লোমে হাত দিয়া বুঝিতে হয়, এগুলি জীবন্ত কি না। সকলের মাঝখানে বুদ্ধের প্রকাণ্ড বড় মূর্ত্তি—সাদা ধবধবে, মাথায় কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছ, পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঠিক যেন এক জীবন্ত দেবতা।

মূর্ত্তিগুলির সাজ পোষাক ও তারি চমৎকার যেখানে যেটুকু ঠিক মানায় সেইভাবে সাজান হইয়াছে

মঞ্চের সামনে পুতুলের নাচ হইতে থাকে। সে মূর্ত্তিগুলি ও মাখনের তৈরী। তাহাদের গায়ে লাম্বা পোষাক। পুতুলগুলি ক্রমাগত সামনে পিছনে নড়াচড়া করিতে থাকে।

এই পুতুল নাচের পর অন্য সব আমোদ প্রমোদ সুরু হয়।

অনেক লোকজন সেই মঞ্চের চারিদিকে নাচিতে সুরু করে। জলন্ত মশাল হাতে লইয়া লামার চারিদিকে পাহারা দেয়। লোকের ঠেসাঠেসিতে মূর্ত্তির হাত না ভাঙ্গিয়া যায় সেজন্য সাধ্যমত লোকদিগকে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করে।

এই উৎসব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পরদিন ভোর বেলাই উৎসবের সমস্ত আনন্দ ফুরাইয়া যায়। সেইদিন সমস্ত মূর্ত্তিগুলি আনিয়া সহরের নিকটেই কোন কুয়ায় বিসর্জ্জন দেয়।

তিন মাসের এত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল এক রজনী উৎসবেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

তারপর যাত্রীরা কেহ উটে, কেহ ষাঁড়ে চলিয়া দলে দলে লোক হেট মাথায় ধীরে ধীরে পথ চলিতে থাকে

কত দুর্গম পথ ও পাহাড় কত উৎরাই চড়াই ভাঙ্গিয়া এই উৎসব দেখিতে আসিয়াছিল, তারপর এক রাত্রি ধুমধাম ও আনন্দের স্মৃতি বহন করিয়া আজ সকলে দেশে ফিরিয়া চলিয়াছে।

যাত্রীরা যখন পুত্রকন্যা লইয়া ষাড়ের উপর চড়িয়া পাহাড়ের ধার দিয়া রওনা হয়, দেখিলে মনে হয়, যেন পার্ব্বতী বুঝি পুত্রকন্যাসহ কৈলাসে চলিয়াছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of:—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I. C.I.E., I.C.S.
„ Sir Henry Wheeler, K. C. I E.
„ Sir S. P. Sinha, Kt.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E M. A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C. .E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, M.A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C I. E.
„ Mr. F. C. French I.C.S.
„ Mr. W. A. Seaton I. C. S.
„ Mr. R. B. Hughes-Buller, C.I.E., .C.S.
„ Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
Rai Kumudini KantaBannerji Bahadur, M.A.
Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
J. C. Kydd, M. A.
W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
T. T. Williams M. A., B. Sc.
Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.

The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The „ Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhyaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
Hemendra Prosad Ghose.
Akshoy Kumar Moitra.
Jagadananda Roy.
Binoy Kumar Sircar.
Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

সূচীপত্র

THE DACCA REVIEW.

VOL VII. JULY, 1917. No.

A STUDY IN THE MANTRA SHASTRA.

(Causal Shaktis of the Pranava).

BY

Arthur Avalon.

It is natural, given the difficulties of the subject and the mystery which surrounds it that strangers to India should have failed to understand Mantra. They need not, however, have then (as some have done) jumped to the conclusion that if was "meaningless superstition." This is the familiar argument of the lower mind which says "what *I* cannot understand can have no sense at all." Mantra *is*, it is true, meaningless to those *who do not know its meaning*. But there are others who do and to them it is not "superstition." It is because some English-educated Indians are as uninstructed in the matter as that rather common *type* of Western to whose mental outlook and opinions they mould their own that it was possible to find a distinguished member of this class describing Mrntra as "meaningless jabber." Indian doctrines and practice have been so long and so greatly misunderstood and misrepresented by the foreigner that it has always seemed to me a pity that those who are of this Punyabhumi should through misapprehension malign without reason anything which is of their own. This does not mean that they must accept what is in fact without worth because it is Indian but they should at least first understand what they condemn as worthless.

When I first entered on a study of this Shastra I did so in the belief that India did not contain more fools than exist amongst other peoples but had on the contrary produced intelligences which (to say the least) were the equal of any elsewhere found. Behind the unintelligent practice which doubtless to some extent exists amongst the multitude of every faith I felt sure there must be a rational principle since

men as a whole do not continue throughout the ages to do that which is it itself meaningless and is therefore without result. I was not disappointed. The Mantra Shastra, so far from being rightly described as "meaningless superstition" or "jabber," is worthy of a close study which, when undertaken, will disclose its value to minds free from superstition, of metaphysical bent and subtly-seeing (*Sukshmadarshin*). A profound doctrine ingeniously though guardedly set forth is contained in the Tantras of the Mantra Shastra or Agamas. This is an auspicious time in which to open out the secrets of this Adhyatmik science. For here in this country there has been a turn in the tide. The class of Indian who was wont to unite with the European critic of his motherland in misunderstanding and misrepresenting her thoughts and institutions, is to her good fortune gradually disappearing. Those who are recovering from the dazzle produced on its first entrance by an alien civilization are able to judge aright both its merits and defects as also to perceive the truth of the saying of Schiller "Hold to your native land for your strength comes from it." Ans vaterland ans teure schliess dich an Da sind die starken wurzeln deiner Kraft. Again in the West there is a movement away from the materialism which regarded that alone as "real" which is gross sensible matter; and towards that standpoint whence it is seen that thought itself is a thing which is every whit as real as as any external object Each is but an aspect of the one conscious Self whence both mind and matter proceed. This Self or Chit is the Soul of the universe, and the universe is Chit which has become its own object. Every being therein is Mantra; that is Chit manifesting as "Sound" or motion which proceeds from Nada-Shakti. This Western movement is called by its adherents "New Thought". but its basal principles are as old as the Upanishads which proclaimed that all was Feeling-consciousness (Chit) and therefore what a man thought that he became. In fact thought counts for more than any material means whatever. I am not however here entering upon a general defence of so immense a subject for this cannot be compassed in an article such as this. The present note is but a short summary of the result of some enquiries recently pursued in Kashmir with a view to ascertain the notions of the Northern Shaiva school on several matters which I had been studying in connection with an intended work on the wakening of the spiraline energy or Serpent Power. I was already aware as the Kularnava Tantra (one of the foremost Tantras of the "Bengal" school) indicates, that the Shaiva Darshana and not Shankara's exposition of Vedanta is the original philosophical basis of the Shakta faith though some who call themselves Shaktas seem now-a-days to have for-

gotten if they were ever aware of that fact. In Kashmir, Kula Shastra is, I believe, another name for the Trika. But amongst several other objects in view I wished to link up the connection of certain Shaktis mentioned in the Kriya portion of the Shastras with the thirty-six Tattvas of the Shaiva school, their position in the scheme not being in all cases clear to me according to the information previously at my disposal. I have worked the matter out in more detail in the work which is now in the press, but the present article will summarise conclusions on certain points.

Being (Satta) is of two kinds, formless (Arupa), and with form (Rupa). In the first the "I" (*Aham*) and the "This" (*Idam*) or universe representing thethe Prakasha and Vimarsha aspects of experience are one. Shiva and Shakti exist in all the planes. But they are here undistinguishably one in the embrace of the Lord (Shiva) and "the Heart of the "Lord" (Shakti). Shiva is *Chit.* Shakti is *Chidrupini.* He is Para and She Parā. This is the Perfect Experience which is Ananda or "Resting in the Self" (Svarupa vishranti). Shiva then experiences the universe as Parashakti that is Paránada and Paravak. This is the love of the Self for the Self. The Supreme experience is the bliss of unalloyed Love. The Idam then exists as Parashakti. The two aspects are as it were one *Ekam tattvam iva*) to use a phrase in the Ahirbudhnya Samhita of the Pancharatra Agama. The "Supreme Sound" and "Supreme Speech" are thus the Perfect Universe which is the supreme Kailasa and Goloka; for "Go" means "sound." This is the supreme unitary experience" in which though the "I" and the "This, do not cease to exist they are both in their *Svarupa* and thus mysteriously coalesce in one unity of Being which is the "Two in one." The whole process then of creation, that is the rise of imperfect or dual experience, is the establishment through the negation of Shakti (*nishedha-vyapara rupa-shakti*) of a diremption in the one unitary consciousness whereby the Aham and the Idam which had then existed, coalesced in one, diverge in consciousness until in our own experience the "I" is separated from the "This" seen as objects outside ourselves.

The process of manifestation of Mantra is that of cosmic ideation (*Srisktihalpanā*) in which jnana Shakti first merely formulates as thought the outlines of the limited universe which is about to emerge from and for consciousness, and which is called the "thinkable" (*mantavya*) which through Nada which is *Kriyashaktirupa* moves towards the "speakable" (*Vachya*) with which again consciousness identifies itself as Bindu which is characterisec by a predominance of activity (*Kriyâprâdhânya lakhana*). Diversity (*Prithagbhâva*) is then produced by Bindu as Makara in the Maya Tattva. Shakti as Ukara creates objects (*Prameya*) as

separate existences and by the completion of the Tattvas objectivity is completely revealed as Akara. To describe however adequately this grand system of Abhāsa, as it is called, would require a full exposition of the Northern or monistic Shaiva Darshana on which the Shakta doctrine and practice of the Agamas is based. I can here only indicate shortly the Shaktis of the Mula Mantra or Pranava which are the correspondences from the Shakti aspect of the Shaiva Tattvas. The accounts of the Shaktis vary but such variance is rather due to the fact that some accounts are fuller than others than to any substantial difference in principle.

The gist of the matter may be shortly stated as follows:—In creation, the three Shaktis, Jnana, Ichchha. Kriya, manifest. These are represented by the divisions of the Mantra which fall within the general terms Shakti, Nada Bindu. "What is here is there," and these Shaktis of the Lord (Pati) appear as the Gunas of Prakriti in the Pashu. or as it has also been said Jnana and Kriya with Maya as the third appear as Sattva, Rajas, and Tamas of the Purusha-Prakriti stage which is the immediate source of the consciousness of the Pashu. The creative consciousness (Shakti) projects the universe as all-diffusive Consciousness (*Sadakhya Tattva*) which objectively considered is all diffusive "Sound." that is movement (Nada). Here the emphasis is on the Aham, which is yet coloured by the Idam as the universe faintly rises into the field of the changeless consciousness. Consciousness then identifies itself with the clearly perceived Idam and becomes Bindu. Here the emphasis is on the Idam with which consciouness becomes a point (Bindu). Then the evolving consciousness holds the "I" and the "This" in equal balance (*Samanadhikarana*) at which point Maya Shakti, which is the sense of difference (*Bhedabuddhi*), intervenes to separate the Aham (as Purusha) and Idam (as Prakriti) hitherto held as parts of the one Consciousness and the divisive power of Kala Shakti breaks up the universe so separated from the Self into that plurality of objects which is our ordinary worldly experience. The universe which in the Purusha Prakriti stage was seen as a whole though different from the Self is now also seen as separate but as a multitude of mutually exclusive beings.

There is first a five-fold division of the "five rays" of Om, namely, A U M Nada, Bindu, Shanta. The Prapanchasara Tantra says that Jagrat is Vija Svapna is Bindu, Sushupti is Nada, Turiya is Shakti and the Laya beyond is Shanta. This is the simplest form of statement setting forth one Shakti for each of the Varnas, and the Chandra Bindu. In other words from Shiva-Shakti (which includes all the Tattvas down to the appearance of the three Devatas) these latter are produced. There is next a seven-fold division.

Parasamvit or Paramashiva is not technically accounted a Tattva, for the Supreme Experience is Tattvatita. But if we include it as the transcendental aspect of the Shivatattva from which the Abhasa proceeds we get the number seven counting Purusha and Prakriti as two. The number seven is of frequent occurrence; as in the case of the seven Shivas, namely, Parashiva, Shambhu and the five Mahapretas; the seven Shaktis of the Omkara as given in the Sharada Tilaka; the seven shaktis Unmani and the rest as given in the Commentary of Kalicharana on the Shatchakranirupana chapter of Purnanada Svami's work entitled Shritattvachintamani published as the second volume of my Tantrik Texts; and the three and half coils of Kundalini of which the Kubjika Tantra speaks which when uncoiled and divided by its diameter gives seven divisions; because it would seem of the dualism of conscious ness thus effected.

The Sharada speaks of six Shaktis which with the Parameshvara who is Sachchidananda make seven namely:—Shiva, Shakti, Nada, Bindu (Karana), Bindu (Karyya), Nada (Karyya) and Bija. The other seven Shaktis above mentioned are Unmani (or Unmana) Samani (or Samana) Anji, Mahanada (or Nadanta), Nada Ardhachandra and Bindu. If in the first series we take Karyya Nada which is described as the Mithasamavaya (mutual relation) of Shivarupakaryya Bindu and Bija which is Shaktirupa as the correspondence in this scheme of the Shaiva Shudhavidya Tattva with its Samanadhikarana then this series represents all the Shaiva Tattvas up to and including Purusha-Prakriti. The same remarks apply to second series of Shaktis or causal forms (Karanarupa). The first is described by Kalicharana as the state in which all mindness (Manastva) that is ideation ceases. Here there is neither Kalá nor Kála for it is "the sweet pure mouth of Rudra" (Shivapada). The second is the cause of all causes (*Sarvakaranakaranam*). The third which is also called by him Vyapika Shakti appears in the beginning of creation. Mahonada is the Karana Nada which is Kriya Shakti and the first production of Nada. Shakti as Nada is a development of the latter which is transformed into Ardhachandra and the Bindu.

These Shaktis (as well as two others with AUM, making together twelve) are explained according to Shaiva views in an account extracted from the Netra Tantra with Kshemaraja's Commentary and from the Tantraloka. There the Shaktis are given as Unmana, Samana, Vyapika (or Vyapini) Anjani, Mahanada, Nada, Nirodhini, Ardhachandra, Bindu, Makara, Ukara, Akara, The Sanskrit passages here given are the summary in his own language made for me by the Kashmirian Pandit Harabhatta Shastri of Srinagar.

"When the supreme Shiva beyond whom there is nought, who is in the

nature of unchanged and unchangeable illumination moves forth by His will such (willing movement as) Shakti (though in fact) inseparable from Him is called Unmana. Her place is in the Shiva tattva (*Anuttara Paramashiva avichalaprakashatmd yada ichchhaya prasarati sa Shakti shivad abhinnaiva Unmana ityuchate tat-sthanam Shiva-tattvam iti*)

"When the Unmana Shakti displays Herself in the form of the universe beginning with the Shunya and ending with Dhara formulates as mere thought the thinkable, then She is called Samana as well as Shakti-tattva" (*Yada unmana -shaktih atmanan khobhayati shunyadina dharantena jagad-atmano sphurati mon-tavyam manana-matrena asutrayati: tada Samana ityuchyate, Shakti-tattvam iti cha*). "This Samana Shakti Herself is called Vyapini when She operates as the Power which withdraws into Herself all thinkables which are Her creation, She resides in the Shakti-tattva" (*Samana shaktireva svamantavye samharapradha-natvena Vyapini ityuchyate, esha shakti-tattve tishthati*). "It is again the same Samana Herself who is called Shakti when Her operation is chiefly creative in regard to Her own thinkables. She resides in the Shakti-tattva and is all so called Anjani because of Her being coloured (by association) with the think-ables" (*Samonaiva sva-mantavye srishti-pradhanatvena shaktir ityuchyate esha Shakti-tattve tishthati mantavye upa-raktatvat cha anjani ityapi uchyate*). When shobdabrahman moves forth with great strengh from Its Shiva form then the very first sound (produced thereby) which is of the nature of a vibration produced by a sounding bell is called Nadanta (*i. e.*, Mahanada). It resides in the Sadashivatattva" (*Yada shabda-brohma shivarupad ativegena prasarati tada prathamataram ghantanur anan-atma shabdo Nadantah ityuchyate, sa Sadashiva-tattve tishthati*). When Shakti fills up the whole universe with Nádánta then She is called Náda. And this also is the Sadashiva Tattva because of the equality therein of the "I" and the "This" (*Nadantena yada vishvam apurayati tana Nadah ityuchyata, sa cha ahantedantayoh samanyadhikranyena sadashiva-tattvam iti*). Samanadhi-karana in its technical sense is the func-tion of the later developed Shuddhavidya Tattva. Apparently its original is here represented to be the function of the earlier Sadashiva. Tattva in which the duality of the Aham and Idam first manifests.

When Nada after having ceased to operate in its universal scope, does so limitedly (or particularly) then it is Nirodhini. This Shaki rests in the Sadashiva Tattva (*Nado yadá ashesha-vyaptim nimajjya adharam vyaptim un-majjayati tadá Nirodhini ityuchyate, sa sadashiva tattvam alumbate*). "When Nada is slightly operative towards the creation of the "speakable" it is called Ardhachandra which is in Ishvara Tattva. (*Nado yadá ishat vachyon-*

mesham shrayati tada Ardhachandra ityuchate ishvara-tattve). Then "Para-Shakti Herself is called Bindu when She is in the nature of insepcrate illumination in regard to the whole range of the speakable" (*Paraiva shaktih yada samastavachye abheda-prakasha-rupatam grihnati tada binduh ityuchyate, sa Ishvara tattve tishthati*).

Makara or Rudra Devata is defined :—"When Bindu causes diversity to manifest it is called Makára and It moves in Maya Tattva" (*Yada binduh prithag-bhavam adhasayati tada makara ityuchyate, sa cha Maya-tattve*) "When Shakti creates objects as separate existences then She is called Ukara. It resides in the Prakriti Tattva" (*Yada prameyam prithag-bhavena unmeshayati tada Ukarah ityuchyate, sa cha prakriti-tattve tishthati*) "When the creation of the Tattvas has come to an end, then because objectivity is completely revealed (Shakti as) Mantri Kala (that is the creative art or process considered as "Sound" or Mantra) is called Akara" *Tattva-sargasya nivrittiryada jayate tada prameyasya purnataya prakashanat akarah iti Mantri Kala uchyate*).

The extra five Shaktis enumerated in this account are due firstly to the inclusion of A U M ; secondly to counting Vyapini and Anjani separately instead of as being the Nimesha and Unmesha aspect of one Shakti ; and thirdly the sevenfold series would aqpear to include Nirodhini also called Nirodhika in Náda of which it is a more particularised development. Náda would appear in the fuller series to represent Samanyaspanda of the sound emanation. For just as in the region of ideation the evolution is from infinite consciousness to the general and thence to particular ideas ; so from the corresponding objective or Mantra aspect which is that of Shaktopaya Yoga, motion commences from the unextended point first as general, then as particular movement at length developing into the clearly defined particularity of speech and of the objects which speech denotes. The rhythmic vibrations of objects is the same as that of the mind which preceives them since both are aspects of the one Shakti which thus divides Itself.

Namaste ravatvena tattvabhidane.

SANSKRIT LITERATURE OF THE EPIC PERIOD AND OF SOCIAL LIFE IN THE EPIC AND VEDIC PERIODS*

I have come here this evening to speak to you briefly about the Sanskrit literature of the Epic period. It is a great pleasure to us that occidental

* Read before a member of European ladies and gectlemen in the house of Er. F. C. French Commissioner of the Dacca Division, on the 8th January, 1914.

peoples of the civilized world are taking an interest in our language and literature. I dare say you have heard something about the principal lines of speech, Indian, Iranian etc. and their various ramifications. The early Sanskrit was the sacred language of the Brahmins. It is full of complexities, subtleties and irregularities which are seldom met with in any other language. Inspite of all that the language is extremely rich in substance and sweet in melody. With a little patience and perseverance, complete mastery of it can be attained.

Before I begin I shall try to place before you the dates of the Ramayana and the Mahabharat. Mr. Vincent Smith, a great authority on Indian History, has fixed the date of the Mahabharat war at 3000 years before the Christian era. Internal evidence will prove that the date of the Ramayan war is 800 years further back i. e. 3800 B. C. Vrihatbal, the king of Kosal (Ayodhyya) who was 32nd in descent from Rama, fought at Kurukshetra against the Pandavas and was killed by Abhimanyu, son of Arjuna. According to general calculation 32 kings of *Kosal* must have reigned for at least 800 years.

I give below an outline of my work of this evening :—

1. Valmiki, the first Indian Poet.

2. Story of the Ramayana, the first Epic poem.

3. Vyas, a great Indian sage.

4. Comparison of social life in the Epic and Vedic periods.

Valmiki, the author of the Ramayan, is a divine sage. He was a son of Varuna, the god of water and his hermitage lay on the banks of Tamasa, a tributary of the Ganges. This venerable sage, it is said, was a robber in his early years. He was then known by the name of Ratnakar. Once upon a time Brahma, the creator of this universe and one of the Hindu Triad, and Narada, the divine sage, came in the guise of an ascetic to the jungle where Ratnakar used to live. Having seen them from the top of a tree Ratnakar descended and came to Brahma with a club in his hand which he had lifted to hit him on the head. Being asked by Brahma as to why he was going to commit the sin by taking the life of a Brahmin, he said that he did it to maintain his father, mother and wife. Brahma asked him to go to them and question them if they were prepared to share the sin incurred by robbery and the slaughter of Brahmins. Ratnakar went to them but was greatly disappointed on being informed that they would not share the sin incurred by him for their maintenance. He returned and told Brahma what he had heard from his parents and wife and inplored him to show the way of salvation. Brahma advised him to repeat the name of Rama for a certain period and thus to be absolved from the sin committed by him.

On another occasion he went to the banks of the river Tamasa where he saw a couple of cranes pierced by an

arrow from a hunter. He was deeply moved by the pathetic scene and a sanskrit verse suddenly came out of his lips through emotion. This is the first verse (sloka) in Sanskrit in the language of man as opposed to the Vedic Sanskrit which, to an orthodox Hindu, is the voice of God. The verse is a couplet and by pronouncing it Vulmiki cursed the hunter saying "O hunter, you shall not get prosperity in this world, as you have killed the Kranncha (crane) couple."

The Ramayan consists of 7 cantos. The original work ends with the sixth canto which describes the happy return of the hero, Ram, from his exile to his loving people of Kosal (Ayodhya). The 7th canto is rather a supplementary one describing the fate of the heroine, Seeta, and giving the poem a sad ending. We find several additions and interpolations in this canto. The main work comprises 500 chapters and 24000 couplets. The Epic was first introduced to the European public by Gorrasio, who translated it into Italian and published it at the expense of Charles Albert, king of Sardinia, in 1843-67. It was afterwards translated into all the principal languages of Europe.

In the Ramayan we find a vivid description of the domestic and religious life of Ancient India with all its tenderness and sweetness. its endurance and devotion. In Seeta, the heroine of the Epic, we find an ideal of the Hindu wife's self-abnegation, womanly faith and absolute devotion to the husband.

I now come to the story of the Ramayan. Among the Aryans who colonised Northern India about 4000 B. C, the people of Kosala or Ayodhya (Oudh) and Videha or Mithila (North Behar) were the foremost in learning and civilization. Dasaratha was the powerful king of Kosala (Ayodhya) and Janak was the king of Videha (Mithila). The royal family of Ayodhya was connected by marriage with the royal family of Mithila. King Dasaratha had four sons by three principal queens, Kausalya, Kaikeyi and Sumitra. Kausalya gave birth to Rama, the eldest son of the King and hero of the Epic who married Seeta, the first daughter of Janak and heroine of the Epic, who was miraculously born of a sacrificial altar. The young and beautifnl queen Kaikeyi was the mother of Bharat, the second son of king Dasaratha and the twins Lakshman and Satrughna were the sons of Sumitra. Lakshman married the younger sister of Seeta and Satrughna married the second daughter of the brother of Janak. Lakshman was greatly attached to Rama and Satrughna was greatly devoted to Bharat.

Viswamitra the spiritual guide of Dasaratha went to Ayodhya to bring Rama and Lakshan to his hermitage for inflicting punishment upon Taraka, a female demon, who had been doing damage to it and to the sacrifices performed by him. The old king hesitated at first to part with the princes but he at last yielded to the request of his

of his spiritual guide. The sage left Ayodhya with Rama and Lakshman and when they had come near his hermitage, the were fiercely attacked by Taraka who was defeated and killed by Rama. Having received the news of the death of their mother, Marich and Subahu come to the spot and vehemently attacked Rama. A fierce fight ensued in which Subahu was killed and Marich driven back. Marich, however, subsequently retaliated to some extent for the death of his mother by tempting away Rama and Lakshman in the form of a deer and thus helping the demon king Ravan to take away the unprotected Seeta during their exile in *Panchavati* in the forest of Dandaka about 100 miles from the modern city of Bombay.

After the death of Taraka, the venerable sage Viswamitra heard of the ordeal ordained by Janaka for the hand of his daughter, and the holy saint left for the capital of Janak with Rama and Lakshman. On their way they halted at the hermitage of Gautama where they were received and welcomed by his wife *Ahalya*, who had lost her beauty and had been transformed into an ugly shape by the curse of her husband. Ahalya took the dust of Rama's feet and she attained salvation. The salvation was due to the modification of the curse made by her husband.

They then left Gautama's hermitage and entered the capital of Janak. Many suitors came and went away disappointed but Rama won Seeta by breaking the bow of Janak.

Then comes the bridal of Seeta. Dasaratha was invited to attend the wedding which was to take place, according to the prevalent custom of the Hindus, at the house of the bride's father. The old king went to the capital of Janak with his sons, Bharat and Satrughna and his courtiers and the weddings of Rama and his brothers were solemnised with great pomp and eclat.

Then Dasarath journeyed back to his capital accompanied by his sons and daughters-in-law. On his way he met the terrible warrior-sage Parasu-Ram who had extirpated the race of the Kshatriyas (warrior caste) 21 times from the face of the earth as an act of revenge for the death of his father, sage Jamadagni. Parasu-Ram was a man of curious descent: his grandfather was a Brahmin (Rishi or sage) but his grand mother was the daughter of a Kshatriya (King). So in his veins ran the blood of a Brahmin as well as of a Kshatriya. This kind of marriage was allowed in the Epic period although it is prohibited in the present Hindu Society. Parash-Ram was vanquished although there was no regular fight between them. Rama succeeded in bending the bow of Parashu-Ram and that was the test of defeat ordained by the latter.

Dasarath entered his capital decked with banners and amidst the sound of

drums and trumpets. At this time Judhajit, brother of queen of Kaikeyi came to Ayodhya to take Bharat who was permitted by the old king to go to Kekaya, a kingdom lying between the rivers Sutlej and Bias in the Punjab and south of Balkh, and live there with his maternal grand-father for one season. Satrughna accompanied Bharat.

Now Dasarath, owing to old age, made up his mind to renounce the throne in favour of Rama, his eldest son. He called his council and summoned all the burghers, chiefs and neighbouring kings. They assembled in Ayodhya where they were received with due honours. The old king expressed his desire in full council and they all consented to recognise Rama as their monarch, who had won the hearts of his people. All preparations were made for his corontion and the city was gaily decorated. But a dark intrigue was going on in the inner chambers of the palace. Kaikeyi the stepmother of Rama, who had been gladly watching the festive scene preceding the coronation, was won over by the wicked and intriguing Manthara, her nurse and maid. At her instigation Kaikeyi wanted two boons from the old king which he had promised her before owing to his recovery through her tender care from severe wounds he had received in a battle, and with the magic of her beauty with which she had won the heart of her husband, she succeeded in gaining her ends. With great reluctance and with a distressed heart the old king granted the boons he had promised her. Thus the fate of Rama was sealed for a long time. By one boon he was to go to the forest for 14 years and by another Bharat would succeed the old king. Misfortune's darkness thickened over Rama and a deep dark shadow of grief and sadness was cast over the city. The sentence of banishment was pronounced by the old king with distracted heart. Thus Kaikeyi won the throne for her son and Rama proceeded to the forest accompanied by his devoted wife Seeta and faithful and heroic brother Lakshman amidst the wailings of the citizens of Ayodhya. The loyal people of the city followed their exiled prince to a considerable distance. On the 2nd day they crossed the Ganges with the help of the aboriginal chief Guhak. Rama had to steal away at night to escape the loyal people that followed him. On the 4th day they came to the hermitage of Bharadvaj that lay on the confluence of the Ganges and the Jumna (modern Allahabad) and on the 6th day they reached the hill of *Chitrakut* where they met the great saint Valmiki, the author of the Epic. Here in Ayodhya the plight of the old king Dasaratha was simply pitiable: grief for his banished son overpowered the old man: the unfortunate king pined away and died with the devoted and weeping Kausalya by his side. Bharat returned fromthe kingdom of his maternal grand-father and heard of

his father's death and of the banishment of his brother. He refused the throne which had been secured and reserved for him by his ill-advised and cunning mother. He went to the woods to find out his brother in the hope of getting him back to Ayodha. He went as far as Chitrakut where he met his brother and implored him to return to the capital but all his attempts failed. Rama had already made up his mind in the matter and he refused to return. Ram's wise counsel to Bharat on the duties of a ruler and his firm refusal to his brother's passionable appeal were highly impressive. Kausalya's lament was equally touching when she met her daughter-in-law, Seeta, in the dress of an anchorite in the forest. As all his persuasion failed, Bharat returned to Ayodhya with Ram's sandals which he placed on the throne as a sign of his sovereignty. Rama left for the deeper forests of Dandaka so that his friends and relations might not find him again. He visited the hermitage of Atri and thence he proceeded southwards and entered the unexplored wildernesses of Southern India. He passed the Vindhya mountains and arrived at the hermitage of Agastya to whom the Vindhya hills bent their heads, i. e. to say he was the first of the Aryan sages who founded Aryan settlements in Southern India by crossing the Vindhya hills and propagated Aryan civilization there. About 16 miles south of this hermitege and near the sources of the river Godavari, Rama built his forest dwelling in the woods of *Panchavati* (modern Nasik). This place is within a hundred miles from the modern city of Bombay. Here he lived a peaceful and pious life with his brother and wife.

The poet gives here a vivid description of the domestic happiness enjoyed by the exiles in the peaceful hermitages. But this state of things did not last long: a stirring event which followed set everything topsy-turvy and gave a new turn to the story of the Epic.

The love of a demon princess, Surpanakha, younger sister of Ravan was rejected with scorn by Ram and Lakshman: she assumed a hideous shape and threatened the exiles but was insulted in turn and her nose and ears were cut off. The demon generals Khar anb Dushan, who were placed there with 14 thousand soldiers to guard the frontier provinces of the demon king, attacked Rama and Lakshman, but were defeated and slain by the latter. Surpanakha went home and excited the wrath and spirit of vengeance of his brother, the demon king of Ceylon. The residents of the island of Ceylon have been described by the poet as monsters of various forms, able to assume any shape they liked. The aboriginal residents of Southern India have also been described by the poet as monkeys, bears etc., but from their manners and customs as described by the poet, it does not appear that they were animals.

They were probably called by the names of the animals and objects which they worshipped.

Ravan sent Maricha, son of the female demon Taraka of whom you have heard before, to tempt away Rama and Lakshman from the cottage, who, in the shape of a beautiful deer, succeeded in his attempt. The demon king Ravan appeared before the unprotected Seeta in the guise of a mendicant begging for alms and as she came out of the cottage, he took her by force, thrust her into the chariot and went away. On his way to Lanka, Ravan had to subdue the king of birds, Jatayu who fought for the rescue of Seeta, daughter-in-law of his friend Dasaratha and who was left mortally wounded. Seeta was placed in the royal garden named *Asoka* in the city of Lanka, capital of Ravan, under the protection of female guards.

Rama and Lakshman went from one forest to another in search of Seeta and at last they arrived at *Kiskindhya* (Nilgiri hills) where he formed an alliance with the aboriginal king, Sugriva, the chief of the monkeys. Sugriva sent out messengers in different directions, and one of them Hanuman, the great monkey general, entered Lanka and discovered Seeta in her imprisonment. Hanuman managed to burn down a great portion of the city of Lanka before he left the island. Ravan summoned a council of war and a heated discussion f olowed. All but Bibhishan, the younger and the 3rd brother of Ravan, advised the demon king to declare war against Rama. The monkey general Hanuman went to Sugriva's place with the tidings of Seeta to Rama. Sugriva made great preparations for the siege of Lanka. Bibhishan condemned his brother's action and advised him to restore Seeta to her lord and to make peace with Rama but his voice was drowned in the cries of those who advocated war. He was driven from Lanka, and he joined the forces of Rama to whom he gave much valuable information about the capital of his brother and its warriors. Kumbhakarna, the 2nd brother of Ravan also condemned Ravan's action but he did not leave Lanka and remained faithful to his brother: fought for him and died in battle.

The vast legion of monkeys proceeded southwards and arrived at the last extremity of the Deccan peninsula. Rama directed the southern ocean to go back and give space sufficient for a bridge. The ocean yielded and a long bridge was erected by the monkey-engineer, *Nal.* The whole army crossed over from India to Ceylon and besieged Lanka. The siege lasted for a long time. First and greatest among the warriors was Rama, next to him was his rival Ravan, the monarch of Lanka. Lakshman was once made unconscious by a javelin being thrown at hin by Ravan, but he regained consciousness thanks to a medicinal plant brought by

Hanuman under instruction of the monkey-doctor Sushen. The war ended with the fall of Lanka and death of Ravan, his brother, his sons and all the demon generals. The real Epic ends with the happy return of Rama to Ayodhya.

Rama entertained some doubts regarding the purity of Seeta's character and she proved her stainless virtue by an ordeal of Fire. She returned with her husband and Lakshman in an aerial car which had been won by Ravan from the gods and which Bibhishan made over to him. Bibhishan was placed on the throne of his brother.

The poet gives us an excellent description of Rama's journey back to Ayodhya, of the pleasant gathering of the people at his capital to greet him and of his installation.

Although Seeta was subjected to an ordeal of Fire before she had left Lanka for home, yet on her return to the capital, the dark cloud of suspicion still hung on her fame. Although Ram was quite satisfied as to the purity of the character of Seeta, yet he gave way to the opinion of his people and after a short time he banished his loving and faithful wife. At his brother's command Lakshman left her on the banks of Tamasa close to the hermitage of Valmiki. The venerable sage came to the spot after Lakshman had left her and gave her shelter in his hermitage; she gave birth to twins, Lava and Kusa. Years rolled by and the twins grew up and were bred up as hermit boys and as pupils of the great sage.

After years had passed, Rama performed a great Horse-sacrifice. Kings and princes were invited and a great feast was held. The sage Valmiki came to the sacrifice and his pupils, Lava and Kusa, chanted there the great Epic. Rama recognised his sons and he wanted once more to see Seeta whom he could not forget. At his request Valmiki brought her to the great assembly: she was asked to prove her purity so that he might take her back with the approval of his subjects. But Seeta's heart was deeply depressed and broken at the unjust suspicion of her character. She invoked her mother Earth to take her back to her lap and the Earth yawned and took her distressed child into her bosom. Seeta lives in the hearts of the Hindus as a model of womanly love, devotion and noble self-abnegation. The last portion of the Uttarakanda or the supplement deals with the reigns of the descendants of Rama and his brothers and the kingdom founded by them in western India.

VYAS-A GREAT INDIAN SAGE.

Before I say anything about this great philosopher, poet and saint, I would tell you something about his great work, the Mahabharat. The historical fact on which the Epic is based is the Civil war that arose about 3000 years before the Christian era, between the sons of Dhritarastra and Pandu, two brothers,

about the sovereignty of their paternal estate, the Kingdom of the Kurus, a place near modern Delhi. Several millions of men fought at Kurukshetra near Delhi: all the warlike races of Northern India took part in the fight. The battle lasted for eighteen days and in it all the sons of Dhritarastra fell. The war ended with the occupation of the capital by Yudhisthira and his brothers, the sons of Pandu. Yudhsithira the eldest, took the throne and ruled for some years. He conquered all the kings who reigned far and near and performed a Horse-sacrifice. The central figure in the Epic is Draupadi, wife of the five sons of Pandu, whose name we find throughout the book and whose sons were all assassinated while they were asleep in their camp on the last day of the battle. Polyandry was unknown in ancient India and this was a singular case of polyandry mentioned in the Epic. We do not find any case of such marriage in the Ramayan, Many surmises have been put forward by several thinkers of the western world, but none of them deserved acceptance. We cannot arrive at a conclusion from a single case, the data being insufficient. We take that Yudhisthira and his four brothers took one wife at the special command of their mother, *Kunti.*

The author of the Epic is Krishna Dvaipayan Vyas popularly known as Veda Vyas. He was born in an island (Dvip) and was therefore called Dvaipayan literally "island-born." He is called Veda-Vyas because he collected the Vedas and arranged them in different parts. He is also the author of the Geeta and Vedanta. He is known as a venerable sage, poet and philosopher and his name is held in high reverence by the Hindus.

SOCIAL LIFE.

I will now tell you something about the social life of the people in the Epic period.

In ancient India women were not accustomed to live a secluded life: they openly went out in the streets and were held in high esteem in Society. We see in Ancient India cultured women like Gargi, Maitreyi and others, holding discourse on high philosophy: we see in old times, princesses selecting their husbands by self-choice, a form of marriage popularly known as *Svayambar.* Hindu women, in ancient times, were considered by their husbands as their intellectual companions, as their friends and affectionate partners in religious duties and in domestic lives. They freely attended public festivities, visited friends and received guests. We see instances of polygamy in the Vedic period of the Ramayana and Mahabharat. In ancient times polygamy was in vogue among all nations and in all countries. We find one case of polyandry in the Mahabharat and I have already told you what I had to say about this kind of marriage. The caste system was formed early in the Epic

Age. Viswamitra and Jamadagni, father of Parsu-Ram whose name I mentioned before, were Vedic *Rishis* (sages): blood of Kshatriya and Brahmin ran in their veins: they bore arms and composed hymns: they were both Rishis (sages) and warriors and this was the true characteristic of Vedic Rishis.

I have finished. I am much indebted to Miss Garrett for her kindly allowing me to read this paper before you to-night.

UPENDRA CHANDRA MUKHERJI.

WINDERMERE IN WAR-TIME.

I'm thinking now, this war-time
Of the woods round Windermere;
How green and cool and deep they sleep,
And how the crags uprear
To summer skies and summer clouds
Their buttresses of gray;
And I'm wondering, wondering ever,
If I'll go again that way.

It seems like a different planet,
Like a world beyond the dead,
With no sound of shell or cannon,
And no vaguely haunting dread;
You can sit there by the hour,
And the only thing you'll hear
Are the gray reeds all together
Whisp'ring wide on Windermere.

I'm thinking still this war-time
Of the woods round Windermere;
Though I know full well my thinking
Will not bring them very near;
But I seem to see the shadows
Lying far across the lake
When the red clouds gather westward
And the owls begin to wake.

And now I see the moon rise,
And, entangled in the trees,
Far up by rocks and valleys,
Lie her argent traceries;
And all the little sprites and elves,
That sleep by day and hide,
Go sailing on their fallen leaves
Adown the golden tide.

How freshly in the evening
Smell the woods round Windermere!
How many a caged whisper
Wanders fluttering to the ear!
And in the mists the phantoms
Seems to rise and melt away
Of mighty men in Flanders
That do dream of it alway.

ARTHUR W. HOWLETT.

A FIFTEENTH CENTURY MOSQUE IN THE SUNDERBANS.

BY

KHAN SAHIB SYED ABDUL LATIF, B.L.

Whoever has visited the southernmost regions of the Deltaic plains of the Ganges, forming approaches to the Bay of Bengal, cannot but have been impressed by the monotony of the scenery consisting mostly of an ever-increasing stretch of green on either side streaked with jungle of *goma* and *sundar*, *keora* and *mandar*, and an ever-widening expanse of salt water, the smooth downward flow of which in winter is broken only by the typical craft of the fisherman bobbing up and down with the wave. Here and there where reclamation has commenced a few huts with roofs made of palm leaves leap into view to remove the dullness of the sight. Seated on the terrace of one of those Dacca green boats, —the "gondolas" of the Eastern districts,—and enjoying the close of a bright wintry day, one is likely suddenly to have a view of the melancholy prominence of a decaying masonry structure in the midst of a straggling village portions of which are yet overgrown with jungle. Any such structure in a quarter where it could least be expected is likely to send a thrill of joy through the heart of an antiquary, taking more delight in such "crusts and cheese-parings of antiquity" than in the best conditioned modern palaces. It was my experience once under conditions similar to those described above to have a view of the roof of a very old mosque in a little village called "Majidbaria," not very far from the haunt of the man-eaters of the Sunderbans, as the setting sun sent a stream of effulgence upon the thick foliage half-covering that ancient structure. At places like this village tradition which is but history in its undeveloped stage, asserts a magical power, and like the evening sun beaming on the mouldering remains of this relic, sends back her retrospectsve rays to light up its glorious past. I visited the building out of simple curiosity and what I saw and heard is reproduced below:—

Local tradition gives it the age of 1100 years, and its existence in the jungle is said to have been discovered by two upcountry devotees, Ekin Baba and Kala Baba, who had probably been sent to these parts to make known the tenets of Islam. In its present form the main roof of the mosque looks like that of a *dochala* cottage from outside. It is probable that owing to the ravages of time what was originally a dome has degenerated into this shape. The walls of the mosque have sunk several feet, so that the floor inside has a much lower level than that of the ground outside; or there might have been a deposit of mud year after year, so that in course of time the grouud has swelled several feet high. Whatever

might have been the process causing such marked depression in the floor, there is no doubt that the village is a very old one. The modern name of the place is "Majidbaria," having been so named after the mosque. There is no doubt, therefore, that the modern village is an aftergrowth of a much later date. There must have been a a village in existence before the birth of the mosque, which for some cause or other relapsed into jungle till reclaimed again after the discovery of Ekin Baba and Kala Baba. This fact is corroborated by the accounts of the oft-repeated phenomena connected with countries close to the Bay. The once flourishing village existing on the site of Majidbaria must have been swept away by a flood or cyclone, while the mosque, testifying to the perfection of ancient Indian architecture is the only building left behind inspite of the rigour of what might have been. A big plum tree has grown on the roof of the mosque. Although the cupola has been eaten away and destroyed outside, its shape inside is almost intact. The main building is 13½ cubits square, the verandah on the east being 13½ cubits by 5 cubits. The height of the mosque from the floor to the base of the cupola inside is 12 cubits. There are 14 door-ways, 3 to the north, 3 to the south, 3 to the east, 1 leading to the verandah from the north and another from the south besides three attached to the verandah. The roof does not show well owing to its being shrouded in foliage and trees, which the guardians of the mosque have not at all cared to clip or cut down, although they have from the days of yore shamelessly enjoyed the usufruct of the soil attached to it. There is a good-sized sweet water tank 30 yards off from the mosque, which for want of care is gradually being merged in an accession of unwholesome weeds.

There are 5 *kanis* (equivalent to 24 standard bighas or approximately 8 acres) of land attached to the mosque enjoyed rentfree by 3 persons-Meser Ali Fakir, Kadam Ali Fakir and Ahmed Ali Fakir-claiming to be the descendants of persons to whom the guardianship of the mosque had been delegated by the upcountry devotees referred to above. At least 4 *kanis* yield splendid crops of rice every year. Taking the yield per *kani* to be 35 maunds of paddy, according to the most modest estimate, the total outturn comes to 210 maunds, the price of which is at least Rs. 420/-. There is a considerable number of fruit trees, some of which, namely the cocoa-nuts and areca-nut, are very profitable. These people are expected to make Rs. 100/- at least every year by the sale of fruits. Although enjoying all privileges incidental to a rent-free tenure, they have not had the least compunction to withhold themselves from effecting such improvements in the mosque as could be made without the least expenditure of money. The cutting down of trees and jungle that

overhang the roof of the mosque, would not have cost them anything except a little of physical exertion. I chanced to arrive at the place just at dusk, when every Mussalman, however great a sinner he may be, generllay lights even a faint glimmering light in a mosque close to his house. Although these guardians live within 10 yards of the mosque, I was surprised to find that they neither lighted the building nor performed their evening prayers. After a short harangue from me as to their duties and responsibilities, they put in a light. It cannot be denied that their enjoyment of the land free of rent has its origin in their original promise to maintain the mosque in good condition. By departing from this holy compact they have undoubtedly made themselves liable to forfeit the tenure. It is the duty of the Muhammadan community to apply to the authorities for the diversion of the tenure from these useless folk to some one who would utilize the proceeds to the upkeep of the mosque. Even a proposal like this will have a beneficent effect in as much as the present guardians will be awakened from their slumber of ages.

Thanks to the kindness of the Hon'ble Mr. N. D. Beatson-Bell, C. S. I., I. C. S., the mosque has just been taken over, by the Archæological Department for preservation under the Ancient Monuments Act, and the Public Works Department is taking steps for its repair, though it is possible that owing to the destructive effects of the war raging in Europe. funds may not at once be forthcoming for the proposed work. It would not be inappropriate for the Collector of Bakarganj to compel the Fakirs to look after the mosque properly. This is at present the only building in the district of Bakarganj taken over under the Ancient Monuments Act. From a topographical point of view its importance cannot be overrated. The Survey Department puts up trigonometrical pillars here and there in the Province to serve as connecting links for the purpose of survey. This mosque will serve a very useful purpose in that way.

Villagers say that there was a stone slab fixed above the central front door of the mosque, detached and taken away many years ago inspite of their vehement protest by Mr. Reily, the Sunderbans Commissioner. It was fortunate that he did so, for it is now lying in safe custody at the Indian Museum. But for this, an important piece of evidence throwing some light on contemporary civilisation would have been lost to the world. It is due to the courtesy of Mr. Rakhaldas Banerjee, Assistant Superintendent Archælogical Survey of India, I have been supplied with a copy of the inscription on the slab. I have not had the opportunity of inspecting the inscription myself. I reproduce below what I have received from him. The inscription is in Arabic.

It is possible a few words in the inscription, as it stands on the stone slab, are not legible, having been eaten away by time. The following English translation may be useful to those who do not know Arabic:—

> "The prophet of God (on whom be peace) said: 'Whoso buildeth a mosque, God shall build for him seventy palaces'. This was built in the reign of the Sultan, the mighty Pillar of State and Religion, Abul Mozaffar Barbak Shah, son of the Sultan Mahamud Shah, by the illustrious Khan, Ajyal Khan, son of Muhammad,......Year of the Hijra 870".

It would appear from the above that the mosque was built in the year 870 A. H., corresponding to 1465 A. D., when Barbak Shah was the Independent King of Bengal. It was constructed by one Ajyal Khan, who held the title of "Khan", and was evidently a man of influence, if not an officer. The Moghul Empire had not then been established and the Pathan kings were suzerains of Bengal. Barbak Shah's reign was not very eventful. He reigned only 16 or 17 years. There is a bare reference about him in Gholam Hossein Salim's "*Reas-us-Salatin*". Professor Blochman, while deciphering a few inscriptions from Dinajpur in the pages of the Journal of the Asiatic Society gave a more elaborate account of him. This shows what valuable materials for the unravelling in the inscriptions of the history of the past are enshrined of Muhmmadan times. The light and elegant structure of the mosque in question forms a great contrast to the superb and stylish edifices of the Moghul period. This also shows that in the fourteenth and fifteenth centuries there was a flourishing Musalman population in the Sunderbans, wellgrounded in Islamic faith. The inscription of Majidbaria as also those of Dinajpur further give us an insight into the character of the reigning King as well as the people. The King was a pious man who took delight in religious pursuits The people accordingly commemorated his name by the building of pious edifices.

But for the valuable inscription one would have believed the local tradition, according to which the mosque is 1100 years old. The date of the discovery of mosque by Ekin Baba and Kala Baba cannot be determined. It must have been at a time when reclamation began in these parts, sometime in the eighteenth century, after the consolidation of the kingdom during the reign of the Emperor Akbar and his successors. Ekin Baba is still remembered by the villagers as a great saint. There is a very old banyan tree in the village of Bighai almost opposite Majidbaria across a river of that name, which is still held sacred, owing to its association with that saint, who is said to have sat for years under that tree in dovout meditation. Villagers put a light under that tree on stated occasions. There is a superstitious

belief among the villagers that the cutting of the village site by the furious Bighai has been stopped by the blessings of that saint.

SOLDIER'S ADIEU.

Mother, I know you'll grieve when I am dead,
I know you'll lowly bend your old grey head
Over the fire musing in the gloaming
When memories strangely in the room are roaming,

Memories of little things, far-past but dear,
How I did thus and thus, and here and here:
And yet, for all the suffering in your eyes,
You dare not say you'd have it otherwise.

And you'll sit there until the fire is dying,
Remembering, sorrowing, dear, and sometimes crying;
And one night I will come beside you there
Gently, poor mother, and caress your hair.

D. G. D.

THE BRITISH EMPIRE OF TO-DAY.

By W. V. ROBERTS.

The assembling of the War Council of the Empire in London this year was an epoch-marking event in British history, a great stride towards that Imperial federation which has been the dream of patriots in all time. This does not mean, of course, the full realisation of Tennyson's ideal of 'The Parliament of man, the federation of the world.' But it does mean an outward and visible sign of the closer knitting together under the Crown of nearly four hundred and forty millions of people who form more than a fourth of the whole population of the globe, and who occupy over thirteen million square miles, or more than a fifth of the entire surface of the globe.

There has been nothing like this in ancient or modern annals. The Roman

Empire, for example, is popularly believed to have embraced much of the then known world. But Gibbon computes that its population at the time of the Emperor Claudius numbered only about one hundred and twenty millions or not much more than a quarter of the British Empire to-day; and he puts its area at one million six hundred thousand square miles—not half that of the Dominion of Canada. Modern comparisons suffer equally. The population of the Chinese Empire ranks next to that of the British. In the absence of a trustworthy census it is difficult to be exact, but its peoples are variously estimated at from two hundred and seventy millions to four hundred millions crowded together in an area less than a third of that of the British Empire. In Russia the conditions are reversed, the population being estimated at one hundred and seventy-four millions, and the area in square miles at nearly nine millions. The United States of America are smaller again, the population being ninety-two millions, and the square miles about three millions. Before the war the German Empire in Europe extended to only two hundred and eight thousand seven hundred and eighty square miles, with a population of about *sixty-five millions*. Wherever one turns, therefore, the British Empire is, in size and numbers, without a compeer.

Another remarkable fact is found in the way in which the British Empire differs form all others in being distributed all over the world. Lord Palmerston knew something about that, and one cannot help recalling his famous sentence, 'I never could understand my latitudes and longitudes, or make out where the British Empire isn't.' Those words were spoken more than fifty years ago, and since then the development of the Empire has been profound. A few of the changes may be noted. Canada was created a Dominion under the British North America Act of 1867, nine provinces and two territories being now included in it. The establishment of the Commonwealth of Australia was proclaimed in 1901, its six constituent states being New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, and Tasmania. The colony of New Zealand was converted into a Dominion in 1907; and in 1910 the Cape of Good Hope, Natal, the Transvaal, and the Orange River Colony were constituted the Union of South Africa, with the happy result that all are so proud of to-day. These four are the great 'self-governing' dominions, and to them must be added Newfoundland, our oldest colony. John Cabot discovered it in 1497. Between that date and to-day may be traced all the changes in administration that have brought so much lustre to British rule—the development of the most complete form of self-government, combined with ever-growing loyalty to the Crown. Five Prime Ministers—Sir Robert L. Borden, Canada; Mr. W. M. Hughes, Australia;

General Botha, South Africa; Mr. W. F. Massey New Zealand; and Sir E. P. Morris, Newfoundland—are all members of the Privy Council, the final tribunal of appeal in the Empire; and three of them at least, Sir R. Borden, Mr Hughes, and Mr Massey, had attended meetings of the Cabinet in Downing Street before invitations to the War Council of the Empire were issued.

In India also there has been progress. It was Lord Palmerston who conceived the scheme, although other minds carried it through, whereby the rule of the Crown was substituted for that of the Company, an immense gain to the native races. Other changes led up to the India Councils Act of 1909, under which twenty-seven out of sixty members of the Legislative Council must be elected, so that the popular voice may be heard when important changes are proposed. This year India was invited to send three representatives to the War Council, so that its great place in the Empire is generously admitted.

But beyond the self-governing Dominions and India, one must not forget the West Indies and the other dependencies and possessions, administered mainly through the Colonial Office. Here we have some forty high commissioners, commissioners, governors, commanders-in-chief, and commandants, and a further form of government under the two chartered companies of British South-Africa and British North Borneo. It is in considering these dependencies and possessions that one is sometimes puzzled to know, in Lord Palmerston's phrase, 'where the British Empire isn't.' One may start from the Isle of Man and go on to the Channel Islands, Gibraltar, Malta, Cyprus. Then one may tarry a long time over Africa—the west coast possessions of Gambia, Sierra Leone, the Gold Coast, and Nigeria; the East African Protectorate, Zanzibar, Somaliland, Uganda, and Nyasaland; the states comprised in the South African Union and the huge territory (Rhodesia, etc.) under the sway of the British South Africa Company; not forgetting Mauritius and the Seychelles. One may next turn to the North American continent—Canada and Newfoundland; or to the West Indies—Jamaica, the Bahamas, the Leeward and Windward Islands, Barbados, Trinidad and Tobago, Cayman Islands, and Turks and Caicos Islands, with British Guiana and British Honduras. In the South Atlantic we do not fail to remember Ascension, the Falkland Islands (which have figured so prominently in the present war), St. Helena, the last home of Napoleon. While viewing New Zealand, and the states in the Commonwealth of Australia, we must bear in mind that there still remain Papua, Fiji, and many other Pacific islands, the Straits Settlements, the Federated Malay States, Hong Kong, Wei-hai-wei, and British North Borneo. Finally, there are all the glories of India and Ceylon,

One is almost amazed in trying to recall what the British Empire is, and where it is. Its unity in diversity is almost incomprehensible.

That point of diversity, however, is worth noting, for, whereas the Russian and Chinese dominions and the United States of America are each composed of one continuous tract of territory, the British Empire is scattered all over the globe, and stretches from the Arctic Ocean in the north almost to the Antarctic in the south. The physical conditions, therefore, differ greatly from those found in any other empire of the world. The sea divides, but it also unites, the British Empire, thanks to a great mercantile marine and a supreme navy. Bht physical conditions suggest much also in relation to climate. Mr. R. H. Scott, in his book on meteorology, remarks that, looking to the extremes of air temperature found at different places (−81° at Werchojansk, and 127° in the shade in Australia), it follows that man can stand a difference of something like 212°. That is the range between zero and the boiling-point of water. Yet it is a range which may be nearly, if not wholly, traced in air temperature within the limits of the British Empire, and it is under such conditions that rule is maintained from year to year.

But climate also has an important bearing upon race. Neither in China, Russia, Germany, nor the United States of America are differences of race so marked as in the British Empire. The population of the Empire is now placed at nearly four hundred and forty millions, or close on twenty millions more than when the census was taken six years ago. Of this huge total only about sixty-two millions are whites; of these again some forty-six millions are located in the Uuited Kingdom, and about sixteen millions are to be found in the five self-governing Dominions. In Australia, with only one hundred thousand aboriginals in a population of five millions, and in New Zealand, with fifty thousand Maoris and others in a population of one million one hundred thousand, the colour question does not arise. In Canada there are only some two hundred thousand coloured subjects in a population of eight millions. In the South African Union, however, the coloured races outnumber the whites by three to one, in India there are but three hundred thousand whites in a total of over three hundred and fifteen millions; and in the rest of the Empire the whites are estimated at only a quarter of a million among the millions of other races. Perhaps the last fact is the most tremendous of all, speaking more eloquently than words of the British genius for government. A little while ago there was some objection in South Africa to British Indian labour, but that was met, and nowhere else has any real difficulty arisen out of difference of race or colour, no matter what the climate or physical conditions. Is there any other government

of which so much can be said? Is it not indeed a wonderful tribute to British methods that a native chief in Togoland contributed one hundred and one pound ten shillings to the National Relief Fund because of 'deep thankfulness for the release of his people from German rule'?

A corollary to variety of race is variety of language. It is not easy to say precisely how many languages and dialects are spoken in the world, but the majority of them probably are known in the British Empire. It is true that the language difficulty is not great in the United Kingdom, in Australia, and in New Zealand. In Canada it is mainly a question of knowing English and French, especially in certain provinces. But in India the magnitude of the problem becomes apparent at once, for there are two hundred and twenty vernacular languages to be faced—Hindustani, Bengali, Bihari, Punjabi, Tamil, and other tongues, with all their offshoots. In Africa likewise there is a perfect babel of languages. The British and Foreign Bible Society, for example, stock the Scriptures at Johannesburg in a hundred tongues, not to serve an occasional purpose, but to meet a steady demand. So it is in the islands, settlements, and stations commonly spoken of as the 'other possessions' of Britian. In Malta there is a dialect supposed to have been derived from the Carthaginian and Arabic tongues; while away in the Straits Settlements the language of the people is Chinese or Malayan—matters which all have to be taken into account in the daily task of government.

Nor must one overlook the differences in religion or creed. Stay-at-home people are apt to think of these only in relation to the Christian faith; but a census of the Empire has placed the seven religions with the greatest number of adherents among British subjects in an order that is surprising—Hindu, two hundred and eight millions; Mohammedan, sixty-three millions; Christian (of all denominations) fifty-eight millions; Buddhist, twelve millions; Primitive Animistic (Pagan) nine millions; Sikh over two millions and Jain, one and a quarter millions. Professor Estlin Carpenter describes the Sikhs as disciples of Nanak (1469-1538) whose faith touches Hinduism on one side and Mohammedanism on the other. The Jain religon is somewhat akin to Buddhism. But the point to be noticed is that the British Empire is not only Christian; it is also a great Hindu and a great Mohammedan Empire—an Empire, in fact, composed of all nations and kindreds, and peoples and tongues.

Yet neither physical conditions, nor conditions of climate, nor differences in race, language, and religion, could prevent that outburst of loyalty on the declaration of war that has been the wonder of the world. Mr Walter Long said recently that before the war the links that bound the Empire together were links of gold. That was true; but there was something more—an indefin-

able and omnipotent sentiment which no gold could buy. Yet, as a matter of cold, hard fact, the links of gold were very real. The self-governing Dominions and the crown Colonies had before the war come to the London market and had borrowed gold to the amount of over three hundred and sixty millions sterling at from 3 to 4 per cent interest, and the security was so good that the Government decreed by statute that trust money could properly be invested therein. The large municipal and other corporations of the Empire had similarly borrowed some thirty-three millions sterling, and the Empire of India had borrowed one hundred and sixty-four millions sterling, secured on its own revenues. Such links were indeed links of gold. They stand to-day, and there is a very general hope that they will be extended in respect of trade, defence and foreign relations. But on these points opinion is often vague.

Take the question of trade. In 1913, the last full year of uninterrupted commerce before the war, only 26-2 per cent. of British Empire trade was inter-Imperial, the other 73-8 per cent. being with foreign countries. But press the matter further. Almost exactly three-fourths of British imports consisted of food, drink, tobacco, and raw materials; while more than three-fourths of British exports consisted of articles wholly or mainly manufactured. The significance is obvious. We import principally food and raw materials, and export principally manufactures. Food and raw materials are what the Dominions are best able to send us; and manufactured goods, which we produce, are what they most need in exchange. Hence the possibility of the extension of Empire trade. Wheat furnishes an apt illustration. In 1913 we imported fifty-five million hundredweights of wheat from foreign countries, and only fifty million hundred-weights from the overseas Dominions Now Australia desires to grow and send us more wheat. Mr. Hughes, the Australian Premier, when in London last year, bought up a number of steamships in order to establish an Australian line for the express purpose of sending more Australian produce to the Mother-Country. Canada desires to send more, and British India will send all that is possible. So with beef, mutton, butter, cheese, fruit, wool, hides, and other commodities. Mention of hides reminds us of South Africa. Viscount Bryce, in his *Impressions of South Africa*, argues that while not showing signs of becoming a manufacturing country, that Dominion will become a great grazing country, and should continue to export wool, goats' hair, and hides in large quantities; possibly also meat and dairy produce. Well, in 1913 South Africa sent us more hides than any other British possession; and in January of this year Sir Thomas Smartt, a member of the South African Parliament and leader of the Unionist Party there,

proposed at Capetown that the Union Government should appoint a scientific commission to survey the resources of the country. Cotton is certainly a commodity which experts think could be grown largely within the Empire.

The development of agriculture and of food of various kinds presupposes an increased demand for machinery and other manufatured goods. Germany was before the war a large buyer of British goods, and Russia may be a large buyer in years to come. But there is room for a greatly enlarged trade with the Dominions, in response to the food products that we buy. Of certain agricultural machinery to the value of one million six hundred and twenty-eight thousand two hundred and thirty-two pounds exported from this country in 1913, an amount to the value of only one hundred and seventy-eight thousand two hundred and thirty pounds went to our great Dominions. With a view to improve matters the Trade and Industry Committee of the Royal Colonial Institute has been in communication with Governments and Chambers of Commerce in the Colonies, urging that it should be obligatory on all Governments and municipal bodies to buy Empire-made goods, and to place all contracts, so far as possible, with British firms. This year it is announced that replies received from twenty-eight Governments and twenty-one Chambers of Commerce and Boards of Trade go to prove that the Empire is united in the desire to assist.

Questions of Imperial defence and of foreign relations are, of course, matters which will specially come up for consideration before the War Council of the Empire. As the Council will largely shape conditions and terms, it may be assumed that the problem of the future will be mainly one of the continuing and developing that upon which the representatives have agreed. But whichever way one turns, the Empire outlook as the result of the war is distinctly promising. Mr Froude in his *Oceana*, expressed the opinion that one free people cannot continue to govern another free people. Here, however, there is no question of governing by way of dominance. It is a question of joint action and joint administration in the promotion of the interests of the commonweal; and thus it may be that a War Council of the Empire will in due time give place to a Peace Council that will make for the good not only of the Empire, but of the whole world.

CHAMBERS'S JOURNAL.

MERRY WATERS.

O the winds are blowing blowing
  Blowing bravely from the sea
Lifting lightly merry waters
  Lifting them from off the sea

O the tide is flowing flowing
  Flowing racing on the reefs
Throwing high its windy fingers
  Fingering about the reefs

O the foam is flying flying
  Like a cloud along the coast
Kissing madly caves tnd headlands
  Madly kissing all the coast

O the gulls are calling calling
  Wildly riding swinging waves
Wheeling flashing in the sunlight
  Wheeling o'er the swinging waves

O the Sun is shining shining
  Gemming all the dancing sea
Catching all the flying jewels
  Flecked about the dancing sea.

D. G. D.

৭ম খণ্ড। } ঢাকা—ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৪। { ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পাঠান সুলতান বল্বনের সময়ের একখানি সংস্কৃত শিলালিপি।*

আশা করি আপনারা অবগত আছেন যে, দিল্লীতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি কমিশনার, এফ্, এইচ্, কুপার (Deputy Commissioner F. H. Cooper) মহোদয় যে মিউনিসিপাল মিউজিয়াম (Municipal Museum) বা "আজৈবঘর" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—এবং যেখানে বহুকাল পর্য্যন্ত বহুপ্রকারের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন পুরাতত্ত্ব নিদর্শন সংকীর্ণভাবে মিশ্রিত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল—এবং যাহাকে কেবল দিল্লী ফোর্টের (Delhi Fort) ইতিহাস-বিজড়িত প্রত্ন-নিদর্শনের সংগ্রহালয়রূপে পরিণত করিবার জন্ম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নায়ক মার্শাল (John Marshall, অধুনা Sir John Marshall) মহোদয়ের উত্থাপিত প্রস্তাবে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন (Lord Curzon) অনুমোদন প্রদান করেন—সেই মিউনিসিপাল মিউজিয়াম (Municipal Museum) অবশেষে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একটি ঐতিহাসিক সংগ্রহাগারে (Historical Museum) পরিণত হইয়াছে। এইখানে দিল্লীর, বিশেষতঃ দিল্লী ফোর্টের, ইতিহাস-সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ পুরাতন নিদর্শন রক্ষিত হইতেছে। "পাঠান ও মোগল আধিপত্যের সময়ের স্থাপত্য-বিষয়ক ও ইতিহাস-সম্পর্কিত নিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে, এই সংগ্রহালয়ে দিল্লী নগরীর, দিল্লী দুর্গের এবং দিল্লীর প্রাসাদাদির নানাপ্রকারের চিত্র ও ফটোগ্রাফও সংরক্ষিত আছে। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উত্তর অঞ্চলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ (Superintendent) ডাক্তার ভোগেল (Dr. Vogel) এই মিউজিয়ামের (Museum) প্রাচীন নিদর্শনের একখানি অতি মূল্যবান তালিকা (Catalogue) প্রস্তুত করিয়া ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এই ক্যাটালগের (Catalogue) এক অংশে ডাক্তার ভোগেল (Dr. Vogel) পাঠান-যুগের [১২০০-১৫০০খৃঃ] যে ছয়খানি শিলা-ফলক-লিপির উল্লেখ করিয়াছেন,

* পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

তন্মধ্যে, দুইখানি আরবীয় ভাষায় ও অপর চারিখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই ছয়খানি লিপি-সম্বলিত শিলাখণ্ড সম্প্রতি দিল্লী মিউজিয়ামেই (Delhi Museum রক্ষিত আছে। দিল্লীর পাঠান সুলতানগণের সময়েও যে মুসলমান নরপতিগণের কীর্ত্তিকথা সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি প্রভৃতিতে লিখিত হইত তাহা আমি পূর্ব্বে ততটা প্রকৃষ্টভাবে জানিতাম না। কতকদিন হইল নিজাম হায়দরাবাদ রাজ্যের (Nizam-Hyderabad) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নাজিম (Superintendent) আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু গুলাম ইয়াজদানি এম্, এ, (Ghulam Yazdani M. A.) মহাশয় কোন কার্য্যবশতঃ দিল্লী মিউজিয়ামের (Delhi Museum) একখানি ক্যাটালগ্ (Catalogue) আমার নিকট প্রেরণ করেন। তাহা হইতে উপরি উল্লিখিত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত, পাঠান যুগের শিলালিপি চারিখানির বিষয় পাঠ করিয়া বড়ই চমৎকৃত হইয়াছি। ইহাদের প্রথমখানি পাঠান সুলতান গিয়াসুদ্দীন বল্‌বনের সময়ের, দ্বিতীয় খানি খিল্‌জী বংশের প্রথম নরপতি জালালুদ্দীন ফীরোজ সাহের সময়ের, এবং তৃতীয় ও চতুর্থখানি মহম্মদসাহ্ তোগ্‌লকের সময়ের লিপি। প্রথম লিপিখানিতে উল্লিখিত নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনার সূত্রপাত-কল্পে অদ্য এই সভায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ, লিপিপাঠ ও অনুবাদ বঙ্গভাষায় উপস্থাপিত হইতেছে।

যে শিলা-ফলকে এই প্রশস্তি-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহা ১′—৯″ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩′—১০½″ ইঞ্চি প্রশস্ত। এই লিপিযুক্ত পাষাণ-খণ্ড রোহতক (Rohatak) জেলার বোহর (Bohar) নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হয়; কিন্তু ইহা আদিতে দিল্লীনগরীর (Old Delhi) ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পালম্-নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি বাপী বা পুষ্করিণীর সহিত সম্পর্কিত ছিল। সর্ব্ব-প্রথম প্রখ্যাত-নামা মুসলমান মনীষী স্যর সইয়দ আহম্মদ (Sir Syed Ahmed) এই প্রস্তর-লিপির অনুলিপি ও ইহার হিন্দুস্থানী-অনুবাদ সহ একটি প্রবন্ধ তাঁহার এক গ্রন্থে প্রকাশিত করেন। তৎপর মিঃ টমাস (Mr. Thomas) তদীয় "Chronicles of the Pathan Kings of Delhi" নামক গ্রন্থে [১৩৬—১৩৮ পৃষ্ঠায়] স্যর সইয়দ্ আহম্মদ-কৃত পাঠের সমালোচনা করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের (Mutiny) সময় এই শিলাখণ্ড হারাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইহা পরে মিঃ জে, জি, ডেলমারিক্ (Mr. J. G. Delmerick) কর্ত্তৃক পুনঃপ্রাপ্ত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক-সোসাইটির পত্রিকায় [J. A. S. B., Vol. XLIII, Part I, PP. 104-110] প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার ইংরেজি অনুবাদ সহ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের রোহতক জেলার ডেপুটি কমিশনার মেজর এ. সি. বার্টিন (Major A. C. Bartin, Deputy Commisioner, Rohtak District) এই মূল্যবান শিলাখণ্ডখানি দিল্লী মিউজিয়ামে (Delhi Museum) উপহাররূপে পাঠাইয়া দেন।

পাষাণ-খণ্ডের পূর্ব্ব অবস্থা একেবারে নষ্ট হয় নাই—এখনও তাহা ভাল অবস্থায় সংরক্ষিত দৃষ্ট হয়; কেবল লিপির উপরিভাগের দক্ষিণ কোণটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। "স্বস্তি"-শব্দের প্রথম অক্ষরটি লুপ্ত হইয়াছে—খুব সম্ভবতঃ এই শব্দের পূর্ব্বে ক্ষোদিত প্রণব-চিহ্নটিও বিলুপ্ত হইয়াছে। লিপির প্রথম ও শেষ পংক্তিদ্বয়ের কতকগুলি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সমগ্র লিপিটি ২২ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় নানাছন্দে বিরচিত ৩০টি শ্লোক বিদ্যমান আছে। কেবল লিপি-প্রারম্ভে গণপতি ও শিবের নমস্কার ও ২১শ পংক্তিতে লিপির রচনাকাল-বিজ্ঞাপক সন-তারিখ সংস্কৃত গদ্যে লিখিত হইয়াছে। যে অক্ষরে লিপির সংস্কৃত অংশ উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা ত্রয়োদশ-শতাব্দীর নাগরী অক্ষর। কিন্তু লিপির শেষ পংক্তির ও তৎপূর্ব্ব-পংক্তির কতক অংশের লিপি-ভাগ স্থানীয় ভাষায় [সম্ভবতঃ তৎস্থানে প্রচলিত আধুনিক বাগ্‌রী-ভাষার অনুরূপ কোন ভাষায়] রচিত,—এবং সেই অংশের উৎকীর্ণ অক্ষর শারদা অক্ষর। লিপি-রচয়িতা কবির নাম যোগীশ্বর—তদীয় রচনা-রীতি মধ্যযুগের সংস্কৃত-কাব্য-রচনা-রীতির তুল্য। ভাষায় কৃত্রিমতার অভাব আছে, এরূপ বলা যায় না। কবি লিপিতে যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ প্রভৃতি

অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। কবি কাব্য-নির্ম্মাণে ব্যাকরণ-শুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তবে শিল্পীর দোষে স্থানে স্থানে ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। এই লিপিতে অবলম্বিত বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতিতে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, যথা,—(ক) রেফ-সংযোগে কতকগুলি ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে। (খ) অনুনাসিক অনুস্বরদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। (গ) অবগ্রহ-চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। (ঘ) বিসর্গস্থানে প্রয়োজন-স্থলে জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। (ঙ) শ, ষ ও স-এর পূর্ব্ববর্ত্তী বিসর্গস্থানেও শ, ষ ও স প্রযুক্ত হইয়াছে। (চ) শ্লোকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের অন্তে অবস্থিত পদান্ত মকারে অনুস্বার-চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

স্থানীয় ভাষায় ও শারদা অক্ষরে লিখিত লিপির শেষাংশটুকু-সম্বন্ধে ডাক্তার ভোগেল কয়েকটি আবশ্যকীয় কথার উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, শারদা-লিপি কেবল কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য-প্রদেশেই প্রচলিত ছিল—কিন্তু এই পালম-শিলালিপিতে ইহার ব্যবহার দেখিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইহা পঞ্জাবের দূরস্থিত সমতল-ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে কৃতবিদ্যশ্রেণী নাগরী-অক্ষরের ও জনসাধারণ শারদা-অক্ষরের ব্যবহার করিতেন। এইজন্যই বোধ হইতেছে, পালম-লিপির সংস্কৃত-অংশ নাগরী-অক্ষরে ও প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত অংশ শারদা-অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। সে যাহা হউক, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-শতাব্দীতে দিল্লী জেলায় শারদা-অক্ষরের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে, এইরূপ লেখন-প্রণালী কেবল কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য-অঞ্চলেই যে ব্যবহৃত হইত তাহা নহে—দক্ষিণের সমতল-প্রদেশেও ইহার প্রচলন ছিল। হয়ত, গুরুমুখী ও পাঞ্জাবের আধুনিক অন্যান্য অক্ষর প্রাচীন শারদা-অক্ষর হইতেই সমুদ্ভূত।

এই শেষাংশের ভাষা সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মনে করিয়াছেন যে, ইহা "রাজপুতানায় প্রচলিত হিন্দি," কিন্তু তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ দেন নাই। এই অংশের অক্ষর যে, লিপির সংস্কৃত-অংশের লিখিত অক্ষরের তুল্য নহে, অর্থাৎ, নাগরী নহে, মিত্র মহাশয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই—এবং শারদা-লিপিতে ব্যবহৃত মূর্দ্ধণ্য "ণ" চিহ্নকে তিনি প্রশস্তি-পাষাণের ছোট ছোট গর্ত্ত বা খাত মনে করিয়াছিলেন। বহুভাষাবিৎ ডাক্তার গ্রীয়ারসনের (Dr. G. Grierson) মত লইয়া ডাক্তার ভোগেল লিখিয়াছেন যে, এই অংশের ভাষার সহিত হিসার ও তৎসন্নিহিত দেশভাগে [অর্থাৎ পূর্ব্বে যে দেশভাগ "হরিয়ান" নামে অভিহিত হইত সেখানে] অধুনা ব্যবহৃত বাগ্‌রী ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই ভাষার প্রকৃষ্ট বিশেষত্ব "হয়" বা "আছে" অর্থে ব্যবহৃত "হ" শব্দের প্রয়োগ। এই অংশেও এই "হ" শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য দৃষ্ট হয়। প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত অংশে দুইটি শ্লোকও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংস্কৃত-অংশে যাহা "ঢিল্লী" নামে অভিহিত হইয়াছে, এই অংশে তাহা "ঢিলী নামে প্রযুক্ত, এবং প্রশস্তির প্রশস্ত পুরুষের যে নাম সংস্কৃতে "উদ্ধুর"-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই অংশে "উদর"-রূপে প্রযুক্ত দেখা যায়।

পালম্ব-নামক গ্রামে ঢিল্লীর "পুরপতি" উদ্ধুর-নামক ঠক্কুর-কর্ত্তৃক একটি বাপী বা পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠার কথা এই প্রশস্তির প্রধান কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই পালম্ব গ্রাম দিল্লী-সিটী হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উদ্ধুরের পিতা পূর্ব্বে উচ্চপুরী-নামক স্থানে বাস করিতেন। এই উচ্চপুরী বর্ত্তমান সময়ে পাঞ্জাবের বহাওয়ালপুর ষ্টেটের উচ্‌-নামক স্থান; ইহা শতদ্রু, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই স্থলে কয়েকটি কথা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। (১) ডাক্তার ভোগেল তদীয় প্রবন্ধে "বাপী"-শব্দকে সর্ব্বত্রই "well"-শব্দদ্বারা অনুবাদ করিয়াছেন কিন্তু উদ্ধুর যে পুষ্করিণী [কূপ নহে] খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, প্রশস্তির ২৬, ২৭ ও ২৮ শ্লোক হইতে তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। ইংরেজী "well"-শব্দদ্বারা পুষ্করিণীকে বুঝায় কিনা, তাহা আমি জানি না। কিন্তু, সংস্কৃত "বাপী" শব্দে কদাচ "well" বা কূপকে বুঝাইতে পারে না। (২) ডাক্তার ভোগেল "উচ্চাপুরী"

কে একটি গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রশস্তির ১২শ শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "উচ্চাপুরী" গ্রাম ছিলনা নগর ছিল, এবং তাহা সৌন্দর্য্যে অমরাবতীকেও উপহাস করিত। (৫) ডাক্তার ভোগেল "পুরপতি" শব্দে কি বুঝা যাইতে পারে তাহা বলিতে পারেন নাই। "পুরপতি"শব্দে পুরাধিপ বা City Governor অর্থাৎ নগরসাধক বা নগররক্ষক হইতে পারে কিনা তাহাও বিবেচ্য। হয়ত, বল্বনের রাজ্য-সময়ে "ঢিল্লী"-নগরীর রক্ষক ছিলেন ঠকুর বা জমাদার উড্ঢুর; তাহা না হইলে, উড্ঢুর পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়া কবি যোগীশ্বর দ্বারা এত প্রশস্ত প্রশস্তি রচনা করাইয়া লইবেন কেন এবং তাহাতে সুলতানের গৌরবকথা এত প্রকৃষ্টভাবে লিখাইয়া লইবেন কেন? তাই মনে হয় যে, উড্ঢুর সুলতান-নিযুক্ত "পুরপতি" ছিলেন।

লিপি-প্রারম্ভে সংস্কৃত গদ্যে গণেশ ও শিবের প্রতি নমস্কার কথিত হইয়াছে। প্রথম দুই শ্লোকে মহাদেবের আশীর্ব্বাদ প্রার্থিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কবিও প্রশস্ত উড্ঢুরের ন্যায় শৈব ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকত্রয়ে বর্ত্তমান দিল্লীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত ভূভাগের, অর্থাৎ হরিয়ান-নামক প্রদেশের, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রদেশ প্রথমতঃ তোমরগণের এবং পরে চৌহাণগণের শাসনাধীন ছিল—সম্প্রতি [লিপি-সম্পাদনকালে] ইহা শক বা মুসলমান-রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে ইতিহাসে দাস-বংশীয় বলিয়া প্রখ্যাত দিল্লীর সুলতানগণের মধ্যে প্রথম আটজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—সাহবদীন [Shahabu-d-din Ghori (A. D. 1191-1205)], খুটুবদীন [Qu.t.bu-d-din Aibak (A. D. 1205-1210)], সমুসদীন [Shamshu-d-din Altimash (A. D. 1210-1235], পেরুজসাহি [Ruknu-d-din Firoz Shah (A. D. 1235-1236)], জালালদীন [Jalalu-d-din Raziyya (A. D. 1236-1240)], মোজদীন [Muizzu-d-din Bahram (A. D. 1239-1241)], অলাবদীন [Alau-d-din Mas'ud (A. D. 1241-1246)], নসরদীন Nasiru-d-din Mahmud (A. D. 1246-1265)]। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই নাম-তালিকায় সুলতান রেজিয়া বেগমের [Sultan Raziyya Begam] নাম দেখিতে পাওয়া যায় না—বরং সেই নামের পরিবর্ত্তে জালালদীন বা জালালুদ্দীনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। লিপিতে সুলতানগণের নামগুলি সংস্কৃত-আকারে অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠ হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত কবি লিপি-সম্পাদন-কালের পাঠান সুলতান গয়াসদীনের [Ghiyasu-d-din Balban (1265-1287)] সৌরাজ্য-গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুযুগের নরপতিগণের যেমন স্তুতিবাদ প্রাচীন লিপিতে বর্ণিত পাওয়া যায়, এই শক নরপতির সম্বন্ধেও এই লিপিতে তদ্রূপ প্রশংসা-সূচক বাক্য প্রযুক্ত দেখা যায়। অষ্টম শ্লোকে এই সম্রাট গয়াসদীনকে "হম্মীর" বা আমীর উপাধিতে ভূষিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যে এই পাঠান নরপতির রাজ্য পূর্ব্বদিকে গৌড়দেশ ও পশ্চিমদিকে "গজ্জণ" বা গজ্‌নি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—এবং দক্ষিণেও যে তাঁহার আধিপত্য দ্রাবিড়-জনপদ ও সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। তাঁহার সৌরাজ্য-বিধানে সকল জনপদেই যে সুখশান্তি বিরাজ করিত এবং প্রজাবর্গও যে সর্ব্বদাই "অন্তঃসন্তোষপূর্ণ" ছিল তাহাও এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার অধীনে আরও অনেক "ক্ষিতিপতি" ছিলেন এবং তাঁহারা সম্রাট গয়াসদীনের নিকট সেবার্থ গতায়াত করিতেন। সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, এই নরপতির সৈন্যের গতি প্রাচ্যদেশে গঙ্গা-সাগর সঙ্গম-পর্য্যন্ত ও প্রতীচ্যদেশে সিন্ধু-সমুদ্র-সঙ্গম পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। অষ্টম ও নবম শ্লোকে আরও কথিত হইয়াছে যে এই সুলতানের সেনা-তুরঙ্গের নিকট শত্রুগণ সহজে অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। তাঁহার প্রতাপাগ্নির তেজ অন্যদেশের নরপতিগণ সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার অসামান্য রাজকীয় প্রভাবে অন্যান্য দেশস্থিত জনেরা কিরূপ ভীত ও বিকম্পিত থাকিত, কবি দশমশ্লোকে তাহার এক সুন্দর বর্ণনা

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তথায় উক্ত হইয়াছে যে, সুলতান দিগ্বিজয়-যাত্রায় বাহির হইলে পর, তাঁহার ভয়ে গৌড়দেশবাসী আড়ম্বরশূন্য হইত, অন্ধ্রদেশবাসী রন্ধ্র-পরায়ণ হইত, কেরলদেশবাসী কেলিলীলা পরিত্যাগ করিত, কর্ণাটদেশবাসী কন্দর আশ্রয় লইত, মহারাষ্ট্র-দেশবাসী পলায়নপর হইত, গুর্জ্জরগণ হীনবল হইয়া পড়িত এবং লাট দেশবাসী কিরাতরূপে পরিণত হইত। সম্রাটের সুশাসন লক্ষ্য করিয়া কবি একাদশ শ্লোকে একটি অতিশয়োক্তি রচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, এই রাজা রক্ষার জন্য ক্ষিতিতল শাসন করিতে আরম্ভ করিলে পর, বাসুকি ভূভার-বহন-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে আশ্রয় লইয়া অতিসুখে কাল কাটাইতেছেন—এবং স্বয়ং বিষ্ণু পৃথিবী-পালন-চিন্তা পরিহার করিয়া কান্তা লক্ষ্মীকে বক্ষে লইয়া নির্ভাবনায় সাগরশায়ী হইয়াছেন। এইস্থলে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, এই লিপি শ্রাবণমাসে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত। সেই সময়ে যে নারায়ণ সমুদ্র-শয়ন উপভোগ করেন, বোধ হয় কবি তাহা স্মরণ করিয়াই এই শ্লোকে সুপ্রসঙ্গ পাইয়া সুলতানের সৌরাজ্য-মাহাত্ম্য বর্ণনা-সময়ে অতি কৌশলে এই পুরাণ-কথার অবতারণা করিয়াছেন। শত শত মহাপুরীর অধিপতি এই সুলতানের রাজধানীর নাম ছিল "ঢিল্লী" মহাপুরী। দ্বাদশ শ্লোকে এই মহাপুরীর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শ্লোকে অভিহিত হইয়াছে যে, গিয়াসুদ্দিনের সময় ঢিল্লীপুরের অপর নাম ছিল "যোগিনীপুর" এবং এই পুরের "পুরপতি" ছিলেন উদার-চিত্ত, বহুগুণগণ-বিভূষিত, দোষ-বিরহিত উড্ঢুর নামা সুকৃতী পুরুষ। বলা বাহুল্য যে, পৃথ্বীরাজের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল-সম্রাট সাহ-জাহানের সময় পর্য্যন্ত, রাজধানী অনেক বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যথা "কুইল রায় পিথোরা," সিরি, তোগলকাবাদ, আদিলাবাদ, যহানপন্না, ফিরোজাবাদ, পুরানা কুইল, সাহজহানাবাদ ইত্যাদি। যেস্থানে পাঞ্জাবের অপর চারিটি নদী মিলিত হইয়া আসিয়া সিন্ধুনদের সহিত সঙ্গত হইয়াছে—সেস্থানে অবস্থিত উচ্চাপুরী নামক নগরীতে উড্ঢুরের পিতা হরিপাল বাস করিতেন [১৪—১৬ শ্লোক]। বর্ত্তমান সময়ে "উচ্" নামক স্থানটি কিন্তু এই নদী-নদ-সঙ্গম-স্থান হইতে অনেকটা দূরে অবস্থিত। ২৯শ শ্লোকে উড্ঢুর "ঠকুর"-শব্দ-লাঞ্ছিত বলিয়া বর্ণিত। এই অঞ্চলে ঠকুর-শব্দে রাজপুত-ভূস্বামী সূচিত হয়। হয়ত, উড্ঢুর বা তাঁহার পিতা এইরূপ ভূস্বামী ছিলেন। ১৭-১৮শ শ্লোকে উড্ঢুরের পিতৃকুলের চারিপুরুষ ও মাতৃকুলের নয় পুরুষের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, উড্ঢুরের পিতৃ-মাতৃকুলের পরিচয় "বংশাবলী"-নামে প্রথিত প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের এরূপ উল্লেখ হইতে এই বুঝা যাইতে পারে যে, সেই "বংশাবলী" প্রবন্ধ এই কবিবরেরই রচিত হইয়া থাকিবে। তৎপর ২০-২৪শ শ্লোক পর্য্যন্ত উড্ঢুরের তিন পত্নী, সাত পুত্র ও তিন কন্যার নামাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৫-২৬শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, পথশ্রান্ত পান্থজনের ক্লান্তিবিনোদনের জন্য উড্ঢুর পালম গ্রামের পূর্ব্বে ও কুসুম্ভপুরের পশ্চিমে তট-বৃক্ষ-পরিশোভিত এক অতিরমণীয় বাপী বা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। উড্ঢুর যে ইতিপূর্ব্বে অনেক অনেক বিশাল ধর্ম্মশালা ও সত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন ইঙ্গিতে এই শ্লোকগুলিতে তাহারও উল্লেখ আছে। ২৭-২৮শ শ্লোকে বাপীর রমণীয়তা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে মহাদেবের ভক্ত, মহামতি উড্ঢুর যাহাতে সপরিবার কুশলে থাকেন তাহার জন্য ২৯শ শ্লোকে স্বস্তিবাচন প্রদত্ত হইয়াছে। ৩০শ শ্লোকে প্রশস্তি-রচয়িতা কবি পণ্ডিত-যোগীশ্বরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে সংস্কৃত গদ্যে লিপি-সম্পাদনের সন-তারিখ প্রদত্ত আছে, যথা, বিক্রম-সংবৎ ১৩৩৭, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিবস, বুধবার। ডাক্তার কিলহর্ণের মতে এই তারিখ খৃষ্টাব্দের ১২৮০ সালের ২৬শে জুন, অথবা ১২৮১ সালের ১৩ই আগষ্ট। সর্ব্বশেষে স্থানীয়-ভাষায় শারদা-অক্ষরে লিপির সংস্কৃত-অংশের তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে।

এই পালম-শিলালিপি ও দিল্লী মিউজিয়ামের ক্যাটালগে উল্লিখিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত পাঠানযুগের অপর তিনখানি লিপি হইতে, সেকালের দিল্লীর অবস্থান-

সীমার অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখনকার "ঢিল্লী" নগরী "হরিয়ান"-প্রদেশে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই "হরিয়ান"-প্রদেশ বর্ত্তমান সময়ের হিসার ও তৎসন্নিহিত দেশভাগকে সূচিত করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই অঞ্চলে জর্জ্জ টমাস (George Thomas) নামক Irish Sailor স্বাধীন-ভাবে শাসন-কার্য্য চালাইতেন। তদীয় "Military Memoirs of Mr. George Thomas" নামক গ্রন্থে [৮৭ পৃষ্ঠায়] লিখিত আছে যে, "Hurrianah" বা হরিয়ান দিল্লী হইতে ৯০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন :—

"It extends 80 coss from north to south and the same distance from east to west. To the northward it is bounded by the possessions of Sahib Singh, Chief of *Puttialah*, on the north-east by the *Batties*, west by the dominions of *Beykaneer*, and south by *Jypore*, south-east by the pergunnah of *Dadaree*, east by the districts adjoining to Delhi, and north-east by the cities of *Rhotick* and *Panniput*."

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, লিপি-চতুষ্টয়ে উল্লিখিত "হরিয়ান"-প্রদেশ বর্ত্তমান দিল্লীর চতুর্দ্দিগস্থ দেশবিভাগকে সূচিত করিত—তবে ইহার সীমা তখন কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এখন যেস্থানে দিল্লী অবস্থিত তাহা ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই হরিয়ান-প্রদেশে সন্নিবিষ্ট ছিল কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ভৌগলিক নাম যে অনেক সময় পূর্ব্ব-সূচিত স্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়িয়াছে—এই প্রশস্তির "ঢিল্লী" বা "ঢিলী" নামটি তাহার একতম উদাহরণ হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপির মধ্যে "ঢিল্লী"-নগরীর নাম এইস্থানে সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত বলিয়া সম্প্রতি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মুসলমান-রাজত্ব-সময়ে ইহার নাম "দিল্লী" বা "দিহ্লী" বলিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম রূপটি নাগরীতে ও দ্বিতীয়টি পারস্য-ভাষায় লিখিত হইত। Bernier সাহেব ইহাকে "Dehli" এবং Tavenier তাহা "Dehly" বলিয়া লিখিয়াছেন। সম্প্রতি ইংরেজগণ ইহার বানান "Delhi" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং এই নগরীর "Delhi" নামটি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে পঞ্জাব-গবর্ণমেন্ট ১৯৪২নং নোটিফিকেসন (Notification) দ্বারা ঘোষণা করিয়া দেন।

প্রশস্তিতে পালম-গ্রামের নাম একবার সংস্কৃতে "পালম্ব"-নামে [১৭পং] এবং পরে স্থানীয় ভাষায় "পালম"-নামে [২১ পং] অভিহিত হইয়াছে। "Old Delhi" অর্থাৎ "the City of Rai Pitharo's Fort and the Qutb" হইতে এই গ্রাম ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। Delhi বা Shahjahanabad হইতে ইহা ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত—এবং এই স্থান Rajputana Malwa Railway এর দিল্লী হইতে দ্বিতীয় ষ্টেসন। লিপির "কুসুম্ভপুর" কোন স্থান তাহা জানা যায় নাই। তবে লিপিপাঠে এই অবগত হওয়া যায় যে, ইহা পালম-গ্রামের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই উভয় স্থানের মধ্যে কোথায় উদ্ধুর-ঠক্কুর বাপী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও বর্ত্তমান সময়ে ঠিক করা কঠিন।

প্রশস্তিতে উল্লিখিত বা সংক্ষেপে বর্ণিত দুইএকটি ঐতিহাসিক তথ্যের একটু আলোচনার পর আমরা পালম-প্রশস্তির পাঠ ও বাদানুবাদ প্রদান করিব।

যতবার হিন্দুসাম্রাজ্যের সংহতি-শক্তি শিথিল বা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল ততবারই ভারত-বর্ষে—কি উত্তরাপথে, কি দক্ষিণাপথে—স্থানীয় ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের নরপতিগণ স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই হিন্দুসাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ রাজগণের অন্তর্বিদ্রোহ—এবং এইজন্যই বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ-পথও পরিষ্কৃত হইত। ভারতীয় আর্য্য-গণের শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিজাতীয় শক প্রভৃতির বংশোৎপন্ন রাজপুত-জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় নবম-শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজপুত-জাতীয় চৌহাণ বংশের অধীনে আজমীর প্রদেশ শাসিত হইত, এবং মালবের পরমারগণ, গুজরাটের চৌরাগণ, মেওয়ারের

গিহ্লটগণ ও বুন্দলখণ্ড অঞ্চলের চন্দেলগণ সকলেই রাজপুত-জাতীয় ছিল। আলোচ্য শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুসলমান-রাজত্বের পূর্ব্বে হরিয়ান-প্রদেশে প্রথমতঃ তোমরগণ ও পরে চৌহাণ-গণ রাজ্যশাসন করিয়াছিল। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অনঙ্গ-পাল-নামক তোমরবংশীয় এক রাজপুত-প্রধান শক-বিধ্বস্ত দিল্লী-নগরীকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্ররাজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর এই বংশের প্রায় ১৯ জন নরপতির কোনপ্রকারে রাজ্য চালাইবার পর দ্বাদশ শতাব্দীতে এই তোমর-বংশেরই আর একজন অনঙ্গ-পাল-নামধারী শেষ নরপতি, আজমীরের চৌহাণবংশীয় বিশালদেব-নামক নরপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই যুদ্ধের ফলে দিল্লীনগরী চৌহাণগণের হস্তগত হয়। তোমর-নরপতি অনঙ্গপাল বিজেতা বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরকে কন্যাদানে বাধ্য হন। দিল্লীর তোমর-নরপতি অনঙ্গপাল আজমীরের চৌহাণপতি বিশালদেবের সহিত এইরূপ এক সন্ধিসর্ত্তেও আবদ্ধ হইলেন যে, বৈবাহিক মিলন হইতে তোমর-রাজের যে দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করিবেন তিনিই তোমার শাসিত দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। এই দৌহিত্রই পৃথ্বী বিশ্রুত পৃথ্বীরাজ; তিনি চৌহাণরাজের পৌত্ররূপে আজমীর এবং তোমর-রাজের দৌহিত্ররূপে দিল্লী প্রাপ্ত হইয়া যুক্তরাজ্য দিল্লী-আজমীরের অধিপতি হইলেন। চৌহাণ-পতি পৃথ্বীরাজ কিরূপে কান্যকুব্জাধিপতি রাঠোর জয়চন্দ্রের সহিত শত্রুতা করিয়া মুসলমানগণের আক্রমণের সহায়তা করিয়াছেন ইতিহাসপাঠকের তাহা অবিদিত নাই। উভয় রাজপুতের পরস্পর সংঘর্ষের ফলে, তাঁহাদের রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে, সমগ্র ভারতবর্ষই একরূপ শক বা মুসলমান বিজেতাদের হস্তগত হইয়াছিল। দ্বাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে এই উভয় রাজপুত নরপতির এক সাধারণ শত্রু উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু উভয়ের মিলিত চেষ্টায় সেই সাধারণ শত্রুর প্রতি বিপক্ষাচরণের শক্তি বা মন উভয়ের কাহারও ছিল না। এই শত্রু সাহবুদ্দীন মহাম্মদ ঘোরী, অর্থাৎ পালম-লিপির চতুর্থ শ্লোকে উল্লিখিত "সাহবদীন" নামক পাঠান সুলত্যান। এই শত্রু প্রথমতঃ একবার চৌহাণ-নরপতি পৃথ্বীরাজের সঙ্গে স্থানীশ্বর প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়া পরাভূত হন, কিন্তু সেই প্রাঙ্গণেই দ্বিতীয় যুদ্ধে চৌহাণপতি পরাজিত হইয়া বিজেতাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের ফলেই ভারতে পাঠান-সাম্রাজ্যের বা মুসলমান-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হিন্দুবিজেতা সাহাবদ্দীনের পর কোন কোন নরপতি দিল্লী হইতে সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, আমরা লিপির ৪—৫ শ্লোকে তাঁহাদের নামোল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। সাহবদ্দীনের রাজ্য সময়েই গৌড়বঙ্গের শেষ হিন্দু নরপতি লক্ষ্মণসেনের রাজ্যও সাহাবদ্দীনের সেনাপতি কুতুবদ্দীনের সহায়ক বখ্‌তিয়ারের হস্তগত হয়। লিপিতে উল্লিখিত তৃতীয় নরপতি সমসুদ্দীন [Shamasu-d-din Altimash] বাঙ্গালায় এক বিদ্রোহ নিবারণ করেন। তিনি প্রায় ২৫ বৎসরকাল সুলতানরূপে রাজত্ব করেন। এই নরপতির সময় হইতেই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে মোগলগণ সময়ে সময়ে ভারত আক্রমণের সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু লিপিতে উল্লিখিত অষ্টম সুলতান নসরদীন [Nasiru-d-din Mahmud] তদীয় প্রধান অমাত্যের সাহচর্য্যে মোগলগণের অত্যাচার হইতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসিবর্গকে কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পাঠান সুলতানগণের মধ্যে এই নসরুদ্দীন তাঁহার সততা, সদাশয়তা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও বিদ্যানুরাগের জন্য প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি রাজা হইয়াও ফকিরের মত কালাতি-পাত করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধেই আখ্যান শ্রুত হয় যে, তিনি সামান্যরূপ আহারেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন এবং গ্রন্থ-প্রতিলেখ প্রস্তুত করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তদ্দ্বারাই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি মনে করিতেন—রাজা রাজকোষের অধিকারী নহেন, কেবল তাহার সংরক্ষক মাত্র। সুলতানের হইয়া, অধিকাংশ সময়ে তাঁহার ভগিনীপতি গিয়াসুদ্দীন বল্‌বনই রাজ্য-শাসন-কার্য্য সম্পাদন করিতেন। নসরুদ্দীন অনপত্য-অবস্থায় পরলোকগমন করেন, এবং তৎপর তাঁহার রাজ্য বল্‌বানের হস্তগত হয়। বল্‌বান ১২৬৫—৬৬ খৃষ্টাব্দে

দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। পালম-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, বল্‌বানের সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই সৌরাজ্য অনুভূত হইত—সকল জনপদের প্রজাবর্গই তাঁহার সুশাসন-ফলে অন্তঃসন্তুষ্ট ছিল। লিপিতে বল্‌বান সম্বন্ধে বর্ণিত বিষয়ে অতিরিক্ত অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই—কারণ ইতিহাস পাঠেও জানা যায় যে বাস্তবিকই বল্‌বানের প্রভাব কম ছিল না—ভারতে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছায়, তিনি নানারূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। তুরস্ক-দাসগণের আধিপত্য কমাইবার জন্য তাঁহাকে অনেক হত্যাকাণ্ডেও লিপ্ত হইতে হইয়াছিল—দাস-রাজ-পদ্ধতি দূর করিয়া বংশানুক্রমে রাজত্ব-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি সৈন্য-সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে জানিতে পারা যায়। লিপিতেও তাঁহার সেনার উৎকর্ষ-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গৌড়ীয়গণ তাঁহার অভিযান-ভয়ে ভীত হইয়া নিরাড়ম্বর বা নির্গর্ব্ব হইত—লিপির এই কথা পাঠ করিয়া বল্‌বানের সময়ের একটি ঘটনার কথায় স্মরণ হয়। তিনি গৌড়ে তুগ্রল খাঁ কৃত বিদ্রোহের দমন করিয়া, তাঁহাকে নিহত করেন এবং তৎপর তাঁহার স্থলে নিজপুত্র বগ্‌রা খাঁকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই সুলতান মেউয়াটের রাজপুতগণকে পরাভূত রাখিয়াছিলেন। মোগলগণের অত্যাচারে ও আক্রমণে মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন জাতীয় নরপতিগণ নাজিত হইয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন—তাঁহাদিগের অনেকজনকে সম্রাট বল্‌বান আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। অদম্য উৎসাহের ফলেই তিনি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মোগলগণের সহিত পঞ্জাবে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হত হইলে পর, সম্রাট্ স্বয়ং পুত্রশোকে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার সময়েই প্রাচীন হিন্দুরাজধানী দিল্লী-নগরী মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র হইয়াছিল। এই নগরীকে কবি কি মনে করিয়া ১২শ শ্লোকে "পাতালপুরীব দৈত্যনিলয়া" অর্থাৎ পাতাল-পুরীর ন্যায় দৈত্যগণের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বলা কঠিন। বল্‌বানের রাজ্য সময়ে মেউয়াটের রাজপুতগণও এই নগরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া উৎপাত করিত—তাহারাই কি দৈত্য বলিয়া এইস্থানে বর্ণিত হইয়াছে? মোগলগণও যে এই নগরীতে আসিয়া অত্যাচার উৎপাত না করিত, তাহাও বলা যায় না।

পাঠ।

১। [ওঁ স্ব] স্তি ॥ গণপতয়ে নমঃ ॥ (ওঁ নমঃ শিবায় ॥

সৃজতি রক্ষতি সংহরতীহ যস্তিরয়তি প্রতিবোধয়তি প্রজাঃ।
স ভবতাং ভবতাপহরো হরো ভবতু ভাবকচিংতিত-দায়কঃ ॥ ১ ॥

[সাম্রাজ্যস্যাভি] যেক-শ্রিয়মমরধুনী যস্য মূর্দ্ধ্নি [প্রযাতা
কুর্বন্তী(?) যা] তরংগৈরবিরত নিচলচ্চা

২। ....যরম্বং প্রযাতি।
শুভ্রাংশোরংশুমালা-কলয়মতিসিত-চ্ছত্রচক্রায়মাণং
মানাতীতপ্রভাবো ভবতু স ভবতাং শংকরঃ শংকরিষ্ণুঃ ॥২॥

অভোজি তোমরৈরাদৌ চৌহাণৈস্তনংতরং(ম্)।
হরিযানকভূরেষা শকেন্দ্রৈঃ শাস্যতেধুনা ॥ ৩ ॥

আদৌ সাহবদীনস্ততঃপরং খুটুবদীন-ভূপালঃ।
৩। ......জাতোথ সমুসদীন×পেরুজসাহির্ব্বভূব ভূমি-পতিঃ ॥ ৪ ॥

পশ্চাজ্জলালদীনস্তদনংতরমজনি মোজদীন-নৃপঃ।
শ্রীমানালাবদীনো নৃপতিবরো নসরদীন পৃথ্বীংদ্রঃ ॥ ৫ ॥

১। দ্রুতবিলম্বিত।

২। স্রগ্ধরা।

৩। অনুষ্টুভ্। এই শ্লোকে চৌহাণ-বংশীয়গণের ঠিক নামই ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাঁহারা সংস্কৃত "চাহমান"-নামে অভিহিত হইয়াছেন।

৪—৫ আর্য্যা-গীতি। চতুর্থ শ্লোকে "খুটুবদীন" স্থলে খুটু-বদীন"-পাঠ দেখা যায়। এখানে আরবীয় ভাষায় "খ"স্থানে মূর্দ্ধণ্য "ষ" ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজেন্দ্রলালের মতে ইহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মূর্দ্ধণ্য "ষ"কার "খ"-কারের মত উচ্চারিত হয়। এমন কি, গুরুমুখী লিপিতেও "খ"-কার মাত্রাহীন প্রাচীন 'ষ'কার-চিহ্নদ্বারা সূচিত হয়। চতুর্থ শ্লোকের "সমুসদীন" সংজ্ঞার দ্বিতীয় দন্ত্য "স"টি পংক্তির উপরিভাগে ক্ষোদিত হইয়াছে।

আগৌড়াদাজ্জণাংতং দ্রবিড়-জনপদাৎ সেতুবংধাৎসমংতা-
দংতসস্‌ং—
৪। ······ ···তোষপূর্ব্বে সকলজনপদে প্রাজ্য-সৌরাজ্য-
রাজ্যে।
যৎসেবাযাতযাত-ক্ষিতিপতি-মুকুটোদ্ঘট্টন-ভ্রষ্টরত্ন-জ্বালা-
জালপ্রবালৈর্ব্বহতি বসুমতী বল্লবাসংতলীলাং(ম্‌) ॥ ৬ ॥
গংগাসাগর-সংগমং প্রতিদিনং প্রাচ্যং প্রতীচ্যামপি স্নাতুং
সিংধুসমু-
৫। ··· · ·· ···দ্র-সংগমমহো যৎসৈন্যমাধাবতি।
হেলাংদোলিতপাণিকংকণ-ঝণৎকারেণ বারাংগনা
যাংত্যাযাংতি চ নির্ভয়া বহুদয়াশ্চিত্রাং বরাডংবরাঃ ॥ ৭ ॥
যৎসেনাগ্রসরত্তুরংগম-খুরপ্রক্ষেপ-বিক্ষোভিতা-
শশ্বৎ্রনত্র নিবারয়ংতি পুরতো দূ-
৬। ········· ····· ·················রেণ ভুরেণবঃ।
সোয়ং সপ্তসমুদ্র-মুদ্রিত-মহীহারাবলী-নায়কঃ
শ্রীহম্মীর-গয়াসদীন-নৃপতিস্‌সম্রাট্‌ সমুজ্জৃংভতে ॥ ৮ ॥
যদ্বাটীবেগধাবত্তুরগ-খুরপুটাপাত সংচূর্ণ্য মান-
ক্ষোণী-রেণুচ্ছটাভি× কবলিতককুভি ব্যোম্নি সংচ্ছাদ্যমানে।
আদি-
৭। ·· ···ত্যস্য প্রতাপ [ঃ*] স্থ(স্থি)রতর-বিসরদ্দীপ্তি-
ভিসস্তাকমস্তং
যাতি প্রায়েণ রাজপ্রভৃতিষু গণনা কাচ রাত্রৌ দিবা বা ॥৯॥
যশ্মিন্‌ দিগ্বিজয়প্রধানকপরে গৌড়া নিরাডংবরা
অংধ্রা রংধ্রপরায়ণা ভয়বশাস্নিক্কেলয়× কেরলাঃ।
কর্ণা[টা*] অপি কংদরাশ্রয়পরা ভ্রষ্টা মহা-
৮। ·································রাষ্ট্রজা
ত্যাক্তোর্জ্জা× কিল গুর্জ্জরাঃ সমভবন্‌ লাটা× কিরাটা
ইব ॥১০॥

অস্মিন্‌ রাজনি বিভ্রতি ক্ষিতিতলং শেষোপি নিঃশেষতো
ভূভারং সম্পাস্ত বৈষ্ণবমহাশয্যাপদং সংশ্রিতঃ।
লক্ষ্মীং বক্ষসি সোপি বিষ্ণুরধুনা প্রক্ষিপ্য রক্ষাবিধৌ
চিংতা-সংততি-
৯। ·········মাপ্ত-দুগ্ধজলধির্ব্বিদ্রাব্য নিদ্রায়তে ॥১১॥
অস্তানেক-মহাপুরীশতপতে রাজ্যে মনোহারিণী
ঢিল্লী নাম মহাপুরী বিজয়তে ভল্লীব বিদ্বেষিণাং(ম্‌)।
যা পৃথ্বীব বিচিত্র রত্ন-নিলয়া যা গৌরিবানংদিনী
যা পাতালপুরীব দৈত্যনিলয়া মায়েব
১০। ········· ·························যা মোহিনী ॥১২॥
শ্রীযোগিনীপুরমিতি প্রথিতাভিধানে ঢিল্লীপুরে পুরপতি
সস্‌সুকৃতী বভুব।
শ্রীমানশেষগুণ রাশিরপেতদোষো ধীমানুদস্তেমতি রুড্ডর-
·নামধেয়ঃ ॥১৩॥
বিতস্তা-বিপাশা-শতদ্রুভিরাভির্ন্নিলিত্বামলা
১১। ·································চন্দ্রভাগা বিভাগা।
পুরস্তাদস্তৈস্তরং গৈরহংগৈ [ঃ*] স্থিতা যত্র সিংধুঃ
সুবংধুসস্‌বংধুঃ ॥১৪॥
সুধা মধু মুধা সীধু মুধা দিবি সুধারসঃ।
যেন সিংধুসুধা পীতা তস্য জ্ঞানসুধাপ্যধঃ ॥১৫॥
তৎসিংধু-দিব্যসুধয়া পরিধৌত-
১২। ············ভূমিভারস্থলে সকলতাপহরে পবিত্রে।
উচ্চৈরুদংচতি হসংত্যমরাবতী যপ্যচ্ছাপুরী সুরধুনীতট-
বাসিনীং সা ॥১৬॥
তস্যাময় পিতাভূদ্ধরিপালস্তৎপিতা যশোরাজঃ।
দুগ্ধহরস্তজ্জনকঃ কিপুরস্ত পিতেতিপি-
১৩। ················ ·····························ভুবংশঃ ॥১৭॥

৬। স্রগ্ধরা।
৭। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। সপ্তমশ্লোকে রাজেন্দ্রলাল "বধ্যকার" স্থলে "রণ্যকার" পাঠ করিয়াছিলেন।
৯। স্রগ্ধরা; এই শ্লোকের প্রথম চরণে—"যদ্বাতাবেগ"—ইত্যাদি পাঠও হইতে পারে কি না তাহা চিন্তনীয়।
১০—১২। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। দশম শ্লোকের "কর্ণাট" শব্দের টকার মূলে দৃষ্ট হয় না।

১৩। বসন্ত-তিলকা।
১৪। ভুজঙ্গ-প্রয়াত। এই শ্লোকের "উদস্তৈ"—শব্দের দ কারটি পংক্তির নীচে উৎকীর্ণ হইয়াছে।
১৫। অনুষ্টুভ্‌।
১৬। বসন্ত-তিলকা।
১৭—১৮। আর্য্যা। অষ্টাদশ শ্লোকটি তিনটি শ্লোকার্দ্ধ লইয়া রচিত। দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধের পর একটি অস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

উচ্চুর-মাতা চণ্ডী পৃথুপুত্রী পৃথুপিতা হরিশ্চন্দ্রঃ।
উৎসাহগোস্ম জনকঃ সহদেবসুতস্ম তোলসুতঃ ॥
তোলপিতা ব্যাঘ্রহরসিংহসুতো গৌরপৌত্র ইতি॥১৮॥
বংশাবলীতি প্রথিতে প্রবংধে বংশষ-
১৪। ······················সুং পূর্ব্বমতাপি সং(স)ম্যক্।
অত্রাপি তস্ম স্মৃতয়ে প্রশস্তৌ নামানি কামং প্রতিপাদি-
তানি॥১৯॥
ইচ্ছা-জ্ঞানক্রিয়া শক্তিরূপাভিস্তিস্রো যোষিতঃ।
রাজশ্রিয়া রত্নদেব্যা জাজলা জ্যেষ্ঠগেহিনী॥২০॥
তস্যাশ্চ পুত্রো
১৫। ······হরিরাজ-নামা কায়েন বাচা মনসা পবিত্রঃ।
খ্যাতশ্চতুঃষষ্টিকলানিধানং প্রত্যক্ষবিস্ফুর্জ্জ্বনৈকজিষ্ণুঃ
॥২১॥
অস্যানুজৌ চ স্থিররাজ-জৈত্রসংজ্ঞৌ সমং বীরতয়া বিভাতঃ।
যত্রাপরস্যা অপি মধ্যমায়াঃ পুত্রী
১৬। ·······················পুরাভূজনবত্নাদারা॥২২॥
গুণরাজ-ভূপতী অপি পুত্রৌ যৌ তদনুরত্নদেব্যাশ্চ।
হরদেবো নাথ ইতি খ্যাতঃ পুত্রোপি কন্যাস্যা॥২৩॥
উত্তমরাজ×পুত্রসস্যাভালী পুত্রিকেত্যপত্যে চ।
মূল-শাখা ফল-কুটুংবকং কল্পবিট-
১৭। ·······················পিপ্লেস্তেষুথং (ম্)॥২৪॥
স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা বিশালা কা কাননেনাকারি সত্রাদি-
কর্ত্রী।
কিংবাত্রাপি প্রান্তপান্থ-প্রমার্তিচ্ছেত্রী বেত্রা বাপিকা
কাপ্যকারি॥২৫॥

পাদংবগাবপূর্ব্বে চ কুমুংভপুর পশ্চিমে।
কৃতাত্র কৃতিনা বাপী তৃষ্ণা-
১৮। ·······················মোহাপহারিণী॥২৬॥
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরা পরিলুঠদ্ধারাবলীবিভ্রমা
তৃষ্ণাভ্রাম্যদনেককামু[ক০]-জনক্লেশ প্রশাংতিপ্রদা।
ফুল্লন্মৌলিতরুপ্রসূনপটলশ্রেণিঃ শ্রিয়াযোদিনা (নী?)
বাপী কাপি মহামুদং দিশাতু ব×কাংতেব কাংতা-
১৯। ·························তৃশাং (ম্)॥২৭॥
মানসমপি হসতি সতাং নিজপ্রসাদেন কলুষমতি চিতুষা
(?)[।০]
নিজবিশ্রাংত (তি)-বিধাত্রী বিস্তৈবাধ্যাত্মবেদিনাং ভাতি
॥২৮॥
অস্ত স্বস্তি সমস্তবস্তুবিষয় ভোগোপভোগ্যান্বিতি
র্ভাবৈর পুত্র-কলত্র মিত্র-জনতা যুক্তায় যুক্তা
২০। ·······································স্মনে।
ভক্তয়োডকুর-ঠকুরায় মহতে স্বর্গাপবর্গে দিয়া-
নংদয়েন্দুকলাবতংস-চরণ-মংখৈক [নিষ্ঠাত্মনে]॥২৯॥
অখংডপ্রজ্ঞাশেন যোগীশ্বরেণ প্রশস্তি×কৃতা পংডিতেন
প্রশস্তা।
সমস্তশিবামেকপাত্রস্যা বাপীনিমিত্তং সুবিস্তারবত্যাঙ চুরস্ত
॥৩০॥
২১। সংবৎসরেস্মিন্ বিক্রমাদিত্যে সংবৎ ১৩৩৭ শ্রাবণ
বদি ১৩ বুধে॥৩১॥

১৯। ইন্দ্রবজ্রা।
২০। অনুষ্টুভ্।
২১। ইন্দ্রবজ্রা।
২৩। আর্য্যা।
২৪। আর্য্যা-গীতি। রাজন্দ্রলাল-প্রদত্ত প্রতিকৃতিতে "কমুখকং' পাঠ করা যায় কিন্তু তাহাতে ছন্দঃ-সংগতি হয় না। মূললিপিতে "কুটুংবকং" পাঠ স্পষ্ট লক্ষিত হয়—তাহাকে "কুটুংবকং" রূপে প্রকৃত পাঠ বলিয়া ধরিতে হইবে।
২৫। শালিনী।

২৬। অনুষ্টুভ্।
২৭। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। এই শ্লোকে "কামুক" শব্দের দ্বিতীয় "ক"টি রাজেন্দ্রলাল-কৃত প্রতিকৃতিতে পংক্তির উপরিস্থিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু মূলে এই ক অক্ষরটি দৃষ্ট হয় না।
২৮। আর্য্যা-উপগীতি।
২৯। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।
৩০। ভুজঙ্গপ্রয়াত।
৩১। অতঃপর লিপির ভাষায় লিখিত অংশ। যাহারা সংস্কৃত জানিতনা বা বুঝিতনা তাহাদের নিমিত্তই বোধ হয় উপরি লিখিত সংস্কৃত প্রশস্তির তাৎপর্য্য স্থানীয় "যাত্রী" ভাষায় অনুরূপ কথ্য ভাষায় [সারদা অক্ষরে] লিখিত। এই ভাষায় "অই" পঞ্চমী বিভক্তি সূচক প্রত্যয়। [তিনী অহ—তিনী হইতে]

কিআশদ্দীণ গুরিতণে রজি হরিআণ হ দেশহ ॥ রী পংচ কোশ ঢিলী অহ্‌ পংখি পালংম পবেশ হ॥ জেঠ মাশি অঠ (?)-হি শে অঠ (?)
২২। হ শনিবার হ। পাঅবজ ভাই শংভতি কিঅ উ কিতণু শংশোর হ।
শিক ই কুশেশি হরিপাল ঘরি। ঠকুর উডঢ় ধংম জউ। জল হেউ [অচ] তুদি হুশংধ (?) শংধ বিউ॥ বা ই গকুশো অংম মউঃ॥ লিং……

অনুবাদ।

ওঁ স্বস্তি। গণপতিকে নমস্কার (করি)।
ওঁ শিবকে নমস্কার (করি)।

(১)

যিনি এই [সংসারে] প্রজাবর্গের সৃজন, রক্ষণ ও সংহার সাধন করেন, এবং যিনি তাহাদিগকে তিরোহিত করিয়া আবার প্রতিবুদ্ধ করেন, ভবতাপহারী সেই মহাদেব আপনাদের ভাবনা ও চিন্তার বস্তু প্রদান করুন।

(২)

যাঁহার মস্তকে দেব-নদী [গঙ্গা] উপস্থিত থাকিয়া সাম্রাজ্যাভিষেকের শোভা সম্পাদন করিয়া, তরঙ্গমালা দ্বারা অবিরত সঞ্চলমান চামর-ক্রিয়া সাধন করিতেছেন, এবং যাঁহার মস্তকে চন্দ্রমার রশ্মিমালা-বলয় অতিশুভ্র ছত্র-চক্রের স্থায় শোভমান [রহিয়াছে]—পরিমাণের অতীত প্রভাব লইয়া সেই শঙ্কর আপনাদের মঙ্গলবিধান করুন।

(৩)

এই হরিয়ান ভূমি-পূর্ব্বে তোমরগণ কর্তৃক এবং তদনন্তর চৌহাণগণ কর্তৃক শাসিত হইত, সম্প্রতি [ইহা] শক-নরপতিগণ কর্তৃক শাসিত হইতেছে।

(৪)

আদিতে সাহবদীন [সাহাবুদ্দীন] রাজা ছিলেন, তৎপর ভূপাল খুটুবদীন [কুতুবদ্দীন], তৎপর সমুসুদীন [সমসুদ্দীন], এবং [তৎপর] পেরজসাহ [ফিরোজসাহ] ভূমিপতি হইয়াছিলেন।

(৫)

তৎপশ্চাৎ জলালদীন [জলালদ্দীন], তৎপর মোজদীন [মুইজুদ্দীন] নরপতি হইয়াছিলেন। [তৎপর] শ্রীমান নৃপতিশ্রেষ্ঠ আলাবদীন [অলাউদ্দীন] এবং তৎপর পৃথ্বীন্দ্র নসরদীন [নাসীরুদ্দীন] (রাজত্ব করেন)।

(৬)

গৌড়দেশ হইতে গজ্জণ [গাজণী] পর্য্যন্ত, এমন কি দ্রবিড়-জনপদ ও সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র, প্রভূত-সৌরাজ্য সম্বলিত [অতএব] অন্তঃসন্তুষ্ট সকল জনপদে, যাঁহার সেবার জন্য গতাগত ক্ষিতিপালগণের মুকুটমালার উৎঘট্টন বশতঃ ভ্রষ্ট রত্নসকলের রশ্মিজালরূপ প্ররোহদ্বারা বসুমতী বস্তু বাসন্ত-লীলা ধারণ করে,—

(৭)

যাঁহার সৈন্য প্রতিদিন স্নানার্থ পূর্ব্বদিকে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে এবং পশ্চিমদিকে সিন্ধু-সমুদ্র-সঙ্গমে প্রধাবিত হয়; এবং যাঁহার অভ্যুদয়ে বারাঙ্গনা-গণ বিচিত্র বেশভূষার আড়ম্বর করিয়া, হেলায় আন্দোলিত পাণিকঙ্কণের ঝণৎকার করিতে করিতে নির্ভয়ে যাতায়াত করে,—

(৮)

যাঁহার সেনার অগ্রভাগে ধাবমান অশ্বগণের খুর-প্রক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত ভূরেণুসকল দূর হইতে শত্রুগণকে বিদূরিত করে, সপ্ত-সমুদ্র-মুদ্রিত পৃথিবীর হারাবলীর মধ্যমণিতুল্য নৃপতি শ্রীহম্মীর গয়াসদীন [আমীর গিয়াসুদ্দীন] সম্রাড়্‌রূপে বিরাজ করিতেছেন।

(৯)

তাঁহার অশ্বগণের বেগের সহিত পথে ধাবিত হইবার সময়ে, তাহাদের ক্ষুরপুট-সম্পাতে সংঘূর্ণ্যমান ভূরেণুচ্ছটায় সকলদিক কবলিত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, সূর্য্যের প্রতাপও স্থিরতরভাবে বিচ্ছুরিত দীপ্তিমালা সহ প্রায়ই বিলুপ্ত হয়। [কিন্তু] রাজ প্রবৃত্তির রাত্রিই হউক বা দিনই হউক, তাহাতে কি গণনার বিষয় হইতে পারে?

(১০)

তিনি দিগ্‌বিজয়প্রয়াণে বহির্গত হইলে পর, ভয়-বশতঃ গৌড়ীয়গণ আড়ম্বর-রহিত হইত, অন্ধ্রদেশীয়গণ

বঙ্গ পরায়ণ হইত, কেরলগণ কেলি-লীলা পরিত্যাগ করিত, কর্ণাটগণ কন্দরে আশ্রয় লইত, মহারাষ্ট্রীয়গণ পলায়নরত হইত, গুর্জ্জরগণ বলশূন্য হইত, এবং লাটদেশীয়গণ কিরাত তুল্য হইয়া পড়িত।

(১১)

এই নরপতি ক্ষিতিতল পালনের ভার গ্রহণ করাতে বাসুকী সম্পূর্ণরূপে ভূভার ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর মহা-শয্যা-স্থানকে [সমুদ্রকে] আশ্রয় করিয়াছেন, এবং সেই বিষ্ণু নিজেও লক্ষ্মীকে বক্ষে ধারণ করিয়া পৃথিবী রক্ষা কার্য্যের চিন্তাসমূহ বিদূরিত করিয়া দুগ্ধ সাগরে শয়ন-পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন।

(১২)

শত শত মহাপুরীর অধিপতি এই রাজার শত্রুগণের ভয়ী-রূপিনী ঢিল্লী-নাম্নী মনোহারিণী মহাপুরী [রাজ-ধানী-রূপে] বিরাজ করিতেছে। এই [নগরী] পৃথিবীর ন্যায় বিচিত্র রত্নের আধার, স্বর্গের ন্যায় আনন্দ-দায়িনী, পাতালপুরীর ন্যায় দৈত্যগণের আশ্রয় এবং মায়ার ন্যায় মোহিনী।

(১৩)

শ্রীযোগিনীপুর-নামে প্রথিত এই ঢিল্লীপুরে উড্ঢর-নামধেয় এক সুকৃত পুরুষ পুরপতি ছিলেন। তিনি শ্রীসম্পন্ন, অগণিত গুণগণ-সমন্বিত, দোষবর্জ্জিত, ধীমান ও উদারমতি ছিলেন।

(১৪)

যে স্থানে অমলজলা পরিপূর্ণা (?) চন্দ্রভাগা [Chinab] নদী পূর্ব্বদিক হইতে অত্যুচ্চ ও অভঙ্গ তরঙ্গ-মালায় প্রবাহিত হইতে হইতে আসিয়া, বিতস্তা [Jehlam] বিপাশা [Bias] ও শতদ্রুর [Sutlej] সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সেইস্থানে সুবন্ধু সিন্ধুনদও বন্ধুর [চন্দ্রভাগার] সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

(১৫)

বৃথা মধু, বৃথা সীধু (মদ), বৃথা স্বর্গের সুধারস—কারণ, যিনি একবার সিন্ধু-সুধা পান করিয়াছেন তাঁহার নিকট অমৃতও তুচ্ছ [বস্তু]।

(১৬)

সেই সিন্ধুনদের দিব্য সুধায় পরিধৌত, পবিত্র, ও সকলতাপহারী ভূমিভাগস্থলে, উচ্চাপুরী-নাম্নী সেই নগরী, দেবনদীতটবাসিনী অমরাবতী পুরীকেও হাস্য করিয়া, উচ্চে অবস্থিত আছে।

(১৭)

সেই [নগরীতে] উঁহার [উড্ঢরের] পিতা হরিপাল বাস করিতেন। তাঁহার [হরিপালের] পিতার নাম যশোরাজ। তাঁহার [যশোরাজের] জনক দুল্লহর। উঁহার [দুল্লহরের] পিতা কিপু - এই তাঁহার [উড্ঢরের] পিতৃবংশ।

(১৮)

পিথুর কন্যা চণ্ডী উড্ঢরের মাতা ছিলেন। পিথুর পিতা হরিশ্চন্দ্র। উঁহার [হরিশ্চন্দ্রের] জনক সহদেবের পুত্র উৎসাহণ। তিনি [সহদেব] আবার তোলের পুত্র। পৌরপৌত্র সিংহপুত্র, ব্যাঘ্রহর নামক [ব্যক্তি] তোলের পিতা ছিলেন।

(১৯)

"বংশাবলী" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে [গ্রন্থে] এই উভয় বংশ সম্যক্‌ভাবে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার [উড্ঢরের] এই প্রশস্তিতেও স্মৃতি-রক্ষার জন্য কেবল নামগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

(২০)

ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি রূপে রাজশ্রী রত্নদেবী ও জাজলা নামে তাঁহার [উড্ঢরের] তিনটি পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে জাজলা জ্যেষ্ঠ ভার্য্যা।

(২১)

তাঁহার [জাজলার] পুত্রের নাম হরিরাজ; তিনি কায়মনোবাক্যে পবিত্র, বিখ্যাত, চতুঃষষ্টিকলার নিধান, বিষ্ণুর অবতার রূপী এবং একাই ত্রিভুবন জয়শীল ছিলেন।

(২২)

উঁহার [হরিরাজের] স্থিররাজ ও জৈত্রনামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরড়া নাম্নী ভগিনীর সহিত শোভমান

ছিলেন। অপর মধ্যমা ভার্য্যার [রাজশ্রীর] সর্ব্বাগ্রে ধনবতী নাম্নীউদারা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

(২৩)

তৎপর গুণরাজ ও ভূপতি নামে তাঁহার দুইটী পুত্রও জন্মলাভ করেন। রত্নদেবীরও মাথ-নামে পরিচিত হরদেব-নামক একপুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

(২৪)

তাঁহার আরও দুইটি সন্তান ছিল—পুত্র উত্তমরাজ ও পুত্রিকা সাড়ালী। কল্পতরুরূপী উঁহার [উড্‌ঢরের] মূল-লতা-শাখা-ফলরূপ পরিবার এইরূপ ছিল।

(২৫)

সত্রাদিকর্ত্তা এই [উড্‌ঢর] স্থানে স্থানে বিশাল ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শ্রান্ত পান্থজনের শ্রমদুঃখ নিবারণ মানসে এই জ্ঞানী ব্যক্তি এইস্থানেও একটি রমণীয় বাপিকা [পুষ্করিণী] খনন করাইয়া দিয়াছেন।

(২৬)

পালমগ্রামের পূর্ব্বে ও কুসুম্ভপুরের পশ্চিমে, এইস্থানে সেই কৃতী ব্যক্তি তৃষ্ণা ও মোহের অপহারিণী বাপী [পুষ্করিণী] খনন করাইয়া দিয়াছেন।

(২৭)

পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরা, পরিলুণ্ঠমান হারাবলীর বিলাস শালিনী, ভোগাকাঙ্ক্ষায় পরিভ্রমমান অনেক কামুকজনের ক্লেশ-প্রশান্তি-দায়িনী, ফুল্ল-মস্তক তরুরাজির কুসুম নিকরে আবৃত-শরীরা, সৌন্দর্য্যে সন্তোষ-চিত্তা কান্তা যেমন কান্তাবলোকন কারিগণের মহানন্দ বিধান করে, সেইরূপ অতিপ্রশান্ত ও অত্যুচ্চ তটপ্রদেশে আবদ্ধা, [তরঙ্গমালা বশতঃ] পরিলুণ্ঠমান হারাবলীর বিলাস-শালিনী, [জল] তৃষ্ণায় পরিভ্রমমান অনেক পানেচ্ছুজনের ক্লেশ-প্রশান্তি দায়িনী, ফুল্লমস্তক তরুরাজির কুসুম-নিচয়ে বিহিতাবরণা শ্রীসম্পন্না এই মনোহারিণী বাপীও [পুষ্করিণীও] আপনাদের মহানন্দ বিধান করুন।

(২৮)

এই পুষ্করিণী নিজপ্রসাদ-গুণে [নির্ম্মলতায়] সজ্জনের মানসকেও [পক্ষে, মানস-সরোবরকেও] কলুষ বলিয়া উপহাস করে। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানীদের নিজশান্তি-বিধায়িনী বিদ্যার ন্যায় এই পুষ্করিণী শোভা পাইতেছে।

(২৯)

পুত্র, কলত্র, মিত্র ও অনুচরবর্গের সহিত, জিতেন্দ্রিয়, ভক্ত, মহান, স্বর্গাপবর্গের উদয়ে আনন্দিত, চন্দ্রভূষণ [শঙ্করের] চরণ-যুগলে একনিষ্ঠচিত্ত, উড্‌ঢর ঠক্কুরের মঙ্গল হউক, এবং তিনি যেন উপভোগের বিষয়ীভূত সমস্ত বস্তু সর্ব্বপ্রকারে উপভোগ করিতে পারেন।

(৩০)

অখণ্ডকীর্ত্তি পণ্ডিত যোগীশ্বর-কর্ত্তৃক সমস্ত আশীর্ব্বাদের একমাত্র পাত্র উড্‌ঢরের এই প্রশস্ত ও সুবিস্তৃত বাপীখনন সম্বন্ধীয় প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল।

১৩৩৭ বিক্রম-সংবৎ, শ্রাবণ মাস। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিবস, বুধবার। সুলতান গিয়াসুদ্দীনের রাজ্যে হরিয়ান নামক দেশ বিদ্যমান। ঢিল্লী হইতে পাঁচক্রোশ পথের মধ্যে পালম অবস্থিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে··· শনিবারে···।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

মনুষ্যে দ্বিপদের পরিণতি।

মনুষ্য ও পশুর মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ সাদৃশ্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। মনুষ্যভ্রূণে পর্য্যন্ত এই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহা হইতে পশু হইতে মনুষ্যের বিকাশ হইয়াছে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। বস্তুতঃ মনুষ্য শিশুর বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দ্বিপদে হাটিবার পূর্ব্বে তাহাকে হস্তপদ উভয়ের যোগেই হামাগুড়ি দিয়া চলিতে দেখা যায়। ইহাতে মনুষ্য কোন সময়ে যে চতুষ্পদেরই ন্যায় চলিত তাহারই আভাস আমরা প্রাপ্ত হই। উপরি উক্ত প্রমাণ সকল হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মনুষ্যের দ্বিপদপরিণতির প্রকৃত ঐতিহাসিক মূলনির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে পশুজীবনের মধ্যেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

পশুজীবনের বিকাশ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অতি আদিকালে যুগপৎ দুই জাতীয় পশুরই আবির্ভাব হয়। একজাতি উদ্ভিদ্‌ভোজী এবং অন্য মাংসাশী। মাংসাশী জাতি উদ্ভিদ্‌ ভোজীদিগের অপেক্ষা অধিক বলশালী হওয়ায় উদ্ভিদ্‌ভোজীজাতির পক্ষে মাংসাশী জাতির দ্বারা ভক্ষিত হওয়ায় বিশেষ বিপদই উপস্থিত হইল। এই বিপদে মাংসাশী পশু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য উদ্ভিদ্‌ভোজী পশুজাতি বৃক্ষে আশ্রয়গ্রহণ করিল। এই বৃক্ষাশ্রয় লাভের জন্য তাহাদিগকে বৃক্ষারোহণ কৌশল শিক্ষা করিতে হইল। বৃক্ষারোহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে যাইয়া ইহারা হস্তের অধিক পটুতা লাভ করিল। এই পটুতারফলে হস্তের দ্বারা বৃক্ষাদিশাখার ধারণ হইতে ধারণাদিকার্য্য বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইয়া আসিল। হস্তে বস্তু প্রভৃতি ধারণের ক্ষমতা হইতেই কিছু অবলম্বন করিয়া অর্দ্ধ দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভবপর হইল। অবলম্বন সহায়ে অর্দ্ধ-দণ্ডায়মান হওয়ার অভ্যাস হইতেই ক্রমে বিনা অবলম্বনে অর্দ্ধদণ্ডায়মান হওয়ার ক্ষমতা জন্মিল। লেমার নামক বানরজীবনেই প্রথম উল্লিখিত অর্দ্ধদণ্ডায়মান অবস্থা লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এস্থলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এতদ্বিষয়ক বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The evidence suggests, then, that a branch of the early mammals became the primitive tree-climbing lemers in the changing and stimulating conditions of the late Cretacems or early Eocene, * * * * Their prehensible finger and frugivorous, or omnivorous, teeth indicate their climbing habits," The evolution of mind by Mc Cabe p 236.

ঐপ্রমাণ আভাসপ্রদান করে যে প্রথম স্তন্যপায়ীদিগের শাখা শেষ চাখড়িযুগের বা তৃতীয়যুগের আরম্ভভাগের পরিবর্ত্তন বা উত্তেজক অবস্থার মধ্যে আদিম বৃক্ষারোহী লেমার নামক বানরে পরিণত হইয়াছিল। * * * * * * * * তাহাদের ধৃতকারী অঙ্গুলিসকল এবং ফলভক্ষণকারী সর্ব্বভুক্ দন্তসকল তাহাদের বৃক্ষারোহণ স্বভাবেরই পরিচয় দেয়।

অর্দ্ধদণ্ডায়মান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া লেমারের উন্নতির দিকে কিরূপ নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল নিম্নোদ্ধৃতবর্ণনা হইতে তাহা জানিতে পারা যাইবে।

"The semi-erect attitude, also was indirectly helpful. It involved a greater activity of the muscles of the face as well as of the hand and the motor centres of these are in a favourable position to reach on more important areas. The lemer was, therefore a promising organism from the progressive poin of view, and within a relatively short time it is succeeded by and largely replaced by the ape." Ibid p 238.

"অর্দ্ধদণ্ডায়মান অবস্থানও প্রকারান্তরে সহায়কারীই হইয়াছিল। মুখও হস্তের মাংসপেশীর অধিক কার্য্যকারিতা ইহার সহিত জড়িত হইল। ইহাদিগের সঞ্চালক স্নায়ুকেন্দ্র সকল অধিক গুরুতর পরিধিসকলের উপর প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য অনুকূল অবস্থায় সংস্থিত

হইল। অতএব ক্রমোন্নতির দিকদিয়া লেমারের প্রকৃতি উন্নতিশীল প্রকৃতি, অপিচ অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যেই বানর ইহার উত্তরাধিকারী বা স্থলবর্ত্তী হইয়াছে।"

ইহা হইতে বানর মুখের মানবীয়ভঙ্গী ও হস্তের মানবীয় কার্য্যকারিতা এবং দেহের মনুষ্যদেহের ন্যায় যথেচ্ছ সঞ্চালন যে অর্দ্ধদণ্ডায়মান অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

লেমারের অর্দ্ধদণ্ডায়মান অবস্থা শিম্পাঞ্জিও বনমানুষে মস্তিষ্কের অধিক পরিণতির কারণ হইয়া ইহাদিগকে মনুষ্যেরই সহিত সৌসাদৃশ্য প্রদান করিয়াছে। পরন্তু গীবন নামক বনমানুষ জাতির পক্ষে দণ্ডায়মান অবস্থাই সম্ভবপর হইয়াছে। গীবনের এই সম্ভাবিত দণ্ডায়মান অবস্থা এরূপই উন্নতির পরিচায়ক যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ পশুদিগের মধ্যে মনুষ্যের সহিত ইহারই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছেন। এস্থলে আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মত উদ্ধৃত করিতেছি।

"In brain capacity the orang and the chimpanzee come nearest to early prehisoric man; and their semi-erect attitude, which may become quite erect in the gibbon is an even more significent connection.

It is, therefore, agreed that, however late or early the print of divergence may be, the Miocene ancester of man was or resembled, an anthropised ape, most winter now look to the gibbon as our nearest relative." Ibid pp, 243-44.

"মস্তিষ্কের পরিমাণে বনমানুষও শিম্পাঞ্জি আদিম প্রাগৈতিহাসিক মনুষ্যেরই অতীব সন্নিকটবর্ত্তী। তাহাদের অর্দ্ধদণ্ডায়মান অবস্থা যাহা গীবন নামক বনমানুষ জাতিতে দণ্ডায়মান অবস্থারই পরিণত হইতে পারে আরও অধিক অর্থ ব্যঞ্জক সংযোগ-সূত্র।

অতএব ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে ভিন্নরূপতার সময় পূর্ব্বেই হউক কি পরেই হউক দ্বিতীয়যুগের মধ্যভাগে মানবীয় আদি পুরুষ মানবকল্প বানরই ছিল বা বানরেরই তুল্য ছিল। বহু লেখকই এক্ষণে গীবনকেই আমাদিগের অতীব নিকটবর্ত্তী কুটুম্বরূপে অবলোকন করেন।"

কিন্তু গীবনের দণ্ডায়মানহওয়া সম্ভবপর হইলেও সোজা দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভবপর নহে। দণ্ডায়মান হইলেও ইহার উরুও জঙ্ঘা সরলভাবে অবস্থিত থাকে। এই বক্রভাব গীবনেতো লক্ষিত হয়ই এমনকি তৎপরবর্ত্তী উর্দ্ধবিকাশেও যে লক্ষিত হয় তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাবাদ্বীপে যে যে প্রসিদ্ধ নরবৎ জন্তুর কঙ্কাল ডাক্তার ডুবয়কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহা বানর বা বনমানুষ অপেক্ষাও মনুষ্যের অধিক সন্নিকটবর্ত্তীরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে উহার বর্ণনায়ও আমরা বক্রপদেরই উল্লেখ প্রাপ্ত হই। সেই বর্ণনাংশটী এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—"The teeth indicate a join formation equally intermediate and the femur, though more advanced is very heavy and curved" Ibid p 260

"দন্তসকল হইতে তুল্যরূপ মধ্যম প্রকারের চোয়াল গঠনেরই প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উরু অস্থি অধিক উন্নত হইলেও অত্যন্ত ভারীও বক্র।"

মনুষ্য বিকাশেও অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে পদের বক্রতাই লক্ষিত হইয়া থাকে। অসভ্য অবস্থা হইতে যতই সভ্যাবস্থার পরিণতি হইতে থাকে ততই পদের বক্রতার স্থলে সরলতার পরিণতি হইতে থাকে। এরূপেই সভ্যতার বিশেষ বিকাশের সহিত সম্পূর্ণ সরল পদের বিকাশ হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় যে উরুর সহিত রম্ভার তুলনা পাওয়া যায়, তাহাতে সুগোল সরল উরুই যে পদের প্রকৃষ্ট পরিণতি তাহাই প্রতিপাদিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারিতেছি যে দ্বিপদের সম্যক্ পরিণতি যেমন মনুষ্যবিকাশের বিশেষত্ব হইয়াছে সরল ও সুগোল পদের পরিণতি তেমনই সুসভ্য মনুষ্যের বিশেষত্ব হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রহেলিকা।

বুক ভরা দিলে তৃষা—জালিলে অনল
না সৃজিলে পিপাসার বারি,
নিশিদিন দহিতেছি মরমে কেবল
একি লীলা, হে নাথ! তোমারি!

২

আছে ধূ ধূ মরুভূমি, রয়েছে আবার
ছায়া-ঘেরা শ্যাম-উপবন,
আছে অশ্রু আঁখি-কোণে, হাসি সুকুমার
তা'রি পাশে বিরাজে কেমন!

৩

যেখানে আঁধার জাগে, আলোক সেথায়
পেয়েছে ফুটিতে অবসর,
সুখ-দুঃখ, হর্ষ-ব্যথা, আশা-নিরাশায়
চিরদিন মিলন কাতর!

৪

একি প্রহেলিকা দেব! শুধু মোর তরে
বিশ্ব-রীতি হল ব্যভিচার,
নিদারুণ দাহ আছে সারা জন্ম ধরে
শান্তির প্রলেপ নাহি আর!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মুসলমান ঐতিহাসিক (৮)

(গ) মীর গোলাম হোসেনখাঁ।

গোলাম হোসেনের পিতা দিল্লীর বাদশাহের উজীর ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। এই কারণে তাঁহার জীবন নানাবিধ রাজনৈতিক ব্যাপারে বিড়ম্বিত থাকিত। তাঁহার জীবনীর সহিত তৎকালীন বাঙ্গালা দেশীয় রাজনৈতিক ইতিহাস এতই সংশ্লিষ্ট যে, তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনায় বাঙ্গালার অনেক রহস্যময় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের চক্ষে পতিত হয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কেবল ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নহে; তিনি একজন সুনিপুণ কার্য্যতৎপর রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। তাঁহার জীবন নিভৃত পল্লীর শান্তি নিকেতনে নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহিত হয় নাই—পরন্তু তিনি আজীবন বাণিজ্যবহুল সমৃদ্ধ সহরের রাজনৈতিক জনকোলাহলে লিপ্ত থাকিয়া তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উন্মুক্ত বক্ষে সুবিজ্ঞ নাবিকের ন্যায় স্বীয় জীবনতরী চালনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের দৌহিত্র হাসেন ও হোসেনের বংশীয়গণ সকলেই গৌরবাত্মক "সৈয়দ" নামে অভিহিত হন। গোলাম হোসেনও এই সৈয়দবংশীয় ছিলেন। হোসেনের বংশে ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মদিনা হইতে পারস্যান্তঃপাতী মাসেদে আসিয়া বাস করেন। এই ইব্রাহিমের এক অধস্তন বংশধর সৈয়দ ফইজউল্যা খাঁ মোগলরাজত্বকালে শাহজানাবাদ বা নূতনদিল্লী নগরীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফইজউল্যার পুত্রের নাম আলিমউল্যা। আলিম উল্যার কয়েক পুত্র ছিল, তন্মধ্যে আমরা দুইজনের মাত্র নাম জানি:—হেদায়েত আলি খাঁ এবং আবদুল আলি খাঁ। এই হেদায়েত আলিই আমাদের ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের পিতা। সৈয়দবংশীয় ইব্রাহিমের এক উপাধি ছিল—"তেবাতেবা"; এজন্য তদ্বংশীয়গণ সকলেই সৈয়দ ও "তেবাতেবা" এই উভয় উপাধিতে চিহ্নিত হইতেন।

গোলাম হোসেনের মাতৃকুলও সৈয়দবংশীয়। সৈয়দ আহম্মদ নামক এক পবিত্রচেতা মহাত্মা পারস্যান্তর্গত সিরাজে বাস করিতেন, তিনি "শাহচিরাগ" নামে পীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া, বহুদেশে সন্ধ্যালোকে পূজিত হইয়া থাকেন। ইঁহারই বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তির নাম সৈয়দ জিমু—এলাব্‌দিন। ইনি দিল্লীতে বাদশাহ আওরঙ্গজেব ও তাঁহার পুত্র আজমশাহের অধীনে চাকরী করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইঁহার দুইটি কন্যা ও কয়েকটি পুত্র ছিল। পুত্রদিগের মধ্যে আমরা মেহদীনেসার খাঁর নাম জানি, কারণ তিনি পাটনার

শাসনকর্ত্তা—সৈয়দ আহম্মদ ও বঙ্গের নবাব সিরাজ উদ্দৌলার অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। জিন্ এলাব্‌দীনের এক কন্যার সহিত আলিমউল্যার পুত্র হেদায়েত আলির বিবাহ হয়। এই বিবাহে চারি পুত্র জন্মেঃ—(১) গোলাম হোসেন খাঁ, (২) আলি নকী খাঁ, (৩) গালিব আলি খাঁ ও (৪) সৈয়দ আলি খাঁ। এতন্মধ্যে প্রথম দুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

গোলাম হোসেন হিজিরা ১১৪০ সালে বা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা আলি নকীর জন্ম হয়। যখন গোলাম হোসেনের বয়স পাঁচ বৎসর হইল, অর্থাৎ ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতামহী শাহজানাবাদে গৃহাদি সমস্তই বিক্রয় করিয়া কন্যাপুত্র ও জামাতাবর্গ সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদে আসেন। হেদায়েতের পিতা আলিমউল্যা তখনও জীবিত ছিলেন; তিনি অতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষ; তিনি সংসারে একান্ত নিস্পৃহ থাকিয়া স্বীয় দীর্ঘজীবনের শেষদিনগুলি ধর্ম্মারাধনায় পবিত্রভাবে ব্যয়িত করিতেন। এজন্য তিনি বঙ্গদেশে আসেন নাই। এই সময়ে মুর্শিদ কুলি খাঁর জামাতা সুজা উদ্দীন্ বঙ্গদেশের নবাব ছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন সুজাউদ্দীন্ শ্বশুরের অধীনে উড়িষ্যা অঞ্চলের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে মীর্জ্জামহম্মদ নামক তাঁহার এক আত্মীয় তথায় গিয়া সাক্ষাৎ করেন। মীর্জ্জামহম্মদ সুজার জনৈক আত্মীয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মীর্জ্জার সহিত তাঁহার দুই পুত্র হাজি আহম্মদ ও আলিমীর্জ্জাও ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সুজার অধীনে নানা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। মীর্জ্জা মহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র আলি পরিণামে আলিবর্দ্দী খাঁ নামে বিখ্যাত হন, এজন্য আমরা এখন হইতেই তাঁহাকে আলিবর্দ্দী নামে অভিহিত করিব।

গোলাম হোসেনের মাতামহ জিন্ এলাবদিন উক্ত মীর্জ্জা মহম্মদের ভাগিনেয় ছিলেন। * সুতরাং জিন্ এলাব্‌দিনের সহিত আলিবর্দ্দীর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ ছিল। আলিবর্দ্দী বঙ্গদেশে স্বীয় প্রতিপত্তি বলে ক্রমে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন; তাঁহারই ভরসায় গোলাম হোসেনের মাতামহী বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনও অতি শুভক্ষণে হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা বঙ্গে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই আলিবর্দ্দী আজিমাবাদ † বা পাটনার শাসনভার প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে পাটনায় আসিলেন। আলিবর্দ্দীর অযাচিত অনুগ্রহে তাঁহারা তৎপ্রদেশে বহুসংখ্যক জায়গীর লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও গোলাম হোসেন ও তাঁহার বংশধরগণ ঐ সকল জায়গীরের উপস্বত্ব ভোগ করিয়া মহাসুখে পাটনা অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন।

আলিবর্দ্দী যখন বিহার শাসনের জন্য যান, তখন তৎপ্রদেশে নানা বিদ্রোহের জন্য অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। সুযোগ্য আলিবর্দ্দী বলে ও কৌশলে সে সকল দমন করিয়া নিষ্কণ্টকে শাসন করিয়াছিলেন। এসময়ে গোলাম হোসেন অতি শিশু; তাঁহার পিতা হেদায়েত আলিবর্দ্দীর অনুগ্রহে রাজসরকারে প্রবিষ্ট হন। হেদায়েত নিজে বেশ সুবিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ

* মুসলমান ইতিহাস হইতে প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় সহজ সাধ্য নহে। বিশেষতঃ মুতাক্ষরীণ অনুবাদকের অনুবাদে অনেক স্থলেই সম্বন্ধ বিষয়ে নানা গোলমাল দৃষ্ট হয়। ইহার একটি কারণ ইংরাজী ভাষায় সূক্ষ্মভাবে সম্বন্ধ বিচারের উপযোগী অধিক শব্দ নাই, দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ কোন স্থানে Paternal স্থলে maternal বা granduncle স্থলে শুধু uncle হইয়া পাঠকদিগকে মহাসমস্যায় পতিত করিয়াছে। ক্যাম্বে কোম্পানির নূতন সংস্করণে নূতনত্ব অনেক থাকিলেও এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রকাশক মহাশয় আদ্যোপান্ত মিলাইয়া প্রকাণ্ড পুস্তকখানি পাঠ করিবার সুবিধা পান নাই। জিন্ এলাবদিন আলিবর্দ্দীর পিতৃব্য বা পিতৃব্যানীর পুত্র হইতে পারেন।

† আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওখান বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তিনি যখন দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁর সহিত বিবাদ উপস্থিত করেন, তখন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে ঢাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহার প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে অনুমতি দেন। আজিম তথায় আসিয়া দুর্গাদির সংস্কার করিয়া ঐ স্থানের নাম আজিমাবাদ রাখেন (১১০০), Stewarts' History of Bengal p. 224.

ছিলেন—তিনি পুত্রদিগের শিক্ষাবিধানের জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন প্রসিদ্ধ মৌলবীর শিক্ষাধীন থাকিয়া অল্পদিনেই আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়া উঠেন। এই সময় বাঙ্গালা দেশে নানা রাজনৈতিক গণ্ডগোল উপস্থিত হয়।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রজাবৎসল সুজাউদ্দীন্ পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার অসার ও অকর্ম্মণ্য পুত্র সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদে নবাবাসন অধিকার করেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য হাজি আহম্মদ ও প্রসিদ্ধ বণিক জগৎশেঠ প্রভৃতির অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন; সুতরাং তাঁহারা আলিবর্দ্দীর সাহায্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কল্পনা করেন। আলিবর্দ্দী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া গিরিয়া নামক স্থানের যুদ্ধে সরফরাজের সৈন্যদল পরাজিত করেন এবং অবশেষে তাঁহাকে নিহত করিয়া স্বয়ং নবাব হইয়া বসেন। যখন আলিবর্দ্দী এই যুদ্ধাভিযানে মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন স্বীয় জামাতা জৈন উদ্দীন্‌কে আজিমাবাদের এবং হেদায়েত আলি খাঁকে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কয়েকটি স্থানের শাসনভার দিয়া যান। এই জৈনউদ্দীন্ই ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিরাজউদ্দৌলার পিতা।

হেদায়েত স্বীয় চরিত্র ও বীরত্বগুণে ক্রমে এত বিখ্যাত ও সম্মানিত হন যে, জৈনউদ্দীন স্বয়ং তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। যখন তিনি শাহাবাদ অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত জমিদার গরুৎসিংহ প্রভৃতিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে পাটনা পরিত্যাগ করেন, তখন ভয়ে হেদায়েতকে স্থানান্তরিত করিয়া যান। এই সময়ে গোলাম হোসেনের মাতুল মেহদীনেসার খাঁ জৈনউদ্দীনের সহকারিরূপে পাটনার শাসনভার প্রাপ্ত হন। ক্রমে মেহদী কার্য্য-দক্ষতাগুণে তন্‌কা দেওয়ানের (paymaster-general) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র নানাবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিল। হেদায়েত শাসনকর্ত্তার অপ্রিয় হইলেও তাহার প্রভুত্ব কম ছিল না। অল্পদিন মধ্যে সুবিখ্যাত ভাস্কর পণ্ডিত দুর্জ্জয় মারহাট্টাবাহিনী সহ বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হন। এই সময়ে আলিবর্দ্দী জৈন উদ্দীনকে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে আসিতে আজ্ঞা করেন; কিন্তু এই বিপ্লব সময়ে তিনি সৈন্যদিগের বেতন পরিশোধ ও শাসনের সুব্যবস্থা না করিয়া পাটনা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হেদায়েতের শরণাপন্ন হইতে হইল; হেদায়েত স্বীয় ঔদার্য্যগুণে অর্থ দিয়া সৈন্যদিগের বেতন পরিশোধ করিলেন, এবং জৈনউদ্দীনের অনুপস্থিতি সময়ে রাজধানী রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

অবশেষে মারহাট্টাদল পাটনার সমীপবর্ত্তী হইল। কিন্তু হেদায়েতের অনুগ্রহে পাটনা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। গোবিন্দজী নায়ক নামক একজন মারহাট্টা সর্দ্দার পূর্ব্বে যখন বারাণসী অঞ্চলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, তখন হেদায়েত আলি তৎপ্রদেশে শাসন করিতেন। তাঁহার অনুগ্রহে গোবিন্দজী বহুবার স্বীয় ব্যবসায়ে লাভবান্ হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দজী পেশওয়ে বালাজী রাওয়ের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। বালাজীর নিকট যখন হেদায়েতের চরিত্র ও উপকারের কথা প্রকাশ করিলেন, তখন উন্নতমনা সেনাপতি আত্মীয়ের সাধুসংকল্পে সন্তুষ্ট হইয়া পাটনার উপর কোনও অত্যাচার করিলেন না।

এদিকে জৈনউদ্দীন্ পাটনায় প্রত্যাগত হইয়া হেদায়েতের সমস্ত উপকারের কথা বিস্মৃত হইলেন এবং হেদায়েতের ক্ষমতা লাঘবের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন হেদায়েত অসন্তুষ্ট হইয়া পাটনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লী যাত্রা করিলেন এবং যাইবার সময়ে মেহদীনেসারকে কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জৈনউদ্দীনের সহিত যাবতীয় সম্বন্ধচ্যুত হইয়া সাধারণ ভদ্রলোকের মত বাস করিতে বাধ্য করিলেন। গোলাম হোসেন ও আলি নকী উভয় ভ্রাতাই হেদায়েতের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে গোলাম হোসেন পিত্রাদেশে পাটনায় প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার খুল্লতাত আবদুল আলি খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন (১৭৪৫)।* এই সময়ে

* গোলাম হোসেনের বিবাহ ১৭৪৫ অব্দে বা ১৭৪৮ অব্দে হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত বৎসরে

আলিবর্দ্দীর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বিহার অঞ্চলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়াছিলেন। নকী আলি পাটনায় আসিয়া সৈন্যদলভুক্ত হইলেন। মুস্তাফা খাঁর হত্যার পরে গোলাম হোসেন পুনরায় দিল্লী যাত্রা করেন। এদিকে অল্পদিন মধ্যেই পাটনার আফগান সৈন্যবর্গ সমসের খাঁর অধীনে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সেই বিদ্রোহে জৈন উদ্দীন্ ও হাজী আহম্মদ উভয়ে নিহত হন (১৭৪৮। সিরাজ-জননী আমিনা বেগম শত্রুহস্তে বন্দিনী হন। তখন নবাব আলিবর্দ্দী স্বয়ং সসৈন্যে গিয়া বিদ্রোহ দমন করতঃ আমিনার উদ্ধার সাধন করেন। এইবার অল্পবয়স্ক সিরাজ নামে মাত্র পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। প্রকৃত পক্ষে প্রধান মন্ত্রী জানকীরামই সহকারীরূপে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। গোলাম হোসেন গাজীপুরে থাকিতে উপরোক্ত বিদ্রোহের সংবাদপ্রাপ্ত হন। তথা হইতে বারাণসী দিয়া বেরেলিতে গিয়া কিছুদিন তাঁহার পিতার নিকট ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা সেকন্দ্রার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। বেরেলীতে থাকিয়াই গোলাম হোসেন বাদশাহ মহম্মদ সাহের মৃত্যু সংবাদ পান। এই বিষম বিপ্লবযুগে গোলাম হোসেন স্বীয় মাতা ও পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য পাটনায় প্রত্যাগত হইলেন। আলিবর্দ্দীর দ্বিতীয় জামাতা কিছুদিন পাটনার শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, পাটনার রাজ্যভার তিনিই পাইবেন; কিন্তু আমিনা বেগমের চেষ্টায় তাহা হইল না। তখন আলিবর্দ্দী তাঁহাকে পূর্ণিয়ার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এতদুপলক্ষে সৈয়দ আহম্মদ যখন পাটনা পরিত্যাগ করেন, তখন গোলাম হোসেনের আত্মীয় স্বজনেরা বিদ্রোহ সঙ্কুল পাটনার আবাস পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন, গোলাম হোসেন বেরেলী হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুর্শিদাবাদে যাইবার পথে সৈয়দ আহাম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা নকী আলির জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। সৈয়দ আহাম্মদ কিছুদিন মুর্শিদাবাদে অতিবাহিত করেন—সেই সময়ে গোলাম হোসেনের মাতুল মেহদী নেসার খাঁ বীরত্ব ও দক্ষতা গুণে সৈয়দ আহম্মদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। মেহদীনেসার সৈয়দ আহম্মদের পার্শ্বচর হইলে সিরাজের ভবিষ্যত উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় আমিনা বেগম কৌশলে মেহদী নেসারের সহিত তাঁহার বিবাদ সংঘটিত করিয়া দেন। তখন মেহদী ও নকী আলি উভয়ে সিরাজের পক্ষভুক্ত হন। কিন্তু আলিবর্দ্দী শীঘ্রই মেহদীকে স্থানান্তরিত করিলেন, তখন নকী আলি দুইশত সৈন্যের মনসবদার রূপে মুর্শিদাবাদে রহিলেন।

এই সময়ে গোলাম হোসেন সৈয়দ আহম্মদের সহিত পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন এবং অল্পদিন মধ্যে নকী আলিও তথায় গিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অবশেষে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার অর্ব্বাচীন পুত্র শওকত জঙ্গ পূর্ণিয়ার মসনদ প্রাপ্ত হইলেন, গোলাম হোসেন এই বিকৃত মস্তিষ্ক উদ্ধত যুবকের অধীনস্থ, থাকিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এ সময়ে পাটনায় ছিল। তিনিও সেইস্থানে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। এদিকে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী পরলোক গমন করায় সিরাজউদ্দৌলা পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে মুর্শিদাবাদে নবাব হইয়াছিলেন এবং আত্মীয় ও কর্ম্মচারী বর্গের উপর নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সিরাজও শওকত যে দেশের কর্ণধার, তাহার ভাগ্যবিপর্য্যয় যে সহজসাধ্য ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, তাহা সহজেই সকলের নিকট প্রতিভাত হইতেছিল। গোলাম হোসেন পাটনা যাইবার পথে কারণগোলায় গিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা (গালিব আলি ও সৈয়দ আলি) সিরাজের আদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তখন তিনি স্বয়ং ভীত হইয়া পুনরায় পূর্ণিয়ায় প্রত্যাগত হইলেন।

গোলাম হোসেন সিরাজ ও শওকত উভয় হইতেই দূরে থাকিতে সমুৎসুক ছিলেন। কিন্তু যখন শওকত স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে অত্যন্ত অনুরোধ

নির্দ্ধারিত হইয়া শেষোক্ত বৎসরে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। See Vol. IP . 449 and Vol III P. 264.

করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা অন্যায় বিবেচিত হইল। শওকতের অত্যাচার ভয়ে তিনি প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে দরবারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শওকত ও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার মন্ত্রণার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। শতরঞ্চ ক্রীড়ায় কাষ্ঠ-পুত্তল রাজার পার্শ্বে দাবা বা মন্ত্রী যেরূপ ক্রীড়কের প্রধান সম্বল হয়, সাক্ষিগোপাল শওকতের পার্শ্বেও সুচতুর গোলাম হোসেন সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন কি, গোলাম হোসেন না আসিলে দরবারের কোনও কার্য্য হইত না। শওকত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথ পানে চাহিয়া থাকিতেন। শওকত লিখিতে বা পড়িতে কিছুই জানিতেন না; অল্পদিন মধ্যে গোলাম হোসেন তাঁহাকে বানান পড়াইতে বা লেখাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পূর্ণিয়ার দেওয়ান আমে গোলাম হোসেন "সন্দীপনি মুনির পাঠশালা" খুলিয়া বসিলেন।

এই সময়ে মুর্শিদাবাদে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র উপস্থিত হয়। সেনাপতি মীরজাফর, প্রধান মন্ত্রী রায়দুর্লভ, ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ, জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ, কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ও কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানি এই ছয় জনই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান অধিনায়ক। সিরাজকে অপসারিত করিয়া মীরজাফরকে নবাবী দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই সময়ে ধূর্ত্ত মীরজাফর শওকতজঙ্গকে লিখিয়া পাঠান যে, শওকত চেষ্টা করিলে আলিবর্দ্দীর সমস্ত রাজ্যের একাধীশ্বর হইতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁহার সেনাবলের অভাব হইবে না। মীরজাফরের ইচ্ছা এই যে, শওকত বিদ্রোহী হইলে, সিরাজকে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। তখন তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সহজে পরিষ্কৃত হইবে। কিন্তু উদ্ধত শওকত সে দুরাভিসন্ধি না বুঝিয়া—সেই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি অত্যধিক আনন্দে ও আশায় সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আবার মীর আলি ও হবিব বেগ নামক তাঁহার দুই পার্শ্বচর তাঁহাকে আরও ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিল। শওকত নবাব না হইয়াই নবাবী আরম্ভ করিলেন। অনেক কর্ম্মচারীর উপর অযথা অত্যাচার হইতে লাগিল; গোলামহোসেন কয়েকদিন দরবারে আসা বন্ধ করিলেন। তখন শওকত একদিন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন; গোলাম-হোসেন আসিলেন এবং অবসর মত তাঁহাকে এক দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিলেন। শওকতের মত ব্যক্তি যে তাঁহার উপদেশে সহজে বিচলিত হইবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার উপদেশের ফল ধরিল; শওকত মহানন্দে বিভোর হইয়া গোলামহোসেনকে একটী হস্তী বখ্‌সিস্ দিয়া বসিলেন। কিন্তু চঞ্চল ও তরল সলিলের অঙ্গে অস্ত্ররেখা যেরূপ সহজে বিলীন হইয়া যায়, গোলামহোসেনের মধুর বাণীও সেইরূপ ক্ষণকাল মধ্যে পণ্ডিতের প্রলাপ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। আবার পাপের স্রোত বহিল। শওকত অবিরত কর্ম্মচারিগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন; এমন কি প্রকাশ্য দরবারে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশে অশ্লীল পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—গোলামহোসেন অবাক্ হইয়া গেলেন। "ভারতের ইতিহাসে, অর্ব্বাচীন নরপতির অভাব নাই—কিন্তু শওকত নিজগুণে সকলকেই পরাভব করিয়াছিলেন।" *

সিরাজের সহিত বিবাদের উপক্রম দেখিয়া, গোলাম-হোসেন বারংবার শওকতকে স্বীয় কর্ম্মচারিগণের উপর অত্যাচারে বিরত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সে উপদেশ গ্রহণ করিলে, গোলামহোসেন অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচিত হইতে হইবে, এই ভয়ে সুবুদ্ধি শওকত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বরং মদমোত্ত শওকতের আদেশে সিরাজকে লিখিয়া পাঠান হইল:—"আমি বাদশাহের নিকট হইতে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সনন্দ পাইয়াছি। তুমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিবে। তোমাকে প্রাণে মারিতে চাহি না। তুমি ইচ্ছা করিলে ঢাকা প্রদেশের যে

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বিখ্যাত "বাঙ্গলার ইতিহাস— নবাবী আমল" ২২৩ পৃঃ। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসের ৩১৫ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

কোন অংশ গ্রহণ করিয়া, তথায় বাস করিতে পার। শীঘ্র রাজধানী ও ধনভাণ্ডার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে।" এরূপ অসহ্য দর্পপূর্ণ পত্রের একমাত্র উত্তর—যুদ্ধ। ক্রমে তাহারই উদ্যোগ হইল। সিরাজ সেনাপতি রাজা মোহন লালও পাটনার নায়েব নাজিম রামনারায়ণকে সসৈন্যে শওকতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন। শওকতও সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। গোলামহোসেন ও তাঁহার ভ্রাতা নকী আলি সৈন্যদলভুক্ত হইয়া শিবিরে থাকিলেন। নবাব গঞ্জের সন্নিকটে যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে বঙ্গীয় সুদক্ষ সেনাপতিগণের নিকট শওকতের সৈন্যগণের কোনও বিক্রমই কার্য্যকর হইল না। যখন পরাজয় নিশ্চিত হইল, তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া কয়েকজন মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে রহিলেন--তাদের দ্বারা বিগত-চেতন শওকত ও তাঁহার ১৪ জন সহচর। এই ১৪ জনের মধ্যে গোলামহোসেন একজন; তিনিই শওকতকে ধরিয়া হস্তিপৃষ্ঠে উঠাইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে শত্রুশিবির হইতে একটি গোলা আসিয়া শওকতের ভবক্রীড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া দিল।

পূর্ব্ব হইতেই সিরাজউদ্দৌলা গোলামহোসেন ও নকী আলি উভয়ের উপর বিরক্ত ছিলেন। তিনি ভাবিতেন, যত কিছু বিদ্রোহ ও গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহা এই দুই ব্যক্তিদ্বারা হইয়া থাকে। এ জন্য শওকতের মৃত্যুর পর গোলামহোসেনের কিছু ভয় হইয়াছিল পাছে সিরাজ তাঁহাদের উপর অত্যাচার করেন। এমন সময় সিরাজ মোহন লাল ও মীরকাসেম খাঁকে শওকতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে আজ্ঞা করিলেন। মীর কাসেম খাঁ মীরজাফরের ভ্রাতা এবংতিনি গোলাম হোসেনের মাতুলের জামাতা। সুতরাং গোলাম হোসেন ও তাঁহার পরিবার বর্গের উপর কোনও অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য নবাবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা এই সময়ে স্বীয় চরিত্রের মহত্বের পরিচয় দিয়া মোহনলালকে বলিলেনঃ—গোলাম হোসেনের মাতার সঙ্গে যে কেবল মীরকাসেমেরই সম্বন্ধ, তাহা মনে করিও না। তিনি সম্বন্ধে আমার খুল্লতাতপত্নী; আমিও তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করি। তিনি বা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের উপর যেন কোন প্রকার অত্যাচার না হয়। তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পথে নিরুদ্বেগে যাইবার জন্য আজ্ঞালিপি দিয়া যেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন, পাঠাইয়া দিবে।" * যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলাকে এক নৃশংস পশু বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এ সত্য ঘটনা তাঁহাদিগের নিকট অপ্রীতিকর হইতেও পারে।

এদিকে যুদ্ধের পর গোলাম হোসেন পূর্ণিয়ায় প্রত্যাগত হইয়া গুপ্তভাবে ছিলেন এবং তথা হইতে মীর কাসেমের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। মীর কাসেম নবাবের আদেশ মত গোলাম হোসেনের ধন রত্ন ও আত্মীয় পরিবার সুবিধামত নির্ব্বিঘ্নে জল ও স্থলপথে পাটনায় রওনা করিয়াছিলেন। রাজা রামনারায়ণ ও পথে যাইবার সময় তাঁহার জন্য অস্ত্রধারী পরিরক্ষক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন॥ পথে তিনি হঠাৎ বড় অসুস্থ হইয়া পড়েন; অবশেষে কয়েকজন আত্মীয়ের সদয় ব্যবহার ও শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি সপরিবারে ধন জন সহ নির্ব্বিঘ্নে বারাণসীতে পৌঁছিলেন। ক্রমে ক্রমে গোলাম হোসেনের অপর তিন ভ্রাতা ও সেই স্থানে গেলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় কিরূপে সিরাজউদ্দৌলার দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র

---

* Vol. II. P. 215 (Cambray & co.)

সৈনিকের বিদায়।

('Soldier's Adieu, by D. G. D.)

জানি আমি কাঁদ্‌বি মা তুই
আমার যখন মৃত্যু হবে,
জানি তোর ও শুভ্র মাথা
নীরব ব্যথায় নুয়ে রবে,—
রইবে নত আঁধার সাঁঝে
গৃহকোণের অগ্নি' পরে,
উঠ্‌বে জেগে স্মৃতি কত
ভেসে ভেসে আঁধার ঘরে।

ছোটখাটো অতীত কথা—
সুদূর, তবু ভুলায় হিয়া,—
কোথায় কবে কি করেছি
কেমন করে কিসে দিয়া;
আঁখিতে জল উথ্‌লে ওঠে,
বল্‌বি নাক মুখে তবু,
যা' হল তোর তেমন-ধারা
মনে মনে চাস্‌নি কভু।

আগুন-শিখা আস্‌বে নিবে,
রইবি বসে পাষাণ-সমা,
বসে বসে ভাব্‌বি, কভু
কেঁদে কেঁদে উঠ্‌বি ওমা!
ঘুমালে তুই গভীর রাতে
নীরবে তোর কাছে এসে
অভাগিনী মাগো আমার!
হাত বুলাবো শুভ্র কেশে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

বঙ্কিম প্রসঙ্গ।

(৮)

দুর্গেশ নন্দিনীতে দেখিতে পাই বীরেন্দ্র সিংহ গড় মান্দারণে বাস করিতেন। সেই মান্দারণ মহকুমা জাহানাবাদ অধুনাআরাম বাগের অতি নিকট। বঙ্কিম বাবুর ভক্ত বৃন্দের জাহানাবাদ যাইবার সুযোগ হইলেই তাঁহারা একবার গড় দেখিতে ভুলেন না। আর সেখানে গেলেই মনে পড়ে সেই স্থির যৌবনা, সুরূপা, হাস্তরস রসিকা বিমলাকে, আর সেই রসিকরাজ বিদ্যা দিগ্‌গজকে। সম্ভবতঃ বিমলাজাতীয়া রমণী তাহার ত্রিসীমানায় মিলে না, তবে এখন ও দুই একটী বিদ্যা দিগ্‌গজ থাকিবার সম্ভাবনা।

পঞ্চত্রিংশ বর্ষীয়া বিমলার রূপ বর্ণনায় বঙ্কিমবাবু যে বর্ণনা চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন তাহাতে বিমলাকে মনে পড়িবারই কথা। তিনি সত্যই বলিয়াছেন "বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে। যার রূপ নাই সে বিংশতি বর্ষ বয়সেও বৃদ্ধা, যার রূপ আছে সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ, যার রস আছে সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর চল চল করিতেছে, রসে মন টল টল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক।"

দীনবন্ধু বাবু এই জাতীয়া রমণীকে "দুধ মরে ক্ষীর" বলিয়াছেন। এ কথাও ঠিক, তবে নাড়ী ভাল না হইলে ক্ষীর পরিপাক হয় না। দেশে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার বড় প্রাদুর্ভাব। বল্‌কা দুধ হজম হওয়া ভার, তাই ক্ষীরের আদর করিবার লোক কমিয়া আসিতেছে। বিমলার পর ঐ দেশ হইতেই আর একটী রমণী জন্মিয়াছে, তাহারও কটাক্ষ অনেকে ভয় করিতেন। তাহারও রসের পরিপাকে যৌবন স্থির ছিল। সঙ্গীতে নৃত্যে বিমলার ন্যায় সুনিপুণা ছিল, কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্য্য সমান বা বেশী ছিল তাহা ঠিক নির্ণয় হয় না। এই সুন্দরীটী লোক শিক্ষার প্রশস্ত স্থল—নাম "বর্ণ বাই"।

কোন নবীন ডেপুটী শামলা মাথায় দিয়া চাপরাসী সঙ্গে করিয়া স্বর্ণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে যান। এ ধৃষ্টতা স্বর্ণ সহ্য করে নাই, তাই হাকিমটীর কদর না করিয়া একটু বিরক্তির কষাঘাত সহ বিদায় দেয়। তাহার পর সদর দরজা পার হইবার সময় শামলার উপর হুঁকার জল ঢালিয়া দিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিয়াছিল। ডেপুটী টী নাকি একটী গ্রন্থকার, সুতরাং মনে হয় এই সুমিষ্ট আচরণে নারী চরিত্র জ্ঞানের তাঁহার একটু সুযোগ ঘটিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সধবার একাদশীর কাঞ্চনই এই স্বর্ণ। কিন্তু তাহার ঘটীরাম ডেপুটী আমাদের কথিত এই ডেপুটি টী নহেন। স্বর্ণ ছিল দর্পিতা, গর্ব্বিতা—অর্থলালসা সম্পন্না। সে লালসা দুই এক হাজারে মিটিত না, তাই ঘটীরাম ডেপুটী প্রভৃতির সেখানে খাতির ছিল না। তাহার উপর গর্ব্বিত লোকের সেখানে স্থান ছিল না। আদর পাইত কাম ধেনুরা, আর তাহাদের আদুরে ছেলেরা। অপরে তীব্র বিদ্রূপের জ্বালায় অস্থির হইত।

বঙ্কিমবাবু যদি বরাতে বিমলার রূপের আদত কথা না পারিয়া তাহারই মধ্যে একটু চরিত্র নির্ণয় বিদ্যার (Physiognomy) পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে অনেককে হুঁকার জলের দায় হইতে রক্ষা করা হইত। বঙ্কিমবাবু লিখিতেছেন "কি চক্ষু। সুদীর্ঘ, চঞ্চল আবেশ ময়— কোন কোন প্রগল্ভ যৌবনা কামিনীর চক্ষু দেখিবা মাত্র মনো মধ্যে বোধ হয় যে এই রমণী দর্পিতা, এ রমণী সুখ লালসা পরিপূর্ণা। বিমলার চক্ষু সেইরূপ।"

পাঠক সে চক্ষুর গঠন বুঝিলেন কি? আর একটী চক্ষু দেখিলে সে সবে বিমলার মত চক্ষু তাহা বলিতে পারিবেন কি? কিন্তু ন্যায়ের খাতিরে বলিতে হয় যে এ বিদ্যার "রেনল্ড" বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু বলিতেন রেনল্ডের লেখা এক ঘেয়ে। তাঁহার Mysteries of the court of London প্রথম দুই ভাগ পড়িলে আর অবশিষ্ট ছয় ভাগ পড়িবার আবশ্যক হয় না। কথাটা ঠিক হইতে পারে' কিন্তু আমি তাঁহার যে সুখ্যাতি করিতেছি তাহা অন্য বিধ। ভাবুক পাঠক দেখিবেন তিনি Phyiognomical signs গুলি বজায় রাখিয়া কেমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত চরিত্র গুলির রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এখন এ সকল কথা যাক, আসুন পাঠক আপনাকে গড় মান্দারণের কথা বলি।

গড় মান্দারণ গো ঘাট থানার মধ্যে অবস্থিত। জাহানাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্ম স্থান কামার পুকুরের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ক্ষুদ্রকায়া আমোদর নদী এখন ও মান্দারণের পার্শ্বে প্রবাহিতা। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন "মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠব শালী নগর ছিল।" কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশ জঙ্গল ভূমিতে পূর্ণ ছিল। বেশী দিনের কথা নয় ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরও ইহার কি অবস্থা ছিল তাহা অনেকের জানা আছে। হিংস্র জন্তুর দৌরাত্ম্যে লোক ব্যতিব্যস্ত হইত, দস্যু তস্করের ভয়ে কেহ পথ চলিত না, অনেক উর্ব্বরা ভূমি বিনা আবাদে পড়িয়া থাকিত। বাদশাহ আকবর সাহের সময় তাঁহার রাজস্ব সচীব রাজা তোডরমল নানা স্থানে বন কাটিয়া গ্রাম ও নগর স্থাপন করণান্তর কৃষি কার্য্যের বিস্তার, নূতন প্রজা পত্তন এবং তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে "জঙ্গল বুড়ি" অর্থাৎ বন কাটিবার সনন্দ দিয়া বঙ্গের নানা স্থানে প্রেরণ করেন। তৎকালে খাঁজাহান নামক জনৈক কর্ম্মচারী গৌড়ের দক্ষিণ মধ্য-বঙ্গদেশে এতদ্ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিই নাকি এই স্থানটী পরিখা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে প্রস্তর ময় সুরম্য হর্ম্ম্য এবং মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করান এবং ইহার "মান্দারণ" নামকরণ করেন। মান্দারণ পারশিক শব্দ—অর্থ অরণ্য। জঙ্গল শব্দও তাই। এই খাঁজাহানের নামানুযায়ী জাহানাবাদের উৎপত্তি। স্বীয় নামের পর "আবাদ" শব্দ মাত্র সংযোজিত হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "গড়মান্দারণে কয়েকটী

প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড়মান্দারণ হইয়া থাকিবে।" কিন্তু তেমন কোন প্রমাণ পাই নাই। গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখা অর্থাৎ গড়খাই থাকায় জন্যই সম্ভবতঃ গড়মান্দারণ নামকরণ হইয়াছিল।

শুনা যায় খাঁজাহান পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে রাজস্ব সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার বংশধর "দেওয়ান গাজী" এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া আত্মমাদি রক্ষা করেন। তিনি একজন পীর—অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্থান পীরস্থান হইয়াছে এবং উক্ত প্রদেশের মুসলমান ও অনেক হিন্দু উক্ত পিরের শির্নী দিয়া থাকেন। এই বংশেই নাকি "পীর আলীর" জন্ম হয়। ইহার নাম অনেকেরই জানা আছে। প্রবাদ যে তাঁহার অত্যাচারে অনেক অনেক হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইয়াছিল এবং অনেক হিন্দু মান্দারণ ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে পলায়ন করেন। তাহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি "মান্দারণ তাঁতি" "মান্দারণ তাম্বুলী" প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দেয়।

মান্দারণে এখনও কয়েকঘর মুসলমানের বসতী আছে তাহারা ঐ স্থানের আদিম বাসিন্দা বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে আদি বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারেন না। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "অদ্যাপি পর্য্যটক গড়মান্দারণ গ্রামে ঐ আয়াসলব্ধ দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন, দুর্গের নিম্নভাগ মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি তিন্তিড়ী মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণকে আশ্রয় দিয়াছে। নদী পারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।"

নদী পারে দুর্গের কোন চিহ্ন নাই। এই অশ্বথ ও তিন্তিড়ি প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষ গড়ের মধ্যে আছে তাহাও বহুকালের বলিয়া মনে হয় না। আর অধুনা তথায় ভুজঙ্গ ভল্লুকাদিরও ভয় নাই, ইতস্ততঃ কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড মাত্র দেখা যায়। তথায় যে সকল মুসলমান আছেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সম্বল "পীর"। পরের একজন ফকিরও আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ তথায় যে বীরেন্দ্র সিংহ বা অপর কোন হিন্দুরাজা ছিলেন তাহার কোন কথা বলিতে পারেন না। এখানে যে এক সময়ে মুসলমানদিগের বিশেষ আধিপত্য ছিল তাহা অনেক ভগ্নগৃহাদির নির্ম্মাণ প্রণালী হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। মান্দারণ হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে "সানবঁদি" গ্রামে এখনও একটী প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ আছে; এবং মদিনা ও তেজুয়া গ্রামে এখনও মুসলমানদিগের পূর্ব্ব কীর্ত্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

শৈলেশ্বর শিব যে মান্দারণের অনতিদূরে ছিলেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রামের উত্তরে একটী শিবলিঙ্গ প্রোথিত দেখা যায়, কিন্তু তাহার যে কোন মন্দির ছিল তাহা বোধ হয় না। মনে হয় মুসলমানেরা যেন হিন্দুদের বিদ্রূপ করিতে সেই শিবলিঙ্গটীকে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল।

শিবমন্দির বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গ হইতে বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না। কেন না তাহা হইলে বিমলা তিলোত্তমাকে লইয়া পদব্রজে বাটী যাইবার কথা জগৎ সিংহের নিকট উত্থাপন করিতে পারিতেন না। নিতান্ত নিকটবর্ত্তীও নয়, কেন না অনেকগুলি আম্র কানন ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া জগৎসিংহকে বিমলার অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। এবং অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইবার পর এবং উভয়ে মৃদুস্বরে কথা কহিতে কহিতে কতকদূর যাইবার পর দুর্গ। সুতরাং মনে হয় পথ ক্রোশাধিক হইতে পারে। কিন্তু একক্রোশ ব্যবধানে কোন শিব মন্দির নাই। যে শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ রাজপুত্র সত্য করিলেন যে তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না সে শৈলেশ্বর আর সে থানে নাই। ছিলেন কিনা তাহাও জানিবার উপায় নাই।

সানবঁদীর সিংহদ্বারকেই কেহ কেহ মান্দারণ বহির্দুর্গের তোরণ বলিয়া স্বীকার করেন। আর তাহা সম্ভবপর হইলে মান্দারণের দুর্গ একটী প্রকাণ্ড দুর্গ ছিল। কিন্তু শৈলেশ্বর ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রবীন সাহিত্যিক হারাধন দত্ত বলিয়াছিলেন যে দেড়া

দৌলের শৈলেশ্বর মহাদেব আছেন তাহাই দুর্গেশ নন্দিনীর শৈলেশ্বর। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে কেন না নেড়া দেউল মান্দারণ হইতে ৭। ৮ ক্রোশ দূরে। বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিগ্‌গজের সঙ্গে রঙ্গ সমাপন করিয়া পদব্রজে কি ৮ ক্রোশ যাইয়া আবার ৮ ক্রোশ ফিরিয়া আসিতে পারেন? সম্ভবতঃ সে শিবলিঙ্গ নাই। মুসলমানদিগের আমলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাজা মানসিংহ যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে; তখন জাহাঙ্গীর ভারতের সম্রাট। সে হিসাবে দেখা যায় জগৎসিংহ তাহার কিছু পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। এ সময় ত খাঁজাহানের জাহানাবাদ পরগণা স্থাপনের পর বলিয়াই মনে হয়; তবে তখন মান্দারণে কি করিয়া হিন্দু রাজা ছিলেন তাহা ঠিক করা যায় না। সুতরাং দুর্গেশ-নন্দিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। দুর্গেশ-নন্দিনীর প্রারম্ভেই আছে ৯৯৭ বঙ্গাব্দে জগৎসিংহ শৈলেশ্বরের মন্দিরে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার সময় গড়মান্দারণ হতশ্রী হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। দেশের লোক তাহাদের অত্যাচারভয়ে বন বিষ্ণুপুরে রাজা গোপাল সিংহের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এ সময়ও মান্দারণে মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল বলিয়া জানা যায়। রাজা গোপাল সিংহ যে উপায়ে বর্গীদিগকে বিতাড়িত করেন তাহা আজকালিকার দিনে কেহ বিশ্বাস করিবেন না। প্রবাদ যে স্বয়ং মদনমোহন "দলমাদল" কামান দাগিয়া বর্গীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বর্গীদিগের অত্যাচার দমনে সেকালে যদি মদনমোহনকে এতটা করিতে হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে অধুনা মনুষ্যের স্বাবলম্বনে ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; নতুবা কোটী কোটী বঙ্গবাসীর কাতর প্রার্থনায় তিনি নিশ্চেষ্ট রহিয়া প্রবল অত্যাচারী জার্ম্মাণ দমন করিতেছেন না কেন? সকলই বুঝি সময় সাপেক্ষ।

প্রকৃত পক্ষে বর্গীর হাঙ্গামায় অনেক লোক মান্দারণ ছাড়িয়া বিষ্ণুপুরাঞ্চলে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করেন। মান্দারণ এখন ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে উহা নগর না হউক সহর বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্গীর হাঙ্গামার বর্ণনা সংযুক্ত একটী বহু পুরাতন গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"বলে আর রক্ষা নাই কোথা যাই কি করি বল না
বর্গীগণে মান্দারণে করিয়াছে থানা।
তাদের লোক লস্কর যেন তস্কর ফিচ্চে ঘরে ঘরে
যা পাচ্চে তা নিচ্চে কেবা বারণ করে।
ঘরে কি মানুষ আছে সব গিয়েছে গড় বিষ্ণুপুরে
বর্গীর অত্যাচার জানাতে রাজারে।"

গানে মান্দারণ সহর বলিয়া উল্লিখিত হইলেও তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক সহরের মত ছিল তাহা বলা যায় না। অশিক্ষিত লোকে এতদঞ্চলের বদনগঞ্জ, শ্যামবাজার প্রভৃতি গণ্ডগ্রামকে এখনও সহর বলিয়া থাকে; সুতরাং মনে হয় মান্দারণও ঐ শ্রেণীর একটী সহর ছিল। তবে গড়বিষ্ণুপুর নাম দেখিয়া গড় মান্দারণের নামকরণ যে তথায় গড়খাই থাকার জন্যই হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। শুনিতে পাই বঙ্কিম বাবু স্বয়ং গড় মান্দারণে যান নাই। তাঁহার ভ্রাতা সঞ্জীব বাবু জাহানাবাদে সবরেজিষ্ট্রার ছিলেন, তিনিই মান্দারণের ঐতিহাসিক তত্ত্ব বঙ্কিম বাবুকে জানাইয়াছিলেন।

বঙ্কিম বাবু স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে সার ওয়াল্টার স্কট প্রণীত "আইভানহো" পাঠ করেন নাই। সুতরাং "আয়েষা" চরিত্র যে "রেবেকা" চরিত্রের অনুকরণ তাহা কিছুতেই বলিতে পারি না; তবে সাদৃশ্য এত বেশী যে অনেকে সন্দেহ করেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একদিন আমায় বলেন যে তাঁহার একটী পুস্তকে জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ লেখকের কল্পনার ও ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে চোর সাব্যস্ত করেন, কিন্তু পরে জানা যায় ইংরাজ লেখকের পুস্তক জনসমাজে প্রচারিত হই-

বার পূর্ব্বেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পুস্তক প্রকাশিত হয়; সুতরাং এ যাত্রা তিনি মানে মানে রক্ষা পাইয়াছেন। যদি তাহাই হয় তবে বঙ্কিম বাবুর কি তেমন ঘটনা হইতে পারে না? আর যদি সত্যই অনুকরণ করিয়া তিনি স্বীকার করিতেন তাহা হইলেও তাঁহার জগদ্ব্যাপী সম্মানের কতটুকু অপচয় সাধিত হইত তাহারও পরিমাণ করা যায় না।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিম বাবুর প্রথম পুস্তক, সুতরাং তাহাতে নানা দোষ থাকিবার সম্ভাবনা। এক ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার পরবর্ত্তী ভাষার সহিত উহার কত পার্থক্য। ইহাতে বঙ্কিম-ভঙ্গিমাশালিনী ভাষার নর্ত্তন কুর্দ্দন নাই—জলস্রোতের তর তর শব্দ নাই। ভাষার নূতনত্ব নাই বরং ইহা প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃতানুগামিনী। তাহার উপর স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথানুবর্ত্তী উক্তি "হইবেক" "যাইবেক" প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাই। মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার অনেক কথা বাঁকা, শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। সেই "হবেক" "যাবেক" দেশের লোক তৎকালে শুদ্ধ ভাষায় "হইবেক" "যাইবেক" লিখিবেন বই কি; কিন্তু বঙ্কিম বাবুও দেখিতে পাই বিদ্যাসাগরের অনুকরণ করিয়াছেন। প্রথমবারে প্রকাশিত সংস্করণের অপেক্ষা পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে তাই বহুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

ঔপন্যাসিক চরিত্র গুলির আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে তাহা উচ্চ শ্রেণীর নহে। ইহার প্রধান চরিত্র জগৎসিংহ তিলোত্তমা আয়েষা ও বিমলা। জগৎ সিংহকে ভাল বলিতে পারি না। রাজপুত বীর শিব মন্দির মধ্যে অসহায়া তিলোত্তমার মুখ খানি দেখিবার জন্য লালায়িত—দেখা মাত্রেই বিচলিত। তাহার পরই শপথ যে অন্য নারীকে তিনি ভাল বাসিবেন না। অতএব হে বিমলে একবার তিলোত্তমা দেখাও। বিমলাও রাজি, গড় মান্দারণে গমন কিন্তু দুর্গ মধ্যে প্রবেশ কালে চোরের মত দুর্গস্বামীর অমতে প্রবেশ করিতে নারাজ। যেন বিমলা পরিচয় না দিলে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর বর সাজিয়া বসিয়া তাঁহারই অবিমৃষ্যকরিতার ফলে তিলোত্তমাকে বন্দিনী করিয়া, তার পর আবার যখন কারাগারে তিলোত্তমা তাঁহার দর্শন লালসায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ তলে পতিত হইলেন, তখন ও আদর নাই যত্ন নাই—বিনয় নাই সৌজন্য নাই। বীরপ্রবর, যাঁহার অসহায়া বালিকাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা হয় নাই তিনিই অম্লান বদনে বলিয়া উঠিলেন "এখানে কি অভিপ্রায়ে"? এহেন নির্ম্মম চরিত্রের আবার সমালোচনা কি? প্রকৃত প্রস্তাবে এক আয়েষা লইয়াই দুর্গেশনন্দিনী। যেমন হ্যামলেটের হ্যামলেট বাদ দিলে পুস্তকের আর কিছুই থাকে না, আমরা দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। করুণার ধারা যেন আয়েষা হৃদয়ে লহরে লহরে তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতেছে। অপরিচিত রাজ পুত্রের রোগ শয্যায় তিনি যে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহা আদর্শ স্থানীয়; কিন্তু তাহার মধ্যেও যেন স্থানে স্থানে কেমন কেমন ঠেকে। নবাবনন্দিনীর পক্ষে দুর্গ মধ্যে নিশিথে একাকিনী রোগীর পরিচর্য্যা যেন ঘোর পর্দ্দানসীন প্রথানুবর্ত্তিনী নবাব কন্যার পক্ষে বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।

হউক তাহা, কিন্তু এত সৌন্দর্য্যভরা নারী চরিত্র দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, কল্পনায় আসাও দুরূহ। বস্তুতঃ ইহাই মাধুর্য্য পূর্ণ অপূর্ব্ব কল্পনার ছবি—Idealistic character. ভাল বাসিয়া এতটা স্বার্থত্যাগ দেখা যায় না। পিতা মৃত্যু শয্যায় যন্ত্রণায় কাতর তখনও সেই দেবী-হৃদয়-সম্পন্না আয়েষা, তিলোত্তমার সতীত্ব অটুটভাবে আছে, তাহারই প্রমাণ মুমূর্ষু পিতার মুখ হইতে দেওয়াইতেছেন। যখন জগৎ সিংহের বিবাহে আয়েষা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ যাইয়া তিলোত্তমাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া সেই সুন্দর বদন প্রতি তাকাইয়া আছেন, তখন তিনি সেই যুবতী হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে তাঁহার দিব্য চক্ষুর জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ভাবিতেছেন "এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয় প্রাণেশ্বর কখন মনোপীড়া পাইবেন না।" ইহাই চরিত্র ইহাই কল্পনা। ইহারই প্রশংসা করিতে হয়। মনে হয় "রেবেকা চরিত্রও এত

ফুটে নাই। আয়েষা যখন প্রলোভনকে দূর করিতে গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গ পরিখা জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন, তখন বিচলিত চিত্ত পাঠকের কারুণ্যজড়িত এক বিন্দু অশ্রু না পড়িয়া থাকিতে পারে না।

বিমলা চঞ্চল, অস্থির মতি। কাহারও সহিত পরামর্শ নাই, একাকিনী শৈলেশ্বর শিব মন্দিরে চলিল। এক কথায় দুর্গমধ্যে জগৎসিংহকে আনিয়া তিলোত্তমার কক্ষ মধ্যে পুরিয়া দিল। আমরা এ চরিত্রের প্রশংসা করিতে পারিব না। ইহার সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই আছে তবে বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেন না বঙ্কিম বাবুর পুস্তকের সমালোচনা করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাই সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা মাত্র বলিলাম।

রুচি সম্বন্ধেও পুস্তক মধ্যে একটু বিশেষ দোষ ছিল। আসমানী পান চিবাইয়া দিগ্‌গজের গালে এক গাল পিক্ দিয়াছিল। ইহা যদি রসিকতা হয় তবে আর অশ্লীলতা কাহাকে বলিব? একটী প্রলাপ গ্রস্ত ব্রাহ্মণ সন্তানের গালে পিক দেওয়াও আসমানীর পক্ষে অসঙ্গত কার্য্য। দিগ্‌গজ আসমানীর কে? আর "কে" হইলেও এমন বেয়াড়া বেয়াদব রূঢ় রসিকতা দিগ্‌গজের পক্ষেও অমার্জ্জনীয়। নূতন সংস্করণে ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং বঙ্কিম বাবুও সেই পরিবর্ত্তনের এক কৈফিয়ৎ রাজসাহী কলেজের শিক্ষক শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ "এক শ্রেণীর অনুকরণ প্রিয় লেখক, বিদ্যা দিগ্‌গজ চরিত্রের নামে বঙ্গ সাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে। তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত সেই চরিত্রের কোন কোন স্থান নূতন করিতে হইয়াছে।" কৈফিয়ৎ যদি তাঁহার প্রদত্ত হয় তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হয় নাই। পানের পিকে ব্রাহ্মণের গাল ভরিয়া দেওয়ার জন্য যদি কোন লেখক কিছু বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার উপর অনুকরণ প্রিয়তা কথার কশাঘাত কেন? পরবর্ত্তী সংস্করণে দিগ্‌গজ মহাশয়ের অনুণ্ডিত মস্তকে অড়হর দাল ঢালা হইয়াছে। এটীও অনেকের মতে বেশী মাত্রায় ঠাট্টা। Practical joke.

আসমানীর রূপ বর্ণণায় অনেকে বলেন ভারত চন্দ্রের বিদ্যার রূপ বর্ণনার প্রভা কিঞ্চিৎ দেখা যায়। তবে তাহা মনের কথা, হৃদয় ভাবের অভিব্যক্তি, আর ইহা ব্যঙ্গস্তুতি।

শচীশ বাবু বঙ্কিম বাবুর লিখিত "হিন্দুর পূজোৎসবের উৎপত্তি কথা" প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার স্থানে স্থানে দেখিলাম বঙ্কিম বাবু অনেক সামাজিক নিয়মাদির উদ্দেশ্য যেন বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু এতটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কল্পনায় তাঁহাকে পরাজয় করে এমন লোক কয়জন আছেন?

প্রবন্ধ মধ্যে দেখিলাম উৎসবাদিকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুর্গাপূজা নাক্ষত্রিক উৎসব বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। ভাদ্রের সিংহরাশির পর আশ্বিনের কন্যারাশি তাই এই উৎসবের গোড়া বোধ হয় কন্যারাশির পূজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দুর্গা সিংহবাহিনী, আবার কন্যারাশি সিংহের পৃষ্ঠেই আসন সেই সামঞ্জস্যও দেখান হইয়াছে। কিন্তু দুর্গোৎসব দেখা যায় রাবণের প্রবর্ত্তন। শারদীয়ার অকাল বোধনের সৃষ্টি রামচন্দ্রের রাবণবধের আয়োজন। ইহাই সকলের ধারণা, অপর ব্যাখ্যা বড় স্থান পায় না।

আমরা বহুদিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শারদীয় পূজার একটী তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে পুরাণোক্ত বহু উপাখ্যানের ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—উহারা অর্থবাদ, অর্থাৎ বেদের ও তন্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল কাহিনীর আকারে ব্যাখ্যাত, সরলীকৃত। তাহা হইলেও ইহা কাম্য পূজা হইয়া উঠিয়াছে। মাকে ধনং দেহি রূপং দেহি করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি। তাহার উপর ইহার তামসিকতা ভুলিতে পারি না। পূজার ফর্দ্দে সিদ্ধি লিখিবার পূর্ব্বে কোন বাইজির মধুর তানে মন প্রাণ মোহিত হইবে তাহারই বিষয় আগে ভাবি। ইহার কাছে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যখন স্থান পায় না, তখন নাক্ষত্রিক উৎসবের ব্যাখ্যা গৃহীত হইবে কি?

আমার সহধর্ম্মিনী তাঁহার একটী পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করিয়া একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সংসারের সহিত দশভূজার সাদৃশ্য বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

"দশদিকে দশ হাত শত্রু জয়ে রত,
দক্ষিণে কমলা বামে বীণাপাণি রত,
ধন ধান্যে শক্তিরূপে পূর্ণ মমতার
শিরে পতি, গণপতি কার্ত্তিকেয় যার।

মহিষ মর্দ্দিনী, তবু হাস্যময়ী মুখ,
হেরিলে মায়েরে দূরে যায় যত দুঃখ।
হয়ো'মা তেমনি তুমি সংসার প্রাঙ্গণে
ভুলায়ে রেখো মা লক্ষ্মী আসন দক্ষিণে।

সরস্বতী সপ্তরাগে বেদ পাঠ করি
"অহম" ভবের ছায়া লবে পরিহরি।
সিদ্ধিদাতা সর্ব্বকার্য্যে হবেন গণেশ,
সংসারেতে পাবে সুখ অসীম অশেষ।"

তাই বলি ব্যাখ্যার অভাব হয় না। মনের ভাবকে সাধ্যমত ছুটাইতে পারিলে একটা কিছু দাঁড় করাণ যায় বটে, কিন্তু রামের অকাল বোধনে কন্যা রূপিনী মহামায়ার যে অর্চ্চনা হিন্দুর প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছে, মর্ম্মে পশিয়াছে তাহার আর অন্যথাচরণ হইবে না। কল্পনা ত দূরের কথা, বেদ বেদান্ত ভাসিয়া যাইবে। পুরাণ পরাজিত হইবে।

কৃষিকার্য্যগত উৎসবে লক্ষ্মীপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। অসম্ভব নহে। The Religion of the World নামক গ্রন্থে দেখা যায় গ্রীকদিগের মধ্যে নবান্ন উৎসব লক্ষ্মীপূজা কীরিজ (Ceres) প্রভৃতি ছিল। এ সকল প্রথা ভারতবর্ষ হইতে সেখানে যায় বা আর্য্যগণ এই অনার্য্যদেশে আনেন তাহা জানি না।

লক্ষ্মীপূজায় ধান্য দিতে হয়, সরস্বতীপূজায় দোয়াত কলম প্রভৃতি কেন দিতে হয় তাহা বুঝা যায় কিন্তু লেখক বিজয়াদশমীর দিন কেন দেশে সিদ্ধিপানের ব্যবস্থা হইয়াছে তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন। ইহার উত্তরে অনেকে বলেন নবমীর দিন রাবণবধ সম্পন্ন হইবার পর দশমীরদিনে বিজয়ের উৎসব হয়। সে দিন যোদ্ধারা ভাঙ সেবন করিয়া পরস্পরকে কোলাকুলি করিয়াছিলেন। সেই জন্য সে দিন দুর্গতিহারিণী দুর্গা নাম লিখিতে হয়, আর সেই বিজয়ী সেনার অনুকরণে সিদ্ধি পান করিলে সারা বছরটা ভাল যায় বলিয়া লোকের ধারণা। লৌকিক আচারের সৃষ্টি-রহস্য নির্ণয় করা বড় কঠিন। বিবাহের রাত্রে বরের হাতে "যাতু" দিয়া শাশুড়ী বলেন

"কড়ি দিয়ে কিনলুম, দড়ি দিয়ে বাঁধলুম।
হাতে দিলাম যাতু একবার ভ্যা কর তো বাপু॥"

দীনবন্ধু বাবু এই "ভ্যা করা" দেখাইয়াছেন। কলিকাতায় আজিও ব্রাহ্মণদিগের বিবাহে অনেক স্থলে এ প্রথার প্রচলন দেখিতে পাই। ইহার প্রচলন কিসে তাহা কি করিয়া স্থির হইবে? "তবে কার্ত্তিকমাসে এত দীপাবলি কেন?" এ কথার উত্তর দেয়ালী পোকার বিনাশ সাধন ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া মনে হয় না। সত্য সত্যই ঐ সময়ে দেয়ালী পোকায় লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তাই বোধ হয় আকাশ প্রদীপ, আলোপেজো ও দীপান্বিতার সৃষ্টি।

মনসাপূজা বিভীষিকা অপসারকপূজা। এই মনসাপূজা উনানের উপর হয় কেন প্রশ্ন উঠিয়াছে। শীতকালের রাত্রে উনান গরম থাকে বলিয়া সাপ নাকি তাহার মধ্যে কুণ্ডলি পাকাইয়া বসিয়া থাকে। সর্পাঘাত জনিত মৃত্যুর রিপোর্ট দৃষ্টেও তাহা জানা যায়। সেই ভীতি নিবারণের প্রয়াসে বোধ হয় ইহার প্রবর্ত্তন। তাহার পর দশহরার দিনে "বীড়" খাইবার প্রথা আছে। ইহা দশহরার অন্তর্গত প্রথা নহে, মনসাপূজার অন্তর্ভুক্ত। সেইদিন দশনাগ অঙ্কিত করিয়া মনসার পূজা হয়, সেই পূজার পর "বীড়" অর্থাৎ কাঁটালি কলা, কয়মচা উচ্ছে ও কাগজি লেবুর কুঁচা সংযোগে খাইতে হয়। শুনা যায় ঐ সকল দ্রব্য সর্পে স্পর্শ করে না। আর সেই জন্যই বোধ হয় ব্যবহার হয়। উদ্দেশ্য সর্প যাহা স্পর্শ

করে না, তাহা উদরস্থ করিলে ভোক্তা সর্প দংশন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বিষয়।

শচীশ বাবু স্বয়ং লিখিয়াছেন ইহা বঙ্কিম বাবুর বাল্য রচনা সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিব না, কিন্তু উক্ত কথাগুলি সম্বন্ধে "কৃষ্ণ চরিত্র" লেখক বঙ্কিম-চন্দ্রের মতের যে বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

একদিন লক্ষ্মীপূজার উল্লেখে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মীপূজা মাতৃপূজার রূপান্তর। তাঁহার ধ্যানে দেখা যায় তিনি শুদ্ধাচারিণী পবিত্রতা ও সংযমতার আধার। সন্তান পালনে সেই ভাব বর্ত্তমান না থাকিলে প্রসূতির কর্ত্তব্য পালন হয় না। আজকালকার রমণী-দিগের মধ্যে সেই ভাব ও আচারের বিপর্য্যয় হেতু শিশুদিগের দৈহিক ও মানসিক অবনতি সাধিত হইতেছে।

আজকালকার মেয়েছেলেরা সে দায়িত্ব বিবর্জ্জিতা, না হইবে কেন ষষ্ঠিপূজাই যে লোপ পাইতেছে। আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস হীন হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন ৺ভূদেব বাবু ষষ্ঠিদেবীর আখ্যান ও ধ্যান পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছিলেন যে তিনি জগৎসৃষ্টির ষষ্ঠাংশের পালয়িত্রী। ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় জন্য তিনি লোক সংখ্যার তালিকা (Census Report) আনাইয়া দেখেন যে বালকের সংখ্যা প্রকৃতই পূর্ণ সংখ্যার ষষ্ঠাংশ মাত্র। তখন আর তিনি ধৈর্য্য ধরিতে পারেন নাই বালকের ন্যায় রোদন করিয়া বলিয়াছিলেন—""আমরা কি হলাম, অজ্ঞতার প্রভাবে দেশের ধনরত্ন বিসর্জ্জন দিতে বসেছি।"

ইহাতে বঙ্কিম বাবুও নাকি বিচলিত হইয়াছিলেন এবং সেই অবধি তিনি দেবদেবীর স্তব ও উপখ্যানের সহিত সামাজিক ভাবের সমন্বয় এবং সামাজিক কোন বিশিষ্ট প্রথা প্রবর্ত্তনের অর্থ নির্ণয়ে যত্নশীল হইয়াছিলেন। আর সেই গবেষণার বলে অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ের সুন্দর ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দিতেন। আমরা বারান্তরে তদ্‌সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া পাঠকের তৃপ্তি-সাধনে যত্নশীল হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

প্রতীক্ষায়

আমি নিশি দিন বিরাম বিহীন
নয়নের জলে নাহি,
তোমারি আশায় বসে আছি হায়
আশাপথ পানে চাহি।
ওগো নিরাশার আশার প্রদীপ,
ওগো আঁধারের আলো;
বক্ষে আমার লক্ষ ধারায়
তব আলো রাশি ঢালো।
বিশ্ব ভুবনে প্রেমের মিলন
এ যে বিধাতার দান,
তাই বুঝি বাজে তটিনীর মাঝে
মিলন মধুর তান।
তাই বুঝি বঁধু মালতীর আশা
মিটায় ভ্রমর আসি,
কণ্ঠে তাহার মিলনের হার
পড়ায় সোহাগে হাসি।
পুলক মগন ছুটিছে পবন
মিলনের জয় গাহি,
আমি নিশি দিন বিরাম বিহীন
রব কি আশায় চাহি ?

শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণ

[জয়চন্দ্র দাস]

আমরা পদ-কর্ত্তা জয়চন্দ্র দাসের মাত্র ৩টি পদ "পদ-রস-সার" পুঁথিতে পাইয়াছি। এই তিনটি পদই "সুবল মিলন"—বিষয়ক। "পদ-কল্প-তরু" গ্রন্থে "সুবল মিলন" অর্থাৎ সুবল কর্ত্তৃক সুকৌশলে সঙ্কেত-কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সংযোজন বিষয়ে কোন পদ সংগৃহীত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, "সুবল মিলন" বিষয়টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; তাই "পদামৃত সমুদ্র" "পদ-কল্পতরু" প্রভৃতি প্রাচীনতর সংগ্রহে "সুবল মিলন" পালা দেখা যায় না। পদ-কর্ত্তা জয়চন্দ্র দাসের কোন পদও ঐ সকল সংগ্রহে স্থান পায় নাই। এই উভয় কারণেই আমরা জয়চন্দ্রকে পদ-কল্প-তরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস অপেক্ষা পরবর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতকের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত বলিয়া মনে করি। জয়চন্দ্র দাসের সম্বন্ধে আর কোন বিবরণই জানা যায় নাই। আমরা তাঁহার তিনটি পদই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীরাধার বেশধারী সুবলকে গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া শ্রীরাধা সুবলের রাখাল-বেশ ধারণ করিয়া কিরূপে দিবাশেষে কুঞ্জবনে অভিসার করিতেছেন, এবং সঙ্কেত-কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুবলের বেশধারিণী শ্রীরাধার কিরূপ রহস্য করিতেছেন, জয়চন্দ্র দাসের পদ তিনটিতে আমরা উহার একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই।

শ্রীরাগ।

কিবা অপরূপ বেশ ধনী যে সাজিল।
সব বেশ হৈল পয়োধরে দাগা দিল॥
ভাবিতে ভাবিতে ধনী অনুমান করি।
ধবলীর বচ্ছ ধনী লয় কোলে করি॥
ছাপাইয়া পয়োধর বুকের কাঁচলি।
আনন্দে চলিলা রাই মিলিতে মুরারি॥
রাধাকুণ্ড-তীরে আসি দিলা দরশন।
সুবল দেখিয়া শ্যামের চমকিত মন॥
কহরে কহরে সুবল তব কথা শুনি।
কি লাগিয়া নাহি আইল রাধা বিনোদিনী॥
সুবল বোলেন কানাই তোমার ধবলী।
তার পুষ্পবন ভাজি খাইয়াছে কদলী॥
অরুণ নয়ন আর বসন নাহি গায়।
আমাকে দেখিয়া সে যে কুবচন কয়॥
এতেক কহিয়া রাই বৈসে শ্যামের পাশে।
গদগদ-স্বরে কহে জয়চন্দ্র দাসে॥

শ্রীরাগ।

রাধা বড় অভিমানী　শুনিতে নারে তোমার বাণী
　　চুড়ি আইলাম দেখি তার রঙ্গ।
তাহার বচন শুনি　　বুঝিলাম অনুমানে
　　না হবে না হবে তোমা সঙ্গ ॥
শুনিয়া সুবলের কথা　　মরমে পাইয়া ব্যথা
　　কান্দে কানু করিয়া করুণা।
হে দে রে সুবল ভাই　　আমি প্রাণে জীব নাই
　　রাই মোরে করিল বঞ্চনা ॥
শ্রীমতীর কথা শুনি　　ভূমে পড়ে নীলমণি
　　করে বংশী লোটায়ে ধরণী।
কানুর কাতর দেখি　　হাসে ধনী চন্দ্রমুখী
　　প্রকাশিল যেন সৌদামিনী ॥
ছাড়িয়া রাখাল-বেশ　　প্রকাশিলা নিজ বেশ
　　করে ধরি তুলি শ্যাম রায়।
দেখিয়া রাধার মুখ　　আনন্দে ভরিল বুক
　　জয়চন্দ্র দাসে গুণ গায়।

শ্রীরাগ।

উঠ উঠ প্রাণনাথ মুঞি বড় অভাগী।
চরণে রাখহ নাথ এই বর মাগি ॥
তোমা বিনে অনাথিনীর আর কেহ নাই।
অবশেষে পদতলে মোরে দিও ঠাই ॥
তোমার চরণে থাকি হইয়া নূপুর।
চরণ তুলিতে বাজ কর সুমধুর ॥
যোগী আদি মুনি যত চরণ ধিয়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যার অন্ত নাহি পায় ॥
হেন চরণারবিন্দে রাখ প্রাণনাথ।
কোন কালে না ছাড়িহ অনাথিনীর সাথ ॥
এত শুনি আনন্দিত নন্দের নন্দন।
দারিদ্রে পাইল যেন ঘট-ভরা ধন ॥
জয়চন্দ্র দাসে বোলে করি নিবেদন।
তোহ পদতলে যেন থাকি সর্ব্বক্ষণ ॥

জয়চন্দ্র দাস প্রথম পদের প্রথম অংশে শ্রীরাধার ছদ্ম-বেশে অভিসারের বর্ণনা করিতে করিতে সে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম-জনিত বিষাদ ও সেই সুযোগে শ্রীরাধার অপূর্ব্ব রহস্য অবশেষে তাঁহার সকরুণ আত্ম নিবেদনের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। নাট্যকারোচিত এরূপ রসাবতারণায় দক্ষ জয়চন্দ্র যে কেবল সুবল মিলনের এই কয়েকটি পদই লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহার বিলুপ্ত প্রায় অন্যান্য পদ গুলি সময়ে আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি বর্দ্ধন করিবে এরূপ আশা করা যায় না কি? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনের দ্বারা এ সম্বন্ধে সমবেত চেষ্টার সূত্র পাত হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

[জানকীবল্লভ]

আমরা পদকর্ত্তা জানকীবল্লভের একটি মাত্র ব্রজবুলি পদ "পদ-রত্নাকর" পুথিতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কমলাকান্ত দাস বাঙ্গালা ১২১৩ সালে পদ-রত্নাকর নামক পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত করেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে 'কমলাকান্ত' প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। সুতরাং জানকীবল্লভ যে তাঁহার সম-সাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে। আমরা জানকীবল্লভের স্মৃতির একমাত্র নিদর্শন সেই পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

সুহই।

কি কহব নিঠুর মুরারী।
অব কি জীবই বর-নারী ॥ ধ্রু ॥
তুয়া তনু-নেহ-ভুজঙ্গে।
দংশল কোমল অঙ্গে।
ঔখদ পদ নাহি মানে।
তাপা তোহারি ধেয়ানে ॥
শ্যাম দু-আখর মন্ত্র।
তে ধনি ধৈরজ অন্ত ॥
এক আছয়ে প্রতিকারে।
তোহারি পাণি পানিসারে ॥
তুয়া দিঠিসায়ক আশে।
অবহি বহই মৃদু শ্বাসে ॥

শুনইতে মুরছিত কান।
জানকীবল্লভ অগেয়ান॥

বলা বাহুল্য যে, এই পদটি মথুরায় অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দূতীর উক্তি। দূতী বলিতেছেন—"নিঠুর মুরারি! (আর) কি কহিব! নায়িকা শিরোমণি (শ্রীরাধা) কি এখন বাঁচিবে? তোমার (কৃষ্ণ) দেহ ও প্রেম-রূপ সর্পে (অপর অর্থে—তোমার মন্দ-স্নেহ অর্থাৎ ঔদাসীনতা-রূপ সর্পে) তাহার কোমল অঙ্গে দংশন করিয়াছে। (সেই) গদ অর্থাৎ রোগ ঔষধ মানে না; (কেবল) তোমার ধ্যানে তাগা অর্থাৎ সর্পদষ্ট-স্থানের বন্ধন-রজ্জু (হইয়াছে), সর্প-দষ্ট স্থলে তাগা বাঁধিলে বিষ-বেগ কিয়ৎকালের জন্য প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় রোগী জীবিত থাকে—কিন্তু তাগা বাঁধিয়া তখনি বিষ-নিষ্কাশন করা আবশ্যক, নতুবা অধিক কাল পর্য্যন্ত সেই বন্ধন রাখিলে সেই স্থান পচিয়া যাইয়াও রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হইতে পারে; দূতীর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে ও শ্রীরাধার সেইরূপ কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিরহ ব্যথার প্রতিকার হইতে পারে কিন্তু সত্বর তাহার সেই বিরহ অপনীত না হইলে, সেই কৃষ্ণ ধ্যানে তাহার বিরহানল উদ্দীপিত হইয়া তাহাকে ভস্মীভূত করার আশঙ্কা আছে)। (শাস্ত্রে কথিত আছে যে, নাম ও নামী অভিন্ন; সুতরাং শ্যাম নাম তদগত ভাবে জপ করিলেই শ্যামকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—শ্রীরাধা কেন সেরূপ করে না?—এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা খণ্ডন করার জন্য দূতী বলিতেছেন) 'শ্যাম' এই মন্ত্রটি দ্বি-অক্ষর-বিশিষ্ট; তাই শ্রীরাধার ধৈর্য্যের শেষ (হইয়াছে)। দূতীর এই কথার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে সাপের ওঝার মন্ত্র খুব দীর্ঘ ও বিচিত্র হওয়া আবশ্যক; কেন না রোগী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেই মন্ত্রে মনঃসংযোগ করিতে পারায় তাহার যন্ত্রণার লাঘব বোধ হয়; 'শ্যাম' নামে মাত্র দুইটি অক্ষর থাকায়—তাহা উচ্চারণে তিলার্দ্ধও গৌণ হয় না; একই 'শ্যাম' নাম পুনঃ পুনঃ জপ করিলে তাহাতে বৈচিত্র্য না থাকায় মন আকৃষ্ট না। সুতরাং উহাতে শ্রীরাধা কিরূপে ধৈর্য্য রক্ষা করিবে?) কেবল একটি মাত্র (বিষ-হরণের) উপায় আছে;—(উহা) তোমারই শ্রী-হস্তের (স্পর্শ রূপ) 'পানিসার' নামক বিষ-নাশক ক্রিয়া। (যদি বল যে, 'পানিসার' ছাড়া বিষ-নাশের 'দিঠিসার' নামক সহজ ক্রিয়াও ত আছে—তাই বলিতেছেন, 'পানিসার' দূরে থাকুক) তোমার 'দিঠিসার (দৃষ্টিসার)—অর্থাৎ দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি সংযোজন-রূপ (অনায়াস-সাধ্য বিষ-নাশক) ক্রিয়ার আশায়—এখনও (শ্রীরাধার) শ্বাস মৃদু মৃদু বহিতেছে। (দূতীর এই বাক্য) শুনিবা মাত্র কৃষ্ণ মূর্চ্ছিত এবং (পদ-কর্ত্তা) জানকীবল্লভ জ্ঞান-শূন্য হইলেন। ('শুনইতে' ইত্যাদি বাক্যের ধ্বনি এই যে, শ্রীরাধার বিরহ-বিষের এরূপ অসীম ও অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে, উহার প্রসঙ্গে বিষ-বৈদ্য শ্রীকৃষ্ণও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সেবক পদ-কর্ত্তাও অজ্ঞান হইলেন।)

যে জানকীবল্লভের পদে উত্তম-কাব্য-সূচক ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার এরূপ প্রাচুর্য্য রহিয়াছে তিনি কি কেবল এই একটি মাত্র পদই রচনা করিয়া গিয়াছেন? নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এরূপ একজন উৎকৃষ্ট পদ-কর্ত্তার অন্যান্য পদাবলি সংরক্ষণের অভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

অরক্ষণীয়া।

বঙ্গের সমাজ মাঝে বিত্তহীন গৃহে আমি
অভাগিনী অনূঢ়া বালিকা,
বঙ্গের কানন মাঝে স্ফুটনশঙ্কিতা আমি,
হিমানীতে পীড়িতা কলিকা।
ম্লান গৃহ চিন্তাকুল, অন্ধকার শব্দহীন,
নাহি কোন' হাসি ও উৎসব,
মরমে গুমরে ব্যথা তার মাঝে দীনবেশে
ঘুরিতেছি কাতর নীরব।
সাজিতে কি সাধ যায়, কাঁটা সম অঙ্গে বিঁধে
লজ্জায় হইয়া যাই মাটী,
আমার যা নাই তাও ভুলায়ে দেখাতে হবে
ঝুঁটা দিয়ে ঢেকে রাখি খাঁটী।
উচ্চ হাসি থেমে আসে চলে নাক ছুটাছুটি
ধীর হলো চপল চরণ,
লয়ে কি পুতুল খেলা অবুঝের ভাণ করি
রাখা যায় বালিকা ধরণ ?
কেমনে হইব ছোট হাতের বাহিরে যাহা,
কুঁজা হয়ে চলা ছাড়া আর,
কঠিন প্রয়াসে করি প্রকৃতির গতিরোধ
জীবনের প্রবাহ-বিস্তার।
বিত্তহীন বঙ্গ গৃহে গলগ্রহ তার সব
আমি হায় অনূঢ়া বালিকা,
পড়ে গৃহে হাহাকার এসংসার ছারেখার
লভি মোর যৌতুক তালিকা।
নূতন আসিলে পত্র কাঁপে বুক দুরু দুরু
আবার কি নব বজ্রপাত।
লুকায়ে লুকায়ে দেখি পিতা করে রাখে শির
মাতা ভালে করে করাঘাত।
পিতা কষ্টে অশ্রু বাঁধে মাতা সে লুকায়ে কাঁদে
চোখে মুখে সবি জেগে রয়।
স্তব্ধ রহি ভাইবোন ভাবে আসিতেছে কোন্
অজানিত কেমন সে ভয়।
মোর পানে চেয়ে চেয়ে সবার শুকায় বুক
অলক্ষ্মী পিশাচী যেন আমি
পাছে আমি পাই ব্যথা অকারণ করে কৃপা
আরো ব্যথা আসে তায় নামি।
দীর্ঘশ্বাস ফেলি যবে তাও ফেলি চাপি চাপি
গোপনে ভিজাই উপাধান
পাষাণের ভারতলে তৃণের মতন বাঁচি
ফুকারি কাঁদিলে বাঁচে প্রাণ।
বিমনা হইয়া শুধু করিয়ে কাজের ভুল
ইচ্ছায় করি না অপরাধ,
শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে কি দশা হইবে মোর
জননীর সে এক প্রমাদ।
প্রাণটুকু ক্ষুদ্র বটে ব্যথা অনুভূতি তাহে
অল্প নহে বিপুল বিশাল
আছে চিতে ক্ষুধা তৃষা অন্য সকলেরি মত,
আমরাও প্রেমের কাঙ্গাল।
যে জন অরক্ষণীয়া রক্ষা করে তারে তবে
কিবা ফল হবে ফলোদয় ?
তার চেয়ে ভাল ওগো সব জ্বালা জুড়াবার
অন্ধকার কৃতান্ত নিলয়।

শ্রীকালিদাস রায়

মুসলমান কবির বৈষ্ণব পদাবলী।

প্রেম জিনিসটা হৃদয়ের বস্তু। অনুভূতি তার হৃদয়ে। বুকের মাঝখানে যেখানে প্রাণের আসন, প্রেমের সিংহাসন সেখানেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে থাকিয়াই প্রেম জগতের প্রাণ লইয়া লুকোচুরি খেলে। প্রাণে প্রাণে প্রেমিকতার অনুভব করে, কিন্তু চক্ষে দেখিতে পারে না। এ প্রেম একবার লায়লীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মজনুকে মজাইয়াছিল, সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, পুলকিত হই, মুগ্ধ হই। সে প্রেম-সমুদ্র অগাধ অতলস্পর্শ বটে, কিন্তু সে সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, তরঙ্গের বিক্ষোভ নাই, পবন-জাত চাঞ্চল্য নাই, বীচিমালার লীলাখেলা নাই, তাহা কেবলই কূলহীন, সীমাহীন অনন্ত বিস্তার প্রশান্ত অম্বুরাশির পর অম্বুরাশির সমষ্টি। আর একবার—জগতে কেবল সেই একবার মাত্র প্রেম সাকার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সে প্রেম রাধাকৃষ্ণের। জগতে এমনটি কখন হয় নাই, এমনটি আর কখন হইবে না। ভারতে যুগে যুগে এ প্রেমের কাহিনী গীত হইয়া আসিতেছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আবির্ভূত হইয়া একদিন বঙ্গদেশে এ প্রেমের যে তুফান ছুটাইয়াছিলেন, সে তুফানে বাঙ্গালীর হৃদয়-তরী একবারে বানচাল হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে পড়িয়া বাঙ্গালী কবিগণের কোমল হৃদয় কিরূপ বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্য জগতে চিরদিন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। জয়দেবের বীণাঝঙ্কার থামিতে না থামিতে চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাসের পর জ্ঞানদাস, এরূপ এক কবির পর আর এক কবি সে বীণার সুরে সুর মিলাইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতিতে জগৎ বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কত কবি কতভাবে এ প্রেমের গান গাহিয়াছেন, তথাপি এ গান নিত্যই নূতন। কত চিত্রকর কত রকমে এ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তথাপি এ চিত্রের সৌন্দর্য্য চির বর্দ্ধমান। এ প্রেমের তুলনা এ প্রেম ভিন্ন জগতে আর একটি নাই। এ প্রেম কিরূপ, ভাষায় তাহার অভিব্যক্তি অসম্ভব।

কহএ শেখর বন্ধুর পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে।

এপ্রেমের স্বরূপ কতটা এরূপ বটে, কিন্তু ঠিক এরূপ নয়।

জনমে জনমে হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তবু হিয় জুড়ন না গেল।

ইহাতেও যেন এ প্রেমের কিছুই বুঝা গেল না।

এদেশে বসতি নৈল হব বনবাসী।
কালা নীল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥

তবেই বুঝা গেল, এ প্রেমের জন্য শুধু জাতিকুল-শীলে জলাঞ্জলি দিলে হয় না, ইহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, অসংখ্য হিন্দু কবির সঙ্গে মুসলমান কবিগণ পর্য্যন্ত এ প্রেমপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন। এ প্রেমের মোহ-মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতি গাহিয়া জগতে ইহার অপূর্ব্বত্ব সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। আজ মুসলমান কবিগণের সেরূপ কয়েকটি গান আমরা পাঠকবর্গকে শুনাইব।

এ পর্য্যন্ত এ দীন লেখকের চেষ্টায় ৪০ জনেরও অধিক প্রাচীন মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী লেখক আবিষ্কৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের পদাবলী সময়ে সময়ে বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় আমার নিকট হইতে পদগুলি সংগ্রহ করিয়া নিয়া কয়েকবৎসর পূর্ব্বে "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামে ৫ম খণ্ডে তাঁহাদের একটা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এস্থলে আজ যে কয় জনের পদাবলী প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের নাম এই:—১। তুফাজদিন, ২। আইনদ্দিন, ৩। মনোয়ার ৪। আহাওদ্দিন, ৫। মীর কয়জুল্লা, ৬। ফতেখান, ৭। মোহাম্মদ রহমান, ৮। সিরতাজ, ৯। মীর্জাকাঙ্গালীও ১০।

মোহনতাজ। ইঁহাদের মধ্যে আইনদ্দিন, মনোয়ার, মীর ফয়জুল্লা ও মীর্জ্জা কাঙ্গালীর নাম নূতন নহে— তাঁহাদের রচিত আরও পদ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ছয়জন কবির নাম এই প্রথম মাত্র জানা গেল।

বলা বাহুল্য, কোন কবিরই কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই পদগুলি ভিন্ন বাঙ্গালায় ইঁহাদের রচিত কোন গ্রন্থ ছিল কি না, বলা যায় না; থাকিলেও তাহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত 'রাগমালা' নামক একখানি প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থে এই সকল পদ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, এই কবিগণ অন্ততঃ দুইশত বৎসরের ঊর্দ্ধকালের লোক হইবেন এবং তাঁহারা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সেখ ফয়জুল্লা নামক এক কবির রচিত "গোরক্ষ-বিজয়" নামক একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। সেই কবির নামের পূর্ব্বেও এক স্থলে 'মীর' উপাধির সংযোগ দেখা যায় বটে, কিন্তু তথাপি নানা কারণে আমরা ইঁহাদিগকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করি। সে সমস্ত কথা এখানে বলা আবশ্যক।

কবি আইনদ্দিন সাহ আকবর নামক কোন মহাত্মার পদ-চুম্বন করিয়াছেন, দেখা যায়। তাহা দ্বারা বুঝা যায়, ঐ মহাত্মা তাঁহার গুরু ছিলেন। 'সাহ' সাধারণতঃ মুসলমান ফকিরগণের উপাধি। সম্ভবতঃ সাহ আকবরও একজন ফকির ছিলেন।

আবার আছাওদ্দিন ও মনোয়ার-রচিত দুইটি পদে দেখা যায়, কবি আইনদ্দিনেরও 'সাহ' খ্যাতি ছিল এবং তিনি তাঁহাদের গুরু ছিলেন। এতদ্দ্বারা এই তিনজন কবির সমসাময়িকতাই সূচিত হইতেছে।

কবি কতেখান ইব্রাহিমখান নামক এক মহাত্মার নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি এবং ইব্রাহিমখানই বা কে, জানিবার কোন উপায় দেখি না। তবে কতেখানের পীরের (গুরুর) নাম যে মীর সাহ সুলতান, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সৈয়দ সুলতান নামক এক কবির রচিত অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ ও ফকিরী গান পাওয়া গিয়াছে। এই দুই সুলতান অভিন্ন ব্যক্তি কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

অবশিষ্ট কবিগণ সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না।

পদগুলি যেমন পাওয়া গিয়াছে, প্রায় তেমনই প্রকাশ করা গেল। বর্ণবিন্যাসপদ্ধতিতে আধুনিক হিসাবে সংশোধন করিতে গেলে ভাষাতত্ত্বের অত্যাবশ্যক উপাদানরাজি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিজ্ঞ-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, রচনায় সৌন্দর্য্য ও লালিত্য প্রদর্শনই প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক, এরূপ সংশোধন ব্যতীতও পদগুলির রস-বোধে পাঠকগণের কোন ব্যাঘাত হইবে মনে হয় না; যথাঃ—

(১)

সাত গাঁইআ ভাঙ্গা ছুহি রাগ।

শুন মাই রে কাহে লাগি এ প্রেম বারাইলা ১।
ঘরি ২ এক বুলি বন্ধু গেলা
মোর নখে কথ জুগ ৩ ভেলা॥ ধুআ।
চান্দ চন্দনে ন জুরাএ ৪।
পিআ বিনে মোর মন (ন ?) ভাএ ৫।
এ খেলা ৬ মন্দিরে বসি জাগি।
পিআ বিনে মোর মন (মনে ?) আগি ৭।
কহে তুফানদ্দিন এহি মানসে।
পাইবা রসবতি মানসে॥

১। বাড়াইলা।
২। ঘড়ি।
৩। যুগ।
৪। জুড়ায়।
৫। (ন ?) ভাএ—(কিছু) ভাল লাগে না।
৬। একলা, একাকী।
৭। অগ্নি। প্রিয় বিনে আমার মনে আগুন জলিতেছে।

(২)

ধানশী গুঞ্জরী।

বিনোদিআ জলদ বরণ কালা গ (গো) সই ১। ধু।
আপন মঅনে কভু নহি দেখি
জলদ বরণ কালা গ সই।
চূড্যাটি বানাইআ বাম অঙ্গে টালিআ
তাত শোভে মালতীর মালা গ সই॥
হাটিআ জাইতে নপূর বাজএ
কেলি কদম্বেরি তলে গ সই।
কহে আএ নদিনে কেলি অনুক্ষণ।
সাহা আকবর পদে করিআ চুম্বন॥

১। মূলে ‘জলদ’ স্থলে ‘জলধ’ ও ‘সই’ স্থলে ‘সৈ’ আছে।

(৩)

বরাড়ি।

আজু লো পহু দেখিআ আনন্দ চিত।
কমল নআন অমল বআন
জেহেন চান্দ রিত॥ ধু।
এঘোর মন্দির উজল করিল
অনন্ত আনন্দ ভেল।
পিআ দরশনে জথ দুঃখ মনে
ধন্দ হই চলি গেল॥
বহুদিনে নিধি আনি দিল বিধি
আনন্দ কি উপাম।
চিত্ত পুলকিত তনু উল্লাসিত
হরি (হেরি ?) পহু গুণধাম।
সাহা আএ নদিন ছোঁ পহু প্রবিন
দেখি আনন্দ পরাণ।
হীন মনোজর মাগে জুড়ি কর
মোকে দেঅ দআ দান॥

(৪)

বরাড়ি।

গোকুল আজু আনন্দ অধিক ভেল।
বহু আরাধনে শ্যাম দরশনে
দুঃখ দশা দূরে গেল॥ ধুআ।
আজু হোন্তে অথি গোকুলে বসতি
আকুল ব্যাকুল ছিল।
পহু আগমনে হরিস বাজনে
আনন্দিত হই গেল॥
সবহি গোকুল উৎসব মঙ্গল
ঝুম ঝুম শব্দ উল্লাস।
জঅ জঅ রোল আনন্দ উল্লোল
দশ দিশ হইল উকাস॥
আছদিন কহব এ সব উৎসব
রাখ ২ প্রভু চিরদিন।
মন মনোরথ হইল পূর্ণিত
সহাএ (সহায়) সাহা আএ নদিন॥

(৫)

তুরি গুঞ্জরী।

রাই রাই কর অবধান।
তুআ ভাবে আকুল রসময় কান॥ ধু।
কালিন্দীর তীরে বসি নিরক্ষিএ তোক্ষা।
রসের আবেস হৈআ সদাএ আছি আক্ষা॥
তোক্ষা ন দেখিআ শ্যামে হাতের বাঁশী ফেলে।
ভূমিতে পড়িআ বাঁশী রাধা রাধা বোলে॥
খেনে হাসি খেনে বাঁশী খেনে পড়ি জাএ।
অধরে মুরলি থুইআ তুআ গুণ গাহে॥
মীর ফএজুল্লা কহে রসবতী রাই।
রসের পাসার লৈআ ভেটসি' কানাই॥

(৬)

রাগ—কহ্নু।

প্রাণ সই কি কহব হামো হতভাগী।
দুঃসহ মদন সরে দহে মোর (মোরে ?) নিরন্তরে
উঠি বসি নিশি রহো জাগি ॥ ধু।
বসন্ত খরিএ ১ গেল পাউকের রিত ২ ভেল
এবেহ ন আইসে পীউ মেরা।
ঘন ঘন গরজন বিজুলি চমকে ঘন
দশ দিশ বহে ঘন ধারা ॥
কুলিস দাদুরি নাদ পাপী অতি পরমাদ
কুসুম পরসে তনু কাম্পে।
মৃগমদ সৌরভ চন্দন পরিমল
পিআ বিনে সকলি সন্তাপে ॥
কিএ বিধি ভেল বাম পিআ গেল দূর ঠাম
তনু সে জৌবন গেল ভারা।
জদি সে না মিলে পিউ আনলে তেজিমু জিউ
পিআ বিনে সব আন্ধিআরা ৩ ॥
কহে ফতে খানে সখি উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুত এব্রাহিম খান।
ভব কলপ তরু জানহ আন্ধার
পির মির সাহা ছুলতান ॥

(৭)

রাগোঝা ভাটিআল।

ওকি অপরূপ পেখিলুং বিপিন মাঝে।
জার জথ হিত চিত প্রকাশিত
সাকল নআন সাজে ॥ ধু।
কতুক কারণে গেলু বৃন্দাবনে
দেখিতে ছো বন্ধু ঠাম।
× × ×

কুঞ্জ নিকুঞ্জ বনে অলিকুল গুঞ্জরে
মধু পিএ রঙ্গে আর ঢঙ্গে।
মল্লিক ই মুখ (?) হেরি পহু মুখ
হাসি বিকাশিত সঙ্গে ॥
নানা পক্ষী রবে সুধারস গাবে
পিআগুণ অনুপাম।
পিধ্বনি ধিক চাতক খাতক
পিউ পিউ জপে নাম ॥
কহে মোহাম্মদ রহেমান সম্পদ
প্রভুপদে করহো ভকতি।
ও রাঙ্গা চরণে লইলুম সরণে
মরণে তরিতে গতি ॥

(৮)

ছুহি সিন্ধুড়া।

সই সই কহিতে খাঁখায় পিআর বেভার
শুন প্রাণ সইরে। ধু।
সই সই কি মোর রান্ধন কি মোর বান্ধন
কি মোর হলদি বাটা।
মনের আগুনে বনেত জাইমু
রাখিমু সোআমীর খোঁটা।
সই সই গাছে ধরে ফল নারাঙ্গি কমল
বাদুরে চুসিআ খাএ।
আন্ধার সোআমী হালিআ[১] গোঁআর
শুতিলে সে নিদ্রা জাএ।
সই সই জাহার সোআমী রসিআ নাগর
সে নারীর কিসের দুঃখ।
দিনের পাপখানি দিনেত খণ্ডাইব
দেখিআ সে চান্দ মুখ ॥
সই সই বাপ না মাএরে কি দোষ দিমুরে
কুল চাহি দিল বিহা।
হাতে হাত ধরি গলাএ বান্ধি হরি
সাগরে ডুবাইল নিআ।

১। খরিএ—খরান বা গ্রীষ্মকাল।
২। পাউক—বর্ষা; রিত—ঋতু।
৩। অন্ধকার।

১। হালিআ—হলকর্ষণকারী কৃষক; মূর্খ।

সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী।
ঘরের সোআমী হাসিআ না বোলাএ
মুঞি অপরাধী ছুসি (দোষী)।
সই সই ন জানি কি দোষে প্রিআ মোরে রোসে
নিদআ হৃদএ পিউ।
কহে সিরতাজে সোআমী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জিউ॥

(৯)

নট সিন্ধুরা।

কালিআ নাচেরে রমণী সমাজে। তাল। ধু।
মৃদঙ্গ বাজেরে তাথৈ বাজে করতাল।
সহস্র গোপিনী মাঝে কানু নাচে ভাল॥
করেত কঙ্কণ সোভে কটিতে কিঙ্কিণী।
চরণে নেপুর বাজে রুণুঝুনু শুনি॥
নাচে আর গাহে কালা রমণী সমাজে॥
রবউপং বেণু-বাঁশী মধুর গাজে॥ তাল।
মির্জ্জা কাঙ্গালী ভণে দেখহ চরিত।
তারা সব সঙ্গে চান্দ নাচএ ভূষিত॥ তাল।

(১০)

রাগ—গান্ধার।

আলরে পরাণের সইরে নিঠুর কালারে
মানাইআ মোরে দে। ধু।
এথেক প্রকারে সেবিলু কালারে
জৌবন ধন দিআ দান।
নিঠুর কালা বর এবে না ভেল মোর
দৈবে সে তেজিমু প্রাণ॥
জাতিকুল ছিল সব তেআগিল
ভবেহো মোরে বিমতি।
নিঠুর কালা বিনে আর না লএ মনে
ন জানি কি দৈব গতি॥

মোর নিবেদন শুন সখীগণ
কহিঅ বন্ধুর আগে।
দরসন দিতে শ্যাম কেনে বা হইব বাম
দেখিতে কথেক ধন লাগে॥
মির্জ্জা কাঙ্গালী ভণে কেনে দুঃখ ভাব মনে
তোরে নাহি শ্যামের মন।
পরের পিরীতি খানি ভাটি না জোআরের পাণি
জানিলুং নিসির স্বপন॥

(১১)

রাগ—গান্ধার।

কাণি না কর গুমান শুন [১] ধনি।
যৌবন রূপ ধন না রৈবে নিদানি॥ ধু।
আক্ষার বচন তোক্ষা ন সাধিনা কাল।
অক্ষর গেলে পাছে ঠেকিব জঞ্জাল॥
না হকে বুঝল সখী তোক্ষা নাহি জ্যান (জ্ঞান)
আসিতে জাইতে আসে নিশি শেষ বেআন॥
কহে মছনতাজ সখী শুন দিআ কান।
সুপুরুষের বোল কভু ন টানিবে জান॥

পদগুলির সৌন্দর্য্য ও ভাষা সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিলাম না। রসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। এখানে একটি অবান্তর কথা বলিব। অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়, কয়েকজন মুসলমান দুর্বুদ্ধির বশে বাঙ্গালা ভাষাকে নিজের মাতৃভাষা ও জাতীয়ভাষা বলিয়া স্বীকার না করিয়া উর্দ্দু ভাষাকেই আপনাদের মাতৃ-ভাষার ও জাতীয় ভাষারস্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ কিন্তু বিফল প্রয়াস করিতেছেন এ সকল প্রাচীন রচনা দেখিয়া তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, মুসলমানগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই বাঙ্গালা ভাষাকেই আপনাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার গৌরবান্বিত পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের যুগযুগান্তরের অনুসৃত পন্থা পরিহার করিয়া এখন যদি অন্যপথ অবলম্বন

[১] 'শুন' স্থলে 'চল' ও পড়া যায়।

করা যায়, তাহা হইলে লাভের মধ্যে আমাদের উভয় কুলই নষ্ট হইবে। ফলে ও যে তাহাই ঘটিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। যাহারা খঞ্জনের নাচ ও কাকের নাচ—যুগপৎ দুই নাচই শিখিতে চাহে, কোন নাচই শিখিতে পারে না, ইহা খাঁটি সত্য কথা। ফলে পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে দগ্ধ রম্ভাই ঘটিয়া থাকে। আমার মোহান্ধ ভ্রাতৃগণের ভাগ্যেও যে অবশেষে তাহাই ঘটিবে, তাহা বলিতে কোন ভবিষ্যদ্বক্তার দরকার আছে বলিয়া মনে হয় না। এখনও সময় আছে, এখনও সুবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

আব্দুল করিম

"অস্ফুট।"

অস্ফুট মৃদুল হাস্যে মুগ্ধ হয় মন প্রাণ,
শিশুর অস্ফুট বোলে কি সঙ্গীত মূর্ত্তিমান!
কবির অস্ফুট কাব্য পশিয়া হৃদয় পুরে,
অপূর্ব্ব অব্যক্ত রসে হৃদিমন পূর্ণ করে।
গীতের অস্ফুট রেশে কি জানি কি থাকে টান,
অনন্তের মাঝখানে মিলাইতে চাহে প্রাণ।
প্রিয়ের অস্ফুট স্মৃতি পূর্ণ করি চারিধার,
সৃজে এ মরত মাঝে নন্দনের শোভাসার।
বিশ্বের অস্ফুট খেলা যাহা দেখি সমুদয়—
মধুকোষ সম তাহা—চিরন্তন মধুময়।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

বাগ্মীর বিপদ।

(গল্প)

(১)

হারাধন বাবুর বাগ্মী বলিয়া জনসমাজে, বিশেষতঃ বন্ধুমহলে বেশ একটু নাম ছিল। প্রকাণ্ড সভায় উচুগলায় লম্বা বক্তৃতা করিয়া, খবরের কাগজের সম্পাদক-বর্গের অনুকম্পায় অল্পদিনেই তিনি বেশ একটু সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং একজন ছোটখাট 'জননায়ক' বলিয়া আশ-পাশে পরিচিত হইয়াছিলেন। কালে একজন সুরেন বাড়ুয্যে বা বিপিন পাল হইবার অদম্য পিপাসা তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল, এবং তিনি নিজের ঘরের দোর-জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া, সুবৃহৎ আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া তাঁদের বক্তৃতার ভঙ্গীটুকু হুবহু আয়ত্ব করিবার প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার বক্তৃতা করিবার একটু ক্ষমতা ও জন্মিল।

কিন্তু কালের স্রোতে সে দিন ভাসিয়া গেল। তিনিও নানাকারণে সে সব ছাড়িয়া, ভাল মানুষটি সাজিয়া ঘরে বসিলেন, ঘরের অনেক ছবি ও বহি সহসা গোপনে হুতাশনদেবকে উপহার প্রদান করিলেন। সম্প্রতি কোনও বন্ধু অতীতের সে সব কাহিনী তুলিলে গৃধিনী-চঞ্চুতুল্যনাসা কুঞ্চিত করিয়া বলেন "আরে ছ্যা ছ্যা ও সব হুজুগ আবার ভদ্রলোকে করে! কতকগুলো দূরদৃষ্টিহীন, হুজুগে লোক মিলে কি অকীর্ত্তি কুকীর্ত্তিটাই না কল্লে! ছ্যা! ছ্যা! তখনি দু হাত তুলে বারণ করেছি বাবু ও সব ক'রোনা, ক'রোনা ভাল হ'বে না, কিন্তু ওদেরত গিয়ে, ওর নাম কি, সুখে থাক্‌তে ভূতে কীলোয় —শুন্‌লে না আমার কথা,—এখন ?............আর ওর নাম কি গিয়ে মাতৃসেবা?............"কিন্তু ১৯০৫ সনের সংবাদপত্র গুলি সংগ্রহ করিয়া হারাধন বাবুর বক্তৃতার অংশ একত্র করিলে এখনও——যাক সে কথা। হারাধনবাবু এখন আর ১৯০৫ সনের হারাধন মিত্র নহেন; তাহার পরিধানে মোটা কাপড় আর নাই. এখন মেকেঞ্জীর তাহার পরিচ্ছদ সাপ্লাই করেন; এসেন্স

সাবান, জুতা ইত্যাদিও লবণাম্বুরাশির ওপারস্থিত শ্বেতদ্বীপ হইতে তাঁহার গৃহে আনীত হয়।

[কেন এবং কিরূপে তাহা ঠিক বলিতে পারি না]

... ...

দেশনায়ক হইয়া দশের কাছে যশোপার্জ্জনের লোভটা হারাধনবাবু কস্মিন্‌কালেও স্মরণ করিতে পারেন নাই। এখন মুখ বুজিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ঘরে বসিয়া থাকাটা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বোধ হইল; দেশে এমন কোনও ঘটনাও নাই যাহা লইয়া একটা হুজুগ করা যায়। সৌভাগ্য ক্রমে ইতিমধ্যে বালিকা স্নেহলতা বঙ্গের নির্ম্মম প্রথার জর্জ্জরিত হইয়া আগুণে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিল;—অমনি হারাধনবাবু লাফাইয়া উঠিলেন। মহতীসভায় করুণ ও ওজস্বিনী ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া দিলেন, এবং সভায় অনেক পুত্রের পিতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন—কসাইর মত তাহারা দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তিকে নিংড়াইয়া পণ লইতে পারিবেন না। ব্রুটাসের মত বক্তৃতা করিয়া লোকের সহানুভূতি উদ্রেক করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল অসাধারণ; তাহার করুণ বক্তৃতায় অনেকের বুকই সমবেদনায় আকুল হইয়া উঠিল, এবং অনেক যুবক সভাস্থলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল নিজ নিজ বিবাহে তাহারা শ্বশুর হইতে এককপর্দ্দকও গ্রহণ করিবে না।

অল্পদিনে মধ্যাহ্ন তপনের রশ্মির মত তাহার যশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, সকলে আলোচনা করিতে লাগিল হারাধন বাবু কত বড় বক্তা, কী দেশহিতৈষী, কী তাঁর প্রাণ!

সংবাদ পত্রে, মাসিক পত্রে তাহার বক্তৃতাগুলি ছাপার হরপে বাহির হইল, তাহার নানা আকারের রংএর প্রতিকৃতি ছাপা হইল, এবং অনেক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতামাতা তাহার ছবি দেবতাজ্ঞানে পুষ্পমাল্য ভূষিত করিয়া গৃহে সজ্জিত করিয়া রাখিল।

দেশবিদেশ হইতে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাহাকে প্রীতিসম্ভাষণ সূচক পত্র দিতে লাগিলেন, এবং নানাস্থানে বক্তৃতা করিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল।

বাগ্মী হারাধন বাবু দেশে এক নূতন ভাবের স্রোত বহাইলেন; কোনও কোনও ভক্ত যুবক এমন কথাও প্রচার করিল যে 'হারাধনবাবু মানুষ নন, অবতার।' হারাধনবাবু সে সব শুনিয়া বলিতেন "আঃ ছেলেগুলো জ্বালাতন কল্লে দেখ্‌চি। যতই আত্মগোপন করে থাকতে চাই ততই ওরা টেনে হিচ্‌ড়ে দশের কাছে দাঁড় করে দেয়।" কিন্তু মনে মনে তিনি যে খুসী হন নাই এমন কথা হলপ করিয়া বলিতে পারি না।

(২)

শোনা যায় সময় সময় কণ্ঠভূষণ ও নাকি সাপ হইয়া দংশন করে। ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণ করিবার উপযোগী উদাহরণ দর্শাইতে সক্ষম না হইলেও এটুকু বলিতে পারি বাগ্মী হারাধন মিত্রির অদৃষ্টে অনেকটা সেরূপ হইয়াছিল।

বক্তৃতা করিয়া তিনি কাম্য বস্তু অর্থাৎ 'নাম' অর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাহাকে এমন একটী ক্ষতি সহিতে হইল যাহা উক্তরূপ শতকোটি লাভে ও পরিপূরণ হয় না। ব্যাপারটা ভাঙ্গিয়াই বলি।

সুচতুর হারাধনবাবু নানা উপায়ে বিএ পাশ পুত্র প্রাণধনকে ডেপুটী করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাহার বিবাহ দেন নাই। কারণগুলি যে কি তাহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য কহিতে হয়, এবং হারাধনবাবুর অন্ধ ভক্তদল হয়ত আস্তিন গুটাইয়া—তবে পাঠক যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করেন তাহা হইলে ব্যাপারটা বলি। খাঁটি দেশ ভক্ত ও সমাজ হিতৈষীর সংখ্যা বড়ই কম। নীচ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কেহ কেহ দেশ ভক্তের ছদ্ম আবরণ পরে, হারাধনবাবু সেই শ্রেণীভুক্ত। দুনিয়ার যশ ও অর্থকে তিনি যত ভালবাসিতেন বোধ হয় নব্য যুবকেরা ও যুবতী প্রণয়িনীকে ততটা ভালবাসে না। হারাধন বাবুর দুটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। তিনি খতাইয়া দেখিয়াছিলেন দুটি মেয়ে পার করিতে অন্ততঃ পনরটি হাজার টাকার প্রয়োজন। পণপ্রথার বিরুদ্ধে একটু আন্দোলন করিয়া যদি বিনাপণে মেয়ে দুটাকে পার

করা যায় তাহা হইলে অনেকগুলি টাকা সিন্দুকে থাকিয়া যায়; আর এরূপ আন্দোলনে 'রথদেখা কলাবেচা' দুই-ই হয়।·········অবশ্য তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যাবলী হইতে।

হারাধনবাবু গলার শিরা ফুলাইয়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়িয়া কন্যাদুটি বিনাপণে পাত্রস্থ করিলেন, কিন্তু পুত্রের করে কন্যাদান করিবার জন্য পঙ্গপালের মত লোক যখন তাহার দ্বারস্থ হইল তখন তিনি চক্ষু বুজিয়া ভাবিয়া দেখিলেন নীলামের দরে ছেলের দাম চড়াইবার এইত উপযুক্ত সুযোগ। বিয়ের হাটে—যেখানে গোমূর্খ ছেলের দাম ও হাজারটি টাকা—সেখানে বিএ পাশ ডেপুটী ছেলের দাম জলের দাম হইলেও বিশটি হাজার হওয়া উচিত। কিন্তু বক্তৃতা করিয়া সমাজহিতৈষী নামে পরিচিত হইয়াইত তিনি মুস্কিলে পড়িয়াছেন, যত লোক আসে সকলেই বলে 'এইত খাঁটি লোকের কাজ। বিনাপণে ডেপুটী ছেলের বিয়ে দিবেন, তেমন বুকের পাটা না হলে কি কেউ পারে?' ইত্যাদি।

হারাধন বাবুর মুখের সঙ্গে বুকও শুকাইয়া গেল, ছাই নামের জন্য বিশ হাজারের মায়া ছাড়িতে হইবে!

ক'দিন ক্রমাগত ভাবিয়া ২ তাহার শরীর আধখানা হইয়া গেল। আহার কমিয়া গেল, ডিস্‌পেপসিয়া দেখা দিল। এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত? তুলাদণ্ডের একদিকে যশ অন্যদিকে অর্থ রাখিয়া মাসাধিককাল মাপিয়া দেখিলেন—অর্থের ওজনই বেশী। নাম ধুইয়া কি লোকে জল খায়, না হয় দুদিন লোকে বলিবে—লোকটা মনে মুখে এক নয়। না হয় অসাক্ষাতে কতকথা বলিবে, তা অসাক্ষাতে রাজার মাকেও্ত লোকে ডাইনী বলে, তাতে বয়েই যায়। দুত্তোর নাম, দুত্তোর যশ,—টাকা—দুনিয়ায় টাকাই সবচেয়ে বড়, টাকা থাক্‌লে দুনিয়ার সবাই খোসামুদী করে।

(৩)

অবশেষে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া হারাধন মিত্র সকলকে বলিলেন—"আপনারা জানেন আমার পুত্র বিএ পাশ ডেপুটী গুণে সরস্বতী, রূপে কার্ত্তিক, এরূপ ছেলে লাখে একটা মিলে না।" কন্যাদায়গ্রস্থ লোকেরা তাহার গৃহে ভীড় করিয়াছিল।

সমাগত লোকেরা বলিলেন "হাঁ তা জেনেই ত আগ্রহ করে এসেছি।"

হারাধন মিত্র ঢোক গিলিয়া বলিলেন "নিজ নিজ বুঝে এসেছেন ত?"

সমাগত ভদ্রলোকেরা বিস্মিত হইয়া বলিলেন "ওজন আর কি বুঝব মশায়? আপনি দেশ হিতৈষী, সমাজ হিতৈষী লোক, কিন্তু পুত্র আপনার একটী সবাইকে ত আর তুষ্ট কত্তে পার্ব্বেন না, এরই ভেতর যে মেয়েটি পছন্দ হয় নিন।"

হারাধন মিত্র মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন—"হাঁ, নির্ম্মম পণপ্রথা যাতে দেশ থেকে উঠে যায় সে বিষয়ে শিক্ষিত মাত্রেরই বিধিমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তি হ'তে টাকা নিংড়ে নেওয়ার মত পাপ আর নেই,—আমি তা কর্ব্ব না, তাই বলি আপনাদের ভিতর যারা গরীব তারা অন্য পাত্রের সন্ধান করুন।"

ভদ্রলোকেরা বলিল "মশায়, ছেলের বৌ আন্‌বেন তাতে বেয়ায়ের অবস্থা দেখে কি হবে? মেয়েটী বিদুষী, সুশ্রী কি না দেখ্‌তে পারেন, গরীব বড় লোকের প্রসঙ্গ তুল্‌ছেন কেন?"

হারাধনবাবু। "না, না, হাঁ, বুঝ্‌লেন কি না আমার পুত্রটার এই কেমন একটু ঝোঁক, সে বড়লোক পছন্দ করে, এই তাই—"

১ম ভদ্রলোক। "এই কি শিক্ষিত যুবকের উপযুক্ত কথা? বড় ছোট কি টাকায় হয় না স্বভাবে, আচরণে হয়?"

২য় ভদ্রলোক। "না, প্রাণধনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব, আমি জানি সে উচ্চহৃদয়, গরীবকে খুব পছন্দ করে।"

হারাধনবাবু। "হা তা তবে বোধ হয় আমার বুঝবার ভুল। ওর মাম কি জান্‌লেন কুসুমপুরের জমিদার বড় ধরে পড়েছেন, তাই তাই—"

৩য় ভদ্রলোক। "আমরাও ধরে পড়েছি। আমরা গরীব আপনার মত উচু অন্তঃকরণের লোকের কাছে বেশী সহানুভূতির আশা করি।"

হারাধন বাবু। "হাঁ, তা কর্ব্বেন বৈ কি?

তবে জান্লেন কি না কথা দিয়েছি। তিনি পরশু দিন নিজে এসেছিলেন। দেখুন অতবড় জমীদার তার অনুরোধ কি এড়ান যায়?"

১ম ভদ্রলোক রাগত ভাবে বলিলেন—"আর মশায় আমরা কি ভদ্রলোক নই, আমাদের অনুরোধের কি একটুকু দাম নেই? এই যে একমাস ধরে হেটে হেটে আমাদের পায়ের তলা ক্ষয় হয়ে গেল কৈ আমাদের অনুরোধ ত রাখেন নি।"

হারাধন বাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন—"না, হা দেখুন হা ভুল হ'য়ে গেছে। তিনি যে ভাবে ধরে পড়েছিলেন ছাড়াতে পারেম না, বড্ড চক্ষুলজ্জা আমার।—"ভদ্রলোকেরা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"মহাশয় বোঝা গেছে। তবে আর কেন, নমস্কার আমরা আসি—আমাদের মত বোকা ভেবেচেন তত মূর্খ আমরা নই।"

হারাধন বাবু বিনয়ের ভাণ করিয়া কহিলেন—"মশায় বড় দুঃখিত হলেম। মাপ কর্ব্বেন, দেখুন মানুষের কথাটাই সব, যার কথার ঠিক নেই তার কিছুর ঠিক নেই। কথা দিয়ে ফেলেছি কি কর্ব্ব?"—ইত্যাদি।

(৪)

ভদ্রলোকেরা আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলেন না, কিন্তু গোপনে গোপনে জানিয়া লইলেন নগদ পনর হাজার টাকা পণের লোভে হারাধন মিত্র কুসুমপুরের জমীদারের কুরূপা কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন।

অমনি তাহারা প্রাণধনের নিকট ছুটিলেন এবং তাহাকে বেশ একটু মিঠে কড়া ভাবে শুনাইলেন 'এই কি দেশপ্রাণতা, সমাজ হিতৈষীতা? কন্যাদায়ের সময় বিড়াল তপস্বী সাজিয়া পুত্রের বিবাহের সময় তাহার পিতার এইরূপ ঘৃণিত আচরণ!—ছি! ছি!......

প্রাণধন শিক্ষিত যুবক, উচ্চপ্রাণ, সে ইহাদের কথাগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। পিতার ঘৃণিত আচরণে ঘৃণায় লজ্জায় রোষে তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। হায় এইত দেশের অবস্থা; তাইত এ দেশের অধঃপতন!

এমন অধঃপতিত, স্বার্থান্ধ জাতি আবার উন্নত হইবার স্পর্দ্ধা রাখে!

প্রাণধন বলিল—"আপনাদের ভিতর সবচেয়ে গরীব কে?"

সকলে বলিল—"রামঘোষই সবচেয়ে গরীব।"

প্রাণধন বলিল—"আপনার মেয়ে আমি বিয়ে কর্ব্ব।"

সকলে বিস্মিত হইয়া একে অন্যের মুখপানে তাকাইতে লাগিল। গভীর কৃতজ্ঞতায় হাত কচ্লাইতে কচ্লাইতে রামঘোষ বলিল "সত্যি বল্‌চ বাবা?"

প্রাণধন গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—মিথ্যা কথা জ্ঞাতসারে কহি নাই।"

রাম ঘোষ বলিল—"বাবা মেয়েটী আমার পছন্দ হবেত?"

প্রাণধন। "কেমন দেখ্তে?"

রাম ঘোষ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"বাবা তোমার উপযুক্ত ত নয়ই। তবু দেখো একবার, কার চোখে কি ভাল লাগে বলা যায় না।"

প্রাণধন—"গুণ?"

রাম ঘোষ—"বাবা গরীব আমি, মেয়েকে স্কুলে দিতে পারিনি, লেখাপড়া শেখাতে পারি নি। তবে দেবদ্বিজে ভক্তি আছে, হাতের রান্না চমৎকার। একবার নিজে পরখ করে দেখ, মা আমার বাইরে যেমনই হ'কনা কেন ভেতরটি তার জ্যোৎস্নার মত সুন্দর। কখন যাবে দেখ্তে?"

প্রাণধন—"কিছু প্রয়োজন নাই।"

রাম ঘোষ হতাশকণ্ঠে বলিল—"পছন্দ হবে না বাবা?"

প্রাণধন—"বাইরের রূপে কিছু এসে যায় না, ভেতর যার সুন্দর সেই প্রকৃত সুন্দর। দেখ্বার প্রয়োজন নাই।"

সকলে বিস্ময়নির্ব্বাচক নেত্রে নবীন ডেপুটীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল তাহা তৃপ্তির বিমল প্রভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র রাম ঘোষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

(৫)

যথাসময়ে দরিদ্র রামঘোষের কন্যা কালিতারার সহিত প্রাণধনের বিবাহ হইয়া গেল। হারাধন মিত্র দাঁতমুখ খিচাইয়া, পুত্রের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অমন পুত্রের মুখ তিনি সাতজন্মেও দর্শন করিবেন না। কিন্তু পত্নীর রোদন ও অভিমানের জ্বালায় এবং অমন রোজগারী পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া নিজেরই লোকসান ইহা বুঝিতে পারিয়া অগত্যা রাগটা ধামা চাপা দিয়া রাখিলেন।

কিন্তু চারিপাশের লোকগুলিও সংবাদ পত্রের সম্পাদকবর্গ তাহার পেছনে এমন ভাবে লাগিল যে হারাধন বাবু প্রতিমুহূর্ত্তেই ধরণীকে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাস্তার বাহির হইলে অমনি ইটপাটকেল ধূলি কর্দ্দম প্রভৃতি উপাদেয় উপহার অদৃশ্য হস্ত কর্ত্তৃক তাহার গাত্র লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত; শুধু তাহাই নহে তাহার নামে নানাছন্দের ছড়া বিচিত্র ভঙ্গীতে আওড়াইয়া ছোট ছোট ছেলেগুলো তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকিত। প্রতিদিন রাশি রাশি হরেক রকমের বেনামী চিঠি আসিত, এমন কি সত্য মিথ্যা কাহিনী পূর্ণ তাহার এক অত্যদ্ভুত জীবন-কাহিনী কোনও নামহীন লেখক লিখিয়া ছাপাইয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিল। আরও কতকি জ্বালাতন আরম্ভ হইল তাহাতে হারাধনবাবুর যে কি অবস্থা হইল তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝিবে না।......

এইরূপ অবস্থায় আর এ দেশে বাস করা অসম্ভব ভাবিয়া হারাধন বাবু কিছু দিনের জন্য এদেশ ত্যাগ করাই যুক্তি যুক্ত মনে করিলেন; এবং বঙ্গদেশের জলবায়ু তাহার স্বাস্থ্যের অত্যন্ত প্রতিকূল এইরূপ রটাইয়া সহসা কিছুদিনের জন্য কাশী প্রস্থান করিলেন। যাওয়ার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন জীবনে আর কখনও বক্তৃতা করিবেন না, কারণ বাগ্মীর বিপদ পদে পদে,—বিশেষতঃ যাহার গৃহে ওরূপগোমূর্খ পুত্র আছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

সারদাচরণ মিত্র।

পৃথিবীতে বহুলোক আসে আর যায়, কিন্তু যাঁহারা অন্যান্য অনেকের ন্যায় কেবল ভোগবিলাসেই জীবন না কাটাইয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে মনুষ্যের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া বিশ্বসমুদ্রের সৈকত ভূমিতে কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মহামতি মনুষ্যজাতির প্রকৃত আলেখ্য। সুধীগণ উপদেশ দিয়াছেন,—"অনন্ত সাধারণ ক্ষণ-জন্মা পুরুষদিগের চরিত চিন্তা কর, তবেই বুঝিতে পারিবে যে, মহত্বের দ্বার তোমার জন্যও উন্মুক্ত রহিয়াছে।" সারদাচরণ মিত্র, সকলের ন্যায় খাইয়া শুইয়াই জীবন না কাটাইয়া প্রকৃত কীর্ত্তিবান্ পুরুষের ন্যায় তাঁহার সমগ্র জীবন কাটাইয়াছেন বলিয়াই আজ আমরা তাঁহার ন্যায় মনস্বী পুরুষের চরিত আলোচনা করিয়া ধন্য হইবার প্রয়াসী হইয়াছি—এবং তাই তাঁহার ন্যায় একজন দেশহিতৈষী নির্ভিক বিচারক, ও তেজস্বী সন্তানের অভাবে আজ বঙ্গজননী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত—পানিসেহালা গ্রামে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১১শে ডিসেম্বর, সারদাচরণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র মিত্র। ইঁহারা বনীয়াদী কায়স্থবংশ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এফ্ এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিএ পরীক্ষা দেন; এ পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম

হন। ইহার তিন মাস পর তিনি এম্ এ পরীক্ষা দেন। যদিও অতি সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি এ পরীক্ষায় তৃতীয়স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করেন এবং সেই বৎসরেই প্রেসিডেন্সি কালেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সারদাবাবু বি, এল্ পাশ করিয়া হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন্।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি হাইকোর্টের জজ হন। ইহার পূর্ব্বেও তিনি দুইবার হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। বিচার কার্য্যে তিনি যথেষ্ট নির্ভীকতা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তিনি দীর্ঘকাল ঠাকুর আইন অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সভ্য ছিলেন। ঠাকুর আইন অধ্যাপক থাকিবার সময় তিনি বাঙ্গালার ভূমিসংক্রান্ত একখানা সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় সরকারী নিয়মানুসারে বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির কার্য্য করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যের উড়িষ্যা ভ্রমণ প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য।

সমাজ সংস্কারের জন্যও তিনি আজীবন শ্রম করিয়াছেন। কায়স্থ সমাজ যে, আজ এতটা উন্নত হইয়াছে তাহার মূলে যে সারদা চরণের ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম নিহিত আছে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আজীবন দেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়া গত ১৯শে ভাদ্র, ১৩২৪, মঙ্গলবার রাত্রিতে মনস্বী, কর্ম্মবীর সারদাচরণ ৭০ বৎসর বয়সে জ্বালা যন্ত্রণাও অতীতে শান্তির পবিত্রধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

যাঁহারা দেশের মঙ্গল ব্রতে ব্রতী রহিয়া চিরকাল দেশের সেবা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও, তাঁহাদিগের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। সারদাচরণও তাঁহাদিগের ন্যায় একজন, ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও জ্যোতির্ম্ময় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

"যাঁহারা শক্তির প্রসাদাৎ, কিম্বা সাধনার বলে আপনার জীবনকে বহুজীবনের সহিত মিলাইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা জীবনের অমৃত বিলাইয়া কি আলেখ্য দেখাইয়া, মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপরে তুলিয়াছেন, তাঁহারা সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদের মধ্যে সতত উপস্থিত। পৃথিবী তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন, শশ্মান তাঁহাদের স্বর্গারোহণের সোপান-মঞ্চ।"

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

জাগরণ ও সুপ্তি।

নিশার আঁধার ছিন্ন করিয়া ফুটায়ে কুসুম রাশি,
পূরব গগনে মিলব হাস্যে জাগায়ে জগত বাসী,
করমের তরে নিত্য প্রভাতে সোনার কিরণ খণি
কাহার আদেশে ফুল্ল হৃদয়ে ধীরে উঠে দিনমণি।
আলোকে বাতাসে পুষ্প বিকাশে নব পরিমল গন্ধে,
নিখিল বিশ্ব গাহে জয় গান উজ্জ্বল প্রীতি ছন্দে।

রক্ত আভায় সান্ধ্য গগনে আঁকিয়া মোহন ছবি
বিকাশি মাধুরী বিদায়ের ক্ষণে সাঁঝের কনক রবি,
রজনীর লাগি রঞ্জিত করে, জানায়ে প্রীতির বাণী
নিখিল বিশ্বে রচি দেয় ধীরে শান্তি আঁচল খানি।
তপ্ত তৃষিত ব্যথিত হিয়ার সকল বেদনা নিয়ে
ডুবে যায় রবি ধরণীর বুকে শান্তি-পরশ দিয়ে।

শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত।

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, *Nayabasar Road*, *Dacca*.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
„ Sir S. P. Sinha, Kt.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, M.A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
Mr. F. C. French I.C.S.
Mr. W. A. Seaton I. C. S.
Mr. R. B. Hughes-Buller, C.I.E., I.C.S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
J. C. Kydd, M. A.
W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
T. T. Williams M. A., B. Sc.
Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
„ Panchanon Nyogi, M.A.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.

The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The „ Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Mr. Justice Digambar Chatterjee.
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
Hemendra Prosad Ghose.
Akshoy Kumar Moitra.
Jagadananda Roy.
Binoy Kumar Sircar.
Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College

CONTENTS.

সূচী।

THE DACCA REVIEW.

VOL VII. AUGT. & SEPTEMBER, 1917. No. 5. & 6.

THE STORY OF BENGALI LITERATURE.

(Paper read at the Darjeeling Summer Meeting 14th June, 1917.

All that is possible for me to do, within the time at my disposal, is to tell you shortly the story of Bengalee literature. As you all know, the art of telling a short story is a difficult one. The difficulty lies in keeping out a mass of interesting details and at the same time keeping up the interest of the story. So what I propose to do is to give a sort of pen-and-ink sketch of the history of our literature, composed of many blank spaces and a few detached lines. This history is a sealed book to most of you, so my sketch, however meagre and colourless it may be, is likely to have at least the interest of novelty about it.

I ought to tell you at the very beginning, that as yet we do not know the full history either of our language or of our literature. Scholarly research in this field of literature has just begun, and we are still engaged in manuscript-hunting. In the present state of our knowledge, any history of our literature that we may construct, must be of a tentative and incomplete nature. So I have considered it safer for the present to stick to matters of common knowledge, and steer clear of all controversial topics. In the light of fresh knowledge, we may have to revise many of our facts, but certainly not our estimates. We may not know all about our literature, but we know the literature itself,—and that is sufficient for my present purpose.

Bengalee literature was born in Mahomedan India. The reason for this, to my mind, is not far to seek. Along with the Hindu Kings,—Sanskrit, the universal literary language of ancient India, came to be dethroned. And it was under the new political regime that the people of Bengal, for the first time in their history, got the chance of speaking out their own mind in their own tongue.

But the character of this new literature belies its birth, because it is an essentially Hindu literature. All its themes, ideas and sentiments are intimately connected with the Hindu religion and Hindu mythology, Hindu civilisation and Hindu culture. Chronologically it belongs to Mahomedan India, but spiritually it belongs to Hindu India. It is an incontestable fact, that Bengalee literature marks a new stage in the evolution of the Hindu spirit. The character of this evolution was undoubtedly determined, to a certain extent, by the changed political circumstances of the country; but what influence, if any, Islam had on it, remains as yet a matter of of speculation. Whatever influence Mahomedan religious and social ideals had on the Hindu mind, was of an indirect nature. That Bengalee literature is popular in its origin, and is largely democratic in its ideas and sentiments, is very likely due to the Hindu mind's coming into contact with Islam. But no thought of Mahomedan origin found its way into Bengalee literature, until it had been completely transformed and Hinduised,—and that also by a sub-conscious process. The remarkable fact about the Bengalee literature of pre-British days is, that it does not show any trace of any conscious adoption or even adaptation of foreign ways of thinking and feeling. The strangeness of this fact will be apparent to you all, when I come to deal with our modern literature.

Our first poet Chandidas was a contemporary of Chaucer. That Bengalee and English literature should have been born at the same time, is one of those strange historical coincidences, whose mystery astronomers try to solve by reference to the periodical appearance of sun-spots. But barring the fact that they were contemporaries, there is nothing in common either in their lives, or in their works, between these two poets. Chaucer was a highly-cultured and much-travelled gentleman, and a courtier to boot. Chandidas, on the other hand, was a poor village priest, who for aught we know to the contrary, never went either in body or mind beyond the confines of his native village. Whereas Chaucer paints the men and manners of his time, Chandidas sings out his personal emotions; in a word, Chandidas' poetry is as subjective as Chaucer's is objective.

Our first poet also happens to be one of our greatest. As a matter of fact, between him and Rabindra Nate Tagore, there is no other lyric poet who can be placed in the same rank with him. The most remarkable thing about his poetry is, that it is perfect in expression. There is nothing crude or experimental, nothing loose or vague about it. In it the Bengalee language became fully articulate, and Indian literature—far removed from the spirit and temper of our classical literature. The personal

note, which is altogether absent from Sanskrit literature, was heard for the first time in Chandidas' lyrics, in all its clearness and fullness.

I ought to tell you here, that his poems are not lyrics, in the modern European sense of the word. They cannot be classed with Milton's Lycidas, Shelley's Epipsychidion, or Swinburne's Triumph of Time. The Bengalee poet composed real songs, and he expressed such sentiments and used such words only as could be made to fit naturally into the folk-melodies of Bengal. For this reason there is a freshness and charm about them, which we miss in the more ambitious literary productions of a cultured age. Chandidas sings of love—and nothing but love. Its concrete joys and sorrows, its yearnings and delusions, the raptures of union and the pangs of separation, are the entire stock-in-trade of his poetry. To use his own language, the disease called love took possession of his soul in his boyhood, and he suffered from repeated relapses all through his life. His genius lay in giving such fervent and at the same time such exquisite expression to his heart-troubles, that his lyrics have become, for us Bengalees at least, things of beauty and a joy for ever.

Before I take leave of Chandidas, I should like to tell you, that though his poetry is personal in the most intimate sense of the word, it is not personal in form. Evidently, in those days it was considered bad form for a poet to speak in the first person singular. The conventional thing was to describe the ideal love of Radha and Krishna, the story of whose amorous sports on the banks of the river Jamuna has been the favourite theme of successive generations of Indian poets. Chandidas also adopted this convention, but there is nothing conventional about the sentiments he expresses, and his works bear such a strong and unmistakable impress of the poet's individuality and personality, that they clearly stand apart from the anonymous folk-songs of India.

After Chandidas, the poetic genius of Bengal, having lain dormant for about a century, suddenly burst forth into a superb and superabundant crop of songs and lyrics. What shook the people of Bengal out of their spiritual slumber, was the revival of the Vaishnav cult, inaugurated by Chaitanya, the greatest religious reformer Bengal ever produced. Vaishnavism is the oldest monotheistic creed of India, and with its doctrines of a personal God and incarnation, salvation by faith and divine grace, it bears a close resemblance to Christianity. After the fall of Buddhism, this religion was revived throughout the length and breadth of India, and has now come to occupy the position of the dominant creed of our country. Chaitanya's revivalist movement had a double aspect,—destructive as well as constructive. In its negative aspect, it represented on the one hand the revolt against the dry intellectualism and

mechanical ritualism of orthodox Brahminism, on the other the revolt against the gross and immoral rites of popular creeds. In its positive aspect, it represented the lyrical cry of the human soul for the divine. The God of this new religion, was neither a metaphysical entity nor an inhuman deity, but the second person of the trinity, all love and goodness, a concrete and individual over-soul, with whom the human soul could come into direct and intimate communion—and that through faith, which to us means disinterested and uttermost love. Bengalee Vaishnavism, in its anxiety to preserve the personality of God, went so far as to endow him with a spiritual, not a physical body—but a body all the same; and thereby made him almost tangible. It is recorded of Chaitanya, who was the most erudite and brilliant scholar of his age, that on the day he awoke to spiritual life, he tied up his Sanskrit manuscripts, never to open them again. This act is symbolic of the whole movement. Chaitanya was a contemporary of the founder of Protestantism, but he had much more in common with St. Francis than with Martin Luther. Chaitanya deliberately turned his back on the intellectual and practical activities of man. Neo-Vaishnavism, if I may so call it, being divorced from metaphysics, became wedded to asthetics, and all its appeal was to the emotional nature of man.

You can well imagine how such a religion stimulated the poetic soul of the nation. Chaitanya's doctrine of spiritual liberty, equality, and fraternity, could not but set free a quantity of spiritual energy in the heart of the people. As a romantic spiritual movement, which set a new supreme value on human emotions, it caused a simultaneous deepening and heightening of of the emotional nature of the people. And it is no wonder that the Bengalees of that age experienced an urgent need of giving expression to their insurgent and resurgent feelings. The votary of this new cult, found in Chandidas' poetry a ready-made mould, into which they could easily pour their new-born emotions.

The poets of this age played upon the whole gamut of what we call tender emotions. But sex-love, as the intensest and the most insistent of all human passions, was considered the culminating flower of the human spirit. Naturally, in Neo-Vaishnavism, sex-love soon became the symbol of the love of the human for the divine soul, and gradually these two passions came to be identified as being fundamentally one and the same spiritual activity. The sublimation of the sensual into the spiritual, is a common and dominant trait of all romantic literature. and we know that in the hands of Christian mystics, the relation between Christ and the Church very often assumed too human a character. In Bengal this process of identification was an easy one, as our poets sang only the love-story

of the divine Krishna and the human Radha, which might be taken as symbolic of the communion of the human soul with the divine. In the result, some of the finest Lyrics in our language came from the hands of these Neo-Vaishnav poets. The very best amongst them have a passion and warmth, an intensity and fervour, which were denied to the muse of Chandidas. Others have acquired a strange beauty from the mingling of the divine and the human, and the love they treat of seems to have a divine odour, a spiritual flavour and a mystic tinge about it. But we also detect in this latter-day poetry, signs of unmistakable decadance. It is, as a rule, characterised by something that is either overstrained in feeling, or over-emphasised in expression; emotionalism, by its very excesses, died a natural death, as it were through sheer nervous exhaustion. When this revivalist movement settled down into a new orthodoxy, it lost much of its inspiring character, and the Neo-Vaishnav poetry degenerated into conventional literature; that is to say, the latter-day poets began simulating the feelings and repeating the phrases of their predecessors. A purely romantic movement in literature cannot have a very long life, especially amongst a people who have come to the inheritance of Indo-Aryan civilisation, whose fundamental doctrine is, that emotion is a thing not to be expressed, but suppressed. The custodians of Sanskrit literature in Bengal, those whose minds had been hardened by the philosophic and practical disciplines of Vedic culture, had but imperfect sympathies with this sentimental cult, and what we call Lyrical was frankly condemned by them as hysterical. There is a class of people even now, who are for recovering our lost mediæval soul, and remodelling our new poetry on the old. They forget that history does not repeat itself, either in life or in literature, and if we tried to write poetry, after the manner of the Neo-Vishnav poets, we should only succeed in copying their mannerisms. We have a new psychology, with a wider range of emotions, which can find utterance only in new poetry.

The abiding charm of Vaishnav poetry lies in the fact, that it expresses the ardent joys and the sweet sorrows of life, and creates a longing for and holds out a hope of their infinite prolongation in eternal life. But it would be great mistake to suppose that our poets only dealt with the softer emotions of the human heart. There is a class of lyrics which reflects a sterner and gloomier side of the national soul,—I refer to Shakta poetry. Shaktism is also an ancient Indian cult. Quite early in the history of India, the destructive principle in nature had been personified into a goddess of terrible aspect, adorned with skulls, and armed with a sword, eternally dancing a cosmic war-dance. This cult had a strong hold

over the minds of a certain class of Bengalees, especially those belonging to the higher castes. Vaishnavism arose as a protest against the cruel and superstitious rites of this creed. Chaitanya's humanitarian movement undoubtedly succeeded in purging Bengal of the grosser elements of Shakta worship, but it could not kill the feeling that lay behind the worship of Shakti. Nature in Bengal is not always benign,—she has also her angry moods. Ours is the land of earthquakes and cyclones, of devastating floods and tidal waves. We live face to face with the destructive forces of nature, and it is impossible for us to ignore her terrible aspect. Shakta poetry represents the lyrical cry of the human soul in presence of all that is tremendous and death-dealing in the universe. There is such a feeling as the rapturous adoration of the mysterious energy which creates life only to destroy it. We in Bengal see before our very eyes, the process of boundless creation going on simultaneously with reckless destruction. So the goddess Shakti became for us the divine mother who devours her own children. The Bengalee mind, however, humanised the motherhood of Shakti, and the greatest of our Shakta poets,—Ramprosad—sang of her loving kindness in such simple and deep tones, that his songs are amongst the most popular in Bengal. This Shakta poetry represents the very antithesis of the Vaishnav. The contrast between the two is well exemplified by the respective emblems of these two sects, the red flower and the white. The songs of Bengal show that, what we now-a-days call the soul of a nation, is made up of irreconcilable contradictions, and which side of it at a particular moment will blossom forth in literature, is determined by causes other than literary.

All poetry falls naturally into two classes, the lyric and the narrative; because man's feelings and actions are the material on which the poet works. Bengal also produced both. The reason why I have dwelt at some length on the lyric poetry of Bengal is, that our, literature cannot show anything better and in delicacy and depth of feeling the lyrics of Bengal are equal to the best in any other literature. But our narrative poetry never attained a high excellence. The cause of this inferiority should be sought for in our social life. Narrative poetry suffered from the want of proper material. Social life in Bengal lacked that richness and variety, that stir and movement, in a word, that dramatic element, which is the very stuff out of which immortal stories are made. So when a Bengalee poet wanted to tell a story, he had to borrow his subject from other peoples or other ages. The best specimens we have of this class of literature, are the translations of the two great Sanskrit epics, the Ramayana and the Mahabharata. Krittibasa the author of the Bengalee version of the Ramayana, was almost a contemporary of Chandidas. So the lyric and the narra-

tive were born at about the same time.

We know how and under what cricumstances the latter came into existence. The Hindu epics were translated, at the instance of and under the patronage of the Pathan rulers of Bengal. It is a curious fact that our Mahomedan rulers should have been instrumental in spreading and strengthening the hold of Brahminism in Bengal. We know that Bengal had Buddhistic period, which came to an end on the eve of the Mahomedan conquest of our country. In course of time, Rama the hero of the Ramayana, and Krishna the hero of the Mahabharata, had come to be recognised as the incarnations of Vishnu. So these translations helped to mould the religious psychology of the people, in the same manner as the translations of the Bible into popular tongues did in Europe.

There is no question that the Ramayana is the finest romance, and the Mahabharata the greatest drama in all Indian literature. But these epics lost much of their grandeur and strength, their beauty and dignity, in being done into Bengalee. Neither Krittibasa nor Kashidasa, the author of the Bengalee Mahabharata, lived in a heroic age; and it is no wonder that they failed to preserve in their works, the virility and sublimity of the original. But the pity of it is, that in rendering the epic characters into Bengalee, they should have softened their moral features beyond recognition. In the Bengalee version, the sentimental element, as a rule, gets the better of the moral. For example, in the extant edition of Krittibasa's Ramayana, we find that the fierce demons of Lanka, the incarnations of all that is violent and brutal in human nature, have become transformed into Neo-Vaishnavs, who never let slip an opportunity of shedding sentimental tears on the battlefield. It is as strange a conversion as would be that of the German army into a Salvation army! The literary worth of these two Bengalee epic poems is not much, but their educational value has been immense. In spite of all their literary shortcomings, they are the two sanest and healthiest books in our literature. The stories are too great to be spoiled, even by weak translation.

We also have a few indigenous epics in Bengalee literature. I call these narrative poems epics, because they have rather a national than an individual character about them. Somebody has described architecture as an art, which is not one-man deep, but a thousand-men deep. There exists the same difference between an ordinary narrative and an epic, as there is between sculpture and architecture.

All national epics have their origin in international conflicts, and the Bengalee epics are no exception to this rule. These stories have evidently been built up out of popular legends, and are reminiscent of an early period

our history, when there was a battle of rival creeds in Bengal, and the local gods and goddesses fought for supremacy with the Trinity of Brahminic faith, which the early Aryan immigrants to Bengal had brought with them. There are two distinct cycles of these legends, one connected with the worship of Chandi, another with that of Manasha, both of whom in course of time had succeeded in insinuating themselves into the ample and hospitable bosom of the Hindu pantheon. These stories turn on the wrath of these goddesses against those who refused to bow down their heads before them, and the tale is the tale of woe which befell them on account of their intransigence. The victims, as a rule, are merchant princes, votaries of the much nobler and philosophic Shaiva cult, who heroically bore all the calamities which befell them, rather than worship these popular deities, who were, as one of them remarks, as ill-favoured as they were malevolent. Although these stories have all the elements of a Greek tragedy about them, in the hands of Bengalee poets they have become humdrum and prosaic narratives. The object of these poets was, not to create literature, but to impress their audience with the superhuman power of these deities, and the inhuman manner in which they exercised them; so naturally these narratives could not take a high rank as literature.

These poems form the real folk-literature of Bengal, and as such, are characterised by all its artlessness and naivete. All the same, they have a peculiar interest for us. In them we find graphic description of the Bengalee life and Bengalee mind of a bygone age. These village poets paint the picture of contemporary life, in that rough and realistic manner which is so dear to the heart of the people: and what redeems this literature from dullness and banalité, is its humour, half- and half-playful, a humour which never degenerates into positive grossness or prurience. This fact is all the more strange, as in India reticence was never recognised as a literary virtue, until the advent of the British. This idyllic picture of the quiet and easeful rural life, makes us modern men sigh for those good old times. And it is no wonder that the more imaginative amongst us, have idealised this picture into that of an earthly paradise of absolute peace and plenty. And very recently the cry of "go back to the land" has been raised in politico-literary circles. The desire to escape from the storm and stress of modern life into a secure haven of perpetual rest, is a very natural one. But I am afraid we cannot retrace our steps, either socially or psychologically. And then it is too early for a young nation like us to think of retiring on pension! We had better not forget one fact about our past life, which all these poems bring out so prominently,—and that is, that the Bengalees in those days were

a sea-faring people. All the romance of this literarture is connected with sea-voyages. What a wide horizon this fact opens out to our historic imagination, and what a new light it throws on our past national life !

You have seen that the whole of our poetic literature was intimately connected with religion, and thereby had assumed not only a semi-religious, but almost a sectarian character.

But there is one striking exception to this rule. There is a unique book, the Vidya Sunder of Bharat Chandra,—unique both in its merits and its faults,—which marks the birth of the secular spirit in our literature. I have already said that an epic poem partakes of the character of architecture ;—what Bharat Chandra has given us, is a piece of literary sculpture. The Vidya Sunder is a love-story, a novel in verse. And the love he treats of has nothing spiritual or ideal about it, but it is common mundane passion which lends itself to humorous and even indelicate treatment. To Bharat Chandra, love is an amusing episode in a man's life, and he has not failed to draw all the fun he could out of his subject. Bharat Chandra's poem, if I may say so, is a study in nude,—not of Psyche but of Venus Pandemos. He has not forgotten to give the conventional mythological frame to his picture. But he handles the gods and goddesses with such dexterous irreverence, that in his hands the sacred drama of the Hindu pantheon degenerates into a secular comedy. The son of a Rajah himself, and the court-poet of another Rajah, Krishna Chandra,—one of the principal actors in the drama of Plassey,—he embodies in his works all the outer elegance and all the inner corruption of a decadent aristocratic society. Gay and frivolous, cultured and cynical, witty and perverse, Bharat Chandra represents the utterly secular spirit of eighteenth-century poetry. However paradoxical it may sound, there is no gainsaying the fact that he had a typical Latin soul, and there is nothing indefinite or inchoate, shadowy or mystical about his poetry,—which is as brilliant, as it is transparent.

Bharat Chandra's reputation is under a cloud now. The English-educated community have no stomach for a literature which is neither clean nor healthy. A subtle and persistent odour of decaying morals and dying faith pervades the whole poem, which makes the modern reader feel uncomfortably squeamish. I have no hesitation in admitting that Bharat Chandra's masterpiece is a *fleur de mal*, but it is a flower all the same, many-petalled and of perfect form. In the whole field of ancient Bengalee literature, there is nothing which can be compared to it as a work of art. With the solitary exception of Rabindranath Tagore, no Bengalee poet has ever shown such mastery over verse-forms. In sheer technical skill, I doubt if he has any superior, even amongst the

Neo-Parnassian poets of France. I know the modern mind has a prejudice against technique. It is considered as something artificial and mechanical, but that is because the modern mind does not appreciate the abiding value of conscientious work. The time-spirit of this age is in such a tremendous hurry to get on, that it has no leisure to create or appreciate anything permanent. As regards Bharat Chandra's language, there is nothing more limpid, more bright, more graceful or more elegant in the whole range of Bengalee literature. Our people did not know what a plastic material they had in their own language, till Bharat Chandra moulded it into shapes of perfect beauty, so firm in outline, so symmetrical in structure: Bharat Chandra, as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us, writers of the Bengalee language. He was not only the finest artist, but the keenest intellect of the Bengalee literature of pre-British days. He knew the world and its affairs, as no predecessor of his ever did. He paints a harrowing picture of the limitless anarchy of his time, which proclaims loudly that the old order must change, giving place to the new, if the Bengalee people were to live and grow. In a lyric of rare beauty and sincerity, Bharat Chandra addressing his God says, that 'the game you play every day is not good for every day, so play something new after my heart.' His prayer was heard, and within a year of the poet's death, the battle of Plassey had been fought and won by the English.

The English brought prose into Bengal, and when rhyme gave place to reason, our literature entered into its modern phase.

The latter half of the eighteenth century is a blank page in the history of our literature. Evidently, during this period our people were too much occupied with adjusting their lives to the new political conditions, to have any leisure to read or write, and it is just possible that they were in no mood either, for singing songs and telling stories.

The opening years of the nineteenth century saw the birth of a new literature, because by that time the country had got a settled government, and a new generation had come into existence. This new literature did not grow out of the old. Both in matter and manner it was so novel, that it represented not an Evolution, but a transmutation, as it were of the national Psychology.

In English literature our people discovered a new mental hemisphere, a new world of knowledge, the knowledge of the facts of this world and this life,—and a dormant faculty of our soul awoke into new life. What the German philosophers call the "will to know", suddenly manifested itself amongst our people, in all its freshness and vigour. Bengal at this period showed too exclusive a desire to acquire and spread what is called useful knowledge. Naturally it was an age of

text-books and translations. Englishmen wrote books for the benefit of Bengalees, and Bengalees wrote books for the benefit of Englishmen, and it seems everybody was anxious to teach everybody else something or other. What knowledge those Bengalee books contained, and how useful it proved to the community at large, is a matter about which history is silent. This early crop of modern Bengalee literature has entirely disappeared, without leaving any tangible fruit behind. The earliest printed book I know of, Probodh Chandrika, is one of the curiosities of our literature. The author, a Brahmin Pundit, says in his introduction that he had composed the book in order to give a little education to young English gentlemen. What education they derived from this book, has always been a mystery to me. The book is divided into two parts. The first part is a jumble of logic and grammar, philosophy and philology, written in an unintelligible jargon composed of $\frac{3}{4}$th Sanskrit and $\frac{1}{4}$th Bengalee. The second consists of folk-tales and animal stories, written in the raciest vernacular. In the telling of these stories, the learned author gives free vent to what the French call *l'esprit gaulois*. So far as I know, this is the only book in Bengalee literature, which contains a genuine sample of Rabelaisian humour. Never before or after, have didactic stories been written in our language in such an outrageously gross manner. I believe this book has survived, because it has a definite savour about it; the lost ones must have been absolutely tasteless. So far as translations are concerned, it does not appear from their extant specimens, that they were done according to any definite plan or method. I have seen translations of Bacon's essays and of Uncle Tom's Cabin, of the Comedy of Errors, and of Rasselas. This last book has been rendered into such Johnsonian Bengalee, that it would have made the heart of Dr. Johnson glad to read it! There is nothing surprising about all this. It was the experimental age of our literature. The new writers made experiments with language as with literature. They not only wrote booklets on geography and zoology, but also dramas and stories.

From amongst this mass of experimental literature, one book stands out as an unique product of the Bengalee genius. Its author, Michael Madhusudan Dutt, had made many experiments in life and literature. In his youth, he became a convert to Christianity, married an Englishwoman, and wrote English poetry. The first generation of English-educated Bengalees all wrote English, because they had deluded themselves into the belief that they could do so. We also write English, but labour under no such delusion. *Michael was one of the very* first to realise, that a Bengalee could create literature only in Bengalee, and no other language. So after having tried his hand at every form of English

poetry and failed, he sat down to write an epic in Bengalee, after the manner of Milton. This is one of the boldest experiments that has ever been made in any literature, and strange to say, he performed the miracle. It is impossible to bring out the deep-toned music of Paradise Lost from our thin-voiced language. Michael knew perfectly well, that however violently he might torture the Bengalee *vina*, it would never yield the notes of a church-organ. So this audacious poet deliberately invented a language of his own, rich in assonance and consonance, which could be put into Miltonic blank-verse. He had followed the advice of Theophile Gautier to aspiring poets, long before the French poet gave it. He studied the dictionary, and drew his vocabulary from it. Our people consider his work to be a masterpiece of Bengalee literature. It is undoubtedly a master-piece, but of a literature manufactured in a library. It is a veritable Crystal Palace of an epic. Whatever difference of opinion there may be as regards the merits of this book, one thing is certain, that the experiment has never been repeated in Bengal.

Bengal, under the East India Company, failed to produce anything which can be called literature. The object of all writing in this age was pedagogic, and not artistic. It was not only the age of experiments, but also of reformation, in the literal sense of the term. Our fathers strove to reform everything —our religion, society, our language, our education. Bengal produced in the last century a man of colossal intellect and marvellous clairvoyance,—Rajah Ram Mohan Roy,—who embodied in himself all these various reforming activities. British India up to now has not produced a greater mind, and he remains for all time the supreme representative of the spirit of the new age and the genius of our ancient land. He looked at European civilisation from the pinnacle of Indian culture, and saw and welcomed all that was living and life-giving in it. It may be said of him, that he was the originator of our modern literature, because he was the father of Bengalee prose. The great gift of the last age to us, has been that of a new psychology and a new medium of expression.

Bengal's period of literary apprenticeship came to an end with the close of the first century of British rule. And the re-birth of our literature was synchronous with the assumption of the Government of India by the Crown. Our modern literature is too near us to be treated historically. Through lack of a proper perspective, we cannot see the literary products of the present age in their right proportion and true character. Then we are too much interested in the current literary activities, to view them from an impersonal standpoint,—we who are engaged in fighting some tendencies in our literature

and supporting others. So I shall content myself with bringing out the psychology at the root of the present-day literature. It is universally admitted that modern Bengal has produced only two writers of undoubted genius;—Bunkim Chunder the novelist, and Rabindranath the poet. It is obvious from their works that their psychology has been profoundly modified by Western thought and Western feeling, and yet retained its Indian character. In them the East and the West have met. Modern Bengalee literature is born of the contact of these two different cultures, and represents in varying degrees and shades their conflict and union. We in Bengal live under the shadow of the Himalayas, with the breath of the sea in our nostrils. Mentally also, we live in a similar land. At our back stands the ancient culture of India, in all its lofty and static grandeur; and in our front lies the wide expanse of European culture with all its inward depth and all its outward restlessness. Both have an equal fascination for us, and we can no more deny our past than refuse to recognise the present. So our God-given task is to synthetise in our life and in our literature, these two divergent and supreme manifestations of the human spirit. Whether we shall ever succeed in doing so, only the future can tell. But this much is certain, that our literature and our life will have significance and vitality, to the extent that they re present and reflect the endeavour to bring about this synthesis.

PRAMATHA CHAUDHURI.

THE ROMANCE OF TWO LIVES.

When the Mughal Emperor, Jahangir, had but recently ascended the throne of his illustrious father, Akbar, Jadu Rao, a Maratha warrior of Rajput descent, held an important command in the outlying Province of Ahmadnagar. Few of his colleagues could boast of such high pedigree, and consequently the dignity of his family, and the esteem in which he was held, received additional lustre from the circumstance. Under his immediate protection was a bold and valiant Maratha officer Malhaji Bhonsla—a man of plebeian or Sudra parentage, and still unknown to Fame. While he was yet comparatively obscure, but none the less a valued soldier in the camp, there was a great festival at the house of Jadu Rao in honour of a Hindu divinity. He was invited to be present at the celebrations, and he took with him his son, Shahji, a comely boy of some five summers. The devotions being over, the customary wine circulated freely, and under the exhilarating influence of his potations, the

habitually haughty host unbent, and cast aside his pride of birth. Placing the bewildered Shahji on one knee, and affectionately setting his infant daughter on the other, he merrily exclaimed "Behold! What an ideal couple! They surely ought to mate." Barely had the words been uttered when Malhaji sprang to his feet, and rapturously called upon the assembly to bear witness that Jadu had affianced his daughter to Shahji. In a moment Jadu's pride was aflame and he indignantly repudiated the construction that had been put on his jest. But Malhaji refused to yield his point and the angry altercation which ensued produced a long estrangement between the excited fathers. The years went by; Malhaji worked his way to renown. He amassed considerable wealth. He became lord of a jagir, and commander of 500 horse. Jadu had not advanced any higher in his sovereign's favour, and he could no longer affect to despise the Sudra whom he had once spurned. And so to the marriage which he had proposed in his cups he assented under the sobering influences of altered circumstances. The marriage was fittingly celebrated, and from the union was born in 1627 SIVAJI, the world-renowned Maratha hero.

In the following year Shah Jahan succeeded his father, Jahangir, on the throne of Imperial Delhi. He was an oriental dilettante, and as such had an appreciative eye for all that was beautiful in Nature or in Art. It grieved him sorely, he told his courtiers, that the most lovely lilies of Creation should be cribbed and confined within the dismal precincts of the zenana, steeped in the darkness of superstition and ignorance, and lost to the world by the usages of narrow customs. To set them free, and to restore them to their proper station in society, he conceived a plan which pleased his royal mind and forthwith he put it into execution. Says Hamilton in his "East Indies," a book of absorbing interest published within a hundred years of the event the first step he took was to order all the Ladies at Court to provide precious stones to bring to a Market Place that he had erected, and there to show their wares publicly to all the noblemen at Court, who were ordered to buy them at whatever prices the Ladies put upon them. And the King himself was to be a buyer to put the greater honour on the newly erected Market. The Ladies obeyed, and took their booths as they thought fit. On the market day, the King and the noblemen came to the market, and bought the jewels and other trifles the Ladies had to dispose of.

The king coming to the booth of a very pretty lady, asked what she had to sell. She told him she had one large fine rough diamond still to dispose of. He desired to see it, and he found it to be a piece of fine transparent sugarcandy of a tolerably good diamond figure. He demanded to know what price she set

on it, and she told him with a pleasant air that it was worth a lac of rupees. He ordered the money to be paid, and falling in discourse with her found her wit was as exquisite as her beauty, and ordered her to sup with him that night in his palace. She promised to obey, and accordingly went, and stayed with him three nights and days, and then went back to her husband, whose name was Afsal Chaun, and was a Commander of 5000 Horse. The husband received her very coldly, and told her that he would continue civil to her, but would live with her in the same manner as if she were his sister. Upon which she went back to the palace, and desired to be brought to the King; and being conducted to him, she fell at his feet, and told what her husband had said. The King in a rage gave orders to carry the husband to the Elephant Garden, and there to be executed by an elephant which is reckoned a shameful and terrible death. The poor man was soon apprehended, and had his clothes torn off him, as the custom is when criminals are condemned to death: and he was dragged from his house with his hands tied before him. On the way to the Garden he was to pass near the palace and he begged to have leave to speak to the King and then he would die willingly, if his Majesty did not think fit he should live. A friend of his, who was an officer of the Guards, ordered the Messengers of Death to stop for a while till he acquainted the King with the request, which was accordingly done, and he was ordered to be carried into the court of the Palace, that the King might hear what he had to say. And being carried thither, his Majesty demanded what he would have. He answered that what he had said to his wife was the greatest honour that he was capable of doing to his King, who after he had honoured his wife with his embrace thought himself unworthy ever after to cherish her in his bosom. The King, pausing a little, ordered him to be unbound, and brought to his own room. Where as soon as he came, the King embraced him, and ordered a "serpaw," or a royal suit, to be put upon him, and gave him the command of 5000 Horse more; but took his wife into his own Harem or Seraglio, and about nine months after, the famous AURANGZEBE came into the world.

And these two heroes, SIVAJI and AURANGZEBE, born of strangely romantic unions, as long as they lived fought against each other in the open field as also with hidden craft—Sivaji striving to re-establish a Hindu Monarchy: Aurangzebe warding off the overthrow of a once puissant Muhammadan Empire.

HASTA.

MENDEL'S LAWS.

By

S. SINHA, B. Sc., (Ill.) M. A. G. A.
Prof. of Botany, Krishnath College, Berhampore.

These laws were discovered by Gregor Mendel, an Austrian priest, and published by him in the Transactions of the Brunn Natural History Society in 1866. By some extraordinary chance Mendel's papers were lost sight of until the same facts were independently re-discoverd in 1900 by Bailey[1] working in the United States of America, by De Vries in Holland, by Correns in Germany, by Tshermack in Austria, and by Zavitz in Canada. Since then Mendel's work has been the most compelling force in plant and animal improvement. Before we proceed to explain how these laws help in improving plants we wish to state them in a general way. (Our investigation for this purpose was with Indian corn plants).

1. The Law of Dominance :—When two plants having some pair of contrasted characters (such as yellow field corn and white sweet corn) are crossed, one only, the dominant character (*i. e.* the smoothness of field corn) appears in the first generation. The other (the wrinkled) which does not appear in this generation is said to be recessive. The following is a partial list of dominants in corn breeding :—

Flint dominant to sweet.
Flint dominant to dent.
Dent dominant to sweet.
Purple dominant to no purple or white.
Yellow dominant to no yellow or white.
Red dominant to no red or white.

2. The Law of Segregation :—Whenever there occurs a pair of contrasting characters of which one is dominant to the other, in the second generation when this hybrid is inbred it splits up into three kinds :—There are onefourth recessions which will continue to breed true to the recessive character, there are onefourth dominants which will breed true to this type, and are therefore pure. The remaining half will have the dominant character which may be called impure, since in the next filial generation when in-bred their offspring will again split in the proportion of three with the dominant characters to one with the recessive or absent characters, or in other words there will be 75 per cent. of the individuals which

---

[1] The following is the account in De Vries own words in a letter to Bailey :—"Many years ago you had the kindness to send me your article on Cross-Breeding and Hybridization of 1892 ; and I hope it will interest you to know that it was bv means of your bibliography therein that I learned some years afterwards of the existence of Mendel's papers, which now are coming to so high credit. Without your aid, I fear I should not have found them at all".

will show the dominant character, while 25 per cent. will show the recessive character. These 25 percent will ever after breed true, because they contain nothing but the recessive character; while of the 75 per cent. showing the dominant character, one-third which are pure dominant will breed true, and the other two-thirds having the hybrid characters will again split in the next generation.

Mendel suggests that the cause of these peculiar phenomena is that a hybrid plant whose parents differ in a single character pair produces two kinds of egg-cells and two kinds of pollen-grains, one kind being like those of one of its parents, the other kind like those of its other parent. Taking as an illustration a hybrid of sweet corn, having sugary endosperm, with field corn, having starchy endosperm, when the germ cells were formed a segregation of the two potentialities representing the two contrasting characters would occur, and we would have germ cells of one kind containing the potentialities of sugary sweet corn and the other containing the potentialities of starchy field corn. This segregation or purity of germ-cells takes place in the formation of both the egg-cells and pollen-grains. We thus find two kinds of egg-cells and two kinds of pollen-grains in the first generation of the hybrid.

In the above hybrid we have spoken of two kinds of pollen-grains, one of which is identical with the pollen of the sweet corn and the other with that of field corn, the real difference between them was that one of them produced starchy and the other did not, the one that produced starchy is dominant, and it is because of a stronger determiner meeting a weaker determiner in the germ. In the starchy corn there may be a certain organ which performed its function, while the corresponding organ in the sugary corn failed in this. Hence we say that in the former the stronger determiner was present corresponding to the "presence hypothesis," in the latter it had weaker determiner corresponding to the "absence hypothesis." This explains the cause of one producing yellow and the other white etc., as well as of one being starchy and other sugary or whatever may be the case in question.

Several botanists experimented to determine the occurrence of definite segregation in maize. Emerson[1] states that definite segregation occurs in maize. Lock[2] investigating heights of maize plants did not find segregation. East[3] in his recent experiments with maize has shown unquestionable segregation in size characters by

[1]American Naturalist, 44, 739-746, 1910.

[2]Lock: Studies in Plant Breeding in the Tropics, III, Experiments with Maize, 95-184.

[3]American Naturalist, Vol. XLV. No. 531 March 1911.

comparison of the F_1 and F_2 generations[1], some of those segregates will breed as true as the parent forms. For practical purposes in corn breeding the fact of segregation is of greatest importance because the segregates will breed true.

3. The Laws of Recombination: So far we are dealing with one character pair or monohybridism. Now we are going to discuss di-hybridism, when two or more "pairs" of characters are present in the same hybrid, these pairs are independent of each other, so that one member of a given pair may be transmitted with either member of another pair. If we cross yellow sugary corn with white starchy corn we can foretell what will occur. Since yellow and white as well as sugary and starchy are antagonistic characters of allelonorphic pairs, yellow will be dominant over white, starchy will be dominant over sugary. Let us represent Y for yellow, s for sugary, W for white, and S for starchy.

By crossing Ys XwS we will get heterozygote YswS, and by further development we will have egg-cells of four combinations, namely Ys, wS, YS, ws. In the formation of pollen grain we will have the same combination of potentialities, as in the egg-cells, namely Ys, wS, YS, ws, so far as these two character pairs are concerned. When these are brought together which is a matter that depends on laws of probability, we get sixteen possible combinations to produce second-generation hybrids as shown in the following table:—

TABLE I.

Gametes[1] of female	Gametes of male. Ys	wS	YS	ws
Ys	Ys Ys	wSYs	YSYs	wsYS
wS	YswS	wSwS	YSwS	wswS
YS	YsYs	wSYS	YSYS	wsYS
ws	YSws	wSws	YSws	wsws

[1]Gametes—*i. e.* Sexual cells which unite in conjugation or fertilization.

[1]Hybridizers use the letter F_1 (=1st filial generation) to represent the immediate product of a cross. The succeeding generations arising from the F_1 generation are denoted by the letters F_2, F_3, etc.

In the above we find that some of these matings are alike, and striking them out we will have nine different combinations of which

9 contain both Y and s *i.e.* Ys

3 contain w but not s *i.e.* wS

3 contain S but not w *i.e.* SY

1 contains neither Y nor S *i.e.* ws

And this is the 9 : 3 : 3 : 1 ratio which we have in the case of di-hybridism, whenever we deal with two allelomorphic pairs. Out of these sixteen combinations only four breed true in future generations. From this F_2 generation only one (*i.e.* Ys Ys) out of nine Ys, only one (*i.e.* wS wS) out of three wS, only one (*i.e.* YS YS) out of three SY and the only one ws will breed true without any further selection and the rest will not breed true, but will split in future generations.

We are now in a position to state the law of recombination as follows: In the second generation of a hybrid all possible combinations of the characters of the original parents tend to occur. Further, if the second generation is numerous enough, all such combinations will occur in some individuals in homozygote form and being thus firmly fixed will reproduce true to seed.

Fixation of Hybrids. In Hybrids we try to combine the desirable qualities of the two different varieties, discarding their weak points. In many cases they combine, and in few cases they revert to the parental types. Now the question comes how to fix the good qualities when they do combine. Those varieties that bear the recessive character can be kept pure by self-fertilization without the strict isolation from the variety bearing the dominant character. Those varieties that bear the dominant characters can also be kept pure by self-fertilization. We know that inbreeding causes deterioration, but in such cases when a breeder wants to keep his variety pure and breed true, he will have to inbreed.

In case of an intermediate hybrid, that is, one in which the two characters of a certain pair are blended the fixation has been possible. Halstead[1] has bred into a fixed race the intermediate color of a cross between black Mexican sweet corn with Egyptian by selection. Webber fixed a hybrid of black Mexican sweet corn having the blue-black kernels with Stowell's Evergreen which has a nearly white kernel, into a race of light blue violet color. He got this after four year's continous selection of such intermediate light blue violet kernels and or planting, and by isolating the patch.[2] In fixing corn hybrids he suggests in another paper to cross different hybrid seedlings having the same characters, rather than in-breed a hybrid with its own pollen, then to plant the seed of such selected hybrids in isolated patches,

[1] Proc. A. B. A., Vol. IV. P. 350.

[2] Bailey : Cyclopedia of American Agriculture, Vol. II, p. 67, 1907.

so that the hybrids will not be crossed.[1]

The time required to fix a hybrid varies from two to several generations. Punnett[2] says: "two generations suffice to produce and fix the new variety, and one further generation is all that is required to indicate the fixed individuals."

Practical Importance of Mendelian Facts.

The breeder knows that no plant is perfect, every plant is a composite of thousands of characters. From this point of view there may be as many undesirable characters as desirable ones. The breeder seeks for a strain that will be uniform in appearance, that will breed true. He may want entirely new characters as well as recombinations of old ones, he has definite ideals, and wants to 'work to a line.' It seems to us that all these can be fulfilled by the application of Mendel's laws of hybrids, which suggest what we are to look for, and the best ways of combating difficult problems; hence these laws have a great value in improvement of plants.[3]

[1] Science N. S. Vol. XLIII. No. 320.

[2] Punnett: Mendelism. p. 60.

[3] The author can create stoneless mangoes, plumes and peaches by the application of Mendel's law of heredity if he gets sufficient facility for his work.

A STUDY IN THE MANTRA SHASTRA.

Kalas of the Shaktis.

BY

Arthur Avalou.

In a previous number I dealt with the causal Shaktis of the Pranava. This present article is concerned with the Kalâs. Kalâ is a common term in Tantric literature for which it is difficult to find an appropriate English rendering. Shiva has two aspects—Nishkala (Nirguna) and Sakala (Saguna). The former is therefore without Kalâ. The latter is manifested Shakti as Kalâ. Shiva is never without Shakti, for the two are one and the same, and Shakti in Herself according to Her proper nature (Shakti-Svarûpa) is consciousness or Chaitanya (Chaitanyarûpinî). Thus there are said to be no Kalâs in Unmanî which is in the Shiva Tattva. Thereafter with Samanî in Shakti Tattva the Kalâs appear. Thus in Netra Tantra (Ch. 22) seven Kalâs are assigned to Samanî. Shiva is partless but full manifested Shakti has parts (Kalâ). But parts as we know them do not exist until after the universe has evolved from Prakriti: that is, parts in the literal sense of the Mayik world. When therefore mention is made of Kalâ in connection with so high a Shakti as Samanî or any other Shakti which precedes Prakriti, what is meant is something which may be best expressed

by modes or aspects of Shakti. Kalâ, in short, is a particular display of Power or Vibhûti. Kala is also one of the Kanchukas which go to the making of the Purusha consciousness and is the product of higher Shaktis and Kalâs. The Kanchukas or enveloping Shaktis cut down the natural perfections as they exist in the Supreme Self and thus constitute the evolved Self or Purusha. The four Kalâs called Nivritti, Pratishthâ, Vidyâ, Shântâ, are specific modes of Shakti well defined. These are explained later. As regards the other Kalâs there is greater difficulty. In the first place the texts are not consonant. This may be either due to inaccuracy in the Mss. or real variances or to both. Then explanations of the terms are in general wanting though sometimes they are given by the commentators. The Sanskritist will, however, perceive that these latter Kalâs are variant aspects (like Avarana Devatâs of worship) descriptive of the nature and functions of the Shakti whose Kalâs they are and as such may have been set forth for Upasana; the lengthy lists being in conformity with the taste of the age in which these Shâstras were promulgated. Thus Kalâs have been called Jyotsnâ (moonlight) and the like on account of their Sarvajnâtâdharma that is Prakasharupatâdharma; that which being in the nature of manifestation is white and brilliant as moonlight. So again Indhika (kindling) Kala is so called because it is Jnanarupa or in the nature of knowledge; and Rundhani is so called because of its opposing or staying quality as explained later. This great elaboration of Shaktis is also in conformity with a psychological principle on which Tantrik Upasana is based into which I cannot enter here.

The above remarks are illustrated by the lengthy list of Kalas of the Varnas and Pranava given in Ch. III of the Prapanchasara Tantra. (See Vol. III of my Tantrik Texts). The Kalas of Nada, Bindu, AUM are there given and I will not repeat them here; but I will relate instead an account obtained from Pandit Hara Bhatta Shastri and taken by him from Netra Tantra which has not been published. The reader of the Prapanchasara will observe that the accounts vary both as to the names and numbers of the Kalas. In Netra Tantra seven Kalas are given of Samani Shakti, *viz.*, Sarvajna, Sarvaga, Durga, Savarna, Sprihana, Dhriti, Samana; five of Anjani, *viz.* Sukshma, Susukshma, Amrita, Amritasambhaba, Vyapini; of Mahanada one, *viz.* Urdhvagamini; of Nada four, *viz.* Indhika, Dipika, Rochika, Mochika. Some texts speak of Rechika. Nirodhini Shakti has five Kalas called Rundhani, Rodhani, Raudri, Jnanabodha, Tamopaha. The Shatchakranirupana (V. 38) speaks of Bandhati, Bodhini, Bodha. Rodhini and Rundhani, which mean "opposing", indicate the opposition encountered by lower experiencers such as Brahma and

other Devas attempting to enter into the higher state of Nada. These Shaktis (like the "Dwellers on the threshold" of Western occult literature) oppose all those to whom they do not extend their grace (Anugraha) by the Kalas, Jnanabodha' (wisdom) and Tamopaha (dispeller of darkness). These Kalas are therefore called Sarvadevanirodhika that is they oppose entrance into the higher state of consciousness and they oppose the fall therefrom of such Devas as have attained thereto. Of Ardhachandra there are five Kalas, *viz*, Jyotsna, Jyotsnavati, Kanti, Suprabha, and Vimala which are said to be Sarvajnapadasamsthita. For She is knower of all. If one can remain in Ardhachandrapada then all things are known, past, present and future. I am informed that according to Vetra Tantra (Ch. 22), the four Kalas of Bindu are the very important ones Nivriti, Pratishtha, Vidya, Shanta; which however are said in Prapanchasara to be Kalas of Nada, the four Kalas of Bindu being there given as Pita, Shveta Aruna and Asita. These five modes of Shakti are described later. The number and names of the Kalas of AUM differ in these several texts. According to the former the Kalas of the Destructive Rudra are Tamomoha, Kshudha, Nidra, Mrityu, Maya, Bhaya, Jada; of the protective Vishnu the Kalas are Raja (?) Raksha, Rati, Palya, Kamya, Buddhi, Maya, Nadi, Bhramani, Mohini, Trishna, Mati, Kriya; and of the creative Brahma there are Siddhi, Riddhi, Dyuti, Lakshmi, Medha, Canti, Dhriti, Sudha. The three Bindus of the differentiating Parabindu form the Kamakala. The Kalas Nivriti and the rest are the generalities (Samanya) of the Tattvas issuing from Prakriti; that is the Tattvas are sub-divisions or differentiations of these four Kalas. Nivriti Kala is the working force and essential element in the Prithivi Tattva or Solidity; and is so called because here the stream of tendency is stopped and the manifesting energy turned upwards. When Prithivi has been reached by process of evolution and Shakti becomes Kundali (coiled; at rest): Her next movement which is that of Yoga is upwards by involution retracing the steps of descent. The Prithivi *Anu* or point of solidity is inexhaustible potentiality in and as a physical, that is, sensible manifestation of the Spiraline Power welling up from and coiling round the Shiva-bindu This aspect of the Power supplies (as a friend learned in Saiva literature informs me) the curving and circular motion which manifests as the rounding and spherical skin and flesh with which all Prani are supplied. According to the same view Pratishtha which is the same force in all the Tattvas from Apas to Prakriti (Tantraloka Ahan. 10) is so called because whilst Nivritti supplies the outer covering Pratishtha as its name indicates supplies the basis and inner framework on which outer physical universe is

lain. Vidya Kala which is so called because it is limited knowledge is the dominant Kala in the Tattvas from Purusha upwards together with five Kanchukas to Maya. These three are related to the Shaktis Vama, Jyestha and Raudri which manifest as the three motions which go to make the universe, circular, rectilinear, three dimensional, and the line which in terms of consciousness are the movements of the Antahkarana towards the objects (Vishaya) of its experience; such objects being the combination of lines on various planes, in curves and circles. The three dimensional framework affords the basis (Pratishtha) for the outer solid covering (Nivritti) supplied by the spiraline Shakti as the manifested sensible and physical. Beyond Maya there is the consciousness which is peace (Shanti) for it is free of the duality which is the source of sorrow. The last Kala is therefore called Shanta and is dominant in the glorious experience of the Tattvas from Sadvidya to Shakti Tattva. Thus the Tattvas are only the manifestations of Shakti as three typical forms of movement starting from the kinetic state. It is these moving forces as the Kalas which are the inner life and secret of them. The Kalas are not dead forces; for the universe does not proceed from such. They are realised in direct experience as Devatas in and beyond all natural manifestations and may be made to serve the purpose of Sadhana. As Divine Beings they are modes of the one Divine Mother worshipped diagramatically in Yantras. As the inner forces in the Tattvas the Kalas group together the latter into four great "Eggs" (Anda) that is Spheroids comprising those Tattvas only of which a Kala is the common dominant feature and inner force. These are the Brahmanda comprising Prithivi Tattva in which all others are involved the bounding principle or envelope of which is either (Akasha); Prakrityanda or Mulanda; Mayanda; and Shaktanda of which the envelopes are Prakriti, Maya and Shakti respectively. Beyond all these in the centre thereof and pervading all is the Shiva Tattva in regard to which the Divine Shakti as a Kala is an utter negation (Shaunyatishunya) an empty space-giving or vacuity producing power (Avakashada) weich is the negative pole of the conjoint Shiva-Shakti Tattvas. The Shiva Tattva is thus the Parmashiva or Parasamvit the great Bhairava experience with its supreme experience of the universe negatived.

Regarding then this ultimate Shakti also in so far as it is a manifestation as a Kala or moving power the thirty-six Tattvas of which the universe consists are but manifestations of five forces (Shakti) or Kalas into which the one partless Divine Shakti differentiates Herself in an infinite variety of permutations so as to produce the universe with parts namely, Shantatita or Avakashada, Shanta, Vidya, Pratishtha, Nivritti.

According to the account given in the Shatchakranirupana (Vol. II of my Tantrik Texts) and the Commentaries of Kalicharana and Vishvanatha, there is a Shakti called Nirvana Shakti with two Kalas which are Nirvana Kala and Ama Kala known as the seventeenth and sixteenth Kalas, respectively. Unmani is Shivapada which is beyond Kala and Kala. In Shakti Tattva these have their source. The highest Shakti in this Tattva is Samani; Nirvana Shakti is, according to Vishvanatha, Samanapada or Samani, the life and origin of all being. (Sarvesham Yonirupini). According to Kalicharan, Nirvana Shakti is Unmani. Shakti as seventeenth Kala is Chinmantra and is called Nirvana Kala. Vishvanatha identifies it with Vyapini Tattva which is Shaktisvarupa and above (Paratpara) the sixteenth Kala. It is Antargata of, that is, included within, Amakala just as Nirvana Shakti is Autargata of Nirvana Kala. Kalicharana identifies it with Samanapada. Ama is the sixteenth Kala. She is the receptacle of the nectar which flows from the union of Para (Bindurupa Shiva) and Para (Shakti). Vishvanatha cites the Yoginihridaya to show that Ama is Vyapika Shakti. Kalicarana agrees as to this. But it has been said by Vishvanatha that Nirvana Kala is Vyapini Tattva. We must take it then that according to this view Nirvana Kala and Ama Kala are the two aspects, supreme and creative, of Vyapini Tattva as Vyapika and Anjani. Beyond or more excellent than Ama Kala is Nirvana Kala and than this last Nirvana Shakti or Samani in Shakti Tattva wherein is bondage (Pashajala). Thus Nirvana Kala is the Chinmatrasvabhava or pure consciousness aspect of what in the creative aspect is called Ama, the receptacle of nectar that is the blissful current which flows from the union of Shiva and Shakti. This is the rupture of credtion which is known to us also. The same Shakti is in differing aspect Amritakararupini as the seventeenth and the receptacle of Amrita as the sixteenth Kala. Ama is both Srishtyunmukhi (looking towards creation) and Urddhvashaktirupa (looking upwards that is towards liberation). The former is the meaning of the expression "downward turned mouth" (Adhomukhi) This is the position of the Petals before Kundalini ascends.

This is my reading of Texts which are not void of discussion. This apart from difficulties in the Text cited I was informed in Kashmir that Shakti is called the seventeenth Kala or Ama when Chinmatrasvabhava; and Amrita Kala when Purusha is with the sixteen Kalas which in this case are said to be the Jnanendriya, Karmendriya, Tanmatra and Manas (which includes Ahangkara and Buddhi). This may be a difference of terminology only. What seems clear is that in Shakti Tattva (of the thirty-six Tattvas) there are two Kalas which represent the supreme

and creative modes of Shakti whether we call them Nirvana and Ama or Amritakara and Amrita Kala. The sixteenth is the cause of sixteen Kalas and the Kala which is in the nature of ever existent changeless Chit (Chinmatrasvabhava) is the seventeenth.

To sum up. Paramashiva (Parasamvit) in His aspect as Shiva Tattva is the Shunyatishunya so called because in His experience there is not the slightest trace of objectivity whatever. Both these aspects are shantatita. Shakti then gradually unveils again the universe for the consciousness of the Shiva who is Prakasha or the illuminating consciousness which is the subjective aspect of things; and the experience which is summed up as Shanta Kala arises extending from Shakti Tattva to Sadvidya with the Shaktis, Samani, Vyapini, Anjani and their Kalas; and the Shaktis of the Nada and Bindu groups with their Kalas. This is the Spheroid of Shakti (Shaktanda) which is the abode of those glorious Beings who are called Mantramaheshvara, Mantreshvara, Mantra and Vidyeshvara. The Vijnanakalas who are below Shuddhavidya are also above Maya. From the unfolding of Bindu the other Spheroids emanate which manifest the three principal forms of movement which go to the making of the universe. Next in concentric circles arise the Spheroid of Maya (Mayanda) the field of operation of Vidya Kala which is the Shakti producing the limited dual consciousness of all experiencers (Pralayakala, Sakala) below Sadvidya and in or below Maya. Lastly the Spheroids of Prakriti and Brahma provide the vehicles in which the experiencer called Sakala functions. These experiencers comprise all beings from Brahma downwards who are not liberated. Brahma, Vishnu and Rudra are the Lords of the spheres from Prithivi to Maya; Ananta of Sadvidya; Ishvara and Sadashiva of the next two higher Tattvas; Anashrita Shiva of Shakti, Tattva and Shiva of Shiva Tattva which is the ultimate source of, but is itself beyond, all Kalas.

"VEDANTA KESARI."

THE DEATH OF MEGHNAD : THE INDIAN HECTOR.*

BY

(N. MUKERJEE M. A. B. L. BARRISTER-AT-LAW.)

Canto I.

Arms, and him I sing, who, by fate ordained,
O'er demon-bands the main command obtained
What time Vir-Vahu was untimely slain, †
And his brave soul hurled to Yam's gloomy reign.
Proclaim, O silver-tongued Muse, proclaim—
Who next was honoured with a general's name ?
Who was elected Chief of Lanka's force
By Lanka's dread Chief, (now smit with remorse) ?
Of Meghnad, who fought from behind the cloud
And rushed to battle with a roar as loud,
Sing Saraswati !—Sing by what stratagem
Urmila's spouse slew him, (inglorious fame !),
How over Indra'sVictor-foe prevailed,
And by his death his coward-fears dispelled.
Once more ‡ Thee, bright-armed Goddess, I invoke.
As from Ratnakar's threat spontaneous broke—
Provoked by thee—a sweet, immortal strain
At sight lo ! of a bleeding, mated crane,
(Which, fluttering, fell, shot by a fowler vile,
Right in his lap, and writhed in pain awhile) ;
So do thou Goddess of the sacred lyre,
Inspire my lay with something of thy fire !

* Michael Madhu Sudan Dutta is best remembered for his *Meghnadabadha Kavya*, the second Bengali Poem, after the "Tilôttomâ", in blank verse. "In sweetness of diction and richness of imagination it has scarcely any rival in the Bengali language. For a foreigner to attempt English verse and metrical translation of a master-work is a gigantic enterprise." How far this metrical rendering, now presented to the public for the first time, possesses the mellifluous diction of the original is for the reader to Judge. N. M.

† This couplet is added by way of introduction after the fashion of Virgil and Tasso. N. M.

‡ This is in imitation of Milton's "Lycidas." The reference is, of course, to "Tilottomâ", which was composed before "Meghnad." N. M.

What mortal bard thy marvels can rehearse,
(Save by thine all-sufficing grace), in verse?
The Poison-tree changed, by thy wand of gold,
Into sweet-scented sandal wood, behold!
The Bandit felt, reclaimed, thy hallowed flame
And raised his grovelling name to death-less fame—
(Death-less as Uma's death-defying spouse)—
E'en so, O Muse, my native genius rouse!
Poor though my gifts, yet mothers do *most* prize
A child *least*-gifted; nor thy own despise.
Come!—and thou too, gold-winged Bee, on lighter wing-
Fancy!--into my hive thy sweet spoils bring—
Mine epic hive from out which Gourean dames,
And youths shall drink, and glow with patriot-flames.
High on a throne of gold Dashanan sits,
And from each head a shining crown remits,
(Like Hemkuts golden peaks,) a fiery ray;
While courtier-crowds, (but now no longer gay),
And a long minister-train stand around
With streaming eyes bent downwards on the ground;
And sorrowing subjects—Vast as Ocean-waves—
Surround him with the silence of the graves!
In silence they stand in the Audience-hall
Aglow with gems set in its crystal wall—
(Aglow as Manas Lake with gemmy blooms,
Which, by their splendour bright. remove all glooms).
What rows of stately columns there behold,
Of solid rainbows framed, a dome uphold!
(So bears Vasuki on his crested head
The Earth with hills and woods, and seas out-spread).
Lo! from the ceiling pearl-wreaths pendant hung
With diamonds,emeralds and red rubies strung,
Which sparkle like Beauty's laughing eyes,
Or lightning-flashes, as in showery skies.
Close by the throne a youthful damsel stands,
And waves a chourie with her lily-hands.
Behind, one holds aloft the canopy
Fringed with pearls, but, for beauty, seems to be,

In out-ward semblance, Madan, God of Love
Ere Har turned him to ashes in his grove.
A porter grim walks sentry at the gate,
(As, at old Indraprastha, did Rudra wait,
Trident in hand, before the Pandavs' tent,
Day and night, on his self-laid duty bent).
A vernal zephyr murmurs through the hall,
And music-ripples faint the senses lull,
(But sweeter far the strains in Gokul's wood
Waked by the shepherd-God by Jumna's flood).
In such an Audience-hall, unmatched on Earth,
(Un-matched, O Moy! by thine at Indraprasth),
Behold Dashanan with his subjects mourn
For Vir-Vahu, by fair Chitrangada borne!
As from a tree, pierced by an arrow keen,
Exudes a stream of Juice, (to blood akin);
As, ceaseless, falls a fountain from on high,
So down his cheeks flow tears from either eye,
And, dripping from his beard, his State-robes wet!
Thus he mourns for his son, disconsolate.
In front, with folded hands, a trooper stands—
(Survivor sole of many valiant bands)—
A Vaiwasvat saved from the general floods,
(Which all but him engulfed), by righteous Gods.
Still he stands, stained with hostile gore, ashamed,
Last of his bands, (Makarakhya named).
Renowned for strength, the boldest of the bold,
He seems fit match for Kuver, God of gold.
Dashanan, with a sigh, turned to the man,
And, 'twixt sob and tear, thus his speech began:
" Say'st thou, (he cries), O Messenger of ill,
That wandering Vagabond of wood and hill,
That beggar-Rama hath Vir-Vahu slain,
In open battle, with his monkey-train?
Ah! baseless as the fabric of a dream
To me, O Trooper, do thy tidings seem!
Thou might'st as well, with equal nonsense, talk
Of piked Salmalis felled by lotus-stalk!

The *Gods* opposed his course, (how oft in vain)!
Could he by a mere mortal *man* be slain?
Yet I cannot but deem thine ill news true,
For, has this war not claimed, for toll undue,
God-like Kumva-Karn, tall as Shiva's spear,
And as dread in war, ah! before his year?
O Vir-Vahu! (his son he thus bemoans),
O Vir-Vahu! best of my warrior-sons!
Thou too hast fallen in the prime of life!
Who shall save this race in this fated strife?
As, ere he fells the giant of the woods,
The wood-man of its branches first denudes;
So this fell foe resolves my sons to kill
And, last of all, reserves me for his steel!
Intent on my destruction, root and branch,
None would he spare my country's wounds to stanch!
O Surpanakha! in what evil hour
Hadst thou met, (thus he raves), Vaidehi fair
By the Godaveri in Panchvat wood!
But what boots it now o'er the past to brood?
The fire I stole has set my home aflame—
My golden Lanka will soon be a name!
As shines the gay ball-room, ablaze with lights
And dazzling Beauties on vernal nights,
While swells the scented air with mingled strains
Of harps and flutes and drums and soft refrains
And rings out, sweet and clear, the silvery laugh
Of lovers as they draughts of nectar quaff—
One moment!—and, then, cease the laugh and shout,
And one by one the bright lamps flicker out—
The harp, the flute, the drum in silence hushed.
Such seems my state, my joys and glories past!
O for the wings of doves! Fain would I fly
To some far, far lone wood and, weeping, die"!
Thus Ravan raved; (as at Hastina raved
The sightless Kaurav chief in grief, and laved
His aged knees in salt tears at the death
Of his five-score sons, and gasped out his breath).

He ceased ; the tears ran gushing from his eyes.
"Who can thy sorrows soothe"? Thus Sáran cries,
(Sáran, chief of his Minister-train, and wise).
"Yet, though the cloud-capped peaks the thunder cleaves,
Unmoved the mountain still its fury leaves.
So bear, unmoved, thy grief, thy tears forbear.
Cheeer up now, and a General new declare.
Lo ! this phantasmal world of weal and woe
A desert-mirage seems, a Maya-show !
The wise with e'en eye pain and pleasure view
Thus unperturbed, but not the Vulgar crew".
"O Saran ! (thus Naikeshya replies),
"True, this phantasmal scene dupes not the wise ;
Yet heeds not my poor heart thy cold "wise saws",
But sinks with sinking fate, borne down by woes ;
So, when one culls the golden lotus-bloom,
Sinks the slim stem, in sorrows drowned, in gloom".

To be continued.

THE RIVER.

BY E. K. VENNER.

It flows calmly along, under the bridge, and onwards between its deep banks, faithfully recording all their varied reflections on its way, a thing of beauty and a picture of peace in the light of evening with an evil reputation sufficient for a German. For, despite its innocent appearance, it is one of the most dangerous streams that flow. Underneath the calm, flowing surface are holes of surprising depth, and mingling with it unexpected currents full of deadly purpose. The toll of victims in the neighbourhood of the bridge alone, stretching far back into bygone days, must be of appalling length, and still the river asks for more. And, alas ! it is likely to get them, for warnings and cautions are thrown away on the large class that contribute to the boating and bathing fatalities every year.

Splash ! a salmon has jumped close to the bridge—a most effective check to melancholy reflections if you are a fisherman. There he is, dimly seen in

the deep water, lying a little to the left of those weeds, his mouth showing a gleam of white as it opens and shuts—twenty pounds, if an ounce. There is a theory that the salmon here are quite aware of the presence of observers on the bridge, and jump up to have a good look at them. If this is so they gratify their curiosity pretty often, as it is seldom that a pause on the bridge is not followed by a splash below. But whatever salmon are feeding on, they have at present little use for home-made flies, and takes are few and far between.

Not far from the furthermost pier lies a dead member of the community. Is he the victim of an otter, or what? More probably a case of disease. People who know say the drought and need of fresh water affect salmon very unfavourably. Perhaps this is a case in point. A local fishmonger told me that fish taken from the river at this time are quite off colour, the flesh of a recently caught one being white instead of the beautiful pink that has given its name to a much-used colour. But a forty-two-pounder set up in a neighbouring building in the pink of condition shows what the river can produce, an inscription beneath recording that it had been two years in the sea.

But here is a very different kind of fish swimming out from the bridge, a 'great loggerheaded' chub in fact, of which the river is full. It seems strange to find a chub almost within the august circle made by one of the kings of the river, for he is one of the coarsest of fish. Into his capacious leathery mouth goes a large and varied selection of food. Bumble-bees, flies, frogs, minnows, and much else are all alike to him; cheese he is especially partial to—the stronger the better.

I tried the other day by that overhanging bush to indulge his appetite in this last particular, while Mollie read to me Izaak Walton's advice on the subject from the bank above. But in the language of the day, there was 'nothing doing' on this occasion. Still, it was a pleasant experience to fish and have old Izaak behind one, as it were, and to hear of the chub which he caught.

'Look you, sir, there is a trial of my skill; there he is; that very chub which I showed you with the white spot on his tail, and I'll be as certain to make him a good dish of meat as I was to catch him. I'll now lead you to an honest ale-house where we shall find a cleanly room, lavender in the windows, and twenty ballads stuck about the wall. There my hostess, which I may tell you is both cleanly and handsome and civil, hath dressed many a one for me, and shall now dress it after my fashion, and I warrant it a good meat.' The secret of making a chub 'a good dish of meat' appears to be to cook him the day of his capture. But I must say, however, that, much as I should have liked to see this one caught, I should have been quite content to leave the eating of him to Izaak and his

scholar, for, when all is said and done, the chub remains *un villain*, as the French call him.

There is one great drawback to fishing in our river, and that is the presence of a ravenous host of small gudgeon, which, when you are bottom-fishing, bite voraciously at the worm, which is not intended for the consumption of the nursery. Any number of these may be caught in a short time, and as they number almost six to the ounce, there is nothing for it but to throw them back again, unless, indeed, you want them for bait, in which event they would be sure to be affected by an unaccountable fit of shyness. But the persistent way in which at other times they can get a good-sized hook into their tiny mouths is quite remarkable. On one occasion, tired of having my bait spoilt and of returning the marauders to the water, I did use one of them as a bait, with the result of hooking a few minutes later a small jack, which I found exceedingly difficult, with such tackle, to pull out of a bed of weeds. These jack run up to a large size in our river, and vie with the salmon themselves in the weight to which they attain.

About a mile below the bridge are the falls, where the river suddenly breaks away from its slow and stately progress and speeds onward in a smother of froth and bubbles. Here in the gravel reaches is a grayling-ground par excellence, and many a fish has come to hand on the ideal landing-place which looks as if it were made for fishermen. The water also looks as if it should be full of trout, but strange to relate, that fish is very rarely taken in the river ; why, I cannot say.

As you fish from here there is a pool at your feet swarming with what appear to be tiny grayling. So densely packed is this nursery that the nurslings may be scooped up in a landing-net before they have time to pass through the meshes. They are beautiful little silvery creatures, and would be the delight of a boy with a pickle-bottle.

While you are fishing you will also probably see a pair of kingfishers, whose special haunt this is, flashing up towards the falls, and giving warning of their approach by a sound which makes one imagine tiny wheels which require greasing.

Much more difficult to see are the otters and badgers which are about the high sand-banks. One can imagine the large toll of fish taken by the former in the river below, and what a mark for destruction they must present to the river-keepers.

But if otters are the enemies of the keepers, the badgers are equally the enemies of the farmers. A neighbour of mine told me they simply played havoc with his lambs, killing some out of pure mischief apparently, and dragging others to their holes in the river-banks. This hardly accords with the description of the badger which sets

him forth as one of the most quiet and inoffensive of our indigenous animals.' Here he almost rivals the fox as a depredator.

But there is no doubt as to which of the two is the more destructive, and the river people would instantly award the palm to the little red rover. He has multiplied exceedingly of late years, and his raids on the fowl-houses of cottager and farmer are numerous and slaughtering. In fact, what between the damage done by him and that done by the rabbits, whose name is legion, and who have undermined the river-banks in many places in such a way as to make them positively dangerous, the people of the neighbourhood have a very bad time; and if you try to keep down the one, you have to deal with the other; for, a farmer told me, it was no good setting traps for rabbits, as the foxes always heard them and carried them off.

Just level with the falls an island divides the river into two branches, the water that is not drawn into the rapids finding its way round the other side of the island in a broad, rapid stream. In this branch a heron may sometimes be seen standing in a contemplative attitude; at other times he will rise from under the nearer bank, affording one a close view of the splendid spread of his wings and of his beautiful ashgray plumage. He must have a sumptuous time amongst the small fry which swarm here as in other parts of the river, especially salmon par, which are as great a nuisance as are the gudgeon in the upper reaches, should you be fly-fishing for grayling. They are hauled out time after time, only to be returned to the water. This was not their fate in former years before they were protected by law, and many a choice dish of them has appeared on the breakfast-tables of the past. The readiness with which they are caught is all the more exasperating in view of the difficulty in this water of landing grayling. These are generally hooked some distance down-stream, with the result that after a few seconds' play the hook is pulled out of mouths tender enough even when hooked in more favourable circumstances and hardly one in six comes to the landing-net.

The island is reputed to be a great otter stronghold, and it certainly seems an ideal place for such a shy community.

A fisherman once witnessed a curious encounter on it between a rabbit and a stoat. The rabbit suddenly appeared on the edge in an abject state of terror, and vanished a second after, a stoat occupying the place where it had stood; then the stoat vanished on the track of the rabbit. After some minntes the rabbit reappeared, having apparently made the circuit of the island, and once more gave place to the stoat. On the third appearance the rabbit had evidently come to the conclusion that the island was not big enough for the two of them, and that anything would be

better than remaining on it with such a terrible little pursuer. It stood for a second looking at the river, and then suddenly plunged in and struck out for the shore. A minute later the stoat came into view on the taking-off place, and was plainly quite taken aback by the sight of the swimming rabbit. It had evidently never entered into his blood-thirsty calculations that a rabbit could swim He gazed after it, absolutely baffled, and perhaps hoping in his ferocious little mind that the rabbit would be drowned. But the valiant swimmer was equal to the occasion, and the would-be assassin had the mortification of seeing it land and scramble up the opposite bank.

In the upper reaches of the river the water is of great and unexpected depth, shelving down within a foot or so from the bottom of the steep banks to a depth of ten or twelve feet, and getting proportionately deeper farther out. One of these places is known to us as the Perch Hole, from its being a favourite haunt of these game fish. It is also one of the few favourable spots afforded for bank-fishing, the banks having been eaten out in a large semicircle, the sides of which lead easily down to the water. Here, where the water is fringed with water plantain, just outside a bed of weeds, the fisherman may have an exciting time watching his float, which may be taken down any moment by a good fish. The water plantain very much resembles gypsophila, but the angler will probably have more reason to notice the aggravating way in which his hook fits round its knots, to every one of which it is a perfect fit. It is bad enough in August, but it is worse in the autumn, when the plant lies submerged in the flood-water, for then a fixture means a breakage.

In this still-fishing it is extraordinary how much you can see of the life of the river, and how accustomed the river-folk become to your presence. As I was standing there recently, a dabchick suddenly appeared within a few feet of my float, and remained a few seconds near it, looking at me with her wild dark eyes, before paddling very leisurely over to the other side. The animal world is so full of starts and sudden movements that a perfectly still figure always seems to exert a soothing influence on it.

The bridge from here, perhaps, never looks to better advantage than when the river is all aglow with the golden light of sunset, when the water-fowl show black against its magic surface, and when the waters, as they flow onward seem almost to have come down from the western sky—a river of liquid gold. Then the bridge hangs across, a fairy-like structure, a dream-bridge, such as you would imagine to lead to some cloud-capped castle set in the hills beyond.

But there is no such fair illusion when you stand in the same place and see the river raging along in full autumn flood,

level with its fifteen-feet banks: you then only wonder at the strength of the bridge and the solidity of the piers which are withstanding the wild rush of waters.

This part of the river is subject to wind-storms of extraordinary violence, which often arise with startling suddenness, and rush up a magnificent avenue of scotch firs which runs parallel with its course with the roar of an express train. On a recent memorable occasion a more than usually violent storm left behind it a scene of destruction amongst the trees which almost baffles description.

The people of the river country are surprisingly intelligent when one considers the remoteness of their situation. From our bridge it is two miles and more to the next bridge,* and the cottages between the two are very much scattered. In these the people will talk to you in a low, attractive tone of voice, and show sometimes a quite unexpected knowledge of the questions of the day. Some of them speak with great aversion and horror of the river. They will tell you they never walk along its banks if they can help it, and, if you are a stranger, will earnestly warn you of its dangers. In one of the cottages lives an astute old fisherman, who by no means shares this aversion, for he spends all his spare time by the river-side, where his knowledge of the finny folk has been gained by much experience, and from which he generally goes homeward with something in his bag. It had a couple of eels in it when I last met him, and as the eels of the river have a great reputation for savouriness, his supper that night must have been well worth eating. But, like most rustic fishermen, he keeps his knowledge to himself. The story goes that a party of unsuccessful fishermen once came across him, and immediately divining that he knew the ropes, or, rather, the banks proceeded to make much of him in the hope of extracting some useful information. They gave him an excellent lunch, and supplied him with unlimited tobacco, to both of which he took very kindly; but the net amount of information they got from him in return would have been sufficient 'to put on the point of a knife and choke a daw withal', as Beatrice has it in *Much Ado About Nothing*.

I remember one of the same sort on another river, who assured me he knew of a certain bend some distance off where great sport was to be expected, and an arrangement was speedily made with him by myself and a friend to act as a guide to the place, his hand having been liberally crossed with silver. There was one bite during the day of a tentative description, that was all, and a weary trudge home at the end of it with anything but pleasant thoughts of the old rascal who had promissd us such unusual sport. Of course, fish are uncertain things; but I think it quite possible that, knowing the ways of such gentry, he had taken our money to lead us to a place where we could not

possibly spoil sport for him and his companions.

I saw another of the breed the other day flyfishing a promising piece of water on the other side of the river. He could throw a fly, I could see, and seemed to know where to throw it; but as it meant a walk of two miles to get into communication with him by way of the bridge, I had to watch him in silence, and wonder what fly he was using. But would he have shown it to me had I been able to reach him? It is very doubtful.

When all is said and done, being able to fish at all is better than being by a river teeming with fish, where you may only look and long, and when the trout are rising in all directions under your eyes as if they knew you must not fish for them. On such a river it was calculated that the price paid for a season's fishing worked out at something like a guinea a trout of those caught.

Within sound of the falls of our river, where there ought to be trout and are not, there rises the tower of an ancient church under whose shadow Owen Glendower is said to be buried. The supposed place of burial is marked by a much-worn and broken stone slab, which, from its appearance, might well date back to his times. But whether this is his place of burial or not there is not doubt that the ancient princes of Wales were much in its neighbourhood, often perhaps using the river for purposes of defence. All traces of fords have long since disappeared, but ours is not a river which looks as if it ever took kindly to the idea, and no doubt its appetite for victims was quite as voracious then as now.

There is one curious feature connected with the old church of the river which appears in the register of burials. These date back to 1678, and, for some years from the beginning, to every burial entry is attached an affidavit setting forth 'it was buried in woolen,' with the addition, in some case, of the information, 'neither was the coffin lined with anything at all.' This was in compliance with the Act of 1666 under which woollen shrouds only one were permitted to be used in England. To this obligation the lines written on a famous actress buried in Westminister Abbey would seem to refer:

'Odious in woollen, 'twould a saint provoke,'
Were the last words that poor Narcissa spoke.
'One would not sure be ugly when one's dead,
And Betty, give this cheek a touch of red.'

How many woollen shrouds the river has been responsible for the extracts do not tell us.

CHAMBERS' JOURNAL.

DEVELOPMENT OF A MOSLEM BENGALI LITERATURE.

I have often wondered whether the present day Bengali Literature reflects sufficiently well the Moslem mind of Bengal. Actual examination of facts shows the number of Mahomedan writers to be so small, their contribution to literature so slender and so little varied, that this body of literature can hardly be regarded as embodying the hopes and aspirations, the religious, social and intellectual ideals of the community. I am sure that the generality of opinion will go with me when I say that so much as can be said to exist of a Moslem Bengali literature is meagre, and altogether unworthy of the Moslem intellect.

For surely nothing could have been more unfortunate than this—that half of the Bengalee speaking people should not express their mind through the medium of the same literature which the other half is making use of. Bengali Literature is bound to remain incomplete until supplemented by such a branch.

This fact being admitted, I have often looked for the causes that have brought about and made possible the continuance of such a state of things. I shall try to discuss here some of these.

The first reason that suggests itself to me is that the Hindus were the first to enter the field of literature in Bengal, and that they have, by an earlier culture of it, so set their mind's stamp on the literature, that the average Mahomedan writer can now but write after the set model. In the early and the Middle Scots literature, the literature of Barbour and Drummond, of Henryson and Dunbar, a parallel may be found to our case.

To break away from this tradition, to my mind, will be possible only for the strength of a great genius. Such a force alone will be able to refashion the present established order, and impart to the Bengali Literature that unique quality which will make it Moslem. It seems, therefore, that we must wait till such a writer is born. Still, evidently, it is in the hands of the Moslem young men to increase the chances of such a writer appearing in no distant future by taking to literature in larger numbers.

Nay, what is more—this is imperative. For, I do not believe, that a single individual, however vigorous his personality, will be able to do anything unless there is a corresponding energy below. By taking more kindly to the culture of literature the community must come to acquire a certain mental tone which at present is wanting. This tone the great writer cannot originate: he can only make it more distinct and rich.

More definite and universal than this first is the cause which we shall now discuss. This is the general want of Bengalee education that even a little while ago prevailed among the Mahomedans. Even at the present day, education cannot be said to have become sufficiently wide-spread in the community. Still I should think, that point in their progress has now been reached from which literature may emanate. And as education is dependent on literature for its propagation, the call for this new literature must now be urgent and persistent.

But in my opinion what has been most mischievous in this connection is a love—I am afraid an unreasonable love—for the Urdu language. It is an every day experience to see two Mahomedan gentlemen meeting in the street, and holding converse in Urdu, although it is perfectly plain that with both of them Urdu is nothing more than an acquired tongue. To arrogate thus to the position of the language of polite society is nothing less than denying Bengali all the graces and life of cultured dialogue—the quick and sparkling turns of expression, the thrust and parry of wit, the light of emotion, which are its natural inheritances. Again, I am not sure, whether by trusting to Urdu for expression all that is best in Moslem culture, the Mahomedan mind is not losing much of its flower of thought and feeling. This would appear inevitable owing to the limitations that necessarily come upon one when one tries to express one's mind through an acquired tongue. This is the other side of the shield, and we cannot shut our eyes to it.

We often hear so much noise made in certain quarters about the teaching of Urdu in the primary and the Secondary Schools, that we cannot but wonder what it may all be due to. It has its analogue, let me admit, in the clamour for the spread of Sanskrit learning. I

can easily see how in a way it is natural for communities to hold fast to their past—to linger by the well-heads of inspiration that fed them in their infancies, and which are still dear to them for the sake of the tender associations of the dear Auld Lang Syne !

But I cannot think that even this praiseworthy faithfulness to the past is a good enough reason for making us careless, even in the smallest degree, of the present, lest through carelessness we make ourselves less adaptible to our environments, and suffer consequently in the struggle for existence.

Surely in thus deprecating the general study of Urdu and Sanskrit, I make no reflection on them as languages. They are both excellent languages in their own way, and, as we shall presently see, no scheme for the improvement of the Bengali language and literature can possibly ignore them. Nor am I opposed altogether to the spirit of harking back to the past. What I particularly object to is the spirit which seeks to cling to these two languages to the utter neglect of Bengali. That these two languages will always remain the necessary and profitable study of a few is beyond all doubt. But to give a hasty generality to what is good only in the particular is not always sound reason. Let it be understood that Bengali is the mother tongue of the majority of us, and that in its improvement has the improvement of the Bengalee people.

Probably by being something of a bilingual people—that is having an acquaintance with Urdu in addition to Bengali—the Bengali Mahomedans are free from some of the disadvantages that arise from the want of a common tongue, in a country in different parts of which different languages are spoken. But now-a-days, English supplying the same—nay, a much wider need, surely the value of a knowledge of Urdu is not the same as it once might have been. Moreover, the question to-day is not so much that of commerce and intercourse between the different parts of any one country, as it is of the coming together of all the countries of the world. And in the service of this end Urdu obviously cannot compare with English.

Possibly the mixed character of the Bengalee Mahomedans as a community has stood in the way of Bengalee becoming the mother

tongue of nearly all of us. For, whereas the majority of the Bengalee Mahomedans has come in course of time to adopt Bengali as its mother tongue, there is still a small class which has stuck to Urdu. As regards this latter class the problem is rather a difficult one. But much light can be thrown on the question, as it stands in relation to this class, by a reference to the case of the Anglo-Normans after the loss of Normandy in 1204. In less than a century these Anglo-Normans had nothing left for them, but to cast their lot with the Saxons, and adopt the language of the majority. If such a conversion has not already taken place among the Urdu-speaking section of the Mahomedan Community, all will agree that it is high time now that this should happen. And even if this is not to be, our scheme will scarcely suffer because of that. Let this small class retain their old interests and associations. The rest can easily give their time to the service of what they know to be their mother-tongue. The minority will no doubt some day follow.

So much for the class of Mahomedans whose mother-tongue is Urdu still. The other section —which has adopted Bengali—has a large admixture of converts from Hinduism. It may be contended that a large part of this second section having been at one time Hindus, its psychical life is almost the same as that of the parent stock. For, the grooves of thought and feeling once settled into after a length of time are difficult to get away from.* It seems consequently doubtful whether we are justified in expecting of this people a literature with a richer life, and a newer perception of beauty: for the mental life it is which is the mainspring of all literary inspiration. And what is more discouraging is this—that the sparse body of literature that has upto this time been produced by Mahomedan writers seems to bear out this apprehension.

This is a most serious objection, and seems to cut at the very root of such a conception as we are trying to elaborate. Still, to my mind the case is not so desperate after all. By following a different religion, and by imbibing a different tradition, for these several hundred years these Mahomedans have come to acquire a certain uniqueness as

a community. Especially powerful in imparting this individuality has been the force of religion.

Now, religion has been in all ages and countries, side by side with love, one of the sources of the most intense poetical fervour and flow. Even the profligate times of Charles II in England saw the advent of poets of such rapturous religious ecstasy as Vaughan, Herbert, Crawshaw and Traherne. Thus in this new literature it cannot be categorically laid down that newness of thought and feeling will altogether be wanting.

The causes I have so far discussed are what I take to be actual factors which have delayed the making of a Moslem Bengali literature. Besides these there are certain prudential considerations which must be taken into account in a comprehensive discussion of the question at issue.

To a superficial view the development of such a literature will seem to be a doubtful boon, for it may prove inimical to the growth of a friendly feeling between the Hindus and the Mahomedans. But it is clear that the sort of development we are advocating will not be in some senses a new thing at all at hostility with what may be called the Hindu branch of the literature. What I mean is that there will come to be produced in larger number books that will mirror the Moslem self. This literature will be no more than a tributary to the main current of Bengali literature, meandering through fresh fields and pastures new.

Looked at from another point of view this objection will appear to be founded on erroneous psychology: for, perfect union between two peoples is possible only when each has realised to the fullest extent its own individuality.

Again, it is easy to put a new growth of this sort under a ban by labelling it as sectarian, and by pronouncing over it the meaningless commonplace that "sectarianism debases art," and that "the expression 'sectarian art' involves nothing less than a contradiction in terms." It is pointed out that the highest art transcends the limits of time, and place, and religion, and nationality. It is broad-based on the deepest sentiments of the human heart, and feeds itself on the infinite universal

shows of earth and sky,' the perennial mystery of existence and the universe. In the domain of that art there is neither Hindu nor Mahomedan: it is only the expression of the common human nature a touch of which makes us all akin.

These general principles are sometimes marshalled in to discourage the production of literature that may contain the transcript of the things and events of the work-a-day life, or of the uniqueness coming out of participation in a particular sect or environment. But the fundamental fallacy of raising these arguments in such a context, as the present one, becomes at once manifest when we remember the platitude that a country's literature is not made up entirely of the contributions of the greatest masters alone. In all literatures, with the exception of one or two, there must be a majority of lesser writers who must work within limitations, and for whom it is impossible to rise above local conditions. An attempt on the part of these writers to mimic the highest kind of art will have a disastrous effect on the trend of the literature of that country. This is true of all the other fine arts also. An illustration from the history of painting will make my meaning clear. The examples of Raphael's 'Madonnas,' of Titian's 'Holy Family,' and of Botticeli's 'Birth of Venus' have led many lesser minds astray, and finally to lose their life's fulfilment.

It will be seen from all that has been said above that all objections against such a literature are groundless. There is absolutely no reason, therefore, why such a literature will not come into being in the immediate future if only my Moslem friends will throw their whole soul into its making.

The necessity of the rise of such a literature can scarcely be exaggerated. While the necessity has always existed on general grounds, the present trend of circumstances in this country is investing this general demand with a peremptoriness hitherto undiscerned. A movement is afoot in the country which is demanding secondary education through the Vernacular. I do not propose to enter here into a discussion of the merits of this movement. Still I should say that I believe that there is much truth in it; and as far as one can read the

signs of the times, at no distant date the aspirations of these reformers will, at least partially, be fulfilled,—and fulfilled for the good of the country.

Let us remember that education and literature are bound up together by a curious tie of double relation. Education at a certain height bodies itself forth in literature, and in its turn is again dependent on literature for its propagation. This being so, may we not pertinently enquire on what sort of books our Moslem friends will rely for the training of their boys? I know of nothing in the whole range of the present-day Bengali literature which will develop the Moslem uniqueness in the young Moslem students: nothing that will awaken the true spirit of Islam in their hearts. The true education is that I take it, which will perform this, as opposed to a merely utilitarian training of the intellect which takes no account of the education of the heart and the finer sensibilities.

I believe that in the creation of a literature which will have the stamp of the true Moslem self lies the only way out of this tangle. This will be such a literature as will reflect completely the life-history of the community—such as may enable the future historian, even in the absence of all historical monuments, to reconstruct a complete narrative of the social, intellectual and spiritual yearnings of the modern Mahomedan. To ask whether such is the most desirable kind of literature possible is irrelevant. The stamp of necessity is on the whole business; and all theoretical considerations about its desirability are worse than useless.

The gains that will come to the Bengali language from the creation of this literature will be immense. Besides having its vocabulary considerably enlarged, the language will gain immeasurably in point of raciness and fluency from a contact with Urdu. The practice of a rising young poet of our day who makes a large use of Urdu words in his poems has proved so eminently successful that it leaves no doubt on the point.

Our survey will hardly be complete if we leave it here without an attempt to indicate the lines on which the development of this new literature will have to take place. This we shall do in as

short a space as possible, and then the end is reached. Let us begin by seeing what it should not be, and then its positive characteritics will emerge out of the ruin of these negations.

Evidently such a literature cannot be created by merely using Mahomedan names in novels and stories, where the spirit is of the set Hindu type. Yet unfortunately this tendency has manifested itself in certain quarters, especially in the text-books for the primary and the Secondary Schools. Where you used to get Ram in the older text-books you now come across Abdul. It is difficult to discover either the beauty or the utility of this change. This curious phenomenon has arisen, as if in mockery, of the demand of the Education Department for inclusion in the text-books of such matter as may develop the spirit of Islam in the Mahomedan students.

Nor will this literature be created by going to the opposite extreme, and by importing narratives wholesale etc., from Arabic, Persian or Urdu. For, obviously translation only cannot make up a literature. Again, these narratives are at best imbued with the Islamism of a far-off time. In them the life-beat of a living consciousness is wanting. It would have been all right if instead of translating, the spirit of these old narratives could be spontaneously recovered. But the modern life has drifted so far away from the life represented in these narratives that such a recovery is hardly either possible or desirable.

The quality that will make this new literature Moslem is indeed so subtle that even representations of the more superficial aspect of Moslem life will not contain it, far less the use simply of Mahomedan names in narratives and stories. These representations of course have their value in so far as they may serve to give a Mahomedan atmosphere to the writing, something analogous to what is technically known as 'local colour'. But beyond this the utility of these representations does not extend. For, these can no more infuse the true Moslem spirit into the literature we are contemplating than a beautifully carved monument can "call back to its mansion the fleeting breath".

These negations leave us with the one essential thing which will

make possible the growth of a healthy Moslem literature in Bengal. The intensely realised Moslem self must be thrown into the task. The other methods we have discussed may mark tentative stages in the growth, and as such may have their value. But this last condition it is which may lead to the final consummation.

Just before I end I should like to make my contention as definite as possible. It is not merely that I am urging the Mahomedans to write in Bengali : nor is it merely that books by Mahomedan writers should come to be produced in larger numbers. My scheme, though involving both these conditions, is yet something more than these two taken together. Externally the thing will look like this : Mahomedan writers will take more kindly to Bengali literature : many books will come out from their pen : and these will unconsciously reflect the Mahomedan mind. But of the three the last is the most important condition ; without this every thing else is of small consequence.

I would have been content if I could end simply with discerning the necessity of a Moslem literature. But the future is infinitely more hopeful. For, powers beyond human control are leading the Moslem national life to a high destiny. And surely at no far-off time the completely realised self of the Moslems will throw itself irresistibly into a literature unique in itself and full of colour. The development, therefore, of a Moslem Bengali literature is not so much expedient or necessary, as inevitable.

SATYENDRA NATH ROY.

I WILL REPAY.

I saw his mother from the table rise :
She dropped the letter as she read it there
And slowly went, a darkness in her eyes,
And in her heart despair.

"Ye allied nations, hear my call to you :
Let not smooth talkers at the last persuade
You to forgo your payment, but be true
To the great oath ye made.

"They shot my son where on the field he lay,
Helpless they shot him, spurned him like a clod.
I'll watch them cower on the Judgment Day
Before the voice of God."

D. G. D.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৭ম খণ্ড। | ঢাকা—কার্ত্তিক, ১৩২৪। | ৭ সংখ্যা।

আলওয়ালের পদ্মাবতী।*

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সেখ হামিদুল্লা নামক জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক আলওয়ালের পদ্মাবতী প্রথম ছাপা হয়। চট্টগ্রামের মুসলমান কবিগণের আদর্শে এই কাব্যখানি ফারসী অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। সেখ হামিদুল্লা তাহাই বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। †

প্রকাশ-কাব্য মোটেই সুচারু হয় নাই। এই পুস্তক দেখিয়া বটতলার অন্যান্য মুসলমানী কেচ্ছার পুস্তক হইতে যে ইহা উচ্চদরের গ্রন্থ তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। অধিকন্তু, বঙ্গাক্ষরে ছাপা হইলে উর্দ্দু পুস্তকের মত ইহার পাঠ করিতে হইবে শেষদিক হইতে। ইহাতে এই সুন্দর কাব্যখানি পাঠ করিবার স্পৃহা জনসাধারণের বৃদ্ধি পাইবে তাহা বোধ হয় না। তারপর বর্ণাশুদ্ধি এত আছে যে তাহা পড়িয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। কবির সময় নির্দ্দেশ করিবার ও কাব্যের কোন সমালোচনা করিবার কোন যত্ন করা হয় নাই। বটতলার পুস্তকে তাহা প্রত্যাশাও করিনা।

কাব্য খানি উৎকৃষ্ট ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার স্থান অতি উচ্চে। ইহার শুদ্ধ ও সুচারু সংস্করণ প্রকাশ হওয়া কর্ত্তব্য। সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আব্দুলগফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই পদ্মাবতীর একটা সংস্করণ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ভরসা করি শীঘ্রই তাহা করিয়া উঠিতে পারিবেন।

* গৌহাটী সাহিত্য-পরিষদ শাখার তাদ্রের অধিবেশনে পঠিত।

† মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে লেখা আছে যে প্রকাশক "৺ সৈয়দ আলওয়াল পণ্ডিতের পুত্র শ্রীসৈয়দ নুরুদ্দিনের নিকট হইতে" এই পুস্তকের হস্তলিপি খরিদ করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত কথার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা কঠিন। প্রকাশকের কয়েক শতবর্ষপূর্ব্বে আলোয়াল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক কালের হামিদুল্লা সেখের সহিত কবির, পুত্রের সাক্ষাৎ কিরূপে সম্ভব?

কবি আলওয়ালের জীবনী সম্বন্ধে যৎসামান্য যাহা কিছু তাঁহার আত্মবিবরণী হইতে জানিতে পারা গিয়াছে তাহা এই :—ফতেয়াবাদ (ফরিদপুর) পরগণার জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি "মজলিস" * কুতবের একজন সচিবের পুত্র এই আলোয়াল কবি। যৌবনকালে তিনি পিতার সহিত গমন করিতেছিলেন এমন সময় তাহাদিগের তরী হার্ম্মাদ (পোর্ত্তুগীজ জলদস্যু) গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও তাঁহার পিতা নিহত হন। আলোয়াল কোনও প্রকারে বাঁচিয়া রোসাঙ্গে (আরাকানে) উপস্থিত হন। আরাকানরাজের অমাত্য মাগন ঠাকুর † ইহাকে আশ্রয় দেন ও ইহাঁরই আদেশে আলোয়াল পদ্মাবতী রচনা করেন। মাগন ঠাকুরের মৃত্যুরপর সুজার আরাকানে আগমন হয় ও সুজার মৃত্যুরপর আরাকান রাজ কর্ত্তৃক মুসলমান পীড়ন আরম্ভ হয় ও সেই সময় প্রায় ৯ বৎসর আলোয়াল অতিশয় দীন ভাবে যাপন করেন। তিনি নানা চক্রান্তে পড়িয়া কারাগারে পর্য্যন্ত নিপতিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি ঐ আরাকানের সৈয়দ মুসা নামক অন্য একজন মুসলমান ওমরাহের আশ্রয়ে থাকেন।

দীনেশ বাবুর মতে আলোয়াল ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাহ সুজা আরাকানে যান ১৬৫৮ খ্রীঃ। অতএব আলোয়াল এই সময় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

পদ্মাবতী ভিন্ন আলোয়াল মাগন ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকিয়া "ছয়ফুলমুলুক ও বদিউজ্জমাল" নামক ফার্সী-কাব্যের অনুবাদ করেন। মাগন ঠাকুরের জীবিতকালে তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, পরে সৈয়দমুসার আশ্রয়ে আসিয়া তিনি পুনরায় শান্তি পাইলে পর ইহা সম্পূর্ণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি মুসলমানী কাব্য লিখিয়াছিলেন যথা, দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রানী' ও 'সতীময়না' নামক কাব্য দুখানির উত্তরাংশ ও নেজামি গঞ্জবীর "হপ্ত পয়কর" নামক পার্সীকাব্যের বঙ্গানুবাদ।

পদ্মাবতী কাব্যই আলোয়ালের প্রধান কীর্ত্তি। অন্যগুলি সাধারণ মুসলমান কেচ্ছা—তাহাতে কবিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু পদ্মাবতীর উপাখ্যান বিষয় সর্ব্বজন-বিদিত রাজপুতকুল-মহিষী বিখ্যাত পদ্মিনীরাণীর কাহিনী। এইরূপ সর্ব্বজনপূজ্য চরিত্র লইয়া যদি সুন্দর ভাষা ও মধুর কবিত্বসহযোগে কাব্য রচিত হয়, তবে তাহা সমগ্র বাঙ্গালী পাঠকের নিকটে আদরের বস্তু হওয়ারই সম্ভাবনা। এই পদ্মাবতীকাব্যে একজন মুসলমান কবি যেরূপ হিন্দু রীতিনীতির জ্ঞান দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে মুসলমান ও হিন্দুগণের মধ্যে প্রচুর সদ্ভাব ছিল। মুসলমান রাজা অবসর সময়ে আগ্রহের সহিত হিন্দুদিগের কাব্য ইতিহাস শুনিয়া সুখ অনুভব করিতেন ও হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ করাইতেন। গৌড়ের রাজা হুসেন সাহ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁহারই অনুগ্রহে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করিতে আদেশ করেন। এই অনুবাদই পরাগলী মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ। পরাগলের পুত্র ছুটীখাঁর আদেশে শ্রীকরনন্দী মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করেন। আলোয়ালের প্রভু মাগন ঠাকুরও মুসলমান ছিলেন। মুসলমান হইয়াও তিনি হিন্দুদিগের প্রিয় পদ্মাবতী উপাখ্যান লইয়া কাব্য লিখিতে আদেশ করেন। এইরূপে বাঙ্গালা ভাষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদিগের নিকট ঋণী।

তখনকার জাতীয় জীবনেও হিন্দু মুসলমানে অতিশয় প্রীতি ছিল, তাহার বহু নিদর্শন প্রাচীন সাহিত্যে আছে

* দীনেশবাবু লিখিয়াছেন "মসনের"। কেন বুঝিতে পারিলাম না। কাব্যের মধ্যে "মজলিস" নাম আছে।

† মুসলমানের কেন "মাগন ঠাকুর" নাম হইল, কবি তাহার কৈফিয়ৎ এইরূপ দিয়াছেন :—

প্রভুস্থানে মাগিয়া পাইল প্রার্থনা করি।
তে কারণে 'মাগন ঠাকুর' নামধরি।

ও এখনও সামাজিক জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানের পর্ব্বে হিন্দু যোগদান করিত ও হিন্দুদিগের পর্ব্বে মুসলমানেরা যোগদান করিত। পীরের সিন্নি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই শ্রদ্ধাভক্তির বস্তু ছিল। আধুনিক রাজনৈতিক রেষা রেষিতে এই প্রীতির ভাব অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। স্বয়ং প্রবন্ধলেখককেও এক বিবাহ ব্যাপারে পূর্ব্ববঙ্গের এক গ্রামে বিবাহ-শেষে পীরের দরগায় পূজা দিতে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল।

এই সব কারণে আমি বলিয়াছি যে আলোয়াল যে হিন্দু আচার ব্যবহারের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহা এখন আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে, তখন ছিল না।

এই পদ্মাবতী কাব্যের লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয় ইহার সংস্কৃত মূলক ভাষা। কবি সংস্কৃত কতদূর জানিতেন তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে কিছু যে জানিতেন তাহা বেশ বুঝা যায়। তাঁহার আশ্রয়দাতার নাম মাগন। এই মাগন নামের এক ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন এইরূপ :—

নামের বাখান এবে শুন মহাজন।
অক্ষরে অক্ষরে কহি ভাবি গুণগণ॥
মান্তের মাকার আর ভাগ্যের গকার।
শুভযুগ্মে নক্ষত্রের আনিল নকার॥
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে।
রাখিলেন্ত মহাজন অতি মন-শুভে॥
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল।
কাব্যশাস্ত্র ছন্দোমূল পুস্তক পিঙ্গল॥
পিঙ্গলের মধ্যে অষ্টগণ-মূল।
তাহাতে মগণ আভ বুঝ কবিকুল॥
নিধিন্থির কল্পপ্রাপ্তি * মগণ ভিতর।
মগণ মাগণ এক আকার অন্তর॥
আকার সংযোগে নাম হইল মাগণ।
অনেক মঙ্গল ফল পাইতে কারণ॥

* দীনেশ বাবুর ব্যাখ্যা—নিধির স্থিরতাপ্রাপ্তি অর্থাৎ মগণে লক্ষ্মী অচলা থাকেন।

গ্রন্থকার এই উদ্ধৃত অংশে সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের মাদি অষ্টগণ ও এই অষ্টগণের দেবতা ও ফল সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন। অধিকন্তু, একটা নাম ব্যাখ্যায় এরূপ কূটবুদ্ধির প্রকাশও সংস্কৃত কবিতাধ আলোচনার ফলই বোধ হয়।

আলোয়াল "ছয়ফুলমুলুক ও বদিউজ্জমান" কাব্যে লিখিয়াছেন,

আজ্ঞা পাইয়া রচিলাম পুস্তক পদ্মাবতী।
যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি॥

বাস্তবিকই আলোয়াল পদ্মাবতী কাব্যে গভীর পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। "তিনি পিঙ্গলাচার্য্যের মগণ, রগণ প্রকৃতি অষ্টমহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন; আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষপ্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনী চক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োরমত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্ত বন্দনার উপকরণের একটী শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন।" (দীনেশ বাবু)।

দুএকটী উদাহরণ দিতেছি :—

সপ্তসমুদ্রের উল্লেখ।

কঠিন দুর্গম পন্থ অকুল অপার।
সাবধানে থাকি সমুদ্র হইও পার॥
খার খিরো দধি আর সমুদ্রউদধি।
সুরাজল কিবা আর এসপ্ত অবধি॥
হিন্দুস্থানী ভাষে নাম ধরে এই মত।
সংস্কৃতভাবে যেই শুনহ যেকত॥
প্রথমে লবণ ইক্ষু সুরা ঘৃত আর।
দধিদুগ্ধ জলান্তক শুন কহি সার॥

কাকুনচ পক্ষীর বিবরণ।

কাকুনচ নামে এক মহা পক্ষীবর।
হিন্দুস্থান দেশে থাকে পর্ব্বত উপর॥

নির্ম্মল শ্যামল অঙ্গ চরণরাতুল।
দীর্ঘপুচ্ছ আঁখি যুগ মাণিকের তুল॥
হীরা জিনি চঞ্চুতার সব রন্ধ্রময়।
আহার করিতে বায়ু সম্মুখে রহয়॥
পবন সম্মুখে যদি প্রসারয় চুঞ্চ।
রন্ধ্রপথে প্রবেশিয়া শব্দ হয় উঞ্চ।
প্রতিরন্ধ্র পথে উঠে নানা যন্ত্রশব্দ।
পশুপক্ষী মূর্চ্ছা যায় শুনি হয় স্তব্ধ॥
সেই সুধাময় শব্দে হইয়া বিস্মিত।
ভাবেতে বিভোল হই নাচে সুললিত॥
তাহার পশ্চাতে সেই স্থানেতে নির্ভয়।
নিত্যহ কাষ্ঠপুঞ্জ আনিয়া সঞ্চয়॥
চিরকালে এই মতে হয় কাষ্ঠরাশি।
তবে তার মৃত্যু উপস্থিত হয় আসি॥
সেদিন সমস্ত চঞ্চু করে প্রকাশিত।
নানামতে শব্দ উঠে অতি সুললিত।
নানান্ ভঙ্গিমা করি নাচে সেই দিনে।
পশুপক্ষী এক নাহি রহে অন্যস্থানে॥
সিংহকরিমৃগ ব্যাঘ্র একত্র মিশিয়া।
চাহন্ত পক্ষীর রব এক মত হইয়া॥
এমত নাচিয়া যদি পুরায়ন্ত আশ।
দুই পাখে কাষ্ঠপুঞ্জে করয় বাতাস॥
দৈবগতি কাষ্ঠপুঞ্জে লাগয় আগুনি।
সেই অগ্নি মধ্যে পক্ষী পড়য় আপনি॥
ভস্মরাশি হই অগ্নি শান্ত হয় যবে।
এক ডিম্ব তার মধ্যে উপজয় তবে॥
সেই ডিম্ব হন্তে পক্ষী পুনিজন্ম হয়।
যেমতেকহিল সেই কর্ম্মেতে রহয়॥ *

ভাষা বেশ সংস্কৃতমূলক দেখা যাইতেছে। আপনারা দেখিবেন যে ক্রিয়ার আসামীর মত রূপ হইয়াছে—"পুরায়ন্ত, চাহন্ত।" আর, "হইতে" এই কথার পরিবর্ত্তে সমগ্র গ্রন্থে "হন্তে" অথবা "হনে" ব্যবহৃত হইয়াছে।

পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় কবি তাহার রচনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যে যে সকল রূপবর্ণনা আছে, তাহাতে অত্যুক্তি ও উপমার ছড়াছড়ি থাকে। এই কাব্যেও তাহা আছে। এই বর্ণনাটী অতি দীর্ঘ—সমগ্র উদ্ধৃত করা অসম্ভব কতকটুকু উদ্ধৃত করিতেছি :—

পদ্মাবতীরূপ কি কহিব মহারাজ।
তুলনা দিবার নাহি ত্রিভুবন মাঝ॥
আপাদমস্তক কেশ কস্তুরি সৌরভ
মহা অন্ধকার মন দৃষ্টি পরাভব॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
সাম্যতা সৈষ্ঠব কেহ নহে সমস্বর॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবন মোহন।
একগুণে ডংসিতে পারে ত্রিভুবন॥
বিরাজিত কুসম গুঁথিত মুক্তাহার।
সজল জলদ মধ্যে তড়িৎ সঞ্চার॥
তারমধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী॥
স্বর্গ হইতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্য মধ্যে মহাশুদ্ধ পথ॥

অন্যস্থানে,

* * *

স্বেদবিন্দু কপালেতে উপয় যখন।
মুকুতা আসিল কিবা ভ্রাতৃ সম্ভাষণ॥

* * *

ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল॥

* * *

নাসা হেরি শুকপক্ষী গতি বনান্তর।
লাজে তিল কুসম্বিনী দুলায় ধূসর॥

* * *

রসনা কমল পত্র কমল বচন।
ইঙ্গিত হাসিতে করে সুধাবরিষণ॥
লজ্জিত চাতক পিক শুনি সুধাবাণী।
সমতুল নহে বংশী যন্ত্রকুলধ্বনি॥

* ইংরেজী কাব্যেও এই পক্ষীর বিবরণ পাওয়া যায়। এ পক্ষীর ইংরেজী নাম Phoenix.

গমন ভঙ্গিমা হেরি স্বর্গ নারীগণ।
তেকারণে ভূমণ্ডলে না দে দরশন॥

এই প্রকার বর্ণনা চলিয়াছে। আলোয়ালের উপমার চাতুর্য্য যথেষ্ট আছে, অত্যুক্তি গুলি মনোরম; ভাষার প্রবাহ অতি সরল। কথার জন্ত কবি কোথাও ঠেকেন না। এই প্রকার সংস্কৃতমূলক শুদ্ধ ভাষায় ও এইরূপ চাতুর্য্যের সহিত লিখিত বর্ণনা পাঠ করিয়া, সৌন্দর্য্যময় বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই ভারতচন্দ্রকে মনে পড়ে। ভারতচন্দ্রের ছন্দের কৃতিত্ব পুরামাত্রায় আলোয়ালে নাই, কিন্তু শব্দসম্পৎ সমান মাত্রায় আছে বলিতে পারা যায়। রচনার এই ভঙ্গী দেখিয়াই দীনেশবাবু কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বিবরণের ভূমিকা করিয়াছেন আলোয়ালের পদ্মাবতীর সমালোচনা করিয়া; অথচ ভারতচন্দ্রের শতবর্ষ পূর্ব্বে পদ্মাবতী লিখিত হইয়াছিল। সুদূর আরাকানে বসিয়া আলোয়াল কবি কিরূপে ভাষার এই রীতি প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিকদিগের ভাবিবার বিষয়। এই পদ্মাবতী কাব্য কিরূপে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহা জানিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই। * চট্টগ্রাম অঞ্চলেই ইহার প্রচার ছিল এবং তথা হইতেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভাল একখানি সংস্করণ বাহির হওয়া আবশ্যক যাহাতে এই সকল তথ্য আলোচিত হয়।

এখন কাব্যখানির কথা বলিব। পদ্মাবতী কাব্যখানি আলোয়ালের মৌলিক রচনা নহে, অনুবাদ মাত্র। অনুবাদ বলিলে অক্ষরানুবাদ বুঝিতে হইবে না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীরাম দাসের মহাভারত যে অর্থে মূল সংস্কৃতের অনুবাদ সেই অর্থে পদ্মাবতীও অনুবাদ গ্রন্থ; অর্থাৎ গল্প ও বর্ণনা বিষয়গুলি, পাত্রপাত্রীর নামধাম ইত্যাদি মূল হইতে লওয়া হইয়াছে; বাকী যা কিছু তাহা সবই কবির নিজস্ব। কবি বলিতেছেন :—

কাব্যকথা সকল সুগন্ধ ভরপুর।
দূরেত নিকট হয় নিকটেত দূর॥
নিকটেত দূর যেন পুষ্পের কলিকা।
দূরেত নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা॥
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বস।
নিয়রে থাকিয়ে ভেকে না জানয় রস॥
এই সূত্রে কবি মহাম্মদ করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজমম উক্তি॥

কবি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। উপাখ্যানভাগে তিনি মালেকমহম্মদকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ব্বযুগে এইরূপ অনুবাদের বহুল প্রচার হইয়াছে ও তাহাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

“জায়স” নগরে উদ্ভূত মালেকমহম্মদ কৃত “পদ্মাবৎ” নামক হিন্দীকাব্য আলোয়ালের উপজীব্য মূলগ্রন্থ। মালেকমহম্মদ অতি উচ্চদরের সাধক ফকির ছিলেন। তিনি সেরসাহের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে মালিকমহম্মদ আমেথির রাজার শিষ্য ছিলেন। তথাকার রাজদুর্গের সম্মুখে এখনও মালিকমহম্মদের সমাধি দৃষ্ট হয়।

মালিকমহম্মদের কাব্য আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; অতএব এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই হিন্দী কাব্যখানি অতি উচ্চ অঙ্গের ও গ্রন্থখানিতে আধ্যাত্মিক ভাবের ছড়াছড়ি। কাব্যখানির রসাস্বাদন করিতে পারিলে পরমাত্মাকাঙ্ক্ষী লোকের হৃদয় আনন্দ লাভ করিবে।

কাব্যখানির প্রশংসা আরাকানপর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল কাব্যখানি লিখিত হইয়াছিল ৯২৭ সালে অর্থাৎ ১৫২১.

* কবি নিজে মাত্র এই বলিয়াছেন যে মাগনঠাকুর তাহাকে আজ্ঞা করিলে তিনি ইহা লোকের বুঝিবার সুবিধার জন্ত, বাঙ্গালা পয়ারে মালিক মহম্মদের পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন :—

কৌতুকে আদেশ কৈল পরম হরিষে।
শীঘ্র বিজরাজ যেন অমিয়া বরষে॥
এই পদ্মাবতী রসে রচ রস কথা।
হিন্দুস্থানী ভাষে সে যে রহিয়াছে গোথা॥
রোসাঙ্গেতে আনলোকে না বুঝে এ ভাষ।
পয়ার রচিলে পুরে সবাকার আশ।

ষ্টঃ। গ্রন্থমধ্যে মালিকমহম্মদ নিজেই তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

সন নব সৈ সত্তাইস অহে।
কথা আরম্ভ বৈন কবি কহে॥

অতএব আলোয়ালের প্রায় শতবর্ষপূর্ব্বে এই কাব্য খানি লিখিত হইয়াছিল। উদারহৃদয় মালিকমহম্মদ হিন্দু রাজা ও রাণীর চিত্র আঁকিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিকভাব চাপাইয়া দিয়াছিলেন। পদ্মিনীর সমস্ত গল্পটী মালিক মহম্মদ উপসংহারে রূপকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তাহা হইতে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিষ্কাশন করিয়াছেন। যথা :—

তন চিতউর মন রাজা কীন্হা।
হিয় সিংহল বুধি পদ্মিন চীন্হা॥
গুরুসুবা জেহি পথ দেখাবা।
বিন গুরু জগত সো নিরগুণ পাবা॥
নাগমতী ইহ দুনিয়া ধংধা।
বাচা সোই ন ইহ চিত বন্ধা।
রাঘো দূত সোই শৈতানু।
মায়া আলাউদীন সুলতানু॥
প্রেমকথা এহিভাঁতি বিচারু।
বুঝলেহু জো বুঝহি পারু॥ *

এই রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আলোয়াল গ্রহণ করেন নাই, তবে অন্যান্যস্থানের আধ্যাত্মিক ভাব কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে আলোয়াল ভাবুক ও সুবিবেচক ছিলেন। কাব্য খানিকে রূপক না করিয়া কাব্যই রাখিয়াছেন, তবে ভাল ভাল তত্ত্বকথা ভক্তিনতশিরে গ্রহণ করিয়াছেন। আলোয়ালের গ্রন্থারম্ভে যে বন্দনা আছে, তাহার কিয়দংশ এই :—

বিছামিল্লা প্রভুরনাম আরম্ভ প্রথম।
আত্তমূল শির সেই শোভিত উত্তম॥
প্রথমে প্রণাম করি এক কর তার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥
করিল পর্ব্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তারপরে প্রকটিল সেই কবিলাস॥ †
সৃজিলেক আগুণ পবন জলক্ষিতি।
নানারঙ্গ সৃজিলেক করে নানা ভাতি॥
সৃজিলেক পাতাল মহী স্বর্গনর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার॥
সৃজিলেক সপ্তমহী এসপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড॥
সৃজিলেক দিবাকর শশী দিবারাত্রি।
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্ম্মল পাঁতি পাঁতি॥
সৃজিলেক সুশীতল গ্রীষ্ম রৌদ্র আর।
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার॥

মালিক মহম্মদের পদগুলি এই :—

সুমিরো আদি এক করতারু।
জীহজীব দীন্হ কীন্হ সংসারু॥
কীন্হেসি প্রথম জ্যোতি পরকাসু।
কীন্হে সি তিন হি প্রীতি কৈলাসু॥
কীন্হে সি অগ্নি পবন জল খেহা।
কীন্হে সি বহুতে রংগ উরেহা॥
কীন্হে সি ধরতী সরগ পতারু।
কীন্হে সি বরণ অবতারু॥
কীন্হে সি দিন দীনেশ শশীরাতি।
কীন্হে সি নখত তরায়ন পাতি॥
কীন্হে সি ধূপ সীঁব ঔ ছাঁহা।
কীন্হে সি মেঘ বীজু তেঁহি মাঁহা॥
কীন্হে সি সপ্তমহী ব্রহ্মাণ্ডা।
কীন্হে সি ভুবন চৌদহো খণ্ডা॥

ইত্যাদি।

আপনারা দেখিবেন, আলোয়াল এই স্থলে অক্ষরানুবাদই করিয়াছেন। ভাল ভাল স্থলগুলিতে তিনি মালিক মহাশয়কে এইরূপই অনুসরণ করিয়াছেন। আলোয়াল উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

---

* চিতোর—তনু। রাজা—মন। সিংহল—হৃদয়। পদ্মিনী—বুদ্ধি। শুক—গুরু। নাগমতী—সংসার। রাঘবদূত—সয়তান। আলাউদ্দীন—মায়া।

† আদি কবির (ব্রহ্মার) ইচ্ছা। (দীনেশ বাবু)

কোথা গেল দিল্লীশ্বর কোথা কামভাব।
কোথা গেল পাত্রমিত্র বল ছত্রসব॥
কোথা গেল গন্ধর্ব্বসেন সঙ্গে মন্ত্রীগণ।
কোথা গেল রত্নসেন সঙ্গের রাজন॥
কোথা গেল চিত্তান্তর রত্ন চিত্রসেন।
কোথা গেল পদ্মাবতী ত্রৈলোক্যমোহন॥
কোথা গেল হীরামণি শুক সে পণ্ডিত।
চিরদিন যার কীর্ত্তি আছে পৃথিবীত॥
কোথা গেল দিল্লীশ্বর　　গণ।
পরিণামে হেতু কিছু করহ যতন॥
একে একে গরাসিল দারুণ শমনে।
এতেক ভাবিয়া চাহ বুদ্ধিমন্ত জনে॥
সে সুখ সম্পদ কোথা গিয়াছে এখন।
কিছু না রহিবে দৈব কীর্ত্তির কথন॥
কুপাল চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
একের মানস লাগি লক্ষপ্রাণী হরে॥
কহে কবি আলোয়াল পুস্তক উপমা।
সমাপ্ত হইল পদ্মাবতী অনুপামা॥

মালিকমহম্মদে আছে ঃ—

ঔর্যর জান গীত অসকীহা।
কী ইহ রীতি জগৎ মঁহ চীহা॥
কঁহা সো রতন সেন অব রাজা।
কঁহা সুবা অস বুধ উপরাজা॥
কহা আলাউদীন সুলতানু।
কঁহা রাঘোজেই কীহ বখানু॥
কঁহা সুরূপ পদ্মাবত রাণী।
কুহুন রহীজগ রহী কহানী॥
ধন সোই জন কীরত জানু।
ফুল করৈ পৈ মরৈ মবাসু॥

কাব্যখানিতে পদ্মিনীর উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে কিন্তু ঐতিহাসিকতা যোটেই রক্ষা করা হয় নাই। পদ্মিনীর স্বামীর নাম দেওয়া হইয়াছে ভীমসিংহের পরিবর্ত্তে রত্ন সেন। আলাউদ্দীন শেষে রত্ন সেনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

যেন মতে যুদ্ধ ছিল কৌরবপাণ্ডব।
যে সব যুদ্ধ জিনি এ যুদ্ধের রব॥
ধার্ম্মিকের জয় হেন সর্ব্বশাস্ত্র কয়।
অধার্ম্মিক সোলতান সাহারণেতে হারয়॥
এই মতে তিন মাস মহাযুদ্ধ ছিল।
লজ্জা পাইয়া দিল্লীশ্বর পলাইয়া গেল॥
যত হিন্দু নৃপগণ হই এক ঠাঁই।
সোলতান সাহাকে সবে দিলেক খেদাই॥
সে সব সংগ্রাম কথা লিখি অন্ত নাই।
সহস্র পুস্তক হৈলে তবে অন্ত পাই॥
দিল্লীশ্বর গৃহে যাই ভাবিলা অপার।
সতী নারী টলাইতে সাধ্য আছে কার॥

ইতিহাসে আছে পদ্মিনীকে জহরব্রতে জীবন বলিদান দিতে হইয়াছিল, ভীমসিংহ অসি হস্তে জীবনদান করিয়াছিলেন; এই কাব্যে এরূপ শোকান্ত ব্যাপার নাই। আলাউদ্দীন হারিয়া গিয়া আর কিছু করিলেন কি না তাহার উল্লেখ নাই। বরং উল্লেখ আছে যে পরে রত্নসেন পদ্মিনীসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন, পদ্মিনীর দুই পুত্র হইল, সেই পুত্রদ্বয়ের বয়স যখন ৭ ও ৫ বৎসর, তখন রত্ন সেনস্বর্গারোহণ করিলেন ও তাঁহার দুই রাণী নাগমতী ও পদ্মাবতী সহমরণে গেলেন। বলা বাহুল্য মালিকমহম্মদের গল্পও এইরূপ।

রত্ন সেনের মৃত্যুর পর, কুমারদ্বয় দিল্লীশ্বরকে পিতার মৃত্যুসংবাদ দিয়া পত্র পাঠাইলেন—সেই পত্র পাঠ করিয়া,

রত্ন সেন মৃত্যু শুনি দিল্লীর ঈশ্বর।
প্রেম ভাবি দুঃখ শুনি কান্দিলা বিস্তর॥
শুনিলেক রত্ন সেন গেল পরলোক।
উষরা সহিতে সাহা কান্দে ভাবি শোক॥

আলাউদ্দীনকে কবি মহৎ করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। কুমারদ্বয়কে আহ্বান করিলে পর, তাহারা সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের বর্ণনা বড়ই প্রীতিকর—যে পদ্মিনীর প্রতি তিনি এতই লালসা করিয়াছিলেন, তাঁহারই পুত্রদ্বয়কে তিনি কিরূপ অভ্যর্থনা করিলেন, তাহা কবির কথায় বলিতেছি—

সাহার দেখিল যদি দুই সহোদর।
প্রেমভাব হই গেল তাসবার পর॥
নিকটে ইস্তে সাহা আদেশ করিল।
পুনি তুমি চুমি দোহ কতদূর গেল॥
চক্ষুজলে পুনি সাহা কহিল আশ্বাস।
আইস দুই শিশু আইস মোর পাশ॥
আজি তোমা প্রেমে সব ক্রোধ পাশরিলো।
অগ্নিতে সলিল ছিটি নিবারণ কৈল।

* * * *

নিকটে বসিল যদি নৃপতি কুমার।
শাহা আসি দোহে পৃষ্ঠে বুলাইল কর॥

* * * *

তবে শাহা দোহ স্থানে বহুল কহিলো।
দৈব যোগে যেই ছিল সেই গত হইল॥
বাপ স্বর্গে গেল চিন্তা না করিও মনে।
কে কারে বধিতে পারে সেই স্বামী বিনে॥

ইত্যাদি।

পরে আলাউদ্দীন কুমারদ্বয়ের শত্রু ধ্বংস করিয়া তাহাদের রাজ্য নিরাপদ করিয়া দিলেন। কাব্যের এই উপসংহার অংশ করুণরসে ভরা, কবিত্বের খনি। দুঃখের বিষয় যে কবি এই সকল অংশে নিজের কবিত্ব ক্ষমতা আরও না দেখাইয়া তাড়াতাড়ি গল্প শেষ করিয়াছেন।

উপাখ্যান ভাগের ঐতিহাসিকতা এইরূপে রক্ষা করা হয় নাই। ইতিহাসে আছে যে আলাউদ্দীন দর্পণে পদ্মিনীকে দেখিয়াই ক্ষান্ত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটী এই কাব্যে বড়ই বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। রত্নসেন আলাউদ্দীনকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিয়াছেন, আহার বিহারের অনেক বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সম্রাটের তুষ্টির জন্য তাঁহার সহিত সতরঞ্চখেলিতে বসিয়াছেন, দাসদাসীতে ঘর পরিপূর্ণ, সকলেই সম্রাটের আগমনে অতি প্রফুল্লিত, এমন সময়ে একজন দাসী গিয়া পদ্মিনীকে বলিল;

যেন দিল্লীশ্বর আইল দ্বারেতে তোমার।
নিজ আঁখি সাফল্য না কৈলে একবার॥
এমত সুন্দর রূপ যবে না দেখিবা।
জন্মাবধি অনুশোচ করিতে রহিবা॥

পদ্মাবতী দেখিতে স্বীকৃত হইলেন, দাসী শুশ্রূষার দিয়া তাহাকে লইয়া আলাউদ্দীন যথায় দাবা খেলিতে ছিলেন, সেই ঘরের পাশে উপস্থিত করিলা পর্দ্দা ফেলিয়া পশ্চাৎ হইতে সেই পদ্মাবতী সুলতানকে দেখিবেন অমনি সম্মুখস্থ বৃহৎ দর্পণে প্রতিবিম্বিত রাণীর রূপ দেখিয়া আলাউদ্দীন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কবি আলাউদ্দীনকে কলঙ্ক হইতে বাঁচাইবার জন্যই ইতিহাসের এই প্রকার বিকৃতি করিয়াছেন। রাজপুত রমণী কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া পর-পুরুষের—বিশেষতঃ যে পরপুরুষ তাহার আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহার—দর্শন বাসনা পোষণ করিতে পারে এরূপ মনে করা অতিশয় অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থের আরম্ভে উপাখ্যান ভাগের একটা চুম্বক আছে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া গল্পের সারাংশ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি:—

চিতাওর নরেশ্বর, রত্নসেন নৃপবর,
শুকমুখে শুনিয়া মহত।
যুগী হইয়া নরাধিপ চলিল সিংহলদ্বীপ
ষোল শত কুমার সঙ্গতি।
লঙ্ঘিলেন খণ্ডবাট, উত্তর সিংহল ঘাট,
নৌকা দিল নৃপ গজপতি॥
সিংহল দ্বীপেতে গিয়া নানাবিধি দুঃখ পাইয়া
বহুযত্নে পাইল পদ্মাবতী।
পক্ষিমুখে শুনি কথা নাগমতি চিন্তাযুক্তা
পুনিদেশে চলিল নৃপতি॥
সাগরে পাইয়া ক্লেশ পাইল চিতাওর দেশ
কৈল বহু উৎসব আনন্দ।
রাঘব চেতন জ্ঞানী অবিমৃষ্য কহি বাণী
প্রতিপদে দেখাইল চাঁদ॥
তত্বজানি নৃপবর পুনি কৈল দেশান্তর
যাইতে হইল কল্পাদরশন।
বহুল আনন্দমনে করের কঙ্কন দানে
পরিতোষে পাঠাইল ব্রাহ্মণ॥

সোলতান আলাউদ্দীন দিল্লীশ্বর জগদীন
প্রচণ্ড প্রতাপ ছত্রধর।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তথা কহিল কন্যার কথা
শুনি হরষিত নৃপবর॥
সুজা নামে বিপ্রবর পাঠাইল রাজ্যেশ্বর
কন্যা মাগি রত্নসেন স্থানে।
পদ্মাবতী না পাইয়া সুজা আইল পলটিয়া
শুনি সাহা ক্রোধ কৈল মনে॥
বহুল মাতঙ্গ বাজী চতুরঙ্গ দল সাজি
গেল চিতাত্তর মারিবারে।
দ্বাদশ বৎসর রণ তথা ছিল অখণ্ডন
রত্নসেন ধরিল প্রকারে॥
দিল্লীশ্বর দেশে আইল নৃপ কারাগারে থুইল
তাড়না করিল নানাভাতি।
গৌরাব দিলা নাম ছিল রত্নসেন ধাম
মুক্ত কৈল কপট যুকতি॥
চিতাত্তর দেশে আসি বঞ্চিলেক সুখে নিশি
পদ্মাবতী সঙ্গে করিরঙ্গ।
দেও পাল নৃপকথা পদ্মাবতী মুখে তথা
শুনি নৃপ মনো হইল ভঙ্গ॥
সর্ব্বারম্ভে তথা গিয়া দেওপাল সংহাড়িয়া
যুদ্ধক্ষেত্রে আইল নৃপতি।
সপ্তমাস দিনান্তর মৈল রত্ন নৃপবর
দুই রাণী সঙ্গে হৈল গতি॥
পুনি সাজি দিল্লীশ্বর আসি চিতাত্তর গড়
চিতাধর্ম্ম দেখিলা বিদিত।
সতী গতি পদ্মাবতী শুনি সাহা মহামতি
মানাইল পরম দুঃখিত॥
চিতারে সেলাম করি দিল্লীশ্বর গেল ফিরি
পুস্তকের এহি বিবরণ।

মুদ্রিত কাব্যখানিতে মোট ৩১৯ পৃষ্ঠ আছে, ইহার মধ্যে ২০০ অধিক লাগিয়াছে রত্নসেনের পদ্মাবতী লাভ বর্ণনা করিতে। ঐতিহাসিক ব্যাপারটী বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য নহে, নায়িকার বর্ণনাতেই তিনি আপনার সকল চাতুর্য্য কলার অবসান করিয়াছেন। অতি রত্নসেনের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। রত্নসেন শুকমুখে পদ্মাবতীর সংবাদ পান, এই শুকের বর্ণনাই বা কত। রাজা পাগল হইয়া শুকের সহিত জুগী (যোগী) বেশে সিংহলাভিমুখে ছুটিলেন, সঙ্গে কিনা ষোলশত রাজপুত্র (রাজপুত) জুগী হইয়া রাজার সঙ্গে বাহির হইলেন। শিবমন্দিরে রত্নসেনের সহিত পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ বর্ণনা করিতে গিয়া কতই না ভঙ্গিসহকারে কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বয়ং পার্ব্বতী রত্নসেনের সত্য পরীক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হয়েন ইত্যাদি অনেক প্রাকৃত ও অতি প্রাকৃত কথার সমাবেশ আছে। পদ্মাবতীকে লইয়া হরণ করেন ও সমুদ্র কন্যা রত্নসেনের প্রতি অনুরাগিনী হয়েন ও পদ্মাবতীর রূপ ধরিয়া রত্নসেনের নিকট আগমন করেন ইত্যাদি কল্পনার চূড়ান্ত করিয়া তবে কবি রত্নসেনকে দেশে আনিয়া ছাড়িয়াছেন। দেশে আনিয়াই কি রক্ষা আছে? নাগমতী রাণী অভিমানে বসিয়াছেন, সেই অভিমান ভাঙ্গার বিবরণ পড়িলে পাঠকের ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ মজুমদারের কথা মনে পড়িবে।

এই প্রকারে আখ্যানভাগ অতিরঞ্জনে ভরপুর। দীনেশ বাবু বলিয়াছেন যে এই অতিরঞ্জন মুসলমান কেচ্ছার উপাদান। এই কাব্যের এই অতিরঞ্জন ব্যাপারকে মুসলমানীভাব বলিলে আমার মনে হয় সমালোচনার অঙ্গ হানি করা হয়। অতিরঞ্জন মুসলমানের একচেটিয়া নহে। হিন্দুদিগের কাব্যকথায় অতিরঞ্জনের অভাব নাই। তবে শুকমুখে নায়িকার রূপ শুনিয়া পাগল হওয়া ইত্যাদি ব্যাপার মুসলমানী কেচ্ছার পদ্ধতি হইতে কবি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

আধুনিককালে পদ্মাবতীর উপাখ্যান কাব্যাকারে লিখিত হইলে যে যে তত্ত্বের সমাবেশ আমরা প্রত্যাশা করি—যথা ঐতিহাসিক সত্য তাহা এই পুরাতন কবির কাব্যে আমাদিগের প্রত্যাশা করা অন্যায়।

কবির ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহা সুন্দর সংস্কৃতমূলক। যে সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে কবির ভাষা অত্যন্ত

সাধুভাষা। একজন মুসলমান কবি বাঙ্গালা কাব্য লিখিতে বসিয়া যে ভূরি ভূরি মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করেন নাই তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়—ইহাতে কবির উচ্চশিক্ষার প্রমাণই পাওয়া যায়। দুই চারিটী মুসলমানী শব্দ যে নাই এরূপ নহে—কিন্তু বড়ই কম। যথা বেশক্, বয়ান ইত্যাদি। মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে আলওয়ালের ভাষার চাতুর্য্য এমন যে পদ্মাবতী রূপবর্ণনা ইত্যাদি স্থল পাঠ করিলে মনে হয় যেন ভারতচন্দ্রের রচনা পড়িতেছি।

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেই সমস্ত কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালাকাব্যের ছন্দই এই। পয়ারের মত মধুর ছন্দ বোধ হয় আর হইবে না। আলওয়ালের পয়ার আরও মধুর ও সরস। অন্যান্য ছন্দও যৎসামান্য স্থানে স্থানে আছে। দীনেশ বাবু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্থানে স্থানে কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত, যথা ঃ—

"বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।
বরবামা দুই ইন্দু স্রবে যেন সুধা বিন্দু
মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥
প্রফুল্লিত কুসুম মধুব্রত ঝঙ্কৃত
হঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জরত রাসে॥
মলয় সমীর সুসৌরভ সুশীতল
বিলোলিত প্রতি অতি রসভাষে॥
প্রফুল্লিত বনস্পতি কুটিল তমালক্রম
মুকুলিত চূতলতা কোরকজালে॥
যুবজন হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত
রজমল্লিকা মালতীমালে॥"

অন্যত্র, বিদ্যাপতিকে মনে পড়িবে, যথা ঃ—

"চলিল কামিনী গজেন্দ্রগামিনী
খঞ্জন গমন শোভিতা।
কিঙ্কিণী ঘুঙ্গুর বাজয় ঝাঁঝর
নূপুর মধুর বাজে।
ভুরু বিভঙ্গ অপাঙ্গ তরঙ্গ
মন্মথ মনমোহিতা॥"

আলওয়ালের রুচি সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে কবির আদি রসাশ্রিত বর্ণনা পড়িলে ভারতচন্দ্রের কলঙ্কের কথা মনে পড়ে। এখনও মনে হয় যে ভারতচন্দ্র আলওয়াল পড়িয়াই তাঁহার রুচি বিকৃত করিয়াছিলেন। তবে সুখের বিষয়, আলোয়ালের এই রুচিবিকার অত্যধিক নাই। আর রুচির বিষয়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদিগের পুরাতন সাহিত্যে আদিরসের বর্ণনা কুরুচি বলিয়া গৃহীত হইত না। সকল জাতির পুরাতন সাহিত্যেই অল্পাধিক পরিমাণে রুচির বিকার দেখা যায়। তাঁহারা যখন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, আমাদিগের আধুনিক সভ্যতার রুচির নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা আদৌ ভাবেন নাই।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

"গান"। *

[স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ
বিদ্যাসাগর সি, আই, ই,]

মুলতান—যৎ।

পিতৃপূজা মহা যজ্ঞে জাগুক সবার প্রাণ,
প্রাণে প্রাণে সবে মিলি কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

পুণ্যক্ষেত্র বঙ্গভূমে, এ যজ্ঞের মহাধূমে
জাগুক জাতীয় ধর্ম্ম, স্বজাতি কল্যাণ, মান;
স্বজাতি কল্যাণ তরে যাচ সবে যুক্ত করে,
হউক আবার বঙ্গে দেবতার অধিষ্ঠান।

দেববৃত্তি, দেবকীর্ত্তি, দেবধর্ম্ম, দেবমূর্ত্তি,
লভিতে চাহিলে পুনঃ ক্ষত্রিয় সন্তান—
জীবনে পবিত্র হও, যজ্ঞসূত্রে মন্ত্র লও,
যজ্ঞের দক্ষিণা দাও স্বার্থ, অভিমান।

* সাহিত্য মহারথীর এই সঙ্গীতটী, ১৩১৬ সনের ৩০শে চৈত্র, বুধবার ঢাকায় যে বিরাট কায়স্থ সভা হইয়াছিল, তাহাতে উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে গীত হইয়াছিল। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা "ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনের" জন্য এই অপ্রকাশিত সঙ্গীতটী সংগ্রহ করিয়াছি। এই সভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ইহাই সেই অদ্বিতীয় বক্তার শেষ বক্তৃতা।—সম্পাদক।

অন্ধ্রবংশ।

পুরাণ শাস্ত্রানুসারে মৌর্য্যবংশ ১৩৭ বৎসর, শুঙ্গ বংশ ১১২ বৎসর ও কাণ্ঠবংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু এই সকল বংশীয় রাজন্তগণের নাম ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণ মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল নরপতির রাজত্বকাল যোগ করিলে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি হইতে বেশী দাঁড়ায়; কেবল কাণ্ঠবংশের ঐক্য দেখা যায়। বৎসরের ভগ্নাংশ এক বৎসররূপে গণনা করা ঐরূপ অনৈক্যের কারণ বিবেচনায় আমরা মৌর্য্যবংশের রাজত্বকাল ১৩৭ বৎসর ধরিয়া লইতেছি। মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত ৩২১ খৃঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এইরূপ অবিসম্বাদিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং মৌর্য্যবংশের রাজত্বকাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৮৪ অব্দে শেষ হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। অতঃপর শুঙ্গবংশ ১১২ বৎসর এবং কাণ্ঠবংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দে মগধে কাণ্ঠবংশের শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এই সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কাণ্ঠবংশের রাজত্বকালে মগধের রাজশ্রী একেবারে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। অন্ধ্রবংশের অভ্যুদয়ে পুনর্ব্বার উজ্জল হইয়া উঠে পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে অন্ধ্রজাতীয় শিপ্রক (মতান্তরে সিমুক অথবা সিন্ধুক) নামা একজন ভৃত্য নিজ বংশীয়দিগকে লইয়া কাণ্ঠবংশের শেষ নরপতি সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করেন এবং তারপর রাজ্যাধিকারী হন। পৌরাণিক বর্ণনানুসারে অন্ধ্রবংশের প্রথম নরপতি শিপ্রক. কাণ্ঠবংশের ধ্বংশকারীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাণ্ঠবংশের ধ্বংশের বহু পূর্ব্বে শিপ্রক অন্ধ্রবংশের আধিপত্যের সূচনা করেন। এবং তাঁহার বহু পরবর্ত্তী তৎবংশীয় জনৈক নরপতি স্বীয় বাহুবলে কাণ্ঠবংশের ধ্বংশ সাধন করিয়া মগধের অধিকার লাভ করেন। এখন আমরা অন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠার সময়, মগধ বিজেতা নরপতির নাম এবং প্রথম আধিপত্যের স্থান নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বায়ু ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের মতে অন্ধ্রবংশীয়, ত্রিশজন নরপতি রাজত্ব করেন। কিন্তু এই সকল পুরাণে ত্রিশ জনের নাম নাই। মৎস্য পুরাণে ত্রিশজন নরপতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের রাজত্বকাল যোগ করিলে ৪৪২ বৎসর পাওয়া যায়। কিন্তু অন্ধ্রগণ মৎস্য পুরাণানুসারে ৪৩০ বৎসর, বায়ু পুরাণানুসারে ৪১১ বৎসর এবং ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণানুসারে ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন।

প্রখ্যাত নামা টলেমী স্বগ্রন্থে তাঁহার সম সাময়িক রূপে একজন অন্ধ্রবংশীয় রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমি ১৬৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময়ের পূর্ব্বে এবং ১৫১ খৃষ্টাব্দের পরে টলেমির ভূগোল বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছিল। টলেমির গ্রন্থ ধৃত রাজার নাম পুলুমায়ী। অন্ধ্রবংশের বিবরণে দুই পুলুমায়ীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত প্রবর ভণ্ডারকর স্বগ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় সপ্রমান করিয়াছেন যে, গৌতমীপুত্র পুলমায়ীর নামই টলেমির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা হইলে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে পুলুমায়ী বিদ্যমান ছিলেন। পুলমায়ীর পর ৬ জন অন্ধ্রবংশীয় নরপতি রাজত্ব করেন এবং তাঁহাদের রাজত্ব ৬২ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। টলেমির মৃত্যুকাল ১৬৩ খৃষ্টাব্দের সহিত এই সংখ্যা যোগ করিলে আমরা ২২৫ খৃষ্টাব্দে উপনীত হই। এই সময় অন্ধ্রবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব ২৩৬ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রবংশের ধ্বংস কাল রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মৎস্য পুরাণের মতে অন্ধ্রবংশীয়গণ ৪৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ২৩৫ (খৃঃ পূর্ব্ব ২৩৫+খৃঃ ২২৫=৪৬০) অব্দে অন্ধ্রবংশের আধিপত্যের সূচনা হইয়াছিল।

অন্ধ্রবংশের প্রথম নরপতি শিপ্রক ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২১৩ খৃঃ পূঃ অব্দে, কৃষ্ণ ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২০৪ খৃঃ পূঃ অব্দে, শ্রীশান্ত কর্ণি ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৯৫ খৃঃ পূঃ অব্দে, পূর্ণোৎসঙ্গ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া

১১৮ খৃঃ পূঃ অব্দে, স্কন্দ অষ্টমতি ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১১ খৃঃ পূঃ অব্দে, সাতকর্ণি ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১০৬ খৃঃ পূঃ অব্দে, লম্বোদর ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮৬ খৃঃ পূঃ অব্দে, দ্বিবিলক ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৭৫ খৃঃ পূঃ অব্দে মেঘস্বাতি ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৪১ খৃঃ পূঃ অব্দে, স্কন্দস্বাতি ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৩৫ খৃঃ পূঃ অব্দে, মৃগেন্দ্র সাতকর্ণি ৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৩৩ খৃঃ পূঃ অব্দে এবং কুন্তল সাতকর্ণি ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে কাণ্ঠবংশের ধ্বংস অন্তে মগধে অন্ধ্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব আমরা কুন্তল সাতকর্ণি অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী স্বতি বর্ণ, এই দুই জনের এক জনের রাজত্ব কালে কাণ্ঠ বংশের বিলোপ সাধিত এবং অন্ধ্রবংশ কর্ত্তৃক মগধ বিজিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। ২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে কাণ্ঠবংশের বিলোপ কাল রূপে ধার্য্য করিলে এই দুই রাজার একজনের সময়েই উপস্থিত হইতে হয়।

পুরাকালে মহারাষ্ট্র দেশের পশ্চিম ভাগ এবং তৈলঙ্গ দেশ অন্ধ্র নামে পরিচিত ছিল। শিপ্রক এই দেশে আধিপত্যের সূচনা করিয়া মহাপরাক্রম শালী এবং দীর্ঘ স্থায়ী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে শিপ্রক কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজবংশ অন্ধ্রবংশ নামে পরিচিত হইতেছে। পুরাণ শাস্ত্রে ইঁহারা অন্ধ্র ভৃত্য নামে কথিত হইয়াছেন। দক্ষিণাপথের বিবিধ-শিলা লিপিতে অন্ধ্রবংশের শাতবাহন নাম দেখিতে পাওয়া যায়। জন প্রবাদ ও লোক সাহিত্যে শালি-বাহন নাম প্রচলিত হয়। শালিবাহন শাতবাহন শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। হেমচন্দ্র সূরির প্রাকৃত ব্যাকরণে উভয় শব্দ একার্থক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। কালক্রমে আমাদের দেশবাসীরা বিস্মৃতি বশতঃ শালিবাহন নামক রাজবংশের পরিবর্ত্তে শালিবাহন নামক রাজার সৃষ্টি করে এবং শালিবাহন সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী উদ্ভূত হয়। এই সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের পরাজয় এবং সক আক্রমণ কারীদের বহিষ্করণ ও সে ঘটনার স্মরণার্থ শকাব্দের প্রচলন প্রধান। কিন্তু শালিবাহন রাজার নামের ন্যায় এই সকল কার্য্যও অমূলক।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম অংশ বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত মালার উত্তরে এবং দ্বিতীয় অংশ তাহার দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের আদিকালে উহার বিপুল অংশ অন্ধ্রদেশ নামে পরিচিত হয়। অন্ধ্র শব্দ সংস্কৃত অন্ধ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্ধ বা অন্ধ্র নাম প্রদানের কারণ এইযে, উক্ত প্রদেশ তৎকালে গভীর অরণ্য পূর্ণ ছিল এবং তথায় প্রবেশ করিলে সমস্ত অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হইত। বর্ত্তমান উত্তর সরকার, জোলার জেলা, উত্তর আরকট এবং চিঙ্গোল—পুত জেলার কিয়দংশ, বেরার প্রদেশ এবং নিজাম রাজ্যের অধিকাংশ, বাস্তব সংস্থান এবং মধ্য-প্রদেশের অল্পাংশ লইয়া তৈলঙ্গ দেশ। তেলেগু ইহার ভাষা এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে লোকসংখ্যা দুই কোটি দশ লক্ষ। দক্ষিণা পথের আর একটী দেশের নাম মহারাষ্ট্র। ইহার উত্তরে সুরাট ও সাতপুরা পর্ব্বত, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্ব্বে বরদা নদী। এই বিস্তৃত ভূমির পরিমাণ ১০২০০০ বর্গ মাইল। তৈলঙ্গ ও পশ্চিম মহারাষ্ট্র লইয়া প্রাচীন অন্ধ্র-দেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ব-আফগানিস্থান এবং পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তারপর তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইয়া হিমাচল এবং বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত মালার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশে উপনিবিষ্ট হন। বহুকাল অবধি বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত মালা আর্য্যজাতির উপনিবেশের দক্ষিণ সীমা ছিল। মনুসংহিতা এবং পতঞ্জলির মহা ভাষ্যে আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্য জাতির উপনিবেশ অর্থে হিমাচল এবং বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত মালার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎকালে সমুচ্চ বিন্ধ্যা পর্ব্বত উপনিবেশ স্থাপন প্রয়াসী আর্য্য জাতির নিকট অনতিক্রম্য রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল।

বস্তুতঃ খৃষ্টের আবির্ভাবের ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এই সময় তাঁহারা পূর্ব্বপথে উত্তর সরকার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু এই স্থানেই তাঁহাদের গতি মন্দীভূত হইয়াছিল; বিন্ধ্য পর্ব্বতের ঠিক দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী অংশ তাঁহাদের নিকট অপরিচিত ছিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে আর্য্যগণ পূর্ব্ব পথ অবলম্বন করিয়াই বিদর্ভ অথবা বেরারে প্রবিষ্ট হন। ইহার কিছুদিন পর তাঁহারা বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিতে সমর্থ হন এবং গোদাবরীর তীরবর্ত্তী দণ্ডকারণ্যে বসতি স্থাপন করেন। খৃষ্টের আবির্ভাবের সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বেই মাদুরা এবং তাঞ্জোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল।

উত্তর ভারতে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের বহুকাল পরে মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর্য্য প্রভাব বিস্তৃত হইলেও সে প্রভাব সম্পূর্ণ ও সর্ব্বগামী হইয়াছিল। আর্য্যগণ এই প্রদেশের অনেক আদিম অধিবাসীকে অরণ্য এবং পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অনেকে আবার নবাগত জাতির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সমাজে ভুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রের ভাষা অন্যান্য আর্য্য ভাষার ন্যায়ই সংস্কৃত মূলক।

কিন্তু আর্য্য প্রভাব দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; আর্য্যগণ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব অঞ্চলে উপনীত হইয়া তদ্দেশেও আপনাদের সভ্যতা বিস্তার করেন। কিন্তু এই সকল স্থানের আদিম অধিবাসীরা আর্য্য সভ্যতা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন নাই। আর্য্যগণ তাঁহাদের ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে অসমর্থ হন এবং অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহাদের ভাষা শিক্ষা করেন; ফলতঃ তাহাদের সামাজিকতা ও কিয়ৎ পরিমাণে আর্য্য জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তেলিগু তামিল এবং অন্যান্য দক্ষিণী ভাষা সংস্কৃত মূলক নহে। মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান সমূহে আর্য্য সভ্যতা তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইবার কারণ এই যে, আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বেই ঐ সকল স্থানে সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামায়ণে সীতা দেবীর অন্বেষণার্থী বানরাদগের প্রতি যে উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে; তাহাতে তেলিগু, পাণ্ড্য, চোল ও কেরল জাতির আর্য্য সংস্রব শূন্য সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাজ্য সমূহের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম যুগে আর্য্য জাতি অধ্যুষিত অন্ধ্রদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। পুরাণ শাস্ত্রে অনেক রাজবংশ ও রাজার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু অন্ধ্রদেশে ইহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের অধিকার কাঠিবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং তদীয় পৌত্র অশোকের অধিকার পশ্চিমে কাঠিবার হইতে পূর্ব্বে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু অন্ধ্র দেশে তাঁহার আধিপত্য যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ অন্ধ্রদেশ তাঁহার শাসনের বহির্ভূত ছিল। তিনি আপন অনুশাসনে স্বীয় প্রভুত্বাধীন স্থান সমূহের নাম গুপ্ত রাখিয়া কেবল বিজিত দেশ বলিয়া উল্লেখ করিলেন, কিন্তু প্রভুত্বের বহির্ভূত দেশ সমূহের নাম দিতেন। অশোকের একখানি অনুশাসনে "অন্ধ্র" নাম দেখিতে পাওয়াযায়।

অন্ধ্র দেশের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রাচীন রাজবৃত্তান্ত অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ইহার সমৃদ্ধির বিবরণ প্রকাশিত রহিয়াছে। মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক প্লিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সামরিক বল সম্বন্ধে মগধ প্রথম স্থানের এবং অন্ধ্র দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিল অন্ধ্রদেশে ত্রিশ সংখ্যক প্রাচীর বেষ্টিতনগর, অসংখ্য পল্লীগ্রাম, একলক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুইহাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক হাজার রণ হস্তী ছিল। তৎকালে কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী শ্রীকাকুলম নগর অন্ধ্রদেশের রাজধানী ছিল।

অন্ধ্রদেশের পার্শ্বে আর একটী সমৃদ্ধদেশ বিদ্যমান ছিল, তাহার নাম বিদর্ভ। শুঙ্গবংশের সমসাময়িক বিদর্ভের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইতেছে। সে ইতিহাস

পরাধীনতার ইতিহাস। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বে অন্ধ্র-দেশে পরাক্রান্ত স্বাধীন বংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়। শিপ্রক এই রাজ্যের সূচনা করিয়া ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন।

অতঃপর তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। কৃষ্ণ শৌর্য্য বীর্য্য-শালী নরপতি ছিলেন। তিনি রাজ্য বিস্তারে নিরত হন এবং নাসিক পর্য্যন্ত স্বাধিকার ভুক্ত করেন।

কৃষ্ণের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষের নাম কুন্তল সাতকর্ণি। কুন্তল অথবা তদীয় উত্তরাধিকারী স্বাতিবর্ণের রাজত্বকালে মগধ বিজিত হয়, এই সময় অন্ধ্ররাজবংশের গৌরব এবং বৈভবের মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছিল।

কুন্তলের অধস্তন চতুর্থ পুরুষের নাম হাল। হাল বিদ্যোৎসাহি নরপতি ছিলেন, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধন জন্ত মুক্তহস্তে অর্থদান করিতেন। তাঁহার উৎসাহে বৃহৎ কথা ও কতেন্দ্র ব্যাকরণ রচিত হয়। হাল নিজেও কাব্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। "সপ্তশতক" তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। নরপতি হালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষের নাম গৌতমি পুত্র (শাতকর্ণি)। গৌতমি পুত্রের পূর্ব্বে অন্ধ্রদেশে শক পহ্লব এবং যবন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির উপদ্রব আরম্ভ হয়। নাহাপানা নামক একজন সৌভাগ্যশালী শক গুজরাট, কুরাট এবং মহারাষ্ট্র দেশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। অন্ধ্ররাজ্যের কিয়দংশও তাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছিল।

গৌতমি পুত্র রাজপদ লাভ করিয়া স্ববংশের অপহৃত রাজ্য উদ্ধার করিতে উত্থিত হন। এবং সমূলে নাহাপানা বংশের ধ্বংশ সাধন করিয়া স্বীয় বংশের গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত; ও সুরাট পর্য্যন্ত স্বাধিকার বিস্তৃত করেন। নাসিকে গৌতমি পুত্রের একখানি শিলালিপি অবিস্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি তাঁহার বিপুল গৌরব এবং বৈভবের পরিচয় দিতেছে। গৌতমী পুত্র রাজাধিরাজরূপে কথিত হইয়াছেন। তাঁহার অধিকার আশিক, অশ্মক, মূলক, সুরাট, কুকুর (রাজপুতনার অংশ) অপরান্ত (উত্তর কঙ্কন) বিদর্ভ, অনুপ এবং অকারবন্তী (পূর্ব্বমালব) পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বহু সংখ্যক রাজা তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন, তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্যে তাঁহার নদ শোভিত হইত। তাঁহার পালিত পশুসমূহ তিন সমুদ্রের জল পান করিত। যে কেহ তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাঁহাকেই রক্ষা করিতেন; তিনি প্রজার সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের তুল্য বিবেচনা করিতেন। তিনি মনুষ্যের বাঞ্ছিত কর্ত্তব্য সম্পাদন পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং প্রবৃত্তির সম্ভোগ বিধান বিষয়ে সমভাবে মনোযোগী ছিলেন; ইহার প্রত্যেক বিষয়ের জন্ত স্বতন্ত্র স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তিনি বিদ্বান, সাধুজনের আশ্রয়দাতা, গৌরব নিকেতন, সদাচরণের উৎস, সুকৌশলী, একমাত্র ধানুকী, একমাত্র বীর এবং ব্রাহ্মণজাতির একমাত্র আশ্রয় দাতা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ কুল বৃদ্ধির জন্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি জাতিসমূহের মিশ্রণ নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ স্থায়ী রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু যুদ্ধে শত্রুকুলকে বিধ্বস্ত এবং ক্ষত্রিয় জাতির গর্ব্ব ও অহঙ্কার খর্ব্ব করিয়াছিলেন, শক পহ্লব এবং যবনদিগের ধ্বংশ সাধন করিয়াছিলেন, ক্ষত্রপগণের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়াছিলেন এবং সতিবাহন বংশের গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ বীরপুত্র লাভ করিয়া রাজমাতা বালশ্রী গৌতমী গৌরবান্বিতা ছিলেন এবং সে অহঙ্কার লিপিতে প্রকাশ করিয়াছেন, "আমি বীরমাতা, আমার বীরপুত্র, শক, যবনদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে।"

গৌতমি পুত্র (সাতকর্ণি) সুদীর্ঘ ২১ বৎসরকাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করেন। অতঃপর তদীয় পুত্র পুলুমায়ী রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। পুলুমায়ী শৌর্য্য বীর্য্যশালী নরপতি ছিলেন; কিন্তু তাহার রাজত্বকালে অন্ধ্রবংশের গৌরব রবি ম্লান হইয়াছিল। আমরা সে বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এই সময় রুদ্রদামন নামা আর একজন শক সেনাপতি

পুলুমায়ীকে শক্তিশালী দেখিয়া এবং শক অধিপতি মাত্রেরই বৈরী বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আক্রমণ করেন। তিনি পুত্র জয়দাম সহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত হন এবং রাজ্য পুলুমায়ীর হস্তে পতিত হয়। কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জ রুদ্রদাম নামক একজন বীর পুরুষকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করে। তিনি গৌতমী পুত্র পুলুমায়ীকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উজ্জয়িনী, গুজরাট ও সুরাট কাড়িয়া লন। অতঃপর সন্ধি স্থাপিত হয়; পুলুমায়ী বিজেতার কন্যা দক্ষমিত্রাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন।

পুলুমায়ীর অধস্তন তৃতীয় পুরুষের নাম যজ্ঞশ্রী। যজ্ঞশ্রী সৌর্য্য বীর্য্যশালী নরপতি ছিলেন। যজ্ঞশ্রী শকদের সঙ্গে সন্ধি বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বিনষ্ট রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যজ্ঞশ্রী পরলোকগত হইলে বিজয় চন্দ্রশ্রী, পুলোমাচি ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। পুলোমাচি বিশ্রুত নামা অন্ধ্র-বংশের শেষ নরপতি।

অন্ধ্র বংশীয় রাজন্যগণ ন্যূনাধিক ৪৬০ বৎসর প্রবল প্রতাপে ভারত ভূমির বিশাল অংশে রাজত্ব করেন। সমগ্র মধ্য-ভারত এবং মগধ তাহাদের সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। তাঁহাদের সাম্রাজ্য সাগর হইতে সাগরান্তরে বিস্তৃত ছিল; উভয় পার্শ্ব সমুদ্র বারি কর্ত্তৃক বিধৌত হইত। অন্ধ্র নরপতি গণের অনেক মুদ্রায় অর্ণবযান অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অর্ণবযান যে, কেবল মুদ্রার শোভা বৃদ্ধির জন্য অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা নহে। অর্ণবযান অঙ্কিত মুদ্রা সকল ইহাই সপ্রমান করিতেছে যে, অন্ধ্র নরপতিগণ নৌবলের অধিকারী ছিলেন। এই প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশের রাজধানী প্রথমতঃ ধনকটক নামক স্থানে (বর্ত্তমান গণ্টুর জেলায়) অবস্থিত ছিল। গৌতমী পুত্র পুলুমায়ী ধনকটক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠান (পৈথান) নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। গোদাবরী তীরে এই রাজধানী অবস্থিত ছিল।

অন্ধ্র বংশীয় রাজন্যগণ শৌর্য্য বীর্য্যশালী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে গ্রীক্ পার্থিয়ান এবং শকদের আক্রমণ হয়। এই সকল বৈদেশিকের আক্রমণ অপ্রতিহত গতি হইয়াছিল। ইঁহারা উত্তর ভারতের যে স্থানেই অসি হস্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের অজেয় বাহুবলের নিকট অবনত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের আক্রমণের তাদৃশ অবাধ গতি ও দাক্ষিণাত্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই সকল বৈদেশিক আক্রমণ-কারী এবং অন্ধ্রবংশের যুদ্ধে কখনও বৈদেশিকগণ পরাজিত হইতেন, কখনও তাঁহারা অসিধারা পথ পরিষ্কৃত করিয়া অন্ধ্ররাজ্যে প্রবেশ করিতেন। অবশেষে অন্ধ্রবংশ বৈদেশিকদের তাণ্ডব সহ্য করিতে না পারিয়া ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীক্ পার্থিয়ান এবং শকের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অন্ধ্ররাজন্যগণ যে গৌরব অর্জ্জন করেন, তাহা চিরকাল ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত হইবে।

বস্তুতঃ অন্ধ্ররাজন্যগণ অপরিসীম গৌরব এবং বৈভবের অধিকারী ছিলেন। অন্ধ্রদেশীয়েরা জলপথে এবং স্থলপথে পশ্চিম এসিয়া, গ্রীক, রোম, মিশর এবং চীনের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। অন্ধ্ররাজদূত বাণিজ্যের সৌকর্য্য বিধান জন্য রোমে গমন করিতেন। সিরিয়া দেশের অধিপতি যুদ্ধকালে ভারতজাত রণহস্তীর নিয়োগ করিতেন। যে সকল ধাতু ও রত্ন রোম হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইত, প্লিনির গ্রন্থে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পেরিপ্লাসের লেখকও এই সমুদয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ধ্রজাতি অধ্যুষিত দেশে বহু সংখ্যক রোমক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্ধ্রসাম্রাজ্যের বাণিজ্যের সৌকর্য্য সাধনে জন্য গন্ধবণিক এবং তৈল-বণিকদের নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিবার প্রথা উদ্ভূত হইয়াছিল। এই প্রথাকে আধুনিক Banking প্রথার অঙ্কুররূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রাগুক্ত বাণিজ্য বিবরণ প্রদানান্তর শিল্প কলা কি প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। অন্ধ্রবংশের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক

বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত গুহা মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল অতুলনীয় মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মানব হস্ত রচিত কারুকার্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বহুবিশ্রুত অমরাবতী স্তূপ অন্ধ্রবংশের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালের আর একটী কীর্ত্তি ভারতবর্ষের গৌরব নিকেতন ও পৃথিবীর বিস্ময় স্থল অজন্তা গুহা। অমরাবতী স্তূপ এবং অজন্তা গুহা অন্ধ্র রাজগণের অতুল গৌরব ও বৈভবের সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলমান ঐতিহাসিক (৯)

মীর্জ্জা গোলামহোসেন খাঁ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ঐতিহাসিক গোলামহোসেনের জীবনতরী বাহিয়া আমরা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক ভীষণ সমস্যাপূর্ণ যুগে উপস্থিত হইয়াছি। এই যুগ মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বের সন্ধিস্থল। বহুকালের অত্যাচার অবিচারও আলস্য বিলাসের বিপুল বিভ্রাটে যখন মোগল প্রভুত্বের ভিত্তিমূল কম্পিত হইয়া আসিয়াছিল, এবং যখন সামরিক বীরত্ব ও অসামরিক অধ্যবসায়ের ফলে বলে কৌশলে উদীয়মান বৃটিশ শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এই সেই যুগ। বীরত্ব ও শাসন-খ্যাতি লইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ কালের কোলে অন্তর্হিত।

মুর্শিদাবাদের মসনদে উচ্ছৃঙ্খল সিরাজউদ্দৌলা সমাসীন। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচার ও অবিচারে অমাত্যবর্গ মর্ম্মাহত, লোকসমূহ বিরক্ত ও শত্রুপক্ষ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। কেহ জানিত না কি হইবে, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দশা যাহা আছে তাহা যে থাকিবে না, সে বিষয়ে যেন সকলে একমত। এমন সময়ে মীরজাফর প্রভৃতি যাহারা নগণ্য কারণে উত্তেজিত হইয়া নবাবের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে সক্ষম হইলেন, তাঁহাদের ষড়যন্ত্রে যখন সিরাজউদ্দৌলা পলাশি প্রাঙ্গণে অপ্রত্যাশিতরূপে পরাজিত হইলেন, রাজ্য হারাইলেন এবং অবশেষে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া মীরজাফরের পুত্র দুর্ব্বৃত্ত মীরণের আদেশে নবাব সরকারে আজন্ম প্রতিপালিত এক নরাধম দ্বারা নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন, তখন সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বাঙ্গালা মুলুকের ভাগ্যচক্র বিবর্ত্তিত হইল। নবাবের নবাবী গেল, মুসলমান শাসনের সর্ব্ব গৌরব ও সর্ব্ব প্রতিপত্তি নিমিষে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। নবাব সিরাজের শতদোষ থাকিলে তাহাতে নবাবী ছিল—আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল; কিন্তু পরে যাঁহারা নবাব নামে দিন কয়েক ভূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নবাবী শুধু বিলাসিতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল—তাঁহারা শাসকরূপে ইংরাজহস্তে ক্রীড়াপুত্তলবৎ নৃত্য করিতেছিলেন। যে বিশ্বাসঘাতক সিরাজের নবাবী মসনদ অধিকার করিলেন, তাঁহার কার্য্যদক্ষতা এতই অধিক ছিল যে, তিনি অল্পদিন মধ্যেই "কর্ণেল ক্লাইভের গর্দ্দভ"—এই সুমিষ্ট নামে অভিহিত হইলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই স্বোপার্জ্জিত উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।*

এই ভীষণ বিপ্লবের সময়ে গোলামহোসেন সপরিবারে নিরুদ্বেগে সুদূরবর্ত্তী বারাণসীর শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন; অবশেষে যখন ইংরাজ সেনাপতির কঠোর শাসন ও কুটিল নীতি তরঙ্গ বিক্ষোভিত বাঙ্গালা বক্ষে স্বল্পকালের জন্য শান্তি সংস্থাপিত করিল, তখন নকী আলিখাঁ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ও পরিবারবর্গ সঙ্গে লইয়া আবার অর্থাবেষণে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মীরজাফরের সহিত শিশুকাল হইতেই তাঁহার পরিচয় ও সৌহৃদ্য ছিল। মীরজাফর এক সময়ে নকী আলিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সেই আশ্বাসে

---

* "A very few months after Meer Jaffier's accession, he was nick named by one of the wits of court, "Colonel Clive's Ass," and retained the title till his death"—Stewart's History of Bengal. P. 331.

তিনি মনে করিলেন, এবার মীরজাফরের অনুগ্রহে তিনি আজিমাবাদ বা পাটনার সহকারী শাসনকর্ত্তা হইতে পারিবেন। কিন্তু এ তাঁহার বুদ্ধির ভুল; যে লবণের মর্য্যাদা বিস্মৃত হয়, সে কি পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করে? যাহা হউক নকীআলির চেষ্টার ত্রুটী হইল না; তিনি পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করিবার জন্য নবাবের নিকট কাতরোক্তি পূর্ণ এক পত্র লিখিলেন—তদুত্তরে তাঁহাকে আজিমাবাদ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার আজ্ঞা আসিল। এই সময়ে নবাব ভ্রাতা মীরকাজেম আজিমাবাদে সেনপতি ছিলেন—তাঁহারই আত্মীয়োচিত অনুগ্রহে নকী আলি সেই কঠোর আজ্ঞা হইতে রক্ষা পাইলেন। অল্পদিন মধ্যে গোলাম হোসেনও পাটনায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই সময়ে মীরজাফর একটি বিদ্রোহ-দমনার্থ দুই তিন মাস কাল পাটনায় ছিলেন। তখন মীরকাজেম, গোলাম হোসেন ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়া, তাঁহাদের সম্প্রীতি সংস্থাপনের জন্য প্রয়াস পান। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত মীরজাফরের চরিত্র জানিয়া তাঁহার উপর কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না। মীরজাফর আজিমাবাদের সহকারী শাসন কর্ত্তাকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাসেমকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। এই সময় ক্লাইভও পাটনায় আসিলে, রামনারায়ণ তাঁহার শরণাপন্ন হন। রামনারায়ণের সৈন্যবলও কম নহে—বিশেষতঃ মারহাট্টাগণ ২৪ লক্ষ টাকা চৌথের দাবি করিয়া পত্র প্রেরণ করাতে নবাব ও ক্লাইভ উভয়কেই সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। এমন সময়ে রামনারায়ণ বিদ্রোহী হইলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা, সুতরাং রামনারায়ণকে অসন্তুষ্ট করা কেহই সমীচীন বিবেচনা করিলেন না। মীরণ নামে মাত্র পাটনার শাসনকর্ত্তা হইলেন—রামনারায়ণ পূর্ব্ববৎ নায়েব নাজিমরূপে সে প্রদেশের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হইয়া রহিলেন। রামনারায়ণের সহিত গোলাম হোসেনের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, রামনারায়ণ একটু সুবিধামত সময়ে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সিরাজউদ্দৌল্লা গোলাম হোসেনের যে জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাই প্রত্যর্পণ করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিলেন। মীরজাফর মনে মনে রামনারায়ণকে ভয় করিয়া চলিতেন, এজন্য তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালন না করিয়া পারিলেন না। পরে এক গুলিতে দুই কাক বধ করিবার অভিপ্রায়ে নকী আলীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন—ও জায়গীর প্রত্যর্পণ করিবার জন্য লিখিত অনুমতি পত্র প্রদান করিলেন। অল্পদিন মধ্যে নকী আলি সরকারী সৈন্য বলের সাহায্যে জায়গীরের পুনরুদ্ধার করিলেন। অবশেষে মীরজাফর তাঁহারই উপর কৃপা প্রদর্শনার্থ জায়গীর পুনঃ প্রদান করিয়াছেন ভাবিয়া নকী আলি একটু গর্ব্বদৃপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোলাম হোসেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত কনিষ্ঠের সে ঔদ্ধত্য বিস্মৃত হইয়া, রামনারায়ণের প্রিয়পাত্ররূপে আজিমাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। মীরকাজেম খাঁ মুর্শিদাবাদে যাইবার সময়ে গোলাম হোসেনকে পাঁচশত টাকা মাসিক বেতনে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু গোলাম হোসেনের আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত অধিক ছিল; তিনি মীরজাফরের নিকট পূর্ব্বে যথোচিত সমাদর পান নাই—এবং মুর্শিদাবাদে গিয়াও সম্মানিত হইবেন বলিয়া আশা করিতে পারিলেন না; এজন্য তিনি আত্মীয় মীরকাজেমের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক স্বকীয় ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া সপরিবারে পাটনায় বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি স্বীয় বন্ধু মীর্জ্জা আবদুল্লা দ্বারা ইংরাজ বীর ওয়াট্‌স্ ও পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষ অমিয়ট সাহেবের সহিত পরিচিত হন। ইংরাজদিগের সহিত এই তাঁহার সংস্পর্শ।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা আলিগোহর স্বীয় পিতার (বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর) বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া একদল প্রবল সৈন্যসহ বঙ্গ ও বিহার অধিকার করিতে আগমন করেন। গোলাম হোসেনের পিতা সৈয়দ হেদায়েত আলিখাঁ সৈন্যদল মধ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শাহজাদার একজন প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। শাহজাদার আগমন সংবাদে মীরণ মনে করিলেন, গোলাম হোসেনই এই আক্রমণের মূল।

হয়তঃ গোলাম হোসেন বঙ্গ বিহারের সমস্ত অবস্থাদির বিষয় তাঁহার পিতাকে অবগত করাইয়াছেন এবং তাঁহার পিতার প্ররোচনায় শাহজাদা আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছেন। এই ভাবিয়া মীরণ গোলাম হোসেনের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া রামনারায়ণের নিকট এক পত্র লিখেন। যখন রামনারায়ণ গোলাম হোসেনকে ডাকাইয়া উপরোক্ত পত্র দেখাইলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলিলেন যে, উপরোক্ত দোষা রোপ করা সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরাধিক কালের মধ্যে পিতাপুত্রে কোনও সম্বন্ধ ছিল না; এমন কি পত্রাদিও লেখা হয় নাই। ইহার ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে হোদায়েত দিল্লীতে গিয়া পুনারায় বিবাহ করেন; এবং একজন বড় আমীরের মত বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মহাড়ম্বরে জীবন যাপন করিতেছিলেন। নিত্য নূতন সুন্দরী যুবতী সংগ্রহ দ্বারা স্বীয় অন্দরমহলের বলপুষ্টি করিয়া, নৃত্যগীতের জন্য স্বতন্ত্র অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া, দিল্লীবাসী হোদায়েত স্বীয় স্ত্রী ও পুত্রের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রায় ১৫ বৎসর যাবত তিনি সৈনাপত্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রতিমাসে কয়েক লক্ষ টাকা সংসার ব্যয় করিতেন; কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যে একটি কপর্দ্দকমাত্রও তাঁহার স্ত্রী বা সন্তানগণের জন্য প্রেরণ করেন নাই।* যখন সরলহৃদয় ঐতিহাসিক অকপটভাবে এই অপ্রকাশ্য আত্মকাহিনী রামনারায়ণের নিকট বিবৃত করিলেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া দুর্দ্দান্ত মীরণের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

হোদায়েত আলি শাহজাদার সৈন্যদলসহ অগ্রসর হইতেছিলেন দেখিয়া, অমিয়ট সাহেব অন্যান্য ইংরাজ সহ পলায়ন করিলেন। এই সময়ে রামনারায়ণ হোদায়েত আলির মধ্যবর্ত্তিতায় বাদশাহপুত্রের সহিত সন্ধিস্থাপন উদ্দেশ্যে গোলাম হোসেনকে প্রেরণ করিলেন। রামনারায়ণ কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা এখনও ঠিক ছিল না। তবে বাঙ্গালা হইতে নবাব ও ইংরাজগণের সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবার কথা ছিল। যতদিন ঐ সৈন্য না আসে, ততদিন কোনও প্রকারে সন্ধির প্রস্তাবাদি করিয়া বিলম্ব করাই সুচতুর রামনারায়ণের আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। এদিকে শাহজাদা স্বয়ং এলাহাবাদের অধীশ্বর মহম্মদকুলি খাঁর ইঙ্গিতানুবর্ত্তী ছিলেন; একজন্য হোদায়েত তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। কাজেই তিনি মধ্যবর্ত্তিতা করিতে সমর্থ হইলেন না এবং সন্ধিও হইল না। ফলতঃ শাহজাদার সৈন্যদল পাটনা অবরোধ করিল। তখন গোলাম হোসেন নানা সুযোগে পাল্‌কী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পরিবারবর্গ সহ প্রথম সাহসরাম (শাসেরাম) ও পরে বারাণসীতে পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে হোদায়েত হোসেনাবাদে আসিয়া অবস্থান করেন; গোলাম হোসেনও তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথা হইতে টিকারী ও টিকারী হইতে ভ্রাতা সৈয়দ আলির সহিত পাটনায় প্রত্যাগত হইলেন।

তথায় অমিয়ট ও কুলারটন সহেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কারণ যখন গোলাম হোসেন সন্ধির সন্ধানে শাহজাদার শিবিরে গিয়াছিলেন, তখন শাহজাদা ইংরাজদিগের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করেন; ঐ পত্র গোলাম হোসেনই লিখিয়া দিয়াছিলেন; ইংরাজ-সেনাপতি পত্রের ছত্রে ছত্রে তাঁহার কৃতিত্বের সুন্দর আভাস পাইয়া, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং ইংরাজমহলে তাঁহার বিদ্যার প্রতিপত্তি প্রচারিত হয়। উপরোক্ত উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় নির্ভর করিয়া, গোলাম হোসেন স্বীয় আবাসেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

বঙ্গবিহারের এই বিপ্লবময় যুগের সহিত গোলাম হোসেনের জীবন এরূপ ওতপ্রোতভাবে সন্নিবদ্ধ যে, সাময়িক ঘটনার বিবরণী না দিয়া তাঁহার জীবনচরিত রচনা অসম্ভব। গোলাম হোসেনের পাটনায় আসিবার কিছুদিন পরেই অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদ আক্রমণ করেন; সুতরাং মহম্মদ কুলি স্বরাজ্য রক্ষারজন্য ধাবিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদাও বাঙ্গলার নবাব পক্ষ হইতে দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য

* See Vol. II. P. 293.

হইলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ (দ্বিতীয়) আলমগীর উজীর কর্ত্তৃক নিহত হন; তখন আলিগোহর হোদায়েত আলির পরামর্শে শাহ আলম নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং অল্পদিনমধ্যেই পুনরায় বাঙ্গাল আক্রমণ করিবার জন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে রামনারায়ণ পরাজিত ও আহত হন। তখন নবীন বাদশাহের সৈন্যদল নবোৎসাহে পাটনা আক্রমণ করিল। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ইংরাজ সেনার অধিনায়ক হইয়া মেজর কেলড ও নবাবী ফৌজের কর্ত্তা হইয়া নবাবপুত্র মীরণ পাটনা রক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। এক ভীষণ যুদ্ধ হইল; সে যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের সাহাসিকতারই জয় হইল; বাদশাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়ে মীরণ বজ্রাঘাতে গতাসু হন। এদিকে ইংরাজগণ অকর্ম্মণ্য অহিফেন সেবী মীরজাফরকে অপসারিত করিয়া, তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে নবাব আসনে বরণ করিলেন।

ইংরাজসেনাপতি কর্ণাক ও পাটনাকুঠীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ হে সাহেব গোলাম হোসেনকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। স্বাভাবিক সৌজন্যে বৈদেশিকদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে গোলাম হোসেন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কর্ণাক ও হে উভয়ে বন্ধুভাবে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা উভয়ে একমত হইয়া গোলাম হোসেনকে দূতস্বরূপ মীরকাশিমের নিকট প্রেরণ করেন। বিহারের নানা স্থানে বিদ্রোহ হইতেছিল বলিয়া, নবাবকে পাটনায় আসিবার জন্ত আহ্বান করাই এই দৌত্যের উদ্দেশ্য। রাম নারায়ণ ও ইংরেজবর্গ এই উভয়ই গোলাম হোসেনের বন্ধু এবং এই উভয়েই মীরকাশিমের চক্ষুঃশূল ছিলেন; এজন্ত তিনি গোলাম হোসেনের উপরও বিরক্ত ছিলেন। গোলাম হোসেন বর্দ্ধমান গিয়া নবাবের দেখা পাইলেন বটে, কিন্তু কার্য্য সিদ্ধি হইল না। তখন তিনি মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার পথে পাটনায় আসিলেন।

কিছুদিন পরে মীরকাশিম পাটনায় আসিয়া রামনারায়নের নানা ষড়যন্ত্র প্রকাশিত করিলেন। তখন রামনারায়ণ বন্দী হইলেন এবং তাঁহার স্থানে সীতাব রায় নাজির নিযুক্ত হইলেন। মুঙ্গের সহরে গোলাম হোসেনের এক জায়গীর ছিল; উক্তস্থানে রাজধানী সংস্থাপন করা মীরকাশিমের উদ্দেশ্য ছিল, এজন্ত তিনি গোলাম হোসেনকে অন্যত্র জায়গীর দিবার প্রস্তাব করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে উক্ত স্থান চাহিয়া লইলেন গোলাম হোসেন তাহাকে জায়গীর অর্পণ করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে স্বীয় ভরণ পোষণের প্রার্থনা করিলেন। নবাব স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু বহুদিনের মধ্যে কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। মুঙ্গেরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে ফুলারটন প্রভৃতি ইংরাজ বন্ধুর পরামর্শানুসারে গোলাম হোসেন তথায় আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু নবাব তাঁহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন না। গোলাম হোসেন প্রত্যহ দরবারে আসিতেন। হঠাৎ একদিন নবাবের কি সুমতি হইল; তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে যাবতীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইলেন এবং তৎক্ষনাৎ তাঁহাকে ৫,০০০ টাকা প্রদান করিলেন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিমত তাঁহার প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিয়া দিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। স্থির হইল যে, ভবিষ্যতে প্রতিমাসে তাঁহার বেতন দেওয়া হইবে, তিনি একদিন অন্তর নিয়মিতভাবে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা গালিব আলি সপ্তাহের মধ্যে একদিন ও চতুর্থ ভ্রাতা সৈয়দ আলি পক্ষমধ্যে একদিন সাক্ষাৎ করিবেন।

কিছুদিন পরে যখন ইংরাজদিগের সহিত নবাবের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল, তখন গালিব আলি ও সৈয়দ আলি পাটনায় প্রেরিত হইলেন, কিন্তু গোলাম হোসেনকে যাইতে দেওয়া হইল না। ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যদি কোনও সময়ে ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ ঘটে, তখন দূতের কার্য্য হইতে পারিবে; এবং গোলাম হোসেন প্রতিভূস্বরূপ থাকিলে, তাঁহার পিতা নবাবের বিরুদ্ধে যত্নবান হইবার জন্ত বাদশাহকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন না। শীঘ্র ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ বাধিল; নবাব প্রথমে গোলাম হোসেনকে ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা সূত্রে সম্বদ্ধ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন; কিন্তু গোলাম হোসেন সে সন্দেহের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন

করিয়া দিলেন। অবিলম্বে কাটোয়ার যুদ্ধে মীরকাশিমকে পরাজিত করিয়া ইংরাজেরা পুনরায় বৃদ্ধ মীরজাফরকে মসনদে বসাইলেন।

তখন ক্রোধান্ধ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মীরকাশিম অসংখ্য লোককে নৃশংসরূপে হত্যা করিলেন। এই সময়ে অমিয়ট সাহেব নিহত হন। গোলাম হোসেন সে সময়ে মুঙ্গেরে ছিলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্বরূপে হত্যাকাণ্ডের কোনও সংবাদই পান নাই। পরে তাঁহারই অনুরোধে ডাক্তার ফুলারটন সাহেব নিস্তার পাইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য মীরকাশিম গোলাম হোসেনের দ্বারা চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। তখন নবাব সসৈন্যে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গোলামহোসেনও সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে বারাণসী পর্য্যন্ত গিয়া, তথন তাঁহার মাতুল সৈয়দ আলির বাটীতে অধিষ্ঠান করিলেন।

বারাণসীর কর্ম্মবিহীন অলস জীবন বহুদিন ভাল লাগিল না। তথা হইতে গোলাম হোসেন কিছুদিন হোসেনাবাদ ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পাটনায় আসিয়া পূর্ব্ববন্ধু ফুলারটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে ফুলারটনের জীবন রক্ষা হইয়াছিল; সহৃদয় ইংরাজ সে অনুগ্রহের কথা বিস্মৃত হন নাই। এই সময়ে সেনাপতি মনরো সাহেবের সহিত গোলাম হোসেনের পরিচয় হইল। বিখ্যাত রোটাস্ বা রোহিতাশ্ব গড় তাঁহারই জায়গীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল; মনরো প্রস্তাব করিলেন, যদি তিনি উক্ত গড়ের মালিক সহমন্নের নিকট হইতে ঐ গড় ইংরাজদিগকে প্রদান করাইতে পারেন, তাহা হইলে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার চিরবন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইবে। গোলাম হোসেন সহমন্নের নিকট প্রস্তাব করিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত করিলেন এবং যথাকালে সহমন্নকে সঙ্গে করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ সমস্ত কথাবার্ত্তা ধার্য্য করিয়া দিলেন। ইংরাজগণ গোলামহোসেনের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ক্লাইবের সহিত মেজর কার্ণাকের অত্যন্ত সৌহৃদ ছিল। কার্ণাক ফুলারটনের বিরুদ্ধে কোন কথা ক্লাইভকে জানান। এ জন্য ফুলারটন পদচ্যুত হইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব বন্ধু গোলাম হোসেনের নিকট বিদায় গ্রহণের সময় তিনি বারাণসীর অধ্যক্ষ মেজ সাহেবের নিকট এক অনুরোধ পত্র দেন। তদনুসারে গোলাম হোসেন তাঁহার পার্শ্বচর (attendant) নিযুক্ত হন। কিছুদিন বারাণসীতে থাকিতে থাকিতে তিনি সংবাদ পান যে, তাঁহার পিতা হেদায়েত আলি হোসেনাবাদে সন্ন্যাসরোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মাতার পত্রে এই সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি হোসেনাবাদে রওনা হইলেন। তথায় আসিয়া কয়েকদিন মাত্র ছিলেন; পরে মুর্শিদাবাদে যাইয়া নিজ নামে পৈতৃক জায়গীরের সনন্দ গ্রহণ করিলেন। সিতাব রায় ও সৈয়দ আলির চেষ্টায় গোলাম হোসেনের উক্ত কার্য্য সময়মত সুসম্পন্ন হয়। সিতাব রায় যে পাটনার নায়েব নাজিম ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ স্বদেশ যাত্রা করিলে ভেরেলষ্ট সাহেব কোম্পানির গবর্ণর নিযুক্ত হন। তখন সিতাব রায় গবর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় যান। তাঁহার সঙ্গে গোলাম হোসেনও ছিলেন। এই সময় হইতে গোলাম হোসেন অনেক সময়ে কলিকাতায় ও পাটনায় থাকিতেন। ক্রমশঃ ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য বর্দ্ধিত হয়। তিনি স্বীয় গুণে সেই ভীষণ অরাজকতার দিনে ইংরাজ সরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পাটনার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের জনৈক জমিদারের * সহিত গোলাম হোসেনের বহু বৎসর হইতে

* এই জমিদারের নাম উদারহৃদয় ঐতিহাসিক তাঁহার বিরাট গ্রন্থের কোথায়ও প্রকাশ করেন নাই। আমাদের অনুমান হয়, ইনি মিয়াজীরাম (৩য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ দেখুন), কিন্তু স্পষ্ট কিছুই বলিতে পারা যায় না। এই ব্যাপারে যে ইংরাজের কথা আছে, তিনি Mr. Neck হইতে পারেন। কিন্তু ইহাও অনুমান মাত্র।

সৌহৃত ছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কোনও কারণে গোলাম হোসেন জনৈক ইংরাজ ব্যবসায়ীর নিকট উহার জন্য প্রতিভূ হন। কিন্তু উক্ত জমিদার বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক অর্থ পরিশোধ করেন না বলিয়া গোলাম হোসেনের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লওয়া হয়। এই উপলক্ষে আমাদের ঐতিহাসিককে প্রায় ষাট হাজার টাকা দিতে হয়। তাঁহার পক্ষে এত অধিক টাকা এক সময়ে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া অতীব দুষ্কর; তিনি জহরত ও বাসনাদি বিক্রয় করিয়া মোট ৩১ হাজার টাকা মাত্র সংগ্রহ করেন। অবশিষ্ট টাকা এক বণিকের নিকট স্বকীয় জায়গীরের সনন্দ বন্ধক রাখিয়া, কর্জ্জ করিয়া লন। সুতরাং এবার তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে হইল।

ভাগ্যক্রমে এই সময়ে, কর্ণেল গভার্ড চুনার গড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার মত সদাশয় ব্যক্তি ইংরাজদিগের মধ্যে তখন বিরল ছিল। গভার্ডের চরিত্রখ্যাতি ক্রমে দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। গোলাম হোসেনের সহিত পূর্ব্বেই তাঁহার সামান্য পরিচয় ছিল। তিনি পাটনায় আসিলে গোলাম হোসেন গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় দুরবস্থা জানাইলেন। মহামতি গভার্ড দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তৎকালে তাঁহাকে কোনও বিশেষ পদে নিযুক্ত করিবার সুবিধা ছিল না। তবুও তিনি গোলাম হোসেনকে তাঁহার সহিত চুনারে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন গোলাম হোসেন স্ত্রী ও পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে গভার্ডের সহিত নৌকাযোগে চুনার যাত্রা করিলেন। প্রথম হইতেই কর্ণেল সাহেব তাঁহার প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি বিমোহিত হইয়া গেলেন। গোলাম হোসেনের পরিবারবর্গের যাবতীয় ব্যয়ভার কর্ণেল সাহেবই বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী ছিল; তবুও তিনি অকপট ভাবে আমাদের ঐতিহাসিকের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও কৃপা প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য তিনি বাস্তবিকই ধন্য বাদার্হ।

এই সময়ে গভার্ড শুনিলেন যে, অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলা একদল নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অধিনায়করূপে একজন ইংরাজ সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। গভার্ড ভাবিলেন যে, চুনারের কর্ম্মহীন জীবন অপেক্ষা অযোধ্যার উৎসাহপূর্ণ কর্ম্মময় জীবন তাঁহার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এজন্য তিনি উক্ত পদের প্রার্থী হইতে মনস্থ করিলেন। তখন জানব্রীষ্টো নামক এক ব্যক্তি অযোধ্যায় ইংরাজ-রেসিডেন্ট ছিলেন। উপরোক্ত পদে লোক নিযুক্ত করা ব্রীষ্টোরই কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু ব্রীষ্টোর সহিত গভার্ডের পরিচয় ছিল না; এজন্য তিনি স্বীয় বন্ধু গোলাম হোসেনকে অযোধ্যা প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। গোলাম হোসেন চুনারে পরিবারবর্গ রাখিয়া কয়েকজন মাত্র অনুচরসহ লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জৌনপুরে গিয়া তিনি বিখ্যাত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ আক্কারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকদিন শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচনায় পরম সুখে অতিবাহিত করেন। গোলাম হোসেনকে আমরা সর্ব্বত্রই কবির জীবনের পক্ষপাতী দেখিতে পাই; এই জন্য তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকের নানাস্থানে স্বরচিত বা পরকীয় কবিতা উদ্ধৃত আছে। এই সকল স্থানে তাঁহার বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞানের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুসন্ধিৎসা দেখিয়া পাঠকমাত্রের মনে ভক্তির উদ্রেক হয়।

গোলামহোসেন লক্ষ্ণৌ গিয়া জানব্রীষ্টো সাহেবকে গভার্ডের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি সম্মত হইলেন এবং পরে নবাবকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। নবাব বাহাদুর সম্মতি প্রদান করিলে ব্রীষ্টো কলিকাতায় কৌন্সিলে লিখিয়া তাঁহাদেরও সম্মতি আনাইলেন। গোলাম হোসেন সুসংবাদ লইয়া চুনার যাত্রা করিলেন; কিন্তু তিনি চুনার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সুপ্রীম কৌন্সিল হইতে সংবাদ পাইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাইবার তিনি গোলাম হোসেনের পরিবারবর্গেরও যথেষ্ট লইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের যাইবার জন্য বজরা ও নৌকা করিয়া এবং স্বীয় মুন্সীর উপর তাঁহাদের তত্ত্বা-

বধানের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। একজন সুচতুর পত্রবাহক দ্বারাও এ সংবাদ গোলাম হোসেনের নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। গোলাম হোসেন প্রত্যাগমনকালে জৌনপুরে আসিয়া এই সংবাদ পান; তখন তিনি ত্বরিত গতিতে লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। তৎপরে তিনি দশমাসকাল লক্ষ্ণৌ ছিলেন। তাঁহার প্রথমবার লক্ষ্ণৌ যাত্রার পর হইতে চৌদ্দমাসকালের মধ্যে তিনি গডার্ড সাহেবের নিকট হইতে দশ সহস্র টাকা পাইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভুর তত্ত্বাবধানে পরম সুখে লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করিতেছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে এক দৈব ঘটনা ঘটিল। জ্যান্ ব্রীষ্টোর স্থানে মিডিলটন সাহেব অযোধ্যার রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ইহার সহিত শীঘ্রই গডার্ডের মনান্তর উপস্থিত হইল। অল্পদিন মধ্যেই গডার্ড তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের কৃপাপাত্র হইয়া প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য দক্ষিণভারতে প্রেরিত হন। তৎপূর্ব্বেই গোলম হোসেন বন্ধুবরের নিকট বিদায় লইয়া পাটনায় পৌছেন। জীবনের অবশিষ্টকাল শান্তিতে এই স্থানে অতিবাহিত করেন। ১১৯৫ সালের (১৭৮৩ খৃঃ) রমজান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের তৃতীয় দিনে তাঁহার পুস্তক রচনা শেষ হয়। সম্ভবতঃ ইহার কয়েক বৎসর পরে পাটনার প্রদেশেই তিনি পরলোকগত হন। তাঁহার সন্তানাদির কোন পরিচয় বা তাঁহার মৃত্যুর তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

"হিয়ার টান।"

রূপের আলোকে কানন উজলি
গোলাপ যখন ফুটে,
সে আলোর পানে প্রকৃতির টানে
হিয়া যে আমার ছুটে।

এ যদি আমার দোষ হয়ে থাকে
সে দোষ কি মোর ভাই,
গোলাপ যে মোরে টেনে নিয়ে যায়,
আমি কি সেথায় যাই?

প্রেমিক প্রেমিকা মিলেগো যেথায়
গভীর-পুলক ভরে,
একের হৃদয় অপরের সাথে
যেথা বিনিময় করে;

স্বর্গ বলিয়া প্রণমি সে ভূমি,
এ যদি দোষের হয়,—
প্রকৃতিরে তবে দুষিও বন্ধু
সে দোষ আমার নয়।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃকগণ।

[তরুণীরমণ]

"পদ-রস-সার" পুথিতে পদ-কর্ত্তা তরণীরমণের ৬টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয় পাবনা জেলার এক বৈষ্ণব বাবাজির নিকট একখানা প্রাচীন পদাবলীর ক্ষুদ্র পুথি পাইয়াছেন,—উহাতে কেবল "রাগাত্মিক" পদই আছে। আমাদিগের ধারণা ছিল যে কেবল চণ্ডীদাসই "রাগাত্মিক" পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুথিতে আমরা চণ্ডীদাস ব্যতীত আরও কয়েক জন বৈষ্ণব কবির ভণিতাযুক্ত কতক গুলি "রাগাত্মিক" পদ পাইয়াছি। তন্মধ্যে তরণীরমণের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদও আছে। এই পদ গুলি তরণীরমণের রচিত বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার পদ-সংখ্যা অবশ্য আরও বেশী হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটী স্থিত শাখার কার্য্য বিবরণে পাঠ করিয়া ছিলাম যে, তত্রত্য কোন সাহিত্য সেবীর চেষ্টায় তরণীরমণের রচিত একখানা পদাবলীর পুথি সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু আমরা ঐপুথি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যে গৌহাটী শাখা পরিষদের সম্পাদক মহাশয় নিকট পত্র লিখিয়াও উত্তর পাই নাই; সুতরাং উক্ত পুথিতে তরণীরমণের কতগুলি পদ আছে এবং ঐ পুথি হইতে তাঁহার দেশ ও কাল সম্বন্ধে কোন বিষয় জানা যায় কিনা—তাহা জানিতে পারি নাই। "পদকল্পতরু গ্রন্থে তরণীরমণের ভণিতাযুক্ত কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই দেখিয়া আমরা তরণীরমণকে পদ-কল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের পরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলাম কিন্তু "পদ-রস-সার„ ও "পদ-কল্পতরু" উভয় গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি পদের কৌতুকজনক পাঠ-ভেদ দর্শনে আমাদিগের মনে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। "পদ-কল্প-তরু" গ্রন্থের ২য় শাখার ৭ম পল্লবে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পদটি দৃষ্ট হয়, যথা—

মঙ্গল রাগ।

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আবেশে কহত মনের কথা।
কবহুঁ হরিষ বিষাদ ব্যথা॥
সঙ্কেত করল নাগর-রায়।
কি করব সখি কহ উপায়॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি।
কেমনে যাইব রহিতে নারি॥
এতহুঁ ভাবিয়া চলিয়া ধনী।
যতহুঁ বিঘিনি কিছু না গণি॥
সখীগণ মেলি সঙ্কেত গেহে।
আওল তরুণী রমণ কহে॥

"পদ-রস-সার" পুথিতে এই পদের ভণিতায় কলিটির পাঠ এইরূপ, যথা—

"সখীগণ মেলি সঙ্কেত গেহে।
আওল তরণীরমণ কহে॥

বলা বাহুল্য যে উভয় পাঠেই অর্থ করা যায়; সুতরাং ইহাই বিবেচ্য যে, কোন পাঠটি অধিক প্রমাণিক ও সুসঙ্গত। পদ-কল্পতরুর মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সকল পুথিতেই "আওল তরুণী রমণ কহে॥" পাঠ আছে; সুতরাং উহার পরবর্ত্তী "পদ-রস সার" পুথির একখানা মাত্র হস্তলিপি দর্শনে পদকল্প-তরুর ধৃত পাঠকে অপ্রামাণিক বলা যাইতে পারে না। হস্তলিপির প্রাচীনতা ও প্রাচুর্য্য অনুসারে পদ কল্পতরুর পাঠকেই বরং প্রাধান্য দিতে হয়। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে, এই একটি মাত্র সন্দিগ্ধ পদ ব্যতীত পদ কল্প-তরু গ্রন্থে "রমণ" ভণিতা যুক্ত অন্য কোনপদ উদ্ধৃত হয় নাই; পক্ষান্তরে "পদ-রস-সার" "গ্রন্থে "তরণী রমণের" ভণিতাযুক্ত এতদ্ভিন্ন আরও ৫টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এরূপও মনে করা যাইতে পারে যে, "পদ-রস সার" পুথির সঙ্কলয়িতা প্রায় সর্ব্বত্র বৈষ্ণব দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াও এস্থলে যে বিভিন্ন ভণিতা গ্রহণ করিয়াছেন—ইহার কারণ এই যে

বৈষ্ণবদাস তরণী রমণের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকায় তিনি "তরণী রমণ" যে পদকর্ত্তার নাম তাহা বুঝিতে না পারিয়াই অন্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু নিমানন্দ দাস তরণী রমণের পদাবলী সংগ্রহ কালে উক্ত পদটি তরণী রমণের রচিত বলিয়া নিশ্চিত জানিতে পারিয়াই বৈষ্ণব দাসের ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে আবার ইহাও বলা যাইতে পারে যে "তরণী রমণ" নামটি নিমানন্দের সুপরিচিত বলিয়াই তিনি এস্থলে সেই নামের ভ্রান্ত সাদৃশ্য দর্শনে প্রতারিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদিগের বিবেচনায় যদি কখনও তরণীরমণের স্বহস্ত লিখিত পদাবলির পুথি পাওয়া যায় এবং উহাতে এই পদটি দৃষ্ট হয়—তাহা হইলেই ইহা তরণীরমণের রচিত বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হইতে পারিবে, অন্যথা এই সন্দেহের সুমীমাংসা সম্ভবপর নহে।

সে যাহাহউক, আমরা এস্থলে তরণীরমণের নিঃসন্দিগ্ধ অন্ত ৫টি পদ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। তরণী-রমণের পূর্ব্বোক্ত "রাগাত্মিক" পদগুলি অন্যান্য "রাগা-ত্মিক" পদের ন্যায়ই প্রহেলিকাময়, উহা উদ্ধৃত করিলেও সাধারণ পাঠকবর্গের কোন কাজে আসিবে না; সুতরাং আমরা সে গুলি উদ্ধৃত করিব না।

পাহ্লার।

শুন হে যুবক সখা আর কি হইব দেখা
পাসরিতে নারি সুধামুখী।
এ কথা কহিব কায় কেবা পরতীত যায়
মোর প্রাণ আমি তার সাখী॥
সখা! ভাবিতে ভাবিতে তনু শেষ।
না জানি কি করে বিধি যদি নহে কার্য্যসিদ্ধি
আনলে করিব পরবেশ॥ ধ্রু॥
শুনিয়া সুবল কয় কিছু না করিহ ভয়
অবিলম্বে আনি দিব তারে।
পুরিবে তোমার আশ তবে সে জানিবে দাস
বিলাস করিবে রসভরে॥
কর যোড় করি শ্যাম সখারে করে পরণাম
ইহলোকে তুমি মোর বন্ধু।
তরণীরমণে বলে রাখ রাঙ্গা পদ-তলে
এই বার তরাও ভব-সিন্ধু॥

বরাড়ী।

শুন ধনি রমণি-শিরোমণি রাধে।
হেরইতে কানু করল বহু সাধে॥
যব যমুনা তুহুঁ নাহিতে গেল।
মাধব তব তহি তরুতলে খেল॥
যৈখনে হেরল তুয়া মুখ-চান্দ।
যামিনি দিনয়া ঝোরে ঋর ঋর কান্দ॥
উচল কুচযুগ হার উজোর।
সঙরিতে কম্পিত নন্দকিশোর॥
রাম-কদলি উরু পদ-নখ ইন্দু।
সঘনে ফুকারই ব্রজ-কুল-বন্ধু॥
অভিসর সুন্দরি না কর বিলম্ব।
মাধব যদি জিয়ে তব অবলম্ব॥
তরণীরমণ ভণ বিহিক বিধান।
দাখিছে যৈছে করল হেম দান॥

ধানশী।

সখীগণ (তোহে?) আপন হাম জন।
অন্তর বাহির না করলুঁ আন॥
এ বাধে যা কর ভয় নাহি হোয়।
তা কর আগে সোপি দেই মোয়॥ ধ্রু॥
পহিলহি আদর নয়ন-বিভঙ্গ।
কহইতে (করহ'তে?) কোরে আন ভয়-রঙ্গ।
এহ সখি হাথে সহা নাহি যায়।
পিরিতি মুরুখ সত্রেত কোকর চায়॥
তরণীরমণ ভণ আন নাহি জান।
সো সুপুরুখ লাগি তেজবি পরাণ॥

(অর্থাৎ শ্রীরাধা বলিতেছেন)—হে সখীগণ! তোমাদিগকে আমি আপন বলিয়া জানি, অন্তরে এবং বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করি নাই; (তবে কি জন্য তোমরা) যাহার (কোন কাজেই) ভয় হয় না, তাহার (অর্থাৎ হঠকারী শ্রীকৃষ্ণের) সম্মুখে আমায় সপিয়া দিতেছ? (শ্রীকৃষ্ণের মিলনের পূর্ব্বে) নয়ন-ভঙ্গী ও আদর (দেখা যায়) কিন্তু সে ক্রোড়ে (ধারণ) করিলে অন্যরূপ ভয় ও ক্রীড়া-চাঞ্চল্য (দেখা যায়)।

হে সখি! আমার পক্ষে উহা সহ্য হয় না; কে চাহিয়া অর্থাৎ দেখিয়া শুনিয়া মূর্খের সঙ্গে প্রণয় করে? তরণীরমণ বলিতেছেন——আর (কিছু) জানি না,—(এইমাত্র জানি যে) সেই সপুরুষের জন্য (তুমি) প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহিবে!

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী হইয়া সখী-দিগকে বলিতেছেন——

ধানশী।

শ্যাম-নাম যব যে মোরে শুনায়ব
না হেরব তাকর মুখ।
কালীয় বরণ কভু নাহি পেখব
তবহু মিটব মোর দুখ॥
সজনি ঐছন মরম-বিচার।
তাকর স্বরূপ বিরূপ করি রাখহ
যৈছে না হয় বিকার॥ ধ্রু॥
গুঞ্জ কঞ্জ? বিম্বফল নহ কিসলয় দল
বন্দনি (বান্ধুলি)? করু দূর দেশ।
কর পদ অধর যে সব সম তাকর
হেরইতে তনু করু শেষ॥
কোকিল ষটপদ ভুহু দূরে তেজহ
কালীয় বরণ সম তার।
মৃগমদ উতপল সুগন্ধি সুশীতল
পরশ করব নাহি আর॥
আর দিগগণ না চলু সমীরণ
আনব তা তনু-গন্ধ।
তেজহ শিখিগণ শির পর ভূষণ
তাহে অতি নাচন মন্দ॥
না করব চন্দন অঙ্গে বিলেপন
চারু তিলক তছু ভালে।
তেজব নিলাম্বর না হেরব অম্বর
দরশহ এ মেঘমালে॥
সুখদ ঐতি পথ (?) না হব হৃদিগত
সুমধুর, মুরলী সমান।
তরণী রমণ ভণ ঐছে কবর পুন
যাবধি রহল পরাণ॥

দুঃখের বিষয়——এই বিচিত্র পদটির স্থানে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, সুতরাং সম্যক্ অর্থ-প্রতীতি হয় না; তথাপি এই পদে প্রিয়তমের বিরহে দৃষ্টি মাত্র শ্রুতি ও স্পর্শের পীড়াদায়ক বস্তুগুলির শ্রীরাধা কর্ত্তৃক ছল-পূর্ব্বক বর্জ্জন পদকর্ত্তা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

অতঃপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন যথা,—

ধানশী।

যতনে রাই সেই মন্দিরে গেল।
নিজ নিজ সেবন সখীগণ কেল॥
নিরজনে রহ ধনি হোই সুথির।
অন্তর গরগর কাট বাহির॥
কানু-পরশ রস যদি নাহি জান।
দরশে হরষ মন সরস নয়ান॥
ভাবি ভবনে ধনি হৃদয় বিথার॥
বিবশ লাজ ভয়ে তাহে অনিবার॥
তরণীরমণে ভণ অপরূপ রস।
পহিলক মিলন যুবতি-অপযশ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

অমঙ্গল।

শুভদিনে আমার কেন
নয়ন ছলছল
তোরা কেহ সুধাস্‌নেরে
বুঝবি কি তা বল।
এই বাড়ী আর এই উঠানে
গোপন ব্যথা আমার জানে,
কোলাহলে উঠছে নে'ড়ে'
হিয়ার কলকল।

(২)

মনে পড়ে দারুণ রাতি
আলো আঁধার ছাদ,
সোণার প্রদীপ নিভলো হেসে
পড়লো সাধে বাদ।
রোদন ধ্বনি হাহাকারে
মূর্চ্ছাতুর রইনু পড়ে।
সাম্‌নে আমার মিলিয়ে গেল
সোণার শতদল।

(৩)

চারিদিকে আলোক মালা
আনন্দেরি গান,
লজ্জা করে থাকতে আমার
শুষ্ক ম্রিয়মাণ।
হাস্য আমার অশ্রু ভরা
ঢাক্‌তে গিয়ে দেয় যে ধরা
অতল স্মৃতি সিন্ধু মথি'
উঠছে হলাহল।

(৪)

এই খানে সে ভাসান দেওয়া
ভুলবে কি সে মন,
সাধন গুহায় সাজবে কেন
বাহ্যিল নিমন্ত্রণ?
আজ্‌কে আমি শক্তিহারা
বিশ্ব ডাকি' পায় না সাড়া
সুখের চিতা যজ্ঞ কুণ্ড
চাইছে আঁখিজল।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

নিবেদন *

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল সে দিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়া ছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পরে।

* বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে পঠিত।

কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটী ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই, যে মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাসরাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্যসম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণ-ভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তিনি জনহিতকর নানাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যর উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে-সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখসম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্রের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহুদেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষা-কার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয় পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জর্ম্মাণীতে আচার্য্য হর্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়া সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভায় কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন

মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসির বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমান-কালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পরে তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম, যে আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিন ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল। আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেদিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাতকারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপে অনুমান করা যায় কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রীড়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মত বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরো দুই একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন, তাহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সেই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী পর্য্যটন

ভাগ্য ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম, উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মান করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই সেই দুর্য্যোগ ও একদিন অভাবনীয়-রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরাজ একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন; তিনি উদ্ভিদ জীবন সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং যে সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষানুসারে এই সকল কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন "তোমা-দের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশসেবক!" জানিতে পারিলাম, সেইদিনের আগন্তুক আজ আমা-দের ভারতসচীব মণ্টেগু। ইহার পর ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে

প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভাড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ক্রটী দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন: তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জর্ম্মাণ অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটী মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমার নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যে আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট পৌছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল, যে এ সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাইত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিলেন সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের।

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবনপণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়।

বিজ্ঞান প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগত অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশ বলে জড় যন্ত্রগুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, যে তাহার দুইটি চক্ষু একসময়ে জাগরিত থাকে না,

পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণমান বিদ্যুৎ-উর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্ব্বাক জীবনের বেদনাচাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থির বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধি মাত্রা পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগদ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনা প্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্ব-বিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোন বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্ব্বেণী সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহুশাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞান বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যে নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইবে; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি যে আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুইজন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম। গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয় আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়ত, দেখিতে পাইব যে এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার।

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এইস্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোন পেটেণ্ট লওয়া হইবে না; কারণ আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থলাভের উপায় নহে।

আমার আরো অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনও আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমুর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন, আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাত বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি, বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদ্-জগতে, তুষ্ণীম্ভূত, অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতি শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল। ইহার মধ্যে কোন্‌টা নশ্বর কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্য পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব চিন্তা প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশ বিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই।

তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল! তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার অগম্য তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

"সার্থকতা।"

জীবন-বসন্তে যদি পিকবর
নাহি ওগো কভু গাহে,
আঁখি তুলে যদি কেহ মোর সখা
গোলাপ পানে না চাহে;

তুমি প্রিয় ওগো চাহিও,
হৃদি বীণে মোর গাহিও।

ধন্য করিয়া জীবন আমার
ক্ষুদ্র কুসুম ফুটিবে,
চারি পাশে মোর পাগল হইয়া
অগুরু গন্ধ ছুটিবে।

তুমি প্রিয় ওগো চাহিও,
হৃদি বীণে মোর গাহিও।

পরশ পাথর পরশি তোমার
সোণা হবে হৃদি মোর,
বক্ষ বাহিয়া লক্ষ ধারায়
বহি যাবে প্রেম লোর।

শ্রীচারুভূষণ দেব চৌধুরী

মাননীয় বিচারপতি

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী, নাইট্,
সি-এস্-আই, এম্ এ, ডি এল, ডি-এস্-সি,
পি-এইচ্-ডি, এফ্-আর-এ-এস্,
এফ্-আর-এস্-ই, এফ্-এ-এস্-বি
মহোদয়ের প্রতি

অভিনন্দন।

হে ঋত্বিক্! সুমহান্ বাণীর মন্দির
তপোমন্ত্রে করিয়া মুখর,
ক্লান্তিহীন সাধনায় হিয়া-রক্ত ঢালি'
অঞ্জলিয়া বক্ষের পঞ্জর,
দাঁড়ায়েছ আজি সিদ্ধ সাধক সমান
স্মিত আস্যে মহাগরিমায়,—
তরঙ্গিত নিখিলের বিস্ময়-কল্লোল
লুটি' লুটি' চরণ-তলায়;
চন্দন চর্চ্চিত ভালে, পূত-আশীর্ব্বাদ
পূজা-ফুল শোভিছে মাথায়—
হে ঋষি! হে ভারতীর মহাপুরোহিত!
ধন্য হলে সিদ্ধ সাধনায়।

হে মহান্! হেরি' হেরি' না পাই আভাষ
কোন্ দূর অনন্ত অম্বর
তব দীপ্ত গরিমার আলোক-নির্ঝরে
অবগাহি' হয়েছে ভাস্বর!
অন্তহীন ওই জ্ঞান-সিন্ধু-সিকতায়
কত ভক্ত বিস্ময়-আকুল
কৃতাঞ্জলি নতশিরে করিছে বন্দন
নেহারিয়া প্রসার বিপুল!

হে বাণী-নন্দন! আজি দেবতার মত
স্থান তব হিয়ায় হিয়ায়,
ও চরণ-শতদল-মকরন্দ চুমি'
কত ভৃঙ্গ গাহে মূর্চ্ছনায়!

'কার ভাষা ভুলিবারে সবে চায়' বলি
কবে কবি গেয়েছিল গান,
আজি কে গাহিল 'দাও ও চরণে ঠাঁই,
চাহিনা গো ধন চাহিনা মান।'—
কে সাজাল ভিখারিণী মলিনা ভাষায়
কে সাজাল রাণীর মতন,
বাণীর দেউলে শত ভাষা-রত্ন-পীঠে
দিল তারে হেম-সিংহাসন?—
তুমি মুছায়েছ আঁখি; তবু সে কুণ্ঠিতা
লাজ-নম্রা উপেক্ষিতা হায়,
হে ভক্ত! ঘুচাও লাজ বঙ্গভারতীর
উজলিয়া নবীন বিভায়।

হে গুরু! দিয়াছ আঁকি' জ্ঞানের অঞ্জন,
অন্ধ কত লভেছে আলোক,
ভাষাহীনে দেছ ভাষা কলকণ্ঠে তাই
কত ছন্দঃ ভুলাল ভূলোক!
যে শাখে ফোটেনি ফুল, নবীন মঞ্জরী
আজি তারে করেছে মোহন,
যে কুঞ্জে জাগেনি গান, রাগিনী তাহার
তরঙ্গিয়া ভরিল ভুবন!
হে নির্ম্মল! ডুবি' তব গরিমা-সায়রে,
হে দেবতা! লুটি' ওই পায়,
তৃপ্ত হোক্ ধন্য হোক্ বিমুগ্ধ পরাণ,
আশীর্ব্বাদ লভিয়া মাথায়।

পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ,
ঢাকা
অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

"বিশ্বেশ্বরের চরণে।"

(গল্প)

(১)

প্রিয়বন্ধু বিজনের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া আজ এক বৎসর পরে হঠাৎ উপরের সিড়িতে নারায়ণীর সঙ্গে মোহনের মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। শেষবার যখন দেখা হয় তখন নিজদের বাড়ী রায় পাড়ায় দেখা হইয়াছিল, তারপর সে দিদির নিকট এলাহাবাদে চলিয়া যায়, নারায়ণীর আর কোনো খবর রাখিত না। তবে সে কিছুদিন হয় শুনিয়াছিল যে, বিজনের ঠাকুরমার সঙ্গে নারায়ণী নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। তাঁহারা যে ফিরিয়া আসিয়াছে এসংবাদ জানিতে পারিলে সে কিছুতেই এখানে আসিতে স্বীকৃত হইত না। কিন্তু আজ সমস্ত দোষটা নিজের স্ত্রী ইন্দুর উপর যাইয়া পড়িতে চাহিল। তারি আগ্রহেইত, সে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং একাজের জন্ত যদি কেহ দায়ী থাকে তবে সে।

বন্ধুর সাদর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই রাত্রেই মোহন বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মোহনকে হঠাৎ ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ব্রহ্মময়ী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন ও মনে মনে একটা কারণও ভাবিয়া লইলেন, হয়ত বা তাঁহার এই এক গুয়ে ছেলেটী কিছু একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। তাই শঙ্কিত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারে মনু কি করে তুই এই রাত্রে একাটী চলে এলি? বিজন তোকে ছেড়ে দিলে? তুই কি তার সাথে রাগ করে চলে এসেছিস?" এই বিজন ছেলেটীকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন। এটীকে নিজের আর একটী সন্তান মনে করিয়া তিনি গর্ব্বও অনুভব করিতেন।

মোহন তাড়াতাড়ি উত্তর করিল 'কিছুনা মা, আমি ঠাকুর মার মত নিয়েই চলে এসেছি। তিনি পুরী হতে ফিরে এসেছেন, এ খবরত বিজন আমায় কোনো দিন বলে নি।' 'আচ্ছা তোর ঠাকুর মা কি আগেকার মত এখনো বেশ চলা ফেরা কর্‌তে পারেন? আর নারায়ণীর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে রে? সে ভাল আছে ত?' পুত্র সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে বলিয়া উঠিল, 'নারু যে তার স্বামী হারিয়েছে, কই এসংবাদ ত তুমি একদিনের তরেও আমায় বলনি।' এ ব্যাপারটা ধারণা করিতেও যেন তাহার সমস্ত দেহটাকে শিথিল করিয়া তুলিল। অতীতের অনেক কথাই যেন, আজ তার হৃদয়টাকে খোলা পাইয়া দমকা বাতাসের মত হু হু করে বয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সে মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া পুনরায় কাতর কণ্ঠে কহিল, "নারুকে এ বেশেও কোনো দিন দেখ্‌তে হবে তাত স্বপ্নেও ভাবিনি।"

ব্রহ্মময়ী জড়ের মত দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর যেন হিম হইয়া আসিতেছিল। তিনি কোনই উত্তর দিলেন না। মোহনই বলিয়া উঠিল "জানত মা আমার চাকরী হয়েছে; কালই আমি যেতে চাই। যত দেরী করব ততই নিজের ক্ষতি হবে। বিজনটা এমন একগুয়ে, সে কিছুতেই চাকরী কর্‌বেনা— অনাহারে থাক্‌লেওনা। আমাদের কলেজ হাসপাতালেই কিন্তু ও চাকরী পেয়েছিল। হাতের লক্ষ্মী কেহ কখনো পায়ে ঠেলে? ও এমনি লক্ষ্মী ছাড়া!" যাকে একদিনও চোখের আড়াল করেন নাই তাহাকে দূরদেশে পাঠাইতে হইবে ভাবিলে স্নেহময়ী মাতার প্রাণে কতখানিই না আঘাত লাগে। তবু তিনি তাঁর মনের দুর্ব্বলতাকে জোড় করিয়া বদ্ধ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা কালই যাস্। কিন্তু বল্‌ত মনু, তুইযে চলে এলি, ইন্দুকে নিয়ে এলিনি কেন?" একটু কি ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন "আমায় ছেড়ে চল্‌তে ত তুই এখনো শিখিস্‌নি, কি করে চাকরী করবি বলত? না তোর চাকরী করে কাজ নেই।" "মা পুরুষ মানুষের কি চিরকাল ঘরের বৌটীর মত বাড়ীতে বসে থাকা ভাল দেখায়? বিদেশে যেতে যেতেই পাকা হয়ে যাব। তুমি কিছু ভয় করোনা।" ব্রহ্মময়ী বুঝিলেন অধিক বলা নিষ্প্রোয়জন। এই আদুরে ছেলেটীর স্বভাব তিনি খুব বিশেষ ভাবেই বুঝিতেন। জেদ ধরিলে সে তা সাধন করিবেই।

এইরূপ একগুঁয়ে লোকের, খড়ের আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও বেশী সময় লাগে না, আবার ধপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও বেশী সময়ের দরকার হয় না। কালই আবার তাহার মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে ফিরিয়া যাইতে পারে ইহা ভাবিয়া ব্রহ্মময়ী এখানেই চাপিয়া যাওয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন। মাতাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া "দেখ মা এখনি আমার জিনিষ গুলি ঠিক্ করিয়া রাখ্তে হয়; তা নাহলে কাল্‌কে ত আর গাড়ী ধরতে পারবনা" এই বলিয়া মোহন ধপ্ ধপ্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। মাতা উপায়ন্তর না দেখিয়া এই স্বেচ্ছাচারী পুত্রটীর পিছু পিছু নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কেবলি জাগ্‌তেছিল যে এই ছেলেটী এখনো কোন কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ রহিয়া গেল।

ব্রহ্মময়ীর পিত্রালয় ছিল আনন্দবাগ গ্রামে। সেখানেই নারায়ণীর মাতার সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং সে আলাপ পরে দৃঢ় অটুট বান্ধবতায় পূর্ণ হয়। নারায়ণীর মাতার অদৃষ্টে বিধাতা পুরুষ সুখের একটী ছাপ দিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। চিরটা জীবনই কেবল দুঃখ-দুঃখ-দুঃখ। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া এই নারায়ণীকেই নিজের বুকের উপর রাখিয়া ভিতরের বহ্নিকে উপেক্ষা করিয়া সংসারে শত যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতেন। এই নারায়ণীই তাঁহার দুঃখে সুখ, আঁধারে আলো, চিন্তায় তৃপ্তি, ব্যথায় শান্তি। নারায়ণীর যখন ১১ বৎসর তখন একদিন বিশ্ব বিধাতার আদেশ বাণী অভাগিনী বিধবাকে প্রস্তুত হইতে জানাইয়া দিল। তিনি নারায়ণীকে ব্রহ্মময়ীর হাতে সমর্পন করিয়া জীবনের এই শেষ সময়ে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলেন। ব্রহ্মময়ী সাদরে সখীর শেষ দান গ্রহণ করিলেন এবং সেই হইতেই নারায়ণী, ব্রহ্মময়ীর সংসারে।

যখন নারায়ণীকে লইয়া ব্রহ্মময়ী কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন তখন মোহন মেডিক্যাল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। ব্রহ্মময়ী ভবিষ্যতের কি সুন্দর চিত্র খানিই না আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কে জানিত, অদৃষ্ট বিধাতা মাতার ন্যায় কন্যার অদৃষ্টেও সুখের ছাপ দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে নারায়ণীর খুবই কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু সে শোক ক্রমে ক্রমে সয়ে গেল। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন সে উপলব্ধি করিতে পারিত যে, অভাগিনী নারায়ণী, রাজরাণী হইতে চলিল তখন তার সমস্ত প্রাণটা পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত। নারায়ণীকে ছাড়া মোহনেরও একদণ্ড চলিয়া উঠিত না। মোহনকে দেখিবার শুনিবার সব ভারই এখন নারায়ণীর হাতে। এসব দেখিয়া শুনিয়া ব্রহ্মময়ী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

ইতি মধ্যে বিজনের বিবাহ খুব ধুম ধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। পরীক্ষার বৎসর বলিয়া ব্রহ্মময়ী মোহনের শুভকার্য্যটা স্থগিত রাখিলেন। তাহার এইত শেষ কাজ—কত না ধুম ধাম করিবেন।

অতিরিক্ত পড়া শুনায় মোহনের শরীর একটু খারাপ হইয়া পড়িল। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে সকলেই তাহাকে একবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। সে সময়ে এলাহাবাদ হইতে বোনেরও সাদর নিমন্ত্রণ আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহন এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

এলাহাবাদ হইতে আসিয়া মোহনের হঠাৎ বিবাহে বৈরাগ্য দেখা গেল কেন তাহার কারণ কেহই খুঁজিয়া পাইল না। সেও কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না। কেবল মাকে পরিষ্কার ভাবে বলিল, সে বিবাহ করিবে না। একজন বিবাহ না করিলেই যে বৃহৎ মহাভারত অশুদ্ধ হইবে, এ রকম কোন নিয়মই নাই। মাতা পুত্রের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে একেবারে দমিয়া গেলেন। তথাপি মোহনকে জানাইয়া দিল যে, এরকম কাজ হলে তিনি এবং সে সঙ্গে মোহনকেও ধর্ম্মের কাছে দায়ী থাকিতে হইবে। মোহন এসকল যুক্তিতে আদৌ মন না দিয়া খুব উৎসাহের সহিত নারায়ণীর জন্য একটী ভাল ছেলে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। বহু চেষ্টার পরও যখন মনের মতন ছেলে খুঁজিয়া পাইল না তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

ব্রহ্মময়ী যখন দেখিলেন আর কোন মতেই নারায়ণীকে ঘরে রাখা যায়না তখন বিজনকে একটা ব্যবস্থা করিবার জন্ম ধরিয়া বসিলেন। বিজন, বন্ধুর নির্ম্মম ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু ব্রহ্মময়ীর প্রাণের বেদনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া আর কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার নীরব মৌন ভাষা জানাইয়া দিল সে, চেষ্টার ত্রুটী করিবে না।

বিজনের চেষ্টায়—একটী ভাল ছেলে পাওয়া গেল। বিবাহের কথাবার্ত্তা যখন একরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল তখন মোহন মাকে ধরিয়া বসিল, সে নিজেই বিবাহ করিবে। বিজন জেদ ধরিল তা হতেই পারে না। "না মা এরূপ অবিবেচক নিষ্ঠুর ছেলের হাতে তুমি নারায়ণীকে সঁপে দিও না নারায়ণীরত সুখ হবেই না, তোমারও এজন্ম সারা জীবন কষ্টে পেতে হবে।" বন্ধুর ব্যবহার বিজনের প্রাণে যে দাগা দিয়াছিল, এক পসলা বৃষ্টি হওয়ার পর সে দাগও মুছিয়া গেল এবং সে সঙ্গে বিজনের প্রাণটাও বেশ হাল্কা হইয়া গেল। মোহন বন্ধুর দুটী হাত সজোরে ধরিয়া বলিল "বিজন তুইও কি আমার প্রতি নির্ম্মম হবি? ঠিক্ দেখিস্ এবার আমি একেবারে বদ্‌লে যাব। আমার একথা আখরে আখরে সত্য হবে।" অবশেষে মোহনেরই জয় হইল। আগামী মাঘ মাসেই বিবাহ হইবে স্থির হইল। মাতা এসংবাদ আত্মীয়স্বজন সকলকে জানাইলেন এবং বহু আত্মীয়কে আনিতে লোকও পাঠাইলেন। মাতার অনুরোধে এলাহাবাদ হইতে বোনকে আনিবার ভার বাধ্য হইয়া মোহনকেই গ্রহণ করিতে হইল।

এলাহাবাদে অমলা দিদির ভাসুরের মেয়ে ইন্দুর অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমটির মত মুখের হাসি হাসি আভাস, মোহনের প্রাণে এমন একটা মোহ জন্মাইয়া দিল যে সে কিছুতেই নারায়ণীকে আর হৃদয়ে স্থান দিতে পারিল না। বোনের কাছে সে নিতান্ত নির্লজ্জের মতই বিবাহের প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিল। মোহন মাকে এসংবাদটা সবিশেষ জানাইল এবং নারায়ণীকে বিবাহ না করিবার কৈফিয়ৎস্বরূপে ইহাও জানাইল যে যাহাকে এতদিন বাড়ীতে রাখিয়া বোনের মত স্নেহ করিয়া আসিতেছি তাহাকে বিবাহ করিলে নিতান্তই অধর্ম্মের কাজ হয়। এসংবাদ যখন ব্রহ্মময়ীর নিকট পৌঁছিল তখন তিনি কিছুতেই তাঁহার উচ্ছ্বসিত বেদনাকে আর দমন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। একটা ভীষণ অলস্ত কামানের গোলা পড়িয়া যেন তাঁহার জীর্ণ হৃদয় দুর্গ একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং সে কামানের গোলার ধোঁয়াতে যেন সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁহার নিকট অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। এসংবাদ নারায়ণীর নিকট পৌঁছিতে বেশী সময় লাগিল না। তাহার সমস্ত জমাট ব্যথা অশ্রুরূপে দর দর ধারে পড়িতে লাগিল। আমি নিরাশ্রয়া পিতৃ মাতৃহারা সহায় সম্পদ হীনা বলিয়াই কি এই অপমান! ব্রহ্মময়ী পুত্রের পত্রোত্তরে লিখিলেন, "তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিও তবে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পাপকে ঢাকা দিতে চেষ্টা করিওনা।" মা যে খুবই বিরক্ত হইয়াছেন তাহা মোহন বেশ বুঝিতে পারিয়াও—ওদিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য করিল না। নির্ব্বিঘ্নেই এলাহাবাদে মোহনের বিবাহটা সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের প্রায় দু মাস পর মোহন সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিল। পুত্র যখন অপরাধীর মত মার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল তখন মা আর পুত্রের প্রতি অভিমান রাখিতে পারিলেন না। তেমনি আদর করিয়াই তাঁর স্নেহের কোলে স্থান দিলেন। মোহন কিন্তু নারায়ণীকে বাড়ীতে দেখিতে পাইল না। খোঁজ লইয়া জানিল যে নারায়ণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মোহনের প্রথমে ভয় হইয়াছিল বুঝিবা তাহাকে দেখিতে হইবে ভাবিয়া নারায়ণী এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া বিজনের বাড়ীতে গিয়াছে কিন্তু বিবাহের সংবাদটা শুনিয়া সে বেশ্ নিশ্চিন্ত হইল। কোথায় বিবাহ হইয়া গিয়াছে বা কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, ইহার কোন কথাই মার নিকট উত্থাপন করিতে মোহন সাহস পায় নাই; বরং নারায়ণীর কথা চাপা দিতেই সে সর্ব্বদা চেষ্টা করিত।

ব্রহ্মময়ী বহু অর্থ খরচ করিয়া নারায়ণীকে একটী ভাল ছেলের সহিত বিবাহ দিয়া সুখী করিতে চেষ্টা

করিলেন। কিন্তু বিশ্ব বিধাতা যে নারায়ণীর অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। একমাস পরেই নারায়ণী বিধবা হইয়া ব্রহ্মময়ীর নিকট ফিরিয়া আসিল। নারায়ণীর চিন্তায় ব্রহ্মময়ী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বিজন, ঠাকুরমা, মা ও তার দুই ভগ্নীকে লইয়া যখন নানা তীর্থ দেখিতে রওনা হইবেন, ব্রহ্মময়ী নারায়ণীকেও সেই সঙ্গে তাঁহাদের হাতে সঁপিয়া দিলেন। মোহন কিন্তু এসংবাদ জানিত না। তারপর কখন কি ভাবে মোহনের সহিত নারায়ণীর দেখা হইল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পরদিন ভোর বেলা ইন্দু, নরায়ণীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াই দেখিতে পাইল হরি চাকর খুব ব্যস্ততার সহিত জিনিষ পত্র গাড়ীতে তুলিতেছে। ইন্দুর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না; কিন্তু কি যে তার অপরাধ সেটা ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারিল না। তবু হরিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হরি, এসব কি হচ্ছে?" হরি তাঁকে জানাইয়া দিল যে মোহন গাজীপুর যাচ্ছে। প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিতেই মোহন দেখিল দরজার একটা পাট ধরিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়া আছে এবং তারি পাশে নারায়ণী। ইন্দু যে এত শীঘ্র নারায়ণীর সঙ্গে এমন ভাব করিতে পারিবে সেটা সে আদৌ ভাবিতে পারে নাই। সে অবাক হইয়া ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দু বলিয়া উঠিল "বলি, অপরাধ করেছি আমি আর নির্ব্বাসন দণ্ড নিচ্ছ তুমি, এত বেশ্ মজার বিচার। ওসব আমি হতে দিচ্ছি না। এক টাকায় কত পয়সা হয় এই সামান্য সাংসারিক অভিজ্ঞতা যাঁর নেই, তিনি কিনা যাবেন গাজীপুরে, তা আবার চাকরী করতে। আচ্ছা নারায়ণী দি তুমিই বলত এ রকম লোকের আবার চাকরীর সাধ কেন?" নারায়ণী মোহনের দিকে একবার চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিল। নারায়ণীর সম্মুখে এ ভাবে লজ্জিত হওয়ায় মোহনের সমস্ত পৌরুষত্ব এক নিমেষের ভিতর জাগিয়া উঠিল। সে দীপ্ত ভাবে উত্তর করিল, "ঠিক বোেঁা, মোহনকে তোমরা যতটা বোকা মনেকর, সে ততটা বোকা নয়। আমি কি করব না করব তার কৈফিয়ৎ কি তোমার কাছে দিতে হবে। শুধু টাকা পয়সার হিসাব রাখবার মত বুদ্ধি যার ঘটে তার কেন এত বড় কথা?"

স্বামীর নিকট হইতে এরূপ উত্তর পাইবে ইহা সে একেবারেই কল্পনা করে নাই। তার চোখ দুটী বেদনায় ছল ছল করিয়া উঠিল। "আচ্ছা, যাচ্ছ যাও, আমার ত 'না' বলবার কোন অধিকার নেই" এই বলিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মার নিকট বিদায় লইতে যাইয়া মোহন ও স্থির থাকিতে পারিল না, মাও তাঁর উচ্ছ্বসিত স্নেহকে কোন রকমেই দমন করিতে পারিলেন না। কোথাও যেন তিনি একটু আশ্বাসের আলো খুঁজিয়া পাইলেন না। সমস্ত ভুবনটাই যেন তাঁহার নিকট কেবল কালো বলিয়া মনে হইল। "মা আরত বিলম্ব করতে পারিনা, সময় যে হয়ে এল।" মা, পুত্রকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। "মনু, খুব সাবধানে থাকবি; আমার দিব্বি, রোজ চিঠি লিখতে ভুলিস্নে,—আর যেয়েই তার করবি।" "তাই হবে মা।" এই বলিয়া মোহন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। নারায়ণী এ সকল ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিল না। তার নিকট, এটা একটা প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল।

মোহন চিরকালই সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ,— নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি ততোধিক উদাসীন। গাজীপুরে আসিয়া ব্রহ্মময়ী ও ইন্দুর আর তাড়া না থাকাতে তাহার সমস্ত দেহ ও মনটা একবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সকলের স্নেহের আড়ালে আসিয়া পড়াতে তার হৃদয়টা যেন নির্ম্মম হইয়া পড়িল এবং সে সঙ্গে মেজাজটাকেও রুক্ষ করিয়া দিল। গাজীপুর আসিয়া মোহন যে একজন বন্ধু পাইয়াছিল তার নাম ক্ষীরোদ বিহারী। তিনি সর্ব্বদাই মোহনের খোঁজ খবর লইতেন। সাধারণতঃ বেশী মাত্রায় পরিশ্রম করিলে যাহা হয়; মোহনেরও ঠিক তাহাই হইল। মোহন ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। সময় ও সুযোগ পাইয়া ধীরে ধীরে নানা ব্যাধি আসিয়া মোহনকে আক্রমণ করিল। ক্ষীরোদ বাবু, বন্ধুর জন্য বড়ই ভাবিত

হইলেন। হরি চাকরের নিকট হইতে বিজনের ঠিকানাটা জানিয়া লইয়া তাহাকে আনিতে ভার করিয়া দিলেন। মোহন ইহার বিন্দু মাত্রও জানিত না।

বিজন তার পাইয়াই সকলকে লইয়া গাজীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহন হঠাৎ সকলকে দেখিয়া প্রথমে বড়ই বিস্মিত হইল। এ সকল যে ক্ষীরোদ বাবুর কর্ম্ম তাহা বুঝিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না, শয্যাশায়ী দুর্ব্বল ক্ষীণ মোহনকে দেখিয়া ব্রহ্মময়ী আর চক্ষের জলকে বাধা দিতে পারিলেন না। মোহনের গলা জড়াইয়া শিশুর মতন কাঁদিতে লাগিলেন।

চিকিৎসা এবং নারায়ণী ও ইন্দুর শুশ্রূষার গুণে মোহন ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল। মোহনের নিকট আসিতে প্রথমে নারায়ণীর খুবই লজ্জা করিত। যে নিজ হাতে বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, তার কাছে সহসা বাহির হইতে বোধহয় সকলেরই লজ্জা করে। যে মোহন দা কে ছাড়া তার এক মুহূর্ত্ত ও চলিত না সে মোহন দা আজ এত নিকটে থাকিয়াও তার কাছে হাজার ক্রোশ দূরে। আজকাল আর মোহনের নিকট আসিতে তার তেমন লজ্জা নাই। অনেক সময় দীর্ঘ দুপুর গুলো মোহনের সঙ্গে গল্প করিয়াই কাটাইয়া দেয়। সে দিন মায়ের ঘরে ঔষধ সেবন করিতে যাইয়া দেখিল নারায়ণী মায়ের আহ্নিকের সব ঠিক করিয়া দিতেছে। মাতা নারায়ণীকে পুত্রের ঔষধটা আনিয়া দিতে বলিয়া আহ্নিক করিতে ঠাকুর ঘরে চলিয়া গেলেন। মোহন একখানা চৌকিতে বসিয়া চস্‌মাটা পরিষ্কার করিতেছিল। নারায়ণী ঔষধের গ্লাসটা সম্মুখে ধরিতেই তাহা হাত বাড়াইয়া লইয়া বলিল, "জ্যোতি, আমাদের-পরশু যাওয়াই ঠিক হইল। প্রথমেই বৈদ্যনাথ যাব কি বল?" বলেই ঔষধটা একঢোকে গিলিয়া ফেলিল। অনেকদিন পর আজ অকস্মাৎ এ সম্বোধন শুনিয়া নারায়ণী প্রথমে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতিটা কাটিয়া গেলে সে উত্তর করিল "না মনুদা, আর কোথাও যেয়ে কাজ নেই; চল বাড়ীতেই যাই।" "এই কয়টা দিন দিবানিশি অক্লান্তভাবে খেটে খেটে তোমার শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এখন তোমার একটু ঘুরে ফিরে না আসলে দেহটা টিকবে কেন? না তুমি এতে আপত্তি করতে পারবে না। তা হলে আমারও যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু বলে রাখ্‌ছি।" একটু থামিয়া জ্যোতির কোমল দক্ষিণ হাতখানা ধরিয়া আবেগ ভরে বলিতে লাগিল "তা কিন্তু হতে পারে না জ্যোতি, একথা আমি মিনতি করেই বল্‌ছি; আর আমার কথা কি তুমি ঠেলে ফেল্‌তে পারবে।' নারায়ণী ধীরে ধীরে হাতখানা সরাইয়া নিয়া কপাটের দিকে চাহিতেই দেখিল ইন্দু তাহাদের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ইন্দু নারায়ণীকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াই দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। যেন সে কিছুই দেখে নাই। নারায়ণীর কেবলি মনে হইতে লাগিল 'ইন্দু কিই না মনে ভাবিয়াছে।' সে লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ আসিয়া মোহনের একটু বাড়াবাড়ি দেখা গেল। ইন্দু যে তাহা লক্ষ্য না করিল তাহা নয়। নারায়ণী, মোহনের এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া নিজের মনকে বেশ দৃঢ় করিল এবং সর্ব্বদাই মোহনের চোখের আড়ালে থাকিত। কিন্তু সকলের চেয়ে নারায়ণীর বুকে বাজিল ইন্দুর ব্যবহার। ইন্দু আর তেমন সরল ভাবে তার সাথে কথা বলে না—সবটাতেই যেন একটা অবিশ্বাসের ছায়া। সে যে তাদের সুখের ঘরে আগুন জ্বালাইতে বসিয়াছে এটা ভাবিতেও তার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

বৈদ্যনাথে আসিয়া মোহনের মনটা এত খারাপ হইয়া গেল যে সে কিছুতেই আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিল না। বাড়ীতে ফিরিবার জন্য সবাইকে তাড়া করিতে আরম্ভ হইল।

ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা, বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে একবার বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া যায়। নারায়ণী ও ইন্দু উভয়েই এই প্রস্তাব সমর্থন করিল। মোহনকেও বাধ্য হইয়া তাহাদের মতে মত দিতে হইল।

কাশীতে আসিয়া অনিয়মের পরাকাষ্ঠা করিতে তাহারা কেহই কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রত্যহ খুব ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করা আর দুপুররাত পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শুনাই যেন তাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত পান করিয়া নারায়ণীর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা

নিভিয়া গেল। তার হৃদয়ে যে একটু কালোর ছাপ পড়িয়াছিল তাহা পবিত্র আলোকের রশ্মিতে বিস্মৃতির অতল সলিলে ডুবিয়া গেল। নারায়ণীর শরীর পূর্ব্ব হইতেই খারাপ ছিল। অধিকমাত্রায় অনিয়ম করার ফলে সে শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। চিকিৎসার ও শুশ্রূষার কোন ক্রটী না থাকিলেও, পৃথিবীর সহিত নারায়ণীর বন্ধনটা যেন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। সাতদিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোহনকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

এ আঘাতটা মোহনকেই বেশী বিব্রত করিয়া তুলিল। অতীতের অনেক স্মৃতিই আজ তাকে অনুতাপের ভীষণ জ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিল।

*　　*　　*　　*　　*

বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া আসিয়া মোহন উপরের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসিয়া জ্যোছনাস্নিগ্ধ বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কি একটা ভাবে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, কোন সময়ে যে ইন্দু রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা টেরও পায় নাই। হঠাৎ উঠিতেই ইন্দুকে দেখিতে পাইয়া তাহার হাত দুটী চাপিয়া আবেগভরে বলিল, "চল চল ইন্দু আমরা বাড়ী চলে যাই।" ইন্দু স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তাই চল প্রিয়তম;—আমাদের অন্য কোথাও যেয়ে আর কাজ নেই।" স্বামীর প্রাণে যে আজ কতখানি বেদনা তাহা ধারণা করিতেই টস্ টস্ করিয়া সহানুভূতির অশ্রুজল তাহার অলক্ষিতে বাহির হইয়া মোহনের চরণের উপর পড়িল।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"সন্ধ্যায়।"

ক্লান্ত রবি ডুবে গেছে শ্যাম নদীতীরে,
দিবসের কোলাহল নিবে এল ধীরে;
থেমে গেছে জগতের সুখগান হাসি,
গুমরি কাঁদিছে শুধু অন্ধ ব্যথারাশি।
মনে পড়ে সেই এক গোধূলি লগনে,
মোদের হিয়ায় প্রিয়া চির শুভক্ষণে
মিলনের মহাসুর উঠেছিল বেজে।
গোপনে নীরবে এই মরমের মাঝে,
উঠেছিল ফুটে এক স্নিগ্ধতার ছায়া
সারা অঙ্গ শিহরিয়া;—কি মোহিনী মায়া।
তারপর সেই প্রিয়া রক্তিম সন্ধ্যায়,
এমনি অস্ত-অরুণ কিরণ আভায়,
মাগিলে বিদায় তুমি; আঁখি দুটি ম্লান,
তারপর ধীরে ধীরে সব অবসান।
আজিও তেমনি সন্ধ্যা উদার নির্ম্মল,
চেয়ে আছি শূন্য পানে চোখে আসে জল।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত।

প্রদীপ।

এই সন্ধ্যায় জ্বালা আমার হাতের দীপ
দিলাম তোমার চরণের তলে রাখি!
জ্বালা এ পূজার অর্ঘ্য লইয়া হায়!
করিয়ো পূর্ণ যা' আছে ইহার বাকি!
কতবার দীপ নিভেছে পবন-ত্রাসে;
কতবার হায়! মলিন এ ধূলা বাসে
মুছাতে চরণ সরমে মরেছি আমি
করিয়ো পূর্ণ এখনো যা' আছে ফাঁকি!

থালা ভ'রে দীপ জেলেছিনু সারি সারি—
এসেছি সে থালা বহিয়া অনেক দূরে;
নিভেছে অনেক তবুও রয়েছে আজও
দু'একটি তার, শূন্য এ মন জুড়ে!
আঁচল খসিয়া পড়েছে অনেকবার;
শিখার দীপ্তি আঁধারে মেনেছে হার
এখনো যা' আছে দয়া করে তার পানে
তাকাও দেবতা! থেক না'ক আর দূরে!

নয়নের জলে অনেক প্রদীপ মোর
নিভায়েছি আমি, ক্ষম সে নয়ন-লোর;
অনেক নিশায় আঁধার পথের পাশে
চেয়েছি শূন্যে! নিশা হয়ে গেছে ভোর!
ক্ষম সে আমার শূন্য অলস মন;
দীপ লয়ে হাতে প্রদীপ খুঁজিতে ব্যর্থ করেছি ধন।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

THE COMMISSION.

The Royal Commission which has been appointed to enquire into the constitution of the Calcutta Universsity and to recommend any changes that may seem necessary has now got to work, and having taken a general survey of the situation has settled down in Calcutta. In December the members spent a week in Dacca. They seemed surprised at the extent, and may we not say the magnificence, of the various buildings available here for University purposes, and they probably used the words uttered by the Queen of Sheba upon a similar occasion ; though universities, teaching, unitary, or residential, were to be sure not much talked about in her day.

The very fact that a Royal Commission has been appointed is a clear indication that some change in the University system is contemplated. When we couple with this fact the promise that has been made that Dacca shall have a University, the only questions that remain to be answered are how? and when?

Be it far from us to attempt, however humbly, to do the work which the Wise men of the West have before them. All that we can say is that we want to see a Dacca University founded, and that we want to enjoy its benefits as soon as possible. It seems certain that it will be impossible for Calcutta to continue to cope with the matriculating multitudes much longer: the sooner, therefore, the Dacca University is established the better will it be for its over-burdened parent, as well as for the good people of Eastern Bengal. In regard to these questions we must keep in view Bengal as a whole and try to see how we can secure efficient instruction, instruction that will be useful as well as ornamental for the greatest number of those who are fit to receive it.

One thing is certain. The India of the future is not going to be an India in which the sole ambition of the student is to secure a government post. That field of enterprise has its obvious limits, and we have pretty well reached them. The training we shall have to give must fit students to carve out their own future ; we must keep in view the average man and try to make him equal to the part he will have to play. There is no fear

that the clever boys will be neglected ; they have been found to be quite capable of taking care of themselves, from the days of Abelard to those of Sir Asutosh Mukherji.

It is very important also that we should have clear ideas as to what a University really is. It is not a political organisation ; nor is it a debating society ; nor again is it an institution where a number of posts are provided for an equal number of gentlemen who are not quite sure that they could make an equally comfortable living in any other walk of life ; nor yet again is it an absolute monarchy where any one person has a preponderating influence. No, a University in the proper sense of the term is an organism complete in itself which exists for the purposes of giving a liberal education to students and of promoting research and higher culture ; it has no ulterior motive ; as to constitution it is a republic of letters, a body in which every member has his appropriate function, and his appropriate work. Some universities tend to become like a child with the rickets, the head is somewhat enlarged and the members are weak and shrivelled ; we are sure that the commissioners will save us from any such fate.

On one point we can lay stress. The Commissioners come in the main from England. Now, in many matters the East can supply the West with wisdom which it would find exceedingly useful, but the very presence of these gentlemen shows that the corresponding proposition in the opposite sense can be maintained. In regard to the organisation of Universities at all events the platitudes of Europe are full of novelty in India. But none the less the Commissioners must not be deceived. The new wine of the East may not suit the old bottles which have been shaped and patched by Cam and Isis. We must pray for the grace of congruity. Commissions come and commisions go, but India is India and unless something that suits her special needs emerges she plunges in thought again, sometimes possibly gently smiling at the efforts of those who have tried to change her.

Let us all hope that the happy combination of Western form and Eastern spirit will be effected by the Commission. They have an uncommonly difficult task before them—that is if the result of their labours is to get beyond the paper stage.

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of:—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

Th Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
Sir S. P. Sinha, Kt.
Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
" Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
F. C. French, Esq., C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
J. C. Kydd, M. A.
W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
T. T. Williams M. A., B. Sc.
Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.

The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The " Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra
" Jagadananda Roy.
" Binoy Kumar Sircar.
" Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law. Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

সূচী।

THE DACCA REVIEW.

Vol. VII.	OCTOBER, 1917.	No. 7.

SOME REFLECTIONS ON THE EDUCATION PROBLEM.

BY

P. LEO FAULKNER, F.R.G.S., I.P.,

Author of

"THE SCOPE OF BIOOEOGRAPHY" etc., etc.

Education can be likened unto a fork with three prongs representing in turn religious, physical and intellectual training. So long as the prongs are in no wise bent or injured the fork may perform its functions with the desired success, but let one of them be damaged and the result will almost surely be unsatisfactory. In a complete scheme of education we must therefore constantly keep in view the three main divisions to which I have alluded and insist that no one amongst them is allowed to develop at the expense of the others. Education does not only concern the individual—it is of the utmost importance to the State. What good to himself or his country is a great scholar if he be a physical or a moral wreck? Despite his erudition the probabilities are that he may lead others astray by his evil example and inclinations and be a source of untold harm.

I must confess that though it was my good fortune to be a member of the governing body of one of the most important colleges in West Bengal, I have, comparatively speaking, but little experience of higher education in this Province. Still during the year I see not a little of primary and secondary schools. As my launch passes through a *khal*, despite the presence of the masters the boys in the school on the bank throw down their books and rush outside to view the steamer. I have not infrequently stopped the launch to look in at these schools and inquired casually why no notice was taken of such a sin against authority. The masters, however, invariably appear to think that the boys' action was entirely natural and proper. And who are these teachers? They are for the most part men or youths who have failed to obtain

other appointments or who are preparing for their degree. Not a single one have I met who has been instructed in the science and method of teaching though this is hardly their fault as Training Colleges in India are at present very few and far between. To add to their difficulties the greater portion of the instruction is imparted in a foreign tongue, a phase of the educational system in India which has already attracted the attention of His Excellency the Viceroy. In a recent issue of the Calcutta Review Professor Madhusudan Bhattacherji had a very interesting article on English as a medium of instruction. He declares "it is almost impossible to master a foreign language from books only, without breathing the atmosphere of the people speaking the language. Our imperfect knowledge of English gives an air of unreality to to everything that we speak or write.... The objections advanced against Bengali were that the language was too concrete and could not be a proper vehicle for the expression of abstract sentiments. There were no books in Bengali on science, philosophy and history. But while admitting the force of these remarks, we call still urge that the difficulties were not insurmountable ....." There is no doubt much to be said in favour of these views and speaking for myself I am indeed glad that my studies had not to be made, say, in Russian or Chinese. Yet for many centuries in England Latin was the general medium of instruction. In fact it was only when education began to be more general and the populace at large indicated their purpose of opening out the field of education that English was adopted as the language of learning. In more recent times, at the Berlin Conference of 1890, the German Emperor emphatically asserted "It is our duty to train up men to become young Germans, and not young Greeks and Romans. We must make German the basis, and German composition must be the centre round which everything must turn." Again there is a very large and influential French colony in the Dominion of Canada and in their schools French has always been spoken and used. Indeed there are very few countries in the world where national culture does not form the basis of education. It seems to me, therefore, that until satisfactory arrangements are made for the scientific training of teachers and as long as the great mass of the youth of the country receive their education in a foreign language which it is obvious they cannot be expected to master, so long will the question of education in Bengal be an extremely difficult problem. Is it possible, not to say probable, that education will be education in the proper sense of that word if the agency employed is untrained and unskilled and the medium used a foreign language of great difficulty?

Bengal is an agricultural country and only ten per cent of its population live

in towns. In East Bengal particularly —where the majority of the inhabitants are Mahomedans—such conditions now obtain and as far as can be seen at present the conditions are not likely to alter. From an early part of their school career children should surely be instructed in the rudiments of science and their application to agriculture. Teachers should give object lessons in this connection as is done in England in rural districts where children are encouraged to cultivate little plots of land with flowers, vegetables and cereals. Their education should be such as will best fit them for the posts they are most likely to fill in after life. The Agricultural Department is striving its hardest to assist the cultivator but so far without much success. Why? Because the raiyat class are satisfied with the methods of former ages and cannot conceive that innovations may be entirely for their benefit. Let the present generation be brought up to realise that the world is going forward and that if Bengal is to take her proper place in the World's commerce, agricultural methods must be improved. There should be pictures in the country schools to depict steam ploughs and other modern developments so that the curiosity of the young may be excited and their intelligence stimulated. Only a few days ago a Mahomedan boy from Noakhali came begging for alms to my bungalow. His father, a poor cultivator, was unable to provide the necessary funds to maintain him at school. I offered to give him a rupee for each day during which he would weed my garden for six hours. To this, however, he could not possibly assent. It would be a matter of shame to him, the son of a father who possibly at that hour was busy ploughing his few bighas of land in distant Noakhali. And in all probability what will be the end of that boy? A teacher in the lower forms of a rural H. E. School!

Now as regards physical training I would venture to assert that, taken as a whole, the elders of the community look upon it as so much waste of time. That there are exceptions I will not attempt to deny but I am speaking in generalities. As an officer of Police I can affirm that not more than one in five candidates who apply to me for the post of constable fulfils the necessary physical requirements. Again last year I had to reject a large number of young men who applied for nominations as Sub-Inspectors. They had all passed the Entrance or Matriculation examinations but their chests were sadly undeveloped. And then what has happened in connection with the formation of the Bengalee Double Company? I was told a few days ago that on the morning a young Mahomedan of Pirojpur presented himself for medical examination only two recruits passed the doctor out of twenty-one who appeared. From the earliest times, it should be remembered, physical training has been recognised as one

of the phases of education. Amongst the Spartans gymnastics was a very important part of the curriculum and it is interesting to note in passing that the art of stealing was taught as a training in resourcefulness and judgment. Being a member of the constabulary which even now has frequently to deal with problems of great intricacy I would indeed be loth to suggest that the youth of Bengal should follow *in extenso* the example of the Spartans but the training in resourcefulness and judgment can be otherwise obtained by indulging in manly sports and pastimes. It is quite erroneous to imagine that because a man attains to eminence in the world of games that he cannot attain to success in other directions. To give an example which readily occurs to me I would remark that we have had two Viceroys in the last decade who earned renown in the realms of sports. But like everything else physical exercise should not be overdone, it is but one phase of education. Neither need it be expensive for in addition to the national games of Bengal, swimming, water polo, paper-chases, running and jumping can be encouraged at but little cost. Moreover, a healthy mind can only exist in a healthy body and the boy whose thoughts turn towards games in the hour of relaxation is far less likely to fall into trouble than the boy who is prone to pass his spare time in less desirable pursuits. Let the elders of the community admit once and for all that physical training is an exceedingly necessary phase of education and let them insist that their boys do not spend their evenings wandering round the bazaars imbibing noxious ideas and learning vicious habits. As a Police Officer, I have great facilities for studying human nature and and it gives me much greater pleasure to see boys on their way to the playing fields than to espy them turning down some narrow lane in a disreputable part of the town. We all know that the boys of to-day will be the men of the future and the responsibilitres increase with each generation. It then follows that they should be equipped with all possible knowledge and strength otherwise it is not only the individuals but their country also that will suffer.

With the question of religious education I do not intend to deal. It is not only a controversial but a very difficult subject. Speaking for myself I cannot conceive my children being educated in a school at which the tenets of my faith were not inculcated. That every boy, Mahomedan, Hindu or Christian, should be carefully and thoroughly instructed in his religious beliefs I frankly admit, but it is just as necessary that he should be taught to respect the religions of those who are not of his community. Live and let live is advice that cannot be too strictly followed. But how this phase of the problem can best be solved is a matter I have no hesitation in leaving to others more competent to decide.

STEPHEN PHILLIPS.

About the beginning of the present century, when Stephen Phillips was presenting the first-fruits of his poetic genius to the world, Mr. W. L. Courtney ventured to speak of him as one "from whom we have the right to expect hereafter some of the great things which will endure." Towards the end of 1915 death summoned the poet away, but not before he had triumphantly accomplished what the critic had hoped. We read of his death with surprise and regret, for he was a comparatively young man who might have given us several more majestic tragedies like those which will be a lasting monument to him.

He was born in 1868 at Somerton, near Oxford, and like many other English poets was the son of a clergyman. For a time he was a student at Cambridge University but left it without taking a degree. In his case, it was the stage that called him from the lecture-room, and for six years he was an actor in the company of his cousin, the famous tragedian, F. R. Benson. Those years were of graat value to Stephen Phillips who gained as an actor that intimate acquaintance with stage-craft which is so manifest in his dramas. He gives strikingly elaborate and careful stage-directions in all his plays, and none but a man who had lived in the atmosphere of a theatre would have ventured to do that. In fact, he made more of an art of stage-directions than any dramatist before him had done, and often the prose of them, like the prose of Shelley or Swinburne discovers a poet.

But Stephen Phillips did not find in this manner of life the quiet and freedom which his poetic soul yearned for, and although his next occupation did not by any means bring him the ideal leisure of the poet, it gave him some time for writing and must have been helpful in other ways. The six years of an actor's life were followed by six years as a lecturer in history at a big Army Examiner's in Blackheath, and while there he brought out his first great poem "Christ in Hades," and a book of verse which won for him the *Academy's* prize of £100 as the best book of the year. With the appearance of "Paolo and Francesca," a drama which was commissioned by Mr. George Alexander and dedicated to him, his fame was established, and in 1900 the tragedy of "Herod" was produced at Her Majesty's Theatre where it held the stage for many nights. "Ulysses" followed in 1902, and "Nero" in 1906. These were followed, at intervals by other tragedies such as "The Sin of David," "Iole" and "The King," and by a multitude of short poems.

Stephen Phillips did not attempt comedy, knowing where his strength lay. Comedy would have come most

unnaturally from his pen for his way was amid the gloom aud the shadows. Occasional glimpses of comic relief appear in his tragedies, but the relief is usually only of a partial kind. The scene between Eumaeus, the old swineherd, and Ulysses in the play of "Ulysses," and the episode in "Paolo and Francesca," where at a wayside inn a few rough soldiers exchange banter with some village maidens, are the only two scenes in which the shadow of gloom completely lifts for a moment. Both are skilfully done, the chaff of the soldiers and girls showing the dramatist's command of natural conversation, and the remarks of Eumaeus to his disguised master recalling rich Elizabethan humour.

Ulys. I have tidings of your lord Ulysses.

Eum. That's an old tale with you beggars—you have all seen Ulysses, and then you are well fed by his queen Penelope..... ....

Where hast thou seen him then? There is but one place where he has not been seen—

Ulys. What place is that?

Eum. In hell; I recommend hell to thee: no beggar hath yet bethought him of hell.

The dramatic irony of this conversation is remarkable, and it is a very common device with Stephen Phillips.

Yet, we feel that the dramatist sustains such a scene even for a page or two, only by a great effort, and that the strain could not last. When he gets back to the atmosphere of tragedy—and all his tragedies are of an intense kind—the greater is his mastery of a situation and the nobler is his verse. The subjects to which he is drawn do not show the same variety as those of Shakespeare but there is no monotony of treatment. He seems to have come under the spell of "Antony and Cleopatra," for love plays a large part in the catastrophes of his dramas.

"Her face was close to me, and dimmed the world" one of the most terrible and one of the most beautiful lines in his poetry would be the exclamation of some of his heroes, brought to the last account. But it is never the face of a Cleopatra, if we exclude Poppaea who does not begin the ruin of Nero but merely helps it on. In "Paolo and Francesca," a work of the most delicate beauty and dignity, this is the theme. Dante had treated the mediaeval tragedy in his Inferno, and painters have often interpreted it in colours. The story is a true one and has much in common with the tale of Launcelot and Guinevere. When Rimini and Ravenna made a compact in the 13th century they sealed it by the marriage of Francesca with Giovanni Malatesta, tyrant of Rimini, who sent Paolo his brother to bring home the beautiful young bride. But Paolo and Francesca fell in love, and Giovanni, who in the drama of Stephen Phillips is not the heartless tyrant of history,

found them together and slew them.

"Unwillingly
They loved, unwillingly I slew them."

The story is even sadder than that of Romeo and Juliet and none but a great poet could successfully treat it. Stephen Phillips has made of it a very beautiful thing. Paolo and Antony are of the same type. They cannot run from the love of Francesca and Cleopatra. Paolo makes the attempt,

"O, there is still a world of men for a man!
I'll lose her face in flashing brands, her voice
In charging cries. I'll rush into the war!"

but he fails.

"I cannot go: thrilling from Rimini,
A tender voice makes all the trumpets mute."

"The Sin of David" shows the same fundamental idea. The tragedy of Sir Hubert Lisle's life begins in his resistless but guilty love for Miriam Mardyke, hers in the acceptance of his love. Her beauty falls on him like a tempest and his life is stunned:

"My voice in the council falters: in mid-act
This lifted arm falls at thy floating face.
They waver like a mist, the ranks of war,
They waver and fade; he fades, th armed man,
And spurring armies in a vision clash."

Yet he would abandon everything for her love, and the road to ruin is taken when Miriam pours out her soul:

"O, all my life has listened for thy step
For thee alone came I into this world,
For thee this very hair grew glorious,
My eyes are of this colour for thy sake
This moment is a deep inheriting,
And as the solemn coming to a kingdom."

This play resets the scriptural story of David and Uriah, and is in the catastrophe one of the gloomiest things in literature. The one act tragedy of "Iole"—a still sadder theme—has also its source in the Old Testament. The heart-rending story of Jephthah and his daughter is magnificently sung in the characters of Pelias and Iole. "Nero" and "Ulysses" are classical subjects and for "Herod" the poet read *Josephus*. But in each case the treatment is fresh and original. In a note attached to "Ulysses" the author tells us he has departed from the Homeric story slightly in some scenes and entirely in others. In "Nero" he makes the Emperor an æsthete in crime and increases our horror by this very fact. Nero's imaginative nature and the knowledge of his power to satisfy it in anything make him what Seneca, his tutor, had feared an artist in omnipotence' who

"Uses for colour this red blood of ours
Composes music out of dreadful cries,
His orchestra our human agonies,
His rhythms lamentations of the ruined,
His poet's fire not circumscribed by words,

But now translated into burning cities,
His scenes the lives of men, their deaths a dràma,
His dream the desolation of mankind,
And all this pulsing world his theatre."

No more terrible aesthetic whim could be imagined than the arrangement of Nero for the poisoning of his half-brother "the boy Britannicus."

"It shall be
Performed to-night at supper: get you seats
It shall be something new and wonderful,
Done after wine, and under falling roses
And there shall be suspense in it, and thrill:
It shall be very sudden, very silent,
And terrible in silence—I, the while
Creator arranger of the scene,
Reclining with a jewel in my eye;
And Agrippina shall be close to me,
Aware yet motionless."

This idea of Nero as an aesthete in horrors gave Stephen Phillips a fine opportunity of showing his power, which lies largely in the rendering of terrible beauty.

Most of his work is in blank verse, and it is well he he was sparing of rhyme. Once or twice in his dramas, as for instance in the scene amongst the gods of Olympus, which forms the prologue of "Ulysses," he uses rhyme and although there the effect is musical and dignified, often in his short poems one feels he is out of his element. Rhyme seems to be as fetters to his inspiration and when he has come into possession of a rhyme he is afraid to to let it go in order to beautify his thought. His poems are in the consequence unequal, and only occasionally do we discover a very lovely thing. Here is one:

"Roses bring we to our love,
But lilies to the dead,
White flowers to the breathless give
To the breathing, red,
Yet soon the breathing shall be cold,
And earn the purer flowers,
The lily hath immortal lease,
The rose an hour."

On the other hand, no praise is too high for his blank verse. Its charm lies in a subtle combination of simplicity and dignity such as Tennyson achieved in the finest portion of his Idylls, of the King. But Phillips is almost always dignified and Tennyson is not. Also, like the treatment of his great themes. his blank verse is his own. It shows the cadences of Milton, of Keats and of Tennyson, and in "Herod," of the English Bible, but no influence predominates. It is different with the thought. There is much of the sensuousness of Keats and the delicate artistry of Tennyson and the elemental grandeur of Marlowe. In Imagination, Phillips is not behind our greatest poets, and the boldness of his imagery is one of the most impressive features of his work. Yet all is in place. Speaking of the madness of Herod, the outstanding

thing in whose career, was his love for Mariamne his wife, the physician says.

"And in the wild foam of insanity
He clasps this rock: that Mariamne lives."

Even more startling are Francesca's words to Nita

"Now
Day in a breathless passion kisses night,
And neither speaks."

Phillips makes abundant use of alliteration and the subtle variation of vowels. Somewhere he speaks of "the sweet slur of 'r's'" and much of his music is dependent on that.

"I ache to plunge
In the pure water of the purging grave."

says Christina in the grim tragedy of "The king," and Agrippina tells her rebellious son he will hear her step in dead of night.

"In stillness the long rustle of my robe."

But beautiful poetry does not constitute drama; in fact the danger is that it may retard it. Stephen Phillips has the mastery here also. His dramas are full of action, and we never feel that he is allowing his characters to delay the movement by declamation and digression. That has been the fault of some poets who have attempted to write a drama: it has prevented others from the attempt. But Stephen Phillips has achieved brilliant success in the poetic drama where so many have failed, and the critic who has spoken of him as "the greatest poetic dramatist we have had since Elizabethan times" does not exaggerate.

ALLAN CAMERON.

A NEWLY DISCOVERED BENGAL BRONZE.

(about 1250 years old)

The news of the discovery of this inscribed bronze image will delight all lovers of Indian Art and Archaeology. The artistic merit of the figure is very considerable, but its value is increased tenfold by seven lines of clear-cut inscription, which not only furnishes very valuable historical information but locates the art production to a definite Historical period. The image thus is destined to become a prominent landmark in the history of Bengal Arts. Most interesting of all,—the image was consecrated by a queen consort of previously known name, Maharanee Prabhabati, whose husband ruled, in the middle of the 7th century A.D. over Samatata, a neatly defined old pretty little kingdom composed of the plains of Sylhet, Tippera and Noakhali. The personal connection of this historic queen of mellow memory invests the image with a mysterious charm.

The royal husband of Prabhabati belonged to a line of Kings called the Khadgas from their surname. His name was Devakhadga, and he seems to have been the most powerful king of the dynasty.

More than thirty years ago, two copper.-plate inscriptions of Maharaja Devakhadga were dug up from a village called Asrafpur in the Narayanganj Subdivision of the Dacca District. Asrafpur occupies a prominent place by the side of old river-beds on the east of the old and the real Brahmaputra river. These two plates brought to light the line of the Khadga kings who had otherwise been totally forgotten. One of the plates granted land to a Buddhist monastery praying for the longevity of the crown prince Rajaraja Bhatta. The other recorded various grants of land to the same monastery, among which we find the name of the queen consort Maharanee Prabhabati as one of the prominent donors. We have met our dear pious queen again in the new inscription.

The plates are not dated in any known era and palæography is all but a sure guide in fixing dates. As a result, the chronology of the Khadgas is still floating over only 30 decades, with no fixed local habitation, at the mercy of the palæographists!

That the plane tract of land lying within the old course of the Brahmaputra on the west, the Garo and other hills on the north, the hills of Sylhet and Tippera on the east and the sea on the south was anciently the kingdom of Samatata has been proved beyond doubt by sure Epigraphical evidence. (Vide J. A. S. B. Jan. 1915. Pp. 17-18). It happens that a Chinese traveller has recorded in 692 A.D. that during his visit, Samatata was under a devout. Buddhist king called Raja Bhatta and Buddhism was flourishing luxuriantly under him. About half a century earlier Yuan Chwang, the famous Chinese traveller found Samatata a flourishing Buddhist kingdom directly south of Kamrupa i.e. modern Assam. The parallel is very striking. The Khadgas are devout Buddhists. At least four of the line ruled in succession, namely Khadgodyama, Jatakhadga, Devakhadga and Rajaraja Bhatta, the crown prince mentioned the Devakhadga's plate. They ruled in Samatata, as their inscriptions are found within the boundary of Samatata only. The period of their rule must lie between 600 A. D. and 900 A. D., so says palæography. Now look at the otherside. Yuan Chwang found Samatata a flourishing Buddhist country in 626 A. D. It Sing found it in a still more flourishing condition in 692 A. D. The temples had considerably increased in number while the Buddhist priests residing in them had also doubled their number. The analogy would lead one to identify the Raja Bhatta of the plate and Rajabhatta of the Chinese traveller, but still the identification does not seem to command universal satisfaction.

The royal family of Samatatat seems to have been of a particularly religious turn of mind. Yung Chwang states that Silabhadra, the head of the university of Nalanda came of the royal stock of Samatata. We can hardly conceive at this distance of time, what an exalted position it must have been. As the head of the greatest centre of Buddhist culture of the time, he must have occupied the position of the dictator of the then Buddhist world. It is presumable that he was a Khadga, and those who kept alive the name of Khadga in later times, tried in their humble way to emulate their illustrious ancestor by noble deeds of piety and benevolence. Devakhadga himself was a donor of land to Buddhist monasteries, but his wife and son were not slow to follow his footsteps. The pious soul of queen Prabhabati has once again spoken to posterity, through the present discovery.

The image is of the goddess Sarbabani, one of the forms of the goddess Durga. It is about twenty inches in height and rather heavy. It is cast in low relief and the technique is rather crude and the pose rigid. The goddess has eight hands holding different weapons. Two maids are on two sides of her, holding chowries. She stands on a lotus seat on the back of a couchant lion, the execution of whose head is rather pretty. The image was gilt all over, with thin sheets of gold, and the original gilding is still intact in places. The white patches show where the gilding still clings. The inscription on the base, translated reads thus.—"Om, Peace. There was a king, overlord of kings, Khadgadyama by name. His son on earth was Jatakhadga. His powerful and benevolent son Devas khadga was like a sword, a conqueror of all foes. Prabhabati, the Queen-consort of this king, out of reverence for the goddess Sarbabani, gilt her image with gold."

The image reveals a curious state of religious belief prevalent in those days. Queen Prabhabati and the members of her husband's family were all devout Buddhists; but all the same, she did not feel it any way irreligious to pay reverence to a goddess who must have belonged to the Brahmanical Pantheon. Harshabardhana to whose court Yuan Chwang came, divided his veneration among the Buddha, the sun-god and Siva in a similar manner. All this clearly shows that we must revise our idea of the old Buddhists and the Hindus as two communities shut up in watertight compartments. They were more like the present Saktas and Vaishnavas than otherwise.

The image was discovered at a village called Deulbari, 14 miles south of Comilla. Asrafpur, near the bank of the old Brahmaputra and Deulbari, sixty miles south-east mark the extent of the kingdom of the Khadgas.

N. K. BHATTASALI.

GOODNIGHT.

I remember, little son,
Long ago,
How I lulled you in these arms
To and fro.

Sat beside your little bed
Watch to keep
Where your sunny head was lying
Fast asleep.

Now you've lived and done your work
Done your work.
Battle-storm and bitter strife
No more irk.

Wind shall sing your slumber-song
Wind shall sing
Through the grasses round your grave
Wandering.

Mother cannot come, my child,
Watch to keep
Where your sunny head is lying
Fast asleep.

D. G. D.

THE VOICE OF LIFE*

I dedicate today this Institute—not merely a Laboratory but a Temple. The power of physical methods serves for the establishment of that truth which can be realised dicectly through our senses, or through the vast expansion of the perceptive range by means of artificially created organs. We still gather the tremulous message when the note of the audible reaches the unheard. When human sight fails, we continue to explore the region of the invisible. The little that we can see is as nothing compar ed to the vastness of that which we can not. Out of the very imperfection of his senses man has built himseif a raft of thought by which he makes daring adventures on the great seas of the Unknown. But there are other truths which will remain beyond even the supersensitive methods known to science. For these we require fâith, tested not in a few years but by an entire life. And a temple is erected as a fit memorial for the establishment of that truth for which faith was needed. The personal, yet general, truth and faith whose establishment this Institute commemorates is this: that when one dedicates oneself wholly to a great object, the closed doors shall open, and the seemingly impossible will become possible for him.

* Address given by Sir J. C. Bose on the occasion of consecrating his Institute to the nation.

Thirty-two years ago I chose teaching of science as my vocation. It was held that by its very peculiar constitution, the Indian mind would always turn away from the study of Nature to metaphysical speculations. Even had the capacity for inquiry and accurate observation been assumed present, there were no opportunities for their employmeut; there were no well-equipped laboratories nor skilled mechanicians. This was all too true. It is not for man to quarrel with circumstances but bravely to accept them; and we belong to that race and dynasty which had accomplished great things with simple means.

This day twenty-three years ago, I resolved that as far as the whole:hearted devotion and faith of one man counted, that would not be wanting, and within six months it came about that some of the most difficult problems connected with Electric Waves found their solution in my Loboratory, and received high appreciation from Lord Kelvin, Lord Rayleigh and other leading physicists. The Royal Society honoured me by publishing my discoveries and offering of their own accord, an appropriation from the special Parliamentary Grant for the advancement of knowledge. That day the closed gates suddenly opened and I hoped that the torch that was then lighted would continue to burn brighter and brighter. But man's faith and hope require repeated testing. For

five years after this the progress was uninterrupted : yet when the most generous and wide appreciation of my work had reached almost the highest point there came a sudden and unexpected change.

LIVING AND NON-LIVING

In the pursuit of my investigations I was unconsciously led into the border region of physics and physiology and was amazed to find boundary lines vanishing and points of contact emerge between the realms of the Living and Non-living. Inorganic matter was found anything but inert ; it also was a-thrill under the action of multitudinous force that played on it. A universal reaction seemed to bring together metal, plant and animal under a common law. They all exhibited essentially the same phenomena of fatigue and depression, together with possiblities of recovery and of exaltation, yet also that of permanent irresponsiveness which is associated with death. I was filled with awe at this stupendous generalisation ; and it was with great hope that I announced my results before the Royal Society,—results demonstrated by experiments. But the physiologists present advised me, after my address to confine myself to physical investigations in which my success had been assured rather than encroach on their preserve. I had thus unwittingly strayed into the domain of a new and unfamiliar caste system and so offended its etiquette. An unconscious theological bias was also present which confounds ignorance with faith. It is forgotten that He, who surrounded us with this everevolving mystery of creation, the ineffable wonder that lies hidden in the microcosm of the dust particle. enclositg within the intricacies of its atomic form all the mystery of the cosmos, has also implanted in us the desire to question and understand. To the theological bias was added the misgivings about the inherent bent of the Indian mind towards mysticism and unchecked imagination. But in India this burning imagination which can extort new order out of a mass of apparently contradictory facts is also held in check by the habit of meditation. It is this restraint which confers the power to hold the mind in pursuit of truth, in infinite patience, to wait, and reconsider, to experimentally test and repeatedly verify.

It is but natural that there should be prejudice, even in science, against all innovations ; and I was prepared to wait till the first ineredulity could be overcome by further cumulative evidence. Unfortunately there were other incidents and misrepresentations which it was impossible to remove from this isolating distance. Thus no conditions could have been more desperately hopeless than those which confronted me for the next twelve years. It is necessary to make this brief reference to this period of my life ; for one who would devote himself

to the search of truth must realise that for him there awaits no easy life, but one of unending struggle. It is for him to cast his life as an offering, regarding gain and loss, success and failure, as one. Yet in my case this long persisting gloom was suddenly lifted. My scientific deputation in 1914, from the Government of India, gave the opportunity of giving demonstrations of my discoveries before the leading scientific societies of the world. This led to the acceptance of my theories and results, and the recognition of the importance of the Indian contribution to the advancement of the world's science. My own experience told me how heavy, sometimes even crushing, are the difficulties which confront an inquirer here in India; yet it made me stronger in my determination that I shall make the path of those who are to follow me less arduous, and that India is never to relinquish what has been won for her after years of struggle.

What is it that India is to win and maintain? Can anything small or circumscribed ever satisfy the mind of India? Has her own history and the teaching of the past prepared her for some temporary and quite subordinate gain? There are at this moment two complementary and not antagonistic ideals before the country. India is drawn into the vortex of international competition. She has to become efficient in every way,—through spread of education, through performance of civic duties and responsibilities, through activities both industrial and commercial. Neglect of these essentials of national duty will imperil her very existence; and sufficient stimulus for these will be found in success and satisfaction of personal ambition.

But these alone do not ensure the life of a nation. Such material activities have brought in the West their fruit, in accession of power and wealth. There has been a feverish rush even in the realm of science, for exploiting applications of knowledge, not so often for saving as for destruction. In the absence of some power of restraint, civilisation is trembling in an unstable poise on the brink of ruin. Some complementary ideal there must be to save man from that mad rush which must end in disaster. He has followed the lure and excitement of some insatiable ambition, never pausing for a moment to think of the ultimate object for which success was to serve as a temporary incentive. He forgot that far more potent than competition was mutual help and co-operation in the scheme of life.. And in this country through milleniums, there always have been some who, beyond the immediate and absorbing prize of the hour, sought for the realisation of the highest ideal of life—not through passive renunciation, but through active struggle. The weakling who has refused the conflict, having acquired nothing, has nothing to renounce. He alone who has striven and

won, can enrich the world by giving away the fruits of his victorious experience. In India such examples of constant realisation of ideals through work have resulted in the formation of a continuous living tradition. And by her latent power of rejuvenescence she has readjusted herself through infinite transformations. Thus while the soul of Babylon and the Nile Valley have transmigrated, ours still remains vital and with capacity for absorbing what time has brought, and making it one with itself.

The ideal of giving, of enriching, in fine, of self renunciation in response to the highest call of humanity is the other and complementary ideal. The motive power for this is not to be found in personal ambition but in the effacement of all littlenesses, and uprooting of that ignorance which regards anything as gain which is to be purchased at anothers'loss. This I know, that no vision of truth can come except in the absence of all sources of distraction, and when the mind has reached the point of rest.

Public life, and the various professions will be the appropriate spheres of activity for many aspiring young men. But for my disciples, I call on those very few, who, realising some inner call, will devote their whole life with strengthened character and determined purpose to take part in that infinite struggle to win knowledge for its own sake and see truth face to face.

The work already carried out in my laboratory on the response of matter, and the unexpected revelations in plant life, foreshadowing the wonders of the highest animal life, have opened out very extended regions of inquiry in Physics, in Physiology, in Medicine, in agriculture and even in Psychology. Problems, hitherto regarded as insoluble, have now been brought within the sphere of experimental investigation. These inquiries are obviously more extensive than those customary either among physicists or physiologists, since demanding interests and attitudes hitherto more or less divided between them. In the study of Nature, there is a necessity of the dual viewpoint. this alternating yet rhythmically unified interaction of biological thought with biological studies. The future worker with his freshened grasp of physics, his fuller conception of the inorganic world, as indeed thrilling with "the promise and potency of life" will redouble his former energies of work and thought. Thus he will be in a position to winnow the old knowledge with finer sieves, to re-search it with new enthusiasm and subtler instruments. And thus with thought and toil and time he may hope to bring fresher views into the old problems. His handling of these will be at once more vital and more kinetic, more comprehensive and unified.

The further and fuller investigation of the many and ever-opening problems of the nascent science which includes both Life and Non-Life are among the

main purposes of the institute I am opening to-day; in these fields I am already fortunate in having a devoted band of disciples, whom I have been training for the last ten years. Their number is very limited, but means may perhaps be forthcoming in the future to increase them. An enlarging field of young ability may thus be available, from which will emerge, with time and labour, individual originality of research, productive invention and some day even creative genius.

But high success is not to be obtained without corresponding experimental exactitude, and this is needed today more than ever, and tomorrow yet more again. Hence the long battery of super-sensitive instruments and apparatus, designed here, which stand before you in their cases in our entrance hall.* They will tell you of the protracted struggle to get behind the deceptive seeming into the reality that remained unseen;—of the continuous toil and persistence and of ingenuity called forth for overcoming human limitations. In these directions through the ever-increasing ingenuity of device for advancing science I see at no distant future an advance of skill and of invention among our workers; and if this skill be assured, practical applications will not fail to follow in many fields of human activity.

The advance of science is the principal object of this Institute and also the diffusion of knowledge. We are here in the largest of all the many chambers of this House of Knowledge—its Lecture Room. In adding this feature, and on a scale hitherto unprecedented in a Research Institute, I have sought permanently to associate the advancement of knowledge with the widest possible civic and public diffusion of it; and this without any academic limitations, henceforth to all races and languages, to both men and women alike, and for all time coming.

The lectures given here will not be mere repetitions of second-hand knowledge. They will announce, to an audience of some fifteen hundred people, the new discoveries made here, which will be demonstrated for the first time before the public. We shall thus maintain continuously the highest aim of a great Seat of Learning by taking active part in the *advancement* and diffusion of knowledge. Through the regular publication of the Transactions of the Institute, these Indian contributions will reach the whole world. The discoveries made will thus become public property. No patents will ever be taken. The spirit of our national culture demands that we should for ever be free from the desecration of utilising knowledge for personal gain. Besides the regular staff there will be a selected number of scholars, who by their work have shown special aptitude, and who would devote their whole life to the pursuit of research. They will require personal training and their number must necessarily be limited.

But it is not the quantity but quality that is of essential importance.

It is my further wish, that as far as the limited accommodation would permit, the facilities of this Institute should be available to workers from all countries. In this I am attempting to carry out the traditions of my country, which so far back as twenty-five centuries ago, welcomed all scholars from different parts of the world, within the precincts of its ancient seats of learning, at Nalanda and at Taxilla.

With this widened outlook, we shall not only maintain the highest traditions of the past but also serve the world in nobler ways. We shall be at one with it in feeling the common surgings of life, the common love for the good, the true and the beautiful. In this Institute, this Study and Garden of Life, the claim of art has not been forgotten, for the artist has been working with us, from foundation to pinnacle, and from floor to ceiling of this very Hall. And beyond that arch, the Laboratory merges imperceptibly into the garden, which is the true laboratory for the study of Life. There the creepers, the plants and the trees are played upon by their natural environments,—sunlight and wind, and the chill at midnight under the vault of starry space. There are other surroundings also, where they will be subjected to chromatic action of different lights, to invisible rays, to electrified ground or thunder-charged atmosphere. Everywhere they will transcribe in their own script the history of their experience. From his lofty point of observation, sheltered by the trees, the student will watch this panorama of life. Isolated from all distractions, he will learn to attune himself with Nature; the obscuring veil will be lifted and he will gradually come to see how community throughout the great ocean of life outweighs apparent dissimilarity. Out of discord he will realise the great harmony.

These are the dreams that wove a network round my wakeful life for many years past. The outlook is endless, for the goal is at infinity. The realisation cannot be through one life or one fortune but through the co-operation of many lives and many fortunes. The possibility of a fuller expansion will depend on very large Endowments. But a beginning must be made, and this is the genesis of the foundation of this Institute. I came with nothing and shall return as I came; if something is accomplished in the interval, that would indeed be a privilege. What I have I will offer, and one who had shared with me the struggles and hardships that had to be faced, has wished to bequeath all that is hers for the same object. In all my struggling efforts I have not been altogether solitary; while the world doubted, there had been a few, now in the City of Silence, who never wavered in their trust.

Till a few weeks ago it seemed that I

shall have to look to the future for securing the necessary expansion of scope and for permanence of the Institute. But response is being awakened in answer to the need. The Government have most generously intimated their desire to sanction grants towards placing the Institute on a permanent basis, the extent of which will be proportionate to the public interest in this national undertaking. Out of many who would feel an interest in securing adequate Endowment, the very first donations have come from two of the merchant princes of Bombay, to whom I had been personally unknown.

A note that touched me deeply came from some girl-students of the Western Province, enclosing their little contribution "for the service of our common mother-land." It is only the instinctive mother-heart that can truly realise the bond that draws together the nurselings of the common home-land. There can be no real misgiving for the future when at the country's call man offers the strength of his life and woman her active devotion; she most of all, who has the greater insight and larger faith because of her life of austerity and self-abnegation.

Even a solitary wayfarer in the Himalayas has remembered to send me a message of cheer and good hope. What is it that has bridged over the distance and blotted out all differences? That I will come gradually to know; till then it will remain enshrined as a feeling. And I go forward to my appointed task undismayed by difficulties, companioned by the kind thoughts of my well-wishers, both far and near.

The excessive specialisation of modern science in the West has led to the danger of losing sight of the fundamental fact that there can be but one truth, one science which includes all the branches of knowledge. How chaotic appear the happenings in nature! Is Nature a Cosmos, in which the human mind is some day to realise the uniform march of sequence, order and law? India through her habit of mind is peculiarly fitted to realise the idea of unity, and to see in the phenomenal world an orderly universe. This trend of thought led me unconsciously to the dividing frontiers of different sciences and shaped the course of my work in its constant alternations between the theoretical and the practical, from the investigation of the inorganic world to that of organised life and its multifarious activities of growth, of movement, and even of sensation. On looking over a hundred and fifty different lines of investigations carried on during the last twenty-three years, I now discover in them a natural sequence. The study of Electric Waves led to the devising of methods for the production of the shortest electric waves known and these bridged over the gulf between visible and invisible light; from this followed accurate investigation on the

optical properties of invisible waves, the determination of the refractive powers of various opaque substances, the discovery of effect of air film on total reflection and the polarising properties of stained rocks and of electric tourmalines. The invention of a new type of self-recovering electric receiver made of galena was the fore-runner of application of crystal detectors for extending the range of wireless signals. In physical chemistry the detection of of molecular change in matter under electric stimulation, led to a new theory of photographic action. The fruitful theory of stereo-chemistry was strengthened by the production of two kinds of artificial molecules, which like two kinds of sugar, rotated the polarised electric wave either to the right or to the left. Again the 'fatigue' of my receivers led to the discovery of universal sensitiveness inherent in matter as shown by its electric response. It was next possible to study this response in its modification under changing environment, of which its exaltation under stimulants and its abolition under poisons are among the most astonishing outward manifestations. And as a single example of the many applications of this fruitful discovery, the characteristics of an artificial retina gave a clue to the unexpected discovery of "binocular alternation of vision" in man;—each eye thus supplements its fellow by turns, instead of acting as a continuously yoked pair, as hitherto believed.

In natural sequence to the investigation of the response in 'inorganic' matter, has followed a prolonged study of the activities of plant-life as compared with the corresponding functioning of animal life. But since plants for the most part seem motionless and passive, and are indeed limited in their range of movement, special apparatus of extreme delicacy had to be invented, which should magnify the tremor of excitation and also measure the perception period of a plant to a thousandth part of a second. Ultra-microscopic movements were measured and recorded; the length measured being often smaller than a fraction of a single wave-length of light. The secret of plant life was thus for the first time revealed by the autographs of the plant itself. This evidence of the plant's own script removed the longstanding error which divided the vegetable world into sensitive and insensitive. The remarkable performance of the Praying Palm Tree of Faridpore, which bows, as if to prostrate itself, every evening, is only one of the latest instances which show that the supposed insensibility of plants and still more of rigid trees is to be ascribed to wrong theory and defective observation. My investigations show that all plants, even the trees are fully alive to changes of environment; they respond visibly to all stimuli, even to the slight fluctuations of light caused by a drifting cloud. This series of

investigations has completely established the fundamental identity of life-reactions in plant and animal, as seen in a similar periodic insensibility in both, coresponding to what we call sleep; as seen in the death-spasm, which takes place in the plant as in the animal. This unity in organic life is also exhibited in that spontaneous pulsation which in the animal is heart-beat; it appears in the identical effects of stimulants, anaesthetics and of poisons in vegetable and animal tissues. This physiological identity in the effect of drugs is regarded by leading physicians as of great significance in the scientific advance of Medicine; since here we have a means of testing the effect of drugs under conditions far simpler than those presented by the patient, far subtler too, as well as more humane than those of experiments on animals.

Growth of plants and its variations under different treatment is instantly recorded by my Crescograph. Authorities expect this method of investigation will advance practical agriculture; since for the first time we are able to analyse and study separately the conditions which modify the rate of growth. Experiments which would have taken months and their results vitiated by unknown changes, can now be carried out in a few minutes.

Returning to pure science, no phenomena in plant life are so extremely varied or have yet been more incapable of generalisation than the 'tropic' movements, such as the twining of tendrils, the heliotropic movements of some towards and of others away from light, and the opposite geotropic movements of the root and shoot in the direction of gravitation or away from it. My latest investigations recently communicated to the Royal Society have established a single fundamental reaction which underlies all these effects so extremely diverse.

Finally, I may say a word of that other new and unexpected chapter which is opening out from my demonstration of nervous impulse in plants. The speed with which the nervous impulse courses through the plant has been determined; its nervous excitability has likewise been measured. The nervous impulse in plant and in man is found exalted or inhibited under identical conditions. We may even follow this parallelism in what may seem extreme cases. A plant carefully protected under glass from outside shocks, looks sleek and flourishing; but its higher nervous function is then found to be atrophied. But when a succession of blows is rained on this effete and bloated specimen, the shocks themselves create nervous channels and arouse anew the deteriorated nature. And is it not shocks of adversity, and not cotton-wool protection, that evolve true manhood?

A question long perplexing physiolo-

gists and psychologists alike is that concerned with the great mystery that underlies memory. But now through certain experiments I have carried out, it is possible to trace "memory impressions" backwards even in inorganic matter, such latent impressions being capable of subsequent revival. Again the tone of our sensation is determined by the intensity of nervous excitation that reaches the central perceiving organ. It would theoretically be possible to change the tone or quality of our sensation, if means could be discovered by which the nervous impulse would become modified during transit. Investigation on nervous impulse in plants has led to the discovery of a controlling method, which was found equally effective in regard to the nervous impulse in animal.

Thus the lines of physics, of physiology and of psychology converge and meet. And here will assemble those who would seek oneness amidst the manifold. Here it is that the genius of India should find its true blossoming.

The thrill in matter, the throb of life, the pulse of growth, the impulse coursing through the nerve and the resulting sensations, how diverse are these and yet how unified! How strange it is that the tremor of excitation in nervous matter should not merely be transmitted but transmuted and reflected like the image on a mirror, from a different plane of life, in sensation and in affection, in thought and in emotion. Of these which is more real, the material body or the image which is independent of it? Which of these is undecaying, and which of these is beyond the reach of death?

It was a woman in the Vedic times, who when asked to take her choice of the wealth that would be hers for the asking, inquired whether that would win for her deathlessness. What would she do with it, if it did not raise her above death? This has always been the cry of the soul of India, not for addition of material bondage, but to work out through struggle her self-chosen destiny and win immortality. Many a nation had risen in the past and won the empire of the world. A few buried fragments are all that remain memorials of the great dynasties that remain as memorials of the great dynasties that wielded the temporal power. There is, however, another element which finds its incarnation in matter, yet transcends its transmutation and apparent destruction: that is the burning flame born of thought which has been handed down through fleeting generations.

Not in matter, but in thought, not in possessions or even in attainments but in ideals, are to be found the seeds of immortality. Not through material acquisition but in generous diffusion of ideas and ideals can the true empire of humanity be established. Thus to Asoka to whom belonged this vast

empire, bounded by the inviolate seas, after he had tried to ransom the world by giving away to the utmost, there came a time when he had nothing more to give, except one half of an *Amlaki* fruit. This was his last possession and his anguished cry was that since he had nothing more to give, let the half of the *Amlaki* be accepted as his final gift.

Asoka's emblem of the *Amlaki* will be seen on the cornices of the Institute, and towering above all is the symbol of the thunderbolt. It was the Rishi Dadhichi, the pure and blameless, who offered his life that the divine weapon, the thunderbolt, might be fashioned out of his bones to smite evil and exalt righteousness. It is but half of the *Amlaki* that we can offer now. But the past shall be reborn in a yet nobler future. We stand here to-day and resume work tomorrow so that by the efforts of our lives and our unshaken faith in the future we may all help to build the greater India yet to be.

THE SANKHYA YOGA

THE PHILOSOPHY OF THE SANKHYA YOGA OR THE PATH OF SELF-KNOWLEDGE (Concluded).

(Do thou thy duty, undeterred at all
By what of good or ill there may befall).
Be not with joy elate, by woe depressed,
Nor let gain nor loss ever sway thy berast,
Hold triumph and reverse *even* in thy sight—
Then thou canst not *sin*, *Arjun!* hap what might.
This is the truth the *Sankhyans* hold most dear.
This grasped—for thee no *Karma* need have fear.
Whate'er its "fruits"—good, bad, indifferent—
These thou shalt e'er 'scape if thy mind be bent,
Thus unattached, on *Works*—lay *this* to heart.
Now, hear, O Arjun! of the *Yoga Art*—
No effort, here, here at least, is thrown away
Howe'er small, but bears fruit in its own way.
(But this of *Vedic rites* scarce can be said,
Where such by errors oft are futile made).

On ceremonial rites but fools insist
With heaven for goal, pelf and power at least.
They offer birth, as *Karma's* "fruit," again
And seek *Samâdhi*, but must seek in vain.
Can one attention fix. (the mind distraught),
As with poise of a flick'rless flame in fact ?
Above the trinal *Gunos*, Arjun ! rise—
The *Veds'* unending theme—and so despise
"The Pairs of Opposites" termed by the Wise,
As Love and Hate, and Joy and Pain likewise,
Endless alas ! the faiths of wavering minds
Not to the *Sankh* confined, bnt diverse kinds.
Misled by doctrines, and eloquent praise
Of *Vedic* gods for wealth and length of days,
Such folks, O Parth ! in bloody rites engage
With lustful hearts, which ah ! no bliss presage !
A pool amidst an ampler Ocean-flood—
Such to th' Enlightened *Vedic* rituals stood.
The bliss thus earned seems as dust in the scale
Weighed with the *Brahmic Bliss*, (so sages tell).
Works, do thou engage with steadfast mind,
But *never* with a view to "fruits" designed.
Weigh failure and success in equal scales,
For *evenness*, Parth ! *that* condition spells.
Yet better far seems *Budhi-Yog* than Work.
Once this state gained, well mightest thou all work shirk.
In *Budhi-Yôg*, *Dhananjoy* ! shelter take,
(Let fools engage in *Works* for profits' sake).
Whoso-e'er be with *Budhi-Yôg* endued
Is never by "fruits," good or ill, pursued.
Wherefore to *this Yôg*, Pârth ! apply thy mind—
For it is nought but skill in Works defined.
(When from one's eyes drop off *Avidya's* scales—
The mind refined by Works—the *Truth* prevails).
Well may such sage scoff at all "action-fruit"
And "action-bonds", (for these bind not his foot),
And thus freed from the Wheel of Death and birth,
At last attains the *Brahmic* State, O Parth !

Once thou hast skipped o'er *Maya's* tangled maze,
Nought taught, nought yet untaught can thee amaze.
Sore rent by doctrinal doubts thy mind may be !
Yet shalt thou gain *Yōg's* end with *Samadhi.*
"How can such steady-minded sage be known,
In contemplation wrapt, *Madhusudon ?*
Tell me, O *Keshav* ! all his marks aright—
How he sits, talks, walks, and appears to sight ?"
Of *Keshav* thus *Dhananjoy* asked again,
And thus he made his mystic teaching plain.
"The *steady minded sage* is he, indeed,
Who is from all desirs and passions freed,
Dhananjoy ! by content of self with Self,
Nor ever yet succumbs to earthly pelf.
Ne'er such an one, Parth ! is distressedly pain,
Nor ever yet for pleasures longs again.
Released at once from Love. Hate, and Fear,
He fixes on the Self a mind so clear,
Hap what may of ill, he gives them not the reins,
And, as a turtle draws his limbs within,
So from things of sense turns his senses in.
Things of sense oft by indulgence breed
Attachment whence Wrath, and to Wrath succeed
Delusions as to what is right and wrong,
And loss of Reason *thence,* however strong.
With *Reason* lost the man himself is lost—
Beware of *sense-indulgence* at all cost.
("Senses not reined in), *Judgment* goes as astray
Like strong-tossed ship driven far from out her way.
The senses hold well in cheek, yet the *taste.*
For sensual enjoyments is uneffaced—
That goes off instant when Self-knowledge dawns.
(And not till *then*)—*this* he may read who runs.
A *balanced* judgment *his* alone can be,
Who from *sense-objects* keeps his *senses free.*
Such, Stalwart-armed ! (said god-like *Krishna* then)
Snch are, indeed, called *steady-minded men.*
What's "Day" for others, *that* for *these* is "Night"

What's "Night" for *those*, for *these*, ay, broad "*Daylight.*
(What *those* deem *real* in their *walking* hours
To *these* seem *dreams* illusions, *Mayic* powers.
So whilst *those* sleep *Avidya's* sleep, know ye!
These keep awake to the reality).
Behold!—what streams unnumbered Ocean draws
Within its depths, nor yet its shores o'er-flows;
So he, who draws streams of desires within,
Nor lets them mar, for once, his peace serene.
Whoso casts off desires all through his life,
And goes, *attachment-freed*, through earthly strife,
Ever void of the sense of "I" and "Mine,"
Nor vain of lore, shall gain the Bliss divine.
Thus shalt thou, *Parth*! attain the final goal
—*Brahm-Nirvan*—at one with the Parent-Soul—
Nor shalt thou take a *new* frame on at Death,
But, once and for all, shalt resign thy breath.

N. MUKHERJEE M. A. B. L.
Bar-at Law.

A VINDICATION OF THE LIMERICK.

BY CAROLYN WELLS.

It has been said by ignorant and undiscerning would-be critics that the Limerick is not among the classic and best forms of poetry, and indeed, some have gone so far as to say that it is not poetry at all. A brief consideration of its claims to pre-eminence among recognised forms of verse will soon convince any intelligent reader of its superlative worth and beauty. As a proof of this let us consider the following Limerick which in the opinion of connoisseurs is the best one ever written:—

There was a young lady of Niger
Who smiled as she rode on a tiger,
They came back from that ride
With the lady inside
And the smile on the face of the Tiger.

Now let us compare this bit of *real* poesy with what might have been if Chaucer had written the lines.

A mayde ther ben in Niger born and bredde
Hire merye smile went neere aboute hire hedde,
Uponne a beeste she rood, a tyger gaye,
And sikerly she laughen on hire waye.
Anon, as it bifel, back from the ryde
Ther came, his sadel hangen doone besyde
The tyger. On his countenance the whyle
Ther ben beheldc a gladnesse and a smile."

Again if **Austin Dobson** had chosen to throw off the thing in triolet form—

She went for a ride
That young Lady of Niger;
Her smile was quite wide
As she went for a ride;
But she came back inside,
With the smile on the tiger,
She *went* for a ride
That young lady of Niger."

Rossetti with his inability to refrain from refrains would have turned out something like this:—

In Niger dwelt a lady fair
(Bacon and eggs and a bar o' soap!)
Who smiled 'neath tangles of her hair
As her steed began his steady lope.
(You like this style, I hope)
On and on they sped and on
(Bacon and eggs and a bar o' soap)
On and on and on and on;
(You see I've not much scope)
E'en ere they loped the second mile
The tiger 'gan his mouth to ope;
Anon he halted for a while;
Then went on with a pleasant smile
(Bacon and eggs and a bar o' soap!)

Omar would have looked at the situation philosophically and would have summed up his views in some such characteristic lines as these—

Why, if the Soul can fling the dust aside
And smiling, on a tiger blithely ride,
Were't not a shame—were't not a shame for him
In Stupid Niger tamely to abide?
Strange, is it not? that of the myriads who,
Before us, rode the Sandy deserts through,
Not one returns to tell us of the Road.
Which to discover we ride smiling, too.
We are no other than a moving row
Of magic Niger shapes that come and go
Round with the smile-illumined Tiger held
In midnight by the Master of the show."

Tennyson would have seen a dramatic opportunity and would have gloried in his chance thus:—

Half a league, half a league
On the big tiger,
Rode with a smiling face
The Lady of Niger,
Mad rushed the noble steed
Smiled she and took no heed

Smiled at the breakneck speed
Of the big tiger.
Boldly they plunged and swayed
Fearless and unafraid—
Tiger and lovely maid
Fair and beguiling
Flashed she her sunny smiles,
Flashed o'er the sunlit miles ;
Then they rode back, but not—
Not the same smiling !
When can their glory fade ?
O ! the wild charge they made
Riding from Niger !
Honour the ride they made !
Honour the smiles displayed !
Lady and Tiger !

Kipling of course would have seized the theme for a fine and stirring Barrack-Room Ballad.

"What is the Lady smiling for ?
Said Files on Parade—
"She's going for a tiger ride"
The colour sergeant said :
"What makes her smile so—so gay ?"
Said Files on Parade.
"She likes to go for Tiger rides"
The colour Sergeant said.
For she's riding on a tiger you can see his stately stride ;
When they're returning home again she'll take a place inside ;
And on the Tiger's face will be the smile so bland and wide,
But she's riding on a Tiger in the morning."

Browning would have been pleased with the subject and would have done the best he could with it along these lines :—

The Last Ride Together.
(The Tiger speaks)
"Since now at length your fate you know,
I said, then Dearest ; since t'is so
Since nothing all your smile avails,
Since all your life seems meant for fails,
Henceforth you ride inside."
Who knows what's best ? Oh who can tell ?
I loved the Lady—therefore—well
I shuddered, yet it had to be
And so together, I and she,
Ride, ride forever ride."

Swinburne would have spread himself thus ;

"O marvellous, mystical maiden
With the way of the wind on the wing ;
Low laughter thy lithe lips hath laden,
Thy smile is a song of the spring.
Oh typical tropical tiger,
With wicked and wheedlesome wiles,
Oh lovely lost lady of Niger,
Our Lady of Smiles—

Edgar Allen Poe would have put it this way—

"See the lady with a smile
Sunny smile
Hear her gaysome gleesome giggle as she rides around in style
How the merry laughter trips
From her red and rosy lips

As she smiles, smiles, smiles, smiles
smiles, smiles, smiles,
As she rides along the dusty desert
miles.
See the Tiger with a smile,
Happy smile;
If such a smile means happiness—
She's happy quite a pile;
How contentedly he chuckles as he
trots along the miles,
He doesn't growl or groan.
As he ambles on alone,
But he smiles, smiles, smiles, smiles,
smiles, smiles, smiles.
As he homeward goes along the desert
miles.

And Longfellow would have given it his beautiful Hiawatha setting:—

"Oh the fair and lovely lady;
Oh the sweet and winsome lady;
With a smile of gentle goodness
Like the lovely Laughing water
Oh the day the lovely lady
Went to ride upon a tiger,
Came the tiger back returning
Homeward through the dusky twilight.
Ever slower, slower, slower,
Walked the Tiger o'er the landscape.
Ever wider, wider, wider,
Spread the smile o'er all his features.

And so, after numerous examples and careful consideration of this matter we are led to the conclusion that for certain propositions, the Limerick is the best, and indeed the only proper vehicle of expression.

HISTORIC SCRAPS OF PAPER.

THE WAR'S STORY TOLD IN STAMPS.

BY DOUGLAS B. ARMSTRONG.

History is ofttimes recorded in unconsidered trifles—in letters, coins, pictures, relics, fashions, and household gods. The events of our own times are writ large upon the postage-stamps of nations.

As emblems of the State, stamps are particularly prone to reflect the trend of political developments. The imperishable story of the Great War is itself inscribed in no uncertain manner upon the postal issues of the belligerents. Within the pages of the stamp-collector's album are preserved souvenirs of almost every outstanding incident of the hostilities, forming a veritable cyclopædia of the war in the miniature. 'Despise not small things,' says the sage, and in after-years these paper mementoes of the tented field will possess, beyond doubt, a deep historical interest all its own.

The first dishonoured act of war, the violation of Belgian neutrality, is commemorated for all time in a set of the contemporary German postage-stamps, portraying the menacing mail-clad figure of 'Germania,' bearing in heavy black Gothic characters of sinister portent the legend 'Belgien,' and beneath it a new value in Flemish currency, denoting their use under the Imperial governor-generalship. They were introduced

very shortly after the occupation of Brussels, as if in malignant prophecy of the ultimate subjection of the whole of that hapless country, and many millions of specimens have been distributed in neutral and enemy countries as an earnest of frightfulness. It may be that some day they will constitute the last remaining relics of an infamous wrong.

The importation of these or other enemy issues of postage-stamps into Great Britain is prohibited under the Home Office regulations governing trading with the enemy, whilst similar restrictions have been imposed by the French and other allied Governments. Copies contained in letters from abroad and detected by the watchful eye of the Censor are now defaced with a heavy diagonal bar of ink, in which condition they were ultimately delivered to the addressee. In retaliation for the British boycott, the German Governor of Belgium has imposed a heavy fine, accompanied by other pains and penalties, upon Belgian stamp dealers and collectors having in their possession any war-stamps of the Allies.

A plain type-set label of unprepossessing appearance, value ten centimes, and issued under the ægis of the Valenciennes Chamber of Commerce, marks the penetration of the Hun forces into northern France in their ill-starred dash for Paris, following the retreat from Mons. Acting on instructions from head-quarters, the French Government officials had retired from the famous lace-making city; and when the German troops entered into possession on 29th August 1914, the postal service, in common with other State organisations, was conspicuous by its absence. As a temporary measure the local municipal body was authorised to establish provisional postal service along the line of tramway serving the neighbouring communes, and it was in connection with this service that this crudely printed local stamp was created. Its currency lasted for only eight weeks, when the service was taken over by the Imperial German Postal Administration, and controlled from Berlin.

Belgium's final sacrifice in the first phase of the Great War is recalled by some red cross postage-stamps, issued at the instigation of the courageous and charitable Queen Elizabeth during the perilous times of the siege of Antwerp. One of the designs commemorates a notable deed of heroism in the War of Independence of 1830—the death of Count Frederic de Merode in defending the flag—and is taken from the national memorial unveiled at Berchem in the same year. The other bears a familiar portrait vignette of King Albert himself, the Geneva Cross being in each instance incorporated in the design. Both series were printed lithographically in the city when the German heavy artillery was still pounding at the surrounding forts, and were sold for twice their nominal face-values, half of the proceeds going to the Belgian Red cross.

On the withdrawal of the Belgian Government to Ostend, and subsequently to France, two days after their debut the remainder of these stamps were destroyed, together with the stones from which they were printed, to prevent their falling into the enemy's hands.

Following the seizure of the former German colony of Samoa, the 'Pearl of the Pacific,' by an expedition from New Zealand on the same day that the Germans entered Valenciennes, the German colonial postage-stamps, bearing a representation of the Imperial yacht *Hohenzollern*, found in the island post-office, were temporarily withdrawn from circulation, only, however, to be reissued a few days later overprinted with the Royal cipher 'G.R.' and a new value in British currency.

The resources of the local printing establishment (office of the *Samoanische Zeitung*) being somewhat limited, not more than ten stamps could be over-printed at one time, and this, combined with the fact that the compositor was a Chinese-Samoan half-caste, whose know-ledge of English was of the slightest, led to the creation of some curious errors and varieties so dear to the heart of the philatelist. Several stamps re-ceived double impressions of the over-print, and not a few were surcharged upside-down; whilst the first batch of shilling stamps had the value quaintly rendered as '1 Shillings.' This error, by the way, is one of the great rarities amongst the stamps of the Great War. Sets of these occupation stamps were presented to the naval officers of the Australasian squadron and to various officials, and others were eagerly bought up as souvenirs by the rank and file of the expedition. Subsequently ordinary New Zealand postage-stamps, overprinted with the single word 'Samoa,' were brought into use under the British administration.

Nemesis in the shape of the armed forces of Great Britain, France, and Japan, operating in unison, was at the same time overtaking the German colo-nial possessions in other parts of the world. Togoland, the oldest German colony on the West Coast of Africa surrendered to a Franco-British expedi-tion, after some sharp fighting, on 26th August 1914, and has since been admi-nistered under the joint control of Great Britain and France. For the first few weeks of the allied occupa-tion no trace of ex-German colonial stamps could be found, so that those of the adjacent British colony of the Gold Coast had to be temporarily employed. Eventually, however, a regular *cache* of treasure trove, in the form not only of stamps, but of bullion to the value of thirty thousand pounds, was unearthed at Kamina, the site of the powerful wireless station linking the German colonies throughout the world with Berlin. Sealed in strong metal cases, they had been sunk in some disused wells, whence they were recovered by certain native sheikhs and handed over

to the British authorities. The stamps divided between the British and French administrations, were reissued provisionally with the imprint 'Togo Anglo-French Occupation' in English and French respectively. The work of overprinting the British series was carried out by the monks of the Catholic Mission at Lome, the capital of Togo; but the French were forced to send their supply down to Porto Novo, Dahomey, to be surcharged, since no printing press was available in the region under their control. For a brief period all stamps of whatever denomination were used to prepay the ordinary penny postage rate; but this soon proved impracticable, and they were afterwards sold for their equivalent face-values in English or French money.

Another small find of German Togo stamps made by the French at Sansanne Mangu, in the northern part of the colony, in January 1915 was similarly treated; but by May of that year all of the provisional stamps had been exhausted, largely due to the enormous demand for them by stamp-collectors in all parts of the world, and those of the Gold Coast bearing a like overprint have since been in circulation.

Quite Gilbertian in character was the manner of finding the first small supply of German New Guinea postage-stamps by the officials of the Australian Expeditionary Force charged with the occupation of Kaiser Wilhelm's Land and its island dependencies in the north west Pacific. The bulk of the stock had been destroyed by the German colonial authorities, but a number of complete sheets were at length brought to light hidden away amongst some shirts in the wardrobe of the ex-postmaster of the colony. With the aid of a small hand printing-press these were hurriedly converted into British stamps of the realm by the addition of the magic initials 'G. R. I.' and a new value in pence and shillings struck on them at the mission schoolroom at Rabual, which served as an emergeny printin-office. So great was the demand for these historical stamps by the troops and officials of the Commonwealth forces that it was found necessary to restrict the sale to ten shilling' worth to each applicant. Complimentary sets in honour of the event were forwarded for the acceptance of his Majesty the King, certain high officials of the Australian Government, and the principal museum in the Commonwealth. A further supply of ex-German colonial postage-stamps brought down from Nauru in the Marshall Islands, was overprinted and issued in a similar manner at Rabual in December 1914. The stamps in use in New Britain, as the newly acquired territory is designated, since the exhaustion of these provisional issues are those of the current Australian types surcharged 'N. W. Pacific Islands.' All of these occupation stamp issues contain errors and varieties, more or less pronounced, and are much sought after by

philatelists. Prices ranging from a few shillings to twenty or thirty pounds, according to their relative scarcity, are readily obtained in the stamp-market. It is, however, for their historical and philatelic interest that they are chiefly esteemed, quite apart from any question of intrinsic value.

The advent of the Indian Army Corps upon the battlefields of France and Flanders was denoted by a special series of postage-stamps supplied to the field post-offices attached to the various divisions for use upon the correspondence of our gallant native troops. The necessity for this procedure arose from the fact that these stamps were sold not only by the Indian military post-offices in Europe, but also by those serving with the expeditions in Egypt, East Africa, and the Persian Gulf. The local currency units differing in each instance in their relation to the rupee, the absence of any distinguishing mark might have led to the stamps being purchased in wholesale quantities where the exchange rate was lowest, and re-exported to India at a considerable profit. To avoid this contingency, therefore, the contemporary postal issues of British India, with portrait of the King-Emperor, as issued to the military postoffices in the field, were imprinted on the face, with the initials 'I. E. F., signifying 'Indian Expeditionary Force,' and in such form they afford a lasting memorial to the valiant part played by our Indian army in the great war of the nations.

As a prelude to Turkey's entry into the war on the side of the Central Powers, the Sublime Porte, at the dictation of the Wilhelmstrasse, declared the abolition of the foreign capitulations under which various rights and privileges had been enjoyed by European residents in the Ottoman Empire under the 'most favoured nation clause' of certain treaties. Prominent amongst these treaty concessions was the right of the European Concert to maintain their own post-offices in Constantinople and elsewhere in Turkey for the benefit of their countrymen sojourning in the Near East. Seizing the longhoped-for opportunity afforded by the European imbroglio, the Turkish Government was at last able to carry out its cherished object of of securing the suppression of the foreign postal agencies, an event which took place on 1st October 1914, and was duly celebrated by the application of a special overprint in native characters denoting 'Capitulations Abrogated 1333' upon the current stamps of the Ottoman post.

Following the actual declaration of war between Turkey and the Allies, supplies of the beautiful pictorial postage-stamp series of the previous year, the work of a London firm, who hold the plates, were cut off, so that by October 1915 the local stocks had all been used up. Recourse was had, therefore, to a large hoard of obsolete stamps of different kinds lying in the Treasury vaults, for which vain

endeavours had been made to find a purchaser, and these were pressed into the service and reissued imprinted on the face with the device of the Star and Crescent of Islam above the date of the Mohammedan year.

Japan's part in the world war is perpetuated by a military franchise stamp in the form of the regular three-sen inland postage-label of the Imperial Japanese Posts, overprinted with two syllabic characters signifying 'war service' two of which are supplied gratis every month to men of the Japanese army and navy on active service.

Philatelic souvenirs of the temporary Japanese occupation of the Marshall Islands also exist in specimens of the former German colonial postage-stamps of the group impressed in red ink with the name-seals of various Japanese officers. None of these, however, appear to have been employed postally, and their interest is that of curios pure and simple.

At a time when the German commerce raiders in the Atlantic were still at large a remarkable and unique precaution was adopted by the Government of British Honduras to safeguard a consignment of the colonial postage-stamps then on order from the printers in London. Under special instructions from the Crown Agents, this one printing was made upon special paper that had first been covered with a faint moire ground, so that the stamps included therein might be readily distinguished from any that had previously been issued, and in the event of their falling into the hands of the enemy, could at once be declared invalid in the colony. Fortunately the rounding up of the *Dresden* and *Karlsruhe* by the British navy rendered this procedure unnecessary, but the stamps remain as a mute tribute to the power and efficiency of 'Britain's sure shield.'

Two sets of stamps were issued during the course of 1915 from the tiny post office of St. Andresse, Havre, where the exiled Belgian Government has found sanctuary beneath the tricolour of La Belle France. The first, a Red Cross charity issue bearing the likeness of King Albert, was placed on sale at the New year; whilst the second, whose designs include vignettes of historic buildings and monuments in stricken Belgium, is a striking indictment of the vandalism which masquerades under the name of *Kultur*. The Cloth Hall of Ypres, devastated Dinant, and the once noble University of Louvain, all bear testimony to the wanton spirit of sacrilege that has reduced their architectural glories to a mass of smoking ruins.

Of a more inspiriting nature, however, is the scene presented on the five-francs value—King Albert presenting colours to his gallant troops at Furnes during the present war. It was originally proposed that these handsome stamps should be withheld from issue until the Belgian Post-Office was once more

established on its native soil; but they were eventually released to help to provide funds for the prosecution of the war of Belgian liberty, typified by the various designs.

German postage-stamps overprinted 'Russische Polen' in Gothic characters, as well as those of Bosnia and Herzegovina inscribed '*Feld Post*,' carry the mind back to the eventful spring of 1915, when, owing to the temporary failure of the munitions-supply, the Russian army was forced to fall back before the combined Austro-German advance, and Poland aud Galicia were overrun by the enemy's forces. Both the German and Austrian issues appeared in May 1915, and are of a purely military character, not being available for use on private correspondence.

An American war correspondent relates how, in the early days of the war the Galician conscripts serving with the Austrian army, when they were led to positions against the Russians, were encouraged by fictitious stories of the re-establishment of the Polish monarchy in support of which they were shown some bogus stamps adorned with the effigy of King Sobieski III.

One of the minor phases of the Great War, the subjugation of the erstwhile German African possession of the Cameroons, in which both British and French troops were engaged for many weary months, is commemorated in the stamp album by two series of stamps, overprinted in the one case 'C.E.F., signifying 'Comeroons Expeditionary Force,' on the former German colonial types, and 'Corps Expeditionnaire Franco-Anglais Cameroun' on those of Gaboon in the other. When the British troops first occupied Duala, the capital, no trace of any postage-stamps could be found, and for a time all letters emanating from this region bore the superscription, 'No stamps available.' At length, however, a large consignment of stamps addressed to the chief postmaster of the Cameroons on the eve of war was brought to light on board the West African liner *Professor Wærmann*, lying in the harbour of Freetown, Sierra Leone, where she had been brought as a prize by a British cruiser. They were duly converted into a provisional issue for use under the British administration of the Cameroons at the Government printing-office at Freetown, being finally issued at Duala sometime in July 1915. The French series was not issued until four or five months later, when the last of German garrisons in the locality had been reducad.

Austro-German intrigues in southern Persia led to the temporary occupation, with the consent of the Persian Government, of the important trading port of Bushire by Indian troops on 8th August 1916. During the occupation the postal service was maintained by Indian officials, the stock of Persian stamps found in the local post-office being

utilised with the addition of the words 'Bushire under British Occupation,' applied by means of an antiquated hand printing-press which was transferred from the British Residency to the post-office for the purpose. After a currency of only about six weeks these stamps ceased to be valid, when the administration of the town and district was once more restored to Persia. The British occupation stamps are in consequence of considerable scarcity, quite apart from their political interest.

The entry of Italy into the Great War on the side of the Allies was followed by the issue of some special Red Cross postage-stamps, after the French model, but of distinctive and appropriate design. A wreath of laurel encircles the banner of Italy as shown on the ten centesimi + five centesimi grayish blue, whilst the fifteen centesimi + five centesimi is emblazoned with the heraldic arms of Savoy, a Geneva Cross within a small circle being in each instance incorporated in the designs of the stamps, both of which are inscribed '*Croce Rossa.*' With the addition of the name of the issuing office in black overprint, these two charity stamps have also been circulated in the Italian colonies of Libya, Eritrea, Somaliland, the Italian islands in the Ægean Sea, and the postal agencies in Albania, and have already contributed a substantial amount to the funds of the Italian Red Cross.

As a contribution towards the additional revenue required to meet the expenses of military operations, the Italian inland postal rate was raised on 1st January 1916 from fifteen to twenty centesimi per half-ounce, when the current fifteen-centesimi postage-stamps were duly surcharged with the higher figure until such time as a permanent twenty-centesimi stamp could be prepared by the Government bank-note factory at Turin.

For some days after the German occupation of the ancient Polish capital on its evacuation by the Russian army in the autumn of 1915, the regular postal service was restricted to military requirements, and with the approval of the army authorities the local delivery of letters within the city precincts was undertaken by the Burgomasters' Committee of Warsaw. Special stamps were prepared in connection with this town post, crudely lithographed, and representing respectively an allegory of the Vistula (a dragon, with a woman's body, brandishing a sword) and the city arms of Warsaw—the Polish eagle with a crown suspended above its head. The suppression of the local service at the end of a week precluded the issue of stamps of a more ambitious nature depicting the celebrated Sobieski Monument and the Poniatowski Bridge after its destruction by the Russians.

Stamps of the German Empire, overprinted with the inscription, '*Postgebiet ob Ost*' (Postal District of the Eastern

Command), are employed by the military post-offices in the districts of Vilna, Kovno, Suwalki, and Kurland in Lithuania under the German occupation.

Grim relics of the tragedy of the great Serbian retreat across the snow-clad mountains of Albania exist in the form of an abortive series of national postage-stamps, which was on the point of being issued at the time of the Austro-German invasion. Just as the streets of Nish are said to have been decked with flags to welcome the allied relief force which never came, these stamps were destined to be issued in honour of the same unfulfilled event. A set of five values had been prepared typifying the part played by Serbia in the Great War through the medium of a picture reproduced from the Parisian journal *L'Illustration*, depicting the veteran King Peter I, surrounded by his staff, directing the operations of his indomitable army. Part of the stock would appear to have been conveyed to Prizend, and there placed on sale during the temporary establishment of the seat of Government in that town; but the bulk is believed to have fallen into the hands of the invaders. A few sets were preserved by survivors of the great retreat, and constitute souvenirs of undoubted historical interest.

The single word 'Serbien' superimposed on the contemporary postage-stamps of Germany and Austria (Bosnian military post-offices) denotes their use under the Hun administration of that ill-starred country.

Although the idea has frequently been broached, H. M. Postmaster-General has not so far deemed it expedient to create separate stamps for the purpose of collecting the enhanced rates of postage necessitated by the war; nor would there appear to be any immediate prospect of such an innovation in this country. War-tax stamps of a distinctive character have, however, to be affixed to letters posted in, Canada, New Zealand, Fiji, the British West Indies, &c., and Roumania, the last named bearing the imprint, '*Timbru de Ajutor*.' Apropos of the Roumanian war-tax stamps, introduced in anticipation of the early participation of that country in the world-wide hostilities, the following picturesque story is recounted. When the use of these war-tax stamps was first bruited, a competition for an appropriate design was held amongst the leading Roumanian artists and designers, and the first prize was awarded to M. Leca, an eminent sculptor. His design represented a Roumanian soldier saluting two women who stood in a valley surrounded by high hills, over which the sun was rising. On the eve of their issue, however, a formal protest against the use of this design was entered by the Austro-Hungarian Minister at Bucharest, on the ground that it contained a palpable allusion to the Austrian provinces of Transylvania and

Bukovina, as symbolised by the two women, the mountains being the Carpathians, and the rising sun intended to typify the coming of Roumania. To avoid diplomatic complications at that juncture, the stamps were accordingly suppressed, and those of the ordinary current postage type, overprinted as above described, substituted. It is rumoured, however, that specimens of the forbidden issue were printed and distributed *sub rosâ*, and that some were, in an unaccountable manner, found to be affixed to the private correspondence of the Emperor Francis Joseph himself.

To each and every one of the foregoing stamps, as well as to countless other varieties of which space precludes detailed mention, there is attached an historical or romantic interest, imparting to them a special significance as mementoes of the world's most terrible war. The end, alas! is not yet, and ere war's red tide has ceased to flow they will doubtless be supplemented by other and no less historic 'scraps of paper.'

CHAMBERS' JOURNAL.

GRIEF BY AN INDIAN RIVER.

The night was dark and wet when I awoke at half-past two in my cabin in the launch, anchored in the river not far from land. Some one was singing on the near bank a wild and dolorous Indian song, a woman's voice with something crazy in it. And the singing was fierce and quick and incoherent, and then slow and faltering and weaker, as though the heart were dying out of her grief. And once, when one of the men on the laun ch called out, she burst into mad staggering broken speech, with curious noises in the throat, so that I could hear her swallowing. I asked one of the crew who it was that was singing. He said it was a woman, mad with grief because her daughter was dead. And the frogs were croaking, and a jackal howled far inland, and all through the hours of darkness she sang, poor mad woman, pacing quickly up and down, up and down, on the desolate river bank. But there was no moon, and clouds were hiding the stars. But when the grey dawn broke, with rain, the river banks were lonely and still.

D. G. D

৭ম খণ্ড ঢাকা—পৌষ, ১৩২৪ ৯ম সংখ্যা

বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

মানুষের জন্ম কতদিন হইতে, কবে কোন্ অন্ধ তামস যুগে আদি মানব এই জগতের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাসের আলোচনা কৌতুহলোদ্দীপক হইলেও মানব-বিজ্ঞান বা ইতিহাস এ সম্বন্ধে ব্যর্থ অনুসন্ধান ব্যতীত কোনও প্রকৃত সত্যে পঁহুছিতে পারে নাই। আদি জীবন-গঙ্গার ধারার কোথায় উদ্ভব এবং কোথায় লয় তাহা মানব জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। তেমনি ভাষার জন্ম-কথাও ঐতিহাসিক জ্ঞান বিস্তার অতীত। কবে কোন্ যুগে কেমন করিয়া শিশুর অস্ফুটকাকলির মত প্রথমে উহার বিকাশ হয়, সে ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। অথচ এ বিষয়ে যুগযুগান্তর হইতেই বংশপরম্পরাক্রমে ঐতিহাসিক গবেষণাও তথ্যানুসন্ধান চলিয়া আসিতেছে।

বিধাতার সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। তাহাতে সর্ব্বদাই ঐক্যের সহিত বৈষম্য দৃষ্ট হয়। তিনি জগৎ গড়িয়াছেন, গ্রহনক্ষত্র গড়িয়াছেন, কিন্তু সকলই আবার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রত্যেকের মাঝখানেই রঙ্গিল যবনিকা লোভনীয় রূপে বিরাজমান থাকিয়া মানব চিত্তকে যে পরিমাণ প্রলুব্ধ করে, ঠিক্ সেই পরিমাণে নিরাশ করে। বিশ্বনিখিলের সহিত এই যোগের যেরূপ বিয়োগ দৃষ্ট হয়, আমাদের এই বসুন্ধরার অধিবাসী মানব-সন্তান আমরাও তেমনি এক হইয়াও বিভিন্ন, শুধু দেশের বৈচিত্র্যে বা দেহের বৈচিত্র্যে নয়, ভাব, ভাষা, আচার বিচার ব্যবহারে প্রত্যেক বিষয়েই এই পার্থক্যটুকু দেখিতে পাওয়া যায়। আদি যুগের অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা রাষ্ট্র বা সমাজকে কি ভাবে গঠন করিয়াছিল, কিংবা সেকালে ঐরূপ কিছু ছিল কিনা তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। বর্ত্তমান যুগের অতিবড় শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, ভূতত্ত্ববিদ্ এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু এবিষয়ের আলোচনা চলিতেছেও চলিবে, কারণ ইহার উপর জাতীয় গৌরবের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করিতেছে। যে জাতি তাহার ভাষাকে যত বেশী প্রাচীন বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিবেন তিনিই তাঁহার নিজ জাতিকে সুপ্রাচীন বলিয়া গৌরব করিবার অধিকারী হইবেন।

তাই ইংরেজ জগৎ যুড়িয়া ইংরেজী ভাষার গৌরব কীর্ত্তন করেন, করাসী, করাসীভাষার গৌরব করেন, চীন তাহার ভাষার গৌরব করেন; এমনি ভাবে একটা প্রীতির ওপাণ্ডিত্যের কলহ চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। আমরা বাঙ্গালী, আমরা বাঙ্গলাভাষার গৌরবাকাঙ্ক্ষী। তাই বাঙ্গালীর কবি গাহিয়াছেন,

' নানানদেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা পোরে কি আশা ?'

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনত্ব লইয়া এখন আর বড় একটা তর্ক নাই; বেদবল, রামায়ণবল, মহাভারতবল, পুরাণবল, সংহিতাবল, তন্ত্রবল সর্ব্বত্রই বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেযুগের বঙ্গের অধিবাসী যাহারা তাহাদের সহিত আমাদের কোন রক্তের সম্বন্ধ ছিল কিনা সন্দেহ, কালবশে মিশ্রণ ঘটিলেও আদি যুগে যে ঘটেনাই তাহা অতি নিশ্চিত কথা। বঙ্গদেশের প্রাচীনত্বের যে বয়সের কথা ইতিহাস বলিয়া দেয় বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধেত সে কথা ইতিহাস বিশদ ভাবে বলে না।

বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষার প্রথম সৃষ্টি কোন্ মহাপুরুষের ধ্যান সাধনায় অভিব্যক্তি লাভ করে, তাহার মীমাংসা কল্পনার সাহায্য ব্যতীত সম্ভবপর নহে। আমাদের দেশের একটী মেয়েলি শ্লোক আছে "একদেশের বুলি আর দেশের গালি," ভাষার সম্বন্ধে একথাটি বিশেষরূপে প্রযুজ্য। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সমুদয়ই নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ভাষাও পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইতে পারে নাই। প্রাচীনকালে যে সব মৌলিক ভাষা ছিল এখন সে সকলের মধ্যেও বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে আমাদের এসিয়া মহাদেশই ভাষার জন্মদাতা। ইরান প্রদেশের উদ্ভূত এক আদিম ভাষা হইতেই ইউরোপের গ্রীক্, লাটিন, জর্ম্মান, স্লাবোনীয়নস্ প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি। আবার আমাদের এসিয়া মহাপ্রদেশের দেবভাষা সংস্কৃত হইতে জেন্দ্ ভাষার উৎপত্তি। পারসীদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ এই জেন্দ ভাষারই লিখিত। এসকল কথার বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিতে হইলে বহু সময়ের প্রয়োজন।

এখানে ভাষার নানা পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিতেছি। বেদ ভারতবর্ষের আদিম গ্রন্থ। বেদের বয়স লইয়া তর্কযুদ্ধ বহু দিন হইতেই চলিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে উহা ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ রচিত হইয়াছিল। বেদের ভাষা সংস্কৃত; কিন্তু সে সংস্কৃত ও তাহার নিয়ম অন্য কোনরূপ সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের অনেক পরে বৈদিক সংস্কৃতের বহু পরিবর্ত্তন সহকারে মনু ও বাল্মীকির রামায়ণ বিরচিত হয়। রামায়ণের বহু পরবর্ত্তী যুগে মহাভারতের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভষার বহু পরিবর্ত্তন ঘটে, সেজন্যই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষার মধ্যে বহু অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের পর বহু শত বৎসর কেবলি পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে। রাষ্ট্র বিপ্লব ইত্যাদিও তাহার অন্যতম কারণ। এসময়ের পরিবর্ত্তী কালে ক্রমাগত নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কবিকুলরবি কালিদাসের উদ্ভব, তাঁহার অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষা বিশ্বজগতকে যে অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিল সে মধুর ধারা অদ্যাবধি সমভাবে দেশ দেশান্তরের পণ্ডিতমণ্ডলী ও কাব্য প্রিয় ব্যক্তির রসাল চিত্ত সুরসাল করিতেছে। কালিদাসের যুগে সংস্কৃত সাহিত্য অভিনব যৌবন-শ্রী ধারণ করিয়াছিল। এ সময়ের পরে তান্ত্রিক সংস্কৃত দেশে বিস্তার লাভ করে। ভাষার পরিবর্ত্তন, বর্ণবিন্যাস ও উচ্চারণের তারতম্যানুযায়ী ঘটে একথা বলা যাইতে পারে। ধীরে ধীরে বহু পরিবর্ত্তনের পর ভাষার অতি আশ্চর্য্য রূপ রূপান্তরিত হয়; সে বৌদ্ধ যুগে। সে সময়ে সংস্কৃত হইতে যে ভাষার সৃষ্টি ঘটে তাহার নাম 'গাথা'। এই "গাথা" ভাষা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজ সরল ও শ্রুতিমধুর করিবার নিমিত্ত "ব্যঞ্জন ও স্বরের পৃথক্ করিয়া এবং স্থানে স্থানে বিভক্তির লোপ বা উকার দ্বারা বিভক্তির কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া শ্রুতি মধুর করা হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিত গণের মতে এই 'গাথা' ভাষা প্রায় তিন শত বৎসর পরে রাজা অশোকের সময় 'পালি' নামে পরিচয় লাভ করে। এই পালি ভাষা দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্তি লাভ করে, অদ্যাপি সিংহলে এই পালি ভাষা প্রচলিত।

রাজা অশোকের গৌরব-দীপ্তি লুপ্ত হইবার পরে তাঁহার রাজত্বের প্রায় শত বর্ষ পরে সংস্কৃত ও পালি ভাষার অপভ্রংশ রূপে 'প্রাকৃত' ভাষার সৃষ্টি হয়। অতি পূর্ব্বে 'প্রাকৃত' ভাষা ছিল কিনা তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন যদি 'প্রাকৃত' ভাষা পূর্ব্বে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাণিনীর ন্যায় প্রাচীন বৈয়াকরণিকের ব্যাকরণে কিংবা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার নিদর্শন থাকিত, যখন সে নিদর্শন নাই, তখন সেকালে 'প্রাকৃত' ভাষা ছিল না ইহাই বুঝিতে হইবে। 'প্রাকৃত' যুগে অর্থাৎ সংস্কৃতের অপভ্রংশ কালে মূল সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, মাগধী, মহারাষ্ট্রীয়, শৌরসেনী, পিশাচী প্রভৃতি নানা ভাষার উদ্ভব ঘটে এবং নানা দেশ দেশান্তরে ঐ সকল ভাষা ছড়াইয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের নানা প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। কোন্ অপভ্রংশ ভাষা হইতে কিরূপ রূপান্তরিত ভাবে কোন্ ভাষার বর্ত্তমান পরিণতি, তাহা পণ্ডিতগণ এখনও মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তবে আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার বয়স যে হাজার বৎসরের উপর তাহা বঙ্গের বিশ্রুতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত পুরাতন হস্ত লিখিত পুঁথি মুদ্রিত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

সাহিত্য ইতিহাসের প্রাণ। বাঙ্গলাদেশকে ও বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইবে। ইতিহাস মানবজাতির ক্রমোন্নতির কাহিনীর পরিচায়ক। সে কাহিনী সে সাহিত্যই যদি আমরা না জানিলাম তাহা হইলে কি লইয়া গৌরব করিব? বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম খাঁটি পরিচয় আমরা পাই বৌদ্ধযুগে। এই যুগে আমাদের বাঙ্গলাসাহিত্যের রীতিমত একটা প্রভাব ব্যাপ্তি লাভ করে। সে যুগে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলা বস্তু, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বিক্রমপুর, কাশি, অযোধ্যা, নালন্দা পাটলীপুত্র প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র, শিল্প কেন্দ্র ও যেমন বিদ্যমান ছিল, তেমনি নানা দেশের নানা ভাষার উজ্জল স্রোতও খরভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। বহু স্থবির বহু গ্রন্থ রচনা করেন, যদি কোন দিন আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া বৌদ্ধযুগের জ্ঞান চর্চ্চার আলোচনা হয় তাহা হইলে উহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইবে। এখন বৌদ্ধযুগের আলোচনা ইংলণ্ড ও জর্ম্মান দেশের পণ্ডিতেরা যেরূপ করিতেছেন, এদেশে দুই একজন পণ্ডিত ছাড়া তেমন কেহ করেন নাই। বৌদ্ধযুগে আমরা যে বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিচয় পাই তাহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচায়ক, সেই গৌরব রত্ন গণের মধ্যে দুইজন আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ খাঁটী শ্রীবিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। আমি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানওশিলভদ্রের কথা বলিতেছি। এই দীপঙ্করকে প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি বিক্রমপুর বজ্রযোগিনীর অধিবাসী রূপে 'আরতি' পত্রে প্রবন্ধ লিখি এবং মৎ প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' ও প্রকাশ করি তখন ঢাকা হইতে প্রকাশিত কোন সাপ্তাহিক পত্র বিদ্রূপের তীব্র ভাষায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ তিব্বত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে যখন সেখান হইতে নানা পুঁথির সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের আত্মজীবনী ও পাওয়া যায় এবং আমার প্রদত্ত পরিচয় ও তাহাতে উল্লিখিত থাকে তখন আমার অপরাধ দূর হয়। দীপঙ্করের বাড়ীই যে কেবল সেখানে ছিল তাহা নহে, সেকালে বিক্রমপুরে একটী বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, দুইজন তিব্বতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে তাহাদের দেশে লইয়া যাইবার জন্য একবৎসর কাল আসিয়া বজ্রযোগিনী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবিষয়ে আমাকে যে পত্র লিখেন তাহা আমি প্রথম বৎসরের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছি। তিব্বত রাজ ইঁহাকে ১০৩৮ সালে তিব্বত লইয়া যান। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে তিনি নিজকে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'একবার সাধন', 'বজ্রবিধি' 'বজ্রাসন বজ্রগীতি, চর্য্যাগীতি, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানধর্ম্ম গীতিকা ইত্যাদি তাঁহারি বিরচিত। পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে "তাঁহার অনেকগুলি সংকীর্ত্তনের

পদাবলী ছিল।" * বাঙ্গালী মাত্রেই বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গবাসী মাত্রেই গৌরব করিতে পারেন যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিম সৃষ্টিকর্ত্তাদের মধ্যে তাহাদের দেশের একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই প্রাচীন তথ্য প্রদানের জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ঋণী থাকিবেন। তাঁহার এই আবিষ্কারে অন্ততঃ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা পাই। শাস্ত্রী মহাশয় আর্য্যদেব, কম্বলাম্বর, কাহ্ন, কুকুরী ইত্যাদি বিবিধ নামধেয় প্রায় একুশ জন পদকর্ত্তার পরিচয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে প্রদান করিয়াছেন। সেকালের বাঙ্গলা কেমন ছিল তাহা আপনাদের শুনাইবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে একটী পদাবলী উদ্ধৃত করিলাম।

'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ॥
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়।
বলদ বি আএল গবিয়া বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥' ইত্যাদি।

এইযে ইতিহাস এ মুসলমানগণের বাঙ্গলা দেশে আসিবার বহু পূর্ব্বের বাঙ্গালার ইতিহাস। বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কালে কিংবা বাঙ্গালা সাহিত্যের এই আদিযুগে যে দিক্ দিয়া যে ভাবেই দেখিতে যাই না কেন দেখিতে পাই যে আমাদের সাহিত্যের মূল কেন্দ্র ধর্ম্ম। এক এক দেশের এক একটী বিশেষ উৎস থাকে। যে উৎসমুখ হইতে সলিলরাশি চারিদিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের বঙ্গপ্রদেশের মূল উৎস ধর্ম্ম। বিবিধ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্গসাহিত্য নানা ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। কাজেই ভারতীয় সাহিত্যের আদিম ইতিহাস ধর্ম্মের ইতিহাস। এ নিমিত্তই বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা, হিন্দু শাসন কালে সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি বিবিধ ধর্ম্মের কাহিনী গাথায়, কাহিনীতে, ছড়া ও দোঁহায় সুপরিস্ফুট। বৌদ্ধযুগে আমাদের দেশে বিবিধ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যেও সাহিত্যের ধারা একই ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। বৌদ্ধযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয় খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বিএ মহাশয় ডাকের বচনের ডাক, খনা, মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতি, ময়নামতীর গান, ৮ম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ও গীত হইয়াছিল বলিয়া তদীয় 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে আদি বাঙ্গালার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শন করিয়াছি, এক্ষণে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা রচনার আদর্শও উদ্ধৃত করিতেছি। ডাকের বচনে আছে,

'মিঠরান্ধে সরষা কাটে।
সে গৃহিনীতে ঘর না টুটে॥
যে কিছু মধুর বলে।
স্বামীর বোল শিরে ধরে॥
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠ বোলে স্বামীতে ভকতি॥
সর্ব্বকাল স্বামীকে পূজে।
তাহাকে ধর্ম্ম আপনি বুঝে॥'

ডাকের জন্ম অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ। ডাকের পর খনার কথা বলিতেছি। খনার কাহিনী বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে প্রবাদের মত রাষ্ট্র। অন্ততঃ আমাদের বঙ্গদেশের পল্লী-রমণীগণের মধ্যে এমন রমণী অতি বিরল যিনি দুই একটি খনার বচন বলিতে না পারেন। খনার জীবনের বিচিত্র উপন্যাস বঙ্গনারী অশ্রুভরা নয়নে বর্ণনা করিয়া থাকেন। খনার বচন জ্যোতিষের বচনের ন্যায় ভবিষ্য-দ্রষ্টার ন্যায় সমাদৃত। যেমন:—

যদি বর্ষে আগনে।
রাজা যান মাগনে॥

* সম্বোধন—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ প্রণীত। 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' সন ১৩২২। সংখ্যা।

যদি বরে পৌষে।
কাড়ি হয় তুষে ॥
যদি বরে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজার পুণ্যদেশ ॥

অতঃপর ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর রমাই পণ্ডিত, ও ১১শ শতাব্দীর ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী যুগের মাণিকচন্দ্র, গোপীচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র প্রভৃতির গান উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে আপনাদের কৌতূহল নিবারণার্থ কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম। গোপীচন্দ্রের গীতি সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে "মহারাষ্ট্র দেশে বঙ্গীয় গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস লইয়া এখনও কাব্য নাটক রচিত হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা গোপীচাঁদের একখানি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রায় সহস্র বৎসর পরে এখনও পালবংশীয় রাজার সন্ন্যাস সমস্ত ভারতবর্ষের হৃদয় আঘাত করিতেছে। * * পাল রাজগণের অধিকার এক সময়ে প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ব্যাপক ছিল এবং দাক্ষিণাত্যেও তাঁহাদের স্তাবকবৃন্দের অভাব ছিল না, এই কারণে তাঁহাদের গুণ গাঁথা ছড়াইয়া পড়িল।" হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় ও অনেক কবি এশোক-কাহিনী অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

আগ দুয়ারে সদাগর পসার খেলায়।
খেরকির দুয়ার দিয়া প্রণাম যোগায় ॥
কেনে কেনে জ্ঞাত্তা সকল আইলা কি কারণ।
সাতদিন নওগাইত ময়না অনলের ভিতর ॥
তবু পোড়া মাঝি যায় ময়না সুন্দর।
ঐ ময়না পাইয়াছে গোরকনাথের বর ॥

ইত্যাদি।

বৌদ্ধযুগের ক্রমিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিকাশ হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি বঙ্গদেশে হয় নাই, উহা দাক্ষিণাত্য হইতে রামানুজ, মাধবেন্দ্রপুরী ইত্যাদি মহাপুরুষগণের সাহায্যে বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। এবং বাঙ্গালী এই নব প্রেমের ধর্ম্মকে সাদরে বরণ করিয়া নেন। এই বৈষ্ণব-সাহিত্য বাঙ্গালীকে এক অপূর্ব্ব সাহিত্যসম্পদ দান করিয়াছে, যে সাহিত্য সম্পদ সমগ্র জগতের নিকট আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিতেছে। বৌদ্ধ যুগের প্রাধান্য বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ সাহিত্যের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিতে পাই। বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর একরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস। এইযুগের প্রথম বা আদি কবিরূপে আমরা জয়দেব গোস্বামীকে দেখিতে পাই। সে যুগে পণ্ডিত বলিয়া যাহারা পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেন তাঁহারা সকলেই সংস্কৃতে লেখাপড়া করিতেন। কাজেই জয়দেবের গীত-গোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। জয়দেবই সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যবধানের মাঝখানে সেতু রচনা করিয়া তদীয় কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত গীতগোবিন্দের ন্যায় সরস সুন্দর রচনা জগতের সাহিত্যেই অতি অল্প মিলে।

সাহিত্য জাতিয়তার পরিচায়ক। সাহিত্য হইতেই যুগের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, কোন্ যুগের নরনারীর মধ্যে কি বিশিষ্টতা ছিল তাহা সেই সেই যুগের সাহিত্য হইতে বুঝিতে পারাযায়। জয়দেবের রচনা হইতে বাঙ্গালার যে রমণী-সুলভ কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ফল। জয়দেবের শব্দ চয়ন ও শব্দ যোজনার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁহার সংস্কৃত কবিতা, সংস্কৃত না জানিয়াও বুঝিতে পারা যায়।

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল মলয় সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে ॥

বা "চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী ইত্যাদি তদ্‌রচিত গ্রন্থের যে কোন অংশ পাঠ করিলেই তাঁহাকে বাঙ্গালার কবি বলিতে বোধ হয় কেহই কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন 'জয়দেব বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি' ছিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' প্রচার শুধু বাঙ্গলা দেশে নহে সমগ্র ভারতেই তাহার প্রচার। দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দিরে তাঁহার দশাবতারস্তোত্র প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র নর নারীর কণ্ঠে

গীত হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দের কোমল মধুর শ্রুতি সুখকর যে সুখলিপ্সার ও প্রেম প্রীতির ধারা গোমুখীর স্রোতের ন্যায় নামিয়া আসিয়াছে তাহা শুধু দু'দশ বৎসরে বা দু'দশ যুগে শেষ হয় নাই—শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্য্যন্ত কুলপ্লাবিনী পদ্মার ন্যায় তোড় ভাঙ্গিয়া পূর্ণ বেগে বহিয়া চলিয়াছে। এখনও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তাঁহার অসীম প্রভাব।

জয়দেবের পরবর্ত্তী কালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অভ্যুদয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক ব্যক্তি। একজন মৈথিলি একজন খাঁটি বাঙ্গালী। তথাপি দুইজনেই বাঙ্গালী কবি। জয়দেবের প্রভাব তাঁহাদের উপরও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিগণের আত্মনিবেদনের ভাব এ দুই কবির কবিতায় সুস্পষ্ট পরিস্ফুট। বিদ্যাপতি প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। বিদ্যাপতির রচনাও সুখপাঠ্য, শব্দ সম্পদ যুক্ত কিন্তু লালসার ভাব তাহাতে জয়দেব অপেক্ষা কম ফুটিয়া উঠে নাই। বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্যের কবি, সৌন্দর্য্যের উপাসক কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার রচনায় ভাব মাধুর্য্য নাই একথা বলা চলে না। আমরা এখানে তাঁহার দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

'সুজনকো প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল॥
টুটাইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্‌ভুত।
বৈছন বাঢ়তো মৃণালকো সুত॥
সুবহু মতজ যে মতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণি॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত॥

বিদ্যাপতি কি কেবল লালসার কবি? তাহাত নহেন। বিশ্বসৌন্দর্য্য সাগরের মাঝখানে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া যে আনন্দের অতৃপ্তি বোধ তাহা তাঁহার একটী কবিতায় যেরূপ পাই তাহা অতুলনীয়। উক্ত বৈষ্ণব কবি সৌন্দর্য্যে উন্মাদ হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গাহিয়াছেন,—

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশন গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

বিদ্যাপতির 'পদাবলী' সর্ব্বাগ্রে স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক ১৮৭২ খ্রীঃ অঃ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়, তৎপর যথাক্রমে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন, স্বর্গীয় সারদা চরণ মিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতির রচনায় বহু মৈথিলি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরস্পরের মিলন কাহিনী "পদকল্প তরু" ষড়্‌বিংশ পল্লবে লিখিত আছে।

'চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডিদাস গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল, বিদ্যাপতি চলি গেল।
চণ্ডিদাস তব রহই না পারই, চললহি দরশন লাগি॥
পন্থহি দুহুজন, দুঁহু গুণ গায়ত, দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জাগি॥
দৈবহি দুঁহু দোহা দরশন পাওল, লখইনা পারই কোই।
দুঁহু দোঁহা নাম শ্রবণে তাঁহ জানল, রূপ নারায়ণ গোই॥

ইহা হইতে অনুমিত হয় যে উভয়ে একই যুগে এক সময়ের কবি। তথাপি আলোচনা কালে বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী রূপেই প্রায় সকলে চণ্ডীদাসের আলোচনা করিয়া থাকেন। বঙ্গের একজন খ্যাতনামা লেখক বৈষ্ণব কবিগণের কবিতালোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "দুর্ব্বল, স্থবির, কর্ম্মহীন জাতি যেমন কামকলাবিতানে সুখবোধ করে, তেমনই সে জাতির কবিও সে সুখ লিপ্সার মুখে অপূর্ব্ব কামকাব্যের ইন্ধন যোগাইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেব হইতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস পর্য্যন্ত সকলেই একই সুরে একই ভাবের গান গাহিয়াছেন।*' আমরা ইহার প্রতিবাদ

* সাহিত্য—জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।

করি, অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের পক্ষে ইহা আংশিক রূপে প্রযুজ্য হইলেও চণ্ডীদাসের পক্ষে ইহা খাটে না।

চণ্ডীদাসের কবিতা প্রেমের আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। 'কামগন্ধ নাহি তায়।' তাহা সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদী—সর্ব্ব কামনা বিলুপ্তকারী গগন বিহারী বিহঙ্গের মত প্রাণকে সান্ত ও অনন্তের অসীম কল্পলোকের পথ দেখাইয়া দেয়। চণ্ডীদাসের কবিতার তান বাঙ্গালীর চিত্ত নন্দনে যে ভাব প্রসুন বিকশিত করিয়াছিল আজ তাহার সৌরভ জগৎ সুরভিত করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ধারার মূল সূত্র কোথায় তাহা চণ্ডীদাসের কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবি সব ভুলিয়া সব বন্ধন ছাড়িয়া দাম্পত্য প্রেমের মধুর রসে রমণীর আত্ম নিবেদন বার্ত্তা ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া ও শ্রীভগবানের প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি নরনারীর কাম বন্ধন হীন অনুরাগের মাঝ খানেই আরাধ্যকে খুঁজিতে চাহেন। তাঁহারা সীমার মধ্যেই অসীমকে চাহিয়াছেন, সান্তের মধ্যেই অনন্তকে ধরিয়াছেন। তাঁহাদের সকল কবিতা তাঁহারি পানে ধাবিত হইয়াছে। তাই ভাব-বিহ্বল চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন ;—

'পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন তায়॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ-পুণ্য মম তোমার চরণ খানি॥

কিংবা—

''বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

আবার কোথাও চণ্ডীদাসের রাধিকা বলিতেছেন ;—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি　　তোঁহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ　　তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী　　হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন।
কলঙ্কী বলিয়া　　ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ,
তোমার লাগিয়া　　কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।

এ সকল কবিতার মধ্যে আত্মনিবেদনের ভাব ঢল ঢল শতদলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে খানে ভালবাসিতে হইবে, সে খানে রাখিয়া ঢাকিয়া আধখানা প্রাণ দিয়া ভালবাসিলে চলিবে কেন? চণ্ডীদাস ইন্দ্রিয় লালসার ধার ধারেন না, তিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রেম-ভালবাসার শ্রেষ্ঠ কোহিনুর বুকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই 'সব সমর্পিতে' পারিয়াছিলেন। কবি বক্তা, কবি চিত্রকর, কবি সৌন্দর্য্যের প্রতিনিধি। প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কণা কবির জন্যই সৃষ্ট, কবি চিরদিন পিপাসিত মানবকে নূতন কথা শুনাইয়া আসিয়াছেন তাঁহারি প্রদত্ত ভাব-ধন-সম্পদে বিশ্ব মানব ধনবান, তাঁহারি ভাব প্রেরণায় বিশ্ব মানব উদ্বোধিত। যাহারা কবি তাহারা বিশেষ দেশ বা জাতির কবি নহেন তাঁহারা বিশ্ব জগতের সকলেরি আপনার জন। চণ্ডীদাস সেই বিশ্ব জগতের কবি, বিশ্ব সাহিত্যের কবি। তিনি সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার পরে বিশ্বজগতের।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কালে ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন পদকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সকলের পরিচয় প্রদান কিংবা কাব্যালোচনা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অপূর্ব্ব সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যে দুই এক জন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রভাবের মধ্যে নিজ নিজ কবিত্ব প্রতিভা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে গোবিন্দদাস বা গোবিন্দ কবিরাজ একজন। গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বহু পরবর্ত্তী। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ও সুমধুর চরিত্রানুসরণে যে কবিত্ব প্রভাব বঙ্গদেশে বিস্তার

লাভ করে গোবিন্দদাসের কবিতায় তাহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয়। গোবিন্দের—

'ভজহুঁরে মন নন্দ নন্দন
অভয়াচরণারবিন্দরে,
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব-সিন্ধুরে।"

"চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা পায়॥

কীর্ত্তনিয়াগণ অদ্যাপি এসব গান সর্ব্বত্র গাহিয়া বেড়ায়। গোবিন্দদাসের সমকালীন কবিগণ মধ্যে জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, ঘনশ্যামদাস, প্রভৃতি বহু কবির সুমধুর গীতি বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়। গোবিন্দদাসের কবিতায় চণ্ডীদাসের প্রভাব বিদ্যমান। এখানে তাহার একটু দৃষ্টান্ত দিই। চণ্ডীদাসের—

"ধীর বিজুরী বরণ গোরী
পেখনুঁ ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥

এই পদের অনুকরণেই গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন ;—

'চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ায় ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়নে চায়॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাঁশী
মধুর মধুর গায়॥

গোবিন্দদাসের সমকালবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে জ্ঞানদাসের নাম বিশেষরূপ স্মরণীয়। তাহার—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পীরিতি লাগি মন নাহি বান্ধে॥

এই পদাবলীটিও

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করম লিখি।
শীতল বলিয়া চাঁদে সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদে সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি মরণ অধিক ভেল॥

ইত্যাদি পদাবলী চিরনবীন। ইহাদের পরবর্ত্তীকালে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্য হইতেই বহু পদ, রচয়িতা জন্মগ্রহণ করেন। বিষয় সেই পূর্ব্বরাগ, মান বিরহ, মিলন, কেহই তেমন নূতনত্ব বা বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যে একটা ভাবের বন্যা আসিয়াছিল, সে ভাব বন্যার শুধু নদীয়া নহে, সমগ্র বঙ্গই প্রেমরসে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য এক অভিনব গৌরব সমৃদ্ধিলাভ করে। উহা চরিতাখ্যান। পূর্ব্বে যেমন কবিগণ কেবলি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন, এযুগে তেমনি চৈতন্য মহাপ্রভুর "অলৌকিক ও সুমধুর চরিত্রের রসাস্বাদন করিয়া বাঙ্গালী জীবন-চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রথম উপলব্ধি করে—ইহার ফলেই 'চৈতন্যচরিতামৃত,' 'চৈতন্যভাগবত,' 'চৈতন্য মঙ্গল' জীব গোস্বামীর কড়চাই, গোবিন্দদাসের কড়চাই, ভক্তমাল প্রভৃতি বহু জীবন-চরিত্র গ্রন্থের সৃষ্টি। আমাদের মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে যে জীবনচরিত রচনায় আরম্ভ হয় ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা যেমন নব পথে পরিচালিত হইয়া এক অভিনব পন্থা প্রদর্শণ করে, তেমনি সে যুগের ইতিহাস জানিবার জন্যও আমাদিগকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। ঐ সকল চরিতাখ্যান পাঠে আমরা সে যুগের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ সব বিষয়েই পরিস্ফুট জ্ঞানলাভ করিতে পারি। কিন্তু এসকল গ্রন্থের একটা ত্রুটি এই যে উহাতে পূর্ব্বের ইতিহাস বড় একটা নাই, যাহা আছে তাহা চৈতন্য প্রভুর ও তাঁহার

পারিষদদলের। কাজেই বিদ্যাপতি, প্রভৃতি কবিগণের সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে তাঁহাদের কাব্যালোচনা ব্যতীত অন্য কিছু উপায় নাই। দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় সমৃদ্ধ সাহিত্য লইয়া সেরূপ আলোচনা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এ বিষয় অসাধারণ ক্লেশ স্বীকার ও গবেষণা করিয়াছেন, তৎপর 'পদকল্পতরুর' শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংগ্রাহক নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর সংগ্রহ কর্ত্তা মৌলবি আবদুল করিমের নাম চিরস্মরণীয়। এ বিভাগে আমাদের অনেক কাজ করিবার আছে বলিয়াই এই ইঙ্গিতটুকু করিলাম।

'চৈতন্য চরিতামৃতের পর কৃত্তিবাসের রামায়ণই বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অভিনব শক্তির সৃষ্টি করে। কৃত্তিবাস এই রামায়ণের রচয়িতা। বাঙ্গলার এমন পল্লী নাই, এমন লোক নাই যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ না পড়িয়াছে বা কৃত্তিবাসের কথা না জানে। ফুলিয়ার কৃত্তিবাস যে 'সুধাভাণ্ড' গীত গাহিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর বড় আদরের জিনিষ। কৃত্তিবাসের জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কৃত্তিবাসের কথা বা রচনাশক্তির পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ১৮০২ খ্রীঃ অঃ শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রিত হয়। ৺জয়গোপাল তর্কলঙ্কার পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহার বহু সংশোধন করেন। কৃত্তিবাসের রচনা সরল ও প্রাঞ্জল। অল্পশিক্ষিত নর নারীও সহজে পাঠ করিতে পরেন। কৃত্তিবাসের নিজ রচনার উপর বিশেষ আপনার বিদ্যাবত্তার ও পাণ্ডিত্যের একটু গৌরব ছিল। রামায়ণে তাই দেখিতে পাই,—

"কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।"

প্রাচীন সাহিত্যের যুগে একটা অনুকরণের ভাব দেখা যায়। কেহ একটী বিষয়ে রচনা করিয়া শ্রদ্ধা বা কৃতিত্ব লাভ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বহু অনুকরণকারীর উদ্ভব হয়। কৃত্তিবাসের অভ্যুদয়ের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গে রামায়ণ রচয়িতার আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে সকলেই যে অনুকরণকারী ছিলেন তাহা নহে, কেহ কেহ প্রতিভার পরিচয়ও দিয়া গিয়াছেন। দীনেশ বাবু তদীয় "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" গ্রন্থে সে সকল রামায়ণ রচয়িতাগণের নাম ও আনুমানিক সময় উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম রামায়ণ রচয়িতা শিবচন্দ্র সেনের নামোল্লেখ নাই। শিবচন্দ্র সেন "সারদা মঙ্গল" নাম দিয়া সমগ্র রামায়ণ বিবিধ ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। ঢাকা সাহিত্য-সমাজ হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের পর কবিকঙ্কণের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিকঙ্কণ তাঁহার উপাধি—নাম মুকুন্দরাম। কবিকঙ্কণের কাব্যে ইতিহাসের বহু উপাদান বিদ্যমান আছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইহা হইতে জানিতে পারা যায়। অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। আকবরের রাজত্বকালে মুকুন্দরামের জন্ম। ১৪৬৬ শকে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্য সমাপন করেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে তৎকালীন রাজকর্ম্মচারীগণের অত্যাচার জানিতে পারা যায়। মহাম্মদ সরিপ নামক কোন ডিহিদারের উৎপীড়নে তাঁহার নিজ বাসগ্রাম কোয়ারী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। তাহাতে তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ,
গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে
ডিহীদার মামুদ সরিপ।

চণ্ডীকাব্যে কালীঘাট, কলিকাতা, সপ্তগ্রাম নৈহাটি, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ আছে। তারপর ধনপতি যখন সিংহলে যাইতেছেন তখন বলিতেছেন—

"ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে॥

ইহা হইতে সে কালের পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচার কাহিনী জানিতে পারা যায়। নৌ-যুদ্ধে এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের বীরেন্দ্র বীর কেদাররায় যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার যুদ্ধে, পূর্ব্ববঙ্গের নাবিক-

গণের তরণী পরিচালনার নৈপুণ্য ও শৌর্য্য বীর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব—সে পরিচয় পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণ যেরূপ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তদ্রূপ তাহারা যে বঙ্গের সর্ব্বত্র নৌ-পরিচালনায়ও নিযুক্ত হইত ইহাতে বাঙ্গালের প্রতি বিদ্রূপ থাকিলেও বাঙ্গালের গৌরবের কারণ। কারণ 'ডিঙ্গা' দৈবপ্রকোপে ডুবিয়াছিল, বাঙ্গালের কাপুরুষত্বে বা নৈপুণ্যের অভাবে নহে। দেবীর কোপে ঘুরণিয়া ঝড়ে নৌকা ডুবিলে নাবিকগণের রোদন এইরূপ—

"কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাকোই বাকোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাত।
বলদী গুঁড়া হারাইল শুকুতার পাত॥" ইত্যাদি।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যকে সে যুগের ইতিহাস রূপে গ্রহণ করা যায়। মাইকেল কবিকঙ্কণকে লক্ষ্য করিয়া যথার্থই গাহিয়াছেন, ঃ—

"কবিতা পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশঃ সুধাদানে
অমর করিলা তোমা, অমরকারিণী
বাগ্দেবী! ভোগিলা দুঃখ জীবনে,
ব্রাহ্মণ; এবে কেবা পূজে তোমা মজি তব গানে।'

পূর্ব্ববঙ্গেও চণ্ডী কাব্যের অনুকৃতিতে কাব্য রচিত হইয়াছিল। আমি ত্রিপুরাঞ্চল হইতে 'হরিমঙ্গলচণ্ডী' নামধেয় একখানা বহি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'নববিকাশ' নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মাণিক দত্ত, হরিরাম, কমললোচন, জয়রাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কবিকঙ্কণের পর কাশীরাম দাসের নাম স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর জন সাধারণের কবি। কাশীরামের মহাভারত মূল মহাভারতের সহিত ঐক্য রাখিয়া বিরচিত হয় নাই। বহুস্থলে কবি স্বকপোল কল্পিত কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। এসকল কাহিনীতে কাশীরামের কবিত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীরামের কবিত্বশক্তি যে কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টি হইতেই বুঝিতে পারিবেন।

"মহাভারতের কথা অমৃত লহরী,
কাহার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার,
অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার।

কাশীরাম দাসের কবিত্ব শক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। প্রতিদিন লক্ষ কণ্ঠে যাহার রচনা পঠিত হয় তাহার সমালোচনা নিরর্থক। পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় বিংশতিজন কবি মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সঞ্জয়, পরাগল খাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, রাজেন্দ্রদাস, গঙ্গাদাস সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেহই ভাগ্যবান কবি কাশীরামের স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। কাশীরামের রচনায় যে মাধুর্য্য ও প্রাঞ্জলতা দেখিতে পাওয়া যায় অন্য কাহারও রচনায় তদ্রূপ নাই বলিয়াই বোধ হয় কাশীরামের প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের কবিগণ যেমন রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী ও ভাগবত রচনায় পশ্চাৎপদ হন নাই, তেমনি মনসা মঙ্গল রচনায় তাঁহারা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ পর্য্যন্ত হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বংশীবদন কেতকদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি বহু কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। "মনসামঙ্গল" রচয়িতাগণের মধ্যে বরিশাল ফুল্লশ্রীর বিজয়গুপ্তই সমধিক কীর্ত্তিমান ও জনসাধারণের প্রিয় কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই মধ্যযুগে কত যে ছড়া পাঁচালী ও দোহার রচয়িতার অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সূর্য্যের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, সত্য নারায়ণের পাঁচালী ইত্যাদি বহু পাঁচালীর নাম করা যাইতে পারে।

এই সময়ের পর কিছুকাল সাহিত্যের ধারা নবপথে তেমন করিয়া চলে নাই। কবি শ্রেষ্ঠ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের কথা এক সঙ্গে বলিতে হইতেছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুগে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র দুই মহাকবির আবির্ভাব হয়। ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের অনুসরণকারী হইলেও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে রচনা

মধ্যে নূতন জীবন দান করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল অশ্লীলতা-দুষ্ট হইলেও উহা—

ভারতের রচিতের, অমৃতের ভার।
ভাষা গীত, সুললিত, অতুলিত সার॥

আদিরস বর্ণনায় ভারতচন্দ্র অদ্বিতীয়। অনুপ্রাসের ঘটা তাঁহার কবিতায় মূর্ত্তিমান। রামপ্রসাদ ভাবুক এবং ভক্ত কবি রূপে চিরপরিচিত। ভারতচন্দ্র আদিরসের কবি, রামপ্রসাদ ভক্তি বা পরমার্থ বিষয়ের কবি। রামপ্রসাদের গীতাবলি কোন্ বাঙ্গালী না জানেন? তাঁহার কালী-কীর্ত্তন সেই—

গিরিবর! আর আমি পারি নাহে
প্রবোধ দিতে উমারে!
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে

কোন্ শিক্ষিত বাঙ্গালীর না কণ্ঠস্থ? 'মনরে কৃষি কাজ জাননা' 'আমায় দে মা তহবিলদারী' ইত্যাদি পরমার্থ সঙ্গীত ত হাটে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গেও বহু কবির আবির্ভাব হয়। জয়নারায়ণ সেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত যপ্‌সা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'বঙ্গসাহিত্যেরইতিহাস' প্রণেতা দীনেশ বাবু বলেন—'ইনি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সমসাময়িক কবি, এবং উক্ত দুই কবির পরেই সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গের কবিগণের শীর্ষস্থানীয় এবং ঐ সময়ের সমগ্র বঙ্গীয়কবিকুলের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আসীন হইবার যোগ্য। ইহার কাব্য গুলির এক খানিও এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহা যে পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবের কারণ নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। জয়নারায়ণ মহারাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি, এই বংশে আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি নাম্নী দুইজন মহিলাকবি ও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" তাঁহাদের বিষয়ে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিয়াছি। জয়নারায়ণের কবিতা হইতে নৌকায় ঝড় বৃষ্টির সামান্য বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"মেঘের গভীর নাদ শুনি অতি পরমাদ
বিজুলি সঘনে পলে পলে।
আঁখি নাহি মেলা যায় ধন পতি সাধুতায়
কি হৈল কি হৈল বোল বলে॥
আকাশে পরশে ধূলা, বিমানের পাখীগুলা
পাছাড় খাইয়া পড়ে ভূমে।
নানা বৃক্ষ লতা যত মূল হৈতে হৈয়া হত
পড়ে কত পবনের ধূমে॥ ইত্যাদি।

কবিত্বসম্পদে তুল্য না হইলেও পূর্ব্ববঙ্গ যে পশ্চিম বঙ্গ হইতে একেবারে ন্যূন ছিলনা, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা প্রদর্শন করিয়াছি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে আমাদের বঙ্গদেশে আরও দুইজন কবি অপূর্ব্ব মনীষা বলে দেশে নূতন ভাব আনয়ন করেন। একজন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অপর মদনমোহন তর্কালঙ্কার। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বর্ত্তমান যুগের বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রথীর গুরু। হাস্যরস রচনায় তাঁহার ন্যায় সুরসিক কবি বর্ত্তমান যুগে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তিনি কেবল কবি ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন তাহা নহে সে যুগের বঙ্গ সাহিত্যের বহু বিষয়ের একরূপ জন্মদাতা। তাঁহারি চেষ্টায় ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামনিধি (নিধু বাবু) হরুঠাকুর, রাম বসু, নিতাই দাস প্রভৃতি কয়েকজন মৃত কবির জীবনী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। সাময়িক সাহিত্যের দিক্ দিয়াও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। ১২৩৭ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' নামক পত্র প্রকাশ করেন। গুপ্ত কবি নিজেও বীরবিলাসিনী, তরঙ্গ-লহরী, প্রভৃতি বিবিধ ছন্দের সৃষ্টি করেন। গুপ্ত কবির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমরা 'কবিগণ' সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। ইঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া একরূপ অখ্যাত ও অজ্ঞাত ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। এই কবিওয়ালাদের অভ্যুদয় কালেই রামনাথ গুপ্ত বা নিধু বাবু বিদ্যমান ছিলেন। নিধুবাবুও প্রথমে কবির পালা ও গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু পরিশেষে কেবল মাত্র সঙ্গীত রচনায়ই মনোনিবেশ করেন। "নিধুর টপ্পা" বর্ত্তমানেও সর্ব্বত্র সমাদৃত। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে নিধুর টপ্পা এত সুন্দরভাবে বিরচিত যে 'হিন্দুস্থানীর খেয়ালের

সুরও ইহাতে বজায় থাকে। কবি গানে—ভোর, গোষ্ঠ মাথুর প্রভৃতি যেমন আছে, তেমনি হর গৌরীর পুরাণ-কাহিনীও কবিওয়ালাগণ অনুসরণ করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের কবিওয়ালাগণ মধ্যে নীলুপাটনী, ভোলা ময়রা, যজ্ঞেশ্বরী (স্ত্রীকবি) সাতু রায় আণ্টুনিসাহেব সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, হরুঠাকুর ইত্যাদি প্রধান ছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গের কবিওয়ালাগণের মধ্যে রামকুমার রায়, কানাই সরকার, মদন সরকার রামকানাই ঠাকুর, নীলকমল রামরূপ, উদয়চাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র কাশীগুই ইত্যাদি কবি গীতের জন্ম খ্যাতিমান ছিলেন।

আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের রামকানাই ঠাকুরের রচিত একটী ভোর গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্যাম আসার আশাপেয়ে
সখীগণ সঙ্গে নিয়ে বিনোদিনী।
যেমন চাতকী পিপাসায়, তৃষিত জলাশায়, কুঞ্জ সাজায় কমলিনী॥
তুলে জাতি যুতি কোট্‌রাজ বেলি,
গন্ধরাজ আর কৃষ্ণকলি, নবকলি অর্দ্ধবিকশিত, যাতে বনমালি হরষিত।
সাজায়ে রাই ফুলের বাসর,
আস্‌বে বলে রসিক নাগর,
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত॥
ফিরে যাওহে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়েকাতর, আছে দুয়ারে।
প্যারী তাগে প্রেম কর্‌বে না,
রাগে প্রাণ রাখ্‌বে না,
এ' দুখেতে মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে॥"

এখন পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র একটা জাগরণের আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাই আশা হয় আমাদের অতীত-যুগের কবিগণের কাব্য-কথা ক্রমশঃ আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইবে।

রাষ্ট্রশক্তি সাহিত্যের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা বৌদ্ধ যুগ হইতে ইংরাজাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিলাম তাহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে। ইংরাজাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্য একমাত্র রসধারা বুকে করিয়াই বহিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তেমন সজীবতা বা প্রাণ ছিল না। তাহাতে কোকিলের কুহুতান ও বসন্তের মলয় সমীর, প্রেমের প্রীতি আকর্ষণ ব্যতীত তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু এই রস সাহিত্যের ধারা ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলাইয়া গেল। সর্ব্বদেশব্যাপী একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। সেই নবজাগরণের নব্য বাঙ্গালার সাহিত্যের কথাই এখন বলিব।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য তেমন ভাবে পুষ্টিলাভ করে নাই। আমরা বৌদ্ধযুগের কিংবা তৎপরবর্ত্তী যুগে যে গদ্য সাহিত্যের নমুনা পাই তাহা তেমন উৎকৃষ্ট নিদর্শন নহে; বৌদ্ধ সময়ে শূন্যপুরাণ ও বৈষ্ণব যুগের কারিকাগুলি ব্যতীত গদ্যের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর "বৃন্দাবন পরিক্রমা", "কুলজীশ্চটীব্যাখ্যা" জয়নাল ঘোষের 'রাজোপাখ্যান' ইত্যাদি কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত হ্যালহিডে সাহেবের ব্যাকরণ, প্রশ্নোত্তর মালা ও ১৮১২ সালে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে মুদ্রিত 'ইতিহাসমালা'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আমি একখানা 'ইতিহাসমালা' সংগ্রহ করিয়াছি। এই বইখানা কাঠের খোদাই অক্ষরে ১৮১২ খ্রীঃ অঃ মুদ্রিত। শতবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের দেশের গদ্যের ভাষা কিরূপ ছিল উদ্ধৃত গল্পটি হইতে আপনারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"এক দুল্যার পত্নী গজমুক্তা পাইয়াছিল তাহার কথা"।

"একজন দুল্যার ভার্য্যা বহরী জল অন্বেষণ করিতে করিতে কোন মহদারণ্যে প্রবিষ্টা হইল তথাতে এক কুল বৃক্ষ তলেতে এক সিংহ বৃহৎকায় গজ শ্রেষ্ঠকে বধ করিয়া তাহার কুম্ভ হইতে রক্তপান করিয়াছে ঐ হস্তি কুম্ভ হইতে গজমুক্তা নির্গতা হইয়া সে স্থানে পতিতা আছে ইতিমধ্যে ঐ দুল্যার স্ত্রী রক্তমিশ্রিত মুক্তা পাইয়া কুল ফল ভ্রমে প্রথমতঃ বড় তুষ্টা হইল। তৎপর হস্তবরে মুক্তা রাখিয়া

বিবেচনা করিতে গুরুবর্ণ ও কঠিন দেখিয়া নিরাশ হইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।"

"অতএব সকলকে কহিতেছি যে কোন উত্তম বস্তু যদি অধম হস্তে পতিত হয় তাহার দশা প্রায় এই মত হয় ইতি।"

১৮২১ খ্রীঃ অঃ রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহন রায় এক হিসাবে আধুনিক যুগের জন্মদাতা। তিনি ধর্মপ্রচারক হিসাবে যেমন পরিচিত, সাহিত্যের জন্মদাতা রূপেও সমধিক সুবিখ্যাত। বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্য তাঁহার দ্বারা বিশেষরূপে পরিপুষ্টি লাভ করে। সংবাদপত্রের প্রচারকরূপে, হিন্দুর ধর্মরক্ষা করে, সতীদাহ নিবারণ করে, সর্ব্ব বিষয়েই তিনি সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন; রামমোহন রায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত গদ্য প্রবন্ধ সমূহ এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়েও পঠিত হইত। রামমোহনের ভাষা সহজ, সরল ও সতেজ ছিল—তিনি মনের কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন। রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় কাল মধ্যে ও তিরোভাব কালেই বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে একই সময়ে বহু কৃতি পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র ও মহিমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই একে একে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় রাম গোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বহু উজ্জল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়।

গুপ্ত কবির শিষ্যগণ মধ্যে সুধীরঞ্জনের দ্বারকানাথ, নাটকার দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি উত্তরকালে যশস্বী হইয়া উঠেন। তখন চারিদিকেই সাহিত্যের জাগরণ, ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হইয়াছে 'তত্ত্ববোধিনী' চলিতেছে, অক্ষয়কুমার দত্তের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সমূহ উহার কলেবর ভূষিত করিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ লইয়া সাহিত্য লইয়া স্ত্রী-শিক্ষা লইয়া বিব্রত। তিনি—গদ্য রচনায় যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত 'সীতারবনবাস', 'শকুন্তলা' বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রাণে এক নবীন শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে। বর্ণপরিচয় হইতে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্মদাতা, বিরাম চিহ্নের সৃষ্টিকর্ত্তা, সমাজসংস্কারক দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিভায় মনীষায়, সকল বিষয়েই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। এ সময়ে টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীসিংহ প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা চালাইবার চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্র সেন সুলভসমাচার প্রচার করিয়া, সুলভ সংবাদ পত্র প্রচারের সহায়তা করেন।

পশ্চিম বঙ্গে ইংরেজ জাতির শুভ পদার্পণে ও শিক্ষা বিস্তারের প্রথম সুযোগে যেরূপ সাহিত্যে ও মনীষায় ও সামাজিক ব্যাপারে নবীনতাকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে সে সুযোগ না ঘটিলেও পশ্চিমের বাতাস পূর্ব্ববঙ্গেও বহিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেও 'ঢাকাপ্রকাশ', 'কবিতাকুসুমাবলী' মনোরঞ্জিকা ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও অন্যান্য বহু নবীনলেখক এ সমুদয় পত্র ও পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশ করিতেন। তাহাদের মধ্যে দুই একজন পরবর্ত্তীকালেও যশস্বী হইয়াছিলেন, কেহ বা যশস্বী হইতে পারেন নাই। বহু ক্ষুদ্র কালিদাস বহুদিন হইল কাল-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের ধনশালী ভূম্যধিকারীগণকে যেরূপ সাহিত্যসেবায় ও সাহিত্যের চর্চ্চায় অকাতরে ধনব্যয় করিতে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের সেরূপ কোন ভূম্যধিকারীর নাম বিশেষ গৌরবের সহিত উচ্চারণ করা যায় না। সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী—রঙ্গপুরের কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং বর্ত্তমান যুগের ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ব্যতীত সাহিত্যের জন্য কেহ কিছু করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

"বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস" প্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার এই নব প্রকাশিত গ্রন্থে সাময়িক সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। সাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে আমরা এ জন্য গুটিকয়েক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত দিলাম।

আমরা অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি আবার একটু পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা আমাদের দেশের এক শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব দেখিতে পাই। মদালসগমনে হাসিগানে পরিহাসে বা আদিরসের লাস্য-লীলায় বাঙ্গালা সাহিত্য নব জাগরণে জাগরিত হইয়াও যে অভাব বোধ করিতেছিল তাহা এই মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে দূর হইয়া গেল। শান্তিপ্রিয়—বঙ্গবাসী কোমলবাণীর স্বর ভুলিয়া ভেরীর প্রবল নির্ঘোষ শুনিতে পাইল। 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রণেতা মাইকেল মধুসূদনের কথা আমি বলিতেছি। মাইকেল বাঙ্গালা পদ্য সাহিত্যে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, জাতীয়তার অপূর্ব্ব স্পন্দন জাগাইয়া গিয়াছেন। মধুসূদন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রথম কবি আমরা এখানে সামান্য একটু উদ্ধৃত করিলাম—

'মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?'

ইহা হইতেই শ্রুতিবর্গ মেঘনাদের গুরুগম্ভীর পুরুষোচিত বাণীর আভাষ পাইবেন।

মধুসূদনের সমকালে পূর্ব্ববঙ্গের কবি কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বত্র যশ সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরচিত সদ্ভাবশতক বাঙ্গালী আদরে গ্রহণ করিয়াছিল। মাইকেলের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে বাঙ্গালা সাহিত্য এক মহাপুরুষের অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রভাবে বসন্তের নব পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় চিরনবীনতা ধারণ করিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ভাষার প্রাণে যে যৌবন-শ্রী দান করিতে পারেন নাই ইনি তাহা করিতে সমর্থ হইলেন। আমরা এক্ষণে সেই বঙ্কিমযুগের কথা বলিব। বঙ্কিমের যাদুকরী লেখনী প্রভাবে উপল-রুদ্ধ নির্ঝরের মুখ খুলিয়া গেল। ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার আদর করিতে শিখিল। মাকে প্রাণ ভরিয়া মা ডাকিতে শিখিল। তিনি 'বঙ্গদর্শন' প্রচার করিয়া কথা সাহিত্যের প্রচার করিলেন, ইতিহাস পাঠের উপযোগীতা বুঝাইলেন, সারগর্ভ প্রবন্ধ, সরল হাস্য-রসের অবতারণা করিলেন। বঙ্গ-জননীর প্রিয়তম সন্তান ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে গাহিলেন,

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি, সমালোচক, ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। বঙ্কিম-সূর্য্যের চারিদিক ঘিরিয়া নবগ্রহের মত অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি একে একে ফুটিয়া উঠিলেন, বাঙ্গালী বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর বুঝিল

পশ্চিমবঙ্গে যখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভা বলে বাঙ্গালা সাহিত্য-জননীর দিব্যদেহ নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিতেছিলেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সাধক কালীপ্রসন্ন ও 'বান্ধবের' বন্ধুদ্বয়ে পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব মহিমা অটুট রাখিয়াছিলেন। বান্ধবের 'চিন্তা' বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরম্" গাহিয়া গাহিয়া জননীর প্রাণে যে আশার বাণী সঞ্চারিত করিয়াছিলেন—মর্ম্মপীড়িত কালীপ্রসন্নও গাহিলেন।

'নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা।
সোণার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা॥
কুঞ্জে কুঞ্জে যার, কোকিল কণ্ঠে খেলিত সুধাতরঙ্গ
সে কবি নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমানা।
যার রাগমদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত
আজি সে দীপকরাগ—শ্রবণে শুনি না।'

'বঙ্গদর্শনে' হেমচন্দ্র গাহিলেন 'বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে'; 'বান্ধবে' তাঁহার ধ্বনিকেও ম্লান করিয়া কবি গোবিন্দরায় গাহিলেন,—

'নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনেও।
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষিও।

১২৮১ সালের 'বান্ধবে' এই গীতটি প্রকাশিত হয়।

"যমুনা লহরীর" ও বহু পূর্ব্বে কবি গোবিন্দ রায়ের বীণা গাহিয়াছিল।

'কতকাল পরে বল ভারতরে,
দুঃখ সাগর সাঁতারে পার হবে।
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে,
পরদীপমালা নগরে নগরে।

এই দুইটী সঙ্গীত রচনা করিয়াই গোবিন্দ বাবু অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার এই'টী গান এক সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্র গৃহে গৃহে গীত হইত। সম্প্রতি গোবিন্দ বাবু ৮০ বৎসর বয়সে আগ্রা নগরীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ওদিকে হেমচন্দ্র এদিকে নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে সমগ্র বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। হেমবাবুর কবিতাবলী নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী, হেমবাবুর বৃত্রসংহার—নবীনচন্দ্রের কুরু-ক্ষেত্র, অমিতাভ, রৈবতক সমভাবে কবিত্ব প্রতিভায় পূর্ব্ববঙ্গের স্বীয় গৌরব রক্ষা করিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরিয়া যেমন নবগ্রহ দীপ্তি পাইতেছিল। কালীপ্রসন্ন সূর্য্যকে ঘিরিয়াও তেমনি গোবিন্দচন্দ্র, অম্বিকাকুমার, নবীনচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র, শীতলাকান্ত, নিশিকান্ত, ইত্যাদি বহু উত্তরকালের প্রতিভাশালী লেখক দিগদিগন্তে যশ বিস্তার করিতেছিল।

আর বক্তারূপে কালীপ্রসন্ন তখন বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে সভাও পত্রিকা প্রকাশের ধুম পড়িয়া গেল। শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। স্বয়ং কালীপ্রসন্ন ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিলেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায় হইলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ওদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ-সংস্কারের বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন, আর পূর্ব্ববঙ্গের দরিদ্র সমাজ-সংস্কারক রাসবিহারী কৌলীন্য প্রথার দোষ প্রচার করিয়া দ্বারে দ্বারে বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন।

যাত্রাগানে, কথকতায়, কবিরগানে, পাঁচালি সঙ্গীতে, ঢপগানে, কীর্ত্তনে, বাউল সঙ্গীতে ও নাট্যাভিনয়ে পূর্ব্ববঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পশ্চিম বঙ্গের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। বাউল সঙ্গীতে সুধারাম বাউল, দীনবাউল, গঙ্গাধর ঠাকুর, আশানন্দ বাউল প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যাত্রা-সঙ্গীতে যেমন পশ্চিম বঙ্গের গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে, অভয়দাস নীলকণ্ঠ অধিকারী, বৌমাষ্টার প্রভৃতি যশলাভ করিতেছিলেন তেমনি পূর্ব্ববঙ্গে ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী, স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী বিচিত্র-বিলাস, ভরতমিলন, প্রভৃতি পালা রচনা করিয়া ও বরিশালের চন্দ্রমোহন শাপলা, ঢাকা জেলার রাধানাথ, কালাচাঁদ, ভেজরঘোষ গায়কগণের গানেও ঢাকার কালীবাবুর 'সীতার বনবাস' যাত্রা একসময়ে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র এক অভিনব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত তৎকালে মনসার ভাসান, শীতলার গান, সত্যপীরের গান, সত্যনারায়ণের গান, গ্রাম্যগীত, হোলিগীত, মালসী গান, লক্ষ্মীর পাঁচালী, পাঁচপীরের গান, ঘাটুগান, গাজীর গান, সারিগান, ত্রিনাথের গান ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। এসব গান ও আমোদ প্রমোদ পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা সমধিক প্রচলিত।

'ঢাকা-প্রকাশের' সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চৌধুরী মহাশয় সে যুগের পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যের বহু সংবাদ রাখেন, যক্ষের ধনের মত তিনি সে সব অমূল্য রত্ন আগুলিয়া রাখিয়াছেন, আপনারা সে যক্ষের ধন উদ্ধার করিলে রাতারাতি বড়লোক হইতে পারিবেন।

সে যুগের পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীত রচয়িতাগণের মধ্যে রামকুমার বাবু, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাজা সূর্য্যকান্ত (ইঁহার রচিত বহু সঙ্গীত আছে) 'দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন' নামক বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা কুমিল্লার ৺অমৃতলাল গুপ্ত, আদিনাথ দাস, ৺বেণুরাম রামদুলাল মুন্সী, 'ও গো! জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি! কবিবর আনন্দচন্দ্র মিত্র, ইনি কেবল সঙ্গীত রচয়িতা নহেন, হেলেনাকাব্য, ভারত-মঙ্গল ইত্যাদি বহু কাব্য গ্রন্থের প্রণেতা ও বটেন। 'ভারত শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবা বালা'

শীর্ষক বিখ্যাত সঙ্গীতটি ইঁহারি রচিত। 'কবি-কাহিনীর' দীনেশবন্ধু—ইঁহার রচিত—'তুইকি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা' এক সময়ে শিক্ষিত সমাজে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। ৺কৃষ্ণকান্ত পাঠক, রাজমোহন আম্বলী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, ইনি এক সময়ে পল্লী গ্রাম হইতে 'অবলাবান্ধব' নামক পত্র প্রচার করেন। দেশের জাতীয় সঙ্গীত ইনিই সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা' সঙ্গীত পূর্ব্বে শিক্ষিত সমাজে সমধিক প্রচলিত ছিল। ভুবনচন্দ্র রায়, ইনি ত্রিপুরার অধিবাসী শ্যামা-সঙ্গীত রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্নীর যুগের কথা আলোচনা করিয়াছি। আধুনিক যুগের আলোচনা বিস্তারিত রূপে করিবার সময় এখনও আইসে নাই, করাও সঙ্গত নহে। যখন বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন স্বীয় অপূর্ব্ব মনীষা বলে বঙ্গ সাহিত্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, তখন পূর্ব্বাকাশে অরুণিমা বিস্তার করিয়া তরুণ রবি গাহিয়া উঠিলেন,

"খোল নলিনী খোলগো! আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল নাকি ?
দেখ তোমারি দুয়ারি পরে
এসেছে তোমারি রবি।"

ঘুম ভাঙ্গিল, নলিনী সেই তরুণ রবিকে হৃদয়ে স্থান দান করিল। কিন্তু যাহার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব বিজয়ী কবি এ প্রসঙ্গে তাহার কথা না বলিলে চলিবে কেন। প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদীর বাঁধন ছিঁড়িয়া অভিনব ছন্দ ও ভাবের বিকাশে দুইজন বঙ্গ কবি অভিনবত্ব প্রদর্শন করেন, একজন 'সারদামঙ্গলের বিহারীলাল, অপর 'মহিলার' কবি সুরেন্দ্রনাথ। বিহারীলাল অভিনব সুরে গান ধরিলেন, ঃ—

নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন' হৃদি ফুলহার!
মধুর মূরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ শশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম ঘোরে,
কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতেরে পারিব না আর!
তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারে বার!
কুসুম-কানন মন, কেনরে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা-নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্র মা কার দুখে
কাঁদিছ বিষন্ন মুখে
অয়ি দিগঙ্গনে কেন কর হাহাকার!
হয়তো হলনা দেখা, এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার—
ধর ধর স্নেহ-উপহার।"

রবীন্দ্রনাথ এই অভিনব সুরে গান ধরিলেন, বঙ্গ সমাজের নবীন যুবকগণ উহা সাদরে গ্রহণ করিল। আজ বিশ্ব সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে আসন লাভ করিয়াছি—শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তরুণ রবি জীবনের প্রথম প্রভাতে গাহিয়াছিলেন,

'জগতের মাঝে স্থান নেই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গ ভূমি,
গান গেয়ে কবি জননীর তরে
ঠাঁই করে দাও তুমি।

কবির এই বাণী সার্থক হইয়াছে। আমরা জগতের মাঝে স্থান পাইয়াছি। এ যুগ রবীন্দ্রীয়যুগ। এ যুগের সমালোচনার ভার ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হাতে। এ যুগে আমরা কি না পাইয়াছি? বিশ্ববিজয়ী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র, রসায়ণবিদ্ প্রফুল্লচন্দ্র—এক সময়ে জগদীশচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। তিনিই প্রথমতঃ বঙ্গ ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অবতারণা করেন। 'সাহিত্য' 'দাসী' প্রভৃতি পত্রে সে সকল রচনা প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্রের ভাষা কবিত্বপূর্ণ, যাঁহারা তাঁহার রচিত 'ভাগিরথীর উৎস সন্ধানে' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন তাহারাই উহা উপলব্ধি করিতে

পারিবেন। রসায়নবিদ, কবি, ঐতিহাসিক—এমন কোন বিষয় নাই, শাখা নাই যে বিষয়ে আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্য গৌরব করিতে না পারে। আমরা কাহার নাম করিব?

এখন আমরা নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা করিব। পূর্ব্ববঙ্গেই সর্ব্বাগ্রে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হয়। নীল-করের অত্যাচার প্রপীড়িত প্রজার দুঃখ-কাহিনী 'ঢাকা-প্রকাশের' কবি-সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র যখন আলাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিতেছিলেন; তখন দীনবন্ধু মিত্র ঢাকায় ছিলেন, তাঁহার প্রাণে সে বেদনা যে আঘাত করে তাহারি ফলে নীল-দর্পণ' বিরচিত ও ঢাকায় অভিনীত হয়। সে প্রায় চল্লিশ বৎসরের আগেকার কথা। পশ্চিম বঙ্গে রাজা যতীন্দ্রমোহন, সৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃতি যেমন মধুসূদন ও রামনারায়ণের সাহায্যে নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারদের মধ্যে কেহই তেমন কিছু করেন নাই। একে একে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ রায়, বিহারীলাল নাট্যকার রূপে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিলেন। পূর্ব্ববঙ্গেও তেমনি 'শকুন্তলার' রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কালীবাবু, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ, স্বর্গীয় প্রসন্ন পণ্ডিত মহাশয় নাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। ইহাদের মধ্যে কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের হাত বেশ মিঠা ছিল 'বিল্বমঙ্গল' রচনায়ও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এখন পর্য্যন্তও তাঁহার রচিত বিল্বমঙ্গলের গান,—

"চলিতে চরণ চাহে না আর,
অবশ শিথিল অঙ্গ স্কন্ধে পাপভার
ধরহে পাতকী মোরে ওহে গিরিধারী
পাপের বোঝা কি প্রভু! এতই যে ভারি।
থাক্ ভবে কাজ নাই, আমি ভবে চলে যাই,
কিন্তু হে দয়াল নামের কলঙ্ক রবে তোমারি।
আমি রইতে নারি বেড়িয়ে পড়ি বেণুর রব শুনি যে কাণে।
ঘরে র'ব কেমনে।
সে যে প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে প্রাণপণে প্রাণ টানে।
তাই খুঁজে খুঁজে আমি এসেছি এখানে।
তোমরা দেখেছ কি বল আমার সে ধনে।

সে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অভিনয় করিতেন। বাঙ্গালার সুধীজনগণ পরিশোভিত হইয়া নাট্যশালা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সে দিন চলিয়া গিয়াছে। নাট্য সাহিত্যে পূর্ব্ববঙ্গ কোনরূপ গৌরব করিবার অধিকারী নহে। রঙ্গমঞ্চ শোভা সম্পদেও যেমন চিত্তাকর্ষক নহে অভিনয় নৈপুণ্যেও তেমন নহে। পূর্ব্ব, বঙ্গের নাট্যশালায় আমরা বর্ত্তমান যুগে যে দুই একজন নাট্যকার পাইয়াছি তাঁহাদের নাম এখানে করিলাম- 'নাদির শার' অক্ষয়কুমার রায়, বীরবিক্রমের নাট্যকার ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সতী সুকন্যার কালীভূষণ বাবু এবং অভিনেতা ও নাট্যকার হিসাবে 'কেদার রায়' 'ফুল বাই' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।*

পশ্চিম বঙ্গের রঙ্গালয় আমাদিগকে বহু অমূল্য রত্ন দান করিয়াছে, আমরা বর্ত্তমান যুগেও গিরিশচন্দ্র, অমৃত লাল, কবিশ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল,—যিনি রঙ্গালয়ে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, যাঁহার 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' শীর্ষক জাতীয় সঙ্গীতগুলি যেমন অমর তেমনি তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিও মহান্ আদর্শ লইয়া বিরচিত। একটা জাতি তাহার রঙ্গালয় দেখিলে বুঝা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাট্য সাহিত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার কথা এই ক্ষুদ্র পরিসরে বলা চলে না। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমরেন্দ্র নাথ প্রভৃতি বহু ভদ্র ও শিক্ষিত অভিনেতা ও নাট্য-

* নাট্য সাহিত্যের নামে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, এবং অভিনেতা ও নাট্যকারদের নাম লইতেও লজ্জাবোধ করেন, বঙ্গীয় নাট্যশালার চূড়ান্ত অধঃ পতন হইয়াছে তাহা স্বীকার্য্য তথাপি ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে নাট্যশালাকে উপেক্ষা করা চলে না। আমি নাট্যকার রূপে যাহাদের নাম করিয়াছি—আমি জানি যে তাহাদের নাটক, শুধু 'হাতে খড়ি' দেওয়া, তবু তাহাদের এদিকে হস্তক্ষেপ করা কি উৎসাহ যোগ্য নয়।

কাহকেও আমরা এযুগে পাইয়াছি। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের নাট্যশালার প্রতি জনসাধারণের উপেক্ষা করিলে আর চলিবে না।

আমরা এপর্য্যন্ত মহিলা কবিদের বিষয়ে কিছু বলি নাই। এবিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা কোন অংশেই তুলনায় হীন নহে। পশ্চিম বঙ্গে যেমন তরু দত্ত, স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, প্রিয়ম্বদা, সরলা, ইন্দিরা, আমাদেরও তেমনি সরোজিনী নাইডু, কামিনী রায়, আমোদিনী ঘোষ, পঙ্কজিনী বসু, সুরমাসুন্দরী, আশালতা, সরযূবালা দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও হয়ত কত মহিলা নীরবে সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন যাহাদের নাম আমরা হয়ত জানি না। সে দিন একটী বালিকার কবিতার খাতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমরা এখানে তাহার 'আলোও আঁধার' শীর্ষক একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—

'আলো ও আঁধার'।

"আঁধারের পাশে উজল আলোক
অশ্রুর পাশে হাসি
বিষাদের পাশে লুকায় রেখেছ
হরষ পুষ্প রাশি।
মরণের পাশে রেখেছ জীবন,
নিরাশার পাশে আশা,
হৃদয়ের তান গভীর নীরব
নীরব আমার ভাষা।"

এই বালিকার গল্প ও কবিতা গুলি পড়িলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়।

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গের সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জাগিবার আহ্বান নিনাদিত হইতেছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ নবীন আশার বাণী শুনাইয়াছেন, পরম হংস সোহংস্বামী অভিনব বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। দীনকবি গোবিন্দ দাস প্রেম ও ফুলের অর্ঘ্যরচনা করিয়া অঞ্জলি দিয়াছেন, "নারায়ণ" সম্পাদক সাগর সঙ্গীতের অন্তর্য্যামীর মালঞ্চ সাজাইয়াছেন। চট্টগ্রামের শশাঙ্ক মোহন 'বঙ্গবাণী' ও গঙ্গাচরণ 'পরাগ' হস্তে দাঁড়াইয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র, নরেন্দ্রনারায়ণ ও নিশিকান্ত উদ্ভিদ্‌ তত্ত্বে ও সাহিত্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটাইতেছেন, কেদারনাথ অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ, হরিদাস, যতীন্দ্রমোহন, নলিনীকান্ত, উপেন্দ্রগুহ, বীরেন্দ্রনাথ, ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, ধরণীকান্ত, সুধাকান্ত সৌরীন্দ্রকিশোর, ব্রজেন্দ্রকিশোর ভ্রমণে, শিকারে, ইতিহাসে ও গল্পের আসরে নামিয়াছেন, রায় সুরেশচন্দ্র 'মৃগনাভির' সৌরভ ছড়াইতেছেন, বীরেন্দ্রকুমার 'প্রহেলিকা' রচনা করিয়া সমাজ প্রহেলিকার সংস্কারে আসিয়াছেন। ভিক্ষুক পর্য্যটক শরচ্চন্দ্র আর নাই কবি নবীনচন্দ্র দাস আর নাই কিন্তু বিশ্বপর্য্যটক বিনয়কুমার, চীন পর্য্যটক রামলাল সরকার, তরুণ কবি পরিমল ও শ্রীপতি, চট্টগ্রামের জীবেন্দ্রকুমার সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের আশায় কুঞ্জ রচনা করিতেছেন। অনুবাদ সাহিত্যে গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আর এই প্রসঙ্গে অশ্রুভরা নয়নে কবি রজনীকান্তের নাম স্মরণ করিয়া আজ ধন্য হইতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য সাধনায় ঢাকারিভিউ ও সাহিত্য-সমাজ, সাহিত্যপরিষদ ও প্রতিভা, কেদার নাথের সৌরভ, বিক্রমপুর, কৃষিসম্পদ, তোষিণী, রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদ ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? প্রাচীন সাহিত্যে ঢাকা সাহিত্যপরিষদ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ও সাহিত্যসমাজ মীন চেতন ও পল্লী প্রসঙ্গ, সারদামঙ্গল প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গ কি মাসিক পত্র পরিচালনায়, কি সাহিত্য সাধনায়, কি কবিত্ব বিকাশে এখন পর্য্যন্তও যে উচ্চস্থানে আছেন তাহার সমকক্ষ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকদের বহু সাধনা সাপেক্ষ ও সময় সাপেক্ষ। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণের মধ্যে এখনও বোধ হয় সে প্রাণের সাধনা জাগে নাই। মুসলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে সৈয়দ এমদাদ আলি, কায়কোবাদ, মৌলবি আবদুল করিম, ইমদাদউল হক, সিরাজি ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। ধীরে ধীরে মুসলমানগণও বঙ্গ ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়া সাহিত্য চর্চ্চায়

মননিবেশ করিয়াছেন। তারপর এ দেশের ধনী সন্তানেরা খায় দায় ঘুমায়—একমাত্র সন্তোষের প্রমথনাথ ও বরিশালের দেবকুমার সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। অর্থ ব্যতীত ঐতিহাসিক গবেষণা চলেনা, পুঁথি প্রকাশ হয় না, সাহিত্যের মন্দির গড়িয়া উঠে না। কে সে অর্থ দিবে?

আমাকে অল্প পরিসরে অনেক কথা বলিতে হইল, কাজেই পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিতে পারিলাম না, আধুনিক যুগের বর্ণনার বাদ দেওয়ায় বোধ হয় তেমন অপরাধও হয় নাই। চন্দ্র দেখাইতে আবার প্রদীপের প্রয়োজন কি?

যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যাহাদের অভ্যুদয়ে দেশ পবিত্র ও জাতি মহাজাতিতে পরিণত হইবার সুযোগ পায়। বাঙ্গালীর পুণ্যপ্রভাবে এ শতাব্দীতেও আমরা এক মহাপুরুষ লাভ করিয়াছি। মাতৃভূমির সুসন্তান, জ্ঞানরত্নালঙ্কারবিভূষিত ব্রাহ্মণ-কুলগৌরব এই নর দেবতার আবির্ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভগীরথের সাধনার ন্যায় স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ্য তেজের তপঃ প্রভাবাধিকারী এই মহাপুরুষ বাঙ্গলা সাহিত্য-গঙ্গায় ক্ষীণধারায় কুলপ্লাবিনী পদ্মার প্রবল শক্তি সংযোজন করিয়া দিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধিকার দান করিয়া দেশে বিদেশে বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। একদিন যে দেশের কবি মনের দুঃখে গাহিয়াছিলেন,

'হায় মা ভারতী চিরদিন তোর অখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে॥

সে অভাব ঘুচিল। বাঙ্গালা সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হওয়ায় বাঙ্গালী গ্রন্থকার নবীন উৎসাহে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ মহাপুরুষের অনুগ্রহে কালীরাম দাস প্রভৃতি মৃত কবিগণের চিতাভস্মে মঠমন্দির গড়িয়া উঠিল। বাঙ্গালী মৃত সাহিত্যিকগণের আদর করিতে শিখিল। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের পার্শ্বে প্রকাশচন্দ্র সিংহের তর্কবিজ্ঞানকে তুল্যরূপে স্থানদান করিয়া বঙ্গভাষার বিজয়বাণী ঘোষণা করিলেন।

আজ সেই মহাপুরুষ—মহাপণ্ডিত—দয়ার সাগর সর্ব্বজনপ্রিয় ব্রাহ্মণ সন্তান আপনাদের সমক্ষে বরাভয় করে উপবিষ্ট। তাঁহার নিকট আপনারা বর চাহিয়া লউন। আপনারা বলুন হে ঋষি—তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদীয় পুষ্পাঞ্জলি দাও, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় বিষয় বাঙ্গলায় পড়াইবার ব্যবস্থা কর। হে আশুতোষ! তুমি প্রকৃতই আশুতোষ! আজ পূর্ব্ববঙ্গে পদার্পণ করিয়া আমাদের প্রাণে নবশক্তির সঞ্চার করিয়াছ—জাতীয়পোষাকের গৌরব দেখাইয়াছ! ইংরেজী বুক্‌নীর অপেক্ষা বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালাই সুশোভন ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর তোমার এই নব প্রেরণা নবশক্তি যেন আমাদের প্রাণে চিরজাগরূক থাকে। ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া—জাতিয়তাকে রক্ষা করিয়া আমরা যেন ধন্য হইতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গবাসীও সাহিত্য সেবায় যেন পশ্চিমবঙ্গের জ্যেষ্ঠসহোদরের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে। হে আশুতোষ! আমার এই ভক্তিপূত বিল্বপত্র তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।*

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য-সমাজের বিশেষ অধিবেশনে নর্থব্রুক হল প্রাঙ্গণে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

সম্মিলন সম্পাদক।

রামপ্রসাদ।

তুমি আসিবার আগে ফুটিতনা হেতা
আমাদের গৃহ জবা, বার মেসে ফুল,
তুমি আসিবার আগে রাঙা রক্তে তার
সে রাঙা চরণ বলে হত নাক ভুল।
তুমি আসিবার আগে রাজরাজেশ্বরী
শুভঙ্করী ভয়ঙ্করী ছিল মা মোদের,
মায়েরে মা করে নিলে তুমিই প্রথম
চিনাইলে অন্নপূর্ণা ধাত্রী জগতের :
তুমিযে দামাল্ ছেলে আদুরে গোপাল
কেড়ে নিলে মুণ্ডমালা অসি খরধার,
মায়ের আটাসে ছিলে অতুল সোহাগ
দশ হস্তে ঘুরে ফিরে ঝিনুক খোকার।
বরষার ধারা সম-তব গীত ধার
করেছে শ্যামল বঙ্গ, শান্ত ধরাতল,
এনেছে প্রাণের খাদ্য মুমূর্ষুর আশা
করেছে উন্নত নত পবিত্র নির্ম্মল।
ভক্তি আর শক্তি এক নহে ভিন্ন ভেদ
তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার,
গান আর প্রাণ তুমি করে দিলে এক
ভক্তিতে ভরিয়া দিলে পূজা উপচার।
হে ভক্ত পূজার লাগি গড়ে ছিলে তুমি
ভক্তি-ভরে যেই শিব গঙ্গা মৃত্তিকার,
জাগ্রত দেবতা হয়ে মহা মহিমায়
হল তা অনাদিলিঙ্গ পূজিত সবার।

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক।

বেবিলোনের সমাজচিত্র

প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পশ্চিম এসিয়ার টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর মধ্যস্থিত বেবিলোন জগতে কোন কালে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। বেবিলোন আজ পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তর্হিত। বেবিলোনের ইতিহাস আজ শুধু ঐতিহাসিকগণের নিকটই সমাদৃত মিসর, বেবিলোন, এসিরিয়া আজ যুগযুগান্তের কথা অতীত যুগের সভ্যতার লীলাভূমি পশ্চিম এসিয়ার ইতিহাস ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে বর্ত্তমানে গ্রীসির উপকথা বা আরব্যোপন্যাস।

(১) বেবিলোনের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কৌতুহলোদ্দীপক উপখ্যান প্রচলিত। বেবিলোন জাতি ইতিহাসে সুমেরিয়ান (Sumerian) ও সেমিটিক (Semitic) বলিয়া খ্যাত। Hall বলিয়া থাকেন (২) যে সুমেরিয়ান জাতি পূর্ব্বে সেমিটিকগণ বেবিলোনের অধিবাসী ছিল। তাঁহার মতে কখন সুমেরিয়ানগণ অসভ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হইত ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে অজ্ঞ। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই তাহাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে সভ্যতার নিদর্শন ছিল। ইংরাজদের মত বেবিলোন জাতি বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রনে গঠিত। প্রস্তর খোদিত তাহাদের মুখমণ্ডলে ইহুদীজাতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বেবিলোন অধিবাসীর খর্ব্বাকৃতি, সুস্থ ও বলিষ্ঠদেহ, সরল নাসিকা। বেবিলোন সমতলভূমি ও অতিশয় উর্ব্বরা। কাজে কাজেই বেবিলোন বাসী জন্ম হইতেই বেশ কৃষিকার্য্যে পারদর্শী। বেবিলোন নানারূপ উদ্যানে সজ্জিত। বেবিলোনে "ঝুলান উদ্যান" (hanging garden) পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্য্যের একটি। শস্যাদির ভিতরে গমই প্রচুর পরিমাণে কর্ষিত হইত। মিসরের মত বেবিলোন কৃষক শ্রমশীল, কার্য্যেই রত এবং যুদ্ধ বিগ্রহের ঘোর বিরোধী। ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ প্রচলন ছিল। সমুদ্রতীরস্থ জনপদে বাণিজ্যপোত নির্ম্মিত হইত এবং বণিকগণ দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিত।

বেবিলোনে প্রস্তর খণ্ড অতিশয় দুর্লভ—গৃহ নির্ম্মাণে ইষ্টকই ব্যবহৃত হইত। Herodotus বলেন যে প্রত্যেক বেবিলোনবাসী চলিবার সময় স্বকীয় প্রস্তর খণ্ডের খোদিত মোহরটি (engraved seal) সঙ্গে

(১) এই প্রবন্ধের অধিকাংশই অধ্যাপক সেইসের (Prof. Sayce) "Social life among the Assyrians and Babylonians" হইতে সংগৃহীত।

(২) Hall's The Near East, পৃঃ ১১১।

রক্ষিত। মোহরটি ঠিক একটি ছোট রোলারের' মত এবং লিখিবার সময় আর্দ্র কর্দ্দমের উপর ব্যবহৃত হইত। আধুনিক দলিলপত্র 'রেজেষ্টারী' করিতে হইলে মোহরের আবশ্যক হয়। বেবিলোনেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। মোহরটি অতি সযত্নে রক্ষিত হইত।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে ইষ্টকদ্বারা গৃহনির্ম্মিত হইত। কোন কোন গৃহের প্রাচীরগুলি বিভিন্ন পশুপক্ষীর চিত্রে নানাবর্ণে চিত্রিত ছিল। ধনী এমন কি সামারিয়ার (Samaria) মত হস্তিদন্তের (ivory) প্রাসাদে বিলাসে কাল যাপন করিত। গবাক্ষগুলি সুশ্রী সূক্ষ্ম যবনিকাবৃত, দ্বিতল গৃহের বহির্ভাগস্থিত সোপানশ্রেণী গৃহখানিকে আরও সুরম্য করিত। কক্ষগুলি পুরুষ ও নারীর জন্য বিভক্ত। গৃহাভ্যন্তরে সাজসজ্জার আর বিশেষ আড়ম্বর ছিল না—মেজেটা একটা ভাল কাপড়ে আবৃত থাকিত এবং বসিবার জন্য দু' একখানা 'আরাম কেদারা'ও থাকিত। সর্ব্বদেশের মত বেবিলোনের দরিদ্র সন্তান এই সব বিলাসে বঞ্চিত, তাহার কর্দ্দম নির্ম্মিত ক্ষুদ্র স্বল্পায়তন কুটীরখানিই তাহাকে শীতের শৈত্য ও গ্রীষ্মের তাপ হইতে রক্ষা করিত। আপন কর্ত্তব্যসাধনই তাহার জীবনের ব্রত ছিল, এবং কর্ত্তব্যসাধনেই সে অতুল সুখ সম্ভোগ করিত। কিন্তু বেবিলোনে ধনী ও নির্ধনের উভয়ের গৃহই উদ্যান বেষ্টিত এবং গ্রীষ্মের সময় বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতেই আহারের বন্দোবস্ত হইত। কোন গৃহ পাট্টা লইতে হইলে পাট্টাদারকে গৃহের স্বত্বাধিকারীর নিকট প্রতিশ্রুত হইতে হইত যে উদ্যানটি সুরক্ষিত হইবে।

বেবিলোনে পশমের পরিচ্ছদই প্রচলিত ছিল। শিরাভরণ ও আজানুলম্বিত পরিচ্ছদই বেবিলোনবাসী পরিধান করিত। ইতিহাসের প্রারম্ভে যদিও বেবিলোনবাসীর নগ্ন-পদ ছিল কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মের দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই যে রাজা Merodoach-nodinokhi কোমল চর্ম্মপাদুকায় সজ্জিত এবং তাহার চতুষ্কোণ শিরাভরণ পক্ষীপালকে বেষ্টিত।

শিক্ষার আদরে বেবিলোনবাসী আদর্শ। সমাজে শিক্ষাবিস্তারে বেবিলোন ইতিহাসের বিশেষত্ব। এবং অধ্যাপক সেইস (Prv Sayce) বলেন "The Babylonians were the Chinese of the ancient world"। অধ্যয়ন ও লিপিতে বেবিলোনজাতি সতত্‌ই মনযোগী। লিপির নিয়মাদি কষ্টকর হইলেও অনেক পুস্তক রচিত হইত। বেবিলোনের কর্দ্দমের উপর লিপিপ্রণালী অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে 'Cuneiform writing' বলে নিকটবর্ত্তী দেশেও অনুসৃত হইল। ঐ যুগে প্রাচ্যজগতে এবম্বিধ লিপিপ্রণালীর দ্বারাই আন্তর্জাতিক কার্য্যাদি সম্পাদিত হইত। বেবিলোনে অনেক পুস্তকাগার ছিল। কিন্তু এই লিপিপ্রণালী শিক্ষা বিশেষ আয়াস সাধ্য ছিল এবং শিক্ষার্থী নানারূপ সাহায্য গ্রহণ করিত। একটী ধারানুযায়ী বিভক্ত হইয়া পুনরায় পংক্তি অনুযায়ী বিভক্ত হইয়া অক্ষরগুলির নামাকরণ হইত। পাঠের জন্য অভিধানের বন্দোবস্ত ছিল। ফিনিসিয়াতে নূতন বর্ণমালার সৃষ্টি হইলে এই Cuneiform writing বর্জ্জিত হইল। সেইস (Sayce) বলেন যে এই লিপিপ্রণালী সেমিটিক (Semitic) দের নহে, সুমেরিয়ানদের Sumerian)। এবং সেমিটিক বেবিলোনে এই সুমেরিয়ান ভাষা লাটিন (Latin) ভাষা। সেমিটিক বেবিলোন শিক্ষার্থীকে শুধু শব্দ চিহ্ন শিক্ষা করিতে হইত তাহা নহে সে সুমারের (Sumer) প্রাচীন বর্ণমালা নানারূপ অভিধান ও ব্যাকরণ সাহায্যে শিক্ষা করিতে হইত। ভাষা শিক্ষা ভিন্ন ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণিতত্ত্ব, আইন ও ধর্ম্ম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। বেবিলোনের শেষ রাজা Nabonidas একজন খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি স্বদেশের পুরাতন গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিতে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। দেবমন্দির মধ্যেই বিদ্যালয়ের ও পুস্তকালয়ের বন্দোবস্ত থাকিত। Strabo বলেন Borstppa বহু সংখ্যক বিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এবং Borsippa র চিকিৎসাশাস্ত্রের বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রধান। পুস্তকাগারে দেশস্থ সকলেরই সমান অধিকার। এমন কি জনৈক রাজপুত্র একপুস্তকাগারের রক্ষক ছিলেন। ইহা দ্বারাই স্পষ্টই প্রতীত হয় যে এইরূপ কার্য্য কদাচ উপেক্ষিত অথবা হীন কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করা হইত না। সাধারণতঃ সকলেই কিঞ্চিন্মাত্রায় শিক্ষিত ছিল এইরূপ বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। আইনসংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদিতে মোকদ্দমাকারীগণ স্বয়ং স্বাক্ষর করিত।

শুধু পুরুষ নহে বেবিলোন রমণীও শিক্ষিত। উল্লিখিত মোকদ্দমার কাগজপত্রে অনেক রমণীগণের স্বাক্ষর পাওয়া গিয়াছে। এবং যুবক যুবতীগণ একই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে কদাচ সংকোচ বোধ করিত না।

বেবিলোনে বহু বিবাহ চলিত ছিল। কিন্তু ধনীই বহুবিবাহে সক্ষম ছিল; নির্ধন শুধু একমাত্র বিবাহ করিয়াই সংসার চালাইত। ধনীর বহুভার্য্যার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সীই গৃহকর্ত্রী হইত এবং তাহার গর্ভজাত পুত্রকন্যাগণ সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিত। স্বামীর পত্নীবর্জ্জনের (divorce) সময় পত্নীকে দণ্ড স্বরূপ অর্থ দান করিতে হইত। সাধারণতঃ স্বামী বিবাহের সময় যৌতুক গ্রহণ করিত। এই যৌতুক স্ত্রীর ভোগের জন্য অথবা বর্জ্জনের (divorce) পর স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য নির্দ্ধারিত থাকিত। স্বামী উহা ভোগ করিতে পারিত না। কিঞ্চিৎ গৃহসজ্জা, দাসদাসী ও অর্থই যৌতুক স্বরূপ স্বামী গ্রহণ করিত। কন্যার পিতা বর্ত্তমান থাকিলে জামাতাকে পিতাই যৌতুক দান করিত, পিতার অবর্ত্তমানে অথবা মাতা পিতা দ্বারা বঞ্চিতা হইলে মাতাই জামাতাকে যৌতুক দান করিত এবং বিবাহ তাহারই মতামত সাপেক্ষ। নিকট আত্মীয়গণের ভিতর বিবাহ পদ্ধতি মিসরের মত বেবিলোনেও আইনসঙ্গত ছিল অর্থাৎ বিবাহ 'incestuous' বলিয়া গণ্য হইত না। বিবাহ 'রেজেষ্টারী' হইত। স্ত্রী আপন সম্পত্তি স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আপন ইচ্ছানুসারে ব্যবসা অথবা আবশ্যক হইলে বিচারালয়েরও আশ্রয় গ্রহণ করিত।

দত্তকপুত্র গ্রহণে বেবিলোন সমাজে কোন বিঘ্ন ছিল না। দত্তকপুত্র গ্রহণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বেবিলোনের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সন্তানের লালনপালন পারিবারিক জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বেবিলোনবাসী স্বীকার করিত।

বেবিলোনের Khammurabi Code এর কিয়দংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে পত্নী বর্জ্জনের সময় স্বামীর অর্থদণ্ড হইত কিন্তু স্ত্রী স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী ও দায়িত্ববিহীনা গৃহরক্ষিকা প্রমাণিত হইলে স্বামী উক্ত অর্থদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। Hall বলেন (৩) যে মিসর রমণীর মত বেবিলোন রমণীও স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার লাভ করিত এবং এমন কি বিচারালয়ে আপন সম্পত্তির রক্ষার জন্য ব্যবহার জীবিদের মত যুক্তিতর্ক করিত। সহজেই বেবিলোনবাসী বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিত। জমি বিক্রয় বা পাট্টা নেওয়া সম্বন্ধেই অন্যান্য দেশের মত সমস্ত মোকদ্দমার সৃষ্টি। Khammurabi Code এতে এই বিষয়ে সুন্দর বিধি রহিয়াছে—'প্রত্যেক একার (acre) অনুযায়ী ভূম্যধিকারীকে প্রজার নির্দ্দিষ্ট শস্য করস্বরূপ দিতে হইত কিন্তু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইয়া ভূমি নষ্ট হইলে সেই বৎসরের জন্য প্রজাকে কর দান করিতে হইত না।'

'অধমর্ণ তাহার ঋণ পরিশোধের জন্য পুত্র কন্যা অথবা স্ত্রীকে উত্তমর্ণের গৃহকার্য্যের জন্য প্রেরণ করিত এবং উত্তমর্ণ তিন বৎসর কার্য্যের পর উহাদিগকে মুক্তি দান করিত; অনেক সময়ে স্ত্রী স্বামীর বিবাহের পূর্ব্বে ঋণের জন্য দায়ী হইতে স্বীকৃতা হইত না অর্থাৎ উত্তমর্ণের গৃহকার্য্য করিত না।'

'কোন ব্যক্তির গচ্ছিত অর্থ কেহ আত্মসাৎ করিলে দণ্ডস্বরূপ গচ্ছিত ধনের পঞ্চগুণ অপরাধীর সেই ব্যক্তিকে দিতে হইত।'

Khammurabi Codeই বেবিলোনের প্রধান সমাজচিত্র। ইহার সহিত অনেক ঐতিহাসিকগণ Mosaic Lawsএর তুলনা করিয়া থাকেন। অনেকের মতে ইহুদীজাতি তাহাদের আইন পদ্ধতির জন্য এই Khammurabi Code হইতে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করে। কিন্তু Khammurabi Code ও বেবিলোনের রাজা Urukaginaর আইনের নিকট চিরঋণী। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই এই বিষয়ে জ্ঞাত

(৩) Hall's The Near East পৃঃ ২০৫।

প্রত্যেক নগরেই একটি বাজার ছিল, বাজারগুলি সুন্দর বিপণী শ্রেণীপূর্ণ। বাজারে বিশেষ জনতা হইত। প্রচুর শস্যাদি, চিত্রিত বস্ত্র, মৎস্য, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও বলীবর্দ্দের বিক্রয়ার্থ বাজারে আমদানী হইত। বস্ত্র ও মৎস্যের দর অত্যন্ত ছিল। বিক্রেতার সমস্ত জিনিষের উপরই বাজার সরকারের নিকট কিঞ্চিত মাশুল দিতে হইত। দিনাবসানে প্রত্যহ বাজারের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা-রাশি পরিষ্কৃত হইত।

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" বেবিলোনবাসীর মূলমন্ত্র ছিল। রাজকীয় পরিবারও ব্যবসা করিতে অপমান বোধ করিত না। রাজা Nabonidasর পুত্র Belshazzar পশমের ব্যবসা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। অর্থলগ্নি ব্যবসাও চলিত। রাজা Nebuchadnezzar এর রাজত্বকালে ২০৲ টাকা সুদের হারে লগ্নি ব্যবসা হইত, দুর্ভিক্ষের সময়ে ১৩৲ টাকা সুদের হার হইত। অনেক সময়ে বিক্রেতাগণ ধারে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তদানীন্তন সমস্ত সভ্যদেশ হইতে বেবিলোনের বাজারে বিক্রয়ার্থ নানারূপ জিনিষের পত্রের আমদানী হইত। বেবিলোন এই প্রাচীন জগতে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। অধ্যাপক Myres বলেন 'বেবিলোন প্রাচীন লণ্ডন।' অবিবাহিতা নারীগণ ব্যবসার জন্য যৌথসমিতি স্থাপন করিত এবং চিরকুমারী থাকিয়া ব্যবসাতেই কালক্ষেপ করিত। Eridu নগরে ও ভারতবর্ষে বাণিজ্য চলিত। ব্যবসা বাণিজ্যে বেবিলোন সত্বরই উন্নত হইয়া এসিরিয়ার রুদ্র প্রতাপ সত্বে ও জগতে অনেককাল স্থান পাইয়াছিল।

সমাজে দাসত্ব প্রথার প্রচলন ছিল—দাসত্ব এই কালে নিন্দার্হ বোধ হইত না। দাস প্রভুর পুত্রবৎ গণ্য হইত এবং আপন বুদ্ধিতাৎপর্য্যগুণে সমাজের নেতৃত্বও লাভ করিত। খ্রীষ্ট জন্মের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার মত বেবিলোন দাসত্ব জীবন ক্লেশকর ঘৃণার্হ ছিল না। প্রভু ও দাসে চিরমনোমালিন্য থাকিত না। আমেরিকার নির্লজ্জ প্রভুদের মত বেবিলোনের প্রভু স্বার্থান্ধ হইয়া দাসকে পীড়ণ করিত না। রাজসরকারই দাসত্ব জীবনের ক্লেশ অনেক উপশম করিতে লক্ষ্য রাখিত। ভদ্রপরিবারে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হইয়া, স্বকীয় প্রতিভাবলে অথবা বিচারালয়ের আদেশানুসারে অনেক সময় দাস আপন স্বাধীনতা লাভে সক্ষম ছিল।

প্রকৃতি পূজাই বেবিলোনবাসীর ধর্ম্ম। বায়ু, জল, অগ্নি, গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহাদের আরাধ্য দেবতা। বেবিলোনবাসী সাকার উপাসক। পূজাকার্য্যে নানারূপ অনুষ্ঠান পদ্ধতি ছিল। হিন্দুদের মত দুই এক শ্রেণীর পশুহত্যা ধর্ম্ম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু স্থানে স্থানে অনেক দেবমন্দিরে বলিদান হইত। ইউরোপীয়ানদের মত এক সম্প্রদায় মঠবাসী সন্ন্যাসী ছিল, তথায় নারীজাতির প্রবেশাধিকার ছিল না। মঠবাসী তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে শিক্ষা দান করিতেন এবং কোন সহৃদয় ধনীর দানেই মঠ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

সেমিটিক বেবিলোনে Baol সর্ব্বপ্রধান দেবতা। Lilat প্রেতাত্মাদের প্রধান। বেবিলোন স্বর্গ পূর্ব্বাকাশে পর্ব্বতশিখরে চিরমেঘাবৃত। নক্ষত্রই সেই অমরপুরীর আলোকরাজি। প্রেতাত্মাদের আবাসভূমি ভূমি গহ্বরে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ধূলিরাশিই আহার সামগ্রী। Baol হইতেই সব উদ্ভূত—রাজার রাজত্ব, নির্ধনের কুটির Baolর দান করুণা। Baol পূজারক সমাজে শীর্ষ স্থানের অধিকারী।

সেইস (Sayce) বলেন* যে শিক্ষিত সমাজ যে উপরোক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিত, এইরূপ বোধ হয় না। বেবিলোন ইতিহাসের শেষ ভাগে ধর্ম্মমত বিষয়ে বেবিলোনবাসীর গভীর চিন্তা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমশঃই বেবিলোনবাসী একেশ্বর বাদী হইল। বিভিন্ন দেবদেবিগণ যে একই ঈশ্বর, ব্রহ্ম এই বিশ্বাস ধীরে হৃদয়াঙ্গম করিল। Erech নগরে বিভিন্ন দেবদেবিগণ যে একই স্রষ্টার রূপান্তর মাত্র এই গবেষণায় সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা Nebuchadnezzar এর দুইটী প্রার্থনার কয়েকটি চরণ এই স্থলে বিশেষ

* সেইসের (Sayce) Social Life among the Assyrians Balylonians পৃঃ ১১৬।

উল্লেখযোগ্য—"হে প্রভু Merodach, তোমার নিকট আমার প্রার্থনা, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বলি, হে ভূপতি, তুমি নিত্য, জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান তুমিই তাহার প্রভু, তুমি আমাকে (রাজাকে) স্নেহ কর, স্বেচ্ছানুযায়ী তুমি আমার নামকরণ করিয়াছ, তুমি আমাকে সততার পথে চালন করিতেছ ...., আমি তোমার আজ্ঞাধীন, তোমারই সৃষ্টি; তুমিই আমাকে অসংখ্য জনের উপর প্রভুত্ব করিতে নিয়োজিত করিয়াছ। তোমার মহিমাতে যেন আমার অনুরাগ থাকে.........।"

Nebuchadnezzar এর বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ও এইরূপ উচ্চ ভাবের পরিচয় নিম্নলিখিত শ্লোক হইতেও পাওয়া যায়————হে পিতা, তুমি চির ক্ষমাশীল, মানবজাতিকে রক্ষা করিতেছে, তুমি আদি সৃষ্টি, সর্ব্বশক্তিমান্, তোমার চিত্ত গভীর, সেই গভীরতা অভেদ্য অবুদ্ধ। স্বর্গে তুমিই শ্রেষ্ঠ, মর্ত্তেও তুমি। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ঘোষিত হইলে স্বর্গীয়পরীগণ প্রণিপাত করে, মর্ত্তে তোমার ইচ্ছা ঘোষিত হইলে প্রেতাত্মাগণ হীনপ্রভ হয়।" ইহাই বেবিলোন ধর্ম্মের সারাংশ।

সমাজ, কৃষক, তন্তুবায়, সূতার, পাচক, বণিক শিল্পী, ভিষক্, ব্যবহারজীবি, গায়ক, লেখক ও পুরহিত দ্বারা গঠিত। সমাজে উচ্চপদস্থ অর্থাৎ ব্যবহারজীবি বা রাজকর্ম্মচারী হইলে অপরাধের জন্য অধিকতর দণ্ড ভোগ করিত। ভিষক্‌দের পারিতোষিক রোগীর অবস্থানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইত। বর্ণভেদ সমাজে অজ্ঞাত ছিল। শিক্ষা ও বাণিজ্যদ্বারা সমাজের প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারা যাইত। সমাজে অশান্তির লেশ মাত্র ছিল না। বেবিলোনবাসী ব্যক্তিগত জীবন গঠন করিয়া সামাজিক জীবন উন্নত করিয়াছিল। রাজা Urukagina Khamnurabi ও Nebuchadnezzar ইতিহাসে অমর হইয়াছেন। Breasted যখন মিসর সম্রাট Ikhnaton কে বলিলেন (৬) "the worlds' first idealist and the world's first in dirdual" Hall প্রতিবাদে যথার্থই বলেন (৭) যে বেবিলোনের Urukagina ও Khamnurabi র ও Ikhnaton এর এই প্রশংসায় তুল্য অধিকার। এসিরিয়া বিদ্যুৎ বহ্নির মত জগতকে আলোকিত করিয়া ক্ষণেকপরই নির্ব্বাপিত হইল, বেবিলোন ধীরে প্রকৃত উন্নতির পন্থা অনুসরণ করিয়া শত শত বৎসর পশ্চিম এসিয়াকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। সহস্রাধিক বৎসরাতীত হইলেও বেবিলোনের পুণ্যস্মৃতি আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের অন্তরালে জগতকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। বেবিলোন সমাজ এসিয়া ও ইউরোপের আদর্শ। বেবিলোন বর্ত্তমান মহাসমরের রণক্ষেত্র—ইহাই কালের স্থিতি। কালই অজেয়, সর্ব্বশক্তিমান।

শ্রীসুনীল কুমার দত্ত।

৬ Breas fed's A Hist to Egypt পৃঃ ৩৯২।
৭ Hall's The Near East পৃঃ ২২৮।

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
„ Sir S. P. Sinha, Kt.
Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
F. C. French, Esq., C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A
„ Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M. A.
„ W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
„ T. T. Williams M. A., B. Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M. A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.

The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The „ Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
„ Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra
„ Jagadananda Roy.
„ Binoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

সূচী

THE DACCA REVIEW.

VOL. VII. | DECEMBER, 1917. | No. 9.

SCIENCE AND RELIGION.

In a recent issue of this magazine the following words occur in an article written by K. K. Gangulee B. A :—

"All the advancement of Science and Philosophy of Modern civilization has been retrograde, tending at every forward step only to throw the mind of man away from the service of God."

It is not my purpose in the present paper to criticise the above article but rather to correct an impression that leaves its mark on the minds of a large number of people. Scientific facts, scientific beliefs, and scientific tendencies are often used by non-scientific people in a most unscientific way to uphold any peculiar doctrine which they themselves wish to believe. Nowhere has this been manifested more fully than in religious controversy and discussion. The antithesis of science and religion has ever been and is still a favourite theme of the anti-religious propagandist. On the other hand, we find the followers of particular systems of belief using scientific facts and knowledge in a most extraordinary way in order to justify themselves and condemn others. Unfortunately the ordinary man possesses such a meagre knowledge of science that he is unable to distinguish between the often wild speculations of the publicist, possessed of a superficial knowledge of modern science, and the guarded interpretations of the well-versed scholar. I have heard here in Dacca, a learned lecturer, cultured and scholarly in his own particular domain, give an interpretation of modern scientific knowledge which no one thoroughly acquainted with the subject would have dared to have given.

It seems desirable therefore to state as briefly as possible the relation between science and religion and to analyse the above statement that science in its modern developments throws the mind of man away from God.

In the first place it ought to be clearly understood that as far as the laboratory, the class room and the text-book are concerned, Science has nothing to teach us directly about God. About first causes it tells us, and can tell us, nothing. It takes things as they are, analyses and synthesises, establishes relationships and makes intelligible what would otherwise be a mass of heterogeneous, disconnected, and incomprehensible phenomena. It enables us to utilise observation and experiment to our advantage. It takes the complicated and amazing complexities of the universe and explains them in simple and comprehensible elementary facts. But about its reasons for the existence of the most elemental parts into which we can analyse anything, science tells us and can tell us nothing. Any interactions that have taken place between science and religion have been the result, not of what science has discovered about God and creation, but of the interpretation of scientific knowledge in relation to some *peculiar* and often unimportant conception of God and the universe. None would be so foolish as to expect to be able to demonstrate the existence of God by a peculiar combination of acids and alkalies in a chemical laboratory; but people often speak as if science were able to do this. And yet, while Science gives us no direct knowledge of God, it is an undeniable fact that the progress of science during the last seventy years has had an extremely important effect upon the place religion occupies in the life of man. The reason for this is not far to seek. Religion expresses itself through the medium of particular creeds, and in the inception and growths of these peculiar faiths there are, gathered around the fundamentals, innumerable details which are not really essential to the faith. Recorders of religious history are not historians nor are they scientific investigators. Religion is such a vital part of man's nature however that, in process of time, every single detail—legendary, metaphorical, or actual—recorded in relation with their religious founders and beginnings is regarded as a record of fact. As often as not the truth and usefulness of their creed is thought to depend upon the literal truth of every detail associated with it; and more astounding still, the reality of religion is made dependent upon the literal accuracy of often quite unimportant statements.

When therefore, in the progress of learning, Science apparently proved that many of the statements of history and scientific fact found associated with particular creeds were historically inaccurate and scientifically unsound, it became quite a common saying that science was disproving all religious tenets. In the West, men of the type of Blatchford seemed to take a delight in upsetting the faith of uneducated people, and prostituting science to an illegitimate use by carrying it into

realms with regard to which it says and proves nothing.

It comes as a shock to every sincere believer to learn that the theories and facts, in which he has firmly believed from childhood, are not strictly true, and that he must re-adjust his conceptions so as to fit them in more exactly with modern knowledge. And it is not surprising that, in the first shock, there is a great danger of faith and religion being relegated to the part of an interesting historical theory. The West has survived that shock however, and it is no longer true to say that science is weakening religious faith. Indeed as far as science itself is concerned it never was wholly true. None can understand the real significance of science better than the men who have made known its glories. And yet a perusal of the names of those who have led science—reveals the fact, that by far the greater number of them were not only not atheists, but were adherents of some definite form of faith. One or two scientists *e. g.* Huxley and Haeckel definitely attacked *current* religious beliefs, and the opinion was generally held that they were speaking in the name of Science. Such was not the case however and against the very few who in the West repudiated the Christian faith one must set such names as Kelvin, Rayleigh, Maxwell, Herschell, Davy, Faraday, Stokes, Thomson, Rutherford, Bottomley, Lodge, Lord Lister etc., all of whom saw not the slightest inconsistency between the tenets of their religious and their scientific beliefs.

Even Huxley, who perhaps more than any one created unrest in people's minds, even he was not an atheist. He was an agnostic, who declared that it was impossible to know anything about God. Indeed it has been said of him that he was intensely spiritual, and that, in his keenness in the search for truth, he was as truly religious as any man of his time.

Modern science realises its own limitations and no more striking proof of the non-existence of antipathy between science and religion can be found than the present day attitude of scientists. Almost without exception they have declared their belief in God, and moreover many of them have asserted, that their scientific investigations have only made more firm their faith in the power and existance of God. Those who read one or two popular articles by pseudo-scientists, may think themselves in a position to do without God, but the revelations of modern science, the new wonders of the universe opened out for the first time, and the magnificent conceptions given to us by recent investigations, merely throw us back to the position of the Psalmist of old, "My God. How wonderful thou art."

The casual observer may appreciate the beauty of the heavens and think of it as God's handiwork, but what of the conceptions which the astronomer

holds? He alone can realise the grandeur of the external universe, the vastness of the worlds above, the wonderful workings of the inviolable laws that hold them in equilibrium, the immensity of the space through which each rushes with incredible speed on its destined path, the certainty with which sun, moon, earth, stars and planets harmoniously work together, and the wonders revealed by the telescope. The conception of a moving universe, stable in its motion, and overwhelming in its immensities is infinitely more grand than the old ideas devoid of law and unity. Indeed so wonderful in its revelations is the whole astronomical system that one scientist exclaimed "the undevout astronomer is mad."

So it is with the worlds revealed by the microscope. The multitudinous forms of life invisible to the naked eye but manifest to the microscopist—the exquisite forms and colours of the constituent parts of what to the ordinary observer are mere unbeautiful masses—these do not alienate one from the belief in a creative force behind all, but rather bring one in reverence nearer to God. True, just as there are some to whom the glories of nature, the beauty of sunrise and sunset, and the appeal of the world to the æsthetic senses call in vain, so there are a few soulless scientists who, in the unravelling of the facts they investigate, give no response to the wonders revealed. But the effect of a deep study of science upon the average man is to deepen his faith. Everywhere he finds law and order—everywhere he discovers things inexplicable save for the postulation of the Existence of some Supreme creative power.

The india-rubber tree takes a few simple ingredients from the air and earth, without effort and without help, and makes india-rubber—a substance which all the ingenuities of modern science have failed to reproduce. The Cinchona tree takes the same ingredients and gives us quinine, the Coffee tree gives us coffee—a Fourth plant indigo, a fifth cotton, and so on. All these different substances are made of the same elements but how does the plant do it?

Liebig—the great chemist—when asked the question "Do you think that grass and flowers grow by mere chemical forces?" replied "No, no more than I believe that a book on Botany describing them could grow by mere chemical force. They both need a designing and directing power." The modern phycisist has revealed the atom as a miniature world of its own. He has shown the essential similarities which underlie all different forms of matter. He has analysed creation not completely, far from it—but partially—and we are lost in wonder, as we realise to the limits of our comprehension the marvellous way in which matter is built up. But exactly as the critic knows that the picture—poem—or architectural

structure which he analyses was created by some artist, so the physicist knows that no blind cause could have resulted in such wonderful laws and such homogeneous though complicated structures. Maxwell—the real discoverer of wireless telegraphy and one of the greatest of the world's Physicists once said, "I think Christians whose minds are scientific are bound to study Science that their view of the Glory of God may be as extensive as their being is capable of." So it is in all branches of Science—the revelation of fresh wonders—the discovery of fresh laws and the unfolding of new worlds, enhance the glory of the creation.

The reflections of the scientist upon the state of mankind further serve to make him appreciate the power and wonder of God. In his own world he sees perfect harmony, perfect unity, and perfectly smooth working of inviolable laws. The only part of the universe not amenable to, and not living in conformity with law is man. After centuries of so-called civilization in the East as well as the West—he sees mankind struggling in vain to make and obey laws whereby harmony may result. On every hand he sees ghastly failure. In international relationships, inter-communal relationships, in family relationships—chaos, confusion and bitterness and then he turns to his laboratory and studies his science, and at once he finds law and order. From the most minute organism that is revealed by the microscope, to the ordinarily invisible worlds that float in the heavens.

One is the result of man's efforts, the other—what can he say? Here, in India, the effect of scientific thought has not yet been fully felt. That it will be is certain. In the faiths of this country, as in those of others, there have grown up and become established as facts, myths, legends, and beliefs that will not stand modern investigation. The scientific spirit will refuse to believe in illogical and disproved theories, but science will never weaken faith in a Creator. Your young men will grow apathetic to beliefs held dear by their parents, but if they study aright and think *deeply* enough, their thought will give them a faith deep, and more lasting than that which they lose. Because we cannot comprehend to the full what is infinite and invisible, there must ever be changes in our religious conceptions. Only a dead faith can remain unchanged and unchangeable, and the advance of knowledge—in metaphysics, —in science, in all realms, must inevitably react upon our theological doctrines. But alteration of our views about God does not disprove the existence of God any more than the modern view of the atom—so vastly different from that held twenty years ago—disproves the existence of the atom. If there be progress and evolution of any kind, it is inevitable that the average mental ability of one generation

should be higher that that of the preceding one. The faiths of old must therefore change—perhaps not in essentials but certainly in details—and in so far as scientific knowledge and scientific investigation reveal facts, and develop critical powers which destroy certain beliefs, Science will react upon religion; but the reaction will be beneficial. A Faith is no less dear or valuable because it is satisfactory mentally as well as spiritually, and because in all its details it does not tally with conceptions held two, three, or four thousand years ago. If Science tends to destroy, it can also build up; and the fact that the first destructive phase of the inter-relationships of science and religion is, in the West, past, means that, in the light of modern knowledge, there is no antipathy between the two. People may no longer believe in God as conceived by their forefathers in bygone ages, but they believe in God.

What science has achieved for those who have come under its influence is the destruction of a placid acquiescence in by-gone creeds, and no one can deny but that this is good. This destruction merely paves the way for the building up of a faith that shall withstand the questioning of the mind, as well as satisfying the cravings of the heart.

Science will not alone build up that faith, but it will not oppose it. Those people who wish to preserve unchanged, and unchangeable, incomprehensible and devitalized, the creeds of the past have just cause to bewail the spread of knowledge whether of science or arts. But in India, and elsewhere, those who wish to see their people truly religious and sincere should welcome and not bemoan the advent of scientific knowledge and scientific investigation.

"A star mist and a planet, a crystal and a cell.
A jellyfish and a saurian, then caves where cavemen dwell.
Then a sense of law and beauty; and a face turned from the sod.
Some call it evolution, and others call it God.

Sir Francis Bacon, writing at a time when little was known of science, says in his essay on Atheism :—

"A little philosophy inclineth man's minds about to religion; for while the mind of man looketh upon *second* cause scattered, it may sometimes rest in them and go no farther; but when it beholdeth the chain of them confederate and linked together, it must needs fly to Providence and Deity." The same can be said of Science. James Russell Lowell writing during the last century says :—

"For Humanity sweeps onward; when today the martyr stands
On the morrow crouches Judas with the silver in his hands;

... ...

'Tis as easy to be heroes as to sit the idle slaves
Of a legendary virtue carved upon one fathers' graves
Worshiphers of light ancestral make the present light a crime.
Was the Mayflower launched by cowards, steered by men behind their time?
Turn those tracks towards past or future, that make Plymouth rock sublime;

... ...

But we make their truth one falsehood thinking that hath made us free
Hoarding it in mouldy parchments while our tender spirits flee
The rude grasp of that great impulse, which drove them across the sea.
They have rights who dare maintain them; we are traitors to our sires
Smothering in their holy ashes Freedom's new lit altar fires;
Shall we make their creed our jailor?

... ...

New occasions teach new duties; Time makes ancient good uncouth;
They must upward still, and onward, who would keep abreast of Truth

... ...

Truth for ever on the scaffold, wrong forever on the throne—
Yet that scaffold sways the future, and, behind the dim unknown,
Standeth God within the shadow, keeping watch above His own."

Science, and the advance of knowledge generally will cause many heartburnings amongst the thoughtful of India. If men are true to their conscience, Science will make people suffer for their convictions, but it will not alienate them from God. It will burn the mouldy parchments of the past with reverence, only to make more prominent and vital the essential and eternal truths of Religion.

WALTER A JENKIS.

WHAT IS DEATH ?

I

Revived by one refreshing shower,
A solitary fainting flower
Upraised its drooping head,
While I myself, in solitude,
Was wand'ring, in a gloomy mood,
And thinking of the 'dead'.

II

Tho', one by one, my friends are flown,
And I now walk my path alone,
I do not yield to grief,
But seize the moments of my leisure
To think of them with pensive pleasure
That gives me great relief.

III

Death, that we dread, is rest and peace
At whose sweet touch our troubles cease,
And do not come again.
When, driv'n by illness, toil and care,
A hopeless man sinks to despair,
Who soothes his sense of pain ?

IV

Like wither'd petals of a rose
The soul discards her tather'd clothes,
And flits across the skies
To some green bower in whose recess,
Without restraint or heaviness,
In ecstasy she lies.

Far far above our weary strife
There is another stage of life
Conceal'd behind a screen.
That, even in the strongest light,
Obstructs the keenest human sight,
And keeps the 'dead' unseen.

VI

To dust returns dust, as it must
But what about the sentient dust,
That feels, and moves, and speaks
And free from suff'ring and distress
And more alive to tenderness,
Its dearest kindred seeks ?

THE GLORIES OF THE SANSKRIT LITERATURE.

VII.

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্তেশ্চ ॥
তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য ।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ ॥

সাংখ্যকারিকা ।

"From the facts that Prakriti or Primordial Matter—which is devoid of consciousness—being a composite or compound body, must exist for the enjoyment of something else, which is not composite, is not constituted of the three qualities of Satwa, Rajas and Tamas, is the presider of matter and hankering after salvation or separation from matter, it follows that there is such an entity called 'Purusha' which is a mere witness, single, indifferent, observer and non-active"—Sankhya-karika.

Vachaspati Misra remarks:—সংঘাতত্ব

সম্ভূয়কারিত্বম্, অনেকবস্তুঘটিতত্বং বা। অত্র সঙ্ঘাত-সংহতশব্দৌ তুল্যার্থৌ। পুরুষোঽস্তি অব্যক্তাদের্ব্যতিরিক্তঃ কুতঃ সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ। অব্যক্তমহদহঙ্কারাদয়ঃ পরার্থাঃ সঙ্ঘাতত্বাৎ শয়নাসনাভ্যঙ্গাদিবৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া অব্যক্তাদয়ঃ সর্ব্বে সঙ্ঘাতাঃ। ত্রিগুণত্বাদয়োহবিপর্য্যাঃ সঙ্ঘাতত্বেন ব্যাপ্তাঃ।

ইতি তত্ত্বকৌমুদ্যাম্।

We have said before that the Sankhyists by their assumption of a plurality of 'Purushas'* probably mean the same as the 'Jivas' of the Vedantists, as the characteristics of the 'Purusha' described here and in other places of the Sankhya-Darsan are self-contradictory on such an assumption. This assertion based on certain inferences of the Sankhyists has been greatly controverted by the adherents of the Vedantic system of philosophy, both ancient and modern. In fact it is the weakest point of the Sankhya system of philosophy. Even so erudite and impartial a critic as the late Dr. Max Muller, being struck with the incongruity of the assumption and definition of 'Purushas' was compelled to remark thus in his "Six systems of the Hindu Philosophy":—"If the 'Purusha' was meant as absolute, eternal, immortal and unconditioned, it ought to have been clear to Kapila that the plurality of such a 'purusha' would involve its being limited, determined or conditioned, would render the character of it self-contradictory. Many 'purushas' from a metaphorical point of view, necessitate the admission of one 'Purusha'; because if the 'purushas' were supposed to be many, they would not be 'purushas' and being 'purusha' they would by necessity cease to be many."

The fact is that the Sankhyists, who are somewhat agnostic in their principle, denying the necessity of any assumption of the existence of a Supreme God as the First cause* have

*জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব।

সাংখ্যকারিকা।

Nilkantha, the commentator of the Mahabharatam, in commenting on verse II of ch. 315 of Cantiparva remarks :—

পুরুষাণাং নানাত্বমিত্যাহুর্নিরীশ্বর সাংখ্যাঃ।

ইতি ভারতভাবদীপে নীলকণ্ঠঃ।

* Sankhya system of Philosophy is classified into two kinds viz Seshwara or with God and Niriswara or without God. That which is ascribed to Kapila of Agni-vansa is said to be 'Niriswara Sankhya' while the other branch alled 'Seshwara Sankhya' is said to have been promulgated by Kapila, the son of Debahuti and Rishi Kardama. (vide 'Dacca Review' vol III. No. 3, June, 1913. P. 93) The system of philo sophy known as 'Patanjala Darsan' which is a practical exposition of the tenets inculcated in the 'Sankya Darsan' is also known as 'Seshwar Sankhya Darsan, because it admits the existence of a non-active Supreme Deity and defines it as a special kind of 'Purusha' devoid of pleasure, pain, activity and its effects and desire. "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" ইতি পাতঞ্জলদর্শনম্। In the Sankya-karika, not a word is said of Iswara or the Supreme Deity, unless He be included in what is said about the 'Purushas.' In the 'Sankhya-Darsan' of Vijnana-bhikshu (বিজ্ঞানভিক্ষু) there is a Sutra to the effect that the existence of a Supreme Diety is beyond proof: ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। সাংখ্যদর্শনম্—১ অঃ—

made an awkward bungling of the characteristics of the two Souls—the Universal or Paramatma and the individual or Jivatma, by superimposing the characteristics of the former on those of the latter. Granting then, that the 'Purusha' of the Sankhyists is the same as the 'jiva' of the Vedantists and that the characteristics of the Paramatma have been superimposed by the latter on those of the 'jiva' or 'jivatma' of the Vedantists it is possible by an elimination of these adventitious characteristics to reconcile the views of the two systems of philosophy with regard to the active interference of 'jiva' or 'Purusha' in bringing about various changes of matter. Although Vedantists do not admit many of the characteristics of Prakriti or Primordial Matter described in the Sankhya system of Philosophy, they do however agree with it in holding the composite or compound nature of Prakriti and the singleness or simplicity of soul or consciousness *per se* as in the following texts quoted below :—

(১) অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি-মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বং—বৃহদারণ্যক, ২অ, ৫ব্রা, ১৪শ অনুবাক্। Nityanandasramamuni in explaining the above text of the Sruti thus remarks :—যশ্চায়মাত্মা পরিশিষ্টো বিজ্ঞানময়োঽসংহতবাংশ্চেতন তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ। That is to say, this residuary soul which is full of knowledge, consciousness *per se*, non-compound, spiritual and immortal is identical with the eternal, everlasting and all-powerful Brahma or Universal Soul. The qualificatory word অসংহতবান্ means that which is not composite or compound but simple and as it is the specific characteristic of চিৎ (chit) or consciousness *per se* it follows that অচিৎ (achit) or matter must be compound, because these two entities make up the entire universe.

(২) আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত। শ্রুতিঃ। * The word 'ap' (অপ্) of the Sruti-text is explained by Nityananda Muni as the subtlest material seed of the universe compounded of all material elements in their super-subtlest stage. It is in fact said to be the same as the অব্যাকৃত or Primordial Matter of the

১২ পৃ। A very good synoptical account is given of the Theistic Sankhya in Skanda III. Chaps. 26-33 of the Srimadbhagavatam.

* The commentary of Nityananda is quoted here :—আপঃ পয়ঃসোমাদ্যাত্মিকা দ্রবাত্মাঃ সূক্ষ্মভূতা ভূতান্তর সহিতা অপঞ্চীকৃতা অব্যাকৃত নাম্নাঽবস্থিতা এবেদং সর্ব্বং বিকারজাতং জগদগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমাসুর্নান্যৎকিঞ্চিৎ। তা উক্ত লক্ষণাঃ পুনরাপঃ সত্যং সূত্রাত্মকং হিরণ্যগর্ভমসৃজন্ত সৃষ্টবত্যঃ। ইতি বৃহদারণ্যকব্যাখ্যায়াং নিত্যানন্দমুনিঃ।
Also compare :—

আপো হ যদ্ বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষে
বিধেম।
ঋগ্বেদসংহিতা।

Where 'Agni' is the same as Hiranyagarbha and 'Apas' the same as Primordial matter or Avyakrita (অব্যাকৃত).

Sankhyists†. Nilkantha, the commentator of the Mahabharatam explains the word 'ap' occurring in verse 22, ch. 188 of the Santiparva (আপোময়মিদং সর্ব্বং আপোমূর্ত্তিঃ শরীরিণাম্) as সূক্ষ্মভূতসঙ্ঘাতঃ or that which is a mixture of the subtle elements. It is also noticeable that in the Sruti-text cited here, the word 'ap' is used in its plural form with a plural meaning.

(৩) তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা। পঞ্চদশী। Prakriti which is a compound of the three qualities, Satwa, Rajas and Tamas is of two kinds—Panchadasi.

(৪) একমেবাক্ষরং প্রাহুর্নানাত্বং ক্ষরমুচ্যতে। মহাভারতম্। The Rishis say that 'akshara' or universal soul is one without a second, while plurality or compositeness is characteristic of everything else—Mahabharatam. Nilkantha's commentary on the verse is worth perusal and is quoted below :—এতৎক্ষরাক্ষরনির্দ্দেশনং জড়াজড়বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং। একমে

† The word 'avyakrita' (অব্যাকৃত) as used in the Sruti and the Smriti texts is but another name of the Principle called 'Prakriti or Pradhan' or Primordial Matter as explained in the following text :–

অব্যাকৃতম্ প্রধানং হি তদ্রূপং পরমেষ্ঠিনঃ। লিঙ্গপুরাণম্।

The word 'ap' (অপ্) generally signifies water but is sometimes used in the Srutis as equivalent in meaning to কারণজল or the fluid substance, which was the original form of all material elements subtle as well as gross ("আপো বা ইদং সর্ব্বং বিশ্বাভূতানি" ইত্যুপক্রম্য "ভূর্ভুবঃস্বরাপওমিতি" অব্যাকৃত অপংকারণত্ব তদর্থম্বাহ ইতি ভারতভাবদীপে নীলকণ্ঠঃ।) It is also used as a synonym for অব্যাকৃত or প্রধান or তমঃ (Tamas). The last word is analogous in meaning with the English word '*Chaos.*' *Mr. John Whitehurst* F. R. S. thus explains the rationale of the fluidity of the chaos :—"The, fluidity of the earth manifestly implies that the particles of matter which now compose the strata and all other solid bodies, were not originally united, combined or fixed by cohesion, but were actually in a state of separation (তমো বৈ মৃত্যুঃ also নৈবেহ কিংচনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদং আবৃতমাসীৎ। শ্রুতিঃ। Where মৃত্যু is the same as the state of separation) as particles of sugar or salt dissolved in water.

"Whence it appears that when the component parts of the earth were first assembled together, they were in a state of uniform suspension and seem to have composed one general undivided mass or pulp of equal consistence and sameness in every part (তমঃ আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ। ইতি শ্রুতিঃ। Nilkantha explains অপ্ or সলিলং as ব্রহ্মভূতস্যাপ্যর্থ্যাসলিলশব্দেনোপাদানাৎ একার্ণবমবিভাগে ইত্যর্থঃ। In another place as সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবতীতি শ্রুত্যা পরাবরবর্জিত-সলিলাত্মেন নিরূপিতে অদ্বৈতব্রহ্মণে ব্যাখ্যেয়তে। ইতি ভারতভাবদীপে নীলকণ্ঠঃ।) from its surface to its centre; and therefore constituted that particular state and condition of the earth which the ancients have named 'chaos' and have described as a confused mass or pulp, composed of all the elementary principles blended together and without form and void. That is to say, the chaos had not as yet acquired an oblate spheroidal form and the component parts thereof were void of that arrangement which constitutes bodies of different denominations (তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত। *শ্রুতিঃ।) as air, water, stones, minerals* etc. but the whole mass composed of the various elementary principles blended together in one confused heap."—Quoted in Ritchie's "Dynamical Theory of the Earth Vol. I."

হি বিনাশহেতোর্দ্বিতীয়স্যাভাবাদক্ষরত্বং অবি-নাশিত্বং যুক্তং নান্যস্য তু ক্ষরস্যেব। তথা চ প্রয়োগঃ, "প্রধানাত্মনিত্যং ব্যস্তত্বাৎ ঘটাদি-বদিতি।" "ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ" ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং তত্ত্বং। ইতি ভারতভাবদীপে নীলকণ্ঠঃ। The sum and substance remark being that unless consciousness *per se*, which is non-matter is assmue to be a simple entity or one without a second, it cannot appropriately be called 'Akshara, or indestructible, for whatever is composed of two or more things is liable to destruction or dissolution. As all kinds of matter, including 'Pradhan or Primordial matter' are liable to dissolution, therefore they must be composite in character and are therefore aptly called 'kshara' or destructible. Hence in the Sruti and the Smriti texts the two principles matter or Achit and Soul or chit are respectively called 'kshara (ক্ষর) and 'akshara' (অক্ষর)—Nilkantha. The same sentiment finds expression in sections 13-15 of ch. IV. Brah. 5th of the Vrihadarnyaka, but is too long for quotation here.

(5) সাক্ষীচেতা কেবলঃ নির্গুণশ্চেতি। শ্রুতিঃ॥
That is to say Universal Soul is only a witness, consciousness *per se*, *single* and devoid of any quality—Sruti.

(6) নির্ব্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ।
বুদ্ধৌ ঝটিতি শাস্ত্রোক্তা আয়োহন্ত্যবিবাদতঃ॥
পঞ্চদশী॥

Unchangeability, non-attachment, eternity, self-sufficiency, singleness and perfection, which are described in the shastras to be the principal characteristics of the Universal Soul are soon reflected on the intellect of the person who attained to that kind of meditation called Nirvikalpa (নির্ব্বিকল্প)—Panchadasi.

(To be continued.)

GOVINDA CH. MUKHERJEE.

"Of the earth (referring to the 2nd verse of Genesis) it is said that it was "*thohu*" and '*bohu*'; of the '*thchom*' that there was darkness on its aspect ; and of the '*waters*' that they were subject to the vital energy of the spirit of God (আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং মম তৎপূর্ব্বং অতো নারায়ণোহহম্। মহাভারতম্॥ also অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। মনুসংহিতা॥ বীজম্—চিচ্ছক্তিঃ ইত্যর্থঃ।) Now the 'thchom' here mentioned seems to be used in a wider sense than as an appellation of the deep sea or the bottomless places for it is separately distinguished from the waters. It has probably here a more primitive meaning than that which is implied in its etymological relation to '*thohu*' namely, a boundless space and is used to denote space, that which is boundless, not in one, but in all its dimensions, not the deep but the vast" (তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীদিতি যস্য তুচ্ছত্বাভাবাসদ্বিলক্ষণেন বিধানবৎ, চিত্তত্ত্ব "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা-সহ" ইতি বাঙ্মনসাতীতত্বাদস্থানবৎ। ইতি ভারতভাবদীপে নীলকণ্ঠঃ॥)—Presbyterian Review on Fairholme's Geology.

Moreover, the word 'ap' (অপ্) as used in these Sruti-texts cannot mean the element 'water,' for they are all unanimous in holding that the element 'water' even in its subtlest form called Rashatanmatram (রসতন্মাত্রম্) was the sixth in the order of evolution from Prakriti or Primordial matter.

RECOLLECTIONS AND REFLECTIONS.

BY C. L. G.

Editors may be divided into two classes, those who write and those who edit. The purely editing editor, who confines his energies to giving instructions, revising articles, keeping in touch with the people who count, and generally dominating the situation in his office, is becoming rather a rare bird nowadays. But some of the very greatest of the tribe belonged to this class—Delane in particular, who during the whole tenure of his editorship of the *Times* did not write more than two or three articles. As compared with the product of some leader-writers, his contribution was infinitesimal; but volume is no sure criterion of value, though Vauvenargues tells us that *les meilleurs auteurs parlent trop.* There is a story of the Rev. Thomas Mozley, who for many years wrote leaders for the *Times*, submitting a book to a publisher, who asked him if he had ever published anything before. Mozley replied, 'Two volumes of sermons, and about seven thousand leaders in the *Times*.' But Delane was no *roi fainéant*, as may be learned not only from the biography written by his nephew, but from the very interesting paper of reminiscences contributed a few years ago to the *Cornhill* by Dr. Wace, the Dean of Canterbury, who was formerly one of Delane's leader-writers. No one kept a firmer hand on his staff or acted more consistently in accordance with his conception of the duties and responsibilities of an editor. Any irregular intervention he strongly resented, and he occasionally turned the tables with deadly effect on the intervener. Thus it is told that a wellknown journalist, who in his earlier days was an occasional contributor to the *Times*, was asked by the head of a firm of brewers if he could procure the insertion of a paragraph describing the festivities held at the coming of age of the brewer's eldest son. The journalist promised to do his best, wrote an account of the celebration, and submitted it to a friend on the staff of the paper. It was set up in type and included in the 'make-up,' but unfortunately at the last moment it caught the eye of Delane. As we have seen, he hardly ever wrote for his paper, but he often supplied piquant headings to items of news, and so the unfortunate paragraph duly appeared under the title, 'Ale Kings at their Revels.' Some highly efficient editors, while showing a remarkable *flair* in the choice of writers and in controlling their pens, have abstained from writing because they could not write. There was one who wrote such an extraordinarily bad hand that it was said to be a deliberate device to conceal his inability to spell. Delane wrote in an admirably trenchant style, as his letters abundantly prove; his abstention was

simply due to his belief in the Napoleonic maxim, '*Il faut se borner.*' Other great editors in the past were contributors to their own columns, and of these perhaps the most notable were Russel of the *Scotsman*, and Hutton and Townsend of the *Spectator*, who for many years between them wrote the greater part of the paper. Their partnership was a remarkable instance of the loyal and effective collaboration of two men who differed widely in temperament, and yet, unconsciously no doubt, approximated so closely to each other in expression that even constant readers were often mistaken in the ascription of their articles. Nothing could have been more unlike than their handwritings. Hutton wrote a minute and sketchy hand, while Townsend's characters were large and round, like those of a schoolboy. When he went out to India in the 'forties' to join the staff of the *Friend of India*, Townsend's handwriting was so bad that the compositors registered a formal protest. He consulted his chief, Mr. Marshman, who advised him to double the size of his script. He took the advice, acted upon it to the end of his life, and never gave any more trouble to the compositors. As a cure for illegibility the device is worth recording, but nowadays dictation to shorthand writers and the use of the typewriter renders its adoption less needful. The evils of dictation, unless the product is regarded as a rough draft to be rigorously revised and condensed, are too obvious to call for comment. People who dictate are rarely self-critical. But the convenience of being able to read contributions in type-script instead of manuscript is very great. An editor can arrive at a decision in half the time taken in mastering an unfamiliar handwriting. At the same time, the typewriter obliterates the personal note in the look of a contribution. It is impossible not to form a sort of general idea of a contributor from the look of his manuscript. Some handwritings are positively repellent, but calligraphy is not always a proof of mental power. Scholars are nearly always recognisable from the influence of writing much Greek, and, to speak broadly, a well-turned-out manuscript is generally worth reading.

The outside contributor is a strange animal. He will sometimes send a contribution four or five times the maximum length of the articles which appear in the paper he approaches. And the nature of the article submitted often shows a complete disregard or ignorance of its views or tendency. Journalists who study these points and have something to say are bound to succeed. No diplomas are needed in journalism. Any editor worth his salt is always on the lookout for talent, and ready to acknowledge and enlist it. There have been editors, as we have seen, who, without being scholarly themselves, have had an unerring instinct in the choice of men who wrote well and could be trusted to

maintain the literary quality of the paper at a high level. Others, less self-protective and more negligent, have never troubled themselves about such niceties. I remember as a boy, when Tyndall delivered his famous presidential address at the meeting of the British Association at Belfast and fluttered the clerical dove-cotes, how a clergyman wrote in protest to the Dublin *Daily Express*, and signed himself, using English characters, *Tou gar kai genos esmen.* Unluckily his handwriting was not very clear, and the signature appeared as *Ton gar koi geros soner.* A couple of days later another letter appeared, the writer of which alluded to 'Your correspondent Mr. T. G. K. Soner.' Even in these days of anti-classical reaction and tirades against the futility of schoolboys learning Greek, I doubt whether such a blunder would have appeared in a paper of any standing. But editors are not always infallible. It is not so long since a London daily was imposed on by an ingenious contributor, and printed on the 1st of April an article describing in great detail some new mechanical invention, full of 'bosh' technical terminology of the most delicious absurdity; while another journal within the last fifteen years or so published a letter on the habits of a bird at a zoological garden in South Africa which was boldly described as a 'semi-Bombay duck.'

Later still the charming fantasy which Sir J. G. Frazer (the author of *The Golden Bough*) prefixed to his selection of Addison's Essays was regarded by one reviewer as a record of experiences which had actually taken place. An editor should not be grossly ignorant or credulous, but personally I should be sorry to see the tribe so perfectly equipped by knowledge and scepticism as to be proof against all the arts of the literary hoaxer. They are sometimes illegitimate and cruel, but there are occasions on which they simply minister to mirth. The most perfectly successful and the most riotously ludicrous of these impostures is that related by Mr. Eric Parker in his delightful *Eton in the Eighties*, when he describes how for months a group of clever Eton boys supplied the editor of a London magazine with correspondence describing the special games, customs, etc. at Eton. These letters were triumphs of circumstantial absurdity, and, to crown all, the editor was actually invited down to Eton, where some of these bogus customs were enacted for his edification. The history of this hoax is recorded in a little volume unhappily out of print, but the full story remains to be told, and when the name of the editor is disclosed, amusement will give place to wonder and—in some quarters—to intense delight.

My experiences of editors who really edited their contributors' articles have been diversified, but, with one notable exception, they have inspired me with gratitude. I don't suppose I ever wrote

anything which did not gain from condensation; and when, in the exercise of editorial functions, I have had to retrench my own work to meet the demands of the make-up—'Please cut out twenty-four lines,' or half a column, or whatever it was—the process, though sometimes painful, has nearly always resulted in improvement. Writers like myself who are not troubled with exuberance of ideas are irresistibly impelled to pad out their scanty stock with irrelevant upholstery. The blue pencil is to them a boon. The exceptional 'editing' editor to whom I have referred above was one of the most brilliant and stimulating journalists of his time, but his method of dealing with contributions was to rewrite them largely in his own trenchant style, and the consequences were occasionally electrifying to the author. As the editor of a weekly journal published in the provinces he had gathered round him a remarkable band of clever young men, several of whom have since achieved marked distinction in the world of letters. My association with his journal was brief and undistinguished. I only wrote two or three papers, one of which was devoted to a somewhat depreciatory estimate of a popular humorist, whose signal abilities I came in later years to hold in high admiration. But when I ventured to criticise certain blemishes in his work, I never expected to find my mild rebukes turned into ferocious censure by the addition of such a phrase —inserted after a quotation from the author under review—as 'It is vomitable, but it pays.' The editor knew no moderation in praise or blame; he made divinities of his idols and cast his pet aversions on to the dunghill. That was my last contribution to his paper, for shortly afterwards he published a savage article on another editor, one of the first and the most generous of my patrons, holding him up to contempt as a literary Stiggins and his paper as an asylum for maudlin setimentalists, adding that every one who wrote for it was obliged to adopt the style of the editor. As a matter of fact, the fault of the editor in question was that he did not revise the work of his contributors half enough—*experto credite*—while his castigator carried the process to lengths which I have already illustrated. My subscription to his paper had several months to run, but I wrote to the publisher to say that, in consequence of this article, I requested that no more copies should be sent to me. Soon afterwards I received a very friendly letter from the editor, saying that he was not going to take back a word of what he had written, but that he sincerely regretted the severance of my connection with his paper. I gathered from those who knew him better than I did that he would have respected me far more if I had taken up the cudgels for my friend with equal ferocity to his own. But I made no sign, and was content to be quit once and for all of any further

personal association with the most brilliant of the tribe of Bludyer. I never told the other editor, but he heard of my action from a common friend, and wrote me a characteristic and charming letter, expressing his lively regret that I should have given up my connection with the paper that had attacked him. He had read the article, and the passage describing his own paper as a 'hospital for diseased cats' had given him 'the first hearty laugh he had had for many months'—his life was then clouded by grievous domestic anxiety.

One belongs to one's own generation, and can never perhaps fully appreciate the typical representatives of the next; so I may be pardoned for thinking that the editors of thirty and forty years ago were more interesting and remarkable men than their successors. Amalgamations and associations may earn huge dividends for shareholders and bring colossal incomes to their directors, but they do not throw up Bagehots or Delanes, Townsends or Huttons, Greenwoods or Henleys. The days of the independent and despotic editor are past; the competent organiser reigns precariously in his stead, acting as a sort of buffer state between his proprietor (or proprietors) and his staff, or endeavouring to reconcile the conflicting claims of policy and commercialism. The notion of giving an editor an absolutely free hand is incompatible with the principles which govern modern journalism—except in the rare instances where the editor is also proprietor, or, still rarer, where a periodical is organised on a non-commercial basis. Of this Utopian system there is at the moment one conspicuous and admirable example which aims at enlightening and clarifying rather than inflaming public opinion. But to say more about it would be derogatory, for it dispenses with advertisements of all sorts, and has gained in prestige, influence, and independence by this self-denying ordinance. Some editors are responsible to a board, and and their position cannot always be a bed of roses. I knew one not many years ago, and on my meeting him shortly after the paper had changed hands he replied somewhat ruefully to my congratulations on his retention in office, 'I used to have one proprietor; now I have *ten*.' But perhaps the most trying position of all is that of the editor who has not complete control, but is, as it were, *primus inter pares* with colleagues who are each in charge of a department. A daily paper was founded on these lines not a thousand years ago. There was a board of directors, with a managing director; there was a managing editor, a political editor, and a literary editor, to say nothing of other persons who exercised editorial functions. The paper was launched at a most favourable opportunity, with ample resources at its back, and it had the further advantage of meeting an unquestioned need by the representation

of views which lacked authoritative expression. But it was a huge financial failure, largely, if not entirely, because of the lack of central and coherent control. A friend of mine was offered a post on the staff by one of the editors, but when he went to receive his instructions he found that the engagement had not been officially confirmed by who ever was really responsible; and he used to describe how, after interviews with five different editors, he came away quite uncertain whether he was appointed or not. The tragi-comedy of this failure—for it was not without some tragic disappointments—has been told in print under a thinly veiled disguise, and forms one of the most instructive episodes in the romance of modern journalism. In spite of the efforts of an expert 'newspaper doctor,' who was called in to pull things together, the proprietors were obliged to discontinue publication. Their losses, judged by pre-war standards were huge, and though they had spent money like water, they were bitterly and unjustly criticised for not carrying on. The plain fact is that if a high-minded millionaire, with the best of intentions, who knows nothing of the newspaper world or of journalism, decides to found, equip, and run a daily paper, and, instead of choosing one strong editor, entrusts the control to half-a-dozen people of more or less conflicting aims, he can make as certain of losing one hundred thousand pounds a year as if he were to turn the money into sovereigns and play ducks and drakes with them from the deck of a liner in the mid-Atlantic.

One of the innovations of modern journalism—though perhaps it would be more correct to call it a revival on an extended scale—which has much to recommend it, is the recognition of verse as a regular feature, and not an intermittent embellishment. In older days the poets' corner was confined for the most part to obscure provincial journals, and was as a rule an unremunerated refuge for the incompetent amateur. A century and more ago it was otherwise, when Coleridge and others contributed political and patriotic poems to the London daily press. But the practice died out. Certainly it was a very rare occurrence thirty or forty years ago for a poem to appear in a London daily. Poets who desired immediate publication were restricted to the pages of the weeklies or monthlies. Browning's indignant response to the disparaging comment on his wife's *Aurora Leigh*, which occurred in one of Edward Fitz Gerald's letters, appeared in the *Athenæum*. The mordant lines of Samuel Butler, 'A Psalm of Montreal,' on the discovery of a plaster cast of the Discobolus in a room full of skins, plants, snakes, insects, &c, in the Montreal Museum of Natural History, describing Butler's interview with the old custodian, who was employed in stuffing an owl, first saw the light in the *Spectator*; and, strange to say,

Swinburne's 'Faustine' was first published in the same journal. The credit of making serious 'occasional verse' a regular feature in a daily newspaper, and of setting a high standard, probably belongs to the late Mr. Harry Cust during his meteoric tenure of the editorship of the *Pall Mall Gazette*. Mrs. Hinkson ('Katherine Tynan') in her recently published Reminiscences tells us that in one year no fewer than fifty of her poems appeared in the *P. M. G.*, and though she was probably the most frequent as well as one of the most gifted of its poetical contributors, one seldom saw verse in its columns that was not either accomplished or sincere. The practice spread first to other evening papers such as the *Westminster Gazette*, which still keeps it up, and then to the morning press. Poems by laureates have always enjoyed a privileged right of entry to the leading daily, but after Tennyson it cannot be said that they conduced to the prestige of the office. I am thinking now of such poems as those of Mr. Kipling, whose splendid homage to France appeared in the *Morning Post* before the war, and the brilliant political satires signed 'I. C.' which adorned the same column also in antebellum days. The war has been responsible for a great efflorescence of verse, by far the best of which has come from the trenches or has been inspired by direct first-hand experience of war-fare in its various phases on sea or land or in the air. For months together hardly an issue of the *Times* appeared without a poem, and the very large number of volumes of verse published in the last couple of years seems to indicate that the poetry-reading public has grown with the supply. The daily topical poem, however, had already become a feature of the halfpenny press, thus adding to the essentially miscellaneous character of modern daily journalism, which has swallowed up the society paper and seriously encroached on the preserves of the weekly illustrated periodicals by an evergrowing reliance on the resources of photography. When the *Daily Graphic* was started in 1890 the great bulk of the illustrations were reproductions of pen and pencil drawings, but of late years it has abandoned these methods entirely. The camera is beyond doubt a most valuable auxiliary, but, like all auxiliaries, needs to be employed with discretion. How helpful and illustrative in the best sense it can be is well shown in the pages of the *Manchester Guardian*, the photographs in which, both as regards choice and execution, are by far the best to be found in the daily press. But the notion that the camera never lies has long been exploded. In the hands of the unscrupulous snapshotter the thing becomes a weapon, and very often a poisoned weapon. The instantaneous camera sees differently from the human eye, and its pictures are often grotesque libels, more unflattering even than the

most repellent portraits of the most uncompromising realists or impressionists. Again, it is far too often employed as a means of invading privacy or of maliciously lending point to a 'campaign' against some notorious or unpopular personage. The camera, in short, adds a new terror to public life.

War tests everything and everybody, and brings out the best and the worst that is in us. And though the result in the main is encouraging by its splendid disproof of the misgivings of those who held that the fibre of our race had been sapped by luxury and self-indulgence, it cannot be maintained, in view of the predominating influence and the popularity exerted and enjoyed by certain outstanding figures in the world of journalism, that we have reason to be proud of our press as a whole. We find more sanity, moderation, and freedom from personal attacks and bitter recriminations—more, in fact, of what is representative of the best traditions of British journalism and of the spirit of unity and steadfastness—in the leading provincial than in the metropolitan papers. And this is due partly to the more feverish atmosphere of London, but still more to the fact that already, years before the war, the control of the most widely circulated organs had been steadily passing into the hands of men who set enterprise before enlightenment, excitement before instruction, publicity before patriotism, and everything before independence. The development of elementary education had enormously increased the newspaper-reading public, the opportunity was great, and so far as the mere mechanism of the supply and the skill with which the materials were presented went, no one can deny the energy and ability displayed by the organisers of the new journalism. They have shown themselves masters of the art of transport and distribution—of 'getting there first.' It is in their aims and methods as instructors that they have failed utterly in courage, in vision, in illumination. The problem they have set themselves to solve is, 'What does the man in the street like?' The notion of raising his standard, of giving him something better than what he has been accustomed to, is dismissed as quixotic and uncommercial. Just as it is the craze of the fashionable school of 'educationists' to beguile children into the paths of knowledge by turning every lesson into a game, so it is the aim of the newspaper proprietor to enlarge his circulation by 'brightening' all departments of journalism. No doubt there was much in the older journalism that was ponderous and stodgy, but modern methods have swept away its solidity and sanity along with its tiresome conventions and prolixity. In the desire to be 'merry and bright' at all hazards, highly coloured impressions, in which the personal note is always forced, take the place of precise reports. Everything is dramatised—down to the squalors of police-court cases; judges are

encouraged to be facetious and magistrates to be jocular. Yet there are journalists—some of them bred in the new school, others who are survivals of the old—who continue to better their instructions, and, though working for proprietors destitute of any sense of letters, to redeem the vulgarity of their surroundings by the saving grace of style. It is one of the curious and welcome instances of 'man's unconquerable mind' that even a Napoleon of the press cannot altogether sterilise the intellect of his scribes. There is good writing in bad papers, as conversely there is bad writing in good papers. But, tested by the needs of the hour, the provincial papers set an example to their London contemporaries by their larger abstinence from 'grousing' and recrimination, and their more consistent endeavour to promote unity, concord, and concentration. This remark does not apply only to the papers published in the larger centres. Having no interest in or official connection with any paper outside London, I feel perfectly free to express my admiration and respect for those provincial organs which, though hard put to it to keep their ends up against the competition of their sensational and all-pervasive London rivals, have never stooped to their methods, but have chosen the better path of steadily and unfalteringly maintaining the best traditions of British journalism. There are few parts of England where there has been better excuse for depression or the adoption of an alarmist tone than East Anglia, yet there is no paper in the country which has more unswervingly lived up to the precept,

Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem,

than the *Eastern Daily Press* of Norwich. There is an unwritten law which debars one newspaper from discussing another; some journals even go to the length of refraining to mention a contemporary by name. It is not a bad rule in so far as it promotes a healthy professional solidarity, but it has its drawbacks when a paper has 'deserved well of the republic' and there is no means of recognising its services. Good papers do not blow their own trumpets or tell us that they are winning the war. The testimony of an obscure outsider may be of little value, but as a journalist of nearly thirty-five years' standing I may claim the right, in virtue of what it has meant for me and mine in the last three years, to salute a newspaper which has been sane and steadfast from the first days of the war; which has never indulged in scapegoat hunting or uttered the cry, '*Nous sommes trahis;*' which does not advise the appointment of Ministers or crab the appointments when its suggestions are disregarded; in fine, which has no desire to promote that most pernicious consummation, newspaper government, but prefers to face the facts honestly, to discard rumour, to combat dissension, and to drive home the need of fortitude, endurance and self-denial.

HOW TRUE HEARTS BEAT.

(TRANSLATED FROM THE BENGALEE OF MR. FANINDRA NATH PAL.

I.

Praphulla's eyes filled with tears when his wife Sarasibala pulled off another ornament from her person and handed it over to him. His voice was almost choked. "How long can we get on in this way, Sarasi," said he, with a deep sigh.

"There is a God above us and He will surely have mercy on us,"—said Sarasi, in a tone of consolation. "Something would surely turn up ere long to relieve us. Where's the use of wearing your health away with constant anxiety?"

"I can't think how anything could ever turn up to improve our present condition," rejoined Praphulla. "I have got no money—nor have I had any education—can a man in my position hope for better days, Sarasi?"

"Why are you getting so impatient? There is sure to be a change for the better, I tell you," said Sarasi, in a firm tone.

When this talk was going on between husband and wife, the outer room became suddenly alive with the noise and laughter of four or five friends. Pruphulla did not now-a-days like it much but he had to spend his time in the company of these friends and join in their merriment against his own inclination. He had bid good bye to his happiness from the day on which he was obliged for the first time to sell his wife's ornaments in order to procure food. Every morning there used to be a tea party at his house at which a dozen or two of aerated waters, were also consumed. Even in his present straitened circumstances, he had to do everything as usual. He never had the heart to explain to his friends the real state of things and everytime he made the attempt, his speech failed him.

His friends in the outer room began to bawl out "Here Praphulla. Come out of your room."

Praphulla felt as if a dagger had been driven into his heart. Sarasi, who was standing by, noticed the change in her husband's look and said "go to them, my dear. They are crying themselves hoarse. I am making and sending some tea presently. The kettle is already on the fire and I have kept the milk and sugar ready to hand. Go and sit with them outside and I shall be sending the tea in a moment." Praphulla stared at his wife's face with eyes wide open and then said with a sigh "Sarasi, I don't want any tea to-day. What right has a man who is living upon the proceeds of his wife's ornaments to keep up an appearance of respectability—to entertain friends—"

He was going to add something more, when Sarasi pressed his hands with her own and said "why do you take it so, my love? Why do you worry yourself about the loss of the ornaments? If

you had ready money instead of ornaments you would, I am sure, have spent it freely and not counted the loss. It's the same thing. Go out to your friends my dear, and have a chat with them. It would cheer up your spirits."

Praphulla made no reply. He saw the truth of Sarasi's remarks and the futility of grumbling at Fate.

As he was about to go out Sarasi pointed out where there were some cigars and told him to take them with him.

II

Praphulla belonged to an ancient and respectable family. He was the only son of his parents. Owing to their excessive fondling, his education had not been properly looked after and he squandered away his time in play and amusements. His father used to get Rs 200 a month for his personal expenses out of the income of his zemindary and this sum was enough to keep the family above want.

When Praphulla attained the age of 16 years, he was married to Sarasi, a smiling and beautiful girl—the daughter of a poor man. Before his marriage Praphulla used to spend the greater part of the day in the company of his jolly friends but since Sarasi came to live with him he scarcely left his home. His friends used to meet in the outer room of his house. Praphulla would leave his friends every now and then and go inside the house on the pretence of fetching *Pán* for them and tease the young wife sometimes by undoing her coil of braided hair, sometimes by scattering the *Páns* prepared by her and and at other times by pinching her and running away. Sarasi used to complain to her mother-in-law of these acts of mischief. The mother-in-law would hold a regular trial aud pass judgment which, however, never pleased the accused and rarely satisfied the complainant, who often mentally resolved never to complain again. Praphulla's mother was very fond of one particular mode of punishment. "Come my darling," she would tell her daughter-in-law, "seat yourself beside me. Let me see how he dares to tease you now. He is a very naughty boy." Sarasi obeyed her mother-in-law by sitting near her but felt that it was really a punishment inflicted on herself. On such occasions, Praphulla used to shake his forefinger at her from a distance—as much as to say—"Rightly served! Will you again go and complain against me?" In this way the boy and the girl used to spend their days merrily away.

Then Prophulla lost his parents one after the other. For five or six months after his father's death he continued to receive Rs. 200 per mensen from the Estate. But the amount gradually dwindled down in course of time from Rs. 200/- to Rs. 150/-, from Rs. 150/- to Rs. 100/-, from Rs. 100/- to 50/- and so on, till at last it came down to Rs. 10/-. He has been receiving Rs. 10/- only per mensem during the last six

months. This sum rarely sufficed to meet the school expenses of his only son Prasanna The other expenses of the household were met from the sale-proceeds of Sarasi's ornaments. But even this source of income was not inexhaustible and was fast dwindling away. Praphulla's anxiety knew no bounds. He had many rich friends who, if asked, might help him in obtaining some employment or other—every day Praphulla thought of informing them of his circumstances and asking them to help him in obtaining some employment. In fact, he actually visited one or two friends for the purpose, but could not bring himself to say anything about his own affairs and returned home after taking his tea and other refreshments. Sarasi never ventured to ask him anything about the result of his endeavours to secure a situation. She only mentally prayed to the gods to remove the miseries of her husband. At the close of each day she would light a lamp and go about with it from room to room, and sprinkle holy water of the Ganges on the floor and kneeling down on the ground with her *anchal* round her neck she would pray to God with folded hands and call upon Him to put an end to her husband's ill fortune.

III.

Two months more have passed away. God has not yet turned His merciful eye on Praphulla. On that day he had procured Rs. 10 by pledging one of his wife's trinkets and was about to enter the house with the money when he saw his friend Bibhuti dressed in a dirty rag silently sitting on a chair in his outer room with his face downcast. Praphulla's heart thrilled with sympathy at the sight of his friend. This man, thought he, must be as miserable as myself. "Bibhuti!" he cried out in a sympathetic voice.

Bibhuti looked up to him, and forcing a smile into his lips said "Come, Praphulla."

"What's the news" said Praphulla." Haven't seen you for a long time. How long? About four months, is n't it?"

"It must be about that" replied Bibhuti with a sigh. "I was not in a condition to visit you before this."

"What a man of business you must have become not to be able to see us even once in the course of four months!" said Praphulla.

At this remark of Praphulla's, Bibhuti could not restrain a smile even in his present miserable condition. "You will never be able to understand," said he, "what poverty is and God grant that you may never be in a position to understand it. Let that pass. Let me tell you frankly the purpose of my present visit. The day of shamefacedness has long since gone by. For the last three months and more I have been out of employment, I have got three children besides myself and my wife

to support—I am living in a tiled hut—and yet its rent is Rs 6/- a month. I have been unable to pay the rent for the last two months, and the landlord has been insulting me every day—he will drive me out if I fail to pay him to-day—I have got as much money as may buy rice for two meals only and nothing besides—I have taken small loans of a rupee or two from several of my friends which I have not yet been able to repay. How can I pay them back? If you can save me this time by lending or giving me some fifteen rupees--will you?—You won't disappoint me?"—With these words he gave Praphulla a piteous look.

Praphulla was so long listening to his friend's words in silence. When Bibhuti had finished he stood still for sometime absorbed in thought.

"Won't you have pity on me, brother? Won't you save me by paying me only fifteen rupees?" cried Bibhuti in distress. "I am ready to touch your feet if that would soften you.—Please do not send me away, I beseech you."

Praphulla then brought out from his pocket the Ten-Rupee note and handing it over to his friend said in a trembling voice "My brother, I have not got fifteen rupees—I have only ten—which I give you.

Bibhuti heaved a sigh of relief. He thanked Praphulla again and again and said "You have saved me, my brother, but could you not procure me five rupees more from the inside of your house?"

Praphulla thereupon went inside the house. As soon as he met Sarasi, the latter handed over to him a *Churi* and said "Give him five rupees out of this and bring the balance which I hope will keep us for a few days more.

IV.

About a fortnight after this, Praphulla saw in the papers an advertisement signed by a barrister friend of his for the post of a Superintendent of a certain zemindary. The post carried a pay of Rs 50/- besides other advantages. Praphulla informed Sarasi of this and expressed his intention of seeing his friend at once.

"Would it not be better" said Sarasi, "to write to him first and ascertain his views? You would'nt probably be able to tell him every thing verbally. Besides, it is not desirable that you should. If he is inclined to give you the appointment, a letter would serve your purpose just as well."

"Never fear" said Praphulla, "I shall certainly be able to tell him everything. He is an old friend of mine and couldn't possibly refuse my request. Had it been otherwise I should never have have thought of seeing him."

About a couple of hours later, Praphulla came back. "Sarasi," said he, "God has at last come to my help. My friend is a friend indeed! When I spoke to him about the appointment, he

at first laughed aloud and said" Get away ! Don't try to fool me in that way ? He wouldn't at first believe that I was in earnest and I had much to do to make him do so. At last he told me that it was the least thing he could do for me to give me the post, and asked me to call on him again on the day after tomorrow when he would explain to me my duties and arrange everything so as to make my work as light as possible.

"I have all along told you" said Sarasi, with a smile on her lips, "that some good thing was sure to turn up at last."

In the evening Bibhuti came and saw Praphulla. Praphulla welcomed him and offered him a seat and asked "How are you my friend ? Have you been able to procure any employment ?"

" That is what brings me here " said Bibhuti. "You saved me the other day and if you grant my request to-day, I and mine will ever remain grateful toyou."

Praphulla stopped him and said "What nonsense are you talking, Bibhuti ? I shall certainly grant your request if it be within my power."

Bibhuti smiled and said " I shan't ask you to do anything beyond your power. I noticed in the papers to-day that there is a post in a Zemindary in the gift of Mr. Bose. I hear he is a great friend of yours. Would you kindly speak to him about me ? I am told that a word from you would secure me the post."

Praphulla was in a fix. He was asked to recommend another for the very post for which he himself had applied. Alas ! nothing was to be gained by concealing the real fact from Bibhuti. So Praphulla made a clean breast of it to the latter. But it seemed from Bibhuti's looks that he didn't believe the story.

"Then" said Bibhuti, "you don't mean to speak for me ?"

" I have told you everything, my brother " said Praphulla, in his gentlest manner.

"When it is not in your power to do anything for me" said Bibhuti in apparent discontent, "it is useless to ask you again. Let me see if I can procure the post by approaching Mrs. Bose. She is very kind to me and, besides, has promised to do something for as soon as an opportunity presents itself. Let me now go and see her. I have wasted so much time by calling on you.

So Bibhuti went away. Praphulla went within rapt in thought. What was he to do ? Sarasi noticed his gloomy countenance and anxiously asked "why do you look so sad, my darling ? You are not unwell ?"

Praphulla heaved a sigh and said "I fear, this post will also slip from my grasp."

"Never mind," said Sarasi, "you needn't trouble about it. If this slips, another will turn up. Something is bound to come in your way at last."

Praphulla only smiled in reply.

V.

The day fixed for Praphulla's visit to Mr. Bose arrived. Praphulla had

changed his dress and was about to go out when Sarasi came and tied a consecrated flower in a corner of his chadder and said "all your desires will be fulfilled."

When Praphulla arrived at Mr. Bose's house and stood on the verandah Bibhuti came out from inside by pushing aside a screen. His face was deathly pale. As if some grave calamity had overwhelmed him. It turned ghastlier still on seeing Praphulla. He was haunted by the thought that Praphulla had really no need to seek employment and had maliciously snatched the bread from a poor man's mouth. Had not Praphulla come and stood in his way he might have procured a means of livelihood. How heartless the man was! He was unable to stand there and felt an aching pain in his heart. He was scarcely able to look Praphulla in the face. He bent his face downwards and was about to walk past him when Praphulla with a smile caught hold of his arm and said "How now, Bibhuti? Why are you leaving in such a hurry?"

Bibhuti cursed Praphulla in his heart but outwardly said—"What's the use of my staying here any longer? I have no chance here as you have forstalled me by calling here the other day and securing the post for yourself. Mrs. Bose expressed her regret that I had come too late. Had I not gone to you the other day but come here direct, my children wouldn't have had to starve. Is it right to keep the bread from a poor man's mouth in this way?"

Saying this, he quickly went down the stairs without waiting for an answer.

Sarasi stood holding her child by the hand and watching with eager eyes for the return of her husband. She was constantly praying to goddess *Kali* that her husband might not come back disappointed.

At length Praphulla arrived there with a cheerful countenance. The child ran towards him and caught him by the hand. The cloud of doubt in Sarasi's heart disappeared at the sight of her husband's cheerful face and she inferred that his hopes must have been fulfilled. She did not think it necessary even to ask her husband anything about it.

"Khagen Bose is indeed a man," said Praphulla with the smile still on his lips. "He is true to his word. Even his wife who recommended Bibhuti for the post could not alter his resolution. When I was about to enter his room Bibhuti came out with such a gloomy face. I felt a thrill of pity at the sight of his countenance."

Praphulla was going to say something more when Sarasi interrupted him, saying, "Alas! his wants are not less urgent than ours—he is out of employment and has got three or four children to support—please try now to do something for him."

"Did you think that I would wait till you asked me for it?" said Praphulla. "Could I come back without doing something for him?"

Sarasi was overjoyed at this and said "Ah, that's right!" "Had you but seen his look of despair at the time, Sarasi," said Praphulla "you would have better understood his feelings. For my part I forgot my own mission, and on entering Khagen's room I told Khagen that I was really playing him a joke, and that I didn't want any situation, and asked him to give the post to Bibhuti. Khagen laughed and said "what a funny creature you are? Where is Bibhuti? Tell him to join his post tomorrow. My wife also was pleading for him."

Sarasi's face became illuminated with a heavenly light. "Well done, my dear! said she in a voice full of sympathy. "You have at least rescued your friend from misery. It is getting late, please take off your coat, and cool yourself in the fresh air, while I fetch you some sherbet and some sweets.

STRAY THOUGHTS.

Marriage.

I saw a little Indian Girl, 9 or 10 years old, brought in a gharry to the banks of a wide river, and she had bright clothes of divers colours, and bracelets of silver and gold, and many brooches and gleaming medallions, and the black hair on her little head was very sleek and shining. And a man carried her a-straddle on his hip, and set her down on the top step of the ghat, and she stood there quiet and passive, and suffered them to arrange her apparel, with a pull here and a pull there, letting them do what they liked to her gorgeous clothes. They told me she had come to do *puja* before marriage. And after she had stood there a little while, a small forlorn figure on a dreary river-bank, towards the evening of a day of rain, they carried her back to the gharry, and went off, noisily. "Perhaps she is sorrowful," I thought, "to leave her little brothers and sisters and her father and her mother, for a stranger's house, poor child."

In the Zoo.

I saw an ape from Africa, in a cage, sitting on a high bar, alone, paying no heed to the other apes swinging about the cage, nor to the spectators who were giving them things to eat. "Ah, poor ape,' I thought, 'what are you thinking of, sitting up there alone with your melancholy face and brooding eyes, poor broken purpose so like man? To you, too, does Memory the Tormentor come, to torment you? Perhaps you are thinking of the days when you went crashing along mile after mile from branch to branch and tree to tree in the African forests, beneath the bright sunlight, when you were free, poor ape."

To my friend, to write to me.

Write to me, my friend, and tell me whether you have walked the old way this spring, over the grey stone bridge across the clear stream, and turned aside at that gate, and looked over and seen the blue-bells where they rise like a blue foam from the fragrant earth in that little glade, around the cool roots of the ferns.

Le Plesse'.

"If I could run all the day long, and come at the last to my home in the green hills of Ireland, I would laugh at thee, O Dark Angel." The Dark Angel smiled, half-pitying—"Yes, but thou canst not run, poor child." And the Dark Angel drew very near.

D. G. D.

উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত !

(২৪শে আশ্বিন তারিখে মাণিকগঞ্জ রেক্রুইটীং সভায় পঠিত)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

বিংশ শতাব্দীর ঊষায় পৃথিবীর সকল সুসভ্য জাতি অগ্রগামী হইয়াছে। আজ যে জীবনমৃত্যুর সন্ধিযুগ সমুপস্থিত, তাহাতে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া কাহারো আর পিছে থাকা চলে না। সম্মুখে নবীন ঊষা রক্তরাগ রঞ্জিত স্নিগ্ধ আলোক,—পশ্চাতে বিপদের রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার; সম্মুখে বিশ্ব সভার গৌরব মণ্ডিত মুক্ত সিংহদ্বার;—পশ্চাতে কলঙ্ক লাঞ্ছন লিপ্ত ক্ষুদ্রতার অবরোধ; সম্মুখে উচ্ছ্বাসময় মুক্ত জীবন-সমুদ্র, সুখে সন্তোষে হর্ষে গর্ব্বে শতবাহু তুলিয়া আহ্বান করিতেছে; পশ্চাতে মৃত্যুর দেশের করুন রোদন ধ্বনিয়া উঠিতেছে? এই সন্ধি যুগে দাঁড়াইয়া হে আমার স্বদেশবাসি! তোমরা মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিবে, না নবজীবনের সাধনায় নিযুক্ত হইবে।

সাধনার শুভক্ষণ একদিন অকস্মাৎ অপরিচিত অতিথির মত আসিয়া দেখা দেয় বটে, কিন্তু যথা যোগ্য সমাদর না পাইলে মুহূর্ত্তও আর দাঁড়ায় না—একবার ফিরিয়াও চাহেনা! সেই শুভক্ষণেকে ধরিতে হইলে জাগ্রত-সচেতন থাকা প্রয়োজন। এই ঘুমের দেশের রুদ্ধদ্বারে যখন অতিথির করাঘাত শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তখনো কি তোমরা দ্বার মোচন করিয়া তাহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বরণ করিয়া লইবে না? অতিথির হস্তে যে দীপ দেখিতেছ, তাহা রুদ্রদেবের নয়নবহ্নির শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তোমাদের অন্ধকার গৃহের নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকা কি সেই শিখায়

প্রজ্জ্বলিত করিবে না? তোমার দ্বারদেশে মুক্তি-আশাদের যে দীপ জ্বলিতেছে, একবার দ্বার খুলিয়া কি সেই দীপ শিখা স্পর্শ করিয়া ললাটের তিলক পরিবে না?

তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই দিনের কথা স্মরণ হয় যেদিন পোতের পর পোত ভারতের বীরাগ্রগন্যদিগকে বহন করিয়া ফ্রান্সের কূল স্পর্শ করিয়াছিল। তখন অগ্নিশৈলের প্রবল শিখার ন্যায় জর্ম্মানির অগ্নিশ্বাস যেরূপে পৃথিবী দগ্ধ করিবার জন্য খাসিতেছিল তখন যে মহাপটিকা য়ুরোপের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে হাহা রবে ছুটিয়া চলিতেছিল—পৃথিবীর সেই ঘোর সঙ্কটকালে ভারতবর্ষ তাহার বর্ম্ম চর্ম্ম লইয়া Neuve chapelle উন্মাত ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু চমকিত হইয়া দেখিল, জর্ম্মনির সম্মুখে যে বাধা উন্নত শিরে দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহা হিমালয়ের ন্যায়ই দুরতিক্রম্য! সেদিন যদি ভারত তাহার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইত, যদি ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষেই আরো সৈন্য প্রেরণ করিতে হইত, তাহা হইলে শত্রুকে বাধা দেওয়া সম্ভব হইত না। *

তাহার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল; তিন বৎসরে পৃথিবীর ইতিহাসের কত পৃষ্ঠা শোণিতের অক্ষরে লিখিত হইয়া গেল! তিন বৎসরে কত বীরের ললাটে বিজয় তিলক শোভিত হইল—কত চারণের গীতে বীরের সভা মুখরিত হইল! সে সভায় পঞ্চনদের শঙ্খ বাজিল, রাজপুতের অসি জ্বলিল, পাঠানের রণনিনাদ ধ্বনিল, মারাঠা গাঢ়ো খাসিয়া গুর্খা প্রভৃতি সকলের কণ্ঠেই সে সভায় জয়মাল্য শোভিল—কেবল বাঙ্গালী তথায় স্থান পাইল না!

কলঙ্কলাঞ্ছিত প্রত্যাখ্যাত অক্ষম বলিয়া কথিত আত্মবিস্মৃত অনাদৃত বাঙ্গালী সেদিন কহিল—আমিও ব্রত ধারণ করিব! তাহার সেবা তাহার কর্ম্মনিষ্ঠা তাহার ভাব প্রবণতা তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল—তাহার রাজভক্তি ও স্বদেশহিতৈষণা এক শুভক্ষণে তাহার বহু বাঞ্ছিত মন্দিরের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। বাঙ্গালার সকল আশার সার, সকল গর্ব্বের শ্রেষ্ঠ, সকল সম্পদের অধিক বঙ্গযুবকগণ ব্যাকুল আগ্রহে মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। যে জাতি প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত অস্ত্রের পরিচয় লাভে বঞ্চিত ছিল, সেই জাতির সন্তানগণ মাত্র ৪৮ দিনে দুইটী কোম্পানীগঠন করিয়া উৎসাহ দীপ্ত হৃদয়ে শিক্ষাকেন্দ্রে যাত্রা করিল! বাঙ্গালার সে এক স্মরণীয় শুভদিন—বাঙ্গালীর সে এক উৎসবের তিথি। বাঙ্গালী যুবক এখন আসন্ন যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বেও স্বদেশে লিখিতেছে—"আমি সানন্দে জানাইতেছি যে আমাদের গৌরবের দিন সমাগত। কল্য প্রভাত ছয়টার সময় আমরা—স্থানে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিব। জীবন মরণ সংগ্রামের সময় আসিয়াছে। আমাদের যতদূর সাধ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বঙ্গশক্তির পরিচয় দিব। আমরা দেখাইব যে বাঙ্গালী ভীরু নহে।"

বাঙ্গালী জাতির ঘোর পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা টাউন হলে বক্তৃতাকালে কর্ণেল মুডেয়ার সে দিন বলিয়াছেন—'বাঙ্গালী ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে শান্তির সময়ে তাহারা বেশ কার্য্যক্ষম সৈনিক। তাহারা এখন দেখাইতে চাহে যে রণাঙ্গনেও তাহাদের যোগ্যতার অভাব হইবে না।'

আজ এই সভায় আমি জানিতে চাহিতেছি, আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি। আমাদের মুষ্টিমেয় ভ্রাতা পুত্রদিগকে বীরের মাল্য অর্জ্জন করিতে প্রেরণ করিয়াই কি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে? যে দিন তাহাদের জয়নিনাদে বাঙ্গলার গগন পবন চঞ্চল হইয়া উঠিবে, যে দিন তাহাদের জয়মাল্যের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিবে, যে দিন তাহারা সমর জয় করিয়া বাঙ্গালীর

---

* Mr. J. Saxon Mills অধুনা হইল "The gathering of the clans" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—It may truthfully be said that if England had not been able to throw these Indian reinforcements into the fighting line, but had been obliged rather to send out more troops to India, the British forces would scarcely have been able to bear back the German onslaught at that time. Britons will not quickly forget the decisive help afforded by their Indian fellow subjects in those dark and perilous days.

—Quoted from the Bengalee (Dak) 6th Decr 1916

গৌরব-কেতন উড়াইয়া দেশে প্রত্যাগত হইবে—আজ যদি আমরা নীরবে নিদ্রামগ্ন থাকি, তাহা হইলে সেই শুভদিনে কোন্ মুখে গৃহের বাহির হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিব? আজ যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য একটী বৃহত্তর মহত্তর কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে কোন্ লজ্জায় মাথা খাইয়া সে দিনসেই বিজয়ী বীরবৃন্দের যশের অংশভাগী হইতে চাহিব? আমাদের আত্মসম্মান বোধ কি সে দিন আমাদিগকে অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবার জন্য নির্দ্দেশ করিবে না?

তাহাদের মানে আমরা মানী হইব বলিয়া বসিয়া আছি, তাহাদের বলে আমরা বলী সাজিব বলিয়া মনকে বুঝাইতেছি, তাহাদের কর্ম্মে আমরা কর্ম্মী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিবার কল্পনা করিতেছি। ধিক আমাদিগকে! আমরা কি তবে সাজানো প্রতিমা লইয়াই চিরদিন ভুলিয়া থাকিব—প্রাণের সন্ধানে যাইব না? আমরা কি ভুলিয়া যাইব যে আত্মা বলহীনের লভ্য নহে? শুধু সম্পর আত্মীয় বা বন্ধুর পরিচয়ে যে নিজেকে পরিচিত করিতে চাহে, মূঢ় সে—হীন সে—অযোগ্য সে! তাহার মত করুণার পাত্র জগতে কে আছে?

আমরা যাহাদিগকে বাঙ্গালীর প্রতিনিধি করিয়া শূর-সভায় পাঠাইয়াছি, আমরা যাহাদিগকে প্রতিদিন কামানের মুখে পাঠাইয়া অন্তরে বাহিরে গৌরব অনুভব করিতেছি—তাহাদিগের প্রতিও আমাদের যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমরা সভায় সভায় তাহাদের জয়গান গাহিতেছি, শোভাযাত্রা করিয়া তাহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতেছি। তাহাদিগের কণ্টকাকীর্ণ কর্ত্তব্য পথকে কুসুমাস্তরণে আবৃত করিয়া রজত-শুভ্র লাজ নিক্ষেপে মঙ্গলাচরণ করিতেছি এবং তাহাদিগকে পান ভোজনে যথাসাধ্য পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায়ক্ষণকে মধুর করিয়া দিতেছি! কিন্তু যাহাদিগের জন্য এই আয়োজন—যাহাদিগের জন্য এই আড়ম্বর—যাহাদিগের জন্য এই শোভা-যাত্রা ও দীপালীর ঘটা—তাহারা কহিতেছে, আমরা ফুল চাহি না—মানুষ চাই, গান চাহি না—প্রাণ চাই, আমরা শুধু সাধ চাহি না—সাধনা চাই!

হে আমার স্বদেশবাসি! আজ যদি তোমার দিন আসিয়াছে ত একবার তোমার বাহিরকে বিদায় দিয়া অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখ—তোমাকে খুঁজিয়া চিনিয়া বুঝিয়া দেখ। গৌরবোজ্জ্বল অতীতের দিকে চাহিয়া তোমার কার্য্যনিষ্ঠা, তোমার বীরত্বখ্যাতি তোমার ঔপনিবেশিকতার সাহস, তোমার রাজ্যবিজয়, তোমার সমর জয় আরব্যোপন্যাসের উপকথা নহে,—তাহা কোনদিন আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ স্পর্শে ছায়াচিত্রের ন্যায় অকস্মাৎ প্রতিফলিত হয় নাই। তোমার মৌন অতীতকে সঞ্জীবিত কর; দেখিবে, ভারতের বহুস্থানের, বহুবর্ষের ইতিহাস তোমারই কাহিনীতে পরিপূর্ণ; দেখিবে, তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভের বহু উচ্চচূড়া একদিন তোমারই জয়স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করিয়াছে; শুনিবে তোমারই প্রশস্তিকার একদিন! জয়গর্ব্বে গাহিয়াছেন—

> দীর্ঘকাল লজ্যোধ্যা শাস্তে ভক্তি রুচ প্রভৌ।
> বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্ যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা॥

হে গৌড়বাসি! তুমি একদিন যে বলবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলে, পরিশূন্য রামস্বামীর মন্দির আজিও কাশ্মীরে তাহার পরিচয় দেয়। কবিকহ্লণ তোমার সে বীর্য্যকে বিধাতারও অসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন-একদিন তোমারই হস্তি-অশ্ব-সেনা-কটকের পদাঘাতোৎ-ক্ষিপ্ত ধূলিপটলে গগনতল এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া রহিত যে শাসনকার তাহাকে বিহঙ্গগণেরও পদপ্রচারক্ষম বলিয়া মুঙ্গের লিপিতে কহিয়া গিয়াছেন। একদিন তোমারই ইঙ্গিতে কি পঞ্চনদ কি রাজপুতনা, কি গান্ধার কি জালামুখী বিজিত হইয়াছিল—একদিন তুমি "দুর্ব্বার বৈরি" বলিয়া শত্রুকর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলে—হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত একদিন তোমারই চরণ তলে নমিত হইয়াছিল। আজও অজন্তার গিরি গুহায় তোমার সিংহল বিজয়ের চিত্র নরনারীর হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। উহা বীর বাঙ্গালীর বাহুবলের চিত্র—উহার তুলনা নাই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যখন নবোত্থিত কমলবৎ

প্রস্ফুটিত হইতেছিল, সেদিনও সে ভারতের কুরুক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিয়া বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিল। কত শত যুগ পূর্ব্বে, ভারতের ইতিহাসের কুহেলিসমাচ্ছন্ন সুদূর অতীতের রাত্র্যাকাশে ক্ষণ প্রভার চকল আলোকে কণেকের জন্য বাঙ্গালীর যে বীরমূর্ত্তি একবার পৃথিবীর নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়াছিল, হে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী! আজ আবার চাহিয়া দেখ, জগতের মহাকুরুক্ষেত্রে তোমার সেই মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আজ শত্রুমিত্র, ভাবক সমালোচক সকলেরই আগ্রহ-দৃষ্টি বাঙ্গালীর উপর পতিত হইয়াছে। বাঙ্গালী নানা ভাবেপক্ষে রাজসমীপে একদিন যে আবেদন জানাইয়াছিল, রাজ-অনুগ্রহ এখন তাহা সুলভ করিয়া দিয়াছে। জাতীয় উত্থানের এই সন্ধিকালে বাঙ্গালী যদি পশ্চাতে পড়িয়া রহে, তবে তাহাকে জীবন্মৃত হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

গত জুলাই মাসের টাউনহল-সভায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর বলিয়াছিলেন—'আমি এখন একটী নিবেদন করিতে চাই; আমার স্থির বিশ্বাস, যে কেহ বাঙ্গালাকে ভালবাসে, উহা তাঁহারই অন্তরের অন্তর স্পর্শ করিবে। আমি বাঙ্গালীকে বলিতে চাই যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রাণের কামনা পূর্ণ-করিয়াছেন। সম্রাটের পতাকা তলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবার অধিকার তাঁহারা পাইয়াছেন; তাই তাঁহাদিগকে বলিতেছি —দেখিবেন যেন অকৃতকার্য্য হইবেন না। সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন বলিয়া আপনারা এতদিন বলিয়া আসিতেছিলেন। এখন অনেকের চক্ষু আপনাদের উপর রহিয়াছে। আপনাদের বিচার করিবার জন্য বিশ্ববাসী আজ খর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে আপনাদের বন্ধুগণ যে শুধু বিচারকের আসনে বসিয়াছেন তাহা নহে—শত্রুরাও বসিয়াছেন; শুধু ভাবক নহেন, সমালোচকও চাহিয়া আছেন। কেবল হিতকামীর নহে, অহিতাকাঙ্ক্ষীর দৃষ্টিও আজ আপনাদের উপর পতিত হইয়াছে। বাঙ্গালার যুবকবৃন্দকে তাই আবার বলিতেছি—দেখিও যেন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইও না।'

যে অগ্নিময়ী বাণী উদ্ধৃত করিলাম প্রতি বাঙ্গালীর অন্তরে অন্তরে তাহা ধ্বনিত হউক—উহা বাঙ্গালীর নিদ্রায় স্বপ্ন, জাগরণে চিন্তা হউক—তবে না তাহার কলঙ্ক-লেখা ধৌত হইবে—তবে না তাহার দুই শতাব্দীর অক্ষমতার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া তাহাকেও আবার সামরিক জাতির গৌরব ও পদ প্রতিষ্ঠা আনিয়া দিবে—বিশ্ব সভার উচ্চ মঞ্চে তাহার জন্য ও একখানি গৌরবের আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে।

আমরা সাম্রাজ্য ও সভ্যতার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছি। ইহার জন্য শিক্ষা ও শিক্ষার জন্য সাধনা চাই। সৈনিকের ব্রত সেই শিক্ষাকে যেরূপ সফল করিতে সক্ষম, আর কিছু তেমন নহে। কর্ণেল যুডোয়ার সেদিন কলিকাতায় বলিয়াছেন—"আপনাদের যে যোগ্যতা আছে, আপনাদের যে শিক্ষা আছে তাহা আমি স্বীকার করি; আপনাদের যে তীক্ষ্মবুদ্ধি ও বাক্‌পটুতা আছে তাহাও আমি জানি। আপনাদের দেশ ভক্তিও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কি সামরিক বিভাগে, কি শাসনে বা সংরক্ষণে নায়ক হইতে হইলে, ইহার অনেক অধিক গুণপনা আবশ্যক। যিনি নায়ক হইতে ইচ্ছা করেন, শাসনশৃঙ্খলার প্রথমে তাঁহার নিজেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালা অপেক্ষাও বিস্তৃত পৃথিবী যাহার দেশ—ভারতবর্ষ অপেক্ষাও বৃহত্তর যাহার সাম্রাজ্য তাহার ন্যায় হৃদয়ের উদারতা প্রয়োজন। জননায়ককে সর্ব্বতোভাবে জনমণ্ডলীর নায়কই হইতে হইবে; জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার শক্তি তাঁহার থাকা প্রয়োজন। এই সকল গুণাবলী লাভ করিতে হইলে সৈনিকের ব্রত ধারণ করিতে হয়। আজীবন যিনি সৈনিক, তাঁহার সন্তান সন্ততিও জন্মকাল হইতেই এই সকল গুণ লাভ করে।

কর্ণেল যুডোয়ার আরও বলিয়াছেন—"আপনাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের দেশের স্বার্থের জন্য সন্তান সন্ততিদিগকে সৈনিকের ব্রতে দীক্ষিত করুন……… একটী বল বাহিনী গঠিত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না—ইহার চতুর্গুণ সেনা লইয়া রেজিমেণ্টকে ব্রিগেডে

পরিণত করুন; সেইখানেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। ব্রিগেডের ত্রিগুণ সৈন্ত লইয়া একটী বাঙ্গালী ডিভিসনের প্রতিষ্ঠা করুন। যদি করিতে পারেন তবে দেখিবেন আপনাদের বীর পুত্রগণ, অথবা তাহাদের পুত্রগণ যে সকল ক্ষমতা লাভ করিবে, তাহা সুচারুরূপে পরিচালন করিবার যোগ্যতাও তাহাদের হইবে।"

যাহারা জাতীয় বিজয়মন্দিরের প্রতিষ্ঠ, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থে দৃষ্টি তাঁহাদের জন্ত নহে। সে সকল রাজভক্ত স্বদেশ প্রাণ বাঙ্গালী সৈনিকের কঠোর কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থলাভ তাঁহাদের উদ্দেশ্ত নহে। তাহা হইলে ঢাকার নবাব বাহাদুরের সৈনিক হইবার প্রয়োজন ছিল না, হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যাহারাজীব গাউন ফেলিয়া কামান ধরিতেন না, মেদিনীপুরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মসি ত্যাগ করিয়া অসি লইতেন না, উচ্চ শিক্ষিত অধ্যবসায়শীল যুবকগণ যাহারা ভবিষ্যতে যে কোনো কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে—তাহারা সম্প্রতি সাধারণ সৈনিকের মাসিক এগার মুদ্রা বেতন গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইত না। আজ আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছি যে ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালীর নমস্ত—বাঙ্গালীকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করিবার জন্ত ইঁহারাই দেবদূতের স্তায় অগ্রগামী হইয়াছেন! ইঁহারাই বুঝিয়াছেন—'যদি প্রাণ চাও, যদি মান চাও—প্রাণ আগে কর দান!' জাতীয় সম্মান বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহা ভিন্ন আর মন্ত্র নাই। নিরুপদ্রপ রাজপথে শোভাযাত্রার কাঁসীর সুরে গাওয়া অতি সহজ—'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহিত মেষ।' মানুষ হইবার জন্ত যে সাধনা প্রয়োজন আজ তাহার জন্ত সর্ব্বস্ব দান করিবার সময় আসিয়াছে—সে ব্রত বড় কঠিন—সে ব্রতের ফল বড় উজ্জল। বাঙ্গালীকে তাহারই জন্ত আজ দীক্ষা লইতে হইবে।

গীতায় পড়িয়াছি—আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ; আমিই আমার বন্ধু—আমিই আমার শত্রু। এই মহাবাক্য যেমন ধর্ম্মজীবনে ভক্তির পক্ষে সত্য—ইহা তেমনি জাতির পক্ষেও কর্ম্মজীবনে সত্য। এই জাতীয় উদ্বোধনের শঙ্খ নিনাদ যে বাঙ্গালীর কর্ণে প্রবেশ করিবে না—সে-ই বাঙ্গালীর বন্ধু নহে। ওই দূরে উষার যে রক্তিমচ্ছটা, অমানিশার বিগত কালিমার প্রান্তদেশ উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিয়াছে—যে বাঙ্গালী তাহা দেখিয়াও নিদ্রামগ্ন রহিবে, সে কখনো বাঙ্গালীর বন্ধু নহে।

কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—আমরা কি তবে সকলেই এই মুহূর্ত্তে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিব? না—তাহা নহে। প্রতিষ্ঠা-মন্দির রচনা করিতে যেমন শিল্পীর প্রয়োজন, তেমনি কাট-পাথর বহিবার মজুরেরও প্রয়োজন। যাঁহারা শিল্পী, তাঁহারা এই মুহূর্ত্তেই চরণাকার্য্য আরম্ভ করিবেন—যাঁহারা অক্ষম তাঁহারা দেশের শিল্পীকুলকে আহ্বান করিয়া মন্দির নির্ম্মাণে সহায়তা করিবেন। আমরা যেন ইহা মনে না করি যে রাজসরকার হইতে প্রাদেশিক Recruiting Board স্থাপিত হইয়াছে, সরকারি কর্ম্মচারিগণ স্থানে স্থানে Recruiting Officer স্বরূপ সৈন্ত সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন, সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ স্থানে স্থানে যাইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—সুতরাং আমাদের আর করণীয় কিছু নাই। যাহা হইবার আপনিই হইবে। পৃথিবীতে রাজা ও প্রজা সকলেরই আপন আপন কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজার অংশ তিনি করিতেছেন, আমাদেরটুকু আমাদের হইয়া কেহ করিতে আসিবে না। শিশু যদি নিজে পা ফেলিতে না চাহে—কাহারো সাধ্য নাই যে তাহাকে হাতে ধরিয়া হাটাইতে পারে?

আজকাল আমরা শুনিতে পাইতেছি, এবং দেখিতেও যে না পাইতেছি তাহা নহে—নানাস্থানে পিতা মাতা পুত্রের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতেছেন। ইহা এখন বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভাবিক। সেদিন আর বাঙ্গালীর নাই, যখন তাহার সৈনিক ব্রত ধারণের উপলক্ষে সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা বা ঐকতানকার্য্যের প্রয়োজন হইত না; সেদিন আর বাঙ্গালীর নাই যখন তাহার স্ত্রী বা কন্তা তাহার দেহে বর্ম্ম বাঁধিয়া দিতেন; সে দিন আর বাঙ্গালীর নাই যখন তাহার কুললক্ষ্মীর ক্রন্দকথায় যুদ্ধে লিপ্ত পতি পুত্রের নির্ব্বিঘ্নে গৃহাগমনের প্রার্থনা থাকিত।

সেকালে যাহা অতি সহজে হইত—সেকালে যাহা না করিলেই অধর্ম্ম হইত, অপৌরুষ বলিয়া পরিচিত হইত, একালে তাহার জন্য নানা আড়ম্বর প্রয়োজন হইয়াছে। সেকালে বাঙ্গালী যুদ্ধেও গিয়াছে, আবার জয়মাল্য অর্জ্জন করিয়া গৃহেও ফিরিয়াছে; কেহবা রণমৃত্যু লাভ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছে। মৃত্যুর ন্যায় সুনিশ্চিত ঘটনাকে সেকালে সকলে অতি সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা প্রতিকথায় অদৃষ্টলিপির দোহাই দিয়া থাকি—মৃত্যুর বেলাতেও তাহাই। নহিলে জীবন দুর্ব্বহ হইত। ভয় ও শোকের স্থানের অন্ত নাই। তাই পণ্ডিত বলিয়াছেন—

শোক স্থান সহস্রাণি ভয় স্থান শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥

যোদ্ধধর্ম্মের এই মহামন্ত্র ভারতবাসীর জীবনকে সুখের করিয়াছে। যাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিলেই বা কি হইবে? লোহার বাসরেও লখিন্দরকে সর্পে দংশন করিয়াছিল। বাঙ্গালীর মহা কবি তাই মেঘ-মন্দ্রে কহিয়াছেন—'যাটিকাটি দংশে সর্প আয়ুহীনজনে।' ঢাকার প্রাদেশিক সভায় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯১৪ সালে ৮ লক্ষ, ১৯১৫ সালে ৮ লক্ষ এবং ১৯১৬ সালে ৭ লক্ষ লোক সুধু ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। মৃত্যুর অন্যান্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যথা—কলেরা, প্লেগ প্রভৃতির রাজত্বও অব্যাহতই রহিয়াছে। সুতারাং এ দেশে বাস করিয়াও মৃত্যুকে সহজভাবে ধরিতে না পারিলে চলিবে কেন? দুর্ব্বল জাতির স্বভাবই এই যে তাহারা হারাকেই অধিক ভয় করে। আমরা সত্য অপেক্ষা সত্যাভাবকেই অধিক ভয় করিয়া থাকি। আমরা সত্যকে মানি, মিথ্যাকে ভয় করি। তাই কুইনাইনেও আমাদের অচলা ভক্তি, আবার পেট-জোড়া প্লীহার উপর মাদুলী বাঁধিতেও আমাদের মত ব্যগ্র আর কেহ নহে।

যাহারাই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে তাহারাই মরিয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হয় নাই। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবের ছোট লাট Sir Michaelo o' Dwyer বাহাদুর মন্টোগুমরি নগরীতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধের আরম্ভ হইতে ১৯১৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ১১০১৫ জন ভারতবাসী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন। Mr. J. Saon Mills এর পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকে প্রকাশ যে শুধু ১৯১৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ৭০০০০ ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধের জন্য ফরাসীদেশে উপস্থিত হইয়াছিল—তৎপরে আরও গিয়াছে।

অধুনা বাঙ্গালী জীবনের চরমলক্ষ্য চাকুরী বা আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে নূতন অভিষিক্ত অবগাহনের স্থান যে কোথায় তাহা নির্ণয় করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইতেছে! সামরিক বিভাগ যখন চাকুরির ক্রটী নূতন ক্ষেত্ররূপে মুক্ত হইয়াছে, তখন বাঙ্গালীর উচিত নহে কি যে সেই মুক্ত তোরণে প্রবেশ করিয়া, নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া? প্রবেশ কালে বেতনের হার অতি সামান্যই বোধ হইবে। কিন্তু ক্রমশঃ পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বৃদ্ধি হইবে। ভারতবাসী যোদ্ধা এতদিন পর্য্যন্ত Commissioned পদ পাইতনা—সম্প্রতি ৯ জন ভারত-বীর উহা লাভ করিয়াছেন। আশা করা যায় সত্বরই অনেকে উহা লাভ করিবার যোগ্য হইবেন। এতদিন যাহা অসম্ভব ছিল ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই সম্ভব হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী যদি এ সুযোগ গ্রহণ না করে তাহা হইলে তাহাকে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

সাধারণ সৈনিকের বেতন অপেক্ষা সাধারণ কনেষ্টবলের বেতন অনেক কম। সৈনিকের সম্মানের ন্যায় কনেষ্টবলের সম্মান নহে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে সেই স্বল্পবেতনেই অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তান কার্য্যগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কনেষ্টবলও যেমন প্রত্যাশা করে যে সে একদিন পুলিশবিভাগের উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবে; সৈনিকেরও তদ্রূপ উচ্চাশা করিবার পথ বিস্তৃত হইতেছে। বাঙ্গালী কোম্পানী গঠিত হইবার পর এক মাস মধ্যেই কেহ কেহ প্রথমে ল্যান্স নায়ক ও পরে নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; পাঁচমাসের মধ্যেই অনেকে হাবিলদার এবং হাবিলদার-মেজর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুলিসের কর্ম্মে নিযুক্ত

থাকিয়া বাঙ্গালী দারোগা সময়ে সময়ে যেরূপ সাহস ও কার্য্যের পরিচয় দিয়া থাকেন, গুপ্তঘাতকের বিভীষিকা শিয়রে রাখিয়াও যেরূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন—কর্ত্তব্যপথে থাকিয়া যেরূপে প্রাণ হারাইয়া থাকেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই! সুতরাং সেনাবিভাগে প্রবেশ করিতে ভয়ের কোন সত্য কারণ থাকা সম্ভব নহে।

সৈন্য সংগ্রহের ধারাবাহিক ইতিহাস যাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে বঙ্গজননীও এখন অম্লানবদনে পুত্রকে রণবেশে সজ্জিত করিয়া তাহার সহিত রেলষ্টেসন পর্য্যন্ত গমন করিতেছেন; হাবড়া এবং খুলনায় আমরা এ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গরমণী মঙ্গল হুলুধ্বনি করিয়া সৈন্য-সংগ্রহ সভায় উৎসাহ আনয়ন করিতেছেন—বীর পুত্রদিগের শিরে লাজ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। 'মহিলাসমিতি' আজ জগদ্ধাত্রীর ন্যায় অবতীর্ণা। সৈনিক ব্রতধারী বঙ্গসন্তানদিগের জন্য তাঁহাদের যত্নের ত্রুটী নাই। দূর বিদেশে সৈনিকের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হইতে পারে, তাঁহারা মাতৃস্নেহে উদ্বেলিত হৃদয়ে হইয়া পূর্ব্ব হইতেই সে সকল সংগ্রহ করিতেছেন এবং প্রত্যেক সৈনিককে এক একটী ব্যাগপূর্ণ দ্রব্য সম্ভার উপহার দিতেছেন। মহিলাসমিতির মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই একথার সত্যতা সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। দানবীর ডাক্তার রাসবেহারী ঘোষ, মহাশয় য়ুনিভার্সিটী সৈনিকদলের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন! বঙ্গ সৈনিকদিগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান সর্ব্বদাই সংগৃহীত হইতেছে। দেশের এই অনুষ্ঠানকে সফল করিবার দায়িত্ব প্রতি বাঙ্গালীর; একথা যেন আমরা কদাচ বিস্মৃত না হই।

ঢাকার দরবারে মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর সে দিন বলিয়াছিলেন—'বাঙ্গালার যেরূপ শক্তি ও সম্পদ বাঙ্গালা এখনো তদুপযুক্তরূপে এই মহাযুদ্ধে যোগদান করে নাই; বাঙ্গালীর উৎসাহ যেরূপ দীপ্ত, আজিও যুদ্ধব্যাপারে তাহার সম্যক পরিচয় লাভ ঘটে নাই, এতদিন, প্রধানতঃ সুযোগের অভাবেই যে বাঙ্গালী উপযুক্তরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। যে অধিকার এতদিন বাঙ্গালীকে দেওয়া হয় নাই, এবং যখন প্রথমে দেওয়া হইল তখনো বিশেষ সতর্কতার সহিত, শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইয়াছিল—আমি আজ হৃষ্টচিত্তে বলিতেছি, সেই অধিকার আরও বিস্তৃতভাবে এখন বাঙ্গালীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে। বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথমে যে অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহা শুধু পদাতিক শ্রেণীর ডবল কোম্পানী গঠন করিয়া সাম্রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য; বাঙ্গালী উহা গঠন করিয়াছে। সেই নবগঠিত কোম্পানী এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছে যে অবিলম্বে বাঙ্গালা হইতে একটী ব্যাটালিয়ন গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। বাঙ্গালী ব্যাটালিয়নও গঠিত হইয়া এখন আবশ্যক রিজার্ভ সংগৃহীত হইতেছে। আজ আমি আপনাদিগকে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা হইতে আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি এবং সে জন্য ব্যস্তও হইয়াছি। সামরিক বিভাগের নানা কার্য্যের জন্য এখন আমরা রীতিমত মাসে মাসে যতদূর সম্ভব সৈন্যগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।'

সম্প্রতি বাঙ্গালা হইতে কেবল তিন যোদ্ধা শ্রেণীর সংগৃহীত হইতেছে—(১) মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেলের চালক (২) পদাতিক সৈন্য (৩) সিগনালার। এপ্রিল মাসে বঙ্গগবর্ণমেণ্টের চীফসেক্রেটরী মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়কে জানাইয়াছেন যে যাঁহারা বঙ্গবাহিনীতে যোগদান করিতেছেন, যুদ্ধান্তে তাঁহারা সরকারি কর্ম্মের প্রার্থী হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। আপন আপন আত্মীয় স্বজনের জন্য সরকারি কর্ম্মের প্রত্যাশী অভিভাবকগণ এই কথাটী ভাবিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা সৈনিক ব্রত ধারণ করিয়া শিক্ষাকেন্দ্রে যাইতেছেন তাঁহাদের কিরূপ ভাবে সময় কাটিতেছে, তাহা একজন সৈনিকের কথায় প্রকাশ করিতেছি:—

প্রভাতে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করিয়াই আমরা চা ও খাবার খাই; ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত কুচ-কাওয়াজ শিখিতে হয়। ৮টা হইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছুটী। বেলা ১১টার সময় মধ্যাহ্নের আহার। দাইল, তরকারি ও ভাতই আমাদের প্রধান খাদ্য। আমরা ১১৪ জন সৈনিক একত্র আছি। আমাদের জন্য দুইজন পাচক ও দুইজন ভৃত্য আছে। তবে সর্ব্ববিষয়ে আত্মবশ হইবার জন্য আমরা নিজরাই নিজেদের অধিক কাজ করিয়া লই। ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্রাম। আবার ২টা হইতে ৩টা এবং ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আমাদের কুচ-কাওয়াজ চলে। তাহার পর রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত আমাদের সান্ধ্য ভ্রমণের কাল। ইহার পরই আমাদের হাজিরা লইবার রীতি আছে। হাজিরা হইয়া গেলে কেহ বা পুস্তকাদি পাঠ করে, কেহ বা গীত বাদ্যের আলোচনা করে। রাত্রি ৯টার সময় আমাদের নৈশ ভোজন হয়। রুটী, মাংস ও পায়স আমাদের রাত্রের আহার। রাত্রি দশটায় ভোঁ ভোঁ বিউগিল বাজিয়া উঠে, আমাদিগকেও প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতি ও রবিবার আমাদের ছুটী। আমরা এই দুই দিনই খেলা ধূলা করিয়া কাটাই। শরীর অসুস্থ হইলে আমাদের জন্য সুন্দর হাসপাতালের বন্দোবস্ত আছে। কোন বাঙ্গালী সৈন্যের অসুখ হইলে কাপ্তান, কর্ণেল পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাদের দেখিয়া যান।" এইরূপে যাহাদের শিক্ষা দবিশিয় কাল কাটিতেছে তাহারা কি আপন আপন গৃহে ইহা অপেক্ষা অধিক সুখে ও অধিক শৃঙ্খলার সহিত বাস করিত? এ চিত্র কি কাহারও নিকট ভয়াবহ বা কষ্টকর বলিয়া মনে হইতেছে? তবে কে ইহা বলিবে যে সৈনিকের ব্রত কঠোর নহে। ললিতলবঙ্গলতা তাহার জন্য নহে। যাহারা প্রাণ বিনিময়ে মানের কেনা বেচা করে—যাহারা শত্রু-শোণিতে আপন ললাটে বিজয়তিলক অঙ্কিত করে—যাহারা আত্মরুধিরে জাতীয় প্রতিষ্ঠা-মন্দিরের মর্ম্মর বেদী গ্রথিত করে, তাহারা আবশ্যক হইলে রুদ্রের ন্যায় ভীষণ, সূর্য্যের ন্যায় তপ্ত হয় বটে—কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ সাগরের ন্যায় উদার, আত্মসম্মানবোধ হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ ও স্বদেশ প্রেম ভাগীরথীর ন্যায় পবিত্র হয়। তাহারা তাই সখার ন্যায় স্নেহের—অতিথির ন্যায় পূজার ও যোগীর ন্যায় ভক্তির পাত্র। বাঙ্গালীকে এই বেশে দেখিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছি। আজ তাহারই পন্থা নির্দ্দেশের জন্য আমরা সম্মিলিত হইয়াছি।

বঙ্গবাহিনীকে স্থায়ী করিতে হইলে যাহাতে অশিক্ষিত জন সাধারণের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় তাহার জন্য পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে রাজসাহী ও পাবনা জেলা হইতে অনেক নিম্নশ্রেণীর মুসলমান বঙ্গবাহিনীতে যোগদান করিতেছে। বঙ্গের কয়েকজন স্বদেশ প্রাণ ভূস্বামী এই উদ্দেশ্যে যে সকল ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রজা-গণের মধ্যে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বনের স্পৃহা ক্রমেই জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

রাজসাহী জেলার নাটোরের ছোট তরফের রাজ-পরিবার প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহাদের যে সকল প্রজা সৈন্য হইবে, তাহারা নিষ্কর ভূমি পাইবে। তাহেরপুর রাজসরকারের পক্ষ হইতে সৈনিকব্রতধারী প্রজাগণকে রাজস্ব মাফ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। জয়দেবপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সৈনিক প্রজাদের রাজস্ব মাফ দিয়াছেন; তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে যে পরিবারে একজনও সৈনিক হইবে তিনি সেই পরিবারের দেয় রাজস্ব গ্রহণ করিবেন না। বরিশালের রায় জমীদার, নসীপুরের মাননীয় রাজা-বাহাদুর, কাকিনার মাননীয় রাজাবাহাদুর নানা উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আপন প্রজাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। বালুচীর জমীদার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী নিজে ভারতরক্ষী সৈন্যদলের অশ্বারোহী বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন এবং প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাহারা সৈনিক হইবে, সৈনিকের কার্য্যকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার নিকট রাজস্ব লইবেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

সকলের সমবেত চেষ্টা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা ভিন্ন বাঙ্গালী কখনই তাহার বাঞ্ছিত পদগৌরব লাভ করিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর বিজয়মন্দির গঠনের ভার আজ বাঙ্গালীর উপরেই পতিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যেন এখন ভুলিয়া না যায় যে সর্ব্বং পরবশং দুঃখং—বাঙ্গালী যেন না ভুলিয়া যায় যে সে স্বেচ্ছায় ব্রত ধারণ করিয়াছে—কঠোর জানিয়াও সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। তাহারা প্রায় দ্বিসহস্র ভ্রাতা আজ ব্যাকসিন্‌গানের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে সে শুধু জাতীয় গৌরবের জয় পতাকা আনিবার জন্য —শুধু তাহার চিরাচরিত রাজসেবা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য—শুধু তাহার কলঙ্ক লেখা মুছিয়া দিবার জন্য। তাহারা ব্যাকুল আগ্রহে বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; প্রতি নিশ্বাসের সহিত পল গণনা করিতেছে আর ভাবিতেছে—ঐ আসিল ঐ আসিল—বাঙ্গালা হইতে তাহার নবাগত সৈনিক ভ্রাতা শত সহস্রে আসিয়া তাহার বলবৃদ্ধি করিল। এখন কি আর চিন্তা করিবার অবসর আছে।

দেশের দিকে চাহিয়া দেখুন—কৃষককুলের দুর্দ্দশার সীমা নাই। পাটের দাম নাই—বাজারও নাই; গৃহে সঞ্চিত ধন নাই—মহাজনের ঋণ দানে সাহস নাই একটাকার এক টুকরা বস্ত্র তিন টাকায় দাঁড়াইয়াছে—লবণের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিদিন যে সকল দ্রব্য আবশ্যক; তাহারা ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। যাহারা দৈনিক আট আনা পারিশ্রমিকে মজুর খাটিত তাহারা এখন পথে পথে কার্য্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জন খাটাইবার লোকের অভাব। এখন কি এই সকল লোকের আর নিশ্চেষ্ট হইয়া গৃহে বসিয়া থাকিবার সময় আছে?

অজলোক রক্তশূন্য। যে দেশের শাসনশাসনে শিক্ষিত ব্যক্তিই প্রতি পদক্ষেপেই আপন ছায়া দেখিয়া আপনি ভীত হয়, সে দেশের অশিক্ষিত লোক যে একান্ত রক্তশূন্য হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু তেল-নুণ লকড়ি এমন অব্যর্থ ঔষধ যে উহারা মুহূর্ত্তে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়—অলসকে কর্ম্মবীর করে কর্ম্মবীরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে—প্রতিষ্ঠাকেও উন্নতিশীর্ষ করিয়া তোলে। সুতরাং প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর এখন এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন—যাহাতে অশিক্ষিত ভ্রাতাগণ সকলেই আপন আপন অবস্থা ও ব্যবস্থা বুঝিতে পারে তাহার জন্য আমাদেরই চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে যোদ্ধাস্বরূপ কিংবা মজুরস্বরূপ তাহারা সমরবিভাগে যোগদান করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের নূতন পথে এখনই অগ্রসর হইতে পারে। আপন আপন জমীদারের জন্য লাঠি ধরিতে এ শ্রেণীর লোক কোনদিন পশ্চাৎপদ নহে। উহাতে যে পরিমাণ সাহসের প্রয়োজন, বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিবার জন্য তাহার অধিক সাহসের আবশ্যক হয় না। লাঠিয়াল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহারা জমীদারের নিকট যে পারিশ্রমিক পায় তাহা যে কত সামান্য তাহা সকলেরই জানা আছে। অথচ উহাতে গৌরব নাই। কিন্তু রাজসৈন্য হইলে গৌরব আছে, অর্থ আছে, দেশ মাতৃকার পূজার মন্দিরে তাহারই জন্য আশীষকুসুম সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে রাজসেবার পুণ্যে পবিত্র হইবার প্রধান সুযোগ তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

যুদ্ধব্যাপারে শুধু যে যোদ্ধারই প্রয়োজন তাহা নহে যাঁহারা যুদ্ধ করিবেননা এমনও বহুলোকের প্রয়োজন। বাঙ্গালীর কতকাংশ যদি সেই কর্ত্তব্যই পালন করিতে পারে তাহা হইলে বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কারণ আছে। রাজপূজার জন্য ফুলের বিচার নাই। যাহারা যুদ্ধ করিবে না অথচ যুদ্ধকার্য্যে অন্যরূপে সাহায্য করিবে তাহাদিগকে প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—(১) Army Bearer corps (২) Followers (৩) Electrical or supply (৪) Labour.

সম্প্রতি এই সকল কার্য্যের জন্য লোক সংগৃহীত হইতেছে। ইহাদের বেতন ও ভাতার হার দেখিলেই বুঝা যায়, এ দেশে এমন লোকের অভাব নাই যাহারা অন্য উপায়ে এখন সে পরিমাণ অর্থও উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে না। আপন সংসারের উপর একটী ভারের ন্যায় অবস্থান করিয়া যে কতলোক কোন প্রকারে অলস কর্ম্মহীন বা অখ্যাত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে

তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শক্তি থাকিতে অক্ষম হইয়া উৎসাহ থাকিতে অলস হইয়া, চক্ষু থাকিতে অন্ধ সাজিয়া যে ব্যক্তি অন্যের উপার্জ্জিত অন্নের গ্রাস নিজের মুখে তুলিয়া দেয় তাহার জীবন কি দুঃসহ দুঃখময় নহে? সেই পরপুষ্ট বাঙ্গালী প্রতি পদে পদে নিজেকেই শুধু লাঞ্ছিত করে। ইহা আমাদের বঙ্গসমাজের নিত্য প্রত্যক্ষীভূত ভাবিবার বিষয়। ইহা আমাদের ঘরের অপ্রিয় সত্য সংবাদ। ঘরের লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে আমি কুণ্ঠা বোধ করি না।

আমরা যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে যুগ কর্ম্মহীন অলস থাকিবার যুগ নহে। ইহা জীবন সংগ্রামের যুগ; এ যুগে বন্য ফল মূলও আর অনায়াসলব্ধ নহে। এখন ক্ষুধার অন্ন হইতে বিলাসের সামগ্রী পর্য্যন্ত সমস্তই বহু চেষ্টায়, বহু আয়াসে, বহু আয়োজনে বহুদ্বন্দ্ব সংঘর্ষের পর সংগ্রহ করিতে হয়। আমাদের পল্লীভবনের চণ্ডী মণ্ডপের বৈঠকে আহারান্তে নিদ্রারণপর ক্রীড়া ও সায়ং কালে পরচর্চ্চায় কালক্ষেপ করিবার যুগ এ নহে। যুগ-ধর্ম্ম এখন এক অতি প্রবল স্রোতে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এখন আর কেহ বিনাবাক্যব্যয়ে অবহিত হইতে চাহে না। কোন্ সুদূর বিস্মৃত অতীতে আমার পিতৃপুরুষের বৈঠকখানায় ঝাড়ের বাতি জলিত, তাহার আলোক আমার মুখের কালি দূর করিতে আর পারে না! এখন স্বয়ংশক্ত না হইলে আর গতি নাই।

বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে এমন লোকের অভাব নাই, যাহারা দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার পায় না, এমন লোকের অভাব নাই যাহারা নিজ পরিবারকে যথোচিত রূপে প্রতিপালন করিতে পারে না, এমন লোকেরও অভাব নাই, যে সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হইয়াও শুধু হয়েকক্ষের দোহাই দিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বেড়াইতেছে এবং বন্ধ গৃহস্থের বহুকষ্টে উপার্জ্জিত অন্নের অংশ লইয়া কান্তি পরিপুষ্ট করিতেছে। ইহাতে তাহাদিগের লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই। তাহারা আত্ম-সম্মান বোধকে এমনি করিয়াই হারাইয়াছে। এই বিলুপ্ত আত্মসম্মানবোধকে নির্ম্মম আঘাতে জাগ্রত সচেতন করিয়া দিতে হইবে, তাহাদিগকে দেখাইয়া বুঝাইয়া শিখাইয়া দিতে হইবে জীর্ণ গৃহের অন্ধকার কক্ষে শুধু দুঃখ লাঞ্ছনা শুধু অপমান পুঞ্জিভূত হইয়া রহিয়াছে, অথচ সেই গৃহের বাহিরেই তাহাদের জন্য ক্ষুধার অন্ন গৌরবের জয়মাল্য, শক্তির বর্ম্ম সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে এ সুযোগ চিরদিন থাকিবেনা—প্রতিদিন আসিবেনা।

নূতনকে আমরা সহজ ভাবে দেখিতে পারি না। ইহা মানব ধর্ম্ম। অধিক কি বীরধুরন্ধর ইংরেজ দেশে ও যে দিন যখন বাধ্যতা মূলক সৈনিক ব্রত ধারনের আইন হয় তখন অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছিল। আর যদি ভারতবর্ষে সেই আইন হয়, তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যেই উহা সহ্য হইয়া আসিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, সৈনিক ব্রত ধারণ বাঙ্গালায় নূতন নহে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও আমরা ইহাতে অভ্যস্ত ছিলাম। শুধু দুই শতাব্দীর অনভ্যাস—ইহাতেই কি এই ব্যাপার আমা-দের নিকট এতই অপরিচিত অপরিজ্ঞাত ভয়াবহরূপে উপস্থিত হইয়াছে যে আমরা ইহার চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেও সাহস করিব না।

বাঙ্গালী জাতিও এমন ভাবে মনুষ্যত্ব হারায় নাই। যদি হারাইত তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম না যে চট্টগ্রামের একটী সভাক্ষেত্রেই ৯২ জন হিন্দু ও মুসলমান যুবক সৈনিক হইবার জন্য নাম লিখাইতেছে, রঙ্গপুরে ৫৮ জন ভর্ত্তি হইতেছে, রাজসাহীতে ৪০ জন অসিধারণ করিয়া রাজসৈন্যের গৌরব লাভেচ্ছায় দণ্ডায়মান হইতেছে, কুমিল্লায় ৪০ জন আবেদন করিতেছে! সে দিন কর্ণেল বুডেয়ার যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখিয়াছি যে গত ১লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত কেবল ঢাকা জেলা হইতেই ১৩৮ জন সৈন্য রাজসেবা ও দেশসেবার জন্য শিক্ষা কেন্দ্রে গমন করিয়াছে। ঢাকা জেলাই ঐ তারিখ পর্য্যন্ত বঙ্গে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। গত ৩০ আষাঢ় তারিখে ঢাকার সৈন্য সংগ্রহ সভায় যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতে প্রকাশ যে ১৫ই মে হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত—এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ঢাকা জেলা হইতে ১৩৮ জন যুবক সৈন্যদলে যোগ দান

করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ যদি এক ব্যাটালিয়ন, কি ডিভিসন সৈন্য দিতে পারে তাহা হইলেই তাহার শ্রীবিক্রমপুর নাম সার্থক হইবে। একদিন এই শ্রীবিক্রমপুর সেন রাজগণের দেবের নৈবেদ্য স্বরূপ ছিল। বর্ম্মচর্ম্মধারী সৈনিক পুরুষের হর হর বম্ বম্ নাদে একদিন তাহার গগন পবন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইত। শ্রীবিক্রমপুরবাসী কি আজ তাহার পূর্ব্ব গৌরবের জীর্ণ কাঠাম খানি লইয়াই তুষ্ট থাকিবে?

বিশ্বের বীরের মহাসভার কথা ছাড়িয়া দি—বঙ্গবীরের সভাতেই মাণিকগঞ্জের আসন যে কত নিম্নে তাহা কি আপনারা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বাঙ্গালার চারিদিকে যখন জাতীয় জীবনের উষা রক্তিমচ্ছটায় দেখা দিয়াছে, তখনো 'তুমি যে তিমিরে—তুমি সে তিমিরে।' আহার, নিদ্রা, বন্দ ও কুইনাইনকেই জীবনের সম্বল ও লক্ষ্য করিয়া আপনারা বাঙ্গালীর বিজয়-যাত্রায় যে স্থলে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন—যাহাদের হিয়ায় তপ্ত শোণিত-স্রোত বহিতেছে, যাহাদের দীপ্ত উৎসাহ নির্ভিক অধ্যবসায় সমুচ্চকল্পনা বেগবতী আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে এই যাত্রাপথের শীর্ষস্থানে জয়পতাকা বহন করিয়া লইবার জন্য পদে পদে উত্তেজিত করিতেছে—তাঁহাদের পথকে সহজ ও সরল করুন, তাহাদের দেহকে আশীর্ব্বাদের বর্ম্মে আবৃত করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে মুক্তি দিন। গৌরবের প্রতিষ্ঠায় বিজয়ের সুরভি আজ নিশ্বাসে নিশ্বাসে তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া চিত্ত মত্ত করিতেছে—তাহাদের অতীত বংশের কলঙ্কটীকা যে জলিয়া জলিয়া তাহাদিগেরও ললাট দগ্ধ করিতেছে! মুক্তি—মুক্তি দান করুন; বীরের করস্পর্শে তাহারা যে সেই দগ্ধ ললাট শীতল করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে! বালক শম্ভুর ন্যায় কত শম্ভু যে আজ আদেশের অপেক্ষায় আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গালার যুবকগণ! শারদীয় মহাপূজার উদ্বোধনের শঙ্খ বাজিবার আর বিলম্ব নাই। তোমরা হৃষ্টচিত্তে বালক সম্মিলনের জন্য গৃহে যাইতেছ। বিজয়ার মহামিলনের শুভক্ষণে একবার মনে করিও যে তোমাদের সহস্রাধিক ভ্রাতা তোমাদেরই সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হইবার জন্য মেসপটমিয়ায় মরুশ্বাসের সহিত তাহাদের তপ্তশ্বাস মিশাইতেছে—মনে রাখিও তাহারা সুদূর সাগরের তীরে অথবা বালুময় নদীতটের সিক্ত প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বাঙ্গালার আকাশের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালার জয়রথচক্রের পথে আর কেহ তোমাদের আগে বুকের ছাতি পাতিয়া দিতে পারে না—বাঙ্গালার সঙ্কটের দিনে আর কেহ তোমাদের মত হোমাগ্নির উজ্জ্বল শিখায় আঁধার আকাশকে উদ্ভাসিত করে না—বাঙ্গালার পরীক্ষার দিনে আর কেহ তোমাদের মত সহাস্যবদনে অনলে প্রবেশ করে না! কোন্ এক শুভ লগ্নে—সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার কোন্ এক মাহেন্দ্রক্ষণে তোমাদের তপশ্চরণ স্বর্গ হইতে সুরধুনীর ধারা আনয়ন করিয়া মহাকালের উন্নত জটার মধ্যে লীলা তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছে—কপিলের শাপগ্রস্ত বাঙ্গালী জাতির শ্মশানভস্ম তাহার স্পর্শে আজ নবমূর্ত্তি লইয়া সঞ্জীবীত হইতেছে!

তোমাদের পুণ্যে আজ আমরা পবিত্র হইয়াছি—তোমাদের গর্ব্বে আজ আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি—তোমাদের জয়গানে আজ আমাদের নিরানন্দ গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আজ উদ্বেলিত হৃদয়ে তাই তোমাদেরই আবাহন-মন্ত্র পাঠ করিতেছি। স্বার্থশূন্য স্বদেশ সেবায় যে পবিত্র মূর্ত্তি লইয়া তোমরা দেবশিশুর ন্যায় দেখা দিয়াছ, তাহা যেন বাঙ্গালায় অক্ষয় অমর হইয়া রহে—বীরাষ্টমীর মহাব্রত যেন বাঙ্গালার প্রতিদিনের ব্রত হয়—মহাপূজার আরতির ধূপধূনার গন্ধে যেন পৃথিবীর বায়ু সুরভিত হইয়া উঠে। আর তোমরা কর্ত্তব্যের উজ্জ্বল দীপ জালিয়া বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে সিংহনাদে গর্জ্জন করিয়া বল—উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভোলা।

(ঢাকা সাহিত্য-সজ্যের অধিবেশনে পঠিত।)

(১)

ওরে আমার চিত্ত হারা,
ওরে আপন ভোলা,
এম্নি করে দিবস্ নিশি
ছুল্‌বে কি তোর দোলা!
থাক্‌বে না ত এমন হাসি, প্রাণের হরষণ,
কুঞ্জবনে যাইবে থেমে অলির গুঞ্জরণ;
রাজ পুরীতে সারা নিশি জল্‌বে না আর আলোক্‌রাশি,
অন্ধসম শক্ত হবে
আঁধার পথে চলা.
ভাঙ্‌তে যে গো হবেই রে তোর
ঝুলন রাসের খেলা।

(২)

ওরে আমার চিত্ত হারা,
ওরে আমার সব,
সিন্ধু তীরে দাঁড়িয়ে কি গো
শুন্‌বি কলরব?
সিন্ধু মাঝে বান ডাকিবে, দুল্‌বে যে তোর তরী,
এর্ মাঝেতেই দিতে হবে মহাসাগর পাড়ি;
কাঁপে যদি, কাঁপুক্ পরাণ, গাইতে তোমায় হবেই যে গান,
নইলে আঁখি সিক্ত করে
আস্‌বে ভরে জল,
পাগ্‌লা হাওয়ায় ক্ষুদ্র তরী
কর্‌বে যে টল্‌মল্

(৩)

ওরে আমার সৃষ্টি ছাড়া,
ওরে দুলাল মোর,
এম্নি করে দিনটারে তুই
কর্‌বি কিরে ভোর?
আঁধার-ঘন-নিবিড় মেঘে সন্ধ্যা আস্‌বে নেমে,
পথের যত পতারতি, সব যাবে যে থেমে;
আকাশ ভাঙা মেঘের ছলে ভাস্‌বে যে পথ আঁখির জলে,—
বন্ধু যদি শক্ত করে
রয় বা তোরে ঘিরে,
পারের দুয়ার বন্ধ হলে
যেতেই হবে ফিরে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

মিনতি।

(Heine হইতে)

তপ্ত ধরারে রক্ষা করোনা,
করুণা করোনা মানব দলে;
মিথ্যা গর্ব্ব আশ্রয় করি
পড়ে আছে যারা আঁধার তলে।
জ্বালা দিতে যারা জনম লভেছে
মুক্তি তাদেরে দিওনা প্রভু,
বিধান বলি অভিমানী যেগো
তাহারে রক্ষা করোনা কভু।

প্রেমিক জনারে বঞ্চনা করে
যে রমণী সারা দিবস নিশি,
আলোক তাহারে দিওনা হে প্রভু,
থাক্ সে গো চির আঁধারে মিশি।
মিথ্যা কপট বন্ধু যাহারা
চিত্তে হানিছে যাতনা-শর,
বহ্নির মত উল্কা উগারি
তাহাদেরে প্রভু দগ্ধ কর।

শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ।

মানসী-সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

আমাদের পুরাণে আদিতে মানসী সৃষ্টি হওয়ার বহুলউল্লেখই পাওয়া যায়। এই মানসী সৃষ্টির প্রকৃত বিজ্ঞান কিন্তু পুরাণে পাওয়া যায় না। মানসী সৃষ্টি এই রূপে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পৌরাণিক গল্প মাত্রেই পরিণত হইয়াছে। এইরূপে গল্পমাত্রে পরিণত হওয়াতেই মানসী সৃষ্টির বিবরণে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক ও অসম্ভাব্য কল্পনার যোগ দৃষ্ট হয়। এই প্রকারের অলীক কল্পনার মধ্য হইতে প্রকৃত সত্যের উদ্ধার একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিলেই হয়। কিন্তু সম্প্রতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে আলোক পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে পৌরাণিক বৃত্তান্ত সকল তাহার মধ্যে ধরিলে প্রকৃত সত্য তাহাতে যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে তাহা অবশ্যই আশা করা যায়। এবম্প্রকারে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদ্বারা পৌরাণিক মানসীসৃষ্টিবিবরণের মধ্যে যে প্রকৃত সত্যের সন্ধান আমরা পাইয়াছি তাহাই উপস্থিত প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়া মানসী সৃষ্টির সম্বন্ধে পাঠকবর্গের কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করিব।

পুরাণ সকলের মধ্যে বায়ুপুরাণে মানসী সৃষ্টির যে বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই আমাদের নিকট প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া প্রতীয়মান হয় সুতরাং বায়ুপুরাণ হইতেই মানসী সৃষ্টির বিবরণ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিব—

> "ধ্যাতেতু মনসা তাসাং প্রজানাং জায়তে সকৃৎ।
> শব্দাদি বিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণঃ॥
> ইত্যেবং মানসী পূর্ব্বং প্রাক্‌সৃষ্টির্যা প্রজাপতেঃ।
> তস্যান্ববায়ে সম্ভূতা বৈরিদং পূরিতং জগৎ॥
> সরিৎসরঃ সমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতানপি।
> তদা নাত্যম্বুশীতোষ্ণা যুগে তস্মিংশ্চরন্তিহি॥
> পৃথ্বীরসোদ্ভবং নাম আহারং হ্যাহরন্তিবৈ।
> তাঃ প্রজাঃ কামচারিণ্যো মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ॥
> ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নতাস্বাস্তাং নির্ব্বিশেষাঃ প্রজাস্ততাঃ।
> তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন্ কৃতেযুগে॥
> ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং কল্পাদৌতু কৃতেযুগে।
> স্বেন স্বেনাধিকারেণ জজ্ঞিরে তে কৃতে যুগে॥"
>
> অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।
>
> বায়ুপুরাণম্॥

পূর্ব্বে তাহারা একবার মাত্র ধ্যান করিলেই অভীষ্ট সন্তান উৎপন্ন হইত। ধ্যান মাত্রেই তাহাদিগের শব্দাদি পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত শুদ্ধ বিষয় সমূহ প্রাদুর্ভূত হইত। প্রজাপতি পূর্ব্বে এই ভাবে যে সকল মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বংশজাত প্রজাদ্বারাই এই জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। সেই যুগাদিম কালে শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি অত্যল্পই ছিল। প্রজাগণ সরিৎ, সরোবর, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদিতে তখন বাস করিত। সেই সমস্ত কামচারী মনঃসিদ্ধি সম্পন্ন প্রজাগণ পৃথিবীর রসজাত আহার সমুদায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই সমস্ত প্রজাগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছিলনা সকলেই নির্ব্বিশেষ ছিল। আয়ু, রূপ, সুখ সমস্ত বিষয়েই তাহারা সকলে তুল্য ছিল। সকলেই নিজং অধিকারে থাকিয়া জীবন যাপন করিত।

এস্থলে মানসী বলিয়া যে সৃষ্টির কথা লিখিত হইয়াছে তাহা যে প্রাথমিক সৃষ্টি একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মানসীসৃষ্টির জীব সকল সরিৎ সমুদ্রাদিতে বাস করার উল্লেখ হইতে ইহারা যে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর জীব তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়। ইহাদিগের তুল্যরূপতা হইতেও ইহাদিগকে সর্ব্বনিম্নস্তরের জীব বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়। কারণ বিকাশের যতই নিম্নতা বৈচিত্র্যের ততই অভাব, আর বিকাশের যতই উচ্চতা বৈচিত্র্যের ততই বাহুল্য ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আদিম জীবগণের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ ছিলনা বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় ইহাদিগের শারীরিক বিকাশ যেরূপ বৈচিত্র্যহীন ছিল মানসিক বিকাশও যে তদ্রূপ বৈচিত্র্যহীনই ছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। ইহাতে সর্ব্বাদিম জীব সকলের প্রথম অপরিণত অবিশেষ মানসিক অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই আদিম জাতীয় কি জাতীয় জীব তাহা পুরাণে পরিষ্কার রূপে লিখিত হয় নাই। ইহাদিগের 'কুটক'ও

'কৃমিক' বলিয়া যে নাম পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে ইহাদিগকে বিশেষ জাতীয় জীব বলিয়াই মনে হয়। ইহাদিগের উৎপত্তিকালীন অন্য জীবোদ্ভিদের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা পাঠ করিলে ইহাদিগের বিশেষ জাতীয়ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে

"পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব নতদাসন্ সরীসৃপাঃ।
নোদ্ভিজ্জানারকাশ্চৈব তেহ্যধর্ম্মপ্রসূতয়ঃ॥
নমূল ফলপুষ্পঞ্চ নার্ত্তবমৃতবোন চ॥"

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ
বায়ুপুরাণম্।

"তখন পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ বা নারকীয় অধর্ম্মজাত জীব ছিল না। মূল, ফল, পুষ্প, আর্ত্তব কিংবা ঋতু কিছুই ছিল না।"

এই বর্ণনায় পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি কোনটীরই তখন অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া যখন উক্ত হইয়াছে তখন আদি জীব যে ইহাদের কোনও জাতীয় নয় এবং ইহাদেরই অপেক্ষা অধিক নিম্নজাতীয় তাহাই অনুমিত হয়।

প্রাথমিক জীবের সম্বন্ধে পুরাণে যে অস্পষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পাঠ করিলে সেই অস্পষ্টতা তিরোহিত হইয়া যায় এবং ইহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট পরিচয়ই আমরা প্রাপ্ত হই। Sea Anemone Protozoa প্রভৃতি প্রথম জীবরূপের জীবনসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিবরণ জ্ঞাত হইলে আমরা ইহাদিগকেই পুরাণের মানসীসৃষ্টি বুঝিতে পারি। পাশ্চাত্যদিগের ভাষায়ই আমরা ইহাদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে কৌতুকাবহবিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিব—

Anemone—"The sea-anemones have an extraordinary power of reproduction, they may be cut perpendicularly or across, and each cutting will give origin to a new animal. They produce living young, which issue from the mouth, and fix themselves upon adjacent rocks. They also have the power of reproducing their kind by gemination or budding." Beeton's Universal Information.

Protozoa—The reproduction takes place by fission or by breaking up of the contents of the body after encystment, each portion becoming a distinct animal or in other ways but never by true eggs" Webster's Dictionary.

"সামুদ্রিক এনিমোন্ সকলের সাধারণ উৎপাদনশক্তি আছে। ইহাদিগকে আড়াআড়িভাবে কাটা যাইতে পারে। তখন প্রত্যেক কর্ত্তিতখণ্ড হইতেই নূতন জীবের উৎপত্তি হয়। ইহারা জীবন্ত শাবক উৎপাদন করে, ইহা মুখ হইতে বহির্গত হয় এবং নিকটবর্ত্তী শৈলগাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে। কুঁড়ির দ্বারা স্বজাতি উৎপাদনের শক্তিও ইহাদের আছে।"

"প্রটোজোয়ার বংশবৃদ্ধি দৈহিক উপাদানের দ্বিধা ভাগের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাগই স্বতন্ত্রজীবে পরিণত হয়। ইহা হইতে অন্য প্রকারেও বংশবৃদ্ধি হইতে পারে--কিন্তু যথার্থ ডিম্ব হইতে কখনও বংশবৃদ্ধি হয় না।"

প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌দেহের মূল সূক্ষ্মতম উপাদানের নাম কোষ। এই কোষের বংশবিস্তার সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মেরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে আমরা তৎসম্বন্ধে একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি:--

Cells—The embryo animal, as well as the embryo plant, is in its early stage entirely formed of cells of a simple and uniform character ... ... Every cell owes its origin, in some way, to a pre-existing cell. In plants the most common mode of multiplication is the subdivision of the original cell into two halves." Beeton's Universal Information.

"ভ্রূণরূপ জীবও ভ্রূণরূপ বৃক্ষ প্রথম অবস্থায় সরল, একরূপ কোষের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়। প্রত্যেক

কোষই কোনরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী কোষ হইতেই উৎপন্ন হয়। মূল কোষটী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, ইহাই উদ্ভিদের মধ্যে বৃদ্ধির সাধারণ প্রণালী।"

পুরাণে প্রথম মানসী সৃষ্টির যার জগৎপূরিত হওয়ার যে বর্ণনা আমরা পাইয়াছি, উপরিউক্ত বিজ্ঞানবর্ণনার সহিত মিলাইলে কোষকেই আমরা সেই প্রথম মানসী সৃষ্টি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

উপরিউক্ত কোষের প্রত্যেক বিভক্তখণ্ড আবার দুইখণ্ডে বিভক্ত হয়—এইরূপেই বৃদ্ধি চলিতে থাকে। বেক্টেরিয়া (Bacteria) নামে যে জীবাণুজাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাদিগের বৃদ্ধি বিভাগের দ্বারাই হয়—ইহাদিগের সাধারণ জাতীয় (Schizomycetes) নামেই বিভাগের অর্থ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যেরূপ দ্রুত বেগে ক্ষণকালের মধ্যে অসংখ্য২ জীবাণুর সৃষ্টি হয়—তাহা শুনিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়।

প্রথম জীবরূপ সকলের প্রাগুক্ত বংশবৃদ্ধির বিবরণ হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি যে সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগেরই আরও তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই উৎপত্তি "স্বতঃজনন" নামে অভিহিত হইতে পারে। এইখানেই আমরা মানসীসৃষ্টির মূল রহস্য ধরিতে পারি। মনসীসৃষ্টিতে পুরাণে "যেমন চিন্তামাত্রেই সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়", স্বতঃজননেও যে মননমাত্রেই সৃষ্টি সম্পাদিত হয় তাহাই বুঝিতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক জীবরূপের সৃষ্টি জননেন্দ্রিয় বিকাশের পূর্ব্বতনসৃষ্টি বলিয়া মানযোগেই মাত্র সাধিত হইয়া মানসীসৃষ্টি হইয়াছে। জীবমাত্রেই চেতন, চেতনের প্রধানকার্য্যই মনন। প্রাথমিক জীবরূপের দ্বিধাভাগরূপ বংশবিস্তার কার্য্যের যে মননই প্রধান উত্তেজক হইবে, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। এইভাবে মননের কার্য্যকারিতাদ্বারা সৃষ্টি বলিয়াই প্রথম জীবসৃষ্টি 'মানসীসৃষ্টি' এই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

খাঁচার পাখী

বনের পাখি, যতই বাড়ে
খাঁচার ছায়ার গাঢ়তা,
নীল আকাশের খবর আনো
শ্যাম বনানীর বারতা।

অন্ধকারে ফুটিয়ে তোল
ভাবের কুঁড়ি তাহাতে,
হৃদয় কমল ফুটছে কোটে,
উঠ্‌ছে রবির আশাতে।

বাঁধার উপর বাঁধন পড়ে
আলোক আসে আঁধারে,
নিরাশারি কাঁটার বোঁটায়
আশার কলি বাঁধারে।

ডাক যে তোমার ছড়িয়ে গেছে
কাজ কি তোমার আলোকে,
সুরটী তোমার আটকাবে কি
পাখ্‌না এবং পালকে।

সন্দ করি অন্ধ করি
বন্ধ করি খাঁচাতে,
পারবো নাক সুর ফিরাতে
ইচ্ছা মতন নাচাতে।

বাওরে গেয়ে বনের পাখী
বন্ধ কুলুপ চাবিতে
উঠ্‌বে রবি ফুটবে ঊষা
তোমার গানে দাবীতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বীণা-পাণি।

জয়-জয়-জয়-জয় মা ভারতী
    শুভ্র কমলাসীনা ;
চন্দ্র তপন লাঞ্ছিত জ্যোতিঃ
    শ্রীকরে মোহন বীণা।
মথন করি অন্ধ আঁধার
    আহরিয়া জ্ঞান সুধা,
বিশ্বে বিলালে বিপুল পুলকে
    মিটায়ে মানস ক্ষুধা।

কমল যেমন ধীরে ধীরে ধীরে
    কনক কিরণ পেয়ে,—
বিকশিয়া উঠি বিমল হাস্যে
    গন্ধে ফেলে গো ছেয়ে ;
জ্ঞান তেমনি মেলিল নয়ন
    শুনিয়া বীণার সুর,
আলোক রশ্মি পৃথ্বী ছাইল
    উজলি হৃদয় পুর।

বন্দনা তোমা করি গো জননী
    দাও মা' কণ্ঠে সুর,
সুর বেঁধে দাও হৃদয় বীণায়
    বেসুর করিয়ে দূর।
নমো নমো নমো শুভ্রবরণী
    শুভ্র কমলাসীনা,
চন্দ্র তপন লাঞ্ছিত জ্যোতিঃ
    শ্রীকরে মোহন বীণা।

তোমার বীণার সুর শিখি দেবী
    কালিদাস-কম-পিক্,
সুর মাধুরীর মদিরা পিয়াল
    পুলকি' সকল দিক্।
বসন্ত রচি নিত্য নবীন
    ছন্দঃ গন্ধময় ;
সহস্র দিনের ব্যবধানে থেকে
    আজিও যে কথা কয়।

শ্রীচারুভূষণ দেব।

প্রতীক্ষা (গান)

(মিশ্র কেদারা—ঝাঁপতাল)

কতদিন রবো বল আশা-পথ পানে চেয়ে?
নীরবে বাসিব ভালো যাব না তরণী বেয়ে?
প্রেম-তটিনীর কূলে, মধু ভরা ফুলে ফুলে,
এস যদি লব তুলে দিব গো তরী ভাসায়ে।

এস যদি রাখি তরী, না হলে ডুবিয়ে মরি,
কতকাল রবে প্রাণ বিষাদ বেদন সয়ে?
বেসেছি বাসিব ভালো, তুমি যে আঁধারে আলো
নীরবে কিরণ ঢালো—থাকিব আলোক লয়ে।
তুমি বঁধু তুমি সখা! তুমি চির মধুমাখা,
আঁধারে দিও গো দেখা, প্রেম-সুধা বরষিয়ে।
কতদিন রবো বল আশা-পথ পানে চেয়ে?

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

নাম-রহস্য।*

'T is but thy name, that is my enemy :—
Thou art thyself though * * *
* * O ! be some other name.
What's in a name ?
(Romeo and Juliet Act I Sc. II.)

"তোমার নামটাই আমার শত্রু, না হ'লে তুমিত তুমিই। ... .. আর কোনও নাম হও (ধারণ কর)। নামের মধ্যে কি আছে ?"- ইহা মুগ্ধা প্রেমিকার উক্তি। কালিদাস "প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু" বলিয়া যাহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, তদ্রূপ উক্তি তাহাদের একজনের মুখেই শোভা পায়। নামের মধ্যে কিছু না থাকিলে নামটা শত্রু হয় কি করিয়া ?

O Romeo, Romeo ! wherefore art thou Romeo ?
Deny thy father and refuse thy name.

এরূপ কাতর উক্তিই বা সার্থক কিসে হয় ? নামের মধ্যে কিছু আছে কি না তাহা কুন্দনন্দিনী জানিত; তাই "প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী" বলিয়াছিল,—"আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি না কেন ? এখন ত কেহ নাই — কেহ শুনিতে পাবে না। • একবার মুখে আনিব ? কেহ নাই — মনের সাধে নাম করি, ন—নগ—নগেন্দ্র ! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র ! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র ! আলো, আমার নগেন্দ্র ? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র ! কতই নাম করিতেছি — হলেম কি ? আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো — দূর হউক ! ডুবেই মরি। আচ্ছা, যেন এখন ডুবিলাম, কাল ভেসে উঠ্‌বো -- তবে সবাই শুন্‌বে, শুনে নগেন্দ্র ! নগেন্দ্র ! নগেন্দ্র ! নগেন্দ্র ! নগেন্দ্র ! নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন ?" †

নামের মধ্যে কত কি গূঢ় রস আছে তাহা শ্রীরাধা জানিতেন, তাই তিনি কহিয়াছেন—

"সই রে কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম ?
(আমার) কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন-প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ?"‡

---

* ঢাকা সাহিত্য-সমাজের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† বিষবৃক্ষ, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

‡ চণ্ডীদাস।

আর একজন বৈষ্ণব কবি সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসেরই অনুকরণে লিখিয়াছেন—

পৌর্ণমাসী পুত্রি! যুক্তমিদম্। তথাহি

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥ *

এই অতি সুমধুর রচনার যথাযোগ্য সরল ও সুন্দর অনুবাদ করিবার চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র হইবে মনে করিয়া এস্থলে একজন মহাজনকৃত পদ্যানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি:—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহব নামের মাধুরী!
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গঢ়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি॥ ধ্রু॥
আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাঢ়ায় কাণে
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ যবে হয় তবে নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥
কৃষ্ণ দু আখর দেখি, জুঁড়ায় তপত আঁখি,
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম উনমাদ।
যে কাণে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্যস্থান সব রস কৃষ্ণ-নাম
এ যদুনন্দন দাস কয়॥ †

এ সমুদয়ই যে কবির অবাস্তব কল্পনা ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। ভগবদ্ভক্তগণের কথা না হয় আপাততঃ ছাড়িয়াই দেওয়া যা'ক্, নামের মধ্যে যে কিছু একটা অনির্ব্বচনীয় রকমের রস আছে তাহা সম্ভবতঃ

* শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রণীত বিদগ্ধমাধব-নাটক ১ম অঙ্ক।

† যদুনন্দন দাস ঠাকুরের পদাবলী।— বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত অনুবাদ সহ বিদগ্ধমাধব নাটক দ্রষ্টব্য।

প্রেমিকমাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ। যতক্ষণ নামীকে না পাওয়া যায়, লোকে ততক্ষণ নাম লইয়া জল্পনা-কল্পনা করে। নামী জগতে আসিবার পূর্ব্বে তাহার নাম ঠিক হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, ইহাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে। আমি একজন বর্ষীয়সী শিক্ষিতা মহিলার কথা জানিতাম; তখন তাহার পৌত্র-পৌত্রী জন্মে নাই; পাছে তিনি জীবিতা থাকিয়া স্বয়ং তাহাদের নামকরণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য তাহারা জন্মিলে কাহার কি নাম হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই একাদিক্রমে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ ভাব যে বিশেষভাবে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ তাহাও আমি স্বীকার করিতে পারি না। কেন না একজন ইংরেজ লেখক * অসভ্যজাতিসমূহের মধ্যে নাম-করণ প্রথা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন—

"Occasionally the name is imposed before the child is born, and the proud parents call themselves father and mother of such an one before the expected infant sees the light."*

অর্থাৎ কখনও কখনও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাহার নামকরণ হয় এবং সেই সম্ভাবিত অথচ অজাত সন্তানের জনকজননী আপনাদিগকে অমুকের বাপ বা অমুকের মা বলিয়া প্রচার করিতে গর্ব্ব অনুভব করেন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও তাহার নাম-নির্ব্বাচন যে অনেক সময়ে গুরুতর মানসিক পরিশ্রমের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, ইহাও সম্ভবতঃ অনেকের জানা আছে। কেহ বা প্রথম পুত্রের হয়ত একটি অকারাদি নাম রাখিলেন; দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর, একটি অকারাদি নাম না রাখিলে শুনিতে ভাল শুনায় না মনে করিয়া, তাহারও একটি অকারাদি নাম রাখিলেন। এইরূপে পুত্রসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অকারাদি নামনির্ব্বাচন একটু আয়াসসাধ্য হইয়া পড়িবেই। আমার পরিচিত এক পরিবারে 'অখিল','অরুণ', অবোধ','অনুরূপ', 'অভিনব' 'অনিল' ইত্যাদি নাম দেখিয়াছি। আর এক পরিবারে 'অকিঞ্চন', 'অনঙ্গন','অনাবিল','অভিজিৎ' নাম হইয়াছে। এ নামগুলি রাখিতে যে একেবারেই অভিধান অনুসন্ধান করিতে হয় নাই তাহা কে বলিবে? অপর এক ব্যক্তি পুত্রের নামে 'ব্রতের' পক্ষপাতী। তাঁহার প্রথম পুত্র সত্যব্রত, দ্বিতীয় পুত্র ধর্ম্মব্রত, তৃতীয় ধৃতব্রত, চতুর্থ হিতব্রত। পঞ্চমের জন্ম হইলে যে নামনির্ব্বাচনে তিনি কিঞ্চিৎ বিব্রত হইবেন না তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। আমার এক আচার্য্য প্রথমপুত্রের জন্মের পর, সম্ভবতঃ মনের তাৎকালীন ভাবটুকু স্মরণীয় করিবার জন্যই, তাহার নাম দিয়াছিলেন—সন্তোষ। দ্বিতীয়পুত্রের জন্ম হইলে সন্তোষ-নামের সাদৃশ্যে তাহার নাম দিয়াছিলেন—'পরিতোষ'। এইরূপ ক্রমে ক্রমে অভিধানে তোষযুক্ত যতগুলি নাম পাওয়া গেল, সবই প্রায় নিঃশেষ হইল। 'নায়ক' পত্রিকায় পাঠ করিয়াছি, একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মদীয় আচার্য্যপাদকে বলিয়াছিলেন, "'তোষ' ত বাকি রাখিলেন না, এইবার পুত্র হইলে 'তোষ' ছাড়িয়া 'পোষ' ধরিবেন; সন্তোষ, পরিতোষ ইত্যাদির সঙ্গে 'তক্তপোষ' নাম একেবারে বেমানান হইবে না।" প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্রের নাম কি যুক্তিসূত্রে দেবেন্দ্রনাথ হইল তাহা জানি না। কিন্তু তদবধি ঠাকুর বাটীতে ইন্দ্রের বাহার বাড়িয়া চলিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র, হেমেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, রবীন্দ্র, রথীন্দ্র নাম ত আছেই; অন্যান্য শাখায়ও ইন্দ্রের সংখ্যা কম নহে। গণেন্দ্র, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সুধীন্দ্র, শৌরীন্দ্র, বলেন্দ্র, হিতেন্দ্র নামও সকলেরই বিদিত। আরও যে কত ইন্দ্র আছেন সব জানি না। আর কত ইন্দ্রই যে জোড়াসাঁকোর অমরাবতীতে আবির্ভূত হইবেন তাহাই বা কে বলিতে পারে? শোভাবাজারে নবকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া কালীকৃষ্ণ, বিনয়কৃষ্ণ, গোকুলকৃষ্ণ, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, মন্মথকৃষ্ণ, অময়কৃষ্ণ, অমরকৃষ্ণ, অনিলকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, হরিৎকৃষ্ণ প্রমোদকৃষ্ণ, প্রফুল্লকৃষ্ণ, প্রকাশকৃষ্ণ ইত্যাদি কৃষ্ণের বাহার বা বহর চলিতেছে। নামনির্ব্বাচনে যখন এত খুটিনাটি, এত পরিপাটী, এত বিলাস, এত আয়াস, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, নামের মধ্যে কিছুই নাই?

* Andrew Lang. vide Encyclopædia Britannica Ninth Edition Vol. 17 p. 169.

নামের মধ্যে রসিক ভাবুকগণ যে রসের সন্ধান পাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি, আরও কিছু পরে বলিতে হইবে। কিন্তু কেবল ভাবে ও রসে যে এই "অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদের" সকলের তৃপ্তি হইবে, এমন আশা করা যায় না। কেন না এটি "সাহিত্যিক"-গণের সমাজ। এরূপ আসরে আসিতে হইলে একটা গোটা প্রস্তরস্তম্ভ না হউক, অন্ততঃ একটা শিলালিপির প্রতিলিপি, বা তাম্রশাসন, বা একখানি অর্দ্ধভগ্ন দেবমূর্ত্তি, বা তাহাও না জুটিলে, একটা কোনও প্রাচীন মন্দির বা মসজিদের একখানি ইষ্টক হাতে করিয়া আনা দরকার। যদি তাহাও না জুটে, তবে শুনিয়াছি মধ্বভাবে গুড়ের ন্যায় কিছু বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া আনিলেও চলে। কাজেই নামতত্ত্বের অনুসন্ধানে কাব্যকলা ছাড়িয়া বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরই শরণাপন্ন হইতে হইল।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগার আর দার্শনিকের চতুষ্পাঠী উভয়ই বড় দুর্গম স্থান। সেখানে প্রশ্ন করিতে বড় হুঁসিয়ার হইয়া করিতে হয়। তুমি যে সোজাসুজি বলিবে, "হে মহাভাগ! নামতত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলুন;" তাহা ত চলিবে না। তোমাকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া কথা বলিতে হইবে। সেই জন্য প্রশ্নটি কি ভাবে উত্থাপন করা যায় প্রথমে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

ব্যক্তির নামে প্রধানতঃ দুইটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি তাহার নিজস্ব, অপরটি বংশের নাম। 'পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য' এই নামে 'পূর্ণচন্দ্র' এই অংশটুকু নামীর নিজনাম, ইহা তিনি পরিবারের অপর কাহারও সহিত একমালিতে ভোগ করেন না। 'ভট্টাচার্য' এই অংশটুকু তিনি পিতৃপিতামহ হইতে পাইয়াছেন, ইহা তাঁহাকে নিজবংশীয় সকল পুরুষের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটা গোত্র-নামও আছে—যাহা পূজার্চ্চনাদির সময়ে গ্রহণ করিতে হয়। মনে করুন যেন আমাদের কল্পিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশ্যপগোত্রীয়। তাহা হইলে নামের হিসাবে পূর্ণচন্দ্র ত্রিমূর্ত্তি হইতেছেন; গোত্রমূর্ত্তি যথা কশ্যপ, বংশমূর্ত্তি বা পরিবারমূর্ত্তি যথা ভট্টাচার্য্য, আর স্বমূর্ত্তি যথা পূর্ণচন্দ্র।

হিন্দুমাত্রেরই, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমাত্রেরই এই তিনমূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বংশমূর্ত্তি বা পরিবারমূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কাজেই তাহা পুণ্যকার্য্যে গৃহীত হয় না; তৎপরিবর্ত্তে বর্ণ-বাচক শর্ম্মা, গুপ্ত, দাস প্রভৃতি নাম গৃহীত হয়। গোত্রমূর্ত্তি, বর্ণমূর্ত্তি ও স্বমূর্ত্তি—এই তিন মূর্ত্তির উল্লেখ ভিন্ন হিন্দুর যাগযজ্ঞ, বিবাহ চূড়াকরণ ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কোনও কার্য্য চলিতে পারে না। "নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যম্।" আমরা পূর্ণচন্দ্রের এই তিন মূর্ত্তিরই আরাধনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাপকরূপে ধরিতে চাই।

পূর্ব্বোক্ত তিন নাম ব্যতীত পূর্ণচন্দ্রের আরও কতকগুলি অবান্তর পরিচয় আছে। যথা হিন্দু, বাঙ্গালী, ভারতবাসী বা এসিয়াটিক ইত্যাদি। এগুলি খুব সহজবোধ্য বলিয়া এতৎসমুদয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র যে 'মানুষ', তাহার এই ইতরজীবব্যাবর্ত্তক নামটির উৎপত্তির হেতু নির্ণয় করা কিঞ্চিৎ কঠিন। ঐরূপ প্রত্যেকজাতীয় জীবের ইতরজাতিব্যাবর্ত্তক এক একটি নাম আছে। এই নামগুলির উৎপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্যাবৃত, এবং সেইজন্য তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। কিরূপে মানুষের নাম মানুষ, ব্যাঘ্রের নাম ব্যাঘ্র, সিংহের নাম সিংহ, মার্জ্জারের নাম মার্জ্জার, কাকের নাম কাক, কুক্কুটের নাম কুক্কুট হইল, ঐ সকল নাম উহাদিগকে কে দিল, এবং কেন দিল, তাহা ভাবিবার যোগ্য।

প্রশ্নটিকে আরও সাধারণ ভাবে ধরিবার চেষ্টা করা যাউক। দেখা যাইতেছে দ্রব্যমাত্রেরই একটা না একটা নাম আছে, এই নামগুলির উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, এবং এবিষয়ে পণ্ডিতগণের কি মত, তাহাই আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমেই বৈয়াকরণ হয়ত বলিবেন, "নামের উৎপত্তি ঠিক বলিতে পারি আর না পারি, কৃৎ, তদ্ধিত, উণাদিপ্রক্রিয়াদি আলোচনা করিয়া প্রায় প্রত্যেক নামের একটা ব্যুৎপত্তি ত নিশ্চয়ই বলিতে পারি। মনুর

পুত্র মানুষ; যে বিশেষরূপ আঘ্রাণ করে সে ব্যাঘ্র; যে জীব হিংসা করে সে সিংহ। মনু নামেরও একটা ব্যুৎপত্তি দেওয়া চলে। তবে যদিও ব্যাঘ্র কেবল আঘ্রাণই করে না, "খাদতি চ", আর একা সিংহই হিংসা করে না, অন্য প্রাণীও করে, তথাপি কেবল আঘ্রাণমাত্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া ব্যাঘ্রের নামকরণ কেন হইল, এবং হিংসামাত্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া সিংহের কেন নামকরণ হইল, সে তত্ত্ব আমার ব্যাকরণে নাই। ব্যুৎপত্তিতে যদি এ তত্ত্ব-নির্ণয়ে কিছু সাহায্য হয়, তবে আমি ব্যাকরণ খুলিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকৃত আছি।" বৈয়াকরণকে ধন্যবাদ; বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের নিকট হইতে ফিরিবার সময় আবশ্যক হইলে আবার বৈয়াকরণের পদধূলি গ্রহণ করিব।

স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিবেন, "ওহে বাপু, ও তত্ত্ব গুহায় নিহিত। স্বয়ং মনু যোগবলে জানিয়াছিলেন যে, একসময়ে ব্রহ্মা নিজেই পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পের স্মৃতিবলে ভূতমাত্রেরই নামকরণ করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি সেই সকল নামই চলিতেছে; মানুষের কি শ্রাদ্ধ-প্রায়শ্চিত্তাদি ব্যতীত নিজের কিছু করিবার শক্তি আছে? প্রমাণ চাও? এই প্রমাণ দিতেছি। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ২১ সংখ্যক শ্লোকে আছে—"

সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌সংস্থাংশ্চ নির্ম্মমে॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা বেদানুক্রমে সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম এবং বৃত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন।*

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন, "স পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেষাং নামানি গোজাতে গৌরিতি, অশ্বজাতেরশ্ব ইতি......ইত্যাদি" অর্থাৎ সেই হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত পরমাত্মাই গোজাতির গো, অশ্বজাতির অশ্ব......ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার পক্ষে সকল প্রাণীর নামকরণ অসাধ্য কি? বিশেষতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে জগৎটা ত এইরকমই ছিল। সত্য কথা এই যে, জগৎটা অনাদি, নামগুলিও অনাদি। এ বিষয়ে বেদ ও দর্শনও আমার সহায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ ষষ্ঠ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডে দেখিতে পাই, "সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।" আবার ঐ উপনিষদেরই অষ্টম অধ্যায় চতুর্দ্দশ খণ্ডে দেখিতে পাই, "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা ইত্যাদি। এ বিষয়ে দার্শনিকগণ কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা জানিতে চাও ত বেদান্তসূত্র দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ ২০শ সূত্রের শারীরক ভাষ্য দেখ। আর তোমাদের বাইবেলে কি বলে? (স্মার্ত্তমহাশয় আধুনিক কালের up-to-date পণ্ডিত; সম্ভবতঃ ভ্রমণকালে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজও হাতে লইয়া ভ্রমণ করেন।) বাইবেলে বলে না কি?—

And God called the light Day, and the darkness he called Night..........

And God called the firmament Heaven..........

And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas. †

এইরূপ দিন, রাত্রি, আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্রের নামকরণ করিবার পর

And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl

* বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ।

† Genesis Chap. I.

of the air ; and brought them unto Adam to see what he would call them : and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.

And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field..........*

আদম কর্ত্তৃক একক্ষণে অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া যাবতীয় পশু-পক্ষীর নামকরণ অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের স্মৃতিবশে তৎসমুদায়ের নামকরণ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত নয় কি? বিশেষতঃ সৃষ্টির আদি কল্পনা করিলে অনেকগুলি গুরুতর দোষ ঘটে; যদি তাহা বুঝিতে চাও তবে অন্য সময়ে আসিও।"

স্মার্ত্ত মহাশয়ের যুক্তি অলৌকিক রহস্যপূর্ণ। তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। পরন্তু আমি তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেও, এই শ্রেণীর যুক্তিগুলি এই সভার অনেকের কাছেই সত্যের উদ্‌ঘাটক বলিয়া বিবেচিত না হইয়া সত্যের আবরক বলিয়াই অনুমিত হইবে। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক † এই শ্রেণীর যুক্তিকে "that indolent philosophy which refers to a miracle whatever appearances, both in the natural and moral worlds, it is unable to explain" বলিয়া গালি দিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্মার্ত্তের টোল হইতে দূরে পলায়নই শ্রেয়ঃ।

শাব্দিক হয়ত বলিবেন, "বৎস! তোমার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুতর; তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি না জানি না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তুমি নামের উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করিতেছ না, ভাষার উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ। কেন না যদিও Adam smith বলেন যে, ভাষার উৎপত্তি ক্রিয়াপদ লইয়া হইয়াছিল, তথাপি যে Dugald Stewart এর উক্তি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছ, তাঁহার মতে nouns অর্থাৎ বিশেষ্যগুলিই মানবকণ্ঠ হইতে প্রথম উচ্চারিত সার্থক ব্যক্ত শব্দ। বিশেষ্যগুলি নাম ব্যতীত আর কি?"

এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার উৎপত্তি আমার জিজ্ঞাস্য নহে; তবে আমার প্রশ্নের উত্তরে যদি ভাষার জন্মকাহিনী আসিয়া পড়ে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

এইবার বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার প্রশ্ন শুনিয়া বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "নামের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা জানি না; তবে নামসমূহ, এবং কেবল নাম সমূহই বা বলি কেন, যাবতীয় শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল মূল পদার্থগুলি পাইয়াছি তাহা তোমাকে দিতে পারি। এর অধিক যদি কিছু জানিতে চাও, তবে তাহা আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ অনধিকার চর্চ্চা হইবে। তুমি দার্শনিকপাড়ায় একবার যাও; যত অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে একটা না একটা theory খাড়া করা তাহাদেরই কার্য্য, আর তাহাদের মুখেই তাহা ভাল শুনায়। আমি যতটুকু নিঃসংশয়ে জানি তাহা তোমাকে বলিতেছি।

দেখ, জাতিবাচক নামগুলি বিশ্লেষণ করিতে করিতে আমরা কতকগুলি ধাতুতে উপস্থিত হই। একথা তুমি বৈয়াকরণের নিকট হইতেও শুনিয়া আসিয়াছ! তবে তোমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি হইতে বৈজ্ঞানিক রীতি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণ, কেবল তাহার নিজ ভাষা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক বহু ভাষা পরীক্ষা দ্বারা এক শ্রেণীর যাবতীয় ভাষার মধ্যে যতগুলি সাধারণ মূল ধাতু আছে, তৎসমুদয় উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এস্থলে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণগণই ভাষার ঐরূপ বিশ্লেষণের প্রথম পথপ্রদর্শক। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কতকগুলি ধাতু হইতে যে একটি বিশাল ভাষার সমুন্নত শব্দসম্পদ লাভ করা যায়,

* Genesis Chap. II.

† Dugald Stewart.

এ তত্ত্ব য়ুরোপে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে জানা ছিল না, কিন্তু ভারতীয় বৈয়াকরণগণ তাহা খৃষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে শিখাইয়া গিয়াছেন। * তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাষার ধাতু সংখ্যা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ১৭০৬; বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে সংস্কৃত ভাষার আরও বিশ্লেষণের ফলে ধাতুসংখ্যা প্রায় ৮৫০ এ নামিয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহার মধ্যে আবার কতকগুলি ধাতু নূতন যাহা সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণগণ ধরিতে পারেন নাই।

বহুভাষার তুলনা দ্বারা সত্য আবিষ্কারে কতদূর সুবিধা হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে নামের উৎপত্তি আমাদের বিচার্য্য, সেই নাম শব্দের ব্যুৎপত্তিই ধরা যাউক। তোমার বাঙ্গালা নাম শব্দটি সংস্কৃত নামন্ শব্দের পুচ্ছ কর্ত্তন করিয়া পাওয়া গিয়াছে। নামন্ শব্দ যে কেবল সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাহা নহে; প্রায় যাবতীয় আর্য্য ভাষায়ই ইহা দেখিতে পাই। ইংরাজিতে name, Anglo Saxonএ nama, Dutch ভাষায় naam, জার্ম্মাণদিগের ভাষায় name, Gothicএ namo, Iceland এর ভাষায় nafn, Danish এ navn বা namn, Swedish এ namn এ সমুদয়ই Latin nomenএর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। Latin nomen শব্দটি আবার gnomen শব্দের আংশিক ভাবে পরিবর্ত্তিতরূপ। সুতরাং ইহার সংস্কৃত রূপ সম্ভবতঃ কোনও কালে জ্ঞামন্ এইরূপ ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞা ধাতু হইতে উহার ব্যুৎপত্তি খুব যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। কিন্তু সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ অন্য ভাষার সহিত তুলনা করিবার অবসর না পাইয়া অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। শব্দটির ব্যুৎপত্তি যে দুরূহ, তাহা পাণিনীয় উণাদি প্রক্রিয়ার ৪র্থ পাদের ১৫২ সংখ্যক সূত্রটির প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়। ঐ স্থানে আছে, নামন্, সীমন্, ব্যোমন্, রোমন্, লোমন্, পাপ্মন্, ধামন্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ। ভট্টোজি দীক্ষিত ম্না ধাতু হইতে উহা ব্যুৎপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; তাহার অর্থ 'যাহা অভ্যাস করা যায় তাহাই নাম'। তৎপুত্র ভানুজি দীক্ষিত শব্দবাচক নম ধাতু হইতে উহা ব্যুৎপন্ন হইতে পারে, বলিতেছেন। ইঁহারা বা অন্য কোনও বৈয়াকরণ, জ্ঞা ধাতু হইতে যে উহার উৎপত্তি হইতে পারে তাহা বলেন নাই। যদ্দ্বারা জিনিষকে জানা যায়, চেনা যায়, বা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই নাম। এবিষয়ে বিশদভাবে পরে আরও অনেক কথা শুনাব বলিয়া এস্থলে আর অধিক আলোচনা করিব না।

যাহা হইতে নাম বা শব্দমাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিলাম, সেই ধাতুগুলির স্বরূপ কি তাহাও তোমাকে বলিতেছি। বর্ত্তমান যাবতীয় ভাষায় কেবল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দ্বারাই ধাতু চেনা যায়। শব্দরূপে ধাতুর প্রয়োগ সংস্কৃত বা অপর কোনও আর্য্য ভাষায় বা সেমিটিক ভাষায় অতি বিরল। ধাতুসমূহের মধ্যে নানা প্রত্যয়াদি যোগ দ্বারা শব্দ সৃষ্টি করিয়া ভাষায় তাহা প্রয়োগ করা হয়। অব্যাকৃত ধাতুর ব্যবহার প্রাচীনতম যুগের সংস্কৃত ভাষায়ও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু চীন দেশের ভাষায় ধাতু ও শব্দের মধ্যে আকারগত কোনও প্রভেদ নাই। সংস্কৃত দা ধাতু হইতে দানম্ বিশেষ্য, দত্ত বিশেষণ, দদামি, দাস্যামি, দদৌ প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করিয়া ভাষায় প্রয়োগ করা হয়। ঐরূপ Latin এ donum বিশেষ্য, do ক্রিয়া, গ্রীক ভাষায় didomi ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কুত্রাপি অব্যাকৃত দা ধাতুর প্রয়োগ নাই। কিন্তু চীনদেশীয় ভাষায় তা ধাতু অব্যাকৃত ভাবে বিশেষ্যরূপে 'মহত্ত্ব' অর্থে ক্রিয়ারূপে 'মহৎ হওয়া' অর্থে, ক্রিয়াবিশেষণ রূপে 'মহদ্ভাবে' এই অর্থে প্রযুক্ত হয়। আমরা (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা) মনে করি—ভাষার আদিম যুগে সকল ভাষায়ই এই রীতি প্রচলিত ছিল; ধাতুগুলিই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত, পরে মনুষ্যের জ্ঞানসীমার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার পরিপুষ্টি হইতে থাকিলে, নানারূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা এক ধাতু বা ধাতুরূপী শব্দ হইতে বহু শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। *

* "The idea of reducing a whole language to a small number of roots, which in Europe was not attempted before the 16th century by Henry Estiene, was perfectly familiar to the Brahmans at least 500 B. C. Maxmüller, Science of Language Vol. I p. 89.

* চীনদেশীয় ভাষায় inflexion বা বিভক্ত্যাদি যোগে ধাতু ব্যাকৃত করিবার প্রথা নাই। কিন্তু তাহাতে উচ্চারণবৈষম্য দ্বারা

নামের মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে ধাতুতে আসিয়া পড়িলাম ; আরও বুঝা গেল যে, ধাতুগুলিও সম্ভবতঃ পূর্ব্বে শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইত। যদি মনে করা যায় যে, এখন যাহার নাম ব্যাঘ্র, সে জীব ভাষার উৎপত্তিকালে মানব জাতির পরিচিত ছিল, এবং ঘ্রাণক্রিয়ামাত্রজ্ঞাপক কোনও নাম দ্বারা অভিহিত হইয়াছিল, তবে সম্ভবতঃ তখন তাহাকে ব্যাঘ্র না বলিয়া 'ঘ্রা'ই বলা হইত বা ঘ্রা ধাতুর কোন প্রাচীনতর রূপ দ্বারা তাহার নামকরণ করা হইয়াছিল। বৈয়াকরণ তোমাকে এতখানি বলেন নাই, তিনি শব্দের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ লইয়া ব্যস্ত ; প্রাচীনতর রূপগুলি নিয়মের ব্যভিচার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল বলেন। কিন্তু আমরা বলি প্রাচীনতম রূপগুলিই মূলরূপ—আদিম রূপ ; তোমরা পোষাক পরিচ্ছদ পড়াইয়া শব্দের বাহার বাড়াইয়াছ মাত্র।

নামের উৎপত্তি অর্থে এখন ভাষার মূলীভূত ধাতুসমূহের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের অধিকার নাই, তবে যে দুই একটি প্রাচীন মত প্রচলিত আছে, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। প্রথম মতে ধাতুগুলি সবই ধ্বন্যাত্মক শব্দ। মানুষ যখন বাক্‌শক্তিহীন ছিল, তখন যে জীবের যেরূপ রব শুনিয়াছিল তাহার সেইরূপ নামকরণ করিয়াছিল ; কেবল নামসম্বন্ধেই ঐ কথা নহে, ক্রিয়াসম্বন্ধেও তাহাই। যে ক্রিয়ার যেরূপ শব্দ হইত, সে ক্রিয়া বুঝাইতে সেইরূপ ধ্বনির অনুকরণ করা হইত। ঐরূপ অনুকরণ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা সহজসাধ্য দেখিয়া আদিম যুগের মানব ঐ প্রথার বহুল অবলম্বন দ্বারা ভাষার তথা নামের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই মতসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই মতকে "ভেউ-ভেউ বাদ (bow-wow theory) এই নাম দিয়া উপহাস করিয়াছেন। * এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের একমাত্র বক্তব্য এই যে, সকল নামই যে নামীর ধ্বনির অনুকরণে কল্পিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণাভাব। সকল ভাষারই কতকগুলি শব্দ যে ধ্বন্যাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমাদের গোয়ীচন্দ্রও

উণাদ্যন্তং কৃদন্তঞ্চ তদ্ধিতান্তং সমাসজম্।
শব্দানুকরণঞ্চৈব নাম † পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥

এইরূপ স্বীকৃতি দ্বারা কতকগুলি নাম যে শব্দানুকরণমাত্র তাহা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে শব্দের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত শব্দই এরূপ কোনও না কোনও ধাতু হইতে উদ্ভূত, যাহা শব্দানুকরণে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ইংরেজি cuckoo শব্দ যে কোকিলের রবের অনুকরণ তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। গ্রীক kokkyx, লাটিন cuculusও রবানুকরণ হইতেই উৎপন্ন বলিয়া মনে করিতে দোষ নাই। সংস্কৃত কোকিল শব্দে রবানুকরণটা ইংরেজি cuckoo শব্দের ন্যায় তত দূর স্পষ্টভাবে ধরা যায় না। সংস্কৃত বৈয়াকরণ কুক ধাতু ইলচ্ প্রত্যয় করিয়া কোকিল শব্দ সিদ্ধ করেন। কুক ধাতুর অর্থ গ্রহণ। কোকিল শব্দের বৈয়াকরণসম্মত অর্থ—'যাহার রব হৃদয়গ্রাহী।' এই ব্যুৎপত্তি একটু কষ্টকল্পিত বলিয়া কুক্ ধাতুও রবানুকরণ মাত্র বলিয়া না হয় ধরিয়া দেওয়া গেল। সংস্কৃত কুক্কুট শব্দও ঐরূপ। কাক শব্দ রবানুকরণ মাত্র বলিয়া যাস্ক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ বা মানব শব্দ

বৈবস্যাদি দ্বারা ৪০০টি মূল শব্দ হইতে ১২৬৩ ব্যুৎপন্ন শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রয়োগবশতঃ অর্থের ব্যতিক্রম সাধন দ্বারা ৪০ কি ৫০ হাজার পদ তৈয়ার করা হইয়াছে। Maxmuller's Science of Language vol I p. 375 foot-note দ্রষ্টব্য।

* এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মোক্ষমূলর উপহাস করার কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে " onomato-poetic theory" নাম " awkward, and not very clear," বলিয়া "bow-wow theory" নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নামটা শুনিলেই উহা বিদ্রূপাত্মক বলিয়া মনে হয়।

† এস্থলে নাম শব্দটির অর্থ বিভক্ত্যন্ত শব্দ। আমরা যে সকল নামের উৎপত্তি বিবেচনা করিতেছি তাহাও উহার অন্তর্গত।

মানুষের রবানুকরণে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় কি? আমরা হাঁসকে প্যাক্ প্যাক বলি না, হাঁস বা হংস বলি, তাহাত রবানুকরণ নয়। বালকে ছাগলকে 'ভ্যা', গরুকে হাম্বা, বিড়ালকে "মেও" বলে বটে, কিন্তু ভ্যা রব হইতে ছাগল-নামের, হাম্বা হইতে গো-নামের, কিংবা মেও হইতে বিড়াল নামের উৎপত্তি হয় নাই। আবার এক ধাতু হইতে বহুশব্দের উৎপত্তি লক্ষিত হয়, কিন্তু সেরূপ সকল শব্দই যে একবিধ ধ্বনির অনুকরণমূলক তাহা স্বীকার করা যায় না।

নামের তথা ধাতুমাত্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে অপর এক মত এইরূপ; ইতর প্রাণীর ধ্বনির অনুকরণে শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিলে মানুষের অবমাননা করা হয়; তাহার নিজ মনে হর্ষ, দ্বেষ, ঘৃণাপ্রভৃতি ভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল অব্যক্ত ধ্বনি বাহির হইত, সেই ধ্বনিগুলিই ব্যক্ত শব্দের মূল। অধ্যাপক মোক্ষমূলর এ মতেরও একটা বিদ্রূপাত্মক নাম দিয়াছেন। তিনি ইহাকে Interjectional Theory না বলিয়া Pooh-pooh Theory বলিতে চাহেন। সে যাহা হউক এ মতও বৈজ্ঞানিকের চক্ষে অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট।

'হা হা' শব্দ দ্বারা হাসির নামকরণ, 'খক্ খক্' শব্দ দ্বারা কাসির নামকরণ, এমন কি খোকার নামকরণও স্বীকার করিয়া লইতে বাধা নাই, কিন্তু অব্যক্ত শব্দে ও ভাষায় অনেক প্রভেদ। পশুপক্ষী অব্যক্ত শব্দ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অব্যক্ত শব্দই আছে, ভাষা নাই। যেখানে অব্যক্তের অন্ত, সেখানেই ভাষার উৎপত্তি। মানুষ অন্য উপায়ে ভাষার বা নামের সৃষ্টি না করিলে, তাহাদের মধ্যেও কেবল অব্যক্ত শব্দই থাকিত, তাহার কণ্ঠে বাগ্দেবীর পদ্মাসন স্থাপিত হইত না। বিশেষতঃ অব্যক্ত ধ্বনিগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বক করা হয় না; ভাষা বুদ্ধিপূর্ব্বিকা। মানুষ যখন হর্ষ, বিষাদ বা ক্রোধের বশে মুহূর্ত্তের জন্য মনুষ্যত্বের বাহিরে গিয়া পড়ে, তখনই তাহার কণ্ঠ হইতে অব্যক্তধ্বনি বাহির হয়। মানুষ যে মনুষ্যত্বের বাহিরে গিয়া ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল, একথা স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ হয়।"

বৈজ্ঞানিকের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া এইবার দার্শনিকের শরণাপন্ন হইলাম। দার্শনিক বলিলেন, "নামের অন্ততঃ অধিকাংশ নামের, উৎপত্তি ধাতু হইতে এবং ধাতুগুলিও সম্ভবতঃ পূর্ব্বে নামই ছিল, একথা বৈজ্ঞানিক হইতে শুনিয়া আসিয়াছ। কিন্তু ধাতুগুলির একটা প্রধান বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছ কি না বলিতে পারি না; তাহা এই,— প্রত্যেকটি ধাতুই একটা না একটা বহুবস্তুসাধারণ ভাবের দ্যোতক, ব্যক্তিবিশেষনিবদ্ধ বিশিষ্টভাবের দ্যোতক নহে। ইতর জীবের রবের অনুকরণে, বা মানুষের স্বকণ্ঠনিঃসৃত অব্যক্ত শব্দে সেই সাধারণ ভাবদ্যোতক ধর্ম্মটির অভাব। অথচ নামমাত্রই সাধারণভাবের দ্যোতক। এরূপ অবস্থায় সকল নামই কোনও না কোনও ধ্বনির অনুকরণ দ্বারা বা অব্যক্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

'গো' এই নামটি বিশ্লেষণ কর, দেখিবে ইহাতে গমন-করা-রূপ একটি ধর্ম্ম দ্যোতিত হইতেছে। এইরূপে 'সিংহ' নাম বিশ্লেষণ কর, তাহাতেও হিংসা করা বা হিংস্রত্বরূপ ধর্ম্ম লক্ষিত হইতেছে দেখিবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জগতে গরুই একমাত্র জঙ্গম পদার্থ নহে, অন্য জীবও গমন করে; যে বৈয়াকরণ গম্ ধাতু হইতে গো-শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছিলেন, তিনিও গমনশীল জীব। আবার গরু কেবল গমনই করে না, ঘাসও খায়, দুধও দেয়, এবং অন্যান্য অনেক ক্রিয়া করে। তবে কেবল গমন-ক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম দ্বারা তাহার নামকরণ কেন হইল? সিংহাদি নাম সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা চলে। এ বিষয়ে তোমার বৈয়াকরণ কোনও জবাব দিতে পারেন নাই। আমরা একটা জবাব দিতে চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, আমাদের মধ্যেও নানামত আছে। সকল মতের কথা এস্থলে উল্লেখ করিলে তোমার পুথি বাড়িয়া যাইবে।

বৈজ্ঞানিক বলেন, মানুষ ইতরপ্রাণিসমূহ হইতে স্বাভাবিক অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই অভিব্যক্তির ফলে তাহার এমন একটা ধর্ম্ম লব্ধ হইয়াছে, যাহা ইতরপ্রাণীতে নাই। তাহার নাম ভাষা, যাহার মূলে দেখিতে পাই—নামকরণ। তোমরা ইহা মানুষের instinct বা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিবে বল; কিন্তু মানুষকে পশুর

দলে,তির্য্যক্ জাতির মধ্যে ফেলিও না। কেননা ঐ যে তাহার উন্নতির মূলীভূত ধর্ম্মটি, তাহা কোনও পশুর বা তির্য্যক্ জাতির নাই। সে কেমন করিয়া নামকরণ করে তাহা পরে বুঝিব. কেন করে তাহার হেতু—তাহার ভাষা আছে। ভাষার অর্থ নামকরণ, ভাষার সার্থকতা নামকরণে, ভাষার উন্নতি নামকরণে। স্বভাব হইতে সে নানাদ্রব্যের মধ্যে তুলনা করিবার ও তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিবার শক্তি পাইয়াছে ; তাহার সেই তুলনার ফলও যাহাতে অপরের বোধগম্য হইতে পারে সেরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে পারে। সে কেবল রবের অনুকরণ করে না—তাহা হইলে শুকপক্ষীই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিত, শুকদেবের প্রয়োজন হইত না। তোতাপাখী বৃক্ষের কোটর ত্যাগ করিয়া তাজমহল না হউক, অন্ততঃ আসান মঞ্জিলের মত একটা বাড়ী করিতে পারিত। মানুষ কেবল হর্ষবিষাদসূচক রব করে না। তাহা কোন জীবে না করে? কিন্তু হর্ষবিষাদসূচক রব ভাষা নহে। ভাষা হর্ষের বা বিষাদেরও প্রকৃতিটুকু ভালরূপে বুঝিয়া তাহার নামকরণ করে। উপবেশনক্রিয়া সদ্ ধাতু দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কেন হয় তাহা জানি না ; কিন্তু লোকে দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে বসিয়া পড়ে, সেই জন্য সেই উপবেশন ক্রিয়াসাম্যে দুঃখের নাম দেওয়া হইল—বিষাদ। লোকে পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলে বসিয়া বিশ্রাম করে ; সেই জন্য যেখানে বসিয়া বিশ্রাম করা যায় তাহার নাম হইল সদন ; আবার তাহাই যখন বড় আকারে নির্ম্মাণ করা গেল, তখন সেই উপবেশনার্থক সদ্ ধাতু হইতে তাহারও নাম প্রাসাদ রাখা হইল। ইহাই ভাষা, ইহা ত রবানুকরণ মাত্র নহে। এ সকল নাম মানুষই দিতেছে, হিরণ্যগর্ভ দেন নাই ; দিলেও মানুষের যদি ভাষা না থাকিত, তবে হিরণ্যগর্ভ তাহা মানুষের বোধগম্য করিলেন কি করিয়া ? নাম ঈশ্বরের দান নহে, নামকরণ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বরের দান বটে। অবশ্য একথা বলা আবশ্যক যে, হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ যদি মানুষের বুদ্ধিতত্ত্ব হয়, তবে সকল দ্রব্যের নাম হিরণ্যগর্ভদত্ত, ইহা স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, প্রথম নামগুলি ব্যক্তিবাচক ছিল কি জাতিবাচক ছিল ? 'গো' এই নামটা কি প্রথমে কোনও একটি গরুকে দেওয়া হইয়াছিল, না একেবারে গোজাতিকে দেওয়া হইয়াছিল ? এক দল বলেন, সমগ্র জাতির নামকরণ অপেক্ষা ব্যক্তির নামকরণ অধিক স্বাভাবিক। প্রথম যে একটি জীবকে চলিতে দেখিয়া আদিম যুগের মানব তাহার নাম গো রাখিয়াছিল, পরে সেই জীবের সহিত সাদৃশ্য দর্শন করিয়া তজ্জাতীয় অন্য জীবের নামও গো রাখা হইয়াছিল। এইরূপে ব্যক্তির নামকরণই প্রথমে হইয়াছে, পরে জাতির নামকরণ। কিন্তু এতৎসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে গমনক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া গোজাতির নামকরণ করা হইয়াছে, সেই গমনক্রিয়াও সচল বহু ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ একটি ধর্ম্ম। 'গো' নাম প্রথমে কোনও একটা গরুকেই দেওয়া হইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহাও বহুগমনশীল ব্যক্তির সহিত সাদৃশ্যদর্শনে দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে সামান্য হইতে বিশেষে আবার বিশেষ হইতে সামান্যে লীলাখেলা করিয়া মানুষের ভাষা কত নবনব বিভূতি প্রদর্শন করিতেছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এইরূপে একই জীবের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে। নাম হয় কেন, তাহা 'নাম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই বুঝিয়া থাকিবে। যাহা দিয়া জানা যায় তাহাই নাম। যথার্থতঃ জানা যায় কিরূপে ? না, অপর নানাপদার্থের সঙ্গে সাধারণ কোনও ধর্ম্ম আবিষ্কার দ্বারা। একটা গতিশীল জীব দেখিয়া তদ্রূপ অন্য গমনশীল পদার্থের সঙ্গে যখন তাহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা হইল, তখন সেই সাদৃশ্যমূলে তাহার গো এই নামকরণ করা হইল। সেই জন্য, কেবল গরুর গো নাম দেওয়া হয় নাই ; সূর্য্যরশ্মির নাম গো, বাণের নাম গো, জলের নাম গো ইত্যাদি। আবার সেই গরুরই যখন অন্য এক ধর্ম্ম, যথা 'বৎস কর্ত্তৃক দুগ্ধ পান', লক্ষিত হইল, তখন সেই পানক্রিয়াসাধর্ম্ম্যে তাহার নাম ধেনু রাখা হইল। 'ধে' ধাতু হইতে ধেনু শব্দের উৎপত্তি। ধে ধাতুর অর্থ পান করা। আবার দোহনক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহার দোগ্ধ্রী নাম হইয়াছে।

ভাল, মানুষ স্বজাতির মধ্যে কি সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় ?

'মানুষ' নামটির অর্থ তোমাদের ব্যাকরণ মতে মনুর সন্তান।* মানুষ মাত্রেরই এক সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপত্তি কল্পনা করা অসম্ভব নহে; কিন্তু মানুষ নামকরণ করিবার পরে সেই পূর্ব্বপুরুষের কল্পনা করা হইয়াছিল, কি প্রথমতঃ সেই অজ্ঞাত পূর্ব্বপুরুষের নামকরণের পর মানুষ নামের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে। যাহা হউক মনে করা যাউক যেন মনু নামের সৃষ্টির পর মানুষ নামের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলে মানুষ আপনার আদিপুরুষের কোন্ ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া তাহার 'মনু' এইরূপ নামকরণ করিয়াছিল? মন্ ধাতুর অর্থ মনন বা জ্ঞান। মানুষমাত্রেই মনন করে, সুতরাং তাহাদের সাধারণ পূর্ব্ব-পুরুষও মনন করিতেন; সেইজন্য তাহার নাম মনু†। ইংরেজজাতি মনুকে চিনেনা,‡ কিন্তু মন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন man নামে আপনাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকে। Gothic ভাষায় man ও mannisks, আর German ভাষায় mann ও mensch দুই নামই আছে। সবগুলি নামই মন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

মরণ জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম, কিন্তু অন্যজাতীয় জীবের মরণাপেক্ষা স্বজাতীয় জীবের মরণে প্রাণে অধিক আঘাত পাওয়া যায়। অন্য জীবের মরণে বায়সকুলের কিরূপ আনন্দ, আর স্বজাতীয় জীবের মৃতদেহদর্শনে কিরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মানুষও এ সাধারণ নিয়মের বাহির্ভূত নয়। মরণ মানুষের বড় ভয়ের অবস্থা। যে মরে সে প্রাণে বড় দাগা দিয়া যায়। তাই চারিদিকে নানা মরণশীল জীব সর্ব্বদা দেখিলেও, মানুষ স্বজাতির মরণধর্ম্মটি বড়ই ভয়ের সহিত, বড়ই দুঃখের সহিত, লক্ষ্য করিয়াছিল; এবং সেই আতঙ্কের ও খেদের নিদর্শনরূপে স্বজাতির নামকরণ করিয়াছিল—মর্ত্ত্য। § গ্রীক ভাষায় মর্ত্ত্যের অনুরূপ brotos, লাটিনে mortalis, আর ইংরেজিতে mortal শব্দ আছে।

আবার মানুষের অহঙ্কার ও অভিমান যে কত বেশি, তাহাও তাহার নিজ নামকরণে স্পষ্ট দেখা যায়। যখন একদল মানুষ আপনাদের দলগত স্বার্থের ঐক্য অনুভব করে, তখনই তাহারা আপনাদের দলের প্রত্যেকের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া, দলের বহির্ভূত অন্যকে তফাৎ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কুকুরকে ক্ষেপা না বলিলে তাহাকে বধ করিবার ছলটা সহজে পাওয়া যায় না। সেইজন্য দলগত ঐক্যবোধ মনে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইলেই মানুষ নিজ দলের বহির্ভূত ব্যক্তিগণকে নির্য্যাতন করিবার ব্যাজ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণ নিজগণ্ডীর সকলকে মনুর সন্তান, অতএব পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ, বলিয়া গণ্ডীর বাহিরের সকলকে রাক্ষস, পিশাচ, বানর, নাগ ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়া নির্য্যাতন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকল জাতির মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে এই প্রকৃতি দেখা যায়। এস্কুইমোরা আপনাদিগকে, এস্কুইমো অর্থাৎ "কাঁচা মাংস খেকো" বলে না, ঐ নাম অন্যজাতির প্রদত্ত।"

আর অধিক বিদ্যা সংগ্রহ করিলে তাহার ভার বহন করা কঠিন হইবে ভাবিয়া দার্শনিকের চিন্তাকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলাম। বড় ভয়ে ভয়ে তথায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, কেননা আশঙ্কা ছিল, হয়ত দার্শনিক তদীয় চিন্তার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর গ্রামে উঠিতে উঠিতে বলিয়া বসিবেন, "নামের উৎপত্তিসম্বন্ধে এত অনুসন্ধিৎসা কেন? উহার

* পাণিনি ৪।১।১৬১; মনোর্জাতৌ অঞ্ যতৌ ষুক্ চ।

† পাণিনীয় উণাদিসূত্র ১।১০।

‡ মনু আর Noah একব্যক্তি কিনা তদ্বিষয়ক তর্ক এস্থলে আলোচ্য নহে।

§ মোক্ষমূলর বলেন, মানুষের মর্ত্ত্য নাম দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, যখন ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল, তৎকালে মানুষ কোনও না কোনও প্রকার অমর্ত্ত্যজীবে বিশ্বাস করিত। Vide Maxmuller's Science of Language Vol. I. p. 525. কিন্তু এই বিশ্বাস মানুষের মর্ত্ত্য-নামকরণের হেতু বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

আলোচনায় ত কোনও পরমার্থ দেখিতে পাই না। নাম আর রূপ দুই-ই মিথ্যা, কেননা দুই-ই অবিদ্যাকৃত। শঙ্করভাষ্যে কি পড় নাই—"অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ"? সৌভাগ্যক্রমে বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকেরা জগৎটাকে অসত্য না বলিয়া ঘোরতর সত্যরূপে চিনিতে শিখিয়াছেন। তাহার প্রমাণ য়ুরোপের বর্ত্তমান মহাসমর। যাহারা লুঁভে বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করিতে মনে একটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে নাই, তাহারাই না য়ুরোপীয়দর্শনের সম্প্রদায়কর্ত্তা বলিয়া গর্ব্ব করে?

দার্শনিকের নিকট হইতে যতটুকু জ্ঞান সংগ্রহ করা নিজের মস্তিষ্কের পক্ষে অনাময়কর ভাবিয়াছি, তাহা নিজ মনে পুনরালোচনা করিয়া দেখিলাম, এখনও আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের অতি অল্প অংশই আয়ত্ত হইয়াছে। এখন তবে কাহার শরণাপন্ন হই ?

জাতিবাচক নামের উৎপত্তির বিবরণ যাহা হউক একটা পাওয়া গিয়াছে। এখন তাহা হইতে একস্তর নামিয়া আসিয়া গোত্রনাম ও সঙ্ঘ নামের উৎপত্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ করা যায় কিনা দেখা যাউক। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকের নিকট সদুত্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়; আর সাহিত্যিকসমাজে ইদানীং তাঁহার সম্মানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেননা আমাদের জাতীয় তোষাখানায় যাহা কিছু অভাব, তাহা ঐতিহাসিকগণই পূরণ করিয়া দিতেছেন; কেবল যে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিতেছেন তাহা নহে, অনেক নূতন নূতন চকচকে জহরত নাকি নিজ নিজ কারখানায় গড়িয়াও দিতেছেন। আমরা জহরী নহি; যাহারা জহরত চিনেন, তাঁহারা আবার সকলেই নিজ নিজ পণ্য লইয়া ব্যস্ত; কেহ যে নিরপেক্ষ ভাবে পরের কারখানায় মাল পরীক্ষা করিবেন, এরূপ সময় অল্প, প্রবৃত্তি আরও কম।

ঐতিহাসিক বলিলেন, গোত্র নাম ও সঙ্ঘ নামের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে তাহা ইদানীং আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্য জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত আচারের আলোচনা করিলে কতকটা, অনুমান করা যায়। ঐ সকল জাতির মধ্যে দেখা যায়, এক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা অনেক সময়েই আপনাদিকে একবংশোদ্ভূত, এমন কি একই মূল হইতে উদ্ভূত মনে করে। ঐ মূল যে সব সময়ে মানুষ বা দেবতা, তাহা নহে; অনেক সময়েই তাহা কোনও ইতরজাতীয় জীব, কিংবা অচেতন পদার্থ। ইংরাজি ভাষায় ঐরূপ মূলের নাম totem দেওয়া হইয়াছে। যাহারা আপনাদিগকে এক বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয় এরূপ বহু দল নানা স্থানে, এমন কি পরস্পর হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে, উপনিবিষ্ট হইলেও, তাহারা ব্যাঘ্র, বৃক, সূর্য্য, চন্দ্র, তিত্তিরি ইত্যাদিরূপ কোনও একটা totem দ্বারা পরস্পরকে জ্ঞাতি বলিয়া চিনিয়া লয়।* আবার অন্য সঙ্ঘ হইতে নিজ পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য নিজ সঙ্ঘের totem দ্বারা নিজ বেষভূষাদি চিহ্নিত করিয়া রাখে। সেমিটিক ও টিউটনিক জাতির মধ্যেও নাকি ঐরূপ totem হইতে উৎপন্ন নামের স্পষ্ট নিদর্শন আছে। ইংরেজি Wolf, Fox, Lyon, Lamb, Hare, Jack প্রভৃতি নামের উৎপত্তি ঐরূপে হইয়াছে কি না তাহা বিবেচ্য। আমাদের দেশেও কোনও কোনও বংশ হাতী, ঘোড়া, শিয়াল-প্রভৃতি নাম দ্বারা পরিচিত। কিন্তু ঐ ঐ বংশে সচরাচর এরূপ কিংবদন্তী শুনা যায় যে, হয়ত কোন আদিপুরুষ হস্তিপালন, অশ্বশিক্ষা, বা শৃগালহননাদি রূপ কোনও অপেক্ষাকৃত অসাধারণ কার্য্য করিয়া গ্রাম্য সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশ তাঁহার প্রিয় বা তৎকর্ত্তৃক বশীকৃত বা নিহত জীবের নাম দ্বারা পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

জাতি বা সঙ্ঘবিশেষের সাধারণ পিতৃপুরুষ কল্পনা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ প্রভৃতি চিরকাল-প্রসিদ্ধ। মরীচি, অত্রি-প্রভৃতি শব্দ আকাশের এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জের নাম। ঐরূপে ধ্রুবও একটি তারার নাম। শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহের নাম। ইহাদের প্রত্যেকের বংশ আছে। অবশ্য এস্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, মরীচি, অত্রি প্রভৃতি আদৌ লোকের

* Encyclopædia Britannca vol. 17 (Ninth Edition) p. 169.

নামই ছিল, পরে তাহাদের নামানুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র সম্বন্ধেও কি তাহাই বক্তব্য? সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমানিনী দেবতা হইতেই কি সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশের উৎপত্তি কল্পনা করা হয় না?

আবার দেখুন, পুরাণে পিতৃগণ বলিয়া একশ্রেণীর দেবতাই বলুন, বা অতিমানব পুরুষই বলুন, কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহারা ভুবর্লোকে বাস করেন, কোনও কোনও পুরাণের মতে মঘা ও মঘা নক্ষত্রে বাস করেন। গরুড় পুরাণের পিতৃস্তোত্রে * পিতৃগণের সংখ্যা এক ত্রিংশৎ বলা হইয়াছে। আবার বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে † অগ্নিষাত্ত, ও বর্হিষদ্ নামে পিতৃগণের বিষয় কথিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় ‡ উক্ত হইয়াছে সাধ্যগণের পিতৃপুরুষদিগের নাম সোমসদ্, দেবতাদিগের পিতৃগণের নাম অগ্নিষাত্ত, দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, সুপর্ণ, ও কিন্নরদিগের পিতৃগণের নাম বর্হিষদ্। ব্রাহ্মণদিগের পিতৃগণের নাম সোমপ, ক্ষত্রিয়দিগের হবির্ভুক্, বৈশ্যদিগের আজ্যপ, শূদ্রদিগের সুকালী ইত্যাদি। ইহাদের নাম ব্যতীত আর কিছুই জানা যায় না। বায়ুপুরাণ পিতৃগণকে স্থানাভিমানী ও কালাভিমানী অর্থাৎ স্থান ও কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমেরিকার বর্ব্বরেরা যে স্থলে আপনাদের totemকে ইতরজীব বলিয়া কল্পনা করে, আর্য্যগণ নিজ নিজ পূর্ব্ব পুরুষগণকে, এমন কি যক্ষ, রাক্ষসাদি নাম দ্বারা অভিহিত অনার্য্যগণের পিতৃপুরুষগণকেও দেবতা বা তত্তুল্য জীব কল্পনা করিয়াছেন। ইহা বোধ হয় আর্য্যজাতির কল্পনা ও চিন্তাশক্তির একটি বিশেষত্ব। যে যাহা হউক, উভয়ত্রই যে মানবপ্রকৃতির একই প্রবৃত্তি কার্য্য করিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ প্রবৃত্তিটা এই—জাতি, সঙ্ঘ, বা বংশবিশেষের জন্য এক একটি সাধারণ আদিপুরুষ বা মূল কল্পনা।

হিন্দুগণের মধ্যে ঐরূপ কল্পিত আদিপুরুষ হইতে যে কেবল সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশাদি সুবিখ্যাত বংশের উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুর প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্যেই তাহার বর্ণনাম ও স্বনাম ব্যতীত গোত্রনাম রূপ একটি নাম গ্রহণ করিতে হয়। ঐ গোত্র-নামটিও একজন আদি পুরুষের নাম। গোত্র শব্দটির অভিধান-দৃষ্ট অর্থ :— যদ্দ্বারা লোককে ডাকা যায়। § গোত্র শব্দ দ্বারা নাম ও কুল উভয়ই বুঝায়। স্মার্ত্তগণ বলেন, গোত্রনামটি আদিপুরুষের নাম অর্থে কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই গ্রাহ্য। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির গোত্র পূর্ব্বপুরুষের নাম নহে, পুরোহিতের পূর্ব্বপুরুষের নাম। ব্রাহ্মণের পক্ষেও গোত্র যথার্থ পূর্ব্বপুরুষের নাম কি কল্পিত পূর্ব্বপুরুষের নাম, তাহা বিচার্য্য। বৌধায়নসূত্রে মাত্র ৮ জন ঋষি আদি গোত্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম যথা :—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অগস্ত্য। ইঁহাদের অপত্যগণের মধ্যে যাহারা ঋষিপদবীবাচ্য ছিলেন, তাঁহারাও গোত্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কিন্তু মূল গোত্রকার ঐ ৮ জন। তাঁহাদের একজন আবার আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণের গোত্র প্রকৃত পূর্ব্বপুরুষের নাম হইলে, বলিতে হয়, পূর্ব্বে ভারতে ৭ জন মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেই ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত একজন ক্ষত্রিয় হইতেই ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। জমদগ্নি প্রভৃতি সপ্ত গোত্রকারের বংশ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ বংশ থাকিলে তাহাদের গোত্রের নিদর্শন কোথায়? কেন না উত্তরকালীন সকল গোত্রকারকেই উক্ত সপ্ত বা অষ্ট ঋষির বংশোৎপন্ন ঋষি বলা হইয়াছে।

বৌধায়ন যাহা বলিয়াছেন তদনুরূপ দুইটি উক্তি কুলদীপিকাধৃত ধনঞ্জয় কৃত "ধর্ম্মপ্রদীপে" মনুর মুখেও অর্পিত হইয়াছে। ‡ ঐ উক্তি গুলি কিন্তু মনুসংহিতায় নাই। যাহা মনুসংহিতায় নাই, অথচ মনুকথিত বলিয়া কোনও প্রাচীন লেখক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সচরাচর বৃদ্ধ মনুর স্কন্ধে আরোপ করা হয়। সে যাহা হউক ধনঞ্জয়ের সিদ্ধান্ত এই

* ৮২শ অধ্যায়। † বায়ু পুরাণ ৩০শ অধ্যায়; অগ্নিপুরাণ ২০শ অধ্যায়। ‡ মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায়।

§ গূয়তে। গুঙ্ শব্দে। ত্রন্ (উণাদি সূত্র ৪।১৬৫)

শর্ব্বকল্পদ্রুম গোত্র শব্দ দ্রষ্টব্য।

যে, মনুর কথিত ৮টি গোত্রকারের নাম উপলক্ষণ মাত্র; আদিতে আরও গোত্র ছিল। একমতে গোত্র সংখ্যা চব্বিশ, অন্য মতে বিয়াল্লিশ।

যাঁহারা এই গোত্রের উৎপত্তি ও সংখ্যা-সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের উক্তি সমূহ তুলনা করিয়াছেন, তাহারা জানেন গোত্র-সমস্যা বড়ই কঠিন সমস্যা। প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাবে এ সম্বন্ধে কিছুই দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। বিবাহ সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তনের জন্যই যে অতি যৎসামান্য ঐতিহাসিক সূত্র ধরিয়া গোত্র-নাম কল্পিত হয় নাই তাহাও কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারে না।

গোত্রপ্রচলনের উদ্দেশ্য এক বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহনিষেধ। কিন্তু গোত্রনাম প্রচলনের পরেও যখন বিবাহের ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ করার প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন গোত্রের পর প্রবর কল্পনা করা হইয়াছিল। প্রবরের উৎপত্তি সম্বন্ধেও "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" আমরা ঐ সকল মত এস্থলে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে এইমাত্র বলিতে চাই যে, ব্রাহ্মণেতর জাতি যে পুরোহিতের গোত্র-প্রবর গ্রহণ করিয়া স্বগোত্রে বা স্বপ্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, ইহার কোনও যুক্তি কেহ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন কি ?

সে যাহা হউক, এখন যে স্থলে 'চক্রবর্ত্তী' 'ভট্টাচার্য্য' প্রভৃতি উপাধি গৃহীত হয়, পূর্ব্বে সে স্থলে গোত্র-নাম গৃহীত হইত। আমাদের কল্পিত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে আমরা ইদানীং পূর্ণ বাবু, মিঃ ভট্টাচার্য্য, বা ভট্টাচর্য্য মহাশয় বলিয়া সম্ভাষণ করি। তিনি কালিদাসের সময়ের লোক হইলে, তাহাকে হয় শুধু পূর্ণচন্দ্র, না হয় কাশ্যপ বলিয়া ডাকা হইত। নাম লিখিতেও পূর্ণচন্দ্র কাশ্যপ লিখিত হওয়াই সম্ভব ছিল। কখনও কখনও বিদ্যাগৌরব বা ব্যবসায়সূচক কোনও পদবী দ্বারাও তাহার নাম উল্লেখ করা চলিত। শকুন্তলা নাটকে একজন মুনি কণ্বের নাম উল্লেখ করিতে বলিতেছেন :—

এষ খলু কণ্বস্য কুলপতের নুমালিনীতীরম্ আশ্রমো দৃশ্যতে। (মালিনীতীরে এই কুলপতি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে) এস্থলে কণ্ব কাশ্যপ না বলিয়া কুলপতি কণ্ব বলা হইল। উদ্দেশ্য গৌরবপ্রদর্শন। সেই জন্য রাজাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

"অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ ?"

এখন কুলপতি উপাধি নাই, বর্ত্তমানকালে আমরা এরূপ স্থলে বলিতাম "মহামহোপাধ্যায় গৃহে আছেন কি ?"

আবার অন্যত্র রাজা কণ্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্ন করিতেছেন ?

অপি লোকানুগ্রহায় কুশলী কাশ্যপঃ ?

(জগতের উপকারের জন্য কাশ্যপ কুশলে আছেন ত ?) আমরা এস্থলে বলিতাম "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কুশলে আছেন ত ?"

শৌনকের ঋগ্বেদানুক্রমণিকায় ঋষিগণের নাম এইরূপ লিখিত হইয়াছে—অংহোমুগ্‌ বামদেব্য, অপ্রতিরথ ঐন্দ্র, অত্রি ভৌম, অরুণ বৈতহব্য, অযাস্য আঙ্গিরস, কশ্যপ মারীচ, পর্ব্বত কাণ্ব, মুদ্‌গল পৈজবন, শুনঃশেপ আজিগর্ত্তি, সিন্ধুক্ষিৎ প্রিয়মেধ ইত্যাদি। এই সকল স্থলে ঋষিগণের নিজ নামের সহিত যে উপাধিটি সংলগ্ন দেখিতে পাইতেছেন, তাহা তাহাদের কুলোপাধি। সবগুলিকে বোধ হয় গোত্রোপাধি বলা যায় না।

গোত্র-নামগুলি কি কারণে অপ্রচলিত হইয়া বর্ত্তমানকালীন বংশোপাধিগুলিকে স্বস্থান অধিকার করিতে দিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে কালিদাসাদির সময়েও যে লোকের নামোল্লেখ সময়ে গোত্রোল্লেখ না করিয়া ব্যবসায় বা বিদ্যাদি গৌরববোধক উপাধি উল্লেখ করিবার রীতি ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ যথা :—দুষ্যন্ত নিজ পুরোহিতসম্বন্ধে বলিতেছেন—

মদ্বচনাৎ বিজ্ঞাপ্যতাম্ উপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ ইত্যাদি।

(উপাধ্যায় সোমরাতকে আমার বচন অবলম্বন করিয়া বল।) ঐরূপ রীতি হইতেই পরে গোত্রনাম সাধারণ বাক্যালাপে অপ্রচলিত হইয়া যাওয়া সম্ভব।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে যে সকল বংশনাম প্রচলিত, তাহার কতকগুলি আদিতে বিদ্যাবত্তাবোধক ছিল। ভট্টাচার্য্য উপাধিটি প্রথমে আমাদের B Sc., M. Sc. প্রভৃতি উপাধির মত ছিল বলিয়া মনে হয়। যিনি তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনিই ভট্টাচার্য্য উপাধির যোগ্য বিবেচিত হইতেন। কিন্তু যেমন কুলীনের পুত্র নবপ্রকার কুললক্ষণের কোনও লক্ষণযুক্ত না হইলেও কুলীন পদবাচ্য হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি তুতাত উদয়নের নামও শোনে নাই সেও পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও পুরুষের বিদ্যাগৌরবের দোহাই দিয়া ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। চক্রবর্ত্তী উপাধিও বর্ত্তমানকালীন সার্ব্বভৌম প্রভৃতি উপাধির ন্যায় প্রথমে বিদ্যাবত্তা বোধক ছিল। উপাধ্যায়, পণ্ডিত, আচার্য্য, কবিরাজ, অধিকারি প্রভৃতি উপাধিও বিদ্যাবত্তা ও ব্যবসায় এতদুভয়ই বুঝাইত বলিয়া মনে হয়। গোস্বামী উপাধি বৈষ্ণব সমাজে পরমগৌরবসূচক। ঠাকুর উপাধিও সম্ভ্রমসূচক। চট্ট, মুখ, বন্দ্য, গাঙ্গ প্রভৃতি এককালে উপাধ্যায় যুক্ত না হইয়াও ব্যবহৃত হইত। তাহার উৎপত্তির বিবরণ কি তাহা নিঃসন্দেহরূপে নির্ণয় করিতে পারি নাই, তবে কুলগ্রন্থে তাহা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। যথা—

মেলের নাম	প্রকৃতি	পালটী
বাঙ্গাল	রত্নাকর বন্দ্য	মুকুন্দ চট্ট
দেহাটা	দানপতি চট্ট	শ্রীনিবাস গাঙ্গ ইত্যাদি।

উপাধ্যায় যুক্ত হইয়া চট্ট, মুখ, বন্দ্য, গঙ্গ চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় গাঙ্গোপাধ্যায় হইয়াছেন। আবার ঐ সব হইতে চাটার্তি, মুখটি, বাঁড়ুড়, গাঙ্গুটি ইত্যাদি উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। চট্ট হইতে চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় চট্টরাজ উপাধিও আছে।

বক্শি, সরকার, সীকদার, হালদার, মজুমদার, তরফদার, তপাদার, তালুকদার, বিশ্বাস, নিয়োগী, মল্লিক প্রভৃতি উপাধি নবাবী আমলের পদবী-বোধক। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, গোপ, বণিক্, সাহা * শেঠ † ইত্যাদি উপাধি ব্যবসায়দ্যোতক। পাঠক, ভট্ট, ঘটকও তাহাই। এই নাম গুলি ইংরেজী Goldsmith, Smith, Fowler, Brewer Sadler, Turner প্রভৃতির অনুরূপ। ভৌমিক, মণ্ডল, নাথ, নায়ক, প্রামাণিক উপাধি স্ব স্ব সমাজে প্রতিষ্ঠাসূচক। রায় উপাধি রাজন্ শব্দ হইতে, ও খাঁ উপাধি আরবী বা পার্শী মূল হইতে আসিয়াছে, উভয়ই ভূস্বামিত্বদ্যোতক। চৌধুরী শব্দ চতুর্ধুরীণ শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। উহা পদমর্য্যাদা-সূচক কি ধনমর্য্যাদা-সূচক জানি না। ধুর্ শব্দটির অর্থ ভার; বোঝা। সুতরাং চতুর্ধুরীণ শব্দের অর্থ যিনি চারিটি বোঝা (Office) বহন করেন, বা যাহারা বোঝা চারিটিতে অর্থাৎ চারি বাহনে বহন করে—এইরূপ হওয়া উচিত। এর মধ্যে কোন অর্থটা ঠিক তাহা বলিতে পারি না। প্রথমটি পদমর্য্যাদাবোধক, দ্বিতীয়টি ধনবত্তাবোধক।

'ঘোষ' গোপের উপাধি হইলে অর্থ বুঝা যায়। কায়স্থ কি সূত্রে ঘোষ উপাধি পাইয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। কায়স্থ 'শব্দের' প্রাচীন অর্থ কেরাণী। স্বপ্রভুর আদেশ ঘোষণা করিতেন বলিয়া কি কায়স্থ ঘোষ উপাধি পাইয়াছিলেন? ‡

ইংরেজি Wolf, Fox, Lyon, Hare, Lamb প্রভৃতি বংশ-নামের ন্যায় বাঙ্গালায়, সিংহ, হাতী, পক্ষী, নাগ, বটব্যাল (অর্থাৎ বটগাছের সাপ) প্রভৃতি আছে। আবার দেবতাবোধক আদিত্য, সোম, চন্দ্র, দেব, রুদ্র, বসু উপাধিও

* সংস্কৃত সাধু শব্দের অর্থ সুদব্যবসায়ী। সাধু=সাহ=সাহা। † শেঠ=শ্রেষ্ঠী।

‡ অর্দ্ধঘোষ নামে 'ঘোষ' শব্দটি নামের অখণ্ড অংশ। এই শ্রেণীর বংশনামের বিষয় পরে উল্লিখিত হইয়াছে। অখণ্ড ঘোষ-যুক্ত অন্য নাম শুনি নাই। অভিধানে শৃগালের এক নাম 'রাত্রঘোষ' দেখিয়াছি। বৈতালিক অর্থেও ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে। উভয়ত্রই ঘোষ ঘোষণাবোধক।

আছে। 'গুহ' দেবতার নাম হইলেও খুব প্রসিদ্ধ নাম নহে। এতদ্ব্যতীত ডড় (নৌকা ?), ঢোল, বরাট (কড়ি ?), ঢাকী, গড়্গড়ি প্রভৃতি কতকগুলি অদ্ভুত রকমের উপাধিও উল্লেখযোগ্য। Totem-বাদিগণ এগুলি সাদরে লুফিয়া লইবেন, সন্দেহ নাই।

শূদ্রের পক্ষে দাস উপাধি তাহার প্রাচীন বৃত্তির পরিচায়ক। বৈষ্ণব গোস্বামিগণের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ হইয়াও নিজ দৈন্য প্রকাশ করিবার জন্য 'দাস' নাম ধারণ করিতেন। তাহাদের দৈন্যের পরিচায়ক একটি শ্লোক এস্থানে উদ্ধৃত করিতে পারি :—

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

বৈষ্ণব গোস্বামী বলিতেছেন, কেহবা বলেন 'আমরা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াছি', আবার কেহ কেহ বলেন 'আমরা কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়াছি।' আমরা কি অবলম্বন করিয়াছি বলিব ? হরিভক্তগণের পাদুকাই আমাদের অবলম্বন।

গোস্বামিগণের ন্যায় সকল শূদ্র যে বিনয়প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে দাস বলিয়া পরিচয় দিত, এরূপ মনে করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই। তাহা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরই প্রদত্ত। তবে ইহাও বোধ হয় ঠিক যে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের দাস বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করিত না।

বৈদ্যগণ 'দাসের' দন্ত্য 'স' কাটিয়া তালব্য 'শ' করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের অনেকেরই মতে প্রাচীন বৈদ্যোপাধি "দাশ" তালব্য শকারান্ত। * তথাস্তু। কায়স্থাদি বর্ণ অদ্যাপ 'দাস' উপাধির দাস্য ভাব লজ্জাকর বিবেচনা করেন না বলিয়াই রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে ক্রিয়াকাণ্ডাদিতে নামোল্লেখের সময় বর্ণগত 'দাস' নামের পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়োচিত 'বর্ম্ম' ধারণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। আবার বৈদ্যেরাও 'পরে থাকা মিছে, মরে থাকা মছে' ভাবিয়া 'গুপ্ত'-নাম সুগুপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণোচিত শর্ম্ম-নাম ধারণ করিতে, এমন কি কেহ কেহ জাতীয় পৌরোহিত্য পর্য্যন্ত নিজ হস্তে লইবার আয়োজন করিতেছেন।

যে সব উপাধি স্পষ্টভাবে বিজ্ঞতা, ব্যবসায় বা ঐরূপ কোনও বৈশিষ্ট্যর পরিচায়ক নয়, (যথা দত্ত, গুপ্ত, মিত্র, ভট্ট, সেন, পাল, বর্ম্মন, শর্ম্মন্, প্রভৃতি) তাহা পূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষের স্বনামের অখণ্ড অংশ ছিল বলিয়া মনে হয়। দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত-প্রভৃতি নাম খুব প্রাচীন। ব্যাকরণের উদাহরণে ঐগুলি অন্ততঃ পতঞ্জলির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। চারুদত্ত নাম এতকাল কবি শূদ্রকের সমকালীন বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইত, ভাসের নাটকাবলী আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহা আরও প্রাচীন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল নামের দত্ত অংশ অংহোমুগ্ বামদেব্য, অত্রি ভৌম, অভিবর্ত্ত আঙ্গিরস ইত্যাদি নামের বামদেব্য, ভৌম, আঙ্গিরস প্রভৃতি অংশের ন্যায় পূর্ব্বাংশ হইতে পৃথক্ ভাবে লিখিত হয় না। ঐরূপ গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি নামে গুপ্ত শব্দ নামের অখণ্ড অংশ। বিশ্বামিত্র, পুষ্পমিত্র বা পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র প্রভৃতি নামে মিত্র-অংশ, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতি নামে 'পাল'-অংশ, সুদাস, দিবোদাস প্রভৃতি নামের 'দাস'-অংশ, বিষ্বক্সেন, সুষেণ প্রভৃতি নামে 'সেন'-অংশও মূল হইতে অখণ্ড। ধর, ভট্ট, বর্ম্মন্, শর্ম্মন্ নামেরও ঐরূপ উদাহরণ দেওয়া যায়। পূর্ব্বে দেবতাবোধক বলিয়া আদিত্য, সোম, চন্দ্র, দেব, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে কয়টি উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও অনেকগুলিই হয়ত পূর্ব্বে ব্যক্তির নামের অখণ্ড অংশ ছিল। সিংহ সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য।

অনেকগুলি উপাধির মূল দুর্নির্ণেয়। লাহিড়ি, বাগচি, সান্ন্যাল, ঘোষাল, রাহা, হাজরা, চট্ট, মুখ, গাঙ্গ,

* দাশ শব্দের অর্থ দাতা।

কাঞ্জীলাল, আঢক, আইচ, পাইন্, আইন্, ভাদুড়ী, বড়াল, বসাক, কুণ্ডু, ভায়া ইত্যাদি এই শ্রেণীর। ইহার অনেকগুলিই যে কোনও না কোনওরূপ বিবরণাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কোনও কোনওটি বোধ হয় বংশবিশেষের প্রাচীন বাসস্থানের পরিচায়ক। Latin, French, ও German ভাষার ঐরূপ নাম যথেষ্ট আছে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

বন্দ্য, ভদ্র, শূর-প্রভৃতি উপাধি কি কোনও পূর্ব্বপুরুষের কোনও বিশিষ্টপ্রকার গুণজনিত খ্যাতির পরিচায়ক? ইংরেজি Long, Brown, White, Black, Sharp, Wordsworth Fuller প্রভৃতি নামও ঐরূপ ব্যক্তিবিশেষের কোনও বিশেষভাবে লক্ষ্য গুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। দুই একটির মূলে প্রচ্ছন্ন উপহাসও থাকা সম্ভব।

বংশনামের এতদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বিচার এস্থলে সম্ভবপর নয়। এক্ষণে আমরা ব্যক্তির নিজনামের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। এখানেও আমরা প্রথমে ঐতিহাসিকেরই শরণাপন্ন হইয়া দেখিব, তিনি কালাপানির অপর পারের অমার্য্য মুল্লুক হইতে কি অমৃত ফল আহরণ করিয়া আসিয়াছেন।

ঐতিহাসিক বলেন, অসভ্য সমাজে প্রায়শঃ কোনও একটা প্রাকৃতিকঘটনা বা দৃশ্য-বোধক শব্দ দ্বারা নবজাত কুমার-কুমারীদের নামকরণ হয়।* কাহারও নাম "প্রভাতের স্বর্ণ-কুসুম", কাহারও নাম বা শুধু 'প্রভাত'। অনেক সময়ে পিতার নাম সূর্য্য হইলে পুত্রের নাম প্রভাত, কন্যার নাম উষা-প্রভৃতি রাখা হয়। ঐরূপ কবিত্বমূলক নাম অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যগণের মধ্যে খুব প্রচলিত। উত্তর আমেরিকার অসভ্যসমাজে সূর্য্য, চন্দ্র, মেঘ, বায়ু ইত্যাদিবোধক নামই অধিক। এই সমুদয় নামের বলে ঐতিহাসিক গর্ব্ব করিয়া বলেন, যে সকল দার্শনিকেরা প্রাচীন উপকথার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বত্রই সৌরজগতের কোনও না কোনও একটা বৃত্তান্ত রূপকরূপে প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাহারা কি ভ্রান্ত!

অসভ্যসমাজে আবার ব্যক্তির নাম বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। যৌবনে বীরত্ব বা কোনও কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইলে, বাল্যের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই বীরত্ব বা নৈপুণ্য-ব্যঞ্জক কোনও একটি নাম প্রদত্ত হয়। কখনও কখনও ঘৃণা উপহাস-প্রভৃতিব্যঞ্জক নামও দেওয়া হয়। একজন অসভ্যের সবগুলি নাম বিশ্লেষণ করিলে হয়ত এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে:—বাল্যের নাম—ভোরের মেঘ, কৈশোরের নাম—পেটুকবিড়াল, যৌবনের নাম—শাদাভূতের যম, বংশের নাম অর্থাৎ totem—হাড়গিলা।

ঐতিহাসিকের নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে বুঝা গেল,—সভ্যই হউক আর অসভ্যই হউক, মানুষ স্বভাবতঃই কবি। একটু ছিদ্র পাইলেই তাহার অন্তরের কবিত্ব উৎস আপনা হইতে অজস্রধারে বহিতে থাকে। সন্তানের জন্ম সেইরূপ একটি ছিদ্র। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই মাতাপিতার কবিত্বগোমুখীর মুখ খুলিয়া যায়, আর তাহার স্নিগ্ধ ও পুণ্যধারায় কেবল যে সন্তানই অভিষিক্ত হয় তাহা নহে, সমগ্র মানব-সমাজ ধন্য হয়। যিনি মানবীয় সভ্যতার মূল অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাহাকে আমরা এই গোমুখীতীর্থে আর একবার অনুসন্ধান করিতে বলি। নীতি-শিক্ষকগণ কেবল মাতাপিতার মনের অসীম নিঃস্বার্থ স্নেহের কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু সেই স্নেহধারার তরঙ্গে তরঙ্গে কত কবিত্বের স্বর্গীয় ছটা, তাহার কুল-কুল শব্দে কত কর্ণরসায়ন ছন্দের পারিপাট্য, কত প্রাণোন্মাদকর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তাহা দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না।

এই সহজাত কবিত্বসম্বন্ধে সহস্র সহস্র বৎসরেও মানবসমাজের যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ব্যক্তির নামের কল্পনায় নানারূপ পারিপাট্যের কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কত নিত্য নূতন রকমের নাম কল্পিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কত কবিত্ব, কত মাধুর্য্য তাহা বর্ণন করিয়া কে শেষ করিতে পারে?

* Encyclopædia Britannica Ninth Edition vol. 17 p. 169.

অবশ্য কবিগণের মধ্যেও অন্যের অনুকরণপ্রিয়তা দৃষ্ট না হয় তাহা নহে। কেহ বা অপর কোনও কবির প্রকাশিত ভাবের মধ্যে নিজের কোনও অনুভূতির প্রতিধ্বনি পাইয়া তাহারই পুনরুক্তি করেন ; আবার নিকৃষ্ট অনুকরণকারীরা নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করিবার কষ্ট স্বীকার করে না, হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই সে ক্ষমতাবর্জ্জিত। তাহারা নূতন একটা কিছু দেখিলেই বা শুনিলেই তাহার অনুকরণ করে। এইরূপ অনুকরণপ্রিয়তা হেতু এক নামের অসংখ্য লোক দেখা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন পুত্রের নাম রবীন্দ্রনাথ রাখিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালা দেশে আর একটি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কিনা সন্দেহ। আর এখন দিন দিন রবীন্দ্রনাথ-নাম বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ এক বড়লোকের অনুকরণপ্রবৃত্তি ব্যতীত যে ঐরূপ নামকরণের আর কোনও মূল আছে তাহা বোধ হয় না। তবে দুই এক স্থলে হয়ত মাতাপিতা নিজ নিজ পুত্রও রবীন্দ্রনাথের মত যশস্বী হউক এইরূপ একটা শুভেচ্ছা হইতেও ঐরূপ নামকরণ করিতে পারেন।

সন্তানের শুভেচ্ছাও যে একশ্রেণীর নামকরণের হেতু তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে অবিনাশ, অমর, অক্ষয়, চিরঞ্জীব, শতঞ্জীব-প্রভৃতি নামের মূলেও শুভেচ্ছাই বর্ত্তমান। ঐরূপ নামধারী কোনও ব্যক্তির মাতাপিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত আমরা শুনিতে পাইব যে, একাধিক শিশু-সন্তানের মৃত্যুযাতনায় পীড়িত হইয়াই পরে তাঁহারা সন্তানের নাম অবিনাশ, অমর বা অক্ষয় রাখিয়াছিলেন। অনেক মাতাপিতা আবার শুভেচ্ছার সঙ্গে একটু পাটোয়ারি বুদ্ধি মিশ্রিত করিয়া যমকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করেন। তিনকড়ি, ছকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি নামগুলি তাহার প্রমাণ। ছেলে হইলেই মরিয়া যাইবার ভয়ে কখনও কখনও মাতাপিতা অন্য কাহারও নিকট তাহাকে তিন কড়া, ছয় কড়া, সাত কড়া বা নয় কড়া কড়ি মূল্যে বন্ধক রাখেন, বা বিক্রয়ই করেন। বন্ধকী বা বিক্রীত জিনিষ আমার নিজের নহে, আমার প্রতি যমের অসন্তোষের সহস্র কারণ থাকিলেও আমার নিকট হইতে পরের কাছে বন্ধক দেওয়া বা বিক্রীত জিনিষ জোর করিয়া লইবার অধিকার তাহার নাই ; লইলে সে তজ্জন্য জগতের রাজরাজেশ্বরের ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডনীয় হইবে ;—এইরূপ সরল অথচ কুটিল, কিন্তু স্নেহের অতুল অভিব্যক্তির মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত ভাবের প্ররোচনায়ই মাতাপিতা সন্তানের তিনকড়ি প্রভৃতি নাম রাখেন। অনেকে আবার ছেলের নাম রাখেন, "পচা" অর্থাৎ যমের ছুঁইবার অযোগ্য! ইহারও মূলে সন্তানের আয়ুষ্কামনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভূপতি, নৃপতি, ধনপতি, নরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, ভূপাল, পৃথ্বীশ, ক্ষৌণীশ, প্রভৃতি নামের মূলেও সন্তানের শুভকামনা বিদ্যমান। 'ভূপতি' নামের অর্থ 'পৃথিবীর পতি' নহে, 'যিনি পৃথিবীর পতি হইবেন ;' এ যেন ইংরেজি ব্যাকরণের "proleptic use".

অনেক নামের মূলে ধর্ম্মভাব দৃষ্ট হয়। এককালে বাঙ্গালীর নামে এই ভাবটির প্রভাবই অধিক দৃষ্ট হইত, হয়ত বাঙ্গালীর জীবনেও ঐ ভাবটি অধিক প্রবল ছিল। দেবতার নাম অনুসারে সন্তানের নামকরণের একটি বিশেষ হেতু এই ছিল যে, প্রাচীন হিন্দুগণ ভাবিতেন যে, সব সময়ে ভগবানের নাম করা বা তৎপাদপদ্ম চিন্তা করা বাঞ্ছনীয় হইলেও সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় পুত্রকন্যা বা পৌত্র-পৌত্রীকে সম্বোধন করিবার সময় যদি শ্রীভগবানের কোনও একটা লীলার কথা মনে পড়িয়া যায় তাহাও কম লাভ নহে। ঐরূপ বাসনা হইতেই দেবতার নামে পুত্রকন্যাদির নামকরণ হইত। হিন্দুগণের দেবতাও অসংখ্য, আবার এক এক দেবতার নামও অসংখ্য। যে কেহ নিজ বংশবিবরণী খুলিলে, তাহাতে নিজ পূর্ব্ব পুরুষগণের নামে নানা দেবতার নানা নাম দেখিতে পাইবেন।

অনেকে বলেন, শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে পূর্ব্বে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমন কি, স্থলে স্থলে ঘোরতর বিদ্বেষ, ছিল। বিশেষ বিশেষ দেবতার সমর্থক বিশেষ বিশেষ পুরাণ ও কথা সাহিত্য ইহার প্রমাণ। কিন্তু এইরূপ সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ লোকের নামকরণে বিশেষ লক্ষিত হয় না। যে কোনও শৈব বা শাক্ত পরিবারের বংশবিবরণী দেখুন, তাহাতে

শঙ্কর, হর, ভোলানাথ, দুর্গানাথ, শ্যামাকান্ত, ঈশান, মহেশ ইত্যাদি নাম যেমন পাইবেন, তেমনই রামহরি, রামজয়, কেশব, হৃষীকেশ, নারায়ণ, শ্রীধর, গোবিন্দ, মধুসূদন, মাধব ইত্যাদি নামও পাইবেন। নামের ইতিহাস পরধর্ম্মাসহিষ্ণুতার ইতিহাস নহে, এখানে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মসমাজে দেবতাভক্তির অভাব হইলেও ধর্ম্মভাবের অভাব হয় নাই, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ব্রহ্মময়, ব্রহ্মানন্দ, নিখিলেশ্বর, প্রবোধানন্দ, মিলনানন্দ, সত্যশরণ-প্রভৃতি নামই ইহার প্রমাণ। আবার ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয় সমাজেই কতকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, যাহা ঠিক ধর্ম্মভাবমূলক না হইলেও, ঐ ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাদিগকে নীতিমূলক নাম বলা যাইতে পারে। সুনীতিকুমার, সুরুচিকুমার, সুকৃতিমোহন, পবিত্রকুমার প্রভৃতি নাম এই শ্রেণীর। আর হিন্দুই হউন আর ব্রাহ্মই হউন, যাহারা ধর্ম্মভাবাদির ধার ধারেন না, তাঁহারা শুধুই কবিত্বের ফোয়ারা ছুটাইয়া প্রভাত-কুসুম, প্রেমকুসুম, মৃণালকান্তি, ললিতমোহন, কমলবিকাশ, সুকুমার, শিশিরকুমার, পরিমলকুমার, নলিনীকান্ত, সরোজিনী-বান্ধব, শর্ব্বরীভূষণ ইত্যাদি নাম রাখেন। আমাদের কল্পিত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'পূর্ণচন্দ্র' নামও এই শ্রেণীর। পূর্ণচন্দ্র নামধারী ব্যক্তিমাত্রই যে দেখিতে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হইবেন, এরূপ আশা করা অন্যায়। অন্ধের রাজীবলোচন নামে যাহারা আপত্তি করেন করুন, সকল নামই অব্যর্থ নহে। মাতাপিতার চক্ষু লইয়া দেখিলে এবং অন্তঃকরণ লইয়া অনুভব করিলে অনেক বিসদৃশ নামেরই একটা না একটা অর্থ উপপন্ন হইবে। তুমি আমি পূর্ণচন্দ্রকে কাল ও কুদর্শন দেখিলে কি হইবে ? পূর্ণচন্দ্রের জন্মে তাহার মাতাপিতার মনে হয়ত যে আনন্দ হইয়াছিল, আকাশে এককালে শত পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলেও তাহা হইত না। পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা আহ্লাদকর আর কিছু কল্পনার আসে নাই বলিয়াই, তাঁহারা নিতান্ত অতৃপ্তির সহিত পূর্ণচন্দ্র নামই রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে ইদানীং কবিত্বের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া থাকিবে ; সেই জন্য আধুনিক যুগে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে কবিত্বপূর্ণ নামেরই কিছু আধিক্য দেখা যায়। আবার বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা কবিতায় যেমন আর কোনও গুণ না থাকিলেও, তাহাতে, কোমলতার অভাব দেখা যায় না, আধুনিক নামের মধ্যেও সেইরূপ প্রায়ই (ভাষায় বা ভাবে) কোমলতার অভাব দৃষ্ট হয় না। আমার পুত্রের অকিঞ্চন নাম শুনিয়া একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়াছিলেন, নামটি মন্দ হয় নাই, তবে একবারে সংযুক্তবর্ণবর্জ্জিত হইলেই ভাল হইত।

নামের মধ্যে নাকি জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপসিংহ, সংগ্রামসিংহ, সমরসিংহ, খড়্গসিংহ প্রভৃতি নাম বাঙ্গালায় কদাচিৎ দেখা যায়, দেখা গেলেও তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচারমাত্র, ঐরূপ ব্যভিচার দ্বারাই নিয়ম প্রমাণিত হয়। বাঙ্গালার নামে দেবতাভক্তির চিহ্নও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আছে কেবল কোমলতা। বাঙ্গালা বাবুর দেশ, বিলাসের দেশ, সম্ভবতঃ একটু মধুর রসেরও দেশ। তাহার প্রমাণ রমণীকান্ত, রমণীরঞ্জন, যামিনীমোহন, অবলাকান্ত ইত্যাদি নাম।

নামের আলোচনায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখনও অনেক কথা বাকি, কিন্তু আর আপনাদের ধৈর্য্যের উপর জবরদস্তি করিতে ইচ্ছা করি না। নামের আর একটি দিক্ দেখাইয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি, নামের মধ্যে কিছুই নাই ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এখন দেখাইব যে, নামের শক্তি সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ কতদূর দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন ছিলেন।

উপরে যদুনন্দন দাসের যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আছে—"নাম আর তনু ভিন্ন নয়।" অর্থাৎ যেখানে নাম সেইখানেই নামী। * কিন্তু এই কথাই শাস্ত্রকারগণ এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে, তাহাতে নামী অপেক্ষা নামকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে।

* পদ্মপুরাণেও আছে –

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

কথিত আছে, সত্যভামা একবার এক তুলাদণ্ডের একদিকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে ও অপরদিকে তুলসীপত্রে লিখিত কৃষ্ণনাম রাখিয়া দেখিয়াছিলেন, ও জগৎকে দেখাইয়াছিলেন, কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের নামের গুরুত্ব অনেক অধিক। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, অজামিল নামক এক দাসীপতি ব্রাহ্মণ বঞ্চনা ও চৌর্য্যাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ ছিল। মৃত্যুকালে যমদূতগণকে দেখিয়া সে ভয়ে নিজ পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়াছিল বলিয়াই বিষ্ণুলোকে বাসের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। এই ঘটনাসম্পর্কে ভাগবত বলিতেছেন—*

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ মশেষাঘহরং বিদুঃ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥

"পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপপূরণার্থই হউক, অথবা অবজ্ঞাক্রমেই হউক, ভগবান নারায়ণের নামগ্রহণ করিলেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত, যাইতে যাইতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিকর্ত্তৃক দষ্ট, জ্বরাদিরোগে সন্তপ্ত, অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও 'হরি' এই শব্দটী উচ্চারণ করে, তাহাকেও কখন নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না।" †

এখানে দেখিবেন নামের শক্তির ত কথাই নাই, নামাভাসেরই শক্তি কতদূর। বৈষ্ণবগণের মতে এই নামাভাস চারি প্রকার; সাঙ্কেত্য, পারিহাস্য, স্তোভ, ‡ ও হেলা। সাঙ্কেত্য নামাভাসের দৃষ্টান্ত অজামিল। মুসলমানেরা যে গালিরূপে 'হারাম হারাম' শব্দ বলে তাহাতেও নাকি তাহাদের পারলৌকিক ঊর্দ্ধগতি সম্পন্ন হয়। জরাসন্ধ কৃষ্ণনাম লইয়া পরিহাস করিত, তাই তাহার সদ্গতি হইয়াছিল। কথাবার্ত্তা বলিবার সময় বিরক্তিবশেও যদি 'হা হরি' বলা যায়, কিংবা 'হরিকে কি কাজ, এস অন্য কথা বলি' এরূপও যদি বলা যায়, তাহাতেও বৈষ্ণব মতে আধ্যাত্মিক উপকারিতা আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব নামমাহাত্ম্য লক্ষ্য করিয়া নিজরচিত একটি শ্লোকে বলিয়াছেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে না কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈব মীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমার নামের বহুবিধ ভেদ করিয়াছ, আর তোমার সমস্ত শক্তি এক একটি নামে রাখিয়া দিয়াছ। তোমার এমনই কৃপা! কিন্তু আমারও এমনই দুরদৃষ্ট যে, এমন যে তোমার নাম তাহাতে অনুরাগ জন্মিল না!

আপনারা দেখিবেন, ভগবানের নামে ভগবানের সমস্ত শক্তি রহিয়াছে বলা হইল। আবার ভগবানের নাম বিশেষে শক্তিবিশেষের প্রাচুর্য্যও কল্পিত হইয়াছে। ঔষধসেবনের সময় বিষ্ণুনাম, ভোজনে জনার্দ্দন-নাম, শয়নে পদ্মনাভ-নাম, বিবাহে প্রজাপতি-নাম, দুঃস্বপ্নদর্শনে গোবিন্দ-নাম, সঙ্কটে মধুসূদন-নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় বলিয়া ব্যবস্থা

* শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ১৪—১৫ শ্লোক
† বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত অনুবাদ।
‡ "স্তোভং গীতালাপপূরণার্থং কৃতম্"—শ্রীধরস্বামী।

করা হইয়াছে। নামের শক্তিতে বিশ্বাস যে কেবল বৈষ্ণবগণের মধ্যে নিবদ্ধ তাহা বলা যায় না। প্রভাতে উঠিয়া দুর্গা নাম উচ্চারণ করিলে আপদ্ নষ্ট হয়, সূর্য্যের দ্বাদশ নাম আবৃত্তি করিলে দুঃস্বপ্ন নাশ হয় ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়, ইত্যাদিরূপ মতও হিন্দু সমাজে প্রসিদ্ধ। আবার বাইবেলে দেখিতে পাই, সাধু জব সয়তানকর্ত্তৃক নানা ভাবে উৎপীড়িত হইয়া বলিতেছেন,—

"Naked came I out of my mother's womb and naked shall I return thither: the Lord gave and the Lord hath taken away; blessed be the *name* of the Lord *

এখানে জব ভগবানের নামের জয় কীর্ত্তন করিতেছেন আবার Psalm XIX এ দেখিতে পাই।

Give unto the Lord the glory due to his *name*.

Old Testament হইতে এইরূপ আরও বহু উদাহরণ প্রদত্ত হইতে পারে। য়িহুদিদিগের মধ্যে নামের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস অতি প্রবল।

ইসলামেও নামের শক্তিতে বিশ্বাসের প্রমাণ দেখিতে পাই। কোরাণে আল্লার ৯৯টি নাম কীর্ত্তন করা হইয়াছে, কিন্তু নাম-বিশেষে মাহাত্ম্যের আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু মুসলমান-সমাজে একটি প্রথা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। অন্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই, পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তন করিয়া একটি আরবী নাম প্রদত্ত হয়। শ্যামচন্দ্র ধর মুসলমান হইলেই আবদুল বারি কি ঐরূপ কোনও একটা আরবী নাম পাইবেন। মুসলমানদিগের শাস্ত্রমতে ইহার আধ্যাত্মিক উপকারিতা কতদূর তাহা ঠিক জানি না, তবে ইহা যে এককালে মুসলমান জগতে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের একটি উপায় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মেও নামের শক্তিতে বিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। অধ্যাপক স্ল্যাক্ † তদীয় Early Christianity নাম্নী পুস্তিকায় এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

A third feature of early Christian belief, connecting it with the world of magic, is the importance of names.........The Name of God is.........detached as it were and invested with a separate personality......Miracles are performed by the mere pronunciation of the Name......

Not only the name of God but also that of the individual was of more than ordinary significance, and was, therefore, a potent instrument in the working of wonders. The change of a name involved the destruction of the thing or person named (Is 65-15); the utterance of the name called them into being.

ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। ভগবানের নাম ব্যতীত ব্যক্তির নামের মধ্যেও যে কোনও না কোনও প্রকার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা তাহা লোকের মঙ্গলামঙ্গলাদি বিধানে সমর্থ, তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেও দৃষ্ট হয়। আমি কেবল—

আত্মনাম গুরোর্নাম নামাতিকৃপণস্য চ
শ্রেয়স্কামো ন গৃহ্নীয়া জ্যেষ্ঠাপত্যকলত্রয়োঃ ॥‡

ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখনিষেধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি না; কিন্তু আপনারা

* Book of Job Chap I, 21

† "Early Christianity" by S. B. Slack, Prof. McGill University pp 14-19.

‡ শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি নিজনাম, গুরুর নাম, অতি কৃপণ ব্যক্তির নাম, জ্যেষ্ঠ অপত্য ও স্ত্রীর নাম গ্রহণ করিবেন না।

হয়ত সকলেই জানেন, হিন্দুসমাজে লোকে প্রায়ই নিজের ও নিজ পুত্রকন্যাদির কোষ্ঠীগত নামটি কেবল পূজা প্রভৃতির সময় সঙ্কল্পাদি কার্য্যের জন্য ব্যতীত অন্য সময়ে গ্রহণ বা প্রকাশ করে না। কেননা লোকের বিশ্বাস এই যে, ঐরূপ নাম কোনও শত্রুলোকে জানিতে পারিলে অভিচারক্রিয়াদিতে ব্যবহার করিয়া অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। আবার সর্ব্বদা উল্লেখযোগ্য নামসম্পর্কেও মনু বলিতেছেন যে, যে কন্যার নাম উৎকট, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই — সে অলক্ষণা। দিনপঞ্জিকার জ্যোতিষ-বচনার্থেও আপনারা নিম্নলিখিত ছত্র কয়েকটি পড়িয়া থাকিবেন ;—

বাচাল অথবা হয় পিঙ্গলবরণী।
নক্ষত্র-নামিকা কিংবা বৃক্ষের নামিনী ॥
নদী পক্ষী অহি কিংবা নামে অন্তগিরি।
ভীষণনামিকা কিংবা দূতীনামধারী ॥
এ সব বিবাহযোগ্যা কদাচ না হয়।
জ্যোতিষবচন অর্থে এইরূপ কয় ॥
তার মধ্যে বিবাহ কর্ত্তব্য হবে যেই।
জ্যোতিষপ্রমাণ মত লিখিলাম এই ॥
গঙ্গা কি যমুনা বা গোমতী সরস্বতী।
বৃক্ষনামে যদি হয় তুলসী মালতী ॥
নক্ষত্র নামেতে হয় রেবতী অশ্বিনী।
অথবা রোহিণী হয় অশুভনাশিনী ॥

ইহার পরেও কি কেহ বলিবেন যে নামের মধ্যে কিছুই নাই ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত কবিরত্ন।

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5. Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
„ Sir S. P. Sinha, Kt.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
„ Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
F. C. French, Esq., C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M. A.
„ W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
„ T. T. Williams M. A., B. Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
„ G. H. Langley, M. A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.

The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The „ Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Sir Gooroodas Banerjee, KT., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
„ Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
„ Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
„ Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra
„ Jagadananda Roy.
„ Binoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law. Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

সূচী।

// THE DACCA REVIEW.

VOL. VII. JANUARY, 1918. No. 10.

MANDALAY.

In 1908 I went to Mandalay, the last capital of Burma under the Burmese Kings. It was founded in 1857 during the throes of the Indian Mutiny by King Mindon Min, the most notable of all Kings of the Alompra dynasty. The city is about 386 miles by rail from Rangoon; and it lies in 21° 59′ N. and 96° 6′ E Leaving aside all other buildings and pagodas which are numerous I entered Fort Dufferin by the eastern gate. The name Fort Dufferin was given to the old palace by the British Government. The circumference of the fort is 1¼ square miles and it is situated at a distance of a mile from the Mandalay Railway station. The old Palace or "the Centre of the Universe" is located in this fort. "Its architecture is unique, and recalls its prototype of Nepal and Magadha." A moat of 225 feet wide and eleven feet deep surrounds the fort, the water being supplied from the Mandalay Irrigation Canal. As soon as I entered the palace I noticed the Clock Tower on the right and the 'Tooth' relic tower on the left side. The palace is 900 feet long and 500 feet broad and is built on a raised platform which is six feet high. Originally 120 buildings in all were built in the palace enclosure, many of which have been dismantled by this time. The Durbar halls of the King and Queen, the different chambers, the walking halls, the different chambers, the Dancing hall etc. with the existing seven thrones are all beautiful specimens of fine architecture and evince the artistic skill of the Burmans of that age. The Lion Throne which was placed in the Hlutdaw or the Great Audience Hall is now kept in the Calcutta Museum. This was used thrice a year for the special gathering of the feudatory chiefs, ministers and members of the Royal family. The empty royal seat over which the Lion Throne was placed formerly is about eight feet high.

This was approached by the King after crossing a few steps from behind where a small door was built for this purpose.

The palace was made more pleasant by artificial water reservoirs and Palm groves, artificial grottoes, ornamental garden lakes and water palaces, etc. Small archlike bridges were made for crossing the water reservoirs. Not far off from the Palace buildings lie the lotus pond. A boat was found floating over it, perhaps it was used for collecting lotus flowers. A special barge was also utilised by King Thibaw for pleasure trips in the moat. The Commisariat offices, the Jail and the office of the Military Regiment form a part of the palace. An English Club has also been established on the right side of the road which lies at a moderate distance from the Main gate of the Fort.

The robes, wooden figures of the King and Queen and other officials and ladies, the royal and official regalia, the antiquarian collections and other exhibits are preserved in the Museum.

Space will not permit a more detailed description of the palace and its surroundings. Mr. Taw Sein Ko, C.I.E., the Superintendent of the Archæological Survey of Burma writes "Mandalay is the centre of wooden architecture, and wood lends itself to the quaint artistic genius of the Burmese people. The palace buildings and the Monasteries are fine specimens of an art, which is rapidly passing away. The tall pyramidal spires, the multiple roofs, the flamboyant ornaments, the brilliant mosaic work, and above all, the rich gilding which flashes gorgeously in the sunlight, have been handed down for long generations, and, for all we know, these might have formed the chief features of the Palaces of Asoka and his successors, of which we have but a faint glimpse from the records of the early Greek writers."

In November 1901 Lord Curzon inspected the Palace, an estimate was prepared and at a cost of Rs. 75,248 some parts of the palace were repaired. Now a handsome amount is being spent annually for the repair of the pagodas and other buildings of importance in Mandalay Division by the Archæological Department of Burma. Seven lakhs of rupees were collected by public subscription during the last six years for the repair of the religious edifices in the Mandalay hill and its vicinity. The work was done under the supervision of U Khanti, a hermit.

The Zayats, Kyaungs, and pagodas number twentyseven; among these the following deserve special notice. The Kuthodaw Pagoda stands a few hundred yards away to the north-east of the eastern gate of the fort. It was built by King Mindon Min in 1857 on the model of the Shwezigon Pagoda of Pagon, which was the capital of Burma from 108 to 1291 A. D. Six years ago this pagoda was regilt by the Hon'ble U Po Tha, a well known merchant

of Rangoon at a cost of Rs. 30, 000. Inside this pagoda the Tripitaka or the Buddhist canon is inscribed on the 729 stone slabs. This collection is very famous among the Buddhists, and is prized by all oriental scholars.

In the southern part of the town at a distance of 4 miles from the palace at Shanzu one should not fail to see the celebrated Arakan Pagoda wherein is enshrined the Mahamuni image, "the Palladium of the Arakanese race" which was brought by King Bodawpaya in 1784 after his conquest of Arakan. The image is in the sitting posture being 12 feet seven inches high and 9 feet broad. Here exist some bronze figures and miraculous healing powers have been attributed to them for a long time.

The city is larger than Rangoon. Except the B and C roads on which stand big shops and important buildings, the Public Offices, the premises of the Training School and the offices of the Burmese Archbishop, the Thathanabaing are worth seeing. Many houses are scattered here and there and the result is that this city though occupying a bigger area than Rangoon possesses only 1,38,299 human souls. At the Zegyo bazaar wooden articles, silk flowers and lacquer work bowls and trays are sold in enormous quantities at comparatively cheap prices. This is the biggest bazaar in Burma. Females take an active part in the selling of many things—which is very rare in India.

Now to turn to the history of Mandalay. In the month of November 1852 there was a dacoity in the house of the Pagan King's nurse. The Pagan King was the elder brother of Mindon Min who reigned from 1846-1852. King Mindon Min came to know that this dacoity was the result of a conspiracy to disgrace him and finally secure his downfall. Suddenly a banian tree near the residence of the king at Amrapura burst into flower. This was looked upon as a bad omen according to the Burmese custom. In addition to these incidents there were some other minor reasons which led to the decision for the transfer of the palace from Amarapura. The King with his family and other attendants numbering some 300 left his residence at Amarapura on the 18th December 1852. The party encamped for the night at Madaya. This news of the flight of the King was reported to the Pagan King by Ponna Wun Maung Kala and strict orders were given to seize King Mindon and a large army was sent for the purpose. After some fighting the king's party proceeded as far as Singu. On the 22nd December the King arrived at Shwebo and preparations were made for the defence against Pagan King's men. At Shwebo the Sawbwas (chiefs) and other people gave their allegiance to King Mindon Min.

When Pagan Min heard of the defeat of his troops and the loss of Shwebo,

he appointed his younger brother Hlaing Min Thiridhammayaza to the command of 1.000 men. After the further defeat of his soldiers Pagan Min appointed four commanders in charge of the four gates of the city for protection. Now Mindon Min appointed his brother with the title of Eingshemin (heir apparent) as Commander-n-chief of all the forces and sent him with 5,000 men from Shwebo. Their opponents were about 6,000 under the command of Bo Hai. On the night of the 18th February the Einghsemin came over from Sagaing and arrested all the officials of Pagan Min and sent the Crown, the royal robes and insignia to Shwebo. The royal family consisting of Pagan Min's mother, sister, and aunt, were kept in a temporary palace at Shwebo. King Tharrawaddi's daughter, the sister of Pagan Min was then formally married to Mindon Min and was made the chief queen.

There are many fables and stories about the transfer of the capital from Amarapura to Mandalay. It is said that the Great Buddha when he overcame the five Mara (Maya) and was able to see into the future pointed to the Mandalay Hill (which is 954 feet high) and prophesied that, that spot possessed every quality that is good and was fit only for the abode of kings. King Mindon Min also saw in a dream some auspicious signs for the establishment of a palace in Mandalay.

Amarapura though it was known as the "city of immortals" was very unhealthy and owing to the above reasons it was finally decided at a Council to commence the building of the new city and palace on the 13th February 1857. Several officers were appointed to superintend the work and were sent to Mandalay. In June 1857 the king, the chief queen and the whole court in great procession advanced to Mandalay and for some time they stayed in a temporary palace. After the construction of the temporary Kyaungs (or monasteries) 500 priests proceeded from Amarapura and settled there. The final transfer of the Government from Amarapura was however completed in 1860.

In May 1858 the walls of the palace and the palace itself were completed and on Friday, May 1st, at eleven in the morning there was a violent thunderstorm and the palace spire was struck by lightning. Though the King addressed the ministers and a meeting was held in the Hall of Audience where it was announced that it was a good omen and the king would be victorious over all his enemies it was looked upon by the poor people as an inauspicious event which increased the discontent.

"The event of chief importance in King Mindon's reign was according to the Gazetteer, the treaty concluded at Mandalay in 1857 between the British and Burmese Governments. This provided for the mutual extradition of

criminals, the free intercourse of traders, the restriction of the royal monopolies to earth-oil, timber, and precious stones, and the establishment of permanent diplomatic relations between the two countries. Under this treaty a British resident was established in the Upper Burma capital, with certain civil jurisdiction over cases concerning British subjects, and a Political Agent subordinate to the resident was stationed at Bhamo. So long as Mindon Min lived, notwithstanding that he clung to the obsolete ceremonials to which he was accustomed, and thus debarred the British resident at Mandalay in his later years from access to his presence, nothing arose which gave any reason to apprehend a breach in the good relations between England and Burma."

In 1870 for easy communication a telegraph line from Mandalay to the British frontier was about to be laid down. In July 1870 for adminstrative purposes offices for public works, Agricultural and Financial Departments were built in the Palace enclosure and Burmese officials were placed in charge of these Departments. Again in 1872 the Mekkhara prince was appointed to the charge of Engineering work and factories in Mandalay.

In December 1876, King Mindon Min resolved to build a Pagoda which should surpass every pagoda in existence in size and magnificence. A site was selected at the foot of the Yankintaung, a hill which is situated to the east of Mandalay. Some Italian Engineers were appointed to supervise the work. But before the death of the king the structure rose to only 3 feet though the work was pushed on with the greatest energy and ever since than it has been left undisturbed.

In July 1877 the king fell ill and daily grew worse as medical treatment was of no use; so he was unable to attend the court. A rumour soon spread that His Majesty was dead, consequently there was much anxiety among his subjects. In order to convince the people the king with the utmost effort made his appearance in the Hall of Audience where he remained for a short time. He was gradually losing his strength and on the 12th September ordered all the princes to attend at the palace. The Nyaung Yan Prince, who was the most pious of his sons was in daily attendance with the physicians and was aware of the nearly hopeless state of his father; moreover he received a private warning from his mother, so instead of going to the palace he took refuge in the British Residency and persuaded his brother Nyaung Ok to go with him. The other princes went to the palace, were arrested in a body and imprisined in a building to the south of the Hlutdaw. After two days they were removed to a building north of the Bahosin, and were loaded with chains. The mothers of the unfortunate princes begged the king for their release, which

was ganted by him on the 19th September.

After the release of the princes the Mekkhara prince alone was allowed to go to the King's bedside. On hearing further reports from the Mekkhara prince as to how the matter stood and thinking that after his death there might be still more troubles Mindon Min decided to appoint several Regents (Bayingan) for proper administration. Accordingly the Thonze prince Bayingan was placed in charge of the country from Shwebo to Bhamo, the land between Kyaukee and Toungoo frontier was assigned to the Mekkhara prince, and the tract between Myingyan and Myede to Nyaung Yan prince as the third Bayingan. All of them were provided with one royal steamer and a Hlutdaw clerk. Then the King ordered the Treasury to advance money for their expenses. The Mekkhara prince was warned that neither of the Regents should return to the palace without necessary orders with the authoritative signature of His Majesty. The Mekkhara prince retired from the presence of the king after paying his respects and thanking him for the hononr and the favour shown to them all.

"King Mindon Min died on Tuesday, the 1st October, 1878, two hours after sunrise in the golden palace and his remains were humbly carried by the Ministers to the crystal palace, the Hmanandaw, and there laid on a golden couch of state all set with precious stones. His body was decked out in the royal robes, his face, hands and feet were covered deep with the finest gold leaf; a white canopy embroidered with gold leaves was set overhead; and the eight white umbrellas, four on each side, were unfolded over him." After a few days he was buried with all the necessary royal rites and a beautiful monument was erected over the grave in memory of this noble King. "This tomb is gilded and covered with glass mosaic and is a simulation in brick and mortar of the usual seven storeyed spire built of wood. It is a beautiful specimen of Burmese art, and, like the Taj Mahal, is seen at its best by moonlight, when the scintillations of the glass mosaic transform it into a fairy like structure. This was renovated by the Public Works Department in 1898, and the work now seen is of quite recent date. Nothing of the old work remains."

The King breathed his last after a prolonged attack of two months from dysentery. He was a very religious, peace-loving, kindhearted, learned, and intelligent king; besides this he was eager to learn everything new in Science or literature. He built a Christian Church and a School where he sent several of his sons for western education. But he was very zealous in fostering Buddhism in recognition of which numerous pagodas, kyaungs and Zayats &c., were erected during his

regime. The people had a great reverence and liking for the King and his loss was therefore very keenly felt throughout his dominions.

While the King was in his sick bed the Alenandaw queen was trying her best for the nomination of her son Thibaw to the throne and this was somehow secured. Just after the day of the funeral of the King, Prince Thibaw was proclaimed King. Now the Ministers established a constitutional system of Government and a council was appointed for the proper administration of the affairs of the country but it came to an end within three months as the queen Alenandaw and King Thibaw did not like it. Immediately after the coronation of King Thibaw some of the elderly queens, their daughters and many others were arrested and lodged in Jail. They were not released before the occupation of Mandalay by the British troops.

"At first the king's intention was simply to keep the princes, his brothers, in confinement. A large Jail for their accommodation was therefore commenced on the western side of the palace but before long the Alenandaw queen, her daughter Supayalat, and their confidential advisers arrived at the conclusion that the death of the princes was the easiest way of preventing them from giving trouble. King Thibaw required little persuasion and the massacre took place in February 1879. A huge trench was dug to receive them all and many were tossed in half alive or only stunned by the clubs of the executioners. The Hlethin Atwinwun (The Officer in charge of the Boat flotilla) was Myowun (Mayor) of Mandalay at the time, he with the Yanaung Mintha and their Lethondaws, their personal attendants, were sent to verify the dragonnade and see that none escaped. The huge grave was covered with earth, which was trampled down by the feet of the executioners but after a day or two it began gradually to rise and king sent all the palace elephants to trample it level again. After some time the trench was opened again and the bodies were taken out and removed to the common burial ground and interred there." These victims numbered between 70 and 80 souls. All of them were notable and respectable princes and their relatives. With the demise of King Mindon Min his worthy favourites and relatives were put to death mercilessly without any consideration whatever. The people of the Country and the whole court were horrified at this massacre but none dared to murmur, so a spirit of lawlessness spread about the country and taking advantage of the time the dacoits and robbers carried out their plans of infesting every part of the kingdom. After the massacre queen Supayalat distributed to her maids-of-honour all titles that were formerly assigned to the murdered

queens and Princes; King Thibaw also followed this example and conferred on his attendants the title of the deceased princes.

The Ministers and the Alenandaw queen decided that King Thibaw should also marry Supayagyi the elder sister of Supayalat. Supayalat was first married to King Thibaw just after his succession to the throne. Again during his coronation both the sisters were formally married in the presence of the entire court and it was also decided that Supayagyi should be elected as the chief queen and Supayalat should be styled the northern queen. Consequently both of them sat on the throne to the right and left of King Thibaw. This increased the jealousy of Supayalat who did not like that Supayagyi should be the chief queen. Soon after this the nurse of Supayagyi was killed while she was praying for the welfare of her mistress. Quarrels were very frequent between King Thibaw and Supayalat which was the cause of his downfall. Supayalat even contrived to concoct a conspiracy and induced Thibaw to kill Yanaung Mintha who was one of Thibaw's friends; several others were also sent to jail. These arbitrary acts were much discussed in Mandalay and throughout the whole of Burma and "ruined the confidence of the people."

In 1884 another wanton massacre followed. It was suspected that the Myingun Prince who was then at Pondicherry had some supporters among the officials in Mandalay and cast longing looks on the throne. There were already many political prisoners in the Jail near the palace and now on suspicion many more were imprisoned in expectation that they would give information about the intrigues of the Myingnn Prince. But unfortunately nothing came out of it. Perhaps to make room for prisoners some of them were released secretly and when they were going out the king's troops rushed into the jail, killed everyone they came across and to save further troubles set the jail itself on fire. Thus all the prisoners were promptly massacred.

So King Thibaw had now become very unpopular and the massacre of 1884 had horrified many of his subjects; moreover "the establishment of the royal lotteries impoverished and demoralized the people and the royal exchequer was nearly empty." To make matters worse the chief queen sent the Taingda Mingyi (Chief Minister) a a simple order to fill the royal Treasury. The Taingda Mingyi arbitrarily fined the Bombay Burma Trading Corporation and demanded the sum of twenty-three lakhs for having committed a breach of contract in regard to certain teak forests. They appealed to the Government of India and a remonstrance was sent to the King. He however ignored it and tried to levy the fine by the confiscation of timber, elephants and other property of the corporation.

On the 22nd October 1885 an ultimatum containing the following provisions was despatched by a special steamer to Mandalay.

(1) That an Envoy from the Viceroy and Governor-General should be suitably received at Mandalay and that the dispute with the Bombay Burma Trading Corporation should be settled in communication with them.

(2) That all action against the Trading Corporation should be suspended until the Envoy arrived.

(3) That for the future a diplomatic agent from the Viceroy should be allowed to reside at Mandalay, with proper securities for his safety, and should receive becoming treatment in the hands of the Burmese Government."

The Burmese Government was told that the reply must be sent not later than the 10th November, and it was intimated that unless the Burmese Government agreed to these three conditions of the ultimatum without reserve the Indian Government would deal with the matter as they thought fit. A final ultimatum was sent to the King containing the following provisions:—The exact date of the despatch of this ultimatum is not available.

(1) The dispute between the Burma Government and the Bombay Burma Trading Corporation to be settled by arbitration, conducted by a British Officer and a responsible Burmese official.

(2) The reception at the Burmese Court of a British Resident under suitable conditions.

(3) The foreign relations of the Burmese Government to be under the control of the British Government."

King Thibaw's replies to the above ultimatums were anything but satisfactory and immediately an expedition was sent to Upper Burma. "There was some fighting at Sinbaungwe, Kanmyo, and Minhla and the expedition arrived before Mandalay on the 28th November 1885." People say that the king was not aware of the advance of the British troops to Mandalay. "On the 28th the troops disembarked at half past one, marched through the town and surrounded the city walls. General Prendergast and Colonel Sladen entered the palace by the eastern gate and had an interview with the king who surrendered unconditionally." In the palace at the entrance door of the Walking Hall of the king the following inscription has been found on a brass plate. "King Thibaw with his two queens and queen mother sat at this opening when he gave himself up to General Prendergast on the 30th November 1885." In the Burma Imperial Gazetteer the date of the surrender of the king is shown as the 29th November 1885.

"Soon afterwards the king with his two queens and his infant daughter, the Teit Supaya, were taken to the steamer Thooreah and conveyed to

Rangoon and thence to India, and was latterly detained at Ratnagiri where he died in December 1916. The Taingda Mingyi was deported to Cuttack, but was allowed after some years to come to Rangoon, where he died 1896."

This is in short the history of the downfall of the Burmese suzerainty since its inception at Mandalay. King Thibaw was the eleventh and last king of the Alompra dynasty. The following chronological table shows the succession of the Kings of this dynasty.

N. K. DAS GUPTA.

THE DEATH OF MEGHNAD: THE INDIAN HECTOR.

BY

(N. MUKHERJEE, M. A. B. L., BARISTER-AT-LAW.)

Canto I.

This said, he to the messenger now turned
And thus bespake, (while still with grief he burned):
"Canst thou say how fell Lanka's brightest star,
The dread of Heaven and thunder-bolt of war?"
And thus the man in tones of solemon sound,
With folded hands, and head bowed to the ground:
"As rushes, bellowing, a tusker wild
And treads the fenny reeds down, (he replied),
So furious rushed thy son on hostile hosts,
And numbers of the foe slew at their posts,
And strewed the field with mountains of the dead."
He paused and, waxing more eloquent, said;
"Heard I, O King, the Ocean booming loud,
Heard I the Thunder roar from cloud to cloud,
Heard I the Lion with refulgent mane,
Raise echoes wild through the lone mountain-glen,
But heard I not, O King, a mingled roar
Of thunders, Oceans, lions, yet before.
E'en such the din raised by his twanging bow,
But louder still his battle-cry did grow;
While missiles whistled, and hissed on the wing
The feathered fates, loosed from his trembling string,
And, thick as dust, lo! fiery arrows fly,
Lightning-wise, and flame up the noon-tide sky!
Beside him many a band of warriors fought
Of noble lineage, and huge carnage wrought;
(So tusker-herds fight by their leader well
And in their maddened fury forests fell).
What zeal runs through the rank and file, behold!
What wondrous handling of arms manifold!
Thus fought thy god-like son, e'en as a god.

Till on the bloody scene Ram-Chandra strode,
On head a golden crown, in hand a bow
Huge as a Rainbow gemmed, and"—tears overflow
And choke his speech, he stops and says no more,
(Remembrance ripping up, afresh, his sore);
So weeps a wretch, grown suddenly morose,
When Memory wakes the string of by-gone woes.
So wept the courtier-bands and Minister-train;
And to the trooper Ravan said again;
"Go on," O'Messenger conclude thy tale
Of how by Rama's hand Vir-Vahu fell."
"Ah! how can I, (he cries), the tale unfold?
Or shalt thou bear, OChief, to hear it told?
As when a lion on a wild bull springs
Loud he roars, and the wood with echoes rings;
He grinds his teeth; his eye-balls flash with fire;
So on thy son he fell, inflamed with ire!
The tide of battle raged with zeal renewed.
(As Winds and Waves Pursue their ancient feud.)
Ten thousand sabres from their scabbards flew
And sparks of living fire on all sides threw;
Swords clattered on shields, (so loud the uproar!)
And drums and conch-shells raised an Ocean's roar,
Which shook Imperial Lanka to its core;
And all the field ran warm with steaming gore
Rather than live to tell this tale of woe,
Would I were slain by the infuriate foe!
To what crime in my lives of long ago,
Yet unatoned, this living death I owe?
Yet on my *back*, in gory letters' graved,
Behold no wounds!—My *breast* in blood is laved!

"Stop! brave youth! stops! exclaimed the Demon-Chief,
As he rose from his throne, with pride and grief,
"Who could hark to such tales, yet keep aloof
From this great war in sloth beneath his roof?
What adder, deaf to sounds of pipe or lute,
Keeps to its hole coiled-up, thus still and mute

O Lanka ! fit nurse of the brave and free !
Bring forth such heroes still to die for thee !
Now, follow me, Ye Courtier-bands ! (he said,)
To view the Prince amongst his comrades dead.

Ablaze with dazzling crowns, Dashanan clomb ;
The palace-tower crowned with a golden dome ;
(So mounts the Orient hills the God of Day,
Refulgent in his robe of golden ray).
He views Imperial Lanka far spread out,
And towery mansions of gold, round about.
A Park surrounds each, gay with smiling flowers
And silvery lotus-lakes between the bowers.
Not more bewitching yet seems Beauty's bloom
Than scenes like these, fit to remove all gloom.
The Temples rear their shining steeples high,
Vying, (it seems), to kiss the emerald sky.
Lo ! well-filled shops the golden pavements line
And diverse gems, displayed, resplendent shine
As if, for tribute, thus the God of Gold
Lays, Lanka ! at thy feet his gems untold
The Raksha-chief views on the City-wall,
(Like lions perched on crags), his Warriors tall
Watching the crafty foe, armed to the teeth,
And the four main gates, closed and barred, beneath.
Without, in order ranged behold his troops,
And chariots, elephants and steeds in groups.
Far out, beyond the City-Wall, there lie
The hostile hosts, vast as stars in the sky,
Or sands, which on the sea-beach, whirling, fly.
There by the East-gate martial Nila lay
With monkey-forces, eager for the fray.
The South-gate awaits Young Angad's siege.
In him, for youthful vigour, Ravan sees
A towery tusker, leader of his herd.
So, (long trance o'er), by warming zephyrs stirred,
Appears, "renewed in youth, the crested snake
Who slept the Winter in a thorny brake,

And, casting off his slough when spring returns,
Now looks aloft and with new glory burns,
Hissing, high o'er the grass he rolls along
And brandishes by fits his forky tongue." *
At the North-gate the samian Monarch stood,
(Sugriv his name), with lions' strength endued.
Before the West-gate mighty Rama stands,
Bow in hand, and his martial bands commands.
Ah ! sad he looks, pale as a ghost forlorn,
Shorn of thy beaming smiles, O Furrow-born !
Such paleness, thou sweet Lily ! dost display
What time sinks in the sea the God of Day.
On him waits Lakshman on the field of gore,
And Hanu (Anjana' to Pavan bore),
Besides the friendly demon, Vivishon,
(Brother to the ten-headed Dashanan).
As close inclose the Monarch of the Wood
A hunter-band, with many a coil pursued ;
So close a siege, ah ! sea-girt Lanka stands—
A Vima in might—at Raghava's hands !
Lo ! what tumultuous din and hideous cries
Of Vultures, jackals and wolves rend the skies.
The ghouls drink steaming gore, and gorge on meal
And kites swoop down and fight o'er sundered feet.
And arms, with beaks and claws and thrusts of wing,
And, shrieking, putrid flesh, on all sides, fling.
There tower above the mountains of the dead
Huge elephants ; and steeds the field o'erspread.
Endowed with tempest-speed, now still these lie,
And wave no more their golden manes on high !
There lay broke countless cars, inlaid with gems,
No more displaying flags of lightning-flames,

* In these six lines (which occur in the second book of the Aenied) Pyrrhus' *glittering arms* are compared by Vcirgil to the shining *slough of a snake*.

Michael has incorporated these very lines into his deseription of Angald. The lines put in inverted commas, are reproduced from Dryden's classical translation. N. M.

No more revolving round on golden wheel
With flashes of fire each turn would reveal!
Thick as dust swords and lances strewed the fields
And broken bows and spears, and brazen shields,
And quivers and clubs; and on mangled arms
Vain glittered golden amulets and charms!
Helmets and breast-plates and bright diadems
And coronets adorned with flaming gems;
And drums and kettle-drums, and sounding shells
And bugles there lay, mixed with martial mails.
Grasped still in death, the banner-bearers held
The golden poles; nor winds their banners swelled!
Whole legions fell prone on the sanguine plain—
The dying lay interred beneath the slain.
The streaming blood runs warm in purple tide,
And slaughtered heaps arise on every side.
"Not with such rage a bursting tempest borne
Sweeps o'er the field, and mows the golden corn." *
Thus fell Vir-Vahu with his princely train,
Conspicuous to view, on the fated plain.
So fell Ghototh-Koch, (whom Hiramva bore
To mighty Vima), in the Varat-War,
When, hissing, flew from Karna's deadly bow
The deathful dart which laid the Giant low.
Thus Ravan watched the Prince with humbled pride
And his companious-in-death close beside.
"Who would not," (he exclaimed and heaved a sigh),
"Who would not on a bed of glory die?
Breathes there a soul, so deaf to martial calls
That he would fiddle while his country fall?
If such be, cursed, *thrice* cursed such coward be,
Shunned and abhorred by humanity!
Vain! Vain, sublunar sorrows! Yet my heart
Bleeds lacerated by the deadly dart!

* This line which occurs in Book XX "Jerusalem. Delivered", is apparently borrowed from Tasso. N. M.

Ah! Can the human breast, soft as a flower,
The thunder bear? Yet mine hath felt its power.
Father of fathers! how keen must thou feel
A father's *joy*!—A father's *woes* now heal.
What game play'st than with human heart for pawns
On Life's chess-board, nor heed'st our moans and groans?

Having said this, he rolled his eyes around
And viewed his fairy Lanka, Ocean-bound.
The Ocean, nurse of crocodiles, behold
From shore to shore a floating bridge uphold
Of rocks chained fast to rocks by samian skill;
While billows beat against them furious still,
And thunder loud as they break into foam,
(As doth Vasuki in his nether—home).
So! Ceaseless flows, beneath, the moaning main
(Like mountain streamlets murmuring through the glen).
He thus surveyed the floating rocks a while,
Then said to Ocean with sardonic smile:
"Fie! Ocean! fie—*Thou* wearest this *chain of shame*!
Thyself the Nurse of Pearls of blameless fame!
What God hast thou enraged to merit this?
Or hath Raghava bent thy will to his?
OTempest fighter! with what force thy waves
Rage with thy Foe till, foiled, he howlsand raves!
Bury this bridge in thy abysmal womb
And doom thy ravishers to briny tomb.
The dancing bear is led about, enchained,
But not for lions is such fate ordained.
O Mighty Deep! Say why such fetters bear
Bear-like? Why suffer to be bound for e'er
To Lanka, which reposeth on thy breast,
(Like Keshav's *Kaustav*, ay, of gems the best)?
Sweep, sweep thy shame away, drown my fell foe
Beneath thy blue waves, and allay my woe."

Thus Ravan raved, then to his throne returned,
And all his courtier-bands in silence mourned,

Speechless with grief; but hark! what moaning sound
And clink of jewels wake sad music round?
'Tis fair Chitrangada, the bright-eyed Queen;
But ah! maternal sorrows mark her mien!
Weeping she sweeps into the gilded hall,
In sweet disorder, like a goddess tall.
On her a band of blooming maids attend
And streaming tears their fawn-eyes wide distend.
Like *Lightning* still their budding beauties seem,
And, dark as *Clouds*, their flowing tresses stream;
Their tears fall in *Showers*, *thunders* loud their wail,
And lo! their sighs swell out into a *gale*.
As through the Winter dost thou, golden Vine!
(Wild beauty of the woodland!), withered, Pine;
So, sorrow withering every radiant bloom,
She looks, alas! like thee, immersed in gloom!
So mourns the Nightingale, with anguish stung,
When some rude swain purloins her callow young."

NIGHT.

At dusk I sat upon a little hill.
Swift over India sank the velvet night
And from the east the moon upclomb to fill
Earth and deep heaven with a lake of light.
A beetle passed with heavy-droning hum
And a little wind rose up and died again.
I heard the beating of a distant drum
The chanting of far voices on the plain
Singing an Eastern song: the jackals cried
Lifting their hunting call to one first star.
The yellow lamps of men leapt up and died
Upon the infinite lowlands, near and far.

"Now leans the Lady Night her star-strown breast
Prone through dim heaven," I said, "and calm surveys
With steady eye the many—creatured quest
Down in the wild among the darkened ways.
Now lifts the tiger up his terrible head
Slowly, and takes the moonshot jungle tracks
Like living flame: and the loping wolf is led
By his leader a-hunting out in his hungry packs.
And many a grey rat runs by a river-ledge
Beneath high banks, and owls vague-flying call,
And frogs are heard hoarse-crying from the sedge,
And the Sable Maid she is gently watching all."

* * * *

And now the moon was high, and heaven I saw
A purple width, untroubled, starry-dight.
There was not any cloud or fault or flaw
To mar the immeasurable dome of night.

D. G. D.

PREDICTIONS AND PROPHECIES RELATING TO THE KAISER, GERMANY AND AUSTRIA.

BY R. C. WYNDHAM.

That visions of future events and the gift of prophecy have been vouchsafed in all times to certain individuals cannot be doubted, for we have the evidence of Holy Writ to confirm this; but very often these predictions are obscure and difficult to unravel until the event foretold actually happens. Then we call to mind the prediction made, perhaps centuries before, and we palliate our unbelief with the example of the Trojans of old and the story of Cassandra.

Daniel's vision of the 'Four Great Empires' happened in the year 606 B. C. Of the Fourth Empire the prophecy says, 'A king of fierce countenance shall arise, understanding dark sentences (lies). His power shall be mighty, and shall prosper and practise, and shall destroy the just people. Through his policy also he shall cause guile to prosper; he shall magnify himself in

his heart, and shall destroy many; he shall also stand up against the Prince of Princes, but his power shall be broken.'

The time appointed for the fulfilment of the prophecy was 'Seven Cycles,' and as each cycle represents 360 years, so seven times 360 would equal 2520. As the prophecy was delivered in the year 606 B. C., as before stated, then by subtracting 606 from 2520 we get the number 1914, the year the present war broke out, the greatest war the world has ever seen, as prophesied by the prophet Daniel and St. John the Divine, which shall only end with the great 'Armageddon.'

St Peter, in his address on the day of Pentecost, quotes the words of the prophet Joel: 'Your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.'

Having these examples before us, why should we deny the gift of prophecy in these latter days? We see prophecies and predictions given four and five and even seven hundred years ago being wonderfully fulfilled in our own time.

In a book entitled *Vaticinium Lehninenses*, written by a monk in the thirteenth century, the end of the Hohenzollern dynasty is predicted to happen consequent on the events of the year 1914. Now it is to be noted that the rise of that dynasty began only with Frederick of Hohenzollern, Burgrave of Nuremburg, in the fifteenth century, when the Emperor Sigismund conferred the Mark of Brandenburg upon the said Frederick in 1417. After the death of the Elector Frederick William in 1688, Prussia became a kingdom, and Prussian militarism began to show itself, but the end of this was foreshown, not a century later, by an old poet, who, in the year 1762, wrote thus: 'The last Emperor of Germany shall be paralysed in the arm, and will mount his horse on the opposite side.' This corresponds exactly with the case of the present Emperor. And the prediction adds, 'His son shall be killed at the gates of Berlin; in that year Poland shall have its own king.'

The celebrated *Prophecies of Strasbourg* and also a Hermit of Aix-la-Chapelle predict the fall of the German Emperor to occur at this same period.

PROPHECIES OF JOHANNES THE MONK, ABOUT 1600 A. D.

1. It will have been thought that the Antichrist has frequently been identified, for all slayers of the Lamb have a resemblance, and all evil-doers are found to be typical of the Great Evil.

2. The veritable Antichrist will be found to be one of the monarchs of his day, a Lutheran. He will invoke the Name of God (the Good Old God), and will claim to be His successor.

3. This Prince of Liars will swear by the Scriptures; he will represent himself as the instrument of the Most High, to chasten the wicked.

4. He will have but one perfect arm, and his innumerable troops will take for their motto, 'God is with us,' and will appear as the legions of hell.

5. For a long time he will agitate by ruse and felony; his spies will overrun the world, and he will be master of great secrets.

6. He will employ philosophers who will attempt to prove that his mission is celestial.

7. A war will cause the mask to be lifted. This war will not be simply against France, but chiefly against another distinguished Power, and in a short time the war will become universal.

8. This war will enlist all the peoples of Christendom; and also Mohammedans, and those from afar. Armies shall arise from the four corners of the earth.

9. The Angels will enlighten the souls of men, and in the third week they will recognise that this is the Antichrist, and that they will all be enslaved if they do not overthrow this despot.

10. The Antichrist will be recognised by many indications; he will go out of his way to massacre priests, monks, women, children, and the aged. He will go forth torch in hand, like the barbarians, and will show no mercy while he blasphemously invokes the Name of God.

11. His pretentious words will resemble those of the Christians, but his actions will be those of Nero and the Roman persecutors He will have an eagle in his coat of arms, and another eagle will appear in that of his Ally, the other bad monarch.

12. These are Christians, but one of them will die by the malediction of the Pope Benedictus, who will be elected towards the end of the reign of the Antichrist.

13. There will no more be seen any priests, simply to absolve the combatants, for priests and monks will fight as well as other citizens; and further, the Pope Benedictus will have cursed the Antichrist, and it will be proclaimed that those who fight against this despot will find salvation, and dying will straightway be translated to heaven like the martyrs.

14. The Papal Bull which proclaims these things will resound afar, and will give fresh courage to the brave, and carry death to the allies of the Antichrist. The defeat of the Antichrist will demand the death of more men than Rome ever contained.

15. It will need the united efforts of all the Powers, for the Cock, the Leopard, and the White Eagle will not make an end of the Black Eagle if the prayers and wishes of all humane people do not aid them.

16. Humanity has never before known such great peril. The triumph of the Antichrist would be that of the Demon of whom he is the incarnation.

17. It has been said that twenty centuries after the Incarnation of the Word, the Beast will in his turn

incarnate, and menace the world with as much of evil as the Divine Incarnation brought of good.

18. In the twentieth century the Antichrist will manifest himself. His army will exceed in numbers anything that has ever been imagined. There will be Christians among his followers, and there will be Mohammedans and savage troops among the Defenders of the Lamb.

19. In all Christendom there will not be even a small space that is not red—sky, earth, water—and even the atmosphere will be all red, for blood will flow into all the four elements at the same time.

20. The Black Eagle will hurl himself at the Cock, who will lose many feathers, but will use his spurs heroically. He would speedily be reduced but for the aid rendered him by the Leopard and his claws.

21. The Black Eagle will come from the Lutheran country, and will surprise the Cock, and will invade much of his territory.

22. The White Eagle will come from the northern side, and will surprise the Black Eagle and the other Eagle, and will invade the country of the Antichrist.

23. The Black Eagle will be forced to retreat from the Cock, and the Cock should follow him into the country of the Antichrist, to help the White Eagle.

24. None of the battles which have taken place hitherto up till now will have been anything equal to those which will takeplace in the Lutheran country, for the Seven Angels, spoken of by the Divine St. John, will now pour out the fires of their vials of wrath on the impious land, which signifies that the Lamb will ordain the complete extermination of the race of the Antichrist.

25. When the Beast sees that it has lost, it will become furious and will work destruction, and for some months the beak of the White Eagle, the talons of the Leopard, and the spurs of the Cock will rend it. Rivers will be forded by means of dead bodies, which will divert the course of the waters. Only the very distinguished, such as Generals and Princes, shall be interred; for the carnage of the war will be heaped together with the victims of plague and hunger.

26. The Antichrist will on several occasions sue for peace, but the Seven Angels will go before the Three Animals and the Defenders of the Lamb, and will proclaim that peace shall only be accorded on condition that the Antichrist be crushed as straw in the thresher.

27. The Three Animals and the Agents of the Lamb, cannot stop fighting whilst there remain soldiers of the Antichrist.

28. What makes the decision of the Lamb so implacable is that the Antichrist has pretended to be a Christian, and has blasphemously acted in the Name of God. If then he does not

perish, the fruit of the Redemption will be lost, and the gates of hell will have prevailed against the Saviour, and this cannot be.

29. This will be no human war. The Three Animals and the Defenders of the Lamb will exterminate the last army of the Antichrist, but the battle-field will be made a charnel-house as large as a big city. For the dead will have transformed the place, making it a chain of hillocks.

30. The Antichrist will lose his crown, and will die in solitude and in insanity. His empire will be divided into twenty-two states, but none of them shall have either a fort, an army, or a ship.

31. The White Eagle will drive out the Crescent from Europe, where there will remain none but Christians. The White Eagle will then establish himself in Constantinople.

32. Then shall commence an era of peace and prosperity for the world, and there shall be no more war; each nation shall be governed by its own conscience, and will live in justice. Then peace shall reign and happiness shall dawn on the human race.

Such are the extraordinary predictions of Johannes the Monk, uttered over three centuries ago, much of which we see already fulfilled by the present war, but the end has yet to come.

Paragraphs 2 to 8 show clearly the figure of Kaiser William II. as if his name was actually mentioned; especially paragraph 4, where it says, 'He will have but one perfect arm.' It is well known that part of the left arm, as well as the left leg and all the left part of the body of the Kaiser present symptoms of atrophy. In fact for half an hour after his birth he was thought to have been still-born. Well for the world had it been so.

Again the prediction says, 'His innumerable troops will take for their motto, 'God with us.' What presumptuous arrogance!

Professor Rheinfeld Seehy, lecturer in the university of Berlin, preached on Sunday, December 29, 1915, in the cathedral of that city, before the Kaiser and a crowded audience, exhorting his hearers in the following manner: 'As the Almighty gave His Son to be crucified so that the work of redemption should be completed, so Germany is destined to crucify humanity, to secure its salvation. Humanity must be saved by bloodshed, by fire, and by sword. For Germans this is a holy cause which they must not neglect, unless they commit a crime. Our beloved Emperor for long years laboured to maintain the peace of the world (?), and it is exactly on account of our purity (?) that we have been selected by the Almighty as the instrument to chastise the evil-doers, and to combat with fire and sword the wicked. This is the divine mission of Germany, and it is therefore the duty of every German soldier to burn their houses and destroy them root and branch, by every means in our power,

without pity. Pity to the enemy is a crime in the sight of the Almighty. Satan himself has come into the world under the form of a great empire (Britain). *Gott strafe England* ('God punish England') should be the watchword of every German, ay, even in the mouths of babes and sucklings. When this work of destruction is done fire and sword shall not have been in vain. The reign of justice shall be established on earth, and the German Empire shall have created it (?), and will protect it.'

To return to the Prophecies of Johannes the Monk, paragraph 5 says, 'His spies shall overrun the world and he shall be master of great secrets.' How true this is of the Kaiser and his Government!

Paragraph 10 tells us, 'He will go out of his way to masacre priests, monks, women, children, and the aged. He will go forth torch in hand, and will show no mercy. Belgium and France can testify to the truth of this.

In paragraph 11 we read, 'His pretentious words will be those of a Christian, but his actions will be those of Nero and the Roman persecutors.' Paragraph 3 bears on this where it says, 'This Prince of Liars will swear by the Scriptures, and he will cause himself to be represented as the instrument of the Most High, to chastise the wicked.' Can words be plainer or point more significantly to the Kaiser?

The example given above of Professor Seehy bears out paragraph 6, but is only one out of thousands. Such a rodomontade of sycophancy, and such expressions of barbarous cruelty make civilisation shudder, and arouse universal anger and contempt.

But the tide has turned, and to-day instead of their *te deums*, their churches resound with the *de profundis*. Germans would be glad of peace now, many of them on any terms.

Paragraphs 12, 13, and 14 fill us with amazement! Does the present attitude of the Catholics of Canada and the United States of America, headed by Monsignor Bonzano, Delegate Apostolic at Washington, foreshadow the fulfilment of this part of the prediction? Time will tell.

Paragraph 26 says, 'The Antichrist will on several occasions sue for peace.' Has not the Kaiser on several occasions sued for peace both covertly and openly? But peace shall not be accorded until his armies are crushed 'as straw in the thresher.'

How aptly this paragraph fits in with the answer of the Entente to the Peace Note of President Wilson last January!

What shall be said of the vision of the angels at the battle of the Somme, seen by hundreds of hard-headed English soldiers, who cannot be accused of superstition, or of too much credulity in modern miracles? But it has been well said, 'There is more in heaven and earth than we dream of in our philosophy.' What then shall we think of paragraphs 9 and 26?

Another prophet, even earlier than Johannes the Monk, Thomas Joseph Moult, about the year 1500, gives us the following predictions relating not only to Prussia and Austria, but also to Italy and Russia. 'In 1793 there will be the violent death of a Great Queen' (Marie Antoinette, Archduchess of Austria).

'In 1859 there will be a new form of government in a kingdom.' Doubtless this refers to the Independence of Italy, achieved about that time. 'In 1915 a great treachery will be hatched in a European Court.' Would not this refer to the treason hatched in the Russian Court by the false monk Rasputin and others, with the connivance of the German Czarina? 'In 1917 there will be a new form of government in a great empire.' There can be no question of the fulfilment of this, in the events which have just happened in Russia, for mark the difference in the two predictions. That for 1859 speaks of a kingdom, while that of 1917 mentions a great empire.

EXPLANATION OF THE SYMBOLS USED BY THE MONK JOHANNES.

The Black Eagle represents Germany.
The White Eagle represents Russia.
The Other Eagle represents Austria.

The Leopard and his Claws represent England and her Colonial Allies.

The Lamb represents The Spirit of International Justice, Liberty, and Honour, of which Christ, the Lamb, is the Fountain-Head.

The Agents and Defenders of the Lamb represent The Armies of the Entente.

The Antichrist represents The Spirit of Evil animating the Black Eagle and his Allies.

Guile and deceit were to be characteristics of the Antichrist, and it must be admitted that the duplicity and cruelty inherent in the Hohenzollern family, not to speak of Germans in general, are but the ultimate expression of a two-century policy, which, from Frederick II. to the present Kaiser, has constantly exalted force, deceit, and guile, in opposition to justice and honour, denying these principles in international rapport. As far back as 1848 Cavour revealed the cupidity of Prussia for Belgium, and since 1870 the acquisition of that country was for Germans a work to be accomplished. All Germans have looked forward to this, and none but a German could invent the excuse for the invasion—namely, that Britain had intended to make of the country a fortress from which to attack Germany. Conquest has been the aim of every German for long years, more especially since the advent of the present Kaiser to the throne. Many years ago the writer of this article heard a German in London say, 'One-half the trade of London is in the hands of Germans, and I hope to see the other half also.'

Even the two social classes in Germany, which for different reasons

should be imbued with the spirit of internationalism—namely, the intellectual section and the populace—are confirmed militants, and the war now raging shows with a fierce light the moral unity of Germany, displaying, in all its hideous nakedness, Teutonic barbarity, surprising even to those who before held what they conceived to be the lowest idea of German humanity. 'Act like Huns,' says the Kaiser to his soldiers, but they had no need of the stimulus. In horror we pass from wonder to wonder, on learning what the German press and the leaders of the German people say and do, and on seeing them, like the foul fiend, gloat over the massacre of feeble women and children, unoffending priests, nuns, and travellers by sea, whether enemies or neutrals, and the wholesale destruction of property, families made desolate, widows and orphans crying to heaven for vengeance. Even when compelled to retire from before the advancing forces of the Allies, the German soldiery, *by order of their commanders*, lay waste the districts they are forced to evacuate, carrying off the inhabitants and their goods and property into worse than slavery. Already in 1870 all the German hordes, the Prussians and Bavarians especially, had inaugurated this system, 'to terrorise the enemy,' as one of their commanders said at the time. In the present war they have gone even beyond this, and have displayed a vandalism which outvies the vandalism of the ancient barbarians—burning all the houses of the districts from which they have been driven, setting fire to the property they could not carry off, laying waste fields and gardens, uprooting fruitful trees, and rifling churches or levelling them to the ground. But the greatest crime of all is the violation of the tombs and graves of the dead for the sake of the metal and jewellery to be found in them; rifling the dead of their leaden coffins; and robbing the graves of what they could get. Hear the report given by the correspondent of the *Daily Mail*, in the issue of that paper for Thursday, March 29, 1917. 'Looking for the first time at the ruins in the liberated land, the natural comment was that the Germans had left no one unrobbed, except the dead; but these judgments have turned out too favourable to the Boches, who have not only broken open the vaults in the country churchyards to make machine-gun shelters, but pillaged the graves for the zinc and lead linings of the coffins.

'At Champier, near Nestle, the cemetery has been torn up as if by ghouls, coffins broken up, and the remains of the dead scattered about and filth thrown into the graves. The same thing has been done at Margny-aux-Cerises, Laucourt, and Roiglise. It is evident that robbery was the only motive, because only the tombs of the well-to-do were treated in this fashion.'

For generations to come, the very

name of German will be odious, and stink in the nostrils of all civilised nations. And let us remember that it is not only in the districts where the war is being carried on that this diabolical work is practised. German spies and German incendiaries are to be found in all lands, fomenting rebellions and wantonly destroying the property of neutrals, and this they call 'legitimate war.' Was it legitimate war to sink the *Lusitania*, and the many ships of neutral nations, as well as those of belligerents; to destroy factories and property in neutral America? Was it legitimate war to murder Miss Cavell, or to shoot Captain Fryatt?

German statesmen hurl invective against the enemy outvying in the coarsest language the lowest of the populace. Generals laud the pillage of conquered cities, and declare openly that the life of a German soldier is worth many cities of the enemy. In this too they are inconsistent, for they hound their soldiers to their death recklessly on the battlefield.

Princes exalt assassination and poets sing of undying hatred and odium. *Gott strafe England* is the burden of the song taught even in the infant schools. The German Chancellery openly professes the secret maxim of lying and deceit, and insults the enemy as a drunken wanton would a rival of her own ignoble calling.

At the very dawn of the nineteenth century, from the execrable Von Clausen to the no less brutal Bismarck, the German leaders of the people have inculcated the principles of the so-called 'absolute war.' 'Leave nothing to the conquered but their eyes to weep,' says Bismarck. And Bethmann-Hollweg says, 'Necessity has no law. What are treaties but scraps of paper?'

Low cunning, lying, and unheard-of cruelty have characterised this war as far as Germany and her Allies are concerned, as history will show. What greater hypocrisy, deceit, and lying could there be than in the excuse given by the Kaiser for the submarine piracy *à outrance?* At best it is a tardy excuse. What of the sinking of so many ships before Kaiser William found his transparent excuse? The obvious fact is the Kaiser, feeling that his powers approach exhaustion, would deceive his own people and make neutrals believe that by a cowardly stab in the back, as it were, or by a shot from behind a hedge, he could force peace on his own terms, and that speedily. Protests against this cowardly warfare—if we can call it warfare—have been sent to him from every nation; but for the minor nations who unfortunately live on the borders of the marauders, and who for the pirates would be a *bonne bouche*, 'discretion is the best part of valour.' Even for these nations this thraldom will cease before long.

CHAMBER'S JOURNAL.

৭ম খণ্ড | ঢাকা—ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৪। | ১১শ, ১২শ সংখ্যা

মুসলমান ঐতিহাসিক (১০)

আল্-বেরুণী। *

মুসলমান প্রভাবের প্রথমযুগে যে সকল সুশিক্ষিত মুসলমান ঐতিহাসিক সভ্যজগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আল্-বেরুণী অন্যতম। ধর্ম্মপ্রচার ও বীরোচিত শাস্ত্রোপচারে যে নবোত্থিত মুসলমান জাতির কৃতিত্ব দেখা গিয়াছিল, সে জাতি জ্ঞানপ্রভাবেও আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না; এই কথার সার্থকতা যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন করেন, তন্মধ্যে মহাকবি ফার্দৌসী, দার্শনিক ও চিকিৎসাবিশারদ ইবন্ সীনা * এবং বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্ব্বিদ ও ঐতিহাসিক আল্‌বেরুণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা তিনজনই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুলতান মাহ্‌মুদ যখন স্বীয় প্রতিভায় গজনীতে নূতন রাজাসন পাতিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, এই তিনজন সে সময় পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন। † যে আলোক প্রভায় অন্ধদৃষ্টি হইয়া কতশত ভাবুক সাহিত্যিক স্তবকে স্তবকে গজনীতে সমবেত হইয়াছিলেন, ইহাদিগকে সে তালিকাভুক্ত করা যায় না। ফার্দৌসী মাহ্‌মুদের বৃত্তিকামী হইয়া পারসীক ভাষায় প্রথম ও প্রধান মহাকাব্য "শাহনামা" রচনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু মাহ্‌মুদের রাজপ্রতিভা যতই উদার হউক না কেন, তাহাতে কবি-প্রতিভার প্রকৃত [illegible]

* ইহার প্রকৃত নাম আবু আলি আল্-হোসেন ইবন্ আব্দুল্যা ইবন্ সীনা অর্থাৎ তিনি সীনার পৌত্র এবং আব্দুল্যার পুত্র, তাহার নাম আবু আলি। ইয়োরোপীয়গণ তাঁহার নামের শেষটুকু বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে Avicenna নামে পরিচিত করেন।

† ফার্দৌসী (৯৪০—১০২০) খোরাসানে, ইবন্ সীনা (৯৮০—১০৩৭) বোখারায় এবং আল্‌বেরুণী (৯৭০—১০৪৮) খ্বারেজমে প্রাদুর্ভূত হন।

গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ‡ ফলতঃ মহাকবি গজনী হইতে বিতাড়িত হইয়া তুস্ (বর্ত্তমান মেসেদ্) সহরে আত্মগৌরবে অনাড়ম্বরে দেহপাত করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক ইবন্‌সীনা বোখারাতে সামানীবংশীয়দিগের পতনের পর (১০০৪ খৃঃ) মাহ্‌মুদের আহ্বান পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রান্ত প্রদেশে জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন যাপন করেন। আল্‌বেরুণী ও মাহ্‌মুদের বৃত্তিভুক্ হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অধীন বন্দিদশায় ত্রয়োদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। এখানে আমরা ঐতিহাসিক আল্‌বেরুণীর কথাই বলিব।

মধ্যএশিয়ার অন্তর্গত যে প্রদেশের মধ্যদিয়া চক্ষু নদী (আমুদরিয়া বা Oxus) স্বর্ণরেণু বহন করিয়া আরলহ্রদে পড়িতেছে, সেই দেশের পূর্ব্ব নাম খ্বারিজম্ এবং বর্ত্তমান নাম খিবা। * খ্বারিজমের বার আনা রাজ্য এক প্রকার বহু বিস্তীর্ণ অনুর্ব্বর প্রান্তর ((steppe) মাত্র ; উহাতে নানা যাযাবর জাতি বাস করে। এই প্রদেশের এক চতুর্থাংশ মাত্র মারুদ্বীপ, উহা আমু নদী ও তাহার অসংখ্য খালদ্বারা সিক্ত ও সম্পুষ্ট বলিয়া সুজলা সুফলা সুন্দর ভূভাগে পরিণত হইয়াছে। এই সংকীর্ণ ভূভাগ ও তাহার প্রধান নগরীর নাম ছিল খিবা ; এখন খিবা বলিলে সমস্ত প্রদেশটিকেই বুঝায়। তুর্ক, উজবেগ, কিরগীজ্ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক এখানে বাস করে। আরবীয়েরা ৬৮০ খৃঃ এদেশে প্রথম প্রবেশ করে এবং ক্রমে তুর্ক প্রভৃতি জাতি মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। বাগ্দাদের খলিফা-দিগের প্রকৃত প্রতিপত্তির সময় খ্বারেজম্ তাঁহাদেরই অধীন ছিল ; পরে এরাজ্য সামনী বংশীয়দিগের হস্তে পড়ে। দশম শতাব্দীর শেষভাগে খ্বারিজম্ রাজ্য, বোগ্দাদ ও বোখারার প্রভাব নির্ব্বাণোন্মুখ হইবার সময়ে, স্বকীয় মস্তকোত্তলন করিতে থাকে।

যখন স্বাধীনতার নবোন্মেষে খ্বারিজম্ রাজ্যে নানা আয়োজন ও রণরঙ্গ চলিতেছিল, তখনই খিবার অন্তর্গত (সম্ভবতঃ) বেরুণ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে আল্‌বেরুণী জন্ম গ্রহণ করেন। † তাঁহার পূর্ণনাম আবু রাইহান মহম্মদ আল্‌বেরুণী এবং তাহার পিতার নাম আহম্মদ। আল্‌বেরুণী তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। ঐতিহাসিক বদাউনীর বেলায় যেরূপ, আল্‌বেরুণীর বেলায় ও তাঁহার উপাধি বাসস্থানের পরিচয় দিতেছে।

আল্‌বেরুণী অল্প বয়সে আরবী ও পারসীক ভাষায় সুপণ্ডিত হন। তখন এই সকল দেশে শিক্ষার অবস্থা ও জ্ঞানের পরিধি কতটা ছিল, তাহার একটু আভাষ না পাইলে, আল্‌বেরুণীর বিস্তাবত্তার পরিমাণ জানা যাইবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যে এই ঐতিহাসিকের জীবন লীলা এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল যে তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে গিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনেক অবান্তর কথার অবতারণা করিতে হইবে।

অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে আরবীয় সাহিত্যের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। আব্বাচ্‌বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা মনসুর যখন ৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বাগ্দাদে রাজধানী স্থাপন

‡ "To neither of them (Firdausi and Alberuni) Mahmud had been a Mæcenas." কেহ কেহ বলেন উজীর মাইমন্দীর পরামর্শেই মাহমুদ ফার্দৌসীর প্রতি অপব্যবহার করেন।

* রামায়ণ ও পুরাণে গঙ্গার পশ্চিম দিকে সীতা, চক্ষু ও সিন্ধু নদের উল্লেখ। Oxus or আমু যে এই চক্ষু নদী তাহা উইলসন সাহেবও স্থির করিয়াছেন। (Wilson's Sans Dict.) আমু নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়, তাহার লোভে রুশগণ প্রথম এদেশ আক্রমণ করিতে আসে। Skrine's "*Heart of Asia*"; *Rusia's March towards India Vol, I.* Elliot's History Vol. I. p. 50 note.

† বেরুণ যে খ্বারিজমের অন্তর্গত কোন গ্রাম, ইহাই বিশ্বাস যোগ্য কথা। আল্‌বেরুণীর জীবনী লেখক শাহরাজুরী তৎপ্রণীত তারিখ-ই হুকামায় বলিয়াছেন যে বেরুণ ভারতীয় সিন্ধুদেশের অন্তর্গত একটি স্থান। M. Reinaud এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু যতদূর জানা গিয়াছে বেরুণ বা বিরুণ নামক কোনস্থান সিন্ধু দেশে নাই। আল্‌বেরুণী ভারত প্রসঙ্গে সিন্ধুদেশ বা বেরুণের কোন বিবরণ দেন নাই। অপর পক্ষে তিনি খ্বারিজমের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। যুক্ত ইলিয়ট সাহেব কিতাবুল আনসাব নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে বেরুণী একটি পারসীক শব্দ, ইহার অর্থই খ্বারিজমবাসী। Elliot's History of India Vol. II. p. 1. Quarterly Review No. 49 40 po.

করেন, তখন হইতেই আরবীয় সাহিত্যোন্নতি আরম্ভ হয়। আরবীয়দিগের আবেগময়ী প্রকৃতিতে একটা কবিতাপ্রবণতা ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত সর্ব্বতোমুখী সাহিত্য-সাধনা ছিল না। আরবীয়েরা সার্দ্ধশতাব্দী কাল ধর্ম্ম প্রচারে ও দেশবিজয়ে কাটাইয়া ছিল, জ্ঞানানুশীলনে মনোযোগী হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে সে বিষয়ে তাহাদের মস্তিষ্কও অনুর্ব্বর ছিল না; ক্রমে গ্রীক, পারসীক ও ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের সাহায্যে তাহাদের জ্ঞানোৎকর্ষ সাধিত হইয়া ছিল। * মনসুরের সময় (৭৫০—৭৭৫ খৃঃ) হইতে গ্রীকদিগের বিজ্ঞান গণিত এবং পারসীকদিগের গল্প কাহিনী আরবীয় ভাষায় অনুদিত হইতে থাকে। শতবৎসরের মধ্যে অসভ্য আরব সুসভ্য হয়; এবং বাগদাদ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া এথেন্স বা রোমকে পরাজিত করে। †

ভারতবর্ষ হইতে দুইপথে ভারতীয় প্রতিভা বাগদাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়াছিল। প্রথমতঃ পঞ্চতন্ত্রাদি গল্প কথা ও চরকাদি চিকিৎসাগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে পারসীকে ও পরে পারসীক হইতে আরবীতে ভাষান্তরিত হয়। দ্বিতীয়তঃ-মনসুরের সময় সিন্ধুপ্রদেশ তাঁহার অধীন ছিল বলিয়া বাগদাদ ও সিন্ধুদেশে পরস্পর লোক জনের যাতায়াত ছিল।

এই সময় "ব্রহ্মসিদ্ধান্ত", "চরক" ও "খণ্ডন খাণ্ডক" (Arkand) নামক প্রাচীন গ্রন্থগুলি বাগদাদে নীত হয় ও তথায় ভারতীয় পণ্ডিতের সাহায্যে আরবীয় ভাষায় অনুদিত হয়। ভুবন বিখ্যাত হারুণ আলুরসিদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সহিত বাগদাদের আরও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বা উজীর ভীক্ষবী যাহিয়া ভারতীয় আর্য্যকুলজাত ছিলেন। * মুসলমান হইলেও দুইতিন পুরুষে তাঁহার বংশীয়দিগের গতিমতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। হারুণের সময়ে (৭৮৬—৮০৮ খৃঃ) যাহিয়া ও তৎপুত্র ফজলের চেষ্টায় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে লোক পাঠান হয় এবং তক্ষশীলা (Taxila) প্রভৃতি স্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ লইয়া বাগদাদের বহু হাসপাতালে প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয়। খলিফা স্বয়ং দুঃসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসক আনাইয়া রোগমুক্ত হন। † এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের চেষ্টায় দর্শন, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করে এবং

---

* The foundation of Arabic literatrure was laid between A. D. 750 and 850. Greece, Persia and India were taxed to help the sterility of the Arab mind." Prof. Sachan's "*Alberuni's India*" Note 1. p. XXVIII, "The monasteries of Syria, Asia Minor and the Levant were ransacked for manuscripts of the Greek philosophers, historians and geometricians." Sir W. Muir's *Early Caliphate* p. 453. See also Gibbon's Roman Empire Vol. VI p 143—151.

† A Single century transformed the wild camel drivers of the desert into the students of the college and elevated Bagdad above Constantinople, Athens and Rome. Gibbon VI, 147 note.

* বাল্‌খ (Balkh) বা প্রাচীন বাহ্লিকদেশে নৌবিহার বা নববিহার নামে এক বৌদ্ধ মঠ ছিল; একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত উহার পরমক বা অধ্যক্ষ (Abbot) ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। খলিফা আব্বাসের সহিত তিনি ও বোগদাদে আসিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরমক হইতে তদ্বংশীয়দিগের বর্ম্মক বলিত। "the Barmak family had been converted, but their Contemporaries never thought much of their profession of Islam nor regarded it as genuine পরমকের পুত্র খলিদ আব্বাসের উজির হন; মনসুরের সময়েও তিনি সেই উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। তখন তাহার মত সুশাসক কেহ ছিল না। (Ency. Brit. 11th. vol. p. 43) খলিদ, হারুণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। খলিদের পুত্র যহিয়া হারুণের প্রধান উজির হইয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। Skrine's Heart of Asia. p. 95. Sachan's Alberuni vol. I. p. XXXI. বর্ম্মকদিগের ধ্বংস সাধন হারুণের চরিত্রের কলঙ্ক।

† Tobari র বিবরণ (*mem sur Inde*) হইতে জানা গিয়াছে হারুণ বিখ্যাত চিকিৎসক কঙ্ককে (সম্ভবতঃ কঙ্কায়ন) আনিবার জন্য আরব সাগরের পথে দূত প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং তিনি তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া বাগদেব পথে হিন্দুকুশ পার হইয়া স্বদেশে আসেন। Elliot's History of India vol. 1. pp. 446 7. Price, Mahomedan History vol. II p, 88. তাবরিকে জীবন the Livy of Arabia বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

বহন কর, ব্যাস প্রভৃতি ভারতীয় নাম আরবসাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়। হারুণের দ্বিতীয় পুত্র মামুনের রাজত্ব কালে (৮১৪—৮৩৩) দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বহু পুস্তক গ্রীক হইতে আরবীতে ভাষান্তরিত হয়। তখন জ্যোতির্বাদির প্রকৃষ্ট চর্চার জন্য বাগদাদে বিরাট গ্রন্থাগার ও মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মামুনের পর খলিফাগণ কেহই তেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না এবং কেহই জ্ঞানবিনিময়ের জন্য ভারতের সহিত বাণিজ্য করেন নাই। নবম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে শতাধিক বর্ষকাল খলিফা রাজ্যের সমস্ত পূর্ব্বাংশ সামানী বংশীয় শাসকদিগের হস্তে আসে এবং তাঁহারা বোখারায় রাজ সিংহাসন পাতিয়া ভারতসীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসেন। এই সময়ে বোখারা একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হয় ও তথায় একটি বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। * সিন্ধু, পঞ্জাব ও কাবুল প্রভৃতি স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিগণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সে ভাবে বোখারা, হীরাট, খোরাসনে ও খারিজমে ভারতীয় জ্ঞান বিস্তারের অল্পবিস্তর সুবিধা হইয়াছে। এই সামানীবংশীয় পঞ্চম নৃপতির এক ভৃত্য আলপ্তগীন, আল্-বেরুণীর জন্মের কয়েকবৎসর পূর্ব্বে গজনীর শাসনকর্ত্তা হইয়া এক প্রকার স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার উত্তরাধিকারী সুবক্তিগীনের সময় (৯৭৫—৯৯৭) ভারতের সহিত জ্ঞানবিনিময়ের পরিবর্ত্তে যুদ্ধসংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই সুবক্তিগীনের পুত্র প্রবল প্রতাপ মাহমুদের রাজত্বকালে আল্-বেরুণী প্রাদুর্ভূত হন।

খিবা সহরেই আল্-বেরুণীর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে যখন তথায় রাজনৈতিক আন্দোলনে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন তিনি শিক্ষার জন্য হীরাট সহরে আসিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাহার সুশিক্ষা সম্পন্ন হয়। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, সে সময়ে যে উচ্চ-শিক্ষা লাভ তদ্দেশীয় লোকের পক্ষে সম্ভবপর হইত, আবু রাইহান তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক কারণে হউক বা প্রাকৃতিক অবস্থান কৌশলেই হউক, হীরাট তখন একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। শিক্ষাবিস্তারের হিসাবে বিচার করিলে, বগদাদ ও বোখারার মত হীরাটকেও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত। বোগদাদ ও বোখারা রাজধানী বলিয়া তাহাদের প্রাধান্য বুঝিতে পারি; "কিন্তু হীরাটের জ্ঞান-সমৃদ্ধির প্রধান কারণ তাহার স্বাভাবিক সুন্দর অবস্থান। এখন দেখা যায়, রুশিয়া, পারস্য ও বৃটিশরাজ্য প্রভৃতি সকল দিক হইতে রাজপথ সমূহ হীরাটে আসিয়া মিশিয়াছে। এই সকল জাতিদিগের মধ্যে যদি কখনও কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন রণকৌশলানুসারে হীরাটের প্রতি সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবে। খলিফাগণ যখন নির্জ্জীব ভাবে শান্তিনিকেতন * বাগদাদের সুখ শয্যায় সমাসীন ছিলেন, এবং সামানী বংশীয়েরা বোখারায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া খলিফার প্রকৃত প্রতিপত্তি করায়ত্ত করিয়া লইয়া ছিলেন, হীরাট তখন কোন রাজপাট না হইলেও বিদ্যাগৌরবে রাজপদবী লাভ করিয়াছিল। বোগদাদে বহুবর্ষ ধরিয়া গ্রীক্ ও ভারতীয় ভাষা হইতে দর্শন বিজ্ঞান গণিত ও জ্যোতিষের যে সকল পুস্তক আরবীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, হীরাটে তাহা প্রসারিত হইয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিধি বহুবর্দ্ধিত

* ইবন্‌সীনা এই লাইব্রেরীতে স্বীয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি সেখানে থাকিতে থাকিতে লাইব্রেরী অগ্নিসাৎ হয়। The enemies of Avicenna accused him of burning it in order forever to conceal the sources of his knowledge (*Encycl Brit*), বোখারা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, "among her children are to be reckoned some of the greatest theologians, Jurisconsults, historians and poets, of the day" (*Heart of Asia*) H 111-2. বোখারা অঞ্চলে সাধারণ লোকেও কিরূপে পুস্তক সংগ্রহ করিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে জানা যায়:—"A private doctor refused the invitation of the Sultan of Bokhara, because the carriage of his books would have required four hundred camels" Gibbon's Roman Empire Vol. VI P. 145.

* বাগদাদের অন্য নাম Dar-al-Salam, 'the city of peace' Bagdad means Bag or garden of Dad, a christian saint.

করিয়া ছিয়াছিল। কে কে আবু রাইহানের শিক্ষক ছিলেন, তাহা জানা যায় না বটে, কিন্তু তিনি যে অল্প বয়সে গণিত বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ছিলেন, নানা সূত্রে তাহার প্রসঙ্গ ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কথিত আছে এই সময়ে একজাতীয় ভ্রমণশীল বৈদেশিকগণ নানাস্থানে রোগ চিকিৎসা ও ছাত্রবর্গের অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপ একজন শিক্ষকের নিকট ইবনসীনা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন †; সিন্ধু প্রদেশীয় হিন্দুচিকিৎসা ব্যবসায়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইবনসীনার যে ভৈষজ্য বিজ্ঞান (Canon of Medicine) সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র ইয়োরোপ খণ্ডে সমাদৃত হইয়াছে, তাহাও হিন্দু প্রণালীতে লিখিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। হীরাটেও এমন কোন ভারতীয় শিক্ষকের নিকট আবু রাইহানের শিক্ষালাভ করা বিচিত্র নহে।

আলবেরুণী বিদ্যার্জ্জনে একান্ত নিরত থাকিলেও তিনি খারিজমের রাজনৈতিক আন্দোলনে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিছুদিন সংঘর্ষের পর যখন আবুল আব্বাচ মামুন নামক একব্যক্তি স্বাধীনভাবে খারিজমের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৯৯৫ খৃঃ), তখন আমরা দেখিতে পাই, যুবক আলবেরুণী তাহার অমাত্যরূপে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছুদিন পরে তিনি তাহার প্রথম গ্রন্থ "আসার-উল্-বকায়া" বা অতীত নিদর্শন নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রাচীন জাতি সমূহের কালনির্ণয়ই এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তিনি প্রাচীন দেশ সমূহে প্রচলিত অব্দ অনুসারে তত্রত্য রাজাদিগের রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন; এবং এই সকল সূক্ষ্ম তুলনায় একত্র সমাবেশ করিয়া বিশ্বেতিহাসের পন্থা দেখাইয়াছেন। ‡

সামানীবংশীয় নৃপতি মনসুরের অধীন আমীর সুবক্তিগীন গজনীর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমুদ খোরাসানের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। সুবক্তগীনের মৃত্যু হইলে (৯৯৭ খৃ) তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইল গজনীর সিংহাসন দখল করিয়া বসেন। মাহমুদ ভ্রাতার সহিত প্রথম সন্ধি করিতে চেষ্টা করেন; তাহা ব্যর্থ হইলে যুদ্ধার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হন ও ভ্রাতাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া গজনীর অধীশ্বর হন। এদিকে মনসুরের পর তৎপুত্র নূহ বোখারার অধিপতি ছিলেন, তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইলে (৯৯৫ খৃঃ), যখন সামানী সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তখনই খারিজমে মামুন স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন। নূহের পুত্র দ্বিতীয় মনসুর অল্পকাল রাজত্বের পর আবদুল মালিক কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন; তখনই মাহমুদ খোরাসান দখল করিয়া লন। এই সময় বাগদাদের খলিফা আল-কাদির (৯৯১—১০৩১) তাহাকে খেলাত ও উপাধি পাঠাইয়া দেন।* এইরূপে বাগদাদ ও বোখারার রাজতন্ত্রের জীর্ণদশা উপস্থিত হইলে, মাহমুদ বীরপ্রতাপে স্বকীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পাশ্চাত্যভাগের খণ্ড রাজ্য সমূহের উপর তাহার লোভ দৃষ্টি থাকিলেও, সেদিকের অবস্থা এত বিশৃঙ্খল যে বিনা প্রয়াসে তাহার অধিকাংশ মাহমুদের হস্তগত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের সহিত তাহার পিতার সংঘর্ষের ফলে এবং গজনীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য রাজ্য অপেক্ষা অর্থই অধিক প্রয়োজনীয় মনে করিয়া তিনি স্বর্ণভূমি ভারতের প্রতিই ধাবিত হন। খলিফার নিকট খেলাত পাইবার সময় তিনি

† "Higher branches were begun under one of those wandering Scholars who gained a livelihood by cures for the sick and lessons for the young. "Encyclo. Brit. Vol. 3p. 62.

‡ এই পুস্তক "Chronology of Ancient Nations" (Translated by Edward Sachau, London, 1879) নামে ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আল্-বেরুণীর গ্রন্থ জর্জ্জানের রাজা শামস্-আল-মালি নামে উৎসর্গীকৃত হয়। পুস্তকখানি ১০০০ খৃষ্টাব্দে লিখিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, আবু রাইহান হীরাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া খারিজমের রাজ সরকারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হয়তঃ কিছুদিন জর্জ্জান (Hyrcania or Jurgan) দেশীয় নৃপতির বৃত্তি ভোগী ছিলেন, এবং সেই সময়ে এ[illegible] [illegible]। See Encylo. Brit. Al Biruni" Vol. 3 p. 991.

* তাহার উপাধি হয় ইয়ামিন্ উদ্দৌলা। ঐতিহাসিক উৎবীর "তারিখ-ইয়ামিনি" গ্রন্থে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

† Elliots' History of India Vol. 11 p. 24.

শপথ করিয়াছিলেন যে প্রতি বৎসর পৌত্তলিক ভারতের বিরুদ্ধে এক একটি অভিযান প্রেরণ করিবেন; † একথা তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। চতুর্ব্বর্গের মধ্যে ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্থ তাঁহার অধিকতর কাম্য ছিল এবং এমন অফুরন্ত অর্থ অন্যত্র সুলভ ছিল না।

ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ভাগ্যক্রমে খ্বারিজম মাহমুদের কোপ হইতে কিছুকাল রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি খ্বারিজমকে অধীনতা স্বীকার করিতে আদেশ করেন। তদ্বিষয়ক সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ জন্য খ্বারিজমাধিপতি মামুন মাহমুদের নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই দৌত্য কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে আল্ বেরুনী ও বাগদাদের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দার্শনিক ও চিকিৎসক আবুল-খয়েরের নাম উল্লেখ যোগ্য। এই সময়ে ইবন্-সীনা সামানীদিগের পতনের পর (১০০৪) মাহমুদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া খ্বারিজমে স্বল্প বেতনে উজীরের অধীন সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উজীর তাঁহাকেও দৌত্যকার্য্যে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু আবু রাইহানের সহিত বৈজ্ঞানিক বহু বিষয়ে তাঁহার মতদ্বৈধ ছিল এবং তর্ক করিতে ভয় পাইতেন বলিয়া তিনি দৌত্য কার্য্যে সহযোগী হন নাই। * গজনীতে মাহ্মুদের সাক্ষাৎ না পাইয়া দূতগণের ভারতবর্ষে আসিতে হইল। তখন কার্য্যোপলক্ষে আল-বেরুনীকে কিছুকাল সিন্ধুদেশে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা বিশেষ ভাবে শিক্ষা করেন এবং কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া লন। সম্ভবতঃ খ্বারিজমে থাকিতে তিনি তাঁহার সেই জন্মভূমির একখানি ইতিহাস রচনা করেন।

আবুরাইহানের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এই সময়ে মাহ্মুদের প্রত্যক্ষীভূত হয়। তিনি বুঝিতে পারেন, দৌত্য কার্য্যে যে সকল রাজনৈতিক কৌশলের অবতারণা করিয়া খ্বারিজমের স্বার্থ রক্ষা করা হয়, তাহা তাঁহারই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফল। এজন্য তিনি আল্-বেরুনীকে গজনীতে আসিয়া রাজসরকারে চাকরী লইতে বলেন। নানা কূট কৌশলে সে আদেশও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। † আল্-বেরুনী সাহিত্যিক; মাহ্মুদ ও বহু সাহিত্যিককে প্রতিপালন করিতেছিলেন। কথিত আছে, গজনীর রাজসভা ও প্রমোদ কানন চারিশত কবিকোকিলের কলকণ্ঠ মুখরিত থাকিত; সে সভায় মাঁসুরি কবিকুল-চূড়ামণি বলিয়া খ্যাতি পাইলে ও আল্-বেরুনীর মত একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের প্রতিভা বিকাশের স্থান ছিল। কিন্তু তিনি স্বচক্ষে ফার্দৌসীর অবমাননা দেখিয়াছেন; ইবন্-সীনা কেন রাজাদেশ উপেক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া জীবন যাপন করিতে ছিলেন, তাহাও তিনি চক্ষুর উপর দেখিয়াছিলেন; তিনি আরও জানিতেন যে উজীর মাইমন্দী মহাকবির পতনের কারণ, তিনি বেরুনীর প্রতিও সদয় ছিলেন না। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, নিজের স্বদেশের কার্য্য শতগুণে শ্রেয়স্কর মনে করিয়া, তিনি মাহ্মুদের বৃত্তিভুক্ হইতে সম্মত হন নাই। তাঁহার সহযোগী আবুল-খয়ের গজনীতে চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। আল্-বেরুনীও সেখানে একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি পরস্বলুণ্ঠনকারী দুর্দান্ত মাহ্মুদের বৃত্তিকামী না হইয়া যে আত্মসম্মানের পরিচয় দিয়া ছিলেন, তাহা বাস্তবিকই একান্ত প্রশংসার বিষয়।

* Elliots' History of India Vol II. P 3 আল্-বেরুনীর সহিত ইবন্-সীনার যথেষ্ট পত্রবিনিময় হইয়াছিল। ঐ সময় ইবন্-সীনা যে সব উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। Ency. Britt. Vol. 3 P. 991

† Ibid. Elliot কোথায় ও বলেন নাই যে আল্-বেরুনী মাহমুদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তবে তাঁহার ইতিহাসের প্রকাশক Prof. Dowson এইরূপে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আর কেহ তাহা বিশ্বাস করেন না। Dr. Sachan বলেন "There is nothing to tell us that Alberuni was ever in the service of the state or court in Ghazni" Alberuni's India Vol I p. IX আল-বেরুনী তাহার বিবরণীতে কোথাও মাহমুদকে আমীর ব্যতীত সুলতান বলিয়া অভিহিত করেন নাই, এমন কি মাহমুদের প্রশংসা সূচক একটি বর্ণও তাহার পুস্তকে নাই। তিনি বৃত্তিভোগী হইলে এরূপ হইত না।

খারিজমের সহিত যে সন্ধি হইল, তাহার সর্ত্তগুলি যে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা নহে। কিন্তু মাহ্মুদ ধর্ম্মমদে এবং ভারতলুণ্ঠনে এমন ভাবে ব্যতিব্যস্ত ও আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে দূরবর্ত্তী খারিজমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিয়া খারিজমের সহিত বন্ধুত্ব ও সন্ধিসূত্র অপ্রতিহত রাখিয়াছিলেন। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে খারিজমের অধীশ্বর মামুন পত্রদ্বারা মাহ্মুদকে জানান যে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মাহ্মুদের ভগিনীকে বিবাহ করিতে অভিলাষী। * মাহমুদ সে প্রস্তাব সরলভাবে গ্রহণ করিয়া সম্মতি প্রদান করেন এবং সত্য সত্যই আপন ভগিনীকে খারিজমে পাঠাইয়া দেন। অচিরে মামুনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বৎসরই এক ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং বিদ্রোহিগণ মামুনের হত্যাসাধন করে।

সে সংবাদ মাহ্মুদের নিকট পৌঁছিবা মাত্র, তিনি অসংখ্য সৈন্য সহ খারিজম্ আক্রমণ করেন এবং সে দেশ অধিকার করিয়া লন (১০১৭ খৃঃ) † তখন আবার সে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়। মাহ্মুদ স্বীয় রাজ-সভার সর্ব্বপ্রধান আমীর ও বিখ্যাত সেনাপতি আলতুনতাসকে খারিজমের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ‡ প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি রাজ্যের কতকগুলি প্রধান ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন; তন্মধ্যে আল্-বেরুণী একজন। § বিদ্রোহের মূলে আল-বেরুণীর প্ররোচনা থাকিতে পারে বলিয়া মাহ্মুদ সন্দেহ করিয়াছিলেন; শেষতঃ তাহার অধীন হইয়া বৃত্তি গ্রহণ করিতে বেরুণী অসম্মত ছিলেন বলিয়া চিরদিনই তাহার উপর মাহ্মুদের বিরক্তি ছিল। গজনীতে গেলে উজীর মাইমন্দীর পরামর্শে তিনি পণ্ডিতের প্রতি কোন সদয় ব্যবহার দেখান নাই। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ বর্ষকাল আল্ বেরুণী এই ভাবে বন্দীর মত মাহ্মুদের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ান।

সুলতান মাহ্মুদ এই সময়ে ভারতের নানাদেশ আক্রমণ করিয়া, বিধ্বস্ত করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া দেশময় আর্ত্তনাদ তুলিয়া ছিলেন। * হিন্দুর নিকট মন্দির ও বিগ্রহের মত প্রিয় কিছু নাই; সেই মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ ও বিগ্রহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া মাহ্মুদ ইসলাম ধর্ম্মের জয়স্তম্ভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন; কবি বলিয়াছেন:—

> "নিগ্রহিয়া বিগ্রহেরে নিধি নিল হ'রে
> হইল অলকা ভ্রান্তি গজনী নগরে।"

আল্-বেরুণী তখন সম্মানিত বন্দীরূপে শিবিরে শিবিরে নানাস্থানে বাস করিতেছিলেন। গজনী, মুলতান, পেশওয়ার প্রভৃতি নানাস্থানে তাহার অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই বিপ্লব কালে তিনি একমাত্র নির্লিপ্ত; মুসলমান মূর্ত্তিগ্রহ, লুণ্ঠন ও ধনবণ্টন লইয়া ব্যস্ত; হিন্দু ধর্ম্মরক্ষা, প্রাণাহুতি ও অবশেষে সাশ্রুনেত্রে আত্মরক্ষা লইয়া ব্যতিব্যস্ত; দেশময় তুমুল সংঘর্ষ ও আর্ত্তনাদ। তন্মধ্যে ধীরস্থির কেবল আল্-বেরুণী ও তাঁহার সহযোগী বন্দিগণ। মাহ্মুদের দুর্বৃত্ত অত্যাচারের সহিত তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই; বরং যে হিন্দুদিগের জ্ঞানগরিমায় তিনি বিমোহিত, তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি একান্ত ব্যাকুলিত। নিজে বন্দী, স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত বলিয়া লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল। এজন্য তিনি তাহার ভারতীয় বিবরণীতে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঐকান্তিক মর্ম্মবেদনার সূত্রে গ্রথিত। মাহ্মুদ যখন ধন লোভে পার্ব্বত্য কন্দর হইতে মরুপ্রান্তর, কাশীড়া

* Brigg's *Ferishta* Vol. 1 p. 55; কেহ বলেন মাহমুদের কন্যার সহিত এই বিবাহ হয়। *Elphinstone* p. 323 note.

† Malcolm, *History of Persia*, Vol. 1 p. 328.

‡ Elliot Vol. 11 p. 495.

§ Alberuni's India Vol. 1 p. IX.

* আল্-বেরুণী স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন:—Mahmud utterly ruined the prosperity of the country and performed those wonderful exploits, by which the Hindus became like atoms of dust scattered in all directions and like a tale of old in the mouth of the people." Alberuni, India, Vol. 1 p. 22.

(নগরকোট) হইতে সোমনাথ, নানাস্থানে দুঃসাহসিক অভিযানে একান্ত বিব্রত, আল্‌বেরুণী তখন সিন্ধু দেশে থাকিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ পরিচয়ে ও শিক্ষালাভে, প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহে এবং অধ্যয়ন ও অনুবাদাদি নানাবিধ জ্ঞান চর্চ্চায়নিমগ্ন ছিলেন। সে কার্য্যে ও তাঁহার নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া ছিল; হিন্দুরা মুসলমানের ভয়ে ব্যস্ত, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে সহজে চাহিত না; হিন্দুরা মুসলমানকে সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনাদি শিক্ষা দিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হইত না; হিন্দুরা মুসলমানের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ বিক্রয় করা পাপ মনে করিত। তবুও আল্‌-বেরুণী ছাড়িবার পাত্র নহেন; বিনয়, সদ্ব্যবহার ও সমবেদনায় হিন্দুদিগকে মোহিত করিয়া তিনি স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে লাগিলেন। অর্থ অনুগ্রহ ও আত্মরক্ষার লোভে অনেকে বশীভূত হইল। আল্‌-বেরুণী সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের আরবীয় অনুবাদ সম্পাদন করিলেন।* অনুবাদ অনেক করা যায়, কিন্তু বিজাতীয় ভাষায় হিন্দুর দর্শনের সূত্রের অনুবাদ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজে অনুমেয়। শুধু তাহাই নহে, তিনি "ভগবদ্গীতা" ও "বিষ্ণুপুরাণ" বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়া তাহা হইতে বহু অংশ অনুবাদ করিয়া লইয়া ছিলেন। এইভাবে হিন্দু দার্শনিকের উচ্চ মীমাংসা সমূহের যে সারাংশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহা তাহার স্বজাতীয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব।†

কেবল দর্শন শাস্ত্র নহে, আল্‌-বেরুণী ভারত প্রবাস কালে এদেশীয় সমস্ত শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আভাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গণিত জ্যোতিষ ও পুরাতত্ত্বের প্রতি তাহার অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বে কিভাবে সিরীয়া ও সিজিস্তান (শাকস্থান) পর্য্যন্ত হিন্দু সংশ্রব ছিল, এবং ইরাক্ বাবালূখ হইতে বৌদ্ধগণের বিতাড়িত হওয়ার পর কিরূপে পাশ্চাত্য জাতির উপর ভারতীয়েরা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হন, পরে মহম্মদ-বিন-কাসিম, সুবক্তিগীন ও মামুদের অত্যাচারে কিভাবে মুসলমান ও হিন্দুর জ্ঞান বিনিময় সম্পর্ক বন্ধ হইয়া যায়, এবং এই সময়ে কিরূপে হিন্দুর জ্ঞান ভাণ্ডার সুদূর কাশ্মীর ও বারানসী প্রভৃতি স্থানে নীত হওয়াতে উহা আল-বেরুণীর পক্ষে দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছিল,—এ সকল কথা তিনি নিজ গ্রন্থে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।* কিন্তু তবুও নিজ অবস্থায় যাহা সম্ভবপর তিনি তাহাতে ত্রুটি করেন নাই। ভারত সম্বন্ধে স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে তিনি যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বলিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষের পরিশ্রমের পর উহা স্বকীয় "তারিখুল হিন্দ" বা ভারতীয় বিবরণী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। (১০০৩ খৃঃ) তাহার ভারতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইহাই প্রধান ও প্রামাণিক। আমরা যথাস্থানে উহার সারমর্ম্ম প্রকটিত করিব।

তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়া গ্রন্থ শেষ করিবার সময় শুনিলেন, গজনীতে মাহমুদ পরলোকগত হইয়াছেন। অথবা ইহাও হইতে পারে, তিনি মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াই সে গ্রন্থ শেষ করিলেন; জ্যোতির্ব্বিদ্যাদি সম্বন্ধে তাহার আর যাহা বাকী ছিল, তাহা পরবর্ত্তী গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছিলেন। আল্‌-বেরুণী তাহার ভারত বিবরণী কাহারও নামে উৎসর্গ করেন নাই। করিতে হইলে সুলতান মাহমুদের নামে করিতে হয়, তাহাতে তিনি সম্মত ছিলেন না। স্বকীয় জ্ঞান চর্চ্চার সুযোগ পাইয়া তিনি যতই সম্মানের সহিত ভারতে বাস করুন না কেন, তিনি বন্দী, তাহাতে সন্দেহ নাই; মাহমুদ যে তাহাকে স্বাধীনতা দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন নাই, তজ্জন্য তিনি সুলতানের প্রতি কিছুমাত্র ভক্তিমান

---

* Abul-Fazal Baihaki who lived about half a century after Alberuni says (in his *Tarikh-s Sabuktigin*):—The best and most excellent of all the books of the Hindus upon the arts and sciences is one resembling the work of Shairkha Rais Abu ali ibu sina It is called Batakal, or in Arabic Batajal; the book he translated in Arabic." Elliot. Vol. 11 p. 2.

† "It seems to have been something entirely new when Alberuni produced before his compatriots or fellow believers the *Sankhya* by Kapila and the *book of Patanjali* in good Arabic translation" Dr. Sachan in his preface to *Alberuni.*

* Twarikhal Hind, chap. 1 *Alberuni's India* Vol. 1 pp. 17-26.

ছিলেন না। এমন কি, মাহ্মুদকে তিনি সাধারণ ভাবে আমীর বলিয়া ভিন্ন সুলতান বলিয়াও কোথায়ও পরিচয় দেন নাই। সুতরাং "তারিখু-ল-হিন্দু" কোন ও নামে উৎসর্গ পত্রে সমলঙ্কৃত না হইয়াই সমাপ্ত হইল।

মাহ্মুদের দুই পুত্র ছিল, মহম্মদ ও মসাউদ্। বিনীত পিতৃভক্ত মহম্মদ মাহ্মুদের প্রিয়পাত্র বলিয়া নিকটে ছিলেন; দুর্বিনীত ও বলদৃপ্ত মসাউদ ইস্পাহানের শাসন কর্ত্তা স্বরূপ দূরবর্ত্তী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মহম্মদ গজনীর সিংহাসন অধিকার করেন বটে, কিন্তু অচিরে মসাউদ যুদ্ধার্থ নগর দ্বারে উপস্থিত হন। প্রজাবর্গ ও সৈন্য সামন্ত কর্ম্মদক্ষ মসাউদের অধিকতর অনুরক্ত ছিল; তাহাদের সাহায্যে তিনি ভ্রাতাকে অন্ধ ও কারাবদ্ধ করিয়া রাজতক্তে সমাসীন হন। এ সব ব্যাপারে কিছু সময় লাগিয়াছিল। ততদিন আল্-বেরুণী ভারতবর্ষে পূর্ব্বাবস্থায়ই ছিলেন। তিনি দূরে বসিয়া নিরপেক্ষ ভাবে রাজধানীর কার্য্যলীলা লক্ষ্য করিতে ছিলেন, হঠাৎ উল্লসিত হইয়া "তারিখু-ল হিন্দে" নবোদিত ভানুবৎ মহম্মদের স্তাবকতায় কলঙ্কিত করেন নাই। উক্ত গ্রন্থ যেরূপ নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের কোন বিপক্ষ নৃপতির সম্পর্ক সাপেক্ষ না হইয়াই চিরদিন রহিয়া গেল।

মসাউদ্ স্বাধীন চেতা বলিয়া পিতার অনেক কার্য্যের অনুমোদন করিতেন না; সেই জন্যই তাহার প্রতি পিতা বিরক্ত ছিলেন। তিনি এখন রাজতক্তে বসিয়া সর্ব্ব জাতীয় প্রজার প্রীতি বর্দ্ধনের চেষ্টা করিলেন। এই জন্যই হউক বা আল্-বেরুণীর সহিত পূর্ব্ব পরিচয় সূত্রেই হউক, তিনি রাজা হইয়াই আল্-বেরুণী ও তাঁহার সহযোগী দিগকে মুক্ত করিয়া সসম্মানে গজনীতে আনিবার আদেশ দেন। অচিরে তিনি গজনীতে আসিয়া রাজানুগ্রহে জ্ঞান চর্চ্চা করিতে থাকেন; এই সময়ই তাহার বিখ্যাত জ্যোতিষ গ্রন্থের রচনা আরম্ভ হয় (১০৩১ খ্রীঃ)।

এখনও উজীর মাইমন্দী জীবিত। মসাউদের সময়েও তিনি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আল্-বেরুণীর প্রতি সদয় ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উজীরের অনুগ্রহ ব্যতীত রাজসরকারে উচ্চপদ পাওয়া কঠিন। সুতরাং বেরুণীর বন্দিত্ব ঘুচিল বটে, কিন্তু কোন বিশিষ্ট সমাদর হইল না। এমন সময়ে মাইমন্দী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। (১০৩৩ খৃঃ) তখন আবু-নসর আহম্মদ নামক এক ব্যক্তি তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। এই আবু-নসর ১০১৭ হইতে ১০৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত খারিজমের উজীর ছিলেন। সুতরাং তিনি আল-বেরুণীকে বিশেষ ভাবে জানিতেন এবং তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। আবু-নসর গজনীর প্রধান কর্ম্মচারী হওয়া মাত্র আল্-বেরুণীর সুদিন আসিল। রাজ সরকারে তাঁহার অগাধ প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল এবং সেই বৎসরই (১০৩৩) তাঁহার নিরুদ্বেগে জ্ঞান চর্চ্চার জন্য প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। তখন বেরুণীর আনন্দ আর ধরে না। *

এই বার আল্-বেরুণী একজন গুণগ্রাহী রাজা পাইলেন, যিনি তাঁহার সেবা চান না, অথচ সাহিত্য সেবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত। তখন তিনি প্রাণ খুলিয়া চির জীবনের সাধনার ধন জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক গ্রন্থ লিখিলেন, এবং রাজার নামানুসারে ঐ পুস্তকের নাম রাখিলেন,—"আল্-কানুন্ আল্-মসাউদী" অর্থাৎ মসাউদী-বিধি। এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় তিনি যে ভাবে সুলতান্ মসাউদের উচ্চ স্তুতিবাদে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন, তাহাতে একথা না বলিয়া পারা যায় না যে তিনি সেস্থলে তাঁহার লেখনীর চিরাগত সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। † বিশেষতঃ মাহমুদের তুলনায় মসাউদ কিছুই নহেন; মাহ্মুদ ত্রিশবৎসর ধরিয়া অসি বলে ও নীতি কৌশলে যে বিপুল রাজ্যৈশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সুরাসক্ত মসাউদ স্বীয় অকর্ম্মণ্যতার

*"Alberuni is all glee and exultation about the royal favours and support accorded to him and to his studies." Dr. Sachan's preface Vol. I p. XVI.

†"The preface of his *canon Masudicus* is a farrago of high sounding words in honour of king Masud, how was a drunkard and lost in less than a decennium most of what his father's sword and policy had gonid in thirty-three years. "Dr. Sachan.

ফলে দশবৎসরে তাহাই হারাইয়া বসিয়াছিলেন। মাহ্মুদের বিদ্রুপচ্ছলে প্রশংসাবাদেও যিনি কৃপণতা দেখাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মসাউদের অত্যধিক গুণগান নিন্দনীয় না হইয়া পারে না।

"আল্-কানুন" রচনা কালে আবু-রাইহানের বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তৎপরে তিনি আরও ১৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। জীবনের এই অপরাহ্ণ কাল তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে গণিত বিজ্ঞানের চর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখন কোন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। আজীবন পরিশ্রমের ফলে তিনি মস্লেম জগতের জ্ঞান গণ্ডী যথেষ্ট প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তিনি যে কীর্ত্তি করিয়া মর্ত্তলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জগতের যে কোন মহাপণ্ডিতের পক্ষেও একান্ত শ্লাঘনীয় হইত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।

উপক্রমণিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধকাল নানাকারণেই বঙ্গদেশের 'সুবর্ণ যুগ' বলিয়া কথিত হইতে পারে। যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষের যুগপৎ আবির্ভাবে এই সময় বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছিল, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল গৌরবময় পরিচ্ছেদ হইয়া রহিয়াছে। যে কয়জন মহাপুরুষের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে তাঁহারা আজ সর্ব্বসাধারণের প্রাতঃস্মরণীয়, কিন্তু যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া জীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্যক পরিচয় লাভের সৌভাগ্য সকলের আজও ঘটিয়া উঠে নাই।

বংশ-বিবরণ।

বঙ্গদেশের যে কয়েকটি মহাবংশ শিক্ষা, দীক্ষা ও সমৃদ্ধিতে দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সর্ব্বাধিকারী বংশ তাহাদের অন্যতম। এই বংশের অতীত ইতিহাস অতুল গৌরবের পরিচায়ক। ইহার প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ্বর বসু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসন-কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁহাকে "সর্ব্বাধিকারী" খেতাব ও সুবিস্তীর্ণ জায়গীর প্রদান করেন। তদবধি সুরেশ্বরের বংশ সর্ব্বাধিকারী বংশ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সুরেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানেশ্বর সম্রাটের উজীর ছিলেন।* কালক্রমে সুরেশ্বরের বংশধরগণ সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়েন। বর্ত্তমানে এই বংশের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা এরূপ ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের সকলের সন্ধান পাওয়াও সুকঠিন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হইলে পর সর্ব্বাধিকারী বংশের একটি শাখা মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। এই শাখার অনেকে বহু উচ্চ পদ এবং রাজোপাধি লাভ করিয়াছিলেন। †

মুন্সী রামনারায়ণ পারস্য ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত রাধানগরে ও খিদিরপুরে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। খিদিরপুর হইতে মুন্সিবাগান পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা আছে, উহা রামনারায়ণের কীর্ত্তিচিহ্ন। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে রামনারায়ণ উহা নির্ম্মাণ

* Major Walsh's History of Murshidabad.

† Raja Mahendra Narain was a Revenue Minister of Nawab Aliverdi khan, and as such had great influence at the court of Murshidabad. He had substantial dealings with the East India Company's silk *concern* at Kasimbazar. He helped the East India Company during their troublous days, and renderd signal service to Lord Clive in the negotiations that preceded the battle of Plassey. His descendant Bhubanmohan was a great Persian scholar and minister of the Emperor Shah Alum⋯ ⋯Raja Hariprasad, *alias* Raja Kishon, was Diwan of the East India Company's entire silk *concern* in Bengal.

—History of Murshidabad.

করাইয়া দেন। পরোপকার ইঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ইঁহার পুত্র মদনমোহন বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম সবজজ।

সীতানাথ সর্ব্বাধিকারী এই মহাবংশের আর একজন কীর্ত্তিমান মহাপুরুষ। ইনিও রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা সীতানাথ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম হুমায়ুনের * দেওয়ান ছিলেন; তৎপূর্ব্বে বঙ্গের তৎকালীন সুবাদারের দেওয়ানীরূপ অতুলনীয় সম্মানেরও তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন।

মুন্সী রামনারায়ণের পুত্র মথুরামোহনের চারি পুত্রের মধ্যে যদুনাথ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। যদুনাথ তাঁহার পল্লীজননীর স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় তাঁহার সরল অনাড়ম্বর জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইয়াছিলেন। জন্মভূমি রাধানগরের বাহিরে তিনি অতি কদাচিৎ পদার্পণ করিতেন। প্রকৃতির স্বভাবসুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে কাব্যে, সঙ্গীতে ও ভগবৎপ্রেমে তন্ময় রহিয়া বাহিরের জগতকে তিনি ভুলিয়াছিলেন। সংসারের আবর্জ্জনা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবন ছিল তপস্বীর মত শুদ্ধ, শান্ত ও নির্ম্মল। সুন্দর কুসুমস্তবকের মত তাহা একান্তে অতুল শোভাসম্পদে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যদুনাথের ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তীর্থদর্শনাকাঙ্ক্ষায় পল্লীজননীর স্নেহক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া তিনি পদব্রজে কেদার বদরী গমন করিয়াছিলেন। পথের দুর্গমতা, সহস্র-প্রকার বিপদ-সম্ভাবনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অশান্তির সূচনা দেখা গিয়াছিল। যদুনাথের ভ্রমণকালেই সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। পথিমধ্যে কিছুকালের নিমিত্ত সিপাহীরা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। কতবার তাঁহার জীবন-সংশয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু অন্তরের যে প্রেরণায় তিনি বদরীনারায়ণের গিরিমন্দিরের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন প্রাণের ভয় তাহার নিকট তুচ্ছ। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রমণকাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উপন্যাস অপেক্ষাও তাহা অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক।*

পিতৃ-পরিচয়

যদুনাথের প্রথমা পত্নীর গর্ভে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন,—জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার, দ্বিতীয় সূর্য্যকুমার, তৃতীয় আনন্দকুমার ও চতুর্থ রাজকুমার। এই চারি ভ্রাতার নাম বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। যদুনাথের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভেও চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন,—জ্যেষ্ঠ অমৃতকুমার, দ্বিতীয় অনন্তকুমার, তৃতীয় অক্ষয়কুমার ও চতুর্থ উপেন্দ্রকুমার। বসু-বংশোদ্ভব এই আট ভ্রাতাকে লোকে 'অষ্টবসু' বলিত।†

জন্ম ও শৈশবকাল।

যদুনাথের দ্বিতীয় পুত্র সূর্য্যকুমার ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাধানগরই রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি এবং এখানেই সর্ব্বাধিকারী বংশের এই সুবিখ্যাত শাখার আদি নিবাস ছিল। বর্ত্তমানে ইঁহারা কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন।

সূর্য্যকুমারের বয়স যখন ২।০ মাস মাত্র তখন তাঁহার মাতা "সর্ব্বজয়া" ব্রত উদযাপনের পর, যেখানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেইখানে ভুলক্রমে শিশুকে শোয়াইয়া রাখেন। তাহাতে সূর্য্যকুমারের পৃষ্ঠদেশ এরূপভাবে দগ্ধ হইয়াছিল যে, চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন শিশুর মৃত্যু অনিবার্য্য। ইহাতে সূর্য্যকুমারের অরুন্ধতী-তুল্যা মাতা বলেন যে, চিকিৎসকেরা কিছু করিতে না পারিলেও ভগবান তাঁহার পুত্রকে রক্ষা করিবেন, নচেৎ "সর্ব্বজয়া" ব্রত মিথ্যা। মাতৃহৃদয়ের আবেগোৎসারিত এই বিশ্বাস-বাণী সফল হইয়াছিল। সূর্য্যকুমার রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পৃষ্ঠের

* ১৮২৪—১৮৩৮ খ্রীঃ।

* "তীর্থভ্রমণ"—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

† সর্ব্বাধিকারী বংশের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাসের জন্য মল্লিখিত 'সর্ব্বাধিকারী-বংশের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন—লেখক।

ক্ষতচিহ্ন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছিল। শৈশবে তিনি একবার জলমগ্ন হইয়াছিলেন তাহাতেও তিনি রক্ষা পান। যে শিশু ভবিষ্যত জীবনে প্রস্ফুট কুসুমের মত যশঃসৌরভে সমগ্র দেশ আমোদিত করিবে ভগবানের অলক্ষিত-মঙ্গল-নির্দ্দেশেই সে শিশু মুকুলে ঝরিয়া পড়ে নাই।

শৈশবে ও কৈশোরে সূর্য্যকুমার অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। পরিণত বয়সে যে অতুলনীয় সাহস ও বীরত্ব দেশের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল, সুদূর শৈশবেই নানারূপে সূর্য্যকুমার তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অতি বলিষ্ঠকায় বালক ছিলেন। তাঁহার সমবয়স্কেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় ও সম্ভ্রম করিত। তাঁহার যে কোনও আজ্ঞা তাঁহার ক্রীড়াসহচরগণ অমান্য করিতে সাহস করিত না। গাছে চড়িতে, সাঁতার দিতে, 'হা-ডু-ডু' খেলিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলনা।

সূর্য্যকুমারের শৈশবে একটি কৌতুককর ও আশ্চর্য্য-জনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার পেটের পীড়া হইত। একবার তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছিল। আহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই অবস্থায় চঞ্চলমতি বালক সকলের অজ্ঞাতসারে খানকটা গুড় খাইয়া ফেলিলেন। ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়িলে কবিরাজ মহাশয় ও গৃহের সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন! কিন্তু এই অনিয়মের পর হইতেই তাঁহার রোগ অতি দ্রুত কমিয়া আসিল এবং অচিরেই তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলেন। ইহাতে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিলনা।

শৈশবেই মানুষের ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি নিহিত হয়। সূর্য্যকুমার জীবনে যে মহত্ব ও চরিত্র-গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন, শৈশবেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্যকুমার পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, অন্যান্য গুরুজন ও স্নেহাস্পদদিগকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। দুষ্ট লোককে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন—তাহাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেন না। কেহ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিলে সূর্য্যকুমার তাহা নীরবে সহ্য করিতে পারিতেন না। কাহারও অন্যায় কথা শুনিলেও তিনি নীরব থাকিতেন না।

শিশুকালে ও কৈশোরেও সূর্য্যকুমার সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন, তবে নিরর্থক অভিমান করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। ক্রোধ, অভিমান বা কোনও অন্যায় করিলে তিনি তাঁহাদের পাইকের বাড়ী চলিয়া যাইতেন, সেখান হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে হইত। প্রতিবেশীর এই অন্যায়-প্রতিরোধী সাহসী বালককে ভয়ও করিত আবার অত্যন্ত ভালবাসিত। জীবনে তিনি যে পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তরুণ বয়সেই তাহার প্রারম্ভ দেখা গিয়াছিল। বাড়ীতে অতিথি আসিলে তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। আহার করিতে ও আহার করাইতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

রাধানগরের গ্রাম্য পাঠশালায় সূর্য্যকুমারের শিক্ষারম্ভ হয়। তাঁহার অসাধারণ মেধা, প্রগাঢ় শ্রমশীলতা ও অপূর্ব্ব একাগ্রতা দেখিয়া গুরুমহাশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া-ছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন এবং পাঠ শেষ হইলেই খেলায় মত্ত হইতেন। খেলার সময় পড়িতে বলিলে তিনি অত্যন্ত রাগিয়া যাইতেন।

শিক্ষারম্ভ।

পাঠশালায় জলখাবারের ছুটির সময়, তিনি বাড়ী হইতে মুড়ী, নারিকেল প্রভৃতি যাহা কিছু লইয়া যাইতেন, তাহা কখনও সঙ্গীদিগকে না দিয়া খাইতেন না। ভ্রাতায় ভ্রাতায় তাঁহাদের মধ্যে কখনও বিবাদ হইত না। সূর্য্যকুমারের ভ্রাতৃস্নেহের তুলনা ছিলনা।*

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য্যকুমার ভ্রাতাদের সহিত কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে নিম্নতন বিভাগে প্রবিষ্ট হন। তাঁহাদের বাসা ছিল খিদিরপুরে। তাঁহারা প্রত্যহ খিদিরপুর হইতে

* সূর্য্যকুমারের বাল্যজীবনীর জন্য আমি প্রধানতঃ তাঁহার পুত্র, সুলেখক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট ঋণী।—লেখক।

হিন্দু কলেজে হাটিয়া আসিতেন। গড়ের মাঠের উপর দিয়া আসিবার সময় তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে পাঠ আবৃত্তি করিতেন। প্রসন্নকুমার ও সূর্য্যকুমার সুবিখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসনের প্রিয়শিষ্য ছিলেন।

কলিকাতায় আগমন ও হিন্দুকলেজে প্রবেশ।

জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার শিশুকাল হইতেই অতিশয় মেধাবী ও অধ্যয়নশীল ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টা ও যত্নের ফলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ অসাধারণ বিদ্যা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার পরীক্ষা দিয়া যে বৃত্তি পাইতেন, তাহাতে তাঁহাদের পড়ার খরচ চলিত, বাড়ী হইতে সাহায্যের তেমন দরকার হইতনা। ইহার উপর যখন সূর্য্যকুমার বৃত্তি পাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর তাঁহাদের কোনই অসুবিধা রহিল না। কিন্তু খিদিরপুর হইতে হাটিয়া আসা তাঁহাদের বন্ধ হয় নাই।

তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা আনন্দকুমার শৈশব হইতেই নিষ্ঠাবান ছিলেন। প্রসন্নকুমার ও সূর্য্যকুমার তাহাতে গৌরব অনুভব করিতেন। প্রসন্নকুমার তাঁহাদের চতুর্থ ভ্রাতা রাজকুমারের নাম রাখিয়াছিলেন 'লেডি রাজকুমার।' সূর্য্যকুমার এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রসন্নকুমার বলেন,—"দশবছর ওর বয়স হল, এখনও বর্ণশিক্ষা করলে না, খালি বাবুগিরি নিয়েই আছে। সেই জন্যই ওকে আমি 'লেডি রাজকুমার' বলি।" সূর্য্যকুমার উত্তর করিলেন,—"কিছু ভেবনা দাদা, রাজকুমার মস্তলোক হবে।" ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার ওকালতী শুনিয়া প্রসন্নকুমার আনন্দে বিহ্বল হইয়া সূর্য্যকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। আমরা পরে দেখিতে পাইব সূর্য্যকুমারের এই ভবিষ্যবাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল।

প্রসন্নকুমার 'সিনিয়র স্কলারসিপ' পাশ করিয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। লুইস্ সাহেব (Mr. G. Lewis) তখন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ। সূর্য্যকুমারও ভ্রাতার সহিত ঢাকায় আসিয়া ঢাকা কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই কৃতী অধ্যাপকরূপে প্রসন্নকুমারের এবং মেধাবী ছাত্ররূপে সূর্য্যকুমারের খ্যাতি ঢাকা নগরীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঢাকা কলেজে সূর্য্যকুমারের পুরস্কার ও সম্মানলাভ ঘটিয়াছিল।

ঢাকাকলেজে শিক্ষালাভ।

ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রসন্নকুমার বহরমপুর কলেজে অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যকুমারও ঢাকা পরিত্যাগ করেন। প্রসন্নকুমার পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্য করিয়া সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন।

প্রসন্নকুমারের অধ্যক্ষ-পদ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই সূর্য্যকুমার বিশেষ কৃতিত্বের সহিত "সিনিয়র স্কলারসিপ" পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তখন মেডিকেল কলেজের নাম ছিল Graduate Medical College of Bengal. আধুনিক এল-এম্-এস্, এম্-বি প্রভৃতি পরীক্ষার তখনও প্রচলন হয় নাই, কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রেরা তখন জি-এম্-সি-বি উপাধি লাভ করিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে এল-এম্-এস্ উপাধি প্রদান আরম্ভ হয়। সূর্য্যকুমারের চরিত্র-মাধুর্য্য ও অসাধারণ মেধা দেখিয়া মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ইংরেজ অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। ছাত্রাবস্থায়ও তিনি অনেক রোগী দেখিতেন। তাঁহার মৌলিক গবেষণা ও বিচার-শক্তি দর্শন করিয়া একবাক্যে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিত। অস্ত্রচিকিৎসায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার মত মেধাবী ছাত্র মেডিকেল কলেজে আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মেডিকেল কলেজে প্রবেশ।

এই সময় হাওড়া জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের কন্যার সহিত সূর্য্যকুমার পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। রামকৃষ্ণ সরকারের কন্যার নাম হেমলতা। রাধানগর হইতে ব্রাহ্মণপাড়া আট দশ ক্রোশ ক্রোশ হইবে। বিবাহের রাত্রে বরযাত্রীর দল বর লইয়া সময়মত ব্রাহ্মণপাড়ায় পৌঁছিতে পারে নাই।

বিবাহ।

তাহারা প্রান্তরে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সারারাত্রি মাঠে মাঠে ঘুরিয়া উষার প্রাকালে তাহারা পথের সন্ধান পাইল, কিন্তু সে সময় বর লইয়া দুর্দ্দান্ত জমীদার রামকৃষ্ণ সরকারের বাড়ী যাইতে বরযাত্রীগণ প্রথমতঃ সাহসী হইল না। যাহা হউক, বরকর্ত্তাও তেজস্বী পুরুষ, তিনি বর লইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। বিবাহ-সভা তখনও ভাঙ্গে নাই। কন্যাকর্ত্তা উৎকণ্ঠায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি সাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখনই লগ্ন দেখিয়া তিনি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বর দেখিয়া আত্মীয়া কুটুম্বিনীগণ বলিয়াছিলেন—বর ভোলা মহেশ্বর। সূর্য্যকুমারের মুখশ্রী বড় সুন্দর ছিল। তাঁহার আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় উদারভাব ফুটিয়া উঠিত। তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার শরীরের কান্তি ছিল। দেহের গঠন দেখিয়া তাঁহাকে 'ভোলা মহেশ্বরই' মনে হইত।

সূর্য্যকুমারের পত্নীর হেমলতা-নাম সার্থক হইয়াছিল। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্য যেমন অপরূপ ছিল, গুণাবলীও তেমনি অসাধারণ ছিল। হেমলতা পিতার বড় আদরের কন্যা ছিলেন, সুতরাং মনোমত জামাতা পাইয়া রামকৃষ্ণ সরকারের আনন্দের সীমা ছিল না। বিষয়কার্য্যে রামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই সূর্য্যকুমারের মতামত গ্রহণ করিতেন। সূর্য্যকুমারের বন্ধুবান্ধবগণ ব্রাহ্মণপাড়ায় গেলে রামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন। সূর্য্যকুমার মৎস্য ভালবাসিতেন। জামাতার জন্য শ্বশুর প্রায়ই কলিকাতায় একমণ করিয়া মৎস্য পাঠাইতেন। সে মৎস্য সূর্য্যকুমারের সংসারে ব্যয় হইত, এবং যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের ভোগেও লাগিত।

জি-এম্-সি-বি উপাধি লাভ ও ব্রহ্মদেশে গমন।

মেডিকেল কলেজ হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত জি-এম্-সি-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বিবাহের পর, সূর্য্যকুমার "ফায়ার কুইন্" (Fire Queen) নামক সমর-পোতের প্রধান নৌ-চিকিৎসকের (Naval Surgeon) পদ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদেশে গমন করেন। ইহার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।* সমর-পোতের প্রধান চিকিৎসকের পদ সূর্য্যকুমারের পূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার পরেও অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ডাক্তারই এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। 'ফায়ার কুইন' জাহাজের চিকিৎসকরূপে সূর্য্যকুমার যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

গাজীপুরে কর্ম-গ্রহণ: সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা।

কয়েকমাস পরে 'ফায়ার কুইনের' চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যকুমার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গাজীপুরে সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন। তখন ভারতের রাজনৈতিক গগনে অশান্তির মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। সূর্য্যকুমারের গাজীপুর গমনের অব্যবহিত পরেই সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা দেখা গিয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত গাজীপুরের তৎকালীন ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ সম্পূর্ণরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ভাবী অমঙ্গলের কোনরূপ আশঙ্কাই তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই। সূর্য্যকুমার চারিদিকে অশান্তির আভাব দেখিতে পাইলেন। একদিন তিনি সবজজ বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের সহিত ভ্রমণে বাহির্গত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন সিপাহীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সিপাহীরা তাঁহাদিগকে কোনরূপ সম্মান-প্রদর্শন তো করিলই না, বরঞ্চ একজন সিপাহী কাশীনাথ বাবুকে ব্যঙ্গোক্তি করিয়া চলিয়া গেল।† এই ঘটনায় সূর্য্যকুমারের মনে পূর্ব্ব আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশঙ্কার কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিলেন, কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা ভিত্তিহীন বলিয়া সকলেই তাহা উড়া-

---

* শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে (৩৩৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, সূর্য্যকুমার দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়।

† বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, ৩৩৫ পৃঃ।

ইয়া দিলেন। অনন্যোপায় হইয়া সূর্য্যকুমার আপনার চিকিৎসালয়টি সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তাঁহার এ সতর্কতা দেখিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে ভুলিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই গাজীপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন স্থানীয় ইংরেজগণ বাধ্য হইয়া সুরক্ষিত চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং শতমুখে সূর্য্যকুমারের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দূরদর্শিতার গুণে গাজীপুরের ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের প্রাণ-রক্ষা।

গাজীপুরের বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর সূর্য্যকুমারের সুখ্যাতির আর সীমা রহিল না। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেলী (পরে ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী) তখন গাজীপুরের এডিসনাল্ ম্যাজিষ্ট্রেট্। তিনি মুক্তকণ্ঠে সূর্য্যকুমারের অজস্র প্রশংসা করেন।

প্রচুর সুখ্যাতি ও ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের ঈর্ষা।

একজন দেশীয় ডাক্তারের এতাদৃশ সম্মান ও প্রশংসা-বাদে কয়েকজন ইংরেজ কর্ম্মচারী অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। জেনারেল মেসন্ তখন গাজীপুরের সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময় অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ দেশীয়দিগকে জুতা পায়ে দিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। জেনারেল মেসন্ও এই প্রথার সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সূর্য্যকুমারের সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ হয় নাই। ঈর্ষাপরায়ণ কর্ম্মচারীদের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলীক কথা শুনিয়া জেনারেল মেসন্ সূর্য্যকুমারের উপর কতকটা বিরূপ হইয়াছিলেন। এমন সময় একদিন সূর্য্যকুমার জেনারেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। উপদেশমত দারবান তাঁহাকে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। এ কথায় বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়া তেজস্বী সূর্য্যকুমার তৎক্ষণাৎ সাহেবের সহিত দেখা না করিয়াই ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। উপরতলা হইতে জেনারেল মেসন্ সমস্তই দেখিতেছিলেন, তিনি সূর্য্যকুমারের এই তেজস্বিতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে জুতা পায়েই গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি সূর্য্যকুমারের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হন।

জেনারেল নীল সূর্য্যকুমারকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একদল সঙ্কীর্ণমনা কর্ম্মচারী সূর্য্যকুমারের সম্মানে ঈর্ষা অনুভব করিতেছে, এমন কি, হয়ত তাহারা তাঁহাকে বিপন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। এই সকল কর্ম্মচারীদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য জেনারেল নীল একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার হাতে একটি ফোঁড়া হইয়াছিল। একদিন পূর্ব্বাহ্নে সৈন্যদের কুচের সময় ফোঁড়া অস্ত্র করিবার নিমিত্ত ইংরেজ ডাক্তার পামার সাহেবকে না ডাকিয়া সর্ব্বসমক্ষে সূর্য্যকুমারকে সে ভার দিলেন। তখনকার দিনে ইয়োরোপীয়েরা দেশীয় ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে বিশেষ আপত্তি করিতেন, সুতরাং জেনারেল নীলের এই বিসদৃশ ব্যবহারে উপস্থিত ইংরেজগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যকুমার অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ফোঁড়া অস্ত্র করিয়া দিলেন, জেনারেল নীল অত্যন্ত আরাম বোধ করিলেন। বাঙ্গালী ডাক্তারের অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখিয়া সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং কয়েকজন হাইল্যাণ্ডার সৈন্য সূর্য্যকুমারকে স্কন্ধে করিয়া সেনানিবাসে লইয়া গেল।

জেনারেল নীলকে অস্ত্রচিকিৎসা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

সার্থক প্রেম

অরুণের প্রথম চুম্বনে আকাশ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বিহঙ্গেরা মিলনের মধুরতানে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। পবন সেই মিলনের বার্ত্তা বহন করিয়া ধন্য হইল। কুসুমেরা ভাবিল সুধু কি আমরাই এই আনন্দে বঞ্চিত থাকিব? তাই একে একে তাহারা চাহিয়া দেখিল পৃথিবী বড় সুন্দর; আর তাহাদের পলক পড়িল না। সারা রাত্রি ধরারাণীর কোলে অশ্রুজলে আকাশ তাহার দুঃখের কথা জানাইয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে সেই অশ্রুজল ও তাহার ব্যর্থতা অনুভব করিয়া মুক্তার বিন্দুতে পরিণত হইল।

এই মিলন সুবাসপূর্ণ মুহূর্ত্তে সে জাগিল। আকাশ বাতাসের আনন্দ তাহার প্রাণেও তরঙ্গ তুলিল। "তাই তো কি সুন্দর এই পৃথিবী, কি সুন্দর তার সাজ, কি সুন্দর তার গান—এ যে সবই সুন্দর।" সে ঘরের বাহির হইল, যত দেখিল তত মুগ্ধ হইল। তার পর তাহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা আসিল, সে ভাবিল "এ সৌন্দর্য্য সবই আমার।" অপার আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল—ডাকিয়া সে বলিল "আকাশ, বাতাস, শিশির, কুসুম, তোমরা সবাই আমার।" আকাশ পাগলের পাগলামিতে হাসিয়া রৌদ্র ফুটাইল, পবন মৃদু বহিয়া গেল "দেখা যাবে," শিশির অবজ্ঞাভরে তাহাকে ফাঁকি দিয়া লুকাইল, কুসুম সুধু লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

সে সব দেখিল, সব বুঝিল, জানিল পৃথিবী সুন্দর কিন্তু সকল সৌন্দর্য্য তাহার নহে। তাহার প্রাণ সুন্দর তাই সে ভাবিয়াছিল সকল সৌন্দর্য্য তাহার। সে ভুল তাহার ভাঙ্গিল। তখন সে দেখিল ফুল কত সুন্দর; কই আকাশ তো এত সুন্দর নহে; বাতাস সে তো কুসুমের গন্ধ বহন করিয়াই সার্থক; আর শিশির, সে তো মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যায়। সুন্দর তো ফুল, কত তার হাসি, কি তার লীলাকোমল ভঙ্গি, কিবা তার গন্ধ—এ যে সকল কোমলতার, মধুরতার আর সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ। ডাকিয়া সে কহিল "চাই না আমি আকাশ, চাই না আমি বাতাস—আমি আর কিছু চাই না। ও গো বনস্পতির গৃহ আলো করা কুসুমরাণী, আমি তোমার।" সে কহিতে চাহিয়াছিল "তুমি আমার" —আনন্দের পূর্ণতায় কহিল "আমি তোমার।"

ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কহিয়া গেল "পাগল"
সে শুনিয়াও শুনিলনা; ভাবিল "সুখে আনন্দে
তো আমি পাগলই বটি।"

মালি আসিল; রাজার জন্য ফুল লইয়া গেল।
সে দেখিল; অশ্রু তাহার বহিল না। সে হাসিতে চেষ্টা করিল।

রাজার দুয়ারে নিত্যই কত কাঙ্গাল বসিয়া থাকে তাই সে যে সেখানে দাঁড়াইয়া অনিমিষলোচনে চাহিয়া দিন কাটাইল তাহা লোকে দেখিয়াও দেখিল না। কত লোক আসে যায়; রাজার ঘরের পুষ্পসজ্জার একবাক্যে প্রশংসা করে। সে শুনে—কেবল শুনে আরও শুনিতে চায়।

দিন গেল; আকাশ কাঁদিয়া চক্ষুলাল করিয়া তপন দেবকে বিদায় দিল; বাতাস স্বন্ স্বন্ করিয়া শোক গীত গাহিয়া গেল; আবার শিশির দেখা দিল। সে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটী তারা উঠিল; দেখিল সে দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিল কই আর তো কোন দিন কেউ থাকে না; আজ কে এ চোখে পলক নাই, রাজবাড়ীর দিকে তাকাইয়া আছে? সে কিছুই বুঝিল না; সঙ্গীদের ডাকিল। তখন দলে দলে তারারা সব আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল। সে কিন্তু কিছুই বুঝিল না; সে অনন্য চিত্ত।

চাঁদ আসিয়া দেখা দিলেন; তিনি তাহার দুঃখ বুঝিলেন তাই যে জ্যোৎস্না দেখিলে সে পাগল হইত তাহাই পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিলেন। কিন্তু জ্যোৎস্না তাহার কাছে লুটাইয়া কাঁদিল সে দেখিল না।

আবার প্রভাত হইল। ঐ যে মালী; কি লইয়া সে রাজবাড়ী হইতে আসিতেছে? হায় এই কি সেই? কই সে শোভা, কই সে গন্ধ, কই তার সেই পুলক চঞ্চল চাহনি?

মালী বাসিফুল ফেলিয়া দিল; পাগল কুড়াইয়া বুকে তুলিল। অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া বন্যার মত ছুটিল কিন্তু তবু তাহার চোখে মুখে আনন্দের আভা দেখা দিল।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণ।

[দয়াল]—English

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের দ্বারা যে সপরিশিষ্ট পদ-কল্পতরু প্রকাশিত হইতেছে—উহার সম্পাদনের সাহায্যের জন্য আমরা সাহিত্য-পরিষদের পুথি-শালা হইতে যে কয়েক খানা প্রাচীন পদাবলীর পুথি পাইয়াছি তন্মধ্যে ২০১ সংখ্যক পুথি খানা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। পুথি খানার কোন বিশেষ নাম নাই—ইহাতে বৃন্দাবন দাস বৈরাগী কর্ত্তৃক নানা বিষয়ক ৮০৪ টি পদ সংগৃহীত ও রস শাস্ত্রোক্ত পর্য্যায়-অনুসারে বিন্যস্ত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত সমুদ্র গ্রন্থে মোটে ৭৪৬ টি পদ আছে তন্মধ্যে তাঁহার স্বকৃত পদ-সংখ্যাই ২২৮। বৃন্দাবন দাসের এই সংগ্রহে "পদামৃত-সমুদ্র" "পদ-কল্প-তরু" প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই—এরূপ বহু সংখ্যক পদ আছে; সুতরাং সংগ্রহের হিসাবে এই পুথি খানাকে তুচ্ছ করা চলে না। "কীর্ত্তনানন্দ ও "পদ-রত্নাকর" পুথির নিজস্ব কতকগুলি পদ এই সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে; আবার প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ কয়েকজন বৈষ্ণব-কবির এরূপ পদও ইহাতে আছে যাহা আমরা আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন পদাবলী গ্রন্থে পাই নাই সুতরাং বৃন্দাবন দাস বৈরাগীর এই সংগ্রহ সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত পুথিগুলির পরবর্ত্তী এবং যথা সম্ভব নূতন পদ সংগ্রহ করাই বোধ হয় তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পুথি খানার কোন স্থানেই সন তারিখ দেওয়া নাই; সুতরাং এই সংগ্রহটি কত প্রাচীন তাহা নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। এই সংগ্রহে পূর্ব্বোক্ত পুথিগুলির অতিরিক্ত দয়াল ও নন্দদুলাল মাত্র এই দুইজন অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তার নাম আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; "পদরস সার" ও "পদ রত্নাকর" পুথির সংগ্রহকার পদ-কর্ত্তা নিমানন্দ বা কমলাকান্তের কোন পদ এ সংগ্রহে নাই; ঐ দুই খানা পুথিতে যে আমরা পূর্ব্বে প্রকাশিত তালিকা-ভুক্ত ২৯ জন অজ্ঞাত পদ কর্ত্তার পদাবলী পাইয়াছি উহার কোন পদও এই সংগ্রহে নাই সুতরাং এই পুথি খানা পরবর্ত্তী হইলেও সংগ্রহকার বৃন্দাবন বৈরাগী যে পদ-রস-সার বা পদ-রত্নাকর হইতে পদ-সংগ্রহ করেন নাই এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। অতএব পদ-রস-সার ও পদ-রত্নাকরের নিজস্ব কতকগুলি পদ ইহাতে উদ্ধৃত হওয়ার কারণ ইহাই অনুমান হয় যে, নিমানন্দ ও কমলাকান্তের ন্যায় এই বৃন্দাবন বৈরাগী ও বৈষ্ণব কবি দিগের অফুরন্ত পদ-ভাণ্ডার হইতে স্বাধীন ভাবেই পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন বৈরাগীর এই সংগ্রহে আমরা সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের বহু সংখ্যক অপ্রকাশিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি; সকল পদ এ যাবৎ মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই কিন্তু যাহা দেখিয়াছি তাহাতেই আশা হইয়াছে যে, এই বৃন্দাবান্ সংগ্রহটিতে আমরা জ্ঞানদাসের ন্যায় অন্যান্য প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবিদিগের ও অনেক পদ প্রাপ্ত হইব। দয়াল ও নন্দদুলালের ন্যায় আরও অজ্ঞাত পদকর্ত্তার পদও পাওয়া যাইতে পারে। আমরা অনুসন্ধানে যখন যাহা প্রাপ্ত হই তখনই তাহা পাঠক বর্গকে উপহার প্রদান করিব। আমরা এই সংগ্রহে এ যাবৎ দয়ালের ১টি ও নন্দদুলালের মাত্র ২টি পদ পাইয়াছি। দয়ালের নাম আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত তালিকা-ভুক্ত করিয়াছি কিন্তু নন্দদুলালের নাম পরে পাইয়াছি বলিয়া তালিকা ভুক্ত করিতে পারি নাই। দয়ালের পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

মল্লার।

পেখলু অপরূপ নন্দকুমার।
কালিন্দিনীর　　　তীরতরু হেলন
যৈছন জলদ সঞ্চার॥

চূড়হি উড়সে মউর শিখণ্ডক
সো এক অপরূপ ঠাম।
যৈছন ইন্দ্র ধনুক তহি উয়ল
ঐছন মঝু মনে ভান॥
মোতিম-হার উরপর দোলত
হেরিয়ে তারক পাঁতি।
কটিপর পীত বসন বিরাজিত
জিনি সৌদামিনি-কাঁতি॥
চরণ-অবধি বন-মাল বিরাজিত
উনমত মধুকর-জাল।
পদ-পঙ্কজ-তলে মানস সোপলু
কাতরে কহত দয়াল॥

পদ-কর্ত্তা দয়ালের এই একটি মাত্র পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব-শক্তির সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না—কিন্তু দয়ালের দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য-ক্রমে পদাবলী সাহিত্যের জীবন-সংগ্রামে জয়ী এই একটিমাত্র পদের উপরই যখন দয়ালের সমস্ত যশ বা অপযশ নির্ভর করিতেছে তখন আমরা অত খুটিনাটি না ধরিয়া যদি বলি যে, এই পদটির ভাবের জন্ত দয়াল পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট ঋণী হইলেও তাঁহার রচনা ভঙ্গী সুন্দর ও শব্দ-যোজনা সুললিত, তাহা হইলে বোধ হয় উহা অসঙ্গত প্রশংসা হইবে না।

এস্থলে আমাদিগকে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দয়াল বা নন্দলালের ন্যায় দুই চারি জন পদকর্ত্তার নাম বিস্মৃতির গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়া বৃন্দাবন বৈরাগী বৈষ্ণব-সাহিত্যের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন—তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উপকার করিয়াছেন জ্ঞানদাসের ন্যায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির লুপ্তপ্রায় অজ্ঞাত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া। কেন না—পদাবলীর উপাদেয়তা লইয়া বিচার করিলে জ্ঞানদাসের একটি পদ যে, দয়ালের ন্যায় অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদিগের রাশি রাশি পদাবলী হইতেও সাহিত্যের বাজারে অধিক মূল্যবান্ সে কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণের সম্বন্ধে আমাদিগের এই আলোচনা শেষ হইলেই আমরা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদিগের নবাবিষ্কৃত পদাবলী পাঠকবর্গকে ক্রমে উপহার প্রদান করিব, এখন কেবল বৈষ্ণবদাসের সংগ্রহ হইতে জ্ঞানদাসের কয়েকটি মাত্র অপ্রকাশিত পদ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

তুড়ী।

একে কালা বরণ চিকণ তাহে লেপিয়া
মলয়জ মৃগমদ কুঙ্কুমে।
অঙ্গের সৌরভে কত মধুকর উড়ে তায়
সাজিয়াছে কাঞ্চন বিভ্রমে॥
দেখিলু দেখিলু সই যত মনে অনুভই
কহিতে কহিল নয় বোলে।
প্রতি অঙ্গ রসময় পিরিতের আলয়
ভালে তাহে জগজন ভুলে॥ ধ্রু॥
একে সে রসিক রাজ আরে অভরণ সাজ
কুণ্ডলে কুসুম কত পাতিয়া।
আবেশে অবশ গায় চলে আধ আধ পায়
প্রেমে রহে অতিরসে মাতিয়া॥
পিয়ার আরতি যত অপাঙ্গে ইঙ্গিত কত
কেমন কেমন উঠে চিতে।
আরে সে লাবণ্যলীলা বাতাসে দরপে শিলা
জ্ঞানদাস কহয়ে পিরিতে॥

সিন্ধুড়া।

বেশ বনাওনি কেশের সাজনি
কি না সে তিলক দেল।
নয়ন কোণের বাণ বরিখনে
অঙ্গ জর জর ভেল॥
সই বড়ই বিনোদিয়া সে।
অধর মিলনিয়া মন্দ হাসি খানি
মরমে লাগিয়াছে॥ ধ্রু॥
রসের ভরে না ধরে অঙ্গ
চলিতে না চলে পা।
শিরিস-কুসুমে অধিক কোমল
কানড়-কুসুম গা॥

ও রূপ লাবণ্যে কে ধরে পরাণ
ও না মনোহর ছান্দে।
জ্ঞানদাস বিনি পরিচয়ে
দেখিয়া কেবা না কান্দে॥

সিন্ধুড়া

লোচন-অঞ্চলে চিত চোরায়ল
রূপে চোরায়ল আঁখি।
যৌবন-তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল
পরাণ রহিল সাখি॥
সই কিনা সে নাগর কালা।
মরম জানিল ধরম কাহল
জাতি কুল শীল গেলা॥
চাহিতে চাহনি পিম দোলায়নি
হাসনি ভাষণি লীলা।
ও অঙ্গ পরশে পবন করি সে
পরশে পরশ-শিলা॥
একে সে আকার রসের বিহার
আরে অভরণ সাজে।
জ্ঞানদাস কহে ও রূপ দেখিলে
কে করে কাল-বিয়াজে॥

শ্রী।

এ কে সে মুরতি তার পিরিতি-রসের সার
আঁখি-আড়ে চায় বা না চায়।
মধুর মুরলি-স্বরে তরুণী-পরাণ হরে
না চাহিলে যৌবন যাচায়॥
কালিন্দী কূলে তরু মূলে উড়ে পীতবাস।
কাল পায়া তারে বলি গোয়াল কুলের কালি
আজু দেখি লাগিল তরাস॥ ধ্রু॥

ভালে সে কুটিল কেশ মল্লিকা মালতী বেশ
মধুকরী সঙ্গে মধুকর।
চন্দনের বিন্দু তাতে উপমা কহিতে চিতে
হারাইলু যত বুদ্ধি বল॥
হিয়ায় হিলোলে কত নব চম্পক মাল
আর কহিতে নাহি জানি।
জ্ঞান দাসেতে কহে সেই গোল সেই হয়ে
ভালে সুরে রাধা ঠাকুরাণী॥

সখী-উক্তি।

সুহই।

চলইতে থকিত চাকত রহু কান।
হাসি নেহারল তোহারি বয়ান॥
চৌদগে হেরি কহল কিছু থোর।
ধরনি না সম্বরে ও রস-ভর॥
এ সখি এ সখি নিবেদিলু তোয়।
অকপটে কহাব না বঞ্চবি মোয়॥ ধ্রু॥
তুহু বরনারি চতুর বর নাহ।
অনুভবে জানি আছয়ে নিরবাহ॥
তুয়া সঙ্গে পিরিতি কি রস আনঠাম।
কো ধনি গুপতে পুজয়ে নিতি কাম॥
শ্রবণে নয়নে ধনি রহল সমাধি।
ধক ধক অন্তরে উপজে বিয়াধি॥
এত জানি যব হয়ে পরসাদ।
জ্ঞানদাস কহ নহ পরমাদ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

আকাশ

ওই নীল ঘন স্থির নিরমল বিপুল নীলিমা
উলঙ্গিনী শিশু কন্যা সদা তব অঙ্কেতে বিলীনা ;
বিবিধ বসনে ভূষি, বিবসনা আহ্লাদে কখন,
কভু শান্ত, কভু হাসে, কভু করে অশ্রু বরষণ ;
হাস্য লাস্যে ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠে উজ্জ্বল চপলা
কণ্ঠ স্বরে গর্জ্জে বজ্র—আপনায় আপনি বিহ্বলা।
আনিতম্ব কেশদাম প্রসারিত দিগন্ত সীমায়
ব্যস্ত সদা বেশ ভূষা ল'য়ে, মত্ত নিজ গরিমায় !
নাহি প্রেম, নাহি রস, নাহি গন্ধ, তবু প্রতারণা—
দূরের রূপসী ওরে, কাছে গেলে নিষ্ফল বাসনা !
ওই তাই উর্দ্ধশিরে বুকপেতে আছে দাঁড়াইয়া
ভগিনীর আশীর্ব্বাদ স্নেহ প্রেম পাইবে বলিয়া—
পাষাণি, সরিয়া দূরে ছলাময়ী ভ্রূকুটি হানিয়া
কোন্ প্রাণে ভ্রাতৃশিরে দিস্ হেন অশনি ছাড়িয়া ?

জলধি।

জননীর পদতলে অই ধেয়ে ক্ষ্যাপা মেয়ে আসে
আকুল আবেগে মা'য়ে বাঁধিবারে আলিঙ্গন পাশে।
অভিমানে ঝরে চোখে ফেণশুভ্র মুক্তা অশ্রু ধার
উঠিয়াছে ফুলি বুক, দীর্ঘ শ্বাস বহে বার বার ;
শ্যামাঙ্গিনীতন্বী সুতা পদে দলি রত্ন মুক্তা রাশি
ভূমে যায় গড়াগড়ি, জননীর স্নেহে অবিশ্বাসী।
বুকে বুকে থাকে গিরি, অবতনে সিন্ধু নীচে ফেরে
স'বে কেন দুহিতার ? হিংসানল, উঠিতেছে বেড়ে।
নিষ্ফল আয়াসে তাই টানি মার বসন অঞ্চল
উঠিতে মায়ের কোলে সিন্ধু বালা সতত চঞ্চল।
এই ভ্রাতৃ হিংসা হৃদে করিয়াছি গরল সৃজন
বিধাতার অভিশাপে অধোগতি হয়েছে এমন !
আপনার কর্ম্মদোষে অণু অণু লভিছে মরণ
জগতের পরিত্যক্তা, মৃত্যু সম ভীতির সদন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাজকুমারের পরিণাম।

মোগলকুল রবি বাদসাহ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। রাজপুত জাতির শৌর্য্য বীর্য্যে বাদসাহের বীরহৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতি কুশল সম্রাটের ইহাও বুঝিতে বাকী নাই যে প্রকৃতি বৃন্দের হৃদয় অধিকার করিতে না পারিলে রাজাসন স্থায়ী হইবে না। তাই তিনি বহু যত্ন করিয়া রাজপুত জাতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে ব্যস্ত। তিনি মনে করিলেন—বিবাহ বন্ধন দ্বারা রাজপুত ও মোগল শোণিতের সম্মান সাধন করিতে পারিলে রাজপুত জাতির স্বদেশ বৎসলতা ও উৎকৃষ্ট প্রাণতা মোগল বংশে প্রবিষ্ট হইয়া মোগল সিংহাসন ভারতবর্ষে দৃঢ়তররূপে স্থাপিত করিবে। সুতরাং তিনি স্বয়ং জয়পুর রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজপুত দুহিতা বহুদিন অপত্য লাভে বঞ্চিতা ছিলেন। অনেক যাগযজ্ঞ ও আরাধনা করিলেন। অবশেষে সেলিমসাহ নামক এক ফকিরের বরে তাঁহার এক পুত্র লাভ হইল। ফকীরের নামানুসারে পুত্রের নাম হইল সেলিম। ইনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজপুত সম্পর্ক আরও ঘনীভূত করিবার জন্য বাদসাহ আকবর এই যুবরাজ সেলিমের সহিত রাজা মানসিংহের ভগিনীর বিবাহ দিলেন। যথাকালে এই রাণীর গর্ভে একপুত্র জন্মিল। ইনিই খস্রু নামে অভিহিত। ভুবন বিজয়ী অলোকসামান্য প্রতাপ বাদসাহ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী সেলিম। আবার খস্রু এই সেলিমেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। সকলেই মনে করিতে লাগিল খস্রু বড় ভাগ্যবান্। বাদসাহ পৌত্র খস্রুকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। রাজা মানসিংহ দেশ বিজয়ে ও রাজ্য শাসনে বাদসাহের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। খস্রু এই মানসিংহের ভাগিনেয়। পিতামহ, মাতুল ও অন্যান্য আত্মীয়গণের আদর যত্নে খস্রু দিন্ দিন্ শশিকলার মত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কিসে কি হয় বা কি হইবে মানুষের পক্ষে জানা বা বলা অনেক সময় অসম্ভব প্রায় হইয়া উঠে। অমৃত হইতেও যেন কেমন করিয়া হলাহল উঠিয়া পড়ে।

কালক্রমে পিতামহের অজস্র স্নেহ ধারাই খস্রুর ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সূত্রপাত করিল। অত্যধিক আদর পাওয়াতে খস্রুর শিক্ষা সম্যক্ পরিমাণ হইতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদা অপ্রতিহত থাকাতে তিনি অতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন। পরের মনের দিকে চাহিয়া কথা বলা ও করা তিনি মোটেই শিক্ষা করিলেন না। পক্ষান্তরে ক্রমেই অসংযতবাক্ ও নিষ্ঠুর হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সব ছাড়া আর একটা অস্বাভাবিক কারণে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে বিপদের রেখাপাত করিল। আকবর খস্রুকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের প্রতি তিনি ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন। সেলিম অত্যন্ত মদিরাসক্ত। নানাবিধ অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা তাহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। আকবর বড় আশা করিতেছিলেন—একটা স্থায়ী রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু যুবরাজ সেলিম রাজোচিত ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, পরিশ্রম শীলতা, প্রভৃতি অর্জ্জন করিতে নারাজ। তিনি তৎপরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছেন। তাই সেলিমের প্রতি আকবরের স্নেহধারা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। কিন্তু পৌত্র খস্রুকে তিনি ভালবাসা প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তাই আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র খস্রুর প্রতি সেলিমের একটা অনৈসর্গিক ঈর্ষ্যা আসিয়া দেখা দিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন বুঝিবা ভারতের রাজসিংহাসন তাহার ভাগ্যে না পড়িয়া খস্রুর ভাগ্যেই পড়ে। রাজ্যলাভ লালসা এমনই বলবতী যে উহা সুবিমল অপত্য স্নেহ পীযুষকেও বিষদিগ্ধ করিয়া তোলে। মোটের উপর খস্রু ক্রমশঃ পিতার চক্ষুশূল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

আকবর বাদসাহ দাক্ষিণাত্য জয় গমনে উন্মুখ হইয়াছেন। ১৫৯৮ খ্রীঃ সমাগত। মদিরাসক্তিতে সেলিমের দৈহিক ও মানসিক শক্তি অনেকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেলিমের বিশ্বাস বুঝিবা বাদসাহ তাহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার পুত্র খস্রুকেই মনোনীত করিবেন। সেলিমের মনে যে এই আশঙ্কা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল ইহা জানিতে বাদসাহের বাকী ছিল না। এক বিশাল বাহিনী লইয়া সুদূর দাক্ষিণাত্যে যাইবার পূর্ব্বে সেলিমের সেই আশঙ্কা দূর করা যুক্তি সঙ্গত বোধ করিলেন। প্রকাশ্যভাবে সেলিমকে তাহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, আর মানসিংহকে সঙ্গে লইয়া উদয়পুরের রাণাকে পরাভূত করিবার আদেশ দিয়া গেলেন। এই সমুদয় সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও সেলিমের চৈতন্যোদয় হইল না। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক যুবকের মনে রাজ্যলাভ লালসাও দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। বাদসাহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্যভাবে সসৈন্যে আগ্রা অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন, সেই চেষ্টা বিফল হইলেও এলাহাবাদ যাইয়া তথাকার রাজকোষে সঞ্চিত ধন রত্ন হস্তগত করিয়া বসিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে ১৬০০ খ্রীঃ বাদসাহ দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সেলিম অগত্যা হীনবল হইয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রকৃত মিলন সংগঠিত হইল না।

দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার প্রাক্কালে আকবর প্রিয়তম মন্ত্রী আবুলফজলকে দাক্ষিণাত্যে বিজয় সমাপন করিবার জন্য তথায় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই সোদর প্রতিম মন্ত্রীর সঙ্গ লাভের জন্য বাদসাহ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। আবুলফজলের জ্ঞান গবেষণা পূর্ণ কথোপকথন, ও ধর্ম্ম বিষয়ক উদারতা আকবরের বড়ই প্রিয় ছিল তাই তাঁহাকে দিল্লীতে ফিরিবার জন্য হুকুম পাঠাইলেন। বাদসাহের হুকুম নামা পাইয়া আবুলফজল দিল্লী অভিমুখে রওণা হইয়াছেন। সেলিমের ইহা সহ্য হইল না। তিনি মনে করিলেন আবুলফজলই বাদসাহকে মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহার হইতে ক্রমশঃ শ্লথ ও বিগতস্পৃহ করিয়া তুলিতেছে পক্ষান্তরে হিন্দু দর্শন ও হিন্দু আচার ব্যবহারে তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করিতেছে। এই আবুলফজলকে চিরতরে অপসারিত করিতে পারিলেই অনেক গণ্ডগোল কমিয়া যায়। এই মনে করিয়া নিষ্ঠুর প্রকৃতি সেলিম

এক লোমহর্ষণ কাণ্ডে ব্রতী হইলেন। আবুলফজল বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন। তদন্তর্গত অর্চ্চা নামক রাজ্যের রাজা নরসিংহ দেবকে হস্তগত করিয়া তাহারই দ্বারা ঘাতক নিযুক্ত করিয়া আবুলফজলের প্রাণ সংহার করিলেন। এই ঘটনা আকবরের অন্তঃকরণে শেলসম বিদ্ধ হইল, আর সেলিমের প্রতি বিরক্তি শতগুণে বাড়াইয়া দিল।

সেলিমের নিষ্ঠুর প্রকৃতি ক্রমশঃ নিষ্ঠুরতর হইতে চলিল। মদিরাসক্তি এতটা বাড়িয়া পড়িয়াছে যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক পূর্ণপাত্র মদ পান না করিলে আর চলে না। অহোরাত্রে প্রায় ১০ সের মদ্য পান করেন। মদ্যপানের একটি ত্রুটি হইলে তাহার হাত পা কাঁপিতে থাকে। কিঞ্চিদূর্দ্ধ ত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক যুবকের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা নিচয় মদিরা রাক্ষসী গ্রাস করিতে বসিয়াছে। আবুলফজলের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই সেলিমের দোষে আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র খস্রুর প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আজকাল তাহা সেলিমের প্রায় প্রতি কার্য্যে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সন্তানের প্রতি জনকের বিদ্বেষভাব দেখিলে সকল জননীর মনেই ব্যথা লাগে। খস্রু জননীর তাহাই হইল। তাহাতে আবার তিনি রাজপুত রাজদুহিতা, রাজা মানসিংহের ভগিনী বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের প্রতি স্বামীর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেন। তাহাতে সুফল না হইয়া কুফলই হইতে লাগিল। সেলিমের রোষপরায়ণতা তাহাতে বৰ্দ্ধিত হইতে চলিল।

স্বামী ভ্রষ্ট চরিত্র, মদিরাসক্ত, বার বণিতায় আসক্ত ইহাতেই রাজপুত নন্দিনীর গর্ব্বস্ফীত হৃদয় পুড়িয়া ছার খার হইতে ছিল। তারপর আবার তাহার প্রাণ প্রতিম পুত্রের প্রতি ঈদৃশ দুর্ব্যবহার। পদ দলিতা ফণিনীর মত খস্রু-জননী কিছু দিন রোষে ও ক্ষোভে ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রতিকারের উপায় নাই দেখিয়া বিষপানে স্বীয় জীবন লীলা সাঙ্গ করিলেন। পিতৃদ্বেষ দগ্ধ খস্রু ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে মাতৃহারা হইলেন।

রাজপুরী বিশেষতঃ মোগল রাজপুরী বরাবরই দলাদলির ক্রীড়া ক্ষেত্র। রাজা বা বাদসাহ সিংহাসনারূঢ় থাকেন বটে কিন্তু ক্ষমতার প্রায় ষোল আনা রাজকর্ম্মচারীগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। আকবর বাদসাহের রাজত্বের শেষ ভাগে ভাবী উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ লইয়া একটা দলাদলির গঠন হইয়াছে। সকলেই জানেন বাদসাহ সেলিমের প্রতি বিরক্ত এবং পৌত্র খস্রুর প্রতি অনুরক্ত। তাই খস্রুর রাজ্য লাভ সমর্থন কল্পে একটা প্রকাণ্ড দরবার গঠিত হইয়াছে। আর এই দরবার নেতৃগণের মধ্যে দুইজনের স্থান অতি উচ্চ। যে রাজা মানসিংহ বাঙ্গলা, গুজরাট প্রভৃতি বিবিধ স্থান জয়ে আকবরের প্রধান সেনাপতি ও সহায়, যাহার বুদ্ধি কৌশলে তিনি অনেক সময় জটিল রাজ কার্য্যের সমস্যা করিয়া থাকেন, যাহার অধীনে বহু সংখ্যক সেনা, তিনিই খস্রুর মাতুল, তিনি নেতৃবৃন্দের অন্যতম। আবার প্রধান সেনাপতি আজিজ খস্রুর হস্তে তাহার কন্যা সমর্পন করিয়াছেন। তিনিই নেতৃবৃন্দের একজন। সেলিমের বিরাগ, আকবরের স্নেহ ও প্রবল আত্মীয় বৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় খস্রুরও রাজ্য লাভ লালসা বলবতী করিয়া তুলিতে লাগিল। আবশ্যক হইলে প্রকাশ্য ভাবে পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

১৬০৫ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাস পড়িয়াছে। পুত্রগণের ও বন্ধুগণের শোকে আকবরের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মঠ বীর আকবর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষুধার উদ্রেক মোটেই হয় না। সকলই বুঝিতে পারিলেন এই শয্যাই তাহার অন্তিম শয্যা হইবে। আকবরের নিজেরও তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তাই সিংহাসন কাড়াকাড়ির অভিনয়ের সূচনা হইল। আজ খস্রুর দল বড় প্রবল। মানসিংহ ও আজিজের অধীন বহুসংখ্যক সেনা ও আমীর ওমরাহ খস্রুকে সিংহাসনে বসাইতে বদ্ধ পরিকর। রাজপ্রাসাদ ও রাজকোষে তাহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। যুবরাজ সেলিম ভয় চকিত। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে, মুমূর্ষু পিতার শয্যা প্রান্তে যাইতে তাহার সাহস হইতেছে না। ভয় হইতেছে পাছে খস্রু পক্ষাবলম্বী সৈন্যগণ তাহাকে

আবদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহার সমর্থনকারী ব্যক্তি বৃন্দ অপেক্ষা কৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বাদসাহ আকবর পুনঃ পুনঃ সেলিমকে ডাকিয়া পাঠাইতেছেন কিন্তু সেলিম নিজের অসুস্থতার ভাণ করিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেছেন। বিচক্ষণ বাদসাহের সেলিমের অনুপস্থিতির প্রকৃত কারণ বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিমকেই তিনি উত্তরাধিকারী করিয়া যাইবেন—ইহার সুস্পষ্ট আভাস দিতে লাগিলেন। তখন খসরু পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিবৃন্দের চমক ভাঙ্গিল। তাহারা মনে করিতে ছিলেন বাদসাহ খসরুর প্রতিই অধিকতর অনুরক্ত এখন দেখিতে পাই-লেন তাহা নয়। এদিকে সেলিমের পক্ষও সবল ও পুষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। আজিজ নানা দিক দেখিয়া এবং সেলিমের অনুনয়ে আকৃষ্ট হইয়া সেলিমের দিকেই গড়িয়া পড়িবার উদ্যোগ করিলেন। মানসিংহও অগত্যা তাহাই করিলেন। পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়া পিতার পক্ষে অস্বাভাবিক। আবার পিতাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্ত সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে তাহা অধিকার করা ইহা আরও অস্বাভাবিক। তাহার ঈদৃশ অস্বাভাবিক দুরাশার মূল ছিন্ন হইল। আকবর আপনার শয্যা পার্শ্বে আমির ওমরাহ মৌলবীগণকে ডাকিয়া এবং সেলিমকেও ডাকিয়া সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে সেলিমকেই ভাবি উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন। ১৬০৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে তাহার জীবন দীপ নির্ব্বান হইয়া গেল। সেলিম দিল্লীর তক্তে বসিলেন। জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিলেন।

বাদসাহ জাহাঙ্গীর ভারতের সিংহাসনাসীন। খসরু তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে ভাবী উত্তরাধিকারী। আজ যদি পিতাপুত্রে সদ্ভাব থাকিত খসরুর আনন্দের সীমা কি? কিন্তু খসরুর আশা লতা ছিন্ন হইয়াছে। একেইতো পিতা পূর্ব্ব হইতেই খসরুর প্রতি বিরূপ ছিলেন। তারপর আবার সিংহাসন লাভ ব্যাপারে তাঁহার বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। পিতা পুত্রে দেখা শুনা ও বাক্যালাপ বন্ধ। খসরু অতি বিষন্ন ও ক্ষুব্ধ ভাবে জীবন কাটাইতে লাগিলেন। যদি জাহাঙ্গীর বাদসাহ পুত্রের অপরাধ ভুলিয়া যাইতেন—যদি তাহাকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব বা অন্য কোন উচ্চপদ প্রদান করিতেন বুঝিবা তাহা হইলে খসরুর এই মানসিক যাতনার কতকটা শান্তি হইত। বুঝিবা খসরু পিতার প্রতি অনুরক্ত হইতেন এবং স্বয়ংও সুখী হইতে পারিতেন এবং জাহাঙ্গীরও পুত্র স্নেহ সুখ ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না।

আকবর বাদসাহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে সেলিমকে বলিয়া গিয়াছিলেন "তুমিই আমার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী আর খসরুকে বঙ্গদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিও।" জাহাঙ্গীর পিতার এই নির্দ্দেশ স্মরণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে, বুঝিবা সব গোলযোগ মিটিয়া যাইত এবং পিতা পুত্র উভয়ের জীবন কতকটা শান্তিময় হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না।

জাহাঙ্গীর বাদসাহের সিংহাসনাধিরোহণের পর ৩।৪ মাস সময় কাটিয়া গিয়াছে। একদিন রাত্রি-যোগে জাহাঙ্গীর জানিতে পারিলেন খসরু তাহার দলবল সহ আগ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বাদসাহ অমনি তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। খসরু কিছুদূর গেলেই তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য তাহার সঙ্গে যোগদান করিল। তিনি সদল বলে দিল্লী পৌঁছিলেন তথা হইতে পঞ্জাবের দিকে ছুটিলেন। পথে তাহার সৈন্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন লাহোরে পৌঁছিলেন, তখন তাহার সৈন্য সংখ্যা ১০০০০ হইয়াছে। লাহোর নগর অধিকার করিলেন। লাহোরের দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীর স্বয়ং এক বাহিনী লইয়া খসরুর অনুসরণে বাহির হইয়াছেন। তাহার অগ্রগামী সেনাদল লাহোরে পৌঁছিয়াছে। খসরু এই সংবাদ পাইয়া দুর্গ অধিকারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাদসাহের সেনাদলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু আটিয়া

উঠিতে পারিলেন না। সসৈন্যে পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলেন। কাবুলের দিকে ছুটিলেন। সম্রাট সৈন্যও তাঁহাকে ধরিবার জন্য পেছনে পেছনে ছুটিল। খস্রু পঞ্জাবের শতদ্রু নদী পার হইলেন। নৌকাযোগে পার হইতেছেন। নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিছুতেই নামাইতে পারা যাইতেছে না। অযথা বিলম্ব হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বাদসাহের সৈন্যদল আসিয়া অনুচরবর্গ সহ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। দুরাশার বিষময় ফল আজ পূর্ণ হইল।

সাত শত অনুচর সহ খস্রু ধৃত হইয়াছেন। লাহোরের তোরণ দ্বারে সাত শত শূল প্রোথিত হইয়াছে। সাত শত অনুচরকে সেই সাত শত শূলে আবদ্ধ করা হইল। হতভাগ্য ব্যক্তিগণ দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করিয়া জীবন লীলা সাঙ্গ করিল। আর খস্রুকে একটী হস্তীপৃষ্ঠে করিয়া উক্ত অনুচরবর্গের সম্মুখ দিয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করান হইল। একজন বর্ম্মধারী ভৃত্য অনুচরবর্গের তীব্র যাতনাজনিত আর্ত্তনাদ ও অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল "কুমার আপনার সাধের অনুচরবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন"। খস্রুর অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। রোষ ও ক্ষোভের প্রবাহ ছুটিল। অনশনাবস্থায় কেবল অশ্রু বিসর্জ্জনে তিন রাত্রি কাটাইলেন। এই শোচনীয় ও লোমহর্ষণ দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে যে দাগ দিয়া গেল তাহা আর সারাজীবনে মিলিল না। তিনি আজীবন বন্দী হইলেন।

খস্রুর জীবনে আর ঘটনা বৈচিত্র্য নাই, আশার উত্তাল তরঙ্গ নাই। ইহা এখন অবাত বিক্ষোভিত স্রোতোহীন সরোবর সদৃশ। কারাগারই এখন তাঁহার পক্ষে জগৎ। রাজধানীতে কোথায় কি ঘটিতেছে, কোন স্থান হইতে কাহারা আসা যাওয়া করিতেছেন, কিছুই জানেন না। হতাশামূলক একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব তাঁহার বদনে সর্ব্বদা লাগিয়া আছে, অশন, শয়ন ও রক্ষিগণ সহ সামান্য ভ্রমণেই তাঁহার দৈনন্দিন জীবন কাটিয়া যাইতেছে। কর্ম্মকোলাহলময় সংসারের বাহিরে নির্জ্জনে অবসাদ পূর্ণ যে শান্তিটুকু এইরূপে ভোগ করিতে লাগিলেন তাহাও আর বেশীদিন স্থায়ী হইল না।

১৬২১ খৃঃ অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর শৈলাবাস সুখ সম্ভোগ করিতেছেন—তখন সময় সংবাদ পাইলেন। দাক্ষিণাত্যে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। মালীকআম্বার আবার বিপুল বিক্রমে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিতেছে। রাজকুমার খরম ইতি পূর্ব্বেই শৌর্য্যবীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে ইতি পূর্ব্বেই তিনি একবার যশস্বী হইয়া আসিয়াছেন। তাই বাদসাহ খরমকেই আবার দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি বিপুল বাহিনী সহ দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যাত্রা করিবার পূর্ব্বে হতভাগ্য আজীবন বন্দী খস্রুকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া রাজকুমার খস্রুকে চাহিলেন তাহা কে বলিবে? একটী রাজবন্দীকে সঙ্গে রাখিয়া কি তাঁহার যুদ্ধের কিছু সাহায্য হইবে? তাহা তো কখনই সম্ভবপর নয়। সম্রাটের স্বাস্থ্য ভাল নয়। খস্রু বন্দী হইলেও সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাজাহান রাজধানী হইতে বহুদূরে দাক্ষিণাত্যে সরিয়া পড়িতেছেন। সহসা সম্রাটের পরলোক প্রাপ্তি হইলে কি জানি পাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র চিরবন্দী খস্রুর ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগিয়া বসে। কি জানি পাছে সাজাহানের সিংহাসন প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটে। বুঝিবা এই সমুদয় বিবেচনা করিয়াই সাজাহান খস্রুকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। বন্দী খস্রু বন্দীভাবেই দাক্ষিণাত্যে চলিলেন।

উক্ত বর্ষের শেষভাগে জাহাঙ্গীর বাদসাহের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। কতিপয় বর্ষ যাবৎ তিনি মাঝে মাঝে শ্বাসকাসে ভুগিতেছিলেন। এইবার আক্রমণটা একটু তীব্র রকমের হইল। অনেকেই তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করিতে লাগিল। সৌভাগ্য ফলে বাদসাহ কয়েকদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু রাজ্য লালসার এমনই ক্ষমতা যে রাজকুমারগণ শকুনি গৃধিনী হইতেও ঘোরতর ও জঘন্যতর ভাবে রাজা না মরিতেই রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া পারভিজ কার্য্যস্থল ছাড়িয়া রাজধানীতে ছুটিয়া আসিলেন; আসিয়া

দেখিলেন—সম্রাট আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তখন সম্রাটের তিরস্কারে আবার কার্য্যস্থলে গমন করিলেন। সাজাহান সুদূর দাক্ষিণাত্যে বসিয়া রাজার অসুখের সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সহসা দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া আসা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ চিরাকাঙ্ক্ষিত রাজ্য লাভ আশা পাছে বা বিফল হইয়া যায়—এই ভয়ে তিনি সশঙ্ক। সম্রাটের আরোগ্য সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইতেছে। তাই তিনি মনে করিতেছেন রাজসিংহাসন অচিরেই শূন্য হইবে। এমন সময় একদিন সাজাহানের শিবির হইতে সংবাদ প্রচারিত হইল, শ্বশুর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। পিতামহের আদরে ও স্নেহে যে জীবনের সূচনা হইয়াছিল—আজ বন্দীভাবে বহুকাল বাস করিবার পর পিতৃসিংহাসন লিপ্সু কনিষ্ঠ ভ্রাতার করকবলিত হইবার পর সহসা সেই অবসন্ন জীবন দীপটুকু নিবিয়া গেল। জীবনদীপটুকুকে কি রাক্ষসী রাজ্য লোভ লালসা ফু দিয়া নিবাইয়া দিল—না তৈল বিহনে আপনিই নিবিয়া গেল কে বলিবে?

শ্রীকুঞ্জবিহারী হোর।

বিদায়।

(L.G.Moberly)

বিদায়ের কালে তিনটি মিনতি
        জানাই তোমারে হেপ্রিয় মোর ;—
প্রতি দিবসের বিদায়ের ক্ষণে
        মোরে স্মরি ফেলো একটু লোর।
তব হৃদয়ের এক্টী কোণায়
        মোর স্মৃতি যেন পায়গো ঠাঁই ;
আরাধনা কালে, আমার লাগিয়া
        একটু করুণা যাচিও তাই।
যাই তবে যাই সকলু ছাড়িয়া
        শান্ত শীতল ভুবনে যাই,
প্রণয়ের ডোর ছিন্ন করিতে
        মৃত্যুর ছায়া যে দেশে নাই।

* * *

তোমার বারতা স্বর্গ পরীরা
        বহিয়া আনিবে আমার দেশে,
মোর হৃদয়ের গোপন কথাটি
        পবন তোমারে জানাবে এসে।
অমৃতের দেশে মিলিব আবার,
        এযে ওগো চির সত্য-বাণী,—
প্রণয় আমার চুম্বক সম
        মোর পাশে তোমা আনিবে টানি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।
"বান্ধব-কুটীর" :—ঢাকা।

অদ্ভুত স্বপ্ন।

গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। বন্ধুগৃহে গুরুভোজনের পর আরাম কেদারায় আসীন হইয়া বাঁধান মাসিকের পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিলাম। একটি প্রবন্ধ মধ্যে এই কয়টি কথা নেত্রগোচর হইল:—"আজকের দিনে কল্‌কাতার রাজপথে সাহিত্যের মহারথী আকাশে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন—সমস্ত বাংলাদেশ সেইদিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে।" কল্পনায় এই দৃশ্যটি আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল—মনও বাস্তবরাজ্যের বাহিরে বিচরণের প্রয়াস পাইতে লাগিল।

* * * * * *

তারপর, চট্টগ্রাম হইতে অপর এক বন্ধুর আহ্বান পত্র হস্তে আসিয়া পড়িল। তখন, বিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ। পাশ্চাত্য বণিক্ সম্প্রদায়ের আন্দোলনের ফলে অখণ্ড বঙ্গদেশের রাজধানী সে সময় কলিকাতা ছাড়িয়া চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের প্রধান নগরগুলির মধ্যে তখন ব্যোমযান চলাচলের প্রতিবিধি সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। বন্ধুবরের পত্রে তারপরদিন অপরাহ্নে চট্টগ্রামে যে এক বিশিষ্ট সাহিত্য সম্মেলন বসিবে তাহাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহূত হইয়া

ছিলাম; বলা বাহুল্য, সে দিনকার মধ্যাহ্ন ভোজনটা তাঁহারই বাড়ীতে সম্পন্ন করার এক বিশেষ অনুরোধও ছিল। সাহিত্যে ধুরন্ধর না হইলেও—সম্মিলনের আনুষঙ্গিক দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে আমি সর্ব্বদাই পরিতোষ লাভ করিতাম; এ জন্য, সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিতিতে আমার বড় একটা বাদ পড়িত না। এবারে, যে বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইলাম তাঁহার ভোজ্যোৎকর্ষের খ্যাতিও বহু বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এ হেন আহ্বান উপেক্ষিত হইল না। প্রাতঃকালে চা-পানের পর ব্যোমযানের আরোহী হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় বন্ধুবরের চট্টলস্থ প্রাসাদে অবতীর্ণ হইলাম। তথায় আহারাদি ব্যাপার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইলে ক্ষণকাল বিশ্রম্ভালাপের পর বন্ধুবরের মোটর গাড়ীতে চড়িয়া বেলা অনুমান তিন ঘটিকার সময় সাহিত্য সম্মেলনের সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। এক পাহাড়ের উপরের সমতলক্ষেত্রে মণ্ডপটি স্থাপিত হইয়াছে; ক্ষেত্রের তিনদিকে নানাবৃক্ষরাজি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়া সভাস্থলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে,—উহার অন্যদিক্ হইতে প্রশস্ত, বিস্তৃত সোপানাবলী তলদেশস্থ রাজপথ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়াছে। সভাস্থলে বসিবার জন্য যে বহু সহস্র কাষ্ঠাসন স্থাপিত ছিল—আমাদের যাওয়ার পূর্ব্বেই তাহার অধিকাংশ অধিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার বন্ধুবর সভার কার্য্যকারী সমিতির একজন সদস্য ছিলেন বলিয়া—কোনও প্রকারে উভয়ের জন্য আসন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন। তারপর, সুখাসীন হইয়া তাঁহার নিকট সভার উদ্দেশ্যাদি অবগত হইতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন—"বহু বৎসর অতীত হইল—চট্টগ্রামে বঙ্গদেশের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে; ক্রমে এই প্রসিদ্ধনগরে প্রধান বিচারালয়, শিক্ষাগার, বাণিজ্য-বিপনী প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু এতদিনেও এ অঞ্চলের ভাষার প্রাধান্য সমগ্র দেশবাসীগণ স্বীকার করিতেছেন না; এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণের জন্যই অদ্যকার সভা আহূত হইয়াছে। এই সভায় পুরাকালের প্রথা অনুযায়ী বহু বক্তার বক্তৃতা বা নির্দ্ধারণ উপস্থাপিত হইবে না। চট্টল নিবাসী জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর উরগেন্দ্রমোহন শর্ম্মা সাহিত্য-বাদ্শাহ মহাশয় সভায় উদ্দেশ্যজ্ঞাপন এবং নির্দ্ধারণাদি নিজ সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিবেন।" দেশপূজ্য উরগেন্দ্রমোহন বৎসরের অধিকাংশকাল পাশ্চাত্যদেশে অবস্থান করায়—আমার এ তাবৎ তাঁহার দর্শনলাভের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এখন বন্ধুবরকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন—"এখন পর্য্যন্ত পণ্ডিতবর সমাগত হয়েন নাই; উপযুক্ত সময়ে সানুচর রথারূঢ় হইয়া তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইবে।"

ক্ষণকাল পর "ঐ আসিতেছেন" বলিয়া সভাক্ষেত্র হইতে এক ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন সোৎসুকনেত্রে রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে বহু পুরাকালের পরিচিত আকৃতিবিশিষ্ট একখানি রথ ত্বরিৎগতি ব্যোমযান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দ্রুতগতিতে সম্মিলন স্থলে উপস্থিত হইতেছে। রথের বিচিত্রসজ্জা দেখিয়া আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। রথের শীর্ষদেশে কৌশেয় বস্ত্র নির্ম্মিত প্রকাণ্ড এক ধ্বজা,—তাহাতে রজতাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "চলিত বাবা"; রথের প্রত্যেক চক্রের সহিত ভাষাজননীর এক একখানি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি সুদৃঢ় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে; রথের চলতিতে মূর্ত্তিগুলি রাজপথের কঙ্কর মৃত্তিকায় ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। সৌম্যমূর্ত্তি পণ্ডিতবরের দক্ষিণে ও বামে দুইজন সুদর্শন সহচর রহিয়াছেন,—আমার বন্ধু বলিয়া দিলেন একজন "কচিপাতা"র ও অন্যব্যক্তি "বাগ্দেবী"র সম্পাদক। সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিতবর সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন; তাঁহার পারিষদ দুইজন তাঁহার দক্ষিণে ও বামে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ আসনোত্থিত ব্যক্তিবর্গ পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলে—তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে নিজ বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বক্তৃতা চট্টলের মহাপ্রাণ চলতভাষায় প্রকাশিত হইল; আমার ঐ ভাষা এখনও আয়ত্ত না হওয়ায় উহার সারাংশ নির্জীব পুরাকালের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইতেছে। সাহিত্যবাদ্শাহ মহাশয় বলিলেন:—

"আপনারা বোধ হয় জানেন যে আমি ও আমার নিকট আত্মীয়, পাশের বন্ধু দুইজন, রাজধানীর চলিত ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র এবং কোর্ট কাছারীর দলিল, দস্তাবেজ, মুসাবিদাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য একমাত্র আইনসঙ্গত ভাষা বলিয়া প্রচলিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। কিন্তু, এদেশের দুর্ভাগ্য এই যে সকল মহৎকর্ম্মেই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ বাধা প্রদান করে। এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ কর্ম্মনাশা লোক জুটিয়াছে। তাহাদের যুক্তি, তর্ক অদ্ভুত রকমের। তাহারা বলে—তর্কের বিষয়ীভূত চলিত ভাষা কি তাহা এখন পর্য্যন্তও সুস্থিররূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এবং উহা সকল জেলার লোকের পক্ষে আয়ত্ত করাও সম্ভবপর হইবেনা। এই ভ্রান্তিপূর্ণ তর্কের উত্তর এইযে—আমরা কয়জন যে ভাষা কিছুকাল যাবৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি—তাহাই সকলে অনায়াসে আদর্শ মানিয়া চলিতে পারে; আবশ্যক বোধ করিলে—আমরা চলিত ভাষার একখানি লিখিত অভিধান প্রণয়ন করিয়া সকল সাহিত্যসেবীর অবাধ লেখার সুবিধা করিয়া দিতে পারি। আর, চট্টগ্রামের ভাষা আয়ত্ত করা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশী ভাষাও এদেশের লোক আয়ত্ত করিয়াছে; পুরাতত্ত্ব ঘাঁটিলে দেখিতে পাইবেন—কলিকাতা নগরীতে যখন রাজধানী ছিল তখন ঐ অঞ্চলের ভাষাও ভদ্র সাধারণের আয়ত্ত হইয়াছিল,—এখন কি উহা লিখিত ভাষায় ব্যবহার না করিলে লেখককে "ভারি", "পাঁকা", "অচল" প্রভৃতি অপভাষার বিশেষণে বিভূষিত হইতে হইত। কলিকাতা অঞ্চলের মিহি, নিস্তেজ ভাষা যদি কোনও কালে বঙ্গসাহিত্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে—তবে চট্টগ্রামের গম্ভীর বীরত্বব্যঞ্জক ভাষা যে জনসাহিত্যের জন্ত অধিকতর যোগ্য হইবে সে সম্বন্ধে বাক্‌বাহুল্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। আবার কেউ আপত্তি করেন যে "আপনার সখের ভাষা গতিশীল, স্বাভাবিক এবং ভবিষ্যতের পন্থানির্দ্দেশি তাহার প্রমাণ কি!" এ সকল আপত্তি খণ্ডনের জন্ত যুক্তি প্রয়োগ করিতেও লজ্জা বোধ হয়; যাহা হউক, আপত্তি যখন উত্থাপিত হইয়াছে তখন তাহা যুক্তিদ্বারা কাটাইতেই হইবে। পুরাতন সাহিত্যের ভাষা ব্যাকরণের নিয়মে, অভিধানের গণ্ডীতে এখনও আবদ্ধ রহিয়াছে, আর চট্টলের আধুনিক ভাষা মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছে; প্রথমোক্ত ভাষা আবদ্ধ, কাজেই অচল শেষোক্তটির রূপ এখনও কোনও পুঁথিতে ধরা পড়ে নাই,—কাজেই উহা উদ্দামগতিতে দেশকে চমকাইয়া চলিতে পারে। চট্টগ্রামের ভাষা প্রয়োগে যে নিপুণ—সে যে প্রকারেই যে শব্দের বাণান, অর্থাদি প্রয়োগ করুক না কেন তাহাকে কাহারও নিকট জবাবদিহি হইতে হইবে না। এহেন উচ্ছৃঙ্খল ভাষাকে কাঁচা, সবল, জীবন্ত, প্রাণবন্ত বলিতে কোনও মূর্খেরও আপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। কোনও জ্ঞান কর্ম্ম বিবর্জ্জিত বক্তা এখনও বলিয়া থাকে যে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—এই নীতি অনুসরণ করিয়া আমরা অধিকাংশ প্রধান লেখক যেরূপ রচনা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন তাহাকেই দেশের চলিত মনে করিয়া তাহারই অনুকরণ করিব।" কেহ আবার বলে যে "সূর্য্যেও কলঙ্ক আছে, সেই কলঙ্ককে জ্যোতিঃ বলিয়া মানিয়া লইব কেন?" মূর্খদের এই জ্ঞানটুকু হয়না যে আমাদের বরেণ্য আর্য্যাগ্রান চিরকাল ত্রিমূর্ত্তির উপাসক তিনগুণের পরিপোষক; আমাদের তিনজনের বাহিরে অন্য আদর্শ অন্বেষণ করা সনাতন আর্য্যপ্রথার বিরোধী হইবে। তাহাদের আরও জানা উচিত যে দেবকলঙ্ক লীলাজ্ঞানে এদেশে পূজিত হয়—পরিত্যক্ত হয় না। আমাদের মোট কথা এই যে আমি ও আমার আত্মীয় দুইজন যে মত প্রকাশ করিব তাহাই দেশমান্য হইবে; আমাদের মতের বিরুদ্ধে যে নির্ব্বোধ মত প্রকাশ করিবে—যুক্তিদ্বারা তাহার মত খণ্ডন বা ভদ্রভাবে তাহার মতের আলোচনা করা একেবারেই আবশ্যক হইবে না—মাত্র কবির খেউড় গাহিয়াই সেই হতভাগ্যকে সাহিত্যের আসর হইতে নামাইয়া দেওয়া হইবে। যদিও আমাদের মধ্যে কেহ কেহ লঘু প্রবন্ধাদি ব্যতীত অন্য প্রকার জ্ঞানগুরু বিষয়ের রচনা জীবনেও করে নাই—তবুও আমাদের পরিবারভুক্ত অনেকের মতে—আমরা কয়-

জন্যই এদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হীন সাহিত্যগুরু। আমাদের মত যতই অযৌক্তিক, চপল বা সঙ্কীর্ণ হউক না কেন আমাদের রচনা দেশের অল্পলোকে যতই অচল বলিয়া মনে করুক না কেন—উহা যে সকলকে মানিয়া, পূজা করিয়া গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে কাহারও অর্থাৎ আমাদের তিনজনের কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। অতএব, আমার প্রস্তাব এই যে অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সকল লোক চট্টগ্রামের জীবন্ত চলিত ভাষায় আমাদের যথাসাধ্য অনুকরণে সর্ব্ববিধ রচনা লিপিবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হউন; এবং সরকার বাহাদুর যে ইহার বিপরীত আচরণ করিবে—এমন কি ইহার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবে—সে মহারাজা, রাজা প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইলে তাহার খেতাব কাড়িয়া লউন—অন্য সাধারণ লোক হইলে তাহাকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে অবরুদ্ধ করুন।" প্রস্তাবটি উপস্থিত করামাত্র—সাহিত্য-বাদশাহ মহাশয়ের পার্শ্বচর দুইজন, হাত উঠাইয়া, কলরবের সহিত উহা সমর্থন করিলেন—কিন্তু সভাস্থলের অধিকাংশ শ্রোতাই আমার ন্যায় সবিস্ময়ে স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। তখন সাহিত্য-বাদশাহ মহাশয় উঠিয়া বলিলেন—"প্রস্তাবটি আমি স্বয়ং উপস্থিত করিয়াছি এবং আমার আত্মীয় দুইজন সমর্থন করিয়াছেন—অতএব উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া ধরিতে হইবে। অতঃপর সভা ভঙ্গ হউক।"

* * * * * *

বন্ধুকে সভার প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রশ্ন করিব এইরূপ মনে করিতেই হঠাৎ ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষু মেলিয়া গেল। তন্দ্রাভঙ্গে দেখিতে পাইলাম—আমি বন্ধুগৃহে আরামকেদারায়ই শুইয়া আছি;—বাঁধান মাসিক পত্রিকাখানি আমার হস্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি অবাক্ হইয়া আমার অদ্ভুত স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

শ্রীহংসরাজ দেববর্ম্মা।

"তোড়া"।

জীবনের সুমধুর প্রথম ঊষায়
তরুণ উজল রবি, মধুর পাখীর গান,
ধরার শ্যামল ছবি, করেনিক মধু দান;
নয়ন মেলিয়া আগে
সকলের পুরোভাগে
দেখি মোরা স্নেহময়ী জননী তোমায়,
জীবনের সুমধুর মোহন ঊষায়।

নবরূপে নবভাবে আস তার পরে,—
চপল বালক রূপে খেলা ধূলামাঝে কত
করি মোরা বারে বারে অপরাধ শত শত,
সে সব না গায়ে তুলি
মুছাইয়া দাও ধূলি,
স্নেহভরে চুমি, 'বোন্, লহ বক্ষ' পরে;
বিমল সে ভালবাসা উজলি' অন্তরে।

তারপর যৌবনের মধুর আলোকে
নূতন মূরতি ধরে' দাঁড়াও সমুখে আসি;
বরিষ মোদের'পরে তব প্রেম-সুধারাশি,
শ্রান্ত মনে ক্লান্ত কায়ে
আসি তব প্রেম-ছায়ে
সঞ্জীবিত হয় হিয়া বিপুল-পুলকে;
প্রিয়া-প্রেম-পরশন অতুল ভূলোকে।

বার্দ্ধক্যের কালোছায়া আসে যবে ধীরে
ভাঙ্গিয়া পড়ে সে দেহ যৌবনের সুখ-ধাম
লয়ে আস ভক্তি স্নেহ, বিধাতার প্রিয়দান!
ব্যথিত দেহের পর
বুলাইয়া তব কর
স্নেহময়ী কন্যারূপে সেব প্রাণ ভরে,
জুড়ায় আধেক ব্যথা তব স্নেহ নীরে
নানারূপে নানাভাবে সেব নানা জনে,
চেয়ে দেখি, দেখি মোরা বিস্মিত-নয়নে।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

ছবি

পূজার ছুটি। চট্টলের পথে মেঘনার বুকে কলের তরী জল চিড়িয়া ধুপ্ ধাপ্ রবে পথ ছাড়াইয়া যাইতেছিল। তাহাদের পাখার আঘাতে জলগুলা গুঁড়া হইয়া যেমন লাফাইয়া উঠিতেছিল তেমনি শেষবেলার সিঁদুরে সূর্য্যের লাল রশ্মি পাতে রঞ্জিত হইয়া তুমড়ি বাজির ফুলঝুরির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহারই দিকে তাকাইয়া একজন আরোহী রেলিং এর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল; টোপর আকারের টুপিখেরা ময়লা মার্কিনের পাগড়ী মাথায় থাকিলে বুলি না শুনিয়া হয়ত কাবুলী বলিয়া মনে করিতাম। তেমনি লম্বা দাঁড়ি গোঁফ, তেমনি ঢোলা ময়লা জামাজোড়া। পাশে যাইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা যাবেন আপনি? ভদ্রলোক বাহিরের দিক হইতে চোখ দুইটা তুলিয়া লইয়া আমার দিকে এমনি ভাবে চাহিয়া রহিলেন যেন কিছু বুঝিতেই পারেন নাই। ভাবিলাম হয়ত তিনি বাঙ্গালী নন। পরখ করিবার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আমার মুখের কথা বাহির না হইতেই পরিষ্কার খাঁটি বাঙ্গালা ভাষাতেই আমার কথার জবাব দিলেন। তিনি চিত্রকর সরঞ্জাম সব সঙ্গে; যেখান থেকে কাজের ডাক আসে সেখানেই হাজির হন। বেশ ভদ্রলোক; অমায়িক ব্যবহার। কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া একটু ভাব জমিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি চিত্রশিল্পী; নমুনা সঙ্গে আছে?

নমুনা? হ্যাঁ আছে বটে। কিন্তু সে খানা দিয়েই যে হাতে খড়ি। কাঁচা।

'তাহাকে' আমি ধরিয়া বসিলাম দেখিব। ভদ্রলোক যেন বড় অনিচ্ছায়ই চামড়ার ব্যাগটি খুলিয়া সবুজ রেশমী চওড়া ফিতা মোড়া একখানি চিত্রপট বাহির করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ফিতার পেঁচ খুলিয়া অতি যত্নের সহিত আমার হাতে দিলেন।

ছবি দেখিলাম। দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যই হইলাম। ছবিখানি যদি র‍্যাফেল বা রবিবর্ম্মার হাতের হইত, তবে বোধ হয় বিস্ময়ের কোন কারণ হইত না; কিন্তু এক অজ্ঞাতনামা শিল্পীর সর্ব্বপ্রথমকার চিত্রখানিতে যে এমন প্রাণময় ভাবের বিকাশ, এমন সরল সজীবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে এতে একটু আশ্চর্য্যই হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম—একি আইডিয়াল, না সত্যিকার মানুষ? মানুষ হ'লে, কে? একটু ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন—মানুষের মতনও আইডিয়াল হয়, আবার আইডিয়ালের মতনও মানুষ হতে দেখা যায়। মানুষও হতে পারে আইডিয়াল ও হতে পারে এতে বিশেষ এমন কি আর আছে।

আমি নাছোড়বান্দা। পরিষ্কার জবাব চাই। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকার পর বড় জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন—তবে শুনুন। জন্মিবার কাল হইতেই মানুষের ভিতর আর একটি মানুষ ঘুমাইয়া থাকে। শব্দগন্ধ রূপরসাদির স্পর্শ অনুভূতির সাড়া পাইয়া সে যখন পাশমোড়া দিয়া জাগিয়া উঠে, বাইরের মানুষটির চোখে তখন বহির্জগৎ নূতন হইয়া দেখা দেয়। কৈশোর যৌবনের সন্ধে, জীবন বসন্তের উষালোকে তাই বুঝি এই মনের আসল মানুষটি একদিন অভিনব বেশে দেখা দিয়াছিল।

ছেলেবেলা হইতেই সকালে বিকালে যখন তখন কত খেলা এক সঙ্গে খেলিয়াছি; কত শারদ প্রভাতে রাশি রাশি শিশিরভিজা শিউলিফুল কুড়াইয়া দুইজনে মালা গাঁথিয়া স্তূপ করিয়াছি; তারপর সবগুলি মালা নিজহাতে লইয়া দুষ্টামি করিয়া বলিয়াছি—"এই বিভা তুই আমায় বিয়ে করবি।" শিউলির বোটার মত ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া রাগ করিয়া সে বলিত—"যাঃ, কটা বিড়াল। রাগ করিলে সে আমাকে বীরেন না বলিয়া বিড়াল, 'কটা বিড়াল' বলিয়া ডাকিত। মালাগুলি ছিঁড়িতে উদ্যত হইয়া আমি বলিতাম—বল বিয়ে করবি কিনা নইলে দিচ্ছি এসব ছিঁড়ে খুড়ে। মালার লোভে দায় পড়িয়া সে সম্মতি জানাইত। আমিও অমনি তাহার হাতে পায়ে গলায়, মাথায় খোপায় একে একে সবগুলি মালা পরাইয়া দিয়া তাহাকে ফুলরাণী সাজাইয়া দিতাম।

সময় সময় আরও দুই একটি ছেলে মেয়ে আমাদের সঙ্গে খেলিতে জুটিত। সবার চাইতে বিরক্ত করিয়া আমিই তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতাম কাঁদিয়া রাগিয়া সে আমাকে গালি দিত বটে, কিন্তু আমার কাছটি ছাড়া সে কখনও হইত না। আমাদের বাড়ীর পিছনের বাগান হইতে বৈশাখে কাঁচা আম পেয়ারার দিনে পেয়ারা পাড়িয়া তাহার আঁচল বোঝাই করিয়া দিতাম। শুধু কি অমনি দিতাম। সে আমাকে বিবাহ করিবে এই কথাটি আগে বলাইয়া লইতাম। একদিন মনে আছে আমি গাছ হইতে পেয়ারা ছিঁড়িয়া নীচে ফেলিতেছি, বিভা তাহা কুড়াইয়া আঁচলে লইতেছে; এর মধ্যে আর একটি ছেলে গাছ হইতে একটি পেয়ারা ভাঙ্গিয়া তাহার আঁচলে কুড়ান ফলগুলির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—এটিও ওর মধ্যে রাখ্ ত বিভা। বিভা মুখখানা ভার করিয়া সমস্তগুলি পেয়ারা বাগানময় ছড়াইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। সে আমার এমনি পক্ষপাতী, এমনি বাধ্য ছিল।

দুখের দিনে মানুষের সুখের স্মৃতিগুলি বেশী করিয়া দুখ দেয়।

(২)

শীতকালের মধ্যাহ্ন। স্নান করিয়া চুল শুকাইবার জন্য বিভা আসিয়া তাহাদের ছাদে বসিয়াছিল। সরু রাস্তার এপারে আমাদের বাড়ী ওপারে তাহাদের। এক রাশি কাল চুলের মাঝখানে তাহার সদ্যস্নাত মুখখানি নীল সরোবরে পদ্মটির মত টলমল করিতেছিল। কতবার ঐ চুলের খোপার ফুল পরাইয়া দিয়াছি, কত-শতবার 'চোখে কি গেল' দেখিতে যাইয়া ঐ মুখ, ঐ গণ্ড, ঐ চিবুক স্পর্শ করিয়াছি, তবু আজ যেন হঠাৎ চক্ষু ফিরিল না। অনুপল বিপল পল—না দণ্ড গেল। দুই হাতে জানালার দুই গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছি, দেখা আর হয় না।

চুল শুকান হল, বিভা, বলিতে বলিতে তাহার মা ছাদে আসিতেই নজর পড়িল আমাদের বাড়ীর দিকে। তিনি আরও কি বলিতে গিয়া থামিয়া একটু জোরেই বলিলেন—উঠ, চল, খাবি কখন? চুল শুকান আর হয় না! লজ্জায় আমার সমস্ত শরীরের রক্ত হিম্ হইয়া যাইতেছিল। এমনি দারুণ লজ্জায় পড়িয়াই বুঝি লোকে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়।

স্নেহ ভালবাসার ভিতর, অন্যায় অপকারটা বড়ই বিশ্রী, বড়ই বিকট মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

বিভার মা যদি আমাকে ডাকিয়া নিজ হাতে এ অন্যায়ের শাস্তি দিতেন, তবে হয়ত একটু স্বস্তি পাইতাম। তা ত হইল না। তাহাদের বাড়ীর দিক হইতে একটা নীরব তিরস্কার ভাসিয়া আসিয়া তিল তিল করিয়া আমার বুকের রক্ত শুষিয়া লইতে লাগিল। কিন্তু বলিতে কি, লজ্জার চাবুক খাইয়াও নেশা ছুটিল না বরং সজাগ হইয়া উঠিল; কেমন যেন কি রকম মিঠাবিষে সমস্তটা প্রাণ ছাইয়া গেল। বিভারা যে আর একজাতি, এ কথাটা আজন্ম জানি. কিন্তু সেই কথাটাই বার বার মনে উঠিয়া বুকের ভিতর হুল ফুটাইয়া দিতে লাগিল। পড়িতে বসিলে বইএর অক্ষরগুলা হিজিবিজি পাকাইয়া সাদা কাপড়ে ঢাকা পিঠের উপর কাল চুলের গোছার মত ছড়াইয়া যাইত। হাস্‌ছেন। কথাটা হাসির বটে কিন্তু ব্যথা পাইয়াছি কাঁদিবার মতন।

অপরাধীর বিচার না করাই তার বড় শাস্তি। কিছু না বলিয়া, একদিন দেখি বিভা আমার কএকখানা বই, আরও দুএকটি খুঁটিনাটি জিনিষ চাকরের হাতে পাঠাইয়া দিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—কে, দিলেরে?

—মা।

—কিছু বল্লেন?

—না। বল্লেন, দিয়ে আয়। বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। বলিলাম—দাঁড়া। কিন্তু মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না, বইর খবর বিভা জানে? সে কিছু বলেছে? তাহাকে বলিলাম—আচ্ছা যা।

নাঃ, জোর করিয়া মনের রাগ দূর করিতে যাইয়া জ্বালার সঙ্গে বেশ একটু ধস্তাধস্তি হইয়া গেল। সেই দিনই মনের সবল ও সুস্থ অবস্থাতেই ইচ্ছা হইল বিভার একখানা আলেখ্য তুলিয়া রাখিব। শিল্প ও সঙ্গীতের জন্য আমাদের আলাদা শিক্ষক ছিল। বাবা

বলিতেন শিল্প ও সঙ্গীতের একটু 'টেষ্ট' না দিলে ছেলে-মেয়েদের রঞ্জিনীবৃত্তির স্ফূর্ত্তি পায় না। রং, তুলি ও পট লইয়া ছবি আঁকিতে বসিলাম। কিন্তু তাহার 'সিটিং' পাইব কিরূপে? সে পথে ত কাঁটা পুতিয়া রাখিয়াছি আমিই নিজে! এক উপায় ছিল! ইডেনের অতবড় গাড়ীটা বিভাদের বাড়ীর ঠিক সামনে যাইত না। কাজেই তাহাকে একটু হাটিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইত, আবার গাড়ী হইতে নামিয়া হাটিয়া বাড়ী যাইতে হইত। ইডেনের গাড়ীর গুম্ গুম্ আওয়াজে মাথায় টনক পড়িত; অমনি তুলি হাতে জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া চাহিয়া থাকিতাম। আতসী কাঁচে কেন্দ্রীভূত সূর্য্যরশ্মির মত সমস্ত একাগ্রতা দৃষ্টিতে লইয়া হাটিয়া যাইবার কালে তাহার এক একটি অঙ্গ এক একটি প্রত্যঙ্গ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া মনের ভিতর প্রতিবিম্ব ফেলিতাম তারপর তুলির টানে তাহার যথাযথ অনুরূপ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। এমনি করিয়া এক মাসে খসড়া আঁকা শেষ করিয়া তাহাতে রং ফলাইতে বসিলাম। ছবি আঁকা যে দিন শেষ হইবে, সেদিন সমস্ত জানালাগুলি দিয়া তুলির ডগায় প্রাণটি লইয়া তন্ময় হইয়া তুলি চালনা করিতেছি। বিভাদের ছাদ হইতে খোলা জানালা দিয়া দুইটি বিস্ফারিত লোচনের স্নিগ্ধ অচঞ্চল কৌতূহলময় দৃষ্টি যে আমার ক্ষুদ্র ঘরখানির ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। আলেখ্য সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দৃষ্টি পড়িল বিভাদের বাড়ীর দিকে। তখন গরমের ছুটি। দেখিলাম পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দভাবে বিভা দাঁড়াইয়া। কতদিন যে সে এমনি ভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কে জানে! মুখ ফিরাতেই সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বামগণ্ডের তিলটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তুলি হাতেই ছিল; সে তিলটি চিত্রের যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একদিন কি ভাবিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন শিল্পীর পুণ্যভূমি কাশ্মীরে থাকিয়া দশ বৎসর কলাচর্চ্চার পর অল্পদিন হইল দেশে ফিরিয়াছি।"

ছবি দেখিবার জন্য বিস্তর লোক জমিয়া গেল। ভিড়ের মধ্য হইতে ঢুকিয়া পড়িয়া এক ভদ্রলোক পেট্‌কের দৃষ্টিতে ছবিখানা দেখিতেছিলেন। একটু অবাক হইয়াই যেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কার ছবি? আমি কিছু না বলিয়া ছবিওয়ালার দিকে চাহিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—কার তাত জানি না, পথে কুড়ান। ভদ্রলোক চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন—এইত। ব্যাটা সামলাতে না পেরে পথে ফেলে গেছে। এ কেউ হজম কত্তে পারে?

সকলেই অবাক। ব্যাপার কি? তিনি বলিতে লাগিলেন—হাজারখানিক টাকা ব্যয় করে আমার স্ত্রীর ছবি তুলিয়াছিলাম, শেষেত এই, বেমালুম চুরি। যাক আপনি থানায় খবর দিয়েছেন ত। থানায় কিন্তু এজাহার আছে। আগেত ওদের আনন্দ সংবাদটা দিয়ে আসি।

এই বলিয়া ছবিখানা হাতে করিয়া তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়ে কামরার দিকে চলিয়া গেলেন।

নকল কাবুলী ভদ্রলোক, আমাকে বলিলেন—হেয়ালীর মত বোধ হচ্ছে, না? এই প্রৌঢ় স্থূলদেহ, ভদ্রলোকই বিভার স্বামী। বিভা এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তিনি একটু হাসিলেন।

আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

কিছুক্ষণ পর তেমনি ভাবে ছবিখানা হাতে করিয়া আসিয়া দুঃখিত স্বরে তিনি বলিলেন—ভুল হয়ে গেছে, মহাশয় ক্ষমা করিবেন। কিনে রাখতে চাইলাম. কিন্তু বিভা কিছুতেই রাজি হল না, বল্লে কাজ নেই ছবিতে, দিয়ে এস।

জাহাজ চাঁদপুরে গিয়া লাগিল।

রসিদ।

শেষ খেয়া।

শেষ খেয়ার ঐ ডাক শোনা যায়
দূর নদীর ঐ তীরে,
ওগো ত্বরা চল নাম্‌বে আঁধার
পথ ফেলিবে ঘিরে;
সাঁঝের আলো বকের পাখায়,
কাশের বনে অই ডুবে যায়,
সন্ধ্যারতির গন্ধ পবন
মিলায় বুঝি ধীরে,
শেষ খেয়ার ঐ ডাক শোনা যায়
দূর নদীর ঐ তীরে।

(২)

ওগো, চুকিয়ে চল সকল দেনা
ভাবনা অকারণ,
শেষ বলে লও গোপন হিয়ার
আকুল নিবেদন;
জালিয়ে চল হবির বাতি,
সাম্‌নে যে গো আঁধার রাতি;
নিবিড় ঘন আঁধার পথেই
যাচ্ছ আলোর দেশে
লক্ষ তপন জলে যেথায়
লক্ষ তারা হাসে।

(৩)

খেয়ার মাঝি বাজায় বাঁশী
দূর নদীর ঐ তীরে,
"বেলা নাই আর বেলা নাই গো
আয় এক মাঝি পারে;"
মেঘ জমেছে গগন তলে
ভয় দেখাবে ক্ষ্যাপা জলে
বন্ধ হবে পারের খেয়া"
শেষ পুরবী সুরে;
ওগো ত্বরা চল ডাক্‌ছে মাঝি
দূর নদীর ঐ তীরে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত

আকাঙ্ক্ষা।

বিভোর হইয়া যবে তোমারেই ধ্যান করি,
হিয়াখানি যায় যেন বিমল আলোকে ভরি;
সে আলো ধারায়—মোর মলিনতা হয় দূর,
স্মরণ সুধায় হৃদি হয়ে যায় ভরপুর।
রবি শশি তারকায় তোমারি আলোক ভায়,
বিহগ কাকলী তুলি তোমারি করুণা গায়।
ধরণীর সব হাসি—সকল শোভার মাঝে,
দেখা দাও প্রভু মোর চিরদিন বাসনা সাজে।
তবু যেন মনে হয় পাইনি তোমারে আমি,
সুদূর সাগর পারে লুকায়ে রয়েছ স্বামী।
মরণের পরপারে হে মোর জীবনস্বামী,
তোমারি চরণে যেন লুটাতে পারি গো আমি!

শ্রীসুধীরকুমার বসুঠাকুর।

প্রেমিক।

অন্তরে বহে প্রেমের প্রবাহ মুখে নাই তার বাণী,
দিবস রজনী অমিয় সায়রে ডুবে আছে হিয়া খানি।
ত্রিদিবের আভা বদন কমলে নয়নে প্রীতির ধারা,
কাহার পরশে তৃপ্ত পরাণ, নিয়ত পাইছে সাড়া।
ধরার বক্ষে নীরব চক্ষে সকলি দেখিছে চেয়ে,
সব ছেড়ে পুনঃ উল্লাসে মন কি গান উঠিছে গেয়ে।
জগতের ধার ধারে না কিছুই নাহি যশ নাহি আশ,
মান অভিমান দিয়ে বলিদান, নীরব রয়েছে ভাষ।
যাহা ছিল তার আপনার বলে সকলি করেছে দান,—
প্রতিদান লাগি নাই তার আশা,—তবু যে পূর্ণ প্রাণ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত।

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Sir Archdale Earle K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
" Sir S. P. Sinha, Kt.,
" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
" Mr. N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
" Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A
" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
F. C. French, Esq., C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Major W. M. Kennedy, I.A.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Rev. Harold Bridges, B. D
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini KantaBannerji Bahadur, M.A.
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M. A.
" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
" T. T. Williams M. A., B. Sc.
" Egerton Smith, M. A.
" G. H. Langley, M. A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.
Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagepore, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E

The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The " Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
Sir Gooroodas Banerjee, Kt., M.A., D.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
" Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
" Col. P. R. Gurdon, C.S.I., I.A.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
" Rai P. N. Mookerjee Bahadur, M.A.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Janaki Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Babu Deba Kumar Rai Chaudhuri of Barisal.
Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M.A.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur.
" Sures Chandra Singh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
Hemendra Prosad Ghose.
Akshoy Kumar Moitra
Jagadananda Roy.
" Binoy Kumar Sircar.
" Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

—:o:—

সূচী।

// THE DACCA REVIEW.

VOL. VII. FEB & MARCH, 1918. NOS. 11 & 12

R COLLECTIONS OF THE INDIAN MUTINY AT DACCA.

Mr. Brennand's account:—The mutiny began at Barrackpore in March, 1857 by the 34th N. I. Three officers were wounded. The 19th at Berhampur then showed signs of disaffection; they were ordered to Barrackpore and both regiments were disbanded.

In May news arrived of the outbreak of Meerut. At this time the Sepoys stationed at Dacca consisted of two companies of the 73rd N. I. In this month the missionaries met with some opposition from the Sepoys whilst preaching in the bazar.

At the end of May or beginning of June, two other companies of the 73rd arrived from Jalpaigoree as a relief for those that had been in Dacca for some time.

10th June—The troops appear excited on account of the rumour that European troops are to be sent to Dacca.

June 12th—A panic spread among the Europeans, in consequence of a report to the effect that the two companies of the 73rd, which had left the station about the beginning of the month, had met with some disbanded men from Barrackpore, and had mutinied; that they had returned to Dacca, and had been joined by the men at the Lal Bagh; that they were looting the Bazar, and setting free the prisoners at the Jail.

A number of Europeans assembled at the house of Mr. Jenkins, the Magistrate, others resolved to defend themselves at the bank. Some of the ladies went on board boats on the river; arms were collected, the whole town was in a state of excitement; the *bund* was crowded with natives in a state of wonder and curiosity.

Lieutenants McMahon and Rhynd, the officers in command of the troops, started for the Lalbag, where the Sepoys were located. On their return, they

reported that their men were all quiet, and in their quarters, that the alarm was groundless.

On the evening drive, the natives who were collected in knots along the road seemed surprised to see us, after the report that we had all fled, and left them to their fate.

13th—Everything quiet again, and we are going on with our work as usual.

Between the 12th and 23rd June, the Government sent up a hundred men of the Indian Navy, under Lieutenant Lewis, for the protection of the town. They were located in the house on the opposite side of the road to the Baptist chapel.

28th—Two deserters were caught in the neighbourhood by the police, but were rescued by some of the Sepoys. The two companies were paraded, but the *burkundazes* either could not point out the men who had assisted in the rescue or they were afraid to do so. The Sepoys complained that they could not go about the town without being interfered with by the police.

5th July—The Metcalfs came in from Comillah in a fright; they had heard that the Sepoys at Chittagong had mutinied, and that they were on their way to Dacca. The report was, however, without foundation.

Dacca had been comparatively quiet since the arrival of the sailors, Lieutenant Lewis has his tars out frequently in the morning to practise with the guns in the space near the Racquet Court, and in front of the college. He wheels his men about in all directions; sometimes he storms the collectorate,—first at some gate, then at the other, going through all the manœuvres for loading and firing. The Sepoys on guard were very angry; they say *yih kia dar dekhlata?* (ইয়ে কিয়া ডর দেখলাতা। They do not seem to have much affection for the sailors.

Today there was something of a panic among the Sepoys. Dowell, who is in command of the station, sent up to the Lal Bagh for the screws used in elevating the guns, and the men there supposed that there was some intention of disarming them.

30th July—A meeting of European and East Indian inhabitants capable of bearing arms was held at the College; nearly 60 people present. It was resolved to form two corps of volunteers,—one of infantry and the other of cavalry. Major Smith to command the infantry, and Lieutenant Hitebius the the cavalry.

1st, 2nd and 3rd August, the three days of the Bukree Eed—The volunteers all on the alert, patrols out all night on each of the three days. Apprehension that Mahomedans may cause some disturbance. The 2nd being Sunday, a party of the volunteers stationed at the College to protect the people who were at church. Great alarm among the European and Armenian residents, especially among those with families. The terrible news from the North West

proves the necessity of being prepared for any sudden outbreak.

11th August—Many of the Armenians are leaving for Calcutta. The Europeans are thinking of fortifying the mills. The volunteers are on parade for several hours daily and are making good progress in drill. File firing to-morrow, and target practice shortly. The natives scarcely understand the commotion among the Sahibs, or the object of the volunteers who have been keeping up nightly patrols.

14th and 15th August—The festival of Junmostomee. There was as usual a large crowd of people. The cavalry volunteers were mounted on elephants, and well armed and ready for anything that might occur.

The infantry were also armed, and at the college, but all passed off quietly. Letters from Julpaigoree, the head quarters of the 73rd. The officers say they have no hope of being able to keep their men from following the example of the rest of the Bengal army. They have sent away two of the ensigns to Darjeeling but that if their men should rise, they have no expectation of being able to escape, as the country is completely inundated; and they have no pucka house in which they could take refuge to defend themselves.

It has been decided that, if the men at Julpaigoree do mutiny, the Sepoys here shall be at once disarmed.

There are about 50 men at the collectorate; and the plan will be to disarm these in the first instance, and afterwards to proceed to the Lal Bagh to disarm the men there, and to bring away the guns now in their charge.

2nd August—The fortification of the mills is going on; and it will not be long before the place will be ready. There are 200 men at work, digging the ditch from the *nullah* round the house to the river.

27th August—The fortifications are progressing, and it is supposed that should there be occasion for it, we should be able to make a stand against 5 or 6 thousand men. The country around is, however, quiet but there are many rumours of armed men having been seen at different places coming down the river in boats.

"We are informed by the magistrate that we are to have two companies of Europeans at Dacca, and our troops of horse Artillery, within a month.

30th August—Yesterday Sunday, was the great day of the Mohurum. The cavalry volunteers were out all the night patrolling; they describe the town as unusually quiet. The people did not assemble in the same numbers as in former years. Only about 50 were present at the Hosseinee Dalan. It is believed that the Musulmans are completely cowed.

14th September—Some alarm here in consequence of a report that the Sepoys in Assam are in a state of great excitement, and that they had become very insolent. The Government has sent off

a number of sailors in the *Horungatta* by way of the Sunderbans; they are expected to arrive here to-morrow, and are intended for Assam.

"The 73rd at Jalpaigoree still quiet. We have hopes that it will prove staunch. Should it not, we shall be involved here; but we shall be quite a match for the sepoys, and they would probably take to flight. They have been much more respectful towards us of late.

7th September—Every thing quiet. The apprehensions regarding the spread of the insurrection to Bengal are in some measure allayed.

4th October—The day has been fixed upon by the Bishop as a day of humiliation. Winchester away at Sylhet. The service was read by Abercrombie and the sermon by Pearson. In Dacca we are all quiet. The Raja of Assam was brought in a prisoner the day before yesterday.

12th October—The cavalry volunteers gave a ball to the infantry. The gathering was not so great as expected; about 10 ladies present. Of the infantry volunteers only about 20 attended in uniform. The party was on the whole, a very pleasant one.

19th October—Some of the sepoys here have been recently punished, but the matter has been kept quiet.

1st November—Something like a panic occurred on Sunday last, caused by the removal of the sailors to the house near the Church recently occupied by the Nuns. The Sepoys got ammunition out of the magazine; and it was thought that an outbreak was imminent. It is reported that they have written to their brethren at Jalpaigoree, asking whether they should resist if an attempt were made to disarm them. We believe that the disarming could be effected with little danger to ourselves; but it is feared that the effect on the troops at Chittagong, Sylhet, and Jalpoigoree might be disastrous. It is supposed that if we can preserve order in Dacca, the other places will remain quiet. The men are very civil, but with the example of their 'bhai buns' before us, we cannot put much trust in them.

9th November—The infantry volunteers gave a dinner to the station. It came off in the large hall of my house. It was one of the largest parties of gentlemen that has ever been in Dacca. About seventy were invited, and upwards of fifty sat down to dinner. People thought that my house would not be large enough for the occasion but every thing was very conveniently arranged.

17th November—Everything continues quiet around us, and the news from North-West is more cheering.

26th November—The storm that has been passing over India has just passed over Dacca, happily without any other disastrous effects that have attended it in its course elsewhere. We are now rid of our 'staunch' and loyal friends—the Sepoys. Up to Saturday last we

were going on as usual. There was a party out at cricket in the afternoon and the volunteers were at their usual exercise with ball cartridge. In the evening we had our usual drive in the course. The *dawk*, however, brought bad news from Chittagong; and an express was received with intelligence, that the remnant of the 34th, the regiment disbanded at Barrackpur at the beginning of the mutiny, had broken out; that they had looted the treasury, taking with them about 3 lakhs of Rupees, and that they had also killed several Europeans. It is now believed that the Europeans escaped. At about 6 o'clock in the evening, it was determined that the Sepoys here—the detachment of the 73rd should be disarmed; their number, including the Artillery men under the command of Mr. Dowell, was 260. They had possession of 2 field pieces, and in their lines they held a remarkably strong position. It is reported that they threatened to resist any attempt at disarming them, and they affected to despise our sailors who are generally of small stature. The sailors were about 90 in number, fit for duty. It was therefore necessary that they should use great precautions in dealing with a body of armed men, nearly 3 times their number.

The volunteers were warned to be ready at 5'oclock in the following morning, Sunday, the 22nd, and they were enjoined to assemble quietly, so as to excite no suspicion.

At the time appointed, there were assembled the commissioner, the judge and some other civilians and from 20 to 30 volunteers. It was still dark and we waited a short time for the signal. The plan was to begin by disarming the Treasury guard, to place the disarmed men in charge of the volunteers; the sailors would then proceed with their whole force to the Lal Bagh; and it was hoped that the men there would have given up their arms without opposition. Every thing appeared to go on well. The guards at the Treasury were disarmed before the signal was given for the volunteers to advance. There were about 15 of the Sepoys, standing or sitting outside of their quarters, and the rest of them, making altogether, about 36, were supposed to be inside the building. They appeared to be very much dejected, and they reproached their officers for subjecting them to such disgrace, protesting that they would have given up their arms at once to their own officers had they only been asked to do so.

In the meantime, the sailors, on reaching the Lal Bagh, found the Sepoys drawn out prepared to make a resistance, they had evidently been apprised of our intention to disarm them. The sentry fired his musket and killed one of our men; his example was followed by the others, and a volley was fired on the sailors as they advanced through the broken wall near the Southern gateway. The guns had been

placed in position in front of Beebee Pari's tomb, so as to command the entrance, and they opened fire upon our men with grape. As soon as the sailors had got well into the place, they fired a volley. Lieutenant Lewis then led them up the ramparts to the left, charging the Sepoys, and driving them before them at the point of the bayonet. The Sepoys took shelter in their quarters, but they were driven on from building to building by the sailors. At this time, Mr. Mays, a midshipman, at the head of 8 men who were under his command, made a gallant charge from the ramparts down upon the Sepoy guns; they were soon taken and spiked, and the Sepoys began flying in every direction. There was a severe struggle at the end of the rampart: many of the Sepoys were driven over the rampart. Mr. Bainbridge had also a fall over the parapet as he stepped back to avoid the thrust of one of the Sepoys. The sailors obtained a complete victory; the Sepoys fled and concealed themselves in the jungle, leaving about forty of their number killed. Many of those who escaped were severely wounded. Our loss was one killed on the field, 4 severely wounded, since dead, and 9 more or less severely wounded. Dr. Green, who accompanied the sailors was wounded in the thigh. He was kneeling down at the time attending to one of the sailors, who had also been wounded. He is getting on well, but complains of numbness in the lower part of the leg.

A number of the fugitive Sepoys have been brought in, four of them have been already hung, and several others are to undergo the same punishment.

On Monday every thing was quiet again, and we were going on with our work as if nothing had happened. But many of the natives left the city through fear.

29th November.—We have had great apprehensions during the week regarding the residents at Mymensing and Sylhet. It has been ascertained that our fugitive Sepoys were on their way towards those places.

It is fortunate, however, that they are not all proceeding together. The largest party only took the Toke road towards Mymensing, about 20 of their armed men were in front, then followed some of the disarmed men, and only one woman with their children, then the wounded, who appear to have been numerous, and lastly another body of about thirty armed men.

As they approached Mymensing, the magistrate, with a number of *burkundazes* took the field to oppose their passing through the station. They declined the fight and took the direction to Jamalpore.

The Chittagong mutineers were on their way to Dacca, and it was supposed that their object was to join the men of the seventythird. It was then report-

ed that they were about to cross the Tipperah hills to join the men stationed at Sylhet. It was now currently reported that they are at a place on the other side of Comillah; that they have sent a message to the Rajah of Tipperah, that if he does not join them they will dethrone him. The European inhabitants of Comillah, and the respectable native inhabitants have all got away.

30th November—Three of the Lal Bagh mutineers were hung this morning; these with eight others, that have already undergone the same punishment, make eleven in all. We consider that such examples are absolutely necessary in these times. They have produced an excellent effect upon the people, and the bad characters of the town thoroughly understand the lesson that has been read to them. I do not remember the time when the natives were so civil in their behaviour as they are now.

3rd December—Two steamers and a flat arrived this morning with 300 of the 54th Queen's Regiment and 100 sailors on board. The soldiers start for the Tipperah district as soon as a sufficient stock of provisions can be collected. It is supposed that they will be in time to intercept the men from Chittagong before they can reach Sylhet. The sailors will proceed to Bulwah on their way to Rungpore. It is to be hoped they are not too late.

The Sylhet *Dawk* is stopped. It is supposed that the Chittagong mutineers are somewhere on the Sylhet road.

9th December—The latest reports from Sylhet state that the Chittagong mutineers had not reached that station; that they were somewhere in the territories of the Rajah of Tipperah; and that they were afraid to venture upon the plains for fear of the *gora log*. Their party in all consisted of about 500, including their women and children, and the prisoners they had set free from the gaol of Chittagong. They were in great want of provisions, and were stockading themselves, expecting an attack to be made upon them.

18th December—No tidings for the last few days from Sylhet. The last news received was to the effect that the people there were prepared to give the mutineers a warm reception if they should venture upon attacking them. We hope to hear shortly from the troops which left us so lately.

The Dacca mutineers are supposed to be somewhere in Bhootan.

14th January, 1858—The station is now somewhat gay. The steamers with the European troops have returned. The Chittagong mutineers had kept too close to the jungle on their way to Sylhet. The Sylhet light infantry came up with them on two occasions, and each time they have beaten them.

The soldiers and sailors are strolling about the streets in great numbers, there is some uncertainty if they are to remain at Dacca. The general

impression is that they are not required here, and that they might be usefully employed elsewhere.

24th January—The European troops have left for Calcutta. Although everything is quiet on this side of the country, the sailors will probably remain for several months longer.

The principal topic in India is the transfer of the Government to the Crown, and the probable changes that may take place in the different services, and in the general interests of the country.

17th March—Everything has settled down to the usual quiet which prevailed before the mutiny. The Government has been contemplating the laying down a telegraphic line between Calcutta and Chittagong via Dacca. A number of people have arrived in connection with the Telegraph Department; they have pitched their tent on the triangular space of ground before the Church.

3rd April—The scheme of a Railway to Dacca which was before the public in 1856 is again attracting much attention, and it may not be long before the line is commenced.

30th May—There is a rumour that 500 European troops are to be located at Dacca.

9th June—On Saturday last, Davidson, the Commissioner, sent me a copy of an extract from the proceedings of President in Council, ordering that the college building should be prepared immediately for the accommodation of a a wing of the 19th Regiment consisting of 450 men. Those that cannot be accommodated in the college, are to be located in the Mitford Hospital. I have given the students leave for 10 days, or a fortnight, till another building can be procured for their use.

27th June—I have received the sanction of Government to take two houses for the use of the college during the time that the college building may be occupied by the military.

12th July—Three companies of the 19th Europeans have arrived. The greater number will be located in the college, the others will occupy the Foujdari Court.

The station is very gay. A ball at Gunny Meeah's, a station ball at Carnegies, and a bachelor's ball after that.

The public garden south of the college has been made over to a joint stock company, for the purpose of building assembly rooms, a library, theatre, billiard room, &c., &c.

1st August—The sailors started for Sylhet yesterday.

15th Augnst—The station is very gay; three balls in succession.

8th October—Telegraphic line completed between Calcutta and Dacca. The question of Railway still under consideration.

5th November—The proclamation of a transfer of the Government of India to the Queen was read in English and

Bengali on Monday last, in the space in front of the college.

The students had an illumination at the college with fireworks the following evening : they seemed quite enthusiastic in the display of their loyalty.

A line of Telegraph from Dacca to Chittagong was commenced by Captain Mac Garth in December 1858, and was completed about the end of 1858.

The Eastern Bengal Railway was opened from Calcutta to Ranaghat on the 29th September and to Koostea on the 15th November, 1862.

The effect of the famine of 1865-66 were not unfelt in this district, prices rose to an unusual height and there was much distress among the poorer classes.

SOME IMAGE-INSCRIPTIONS From East Bengal.

(BY N. K. BHATTASALI, M. A., CURATOR, DACCA MUSEUM).

The short votive inscriptions recorded on the pedestals of images are always very useful to antiquarians in more ways than one. They not only illumine the darkness of the past by furnishing pointed and concise historical information; but the help that they give in determining the periods of sculptural History is by no means inconsiderable. The students of Iconography too, have reasons to welcome them, as many of the votive inscriptions contain the names of the images on whose pedestals they are inscribed, helping thus to identify them easily. Below I review three such votive inscriptions from East Bengal in some of which all the three characteristics noted above will be found to exist to the fullest degree.

I. THE BHARELLA NARTESWARA IMAGE INSCRIPTION.

The worship of the images of Natesh Siva (The dancing Siva) seems to have been a peculiarity of southern India. The images of the dancing Siva in metal abound in southern India and Ceylon but they are very rarely met with in the North Indian Provinces. How Bengal came to share this peculiarity with the Deccan is one of the unsolved problems of history. We must however note here that North Bengal or West Bengal does not show this peculiarity and it is only in the south-eastern districts of Bengal, roughly comprising the ancient divisions of Vanga and Samatata that several images of the dancing Siva were discovered. The Dacca Museum has got three excellent images of the deity while a rather dilapidated one is to be found in the Rajshahi Museum. I know of two other very well-preserved Natesh images that are being worshipped in two villages in the Dacca and Tippera districts of East Bengal.

The discovery of many images of the same class in a rather limited area cannot be accidental and it is quite possible that their worship was introduced by some Saiva ruling family. The Sena kings whose origin some trace to the Deccan had their metropolis in Vikrampur in the heart of the Ancient Vanga, as is attested by the majority of their copper-plates, and they were renowned Saivas. It is quite possible that the worship of Natesh Siva came from Southern India with the Senas. It is worth noting that out of the seven images of Natesh Siva discovered up to date and known to me, five came from Bikrampur, and a village situated in the suburbs of the capital of the Senas in Vikrampur (a Purgana in the Dacca district goes by the name at present) contains the ruins of a big temple and is still called Nateswara.

The inscription I am going to examine first was found on the pedestal of a huge image of Natesh Siva dug out of a tank in a village called Bharella, P. S. Badkamta, in the district of Tippera. It came to my notice in 1911 and in 1912, I went to Bharella, too late to save the image which had been broken to pieces by a fanatic fakir; but I procured the inscribed pedestal for the Dacca Sahitya Parishad where it is being preserved at present. A large fragment of the figure of the god is now in the Dacca Museum. I reproduce the inscription from the original.

The inscription is in two lines in four sections on four planed spaces on the pedestal, below the lotus seat of the god. The whole inscribed surface measures about 1′ in length and the letters are approximately ½″ long. The first section has suffered a little by the peeling off of the stone, while the beginning of the third and the longest section has been altogether chopped off, damaging 7 or 8 letters of each line. The first line runs connectedly to the end of the third section and then returns to the first section to begin the second line. The name of the sculptor is given in the fourth section in two lines.

The characters used are the ordinary North-eastern *kutila* characters which gave birth to the modern Bengali script, and which, even at this stage shows distinct resemblance to the modern script of Bengal. Paleographical considerations would lead us to assign the latter half of the 10th century as the time when this inscription was incised. The date is absent, but it may be that the lost portion of the 2nd line in the beginning of the third section contained a date. There are some data from which a date is perhaps obtainable by Mathematical calculation. The image was consecrated on the dark fourteenth day, a Thursday, under the star Pushya, on the fourteenth day of the month of Ashardha counted by the movement of the moon. It would be a very interesting calculation to lovers of Astronomical problems, to find out on which year or years between 900—1100 A. D. all these data met.

The inscription refers itself to the 18th year of the reign of a king Layaha Chandra by name. Kings with the surnames of *chandra* are found on the thrones of two adjacent countries, *viz.* Vanga and Aracan about this period. The Chandra kings of Vanga, who like the Sena and Varma kings had their capital in Vikrampur are known from two copper-plates. But no name in their geneology resembles Layaha Chandra, which name sounds rather outlandish. We find an account of the Chandra kings of Arracan, in Phayre's History of Burma P. 45 and Numismata Orientala vol. II. Pl. I. P. 42 by the same author, where we learn that the dynasty came to an end in 957 A. D. We know of another isolated Chandra king of Vanga, Govinda Chandra by name from Rajendra chola's inscription. (Ep. Ind. Vol. IX. P. 232-233.) Layaha Chandra must have belonged to one of these three lines, possibly that of Aracan.

Kusuma Deva, whose son Bhabu Deva consecrated the image of Nartteswara seems to have been a vassal prince under the suzerainty of Layahachandra, ruling over Karmmanta, which I am inclined to identify with modern Badkamta (the senior Kamta), some three miles south-west of the find-place of the image. Badkamta is still a place of considerable importance, being a police station with a big zemindary katchary situated within a spacious area surrounded by an ancient moat and containing two big tanks, from the smaller of which many ancient stone-images of Brahmanical deities were found. Images, both Buddhist and Brahmanical abound in the surrounding villages of Badkamta, and testify to the former prosperity of the tract. The area surrounded by the moat perhaps marks the site of the palace. The appellation Deva at the end of the names of Kusuma Deva and Bhabu Deva is also in favour of supporting their claims to royal dignity. My friend Professor Radhagovinda Basak, M. A., however is in favour of taking the word Karmmanta to mean, a store of grains and relegating Kusuma Deva to the rank of an officer in charge of the royal granary.

The language of the inscription is Sanskrit prose throughout. As to orthography we may note the doubling of consonants after *r* as in নর্ত্তেশ্বর, গর্ব্বাকর, but চতুর্দশী is spelt with one দ .

Numeral figures for 1 and 4 are given in denoting the 14th day of Ashadha.

The letters of the inscription are mentioned to have been engraved by one Ratoka, but Madhusudana seems to have been the sculptor who made the image.

N. B. Perpendicular parallel strokes are used to denote sections.

Text.

PART I.

1. শ্রীলয়হচন্দ্র দেব পাদা ॥ স বিজয় রাজ্যে
অষ্টা ॥
* * * * * * * (কৃ) ষ্ণ চতুর্দশ্যাং
তিথৌ বৃহস্পতি বারে পুষ্য (।) নক্ষত্রে
কর্ম্মান্ত পাল শ্রী ॥

3. কুসুমদেব সুত শ্রীভাবুদেব ॥' কারিত
শ্রীনর্ত্তেশ্বরভট্টা
* * * * * * * * চন্দ্রগত্যা
আষাঢ় দিনে ১৪ ॥
খনিতঞ্চ রতোকেন সর্ব্বাক্ষরঃ ॥

PART II.

1. খনিতঞ্চ শ্র মধু
2. সূদনেনেতি ॥

Translation.

PART I.

In the eighteenth year of the victorious reign of His glorious majesty Layaha Chandra Deva, on Thursday in the dark *chaturdasi Tithi*, and under the star *Pushya*, Bhabu Deva, son of Kusuma Deva Lord of Karmmanta caused to be made the Lord Narttes-wara............on the fourteenth day of Ashadha (calculated) by the movement of the moon. All the letters engraved by Ratoka.

PART II.

Also engraved by Madhusudana.

II. THE BAGHURA VISHNU IMAGE INSCRIPTION.

The inscription was brought to my notice in 1912 when I went to Tippera to secure the inscription described in the foregoing pages. Ramanath Chakravarty, a former pupil of mine, whom I met in Comilla, gave me to understand that an inscribed image of Vishnu had been discovered in a village near the Subdivisional town of Brahmanbaria in the Tippera district and that the local people had been able to read the word Mahipala on the inscription. My curiosity was considerably roused at coming across an inscription of the Pala kings so far east of their native home in North Bengal. Pressure of business, however, did not allow me to go after the inscription at that time. Towards the beginning of the year 1914, Babu Upendra Chandra Guha, B.A., B.T, who is a keen enthusiast in matters Archæological, secured chalked photographs of the inscription and published an article with a reading of the inscription in the Dacca Review. The reading however was rather defective and I gave a more correct reading in the next number of the journal. I also published a correct reading of the inscription in the January 1915 number of the J. A. S. B. and pointed out its importance.

The image containing the inscription was dug out of a pond some ten or twelve years ago in the village of Baghaura near the Subdivisional town of Brahmanbaria in the district of Tippera. It is now worshipped by a half-crazy woman in the neighbouring village of Vidyakuta. In January 1915, I visited the spot and got some excellent photographs of the image but no amount of persuasion could prevail upon the woman to part with the image.

The inscription purports to be of the 3rd year of king Mahipala, presumably of the Pala dynasty of Bengal. It records the installation of the god Narayana in Samatata included in the kingdom of Mahipala, by a merchant Loka. Datta, son of Basu Datta and hailing from the village of Bilakinda, in furtherance of religious merit of himself and parents. Bilakinda is in all probability the village Bilakendui situated close to Baghaura.

The importance of the inscription is two-fold. First, it definitely settles the position of the kingdom of Samatata. There is no room for doubt now that the village of Bilkendui must have been within the kingdom of Samatata. Now let us recall what Yuan-Chwang says about Samatata. The pilgrim came to the country of Samatata going 1200-1300 li *South* of Kamarupa. Taking 5 li to one mile, 1200–1300 li represent about 250 miles. The country of Samatata was about 3000 li (*i.e.* 600 miles) in circuit and bordered on the great sea. The land lay low and was regularly cultivated. Now if we look round for the country which must satisfy all these conditions and at the same time must include the Brahmanbaria Sub-Division of the Tippera District in which the village of Bilkendui is situated and if we remember that natural barriers such as mountains and rivers marked off one kingdom from another in those days, we cannot but accept the plain tract of land bounded by the Garo and the Khashi Hills and the hills of Tippera on the north and east, by the Lauhitya or the old Brahmaputra river on the west and by the Bay of Bengal on the South as the ancient kingdom of Samatata. It is a perfectly natural geographical unit with clearly marked bounderies, comprising of the eastern half of the present Mymensing district lying east of the Brahmaputra, the greater part of Sylhet, and the whole of the Tippera and Noakhali districts. ' The distances between countries recorded by Yuan Chwang are, in all reasonableness, distances between the capital towns, and the distance of 250 miles recorded by Yuan Chwang between Kamarupa and Samatata is pretty accurately the distance between Gauhati and Comilla by any modern route. The circuit of 600 miles is also right and the tract which is a vast plain, borders on the great sea.

There has been much discussion about the situation of the countries of *Shih-li-ch'a-ta-lo*, *Ka-mo-lang-ka* etc., mentioned by Yuan Chwang in his account of the kingdom of Samatata, but no satisfactory solution seems to have been arrived at. With our present identification of Samatata, we may proceed to consider their cases also. This is what we find in Beal's edition about them :—

"Going *north-east* from this to the borders of the ocean, we come to the kingdom of Srikshetra (Shi-li-ch'a-ta-lo)

Farther on to the *South-east* on the borders of the ocean, we come to the country of Kamalanka (Kiamolangkia). Still to the east is the kingdom of Dvarapati (To-lo-po-ti). Still to the east is the of country of Ishanapura (I-shang-na-pu-lo). These six countries are so hemmed in by mountains and rivers that they are inaccessible."

Now, the pilgrim says that the country of Shi-li-ch'a-ta-la might be reached by proceeding *north-east* to the borders of the ocean. This anomalous statement seems to have puzzled every body including Beal and Watters as the borders of the ocean are never reached by going *north-east* from Samatata, wherever its position might have been in eastern India and the fact that all the original copies of the Travels available as well as the biography of the pilgrim give north-east as the direction, has stood in the way of emending the text to *south-east.* My considered opinion is that, inspite of the unanimity of all the versions, *North-east* is a manifest mistake for *South-east* and the apparent unanimity arises from the mistake having originated in a very early copy of the Records. The very qualifying phrase that the direction would lead to the borders of the ocean is sufficient for the emendation. But the emendation is confirmed by the manner in which the succeeding sentences begin. The next sentence begins thus—"Farther on to the *South-east* etc." and this would lose all force if "*South-east*" had not been the direction spoken of in the previous sentence. If we accept south-east and move from Comilla in that direction to the borders of the ocean we arrive at a place called at present Chattagram (Eng. Chittagong) which was anciently called Sri Chattala and which name is still frequently used. Is there any reasonable objection in identifying Yuan Chwang's Shi-li-ch'a-ta-la, with Sri Chattala of the present times? It is evident that it satisfies all conditions.

The second importance of the inscription lies in the fact that it throws some light on an obscure part of the history of the Pala kings of Bengal. The Bangad plate of Mahipala I. and the Dinajpur pillar inscription inform us that some usurpers drove Bigrahapala from the throne and he, after losing his kingdom, took shelter in the eastern country where water abounds (দেশে প্রাচী প্রচুর পয়সি). His heroic son Mahipala recovered the lost kingdom of his father. The two characteristics, *water-abounding* and *eastern* agree well with the present districts which composed the ancient kingdom of Samatata,—so well that it is impossible to suggest any other country which answers to the description equally well, and little room is left for doubt that the eastern country alluded to was the kingdom of Samatata. The new Baghaura image inscription which is the earliest of the reign of Mahipala finally settles all doubts on the point. When we find

that Samatata was under Mahipal so early as the third year of his reign, we cannot but conclude that it was Samatata where Bigrahapala took shelter suffering reverses in war with the usurper, and leaving North Bengal in the hands of the victor. The earliest inscription of Mahipala turning up from Samatata also points to the fact that here probably he was crowned and this was perhaps the loyal country used by him as the base of operations in his fight with the usurper in the recovery of his father's kingdom.

The sloka in the Bangad plate which describes Bigrahapala's sojourn in the Eastern country has been copied also in the Amgachi plate of his great-grand son Bigrahapala III, where it is applied to him. Mr. R. D. Banerjee M. A. in his Monograph on the Palas of Bengal, is inclined to discredit the statements of the Sloka on this ground. When a sloka describing some events in the history of a monarch and occurring in the copper plate of his son is reproduced in the copper plate of the great-grand son of that monarch and is applied to that great-grand-son, it is presumable that the former application is correct, and the later plate, is (i) either a forgery or (ii) the composition of a very silly panegyrist, who was unaware of the historical significance of the sloka and took it only as an attempt a tconventional panegyrics or (iii) the sloka repeated denotes some similar event that happened in the life of the latter monarch.

The inscription is incised under the lotus seat of a standing image of Vishnu about 3′ high, between two kneeling figures. The inscription is in perfect state of preservation and is legible all through without any difficulty. The lines measure 6″ in length and the characters are ¼″ long. The characters belong to the North-eastern variety, specifically called the *kutila* character, which gave birth to the Bengali characters of the modern days. The inscription is dated, but the date is given in regnal years. The inscription refers itself to the third year of the reign of a king called Mahipala, presumably Mahipala I. of the Pala dynasty of Bengal, as Mahipala II. had but a very short and troubled reign, terminating in the successful *kaibarta* revolt. As the chronology of the Pala kings of Bengal is still uncertain, it is difficult to fix on the exact year but it cannot be far removed from 980 A. D.

The language is Sanskrit. In orthography, the only point to note is the absence of Avagraha Sign, in অভিমতরে where অ is used unchanged. No distinctive mark is added to *Halanta* letters. There are numerical figures for 3, 2 and 7.

Text.

1. সম্বত [ত্] ৩ মাঘ দিনে ২৭ শ্রীমহীপাল দেব রাজ্যে
2. কীর্ত্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্ট [া] র কারিতা সমতটে বিলকীন্দ

3. কীয় পরম বৈষ্ণবস্ত বণিক [ক্] লোক-
দত্তস্ত বসুদত্ত সুত

4. স্ত মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশো
ভিবৃদ্ধয়ে ।

Translation.

Om. The year three, the 27th day of Magha. In Samatata, in the kingdem of Sri Mahipala Deva, this meritorious deed, namely (the installation of) the lord Narayana, is of the merchant Lokadatta belonging to (the village of) Bilakinda—a great devotee of Vishnu—son of Basudatta, for the special furtherance of the spiritual merit and fame of himself and parents.

3. THE KEWAR VISHNU IMAGE INSCRIPTION.

The inscription was discovered by myself in 1909. That year, in the month of June, I happened to be on a visit to the little village of Kewar, some three miles to the South-east of Rampal, the famous ancient capital of the Sena kings of Bengal in the Munshiganj Sub-Division of the Dacca district. I found the image lying on its face, half buried in earth and I noticed the inscription on turning it over for inspection.

The inscription is incised on the pedestal of an image of Vishnu about 3′ in length. It is in four lines, each line measuring 7″; but the last line is an inch shorter, for want of plain space to write uppn. The letters are about ½″ in length and are everywhere boldly incised.

The second couplet has been much injured towards the end by the erosion of stone and several letters could be recognised with difficulty.

The inscription is in verse throughout, and consists of only two couplets. The language is correct Sanskrit, with only a single exception, which is perhaps an engraver's mistake. The letters belong to the Kutila variety current in Bengal in the 10th, 11th, and 12th centuries. The inscription is not dated but palæographical considerations would not possibly allow of an earlier date than the early part of the 13th century A. D. It records the installation of an image of the lord Vishnu, by one Vangoka, great-grand son of Sauri Sarman, grand-son of Pitamaha and offspring of the couple Sayoga and Anuyami.

The absence of a royal name in a pretty long inscription is rather remarkable, though by no means uncommon. It may suggest that the inscription belongs to a period when there was no king worth the name to refer to. There is another fact which confirms this supposition. The Brahmin family to which Vangoka belonged, is spoken of as hailing from some place in Varendra, i. e. north of Bengal. They must have migrated to Vanga, which included the pargana of Vikrampura, the region where the image was found, not long before the installation of the statue, as the fact of their

descent from a stock of Varendra was in Vangoka's estimation still of sufficient distinction to merit a special mention. The name Vangoka is also significant. In a family where the first three of the line are named in pure Sanskrit after the sacred name of gods, the naming of the fourth member after the name of a country signifies that he was born just after the family had migrated to that country, and the migration was an important event in the family history.

The period which necessitated the migration of Varendra Brahmins from North Bengal to East Bengal must have been the time when Lakshmana Sena was worsted by Muhammad-bin-Bakteer about 1200 A. D. and the old king and his court fled to Vikrampura. Muhammad established his court at Deb-kot, 14 miles South of Dinajpur in the heart of Varendra, and orthodox Brahmins must have had a rather hot time of it, necessitating flight to the Vanga country, where the Senas still held sway. The history of the reign of the sons of Lakshmana Sena is very imperfectly known, but erasures of royal names on their copper-plates suggest fratricidal war, and consequent anarchy and the present inscription may well belong to this troublous period.

Text.

1. অয়বাস্থবমি [বে] য়েন সযোগাদনূয়া বিষ্ণুঃ [।]
2. বঙ্গোকেন কৃতোবিষ্ণুর্বিষ্ণু সালোক্য কাম্যয়া [।।]
3. বরেন্দ্রীতটকীয়েন শাণ্ডিল্য কুল জন্মনা [।]
পিতার
4. হস্ত পৌত্রেণ প্রপত্র। শৌরিশর্মণঃ [।]

Translation.

Longing for a residence in the same heaven with the god Vishnu, this image of the lord Vishnu was consecrated by Vangoka, hailing from [the village of] Tata in Varendri, offspring of the body of Sayoga and (begotten on) Anuyami, in the race of (the Saint) Sandilya, grandson of Pitamaha and great-grandson of Sauri Sarman.

METHODS OF SCHOOL INSPECTION IN ENGLAND.

Historical Notes 1870—1890.

The year 1870 witnessed the passing of an Act making provision for the establishing of school boards in areas where voluntary schools did not supply the need for schools, for the imposition of a local rate for the purpose of starting and maintaining schools and for the passing of by-laws, making school attendance compulsory. The Act in itself did not affect the prevailing main principles upon which the grants-in-aid to schools from the imperial exchequer were regulated, and the consequent methods adopted by inspectors in examining schools; but with the establishing of state schools not under denominational management the old system of assigning clergymen to inspect church schools, and lay inspectors approved by Roman Catholic or dissenting bodies for Roman Catholic or Non-Conformist schools, was given up. After 1869 the religious tenets of applicants for inspectorships were not considered, and no clergymen were appointed—inspectorships fell in the main to young men of good university degrees and accepted social status, and the country was divided into smaller inspection areas for the inspection of schools of all types, replacing the previous larger cross divisions on denominational lines. Moreover the inspector was in future concerned only with the instruction in secular subjects, the testing of the religious teaching being undertaken in Church schools, by diocesan inspectors appointed by the Church authorities 'ad hoc.' The Act also necessitated an increase in the number of inspecting officers. Already in 1863 the exigencies of 'individual examination' had led to the creation of an 'assistant inspector' class to help in the work of examining the pupils in the three R's, and by 1868 there were twenty-one assistants and seventy-five full inspectors. These assistants, intended for the largely mechanical work of individual examination in very elementary subjects, were men under thirty from the class of trained elementary school teachers, and were at first empowered only to examine, pass or reject individual children presented under the school standards, and that in the presence of the examiner. The Act of 1871 somewhat widened their duties—a good deal of statistical work, the scrutiny of registers, revision of pupil teachers' papers and the inspection of buildings, for example, were entrusted to them, their pay was raised, and promotion to a sub-inspector class to be afterwards mentioned was made possible.

The need for equalising the standard of examinations presented a difficulty, which it was attempted to meet by entrusting to some of the senior district

inspectors the supervision over a number of districts. They were expected to check and standardise the questions and working of local inspecting officers, but in point of fact their efforts in this direction were not very effective. In 1871 there were seventy-six assistant inspectors, eighty-two inspectors and ten senior inspectors, and the present system of dividing the country into ten divisions, with usually some eight or ten districts in each, dates from this period.

The carrying out of the Act involved much executive work not directly educational, such as the drawing up of regulations for school board elections, dealing with applications for establishing school boards, or for building grants (from voluntary schools), reurns as to the supply of schools in different districts, and so on. For this purpose 'inspectors of returns'. were appointed, one for each district, often from men with a legal training. Many of these afterwards became ordinary inspectors, and as the Act came into normal working they ceased to form a separate class. In 1871 they numbered sixty-three.

Though the period from 1870 to 1890 was one of great expansion in the provision of public elementary education, it was also one during which the actual practice of inspection was at its worst. The Revised Code of 1860 had established a bad tradition which persisted indeed till the end of the nineteenth century, and has prolonged some of its evil effects even up till to-day. The main work of the inspector was not inspection but examination; his attention was focussed not on the school as a whole, but on the surface only of a narrow area of instruction; he was obliged to consider within this area not the process of instruction, but a brief show of results, and that except reading on paper. This naturally restricted his outlook and threatened to degrade in time his educational ideals. Moreover the science and art of elementary education were as yet in their initial stages; there was no generally accepted body of principles based on a scientific investigation into young human nature, and the inspectors themselves—at any rate up till 1882, and frequently afterwards—chosen from young men with good university degrees and of accepted social standing came usually to their life's work with little knowledge of either the theory of education or of the schools which they were appointed to inspect, and between them and the teachers in social status and in their general education the gulf was fixed wider than it is to-day. To the 'gentleman' inspector the public elementary schools were institutions for the lower orders with whom he could come into merely official contact. Class pride forbade his association with the teachers, differences in upbringing made it in any case difficult, for the teachers had

come from the schools—in still cruder stages—in which they taught. The healing of the breach has been awaiting the influence of public education itself. If the assistant inspector, on the other hand, was drawn from the classes whose children it was his duty to examine, yet his own meagre education was not such as to elevate his ideals above the bare requirements of his job, which consisted—it will be remembered—in a mechanical examination of individual pupils in a few acquisitions or attainments. The assistant inspector became indeed exceedingly expert within his narrow limits, but perfection, thus attained, means stagnation.

Besides this the whole educational system was de-humanised by an atmosphere of formality and officialism The inspector himself was in fact—whatever the theory—the servant, not of the people, but of the Education Deparment at White-hall. He was severely restricted by instructions tying him down to special methods and an exact procedure. As far as the actual work of examination went this was a vicious consequence of the system—for in a mechanical examination uniformity of standard can only be attained by identity of procedure. If one inspector, for example, read out a dictation passage twice before the pupils, and another once only, or if the numbers on one set of test cards were printed in words, and on another in figures, there could be no common measure of the results. Hence we find the official instructions of 1872 going into detail over methods. 'It is best to dictate the sums, or if cards are used, the number must be printed in words. When cards are not used, the dictation of sums must be the rule through all the standards.' * * *

In dictation of sums the number should be given out according to the principle of numeration, *e.g.*, 3,045 should be 'three thousand and forty-five' not 'three thousands, no hundreds, and forty-five,' etc.

'Teachers must not go near the classes

Problems should be given, but not exclusively.'

Nor was it only on the conduct of the examination that the Department dictated to the inspector; he was treated to official homilies on his general procedure in schools and his programme of visits was precisely pre-arranged, there was no modifying it at discretion according to his judgement of local requirements. The inspector, in his turn, tended to mete out the same measure as he received.

The memories of the older head-masters of to-day carry them back to the inspection of the earlier eighties; and make it possible to reproduce the picture of inspection day. In the village school it was the great day of year,—and was carefully prepared for in advance. The head teacher, while

neglecting the better pupils who were pretty sure of passing the examination, had drilled and driven the dullards—not without tears—to the requisite level of attainment; the 'readers' had been duly memorised, and a number of arithmetical exercises, garnered from schools previously examined from the inspectors' test cards, had been worked again and again to the point of mechanical perfection, while all the 'spot' passages in the general 'reader' had been repeatedly spelt through against the test in dictation. A day before the inspection was due the whole school had been swept and garnished, and the friendly gardener of the local squire had lent a number of flower pots to decorate the school surroundings.

On the day of inspection the assistant inspector arrived betimes and set to work to distribute questions and test cards throughout the classes, afterwards marking off such results as the intervals in the examination allowed. These were entered in a detailed schedule, and it required a good deal of care to avoid mistakes in the entries. While he was thus engaged the inspector himself arrived about 11 o'clock, looked round the school, put a few questions to the head teacher, questioned the classes in history and geography and perhaps grammar, and took the lessons of the pupil teachers. He would probably see a little of every teacher, if there were several, but paid no particular attention to the methods employed in teaching. If the school were a Church one, the local clergyman would come in during the inspection and he and the inspector would leave after middle day for luncheon at the Hall. The assistant was left to finish the examination work, and on the results of the examination and any impressions that the inspector had formed by his own observation, the certificates of the teachers were endorsed.

It must not however be gathered from this account that the influence of inspection was wholly bad. It is true that the prescribed method of examination compelled the inspector to stereotype an evil system—it was not his fault if the teachers spent the year in a round of mechanical drill, or in devising tricks and subterfuges; though it is always an inspector's responsibility if he becomes known for one special line of questioning or a particular set of arithmetical exercises that results in the school's confining its attention to these. It was the system from which the inspection suffered, as did the instruction, for vain repetitions deadened the pupil's interest and the learning of rules without reasons suppressed his intelligence.

On the other hand there is some good in thorough instruction of almost any sort—the habit of doing a little perfectly, acquired in childhood, may persist through life; and the contention of some of the older headmasters of to-day that the substitution of more

intelligent teaching and a wider and more varied curriculum has heen accompanied with a loss in application and intensity on the part of the pupil, in slacker and less accurate working, has some measure of truth.

Apart from its effect upon the instruction of those days being a corollary of any grant-in-aid system—had naturally its good effect in keeping a school up to the mark in building, equipment, and the technical qualifications of the staff; for it was always open to an inspector to refuse to recommend a grant to a school on grounds other than that of bad examination results; and the inspectors did not confine their inquiries to the teaching. The better amongst the inspecting staff were indeed in contant opposition to the system which they had to work, and the dictum of one of the inspectors that 'the studies of the classroom must be those in which progress can be definitely measured by examination, and that there can be no definite aim, no real training without examinations is probably exceptional.

A further circumstance in the education of the period affected the influence of the inspector upon the school and its teaching. As has been already indicated, every step towards the establishment of state control over education was jealously watched by the voluntary agencies to whom the measure of public elementary education already existing in 1870 was due. If State assistance was to find favour with these, it was important to be chary of all unnecessary interference in school management. The consequence was that the official instructions to inspectors contained more than one warning against internal interference with the schools. In the official instructions of 1871, for instance, inspectors are told not to interfere with the responsibility of managers and teachers for the details of school work. 'The efficiency of their arrangements it is remarked 'will be tested by the results produced at the annual examination.' In the instructions accompanying the Code issued ten years later inspectors are explicitly warned against originating or suggesting schemes of study; but they might approve or reject them.

The Government's policy of the maximum of non-interference compatible with the continuance of educational progress must have accentuated still further that detachment of attitude which had already resulted from the class aloofness of the time. The inspectors of these days came into official contact with the teachers only in the school; association with them outside the school work was a thing unthought of. His personal influence suffered accordingly.

Before the last decade of the century however changes for the better had already begun to take place in the conditions of the Government grant and more especially in the curriculum. Even before the Act of 1871 the

practice of basing the grant calculations upon the success of individual pupils in the three R's had been modified by adding grant payments on account of certain extra subjects, and for improvements in staff and on account of successful pupil teachers. After 1871 special grants were first made for individual pupils passing in the higher standards in not more than two specific* subjects—which had in such cases to be taught to the whole class on a scheme approved by the inspector.

In 1875 another important change was made in the award of grants on account of satisfactory work in 'class' subjects, in which the class work was estimated a whole, and not according to individual pupils. The subjects that could be thus treated were grammar, history, elementary geography and plain needlework. Later on the range of 'class' subjects was extended. This recognition of class teaching was for the good—it encouraged the teacher to consider the progress of the class as a whole, instead of paying special attention to the weak pupils and neglecting the strong. On the other hand the good resulting from the widening of the range of the curriculum by the growth of a practice of 'cramming' individual pupils in extra subjects for the sake of the grant, and in an unnatural subdivision of subjects into the smallest branches which the Education Department could be got to recognise as a complete subject for the purpose. Thus physical geography was separated from general geography, euclid was separated from mensuration, and physics was split up into mechanics, heat, sound and light. An elementary school pupil might for instance offer physical geography while ignoring geography in general and might acquire merit for himself and money for his school by accumulating scraps of knowledge disconnected from the experiences of his every day life.

The practice of 'cramming' bright pupils with 'specific' subjects widened still further the gulf between the school and the practicalities of ordinary life.

The introduction of these changes in the grant-earning curriculum reacted upon the character of the inspectorate. Since 1863 the inspecting staff comprised two main classes, the superior staff of full inspectors—men of good university attainments, as a rule (though sometimes military or naval officers of no special experience or qualifications secured appointment)—and trained certificated elementary teachers of some little school experience. These latter had been entrusted with the drudgery of examination. Of these two classes the superior class was prone to disdain the work of individual examination of

* Geography, history, grammar, algebra, geometry, natural philosophy, physical geography, natural science, political economy, languages.

pupils, the inferior class was, on the other hand, no longer equal to the more exacting and intelligent duties imposed by the inclusion of 'specific' and 'class' subjects for examination. There was indeed some ground in the complaint made in Parliament in 1879 that young men fresh from college, with no special knowledge of children or elementary education, were not fitted to inspect elementary schools. Undoubtedly they did not as a rule start their new career suited to the work of individual or even class examination, and frequently when they did not regularly undertake it, remained unsuited for this part of an inspecting officer's duties to the end. One solution of the problem was to promote schoolmasters to the post of inspectors, and in 1881 this step was taken by the creation of a class of sub-inspectors appointed from experienced teachers or headmasters of elementary schools or sometimes by promotion of older men from the assistant inspector class.

In point of fact the two inferior classes of inspector generally did the bulk of the work, though the superior officer remained responsible for every school report sent up from his district, and was expected to take a personal share in the examinations, to assess the grant, to endorse teachers' certificates, to visit in person every newly opened school, and any school the inspection of which he had left to his sup-inspector in the previous year.

The principle of encouraging progress in the instruction or otherwise in schools by paying for it piecemeal remained in force throughout this period. Granted that excellence—rather than the show of it—can be fostered by monetary rewards, the logical procedure, where any special defect in education becomes pronounced, is to offer money rewards for its removal. This was indeed the line actually adopted. And it is thus easy to trace from the changes in the incidence of grant the different steps in advance which the Government aimed at making between the year 1870 and 1890.

The grant for 'class' subjects, for instance, was to counteract the tendency to neglect the progress of the class as a whole, that for individual excellence in 'specific' subjects to revive interest in the more intelligent pupils, who under the old regime were left to themselves as soon as they reached the pass standard' in elementary subjects. Other measures of the period exemplify the same general policy. To raise the 'elementary' instruction above a bare mechanical minimum, the 'standards' in the three R's were revised in 1871. An increase in grant in the same year where there was separate accommodation for infants indicates a recognition of their special requirements.

Singing received a grant in 1872. Attempts followed to give school work

a more practical turn. The terms of the grant for science as a 'specific' subject were modified in 1875, to discourage 'rote' learning of mere information. A year later a premium was placed upon domestic economy as a specific subjec for girls. Betwean 1880 elementary science (or object lessons) became a 'class' subject throughout a school—active observation was to temper the prevailing bookishness. On the girls' side cookery obtained a grant. A more advanced (or seventh) standard of instruction was established in 1882. Latter on English was given preference as a 'class' subject. A 'merit' grant for organisation, discipline, the intelligence of the teaching. and the general quality of the school's work had been also introduced in 1881. In 1886 a Royal Commission was appointed to inquire into the working of the Elementary Education Act, and its report published in 1888 led to further changes in 1890. Meantime the chief features of this period have been described as a general rise in the standards of attainment expected. a continuance of emphasis upon instruction in English, and a recognition of the importance of training for girls.

The work of inspection, became, of course, correspondingly more complicated, and in greater need of experience and skilled guidance. The need for experience was recognised by the institution of the 'sub-inspector' class; that for guidance by the flood of circulars and instructions that flowed from the Department. The combined effect of these changes in curriculum and in the in the inspectorate and of the departmental instructions was to improve the general efficiency of inspection. Inspectors attended to a wider range of subjects, and more than previously to the class instruction as a whole, and whithin limits to the methods of instruction and to the general conduct of the school. The improvement in the prospects of the assistant inspector and the institution of the 'sub-inspector' class brought greater experience in dealing with the internal economy and the instructional condition of schools. The sub-inspector—an old teacher of ability—was less likely to be misled by tricks or showy teaching than the superior inpector or his less experienced assistant. His methods were more enlightened than the latter's and more penetrating than the former's; he knew the schools.

The were however two circumstances in this period that tended to confuse or impede inspection, a prevailing indecision or ignorance as to ideals or methods in school organization and teaching, and the system of subdividing the school's activities into watertight compartments for separate grants. Concerning the principle of education those practically interested in the subject had been gradually amassing experieuce and ideas, but it still

remained to carry through the process of sifting and to establish agreement upon fundamental laws. System and rationalisation were awaited. Thus the epoch was one in which the views of inspectors interested in educational progress proved often fragmentary, sometimes illadvised, and occasionally contradictory. In such circumstances in order to secure uniformity in practice regular instructions were issued to inspectors from headquarters. But unfortunately for this policy the central authority was involved in the same perplexity as its subordinates, and its instructions suffered from the hesitation and lack of conviction that come when principles have not been thought out. Nor, of course, will many of their recommendations survive criticism to-day. In 1880 for example the more than dubious method is prescribed of teaching the 'class' subjects (such as geography and history) through the medium of reading books, special sets to be provided for each subject; and confined to that subject only. Inspectors are warned that they may approve or reject schemes submitted to them, but may not originate or suggest schemes submitted to them, but may approve or reject schemes submitted to them, put may not originate or suggest schemes themselves. This is an impracticable compromise between the policies of encouraging the schools to govern themselves and the inspectors to guide their efforts, not only to estimate their worth.

Similarly another circular, after suggesting several objections to the employment of women teachers in the lower classes of boys' schools ends by permitting managers to try the experiment on their own responsibility. The Department had evidently not made up its mind as to the now recognised value of women in the education of little children of either sex.

The movements initiated from the Department were, however, mainly in advance, and inspectors stood to gain from their reception of new ideas and the general educational stir of the time. But so long as the system of individual stir of the time. But so long as the system of individual examinations and payment for results continued, their methods could not make any definite breok with the old routine; and the epoch 1870—1890 is one of comparative stagnation in the art of inspection. The work in fact was largely uninteresting: and the inspector relied upon his leisure hours for the chief relaxation and interest of life. He got his inspection over in the morning, and went shooting with the local squire in the afternoon.

The policy of distributing grants by items in a school's activities was a second hindrance to an inspector's efficiency. There were grants calculated on individual examination in elementary subjects, grants for this and that class subject, grants again on account of individuals successful in

specific subjects, grants for cookery and singing, and for discipline, organization and the general intelligence and quality of the school work.

The inspector's main attention was thus uniformly directed to the same succession of details in every school; there was scant time, whatever his inclination, to consider its individual possibilities or the broader aspects of school life. What pupils did outside the school, their games and pastimes and homework, their physical condition generally, their general reading, the unity of the curriculum or its suitability to local circumstances, the relation of the school to social and industrial opportunities, many of these important bearings of school life got little consideration.*

• DEROZIO.

A halo of romantic interest surrounds the memory of Henry Louis Vivian Derozio, the first Indian poet to respond to the call of the English Muse. Derozio may be counted among those men whom the unanimous consent of their contemporaries marks out for high future distinction, and whose brilliant opening upon life, closed abruptly by early death almost explains and justifies the antique conception of fate and divine envy.

The facts of Derozio's life, thanks to Mr. Thomas Edwards, are now well known; and we may here content ourselves merely by recounting only such of them as were helpful in developing the poet in him, and in creating a taste for English literature among the youths of Bengal.

Born in 1809, the birth-year of Tennyson and Mendelssohn, Derozio, excepting for a break of about a year and a half, spent the entire span of his short life in Calcutta. This short break, which was spent at Bhagulpore, was, however, very rich in formative influences, and marks probably the most important period of the poet's mental development. So wonderfully quick was the development of Derozio's mind that it is difficult to indicate the point where exactly its expansion began. But if any period can be pointed out as the true seed-time of his genius, then unquestionably the poet's life of Bhagulpore should be accorded that distinction.

Here at Bhagulpore the youthful poet drank in all the sweet influences of the country scene around him—the majestic river flowing past the place with traders slowly moving on its breast, thickets and jungles full of teeming life, and the myriad-tinted panorama of the Indian Sunset. Here also were gathered within hearing of the ripple of the Ganges, the first

* From a most interesting Monograph by Mr. H. G. Wyatt Inspector of Schools Rawalpendi Division. Price 8 as.

flowers to be woven into the poet's wreath of song.

Derozio's activities during the last four years of his life are matters of history. Such was the force of his genius that it inspired the more gifted of his pupil-friends of the Hindu College to break away from the bonds of superstition and idolatry which held the Hindu mind of those times, and sounded the herald melody of the spiritual emancipation of the Bengalee nation. But Hindu Society was not then ripe for freedom, and Derozio was made the victim of calumnies. "Ostensibly he was charged with having denied in public hearing the existence of God, of having taught that obedience to parents formed no part of moral duty, and that the marriages of brothers and sisters were innocent and allowable." In spite of his emphatic denial of these monstrous charges, Derozio was forced to resign his appointment in the April of 1831.

Notwithstanding the poet of Derozio's having had to sever his connection with the College, his pupils regularly visited him at his house, and spent hours in conversation with him. Thus he continued to teach at home what he had taught at school—the sacred duty of thinking for oneself in all matters, love of truth, and abhorrence of vice.

But the young poet's brief life was drawing to a close, and on December 26, 1831, he was carried off in a cholera epidemic that was then fiercely raging in Calcutta and its suburbs. "There crowded round his sick-bed, not terrified by the ravages of cholera, but rising above the fear of contagion, the pupil friends of the Hindu College. All through the weary and sleepless nights and days, there watched by the sick-bed of the dying Derozio, Krishna Mohan, Ram Gopal, Moheschandra and others, sharing the anxiety of the poets' mother, and his sister Amelia." But all human help was unavailing, and the weary eyes closed in death on Monday, December 26, 1831. "And there disappeared from the great river of this mortal life one of the most brilliant morning lights that ever sailed down its stream." Destined to end his career when others barely begin theirs, he wanted same four months to complete twenty-three years.

Such was the wonderful life of this great man, every moment of which was intensely lived. Surely, as the poet has said, 'in short measures may life perfect be.'

To the literary historian working in the field of Indian English poetry, the period of Derozio's connection with the Hindu College is full of interest. By feeding his young pupils' minds on all that was best in English literature, and by setting them an object lesson in practical composition, Derozio trained up a number of young men to sound literary taste, and thus to him, more than to any one else, we are indebted for the first fruits of Indian literary activity in the English language.

Derozio's poetical works, as they have been preserved for us, consist of one long narrative poem. The Fakir of Jungheer —and a body of miscellaneous writings including some one hundred lyrics and sonnets. These originally formed the contents of two successive volumes published in 1826 and 1827.

The lyrics display a fairly large range of subjects as a glance at the titles of some of the poems will show :—'The Harp of India'; 'Love's First Feeling'; 'Heaven'; The Tomb'; 'Evening in August'; 'Dust'; 'Night'; 'Sappho'; 'The Neglected Minstrel? They show the poet in a variety of moods, and give evidence of a certain delicacy of touch and some depth of feeling. The following canzonet may be taken as a fair specimen of the poet's work in a lighter vein :—

"Another night!—the planets tune
Their harps to yon attentive moon;
And with my lay I am waiting now,
But gentle listener, where art thou?
"The breeze wakes many an odour sweet
From flowers that bend beneath its feet,
But as it wantons through my bower
It misseth one—one absent flower.
"Waiting its hopeless destiny
The weeping streamlet wanders by,
Yet pitying winds its sorrows hear—
But ah! who heeds my sigh or tear?
"Fair halo round the bright moon shed!
Like wreath around my loved one's head,
Oh! how much fairer thou wouldst be
If but my loved one looked on thee.
"Another night! and see apace
How darkness veils the heaven's blue face,
Thus, thus, too, blackly o'er my soul
The murkiest clouds of sorrow roll.
"Another night! and lo! the breeze
Hath ceased to woo the trembling trees;
And in my bosom sinks the sigh
With which in pangs I burn, I die."

The poem inevitably reminds one of Alfred Austin's exquisite "Night in June'—a poem bathed in the voluptuous beauty of Summer moonlight.

On the same plane of emotion the following poem shows perfect mastery over the common measure :—

"I wrote my name upon the sand
One happy, happy day;
The wave come rolling toward the strand,
And washed my name away.
"It grieved my heart to look upon
That shore so all untrue,
My labour was at once undone;
And then I thought of you.
"I looked upon a gentle flower
The night was weeping on—
Morn brought the daylight to my bower,
Where were the dew drops gone?
"A breeze came o'er the river's breast
It was felt and then it flew
To some sweet place it loved the best;
Why thought I then of you?

"I've given you all I've 'neath heavens.
Immortal memory;
And sad return—you, you have given
Forgetfulness to me."

These lyrics are fairly typical of the rest in the same class. There is in them an ever-recurring note of sadness combined with a rich play of fancy and felicity of phrase. They have about them something of the Elizabethan air of impromptu, and now and then remind us of Herrick. As a lyrist Derozio does not seek after novel forms and ingeniously woven harmonies as do some of the later nineteenth century English poets such as F. W. H. Myers and Dr. Robert Bridges. His measures are simple, and the music is sweet and sustained in its flow.

The lyric inspiration comes to Derozio from the contemplation of the facts of love and death, and of the face of nature in its gentler and more sober aspects. The Moon, the placid river, grasses and flowers bending under the breeze, the night, and above all the sunset, are again and again called in for poetical treatment. The sunset moves the poet in a way as nothing else can; and in his description of a sunset scene there is always a note of tender melancholy. The Neglected Minstrel had once loved. But death has shattered that dream of beauty; and memory now alone remains to add a pang to the minstrels' feeling of lost hope. The death-scene of the Minstrels' loved one is rendered in these lines of quiet sadness:

"Hast thou observed an august sunset sky,
With all its colours purple, gold and red?
How beautifully dies the day! each hue
Fades faintly out of sight, and every change
Makes heaven look lovely, though it brings
Dun night upon the world apace! and thus
Sweetly died she...... .....
....................O Memory!
Canst thou not also die when all we love
Sinks like the lost star from our sight? Ah no!
Thou dost burn like a pale charnel light
Above the grave of hopes, and smiles and joys
Which make life's wake delightful."

As has been noted above it was Derozio's delight often to cultivate "the sonnet's scanty plot of ground." His sonnets are always intimately personal and skilfully executed. By way of an illustration we may quote the one addressed to the students of the Hindu College which is also of some antobiographical interest:—

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds

And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch (like young brids in soft summer hours)
Their wings to try their strength, O ! how the winds
Of circumstance and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship truth's omnipotence ;
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.

Besides the lyrics there is an amount of miscellaneous work in these two volumes—some descriptive poems and ballads. From this mass of miscellaneous work there stands out at least one poem of real power which demands individual treatment. It is a dramatic sketch of splendid conception of a dialogue between a devotee and his disciple. It has for its subject that conflict between the cloister and the hearth, which has been one of the finest themes of imaginative literature in post-Renaissance Europe. It shows how hard human affections die, and how poor substitutes for them are isolation and ascetic discipline. The poem anticipates in a remarkable manner some of the points which Tennyson and Rabindranath have elaborated in masterly poems—the former with regard to intellectual, and the latter with reference to spiritual isolation. Compared with either 'The Palace of Art,' or Deūl, Derozios' poem is crude, and certainly less intellectual. It fails perhaps to see this problem of selfish isolation in some of its larger bea ings. But immature as it is, there is an element of thoughtful suggestiveness in it which redeems it from being merely a pæan in praise of the flesh and the human affections. Here are some of the disciples' arguments against asceticism :

"But all my meditation end in grief,
Because it tells me that I strive to break
The link which binds me to my race whenever
I cast my eyes upon my mother earth,
I think how like a brother I might serve
Her numerous sons."

With, this brief notice of Derozio's lyrical gifts we come now to the consideration of his longest effort, "The Fakir of Jungheera." It is the tale of a mountain outlaw's love and death and in its general outline reminds one of Byron's Corsair. Derozio first conceived the idea of the poem when he was leading the life an indigo-planter at Bhagulpore, in the neighbourhood of which lies the rock of Jungheera—a mass

of grey, granite which starts from the bosom of the Ganges, and towers up to a height of 70 feet. Derozio had once a view of the rocks from the opposite bank of the river which was at the time full and broad, and it struck him then as a place where achievements of love and arms might take place. And the double character of the Fakir together with some acquaintance with the scenery, induced him to form out of these materials a tale of romantic adventure after the manner of Byron.

The plot of the poem may be set off in a few words. Naleeni a young Hindu widow is about to perform the rite of sati when she is rescued by a former lover—the leader of a band of out laws whose stronghold is the rock of Jungheera. Naleeni's father determined to avenge the insult applies to Shah Suja who is then feasting at Rajmahal, and a thousand of the Prince's bravest men are set at his disposal. These are led against the robber chief; and in the raid that ensues, the chieftain is slain and his little band scattered. His body is recognised on the battle-field by Naleeni to whom the shock proves fatal.

"Around these few incidents Derozio's genius has woven some of the finest poetical imaginings." The poem is marked by an even flow of harmony, and a wealth of imagery shot through here and there with the poet's personal emotions. As an instance of the poet's descriptive power we may quote the closing scene of the poem where Naleeni goes out to search the battle-plain for her lover:—

"High from her cloud pavillion, fleecy white,
The moon rains down her showers of icy light,
And worlds in multitudes, resplendent throng
Around her throne, like minstrels, with their song,
Loosening sweet music on the fragrant breeze,
That silent listen to their melodies.
The earth sleeps listless; she will wake again
When morning breaks her dream, but shall the slain
When now upon her bosom cold she bears
Yet find a land unreached by mortal cares—
A morning blushing in a brighter sky?
... ...
Now all around is tranquil as the sea
When hushed it seems in a reverie;
So still, so silent, you might hear the beat
Of your own heart, or seraph s viewless feet.
But lo! alone upon the battle plain,
Pale as embodied moonlight, glides a form,
Like a soft breeze when silenced in the storm!
Is it a spirit from a happier sphere,
Come down to mourn o'er wrecked enjoyment here?

Or learn that earth has lost a paradise?
Or bear a tale of suffering to the skies?
—'Tis poor Nuleeni?-"......

The poem suffers somewhat from having its slender thread of narrative overlaid by descriptive details, and its beauty consists more in the separate parts than in the whole as a work of art. This however, was only what could be expected of a poet who was still in his eighteenth year. The power of artistic selection with reference to the conception of a 'whole' in view, comes late in a poet's career. Thus, for instance, there is in the earlier writings of Keats and Tennyson a *riot* of colour, and imagery, and descriptive details such as are hardly demanded by artistic necessity. It was only with advanced years that these poets—Keats only partially, and Tennyson with some fulness—realised the value of condensation and terseness.

Reviewing the career of Derozio as whole we cannot deny that considering the poet's youth, the vigour and bulk of his works are indeed great. An intellect so untrammelled, and a taste so mature even at the early age of 23, would certainly have brought their possessor the highest celebrity, had they only been granted a few more years to perfect themselves. But when we come to think not of what was promised, but of what was actually achieved, some moderation of our rapture seems demanded. Some have even doubted—among them Mr. W. T. Webb—whether Derozio would have redeemed the promise of his spring. The influence of Byron that is noticeable everywhere in Derozio's writings, and the very degree of finish attained by his first attempts, are arguments against the theory that Derozio, if a longer lease of life were granted him, would have taken a respectable position among the English poets.

But it may be pointed out in reply that 18 is an age when most poets still struggle under the influence of earlier and greater poets to whom they are led by sympathy; and that this inflnence provided that it is good, is not in the least harmful to the development of the young poet's individuality, but on the contrary, is extremely helpful. It is easy to illustrate the truth of the statement. To those who have any acquaintance with Tennyson's earliest poems—his contributions to the Poems by Two Brothers—the Byronic teaching of most of the pieces is evident. Readers of Keats' *Hyperion* know how he was dissatisfied with the Miltonic inversions of its first version, and set about to recast it. Mr. William Watson has confessed with winning frankness how he fell successively under the spells of Shelley, Keats and Wordsworth before he found his own natural voice. In none of these instances has the influence of the earlier poets been baneful so as to stunt the younger poet's originality. Why then should we in the case of Derozio alone suppose that it would not have

been possible for him to attain to a clearer vision, though in the beginning he was apt to be dazzled by the after-glow of the Byronic sunset.

Moreover, lacking nothing in imagination, music, the poetic eye or verse-technique, what Derozio wanted to take his place among the sons of song was the element of thought—the fundamental brain work which is an inseparable requisite of all great poetry ; and this is the very element that advanced years bring and not so much any perfection of finish.

Again, in discussing the works of young writers, cut off in the prime of life by death, it is not very sound criticism to busy oneself merely with the actual accomplishment. What is enough or just is to try to find possibilities of individual development with maturer years. Going by this criterion one will find much in Derozio which promised future expansion.

But when all is said, fancy likes to play round the memory of this inheritor of unfulfilled renown, and in wondering how unbounded was the promise one is apt to lose oneself in an infinitude of vague and tender regret.

SATYENDRA NATH ROY.

GOD'S ANGELS.

BROTHER, the way is dark,
Dark by the river Somme ;
But, list to yonder lark
Singing of home !
Singing of home and rest,
High o'er thy war-worn breast,
The lark goes soaring west—
Singing of home !

Yea, joy is in the song.
Heaven's glory fills the bars
With ecstasy, and shadows long
With gleaming stars—
With stars that float on high,
Like angels passing by,
They gem the dark'ning sky—
Those shining stars.

So, 'mid the storm and stress,
Bidding thy heart rejoice,
Love gives to fearfulness
An angel's voice.
An angel's voice that sings,
A lark on soaring wings,
That heavenward, homeward flings
His angel voice.

The stars that throb and burn
In those expansions fair,
Wait for thy souls' return,
Upshining there—
There by a way of gold,
From whence the mists have rolled,
God and the stars unfold
An entrance there.

GILBERT RAE.

TRAVEL IN WAR-TIME.

I.—THE LONGEST DAY'S TRAVEL ON EARTH.

WERE a volume to be projected on the influence of the world war on the ways and means of travel, few of its pages would make gayer reading than those allotted to the harrowing day inevitably spent at Haparanda and Tornea on the only direct route available to Russia, a journey of which those who are forced to make it will keep untreasured memories till they die. The ideal of travel, as enunciated by R. L. S., was not to go anywhere, but to go. On this day of penance the traveller does neither, but comes to a standstill under conditions that make such inertia anything but enjoyable. First the Swedish authorities must satisfy themselves that he and his belongings can be allowed to leave the country; then their Russian colleagues have to be equally assured that he should be admitted into Russia. It is true that the inquisitors on both sides of the frontier are not only courteous, bat even helpful; and if despatch were added to their virtues they would be patterns for all the world to copy. Yet, be the wayfarers few or many, nine hours would appear to be the shortest time in which it is possible to complete the indispensable formalities. On an occasion last summer an increment of three hundred Russian reservists returning from America added a further two hours to the ordeal, which thus lasted, fortunately in beautiful weather, from seven in the morning to six in the evening.

This, in brief, is what befalls. On the arrival of the train at Haparanda, passports are given up to the police on the train. Special credentials reduced the present writer's detention to a matter of moments, but some of the patients took nearly half-an-hour getting past the aliens officer, and another two hours went in the examination of baggage by the customs. At eleven a crazy and overcrowded steamboat took the entire company across the river to Russian territory, and here two hours more were devoted to the same inspection *de capo*. Why the train for Petrograd could not proceed in the early afternoon is a mystery, as nothing more happened; but it was a little after six when the third bell announced its departure, and during the last four hours of this purgatory the passengers were crowded and jostled on a hot platform with only a few benches. As an alternative, there was a buffet in which, at the modest price of a rouble, one might help himself indefinitely to a score of dishes. Yet such comfort could bring balm only to the soul of a schoolboy on his Christmas holidays.

It would be impertinent for the stranger in the gates to cavil at such delays, but he cannot be expected to

welcome them, and even the railway and other officials would scarcely linger unnecessarily in such a spot. For the passenger with time on his hands the distractions are few and far between, though on this particular occasion the returning prodigals from Chicago furnished some amusement by their frank admission that, in addition to fighting their country's battles, they hoped to avail themselves handsomely of the low rate of exchange by turning their dollars into roubles as a nest-egg when peace should come again. Here was a complex psychology of patriotism and nostalgia and personal profit that challenged analysis. One young Russian on the train, after losing his left leg on the Strypa, had been fitted at Moscow with an artificial substitute of German make, and fully appreciated the humour of his cure. Of the war we had a grimmer token in the shape of a Red Cross train full of dangerously wounded Cossacks who had been exchanged for similar measure of maimed Germans the evening before, and among these the sad-eyed Russian Sisters of Charity moved with words of comfort and gentle hands.

At length the train pulled slowly out into the lovely wilderness of fir-trees and streams that make Finland one of the most witching lands on earth. It was the end of a most imperfect day, an experience tolerable only under the stress of war. Sybarites grumble at hot and dusty days in the train in northern India, in Arizona, or in the Sudan. Let them try the tedium of Tornea, either in northern India, in Arizona, or in the Sudan. Let them try the tedium of Tornea, either in its summer heat or in the frozen horror of its winter, and then they may grumble with full hearts. The trial must be made soon if at all, for with the return of peace both these northern hamlets will unobtrusively be relegated to the nothingness for which they were admirably designed.

II.—ALONG RUSSIAN ROADS.

Those only who have taken charge wounded men in motor-ambulances can do full measure of justice to the evil of the average Russian road ; and, as they vainly try to ease the sufferings of the broken heroes in the stretchers, they bitterly reflect that the only roads in that vast empire worthy of the name are the rivers made by God. For the handiwork of man they acquire a deep and lasting contempt. True, the roads of Turkey are even worse, but their failings excite no comment in the crumbling land of the Ottoman, since the rich Turk stays indoors and the poor Turk tramps barefoot, thankful that so long as he stands upright on his blistered soles these are at least safe from the bastinado. For longer journeys the true believer has his mules or camels, so that even such highways as were constructed in the heyday of his nation, like that which ran from the

Bosporus to Bagadad three centuries ago, have vanished from off the face of the land.

In the present war the lack of good roads is at once Russia's weakness and her strength. It is not to be denied that she felt the want of them woefully when first she hurled her battalions westward against the invader; but the invader felt it too, as was admitted by the German general who, at a meeting of the Higher Command, said, 'It is all very well, gentlemen, to say that Russia made no preparations for this war. Look at her roads !'

There can be little doubt that, with the enemy at her gates before her wonderful rally, the bad roads were Russia's salvation, and the added difficulty of operations in the rainy season lends a curious sense of security, even close to the firing-line. The writer used to go out with an ambulance to pick up wounded from those of the enemy ; yet, with trackless marshes between, the chance of sudden risk was no greater than it would have been in Epping Forest. Only the aeroplane is independent of such lines of communication, and the German airmen make up for the inaction of their friends beneath by bombing every Red Cross camp within reach morning and evening. Now and then they kill a few orderlies or horses, but their achievement consists mainly is sending surgeons, sisters, and chauffeurs scuttling underground like rabbits. To decamp in this way when a man is shaving or pulling on his top-boots is trying to the temper, but the results seem disproportionate to the expenditure of bombs.

To some extent the poverty of Russian climate, since anything approaching a perfect surface is out of the question in a land exposed to such extremes of temperature ; but, even making allowance for natural disabilities, it must be confessed that the Public Works Department has taken its obligations very lightly. After the war, perhaps Russia will put her roads in order, and let us hope that these will reach unto the Bosporus. It will be a needed reform and a worthy crown to her magnificent efforts, for a perfect road is a noble memorial. When Stevenson taught the Samoans to build roads, he did a greater service than by writing *Virginibus Puerisque.* When Wade cut his splendid roads through the Highlands, he won a greater victory than any over the Stuarts.

III.—ACROSS THE TRANS-SIBERIAN

Ten consecutive days in the same train cannot, under even the happiest conditions, be regarded as a pleasing prospect ; and if the Trans-Siberian Railway, the greatest achievement of engineering with the possible exception of the Great Wall, has its drawbacks in normal times, it is not to be expected that in time of war the tourist should be made exceptionally comfortable on a line that is with perhaps one other

exception, the main feeder of Russia's mighty hosts. Yet he can travel in comparative comfort from Petrograd to Vladivostock, which, seeing that, however welcome to the shareholders of the Cie des Wagons-Lits, he is not wanted by the State, is a concession for which he should be too grateful to permit of his grumbling at the reduction of the service to a single weekly train in lieu of three. There has been some talk, indeed, of restricting the available accommodation to men in uniform, though even this would, in Russia, not necessaarily mean the exclusion of civilians, since the railway engineers, students, and Government officials of every grade wear uniform of some sort in that country.

On the whole, the war has made very little difference in the journey beyond necessitating the trains starting on their long journey from the northern capital instead of from Moscow. True, the entire line is under military control, stations and bridges are guarded by Cossacks, and thousands of German and Austrian prisoners are seen working along the line. Such details, however, matter little to the passengers, who are more concerned with the occasional shortage in the restaurant-car. Yet even this is, as a rule, limited to sugar, for which such substitutes as coloured sweets or jam are occasionally supplied, and the only other inconvenience to which the travelling public is put is to be found in the crowded state of the weekly train, the inevitable result of a rigorously curtailed service.

To the observant eye the personnel of the passengers reflects passing events. These included on a recent occasion a Japanese staff-colonel returning home; a couple of Englishmen on their way back from the Russian front, where they had been detailed to the Red Cross; a wounded Russian officer going to Vladivostock to buy salted fish for the army; a few neutrals, mostly Dutchmen bound for Java; and a 'French' Swiss who spoke perfect German. The talk was also of war, and at the more important halts there was ever a rush for war telegrams that had to be translated for the benefit of the English passengers.

This crossing of Asia is of much interest aud no little beauty. West of Urals, it is true, the outlook is as depressing as only Russian landscape can be on the threshold of winter, when the skies are already gray and the earth is not yet beautified by its mantle of snow. Once that range is left behind, the gloom vanishes as if by magic, and there follows a week of uninterrupted sunshine and of scenery far more captivating than is commonly admitted. We are too apt to draw our inspiration of Siberian scenes from those masters of Russian fiction who have described them from the viewpoint of the convict, who, leaving all hope behind when he came into the land of his exile, would see no beauty

in its lakes and forests, but only a prison from which there was no escape save by the gates of death.

Siberia may not give us the best of Canada or California or Norway, but the traveller with an eye to such analogies will see glimpses of all three wonderlands—lake and river and mountain, rolling prairie and silent forest. Of animal life, both wild and domestic, there is greater lack than on any other journey of the same duration. A few hares, an occasional hawk, a brace or two of wild duck on the lagoons, with countless crows and magpies, are all that reward the most patient watcher; while, on the domestic side, pigs, Mongolian ponies (the raw material of future winners on the Shanghai race-course), and, in the easternmost section, strings of two-humped camels, are the only noteworthy stock.

The most picturesque stretch of the journey is that in which the track skirts the shores of Lake Baikal, one of the largest and deepest of fresh-water lakes. Unfortunately this weekly train passes the lake at night, and its presence is betrayed only by a vague glimmer of moonlight, or is missed altogether.

Other evidences of war are met with on the Trans-Siberian, but it would be improper to allude to these. Great reinforcements are continually going west. In the government of Omsk alone a million sturdy fellows, magnificent specimens of men, were being entrained when the writer passed that way. Heavy trucks of ammunition, carefully packed, and inaccessible alike to rain and prying eyes, were also rolling westward to help in the good work, and on all sides there was that atmosphere of law and order suggestive of military control. It is true that cameras, in normal times a distraction on the trip, were strictly forbidden. On the other hand, the expected severity of the customs officials at Manchuria, the frontier station, proved a false alarm, for neither books nor papers were seized, nor were travellers subjected, as freely foretold at Petrograd, to the indignity of a personal search. The *douaniers*, on the contrary, performed their task with a courtesy and despatch rarely experienced, and were apparently interested only in the smuggling of opium and vodka, for both of which they searched the train with startling results. Indeed, the arrest of a woman and a man, the latter in uniform, provided the one exciting episode of the week.

Be it added that the train, having covered several thousand miles, reached Harbin only an hour late by schedule time, an achievement of which some of Russia's neighbours might well be proud.

IV.—DOWN THE YANG-TSZE-KIANG.

In times like these the peace of a great river is worth travelling to see. The river may not be beautiful, for beauty belongs to the little streams

tumble noisily between rocky banks or that twist more silently amid flowery water-meadows. Of either type Britain has abundance. Her greater waters are also picturesque, but Thames, Tweed, and Wye are mere burns by comparison with the Yang-tsze, which comes after the Amazon and the Nile. Such moving roads are navigable for a thousand miles at a stretch, and China is even more than Russia indebted to inland waterways open all the year, carrying an immense burden of merchandise, and supporting a floating population that numbers millions. Up and down this mighty river the natives sail and drift in sampan and in junk, rigged in such fashion as would in happier times have moved Cowes to laughter yet none the less adequate to bring the primitive craft to their destination in far-off days when the men of Hampshire were stained with woad. The persistence of such craft is part of the Chinaman's retort to the mandate that he should order his house on the model of mushroom civilisations that have come and gone while Cathay pursues the even tenor of its way.

True, progress has begun to infect some of China's millions, who now shave the crown and hold republican sentiments; and the new order patronises such hurried modes of travel as the motor, railway, and river-steamer. River-steamers, whether on the Yang-tsze, Mississippi, or Nile, are of one type, shallow of draught, and with one deck so piled on the other as to give a top-heavy appearence to the whole; but the stern-wheelers of the Nile and some American rivers are dispensed with on the Yang-tsze, and are replaced by a more modern type of craft.

The Yang-tsze itself, once we leave behind the imposing interlude of the Gorges some miles above Hankvw, widens to the unlovely replica of all great rivers, its yellow waters racing between distant banks, one of which may occasionally rise above the dead-level to rocky bluffs crowned with fort or temple, according to the requirements of the period. Given fine weather, the descent from Hankow to Shanghai, a matter of six hundred miles or more, is a pleasant experience. The camera gets many chances with the varied river-craft; the sportsman is attracted by the constant passing of ducks, geese, and other wild-fowl; and the student of mankind may spend crowded hours ashore at Kin Kiang, Nanking, and other ports, each of which has its Bund and the inevitable foreign Concessions that show how far China has travelled politically since the days of Marco Polo. Occasional excitement is furnished by the apprehension of an opium-smuggler, or of one of the lesser culprits who live by contraband traffic in salt. The high profits made out of opium make it worth while risking conflict with the customs officers, and, although China has, like her great neighbour in the west, voluntarily renounced a great

State monopoly for the good of her people, thousands of piculs of the drug are still smuggled along the river, and armed encounters and thrilling captures are common-place events.

For the angler the Yang-tsze has little interest. A stream of such colour and volume is not suited to his quiet arts, and his one comfort lies in contemplating gigantic specimens of a hundredweight or more in the local markets, or perchance in watching the interesting spectacle of natives fishing the lower reaches with trained cormorants. This is chiefly practised towards Christmas. The skilled birds voluntarily give up the prize, and the new recruits are forced to do so by the pressure of a collar that prevents them swallowing it.

Many men are drowned in the Yang-tsze. Such tragedies are the inevitable result of the sudden storms, the careless handling of the native craft, and the crowded condition of the slippery wharves. The death-rate from drowning is further aggravated by a widespread reluctance to go to the assistance of of the victim. This attitude is dictated partly by a superstitious dread of defrauding the Water Devil of his legitimate spoils, and partly also by the notion that the rescuer henceforth becomes responsible for the well-being of his protege.

Apart from the Gorges, and from one or two isolated spots on the right bank, this voyage from above Hankow to Shanghai is not remarkable for its scenery, and, since two or three days of such river-travel are more than enough, it is not without relief that the traveller comes to rest opposite the imposing water-front of Shanghai. The river was policed at this spot in time of war by the vessels of the one considerable navy which then had no sterner work on hand. 'Old Glory' floated proudly from the bows, and as the strains of 'Dixie' echoed over the water, Chinamen in the Nanking Road turned their heads and wondered that such music could entertain the children of a civilisation younger than their own.

V.—THROUGH THE MEDITERRANEAN.

Although the historic sea that has seen the rise and fall of half-a-dozen civilisations is framed in beautiful shores, it cannot be claimed that at the best of times the voyage from the mouths of the Rhone to the delta of the Nile is either enjoyable or picturesque, and on the return voyage the omission of the single port of call still further aggravates the monotony of those days of sea and sky. With the Middle Sea a veritable hive of enemy submarines, the passage is still less enviable, though its safe accomplishment by mail-boats reflects the greatest credit alike on our gallant Ally, and is no small tribute to the seamanship of the men on the men on the bridge.

The present writer has made three voyages though the Mediterranean during

the past eighteen months, each more harrowing than the last. The good ship that bore him safely out and home in the second year of the war lies at the bottom, and the good ship that lately brought him to Marseilles had a narrow escape from a like fate in a sea so rough as to preclude any hope of launching boats, so that the appetite of Von Tripitz must have been further fed with the lives of some sixty women and children.

From Bombay to the Canal the voyage is normal. A few extra formalities on embarking or on landing at Aden or Port Said alone suggest conditions out of the ordinary, and only the somewhat official personnel of the company in both saloons brings its reminder of the war. Christmas in the Red Sea is marked by the usual festivities, though it is impossible to resist the grim reflection that all these chilldren enjoying games on deck may next week find a watery grave. The Canal, interesting as ever since the extension of the conflict to its east bank, finds every one in high spirits at news of recent defeat inflicted on the Turks and their German masters, and only as the mail-boat anchors off Port Said does the more serious side of life obtrude itself with the posting of various orders for boat-drill, for the carrying of life-belts or safety-waistcoats, and for the more efficient watching out for the emissaries of the Master Pirate at Wilhelmshaven. Yet even this ever-present menace of death is taken lightly. The women behave splendidly. The mothers hide their anxiety, and join in games with the children. The men play cards or deck-games, and reflect grimly that one day we may hang the Pirate and wipe off old scores.

At last, convoyed by a saucy destroyer, the great liner swings silently past the long mole and into the Sea of Death. Let not the murderers flatter themselves that their frightfulness makes any difference to the life on board. On New Year's Eve, right in one of the most dangerous zones, there is wassail in the saloon, with music and dancing later in the night. The decks may be gloomy with all lights out, but within all is merry, swarm the *untersee* devils never so thick !

Perhaps the most trying feature of this part of the voyage is the absence of news, as the wireless is used only for official purposes, and we are deprived of the usual war bulletins that, east of Suez, linked us with the outer world. Our only distraction is an occasional battleship, a patrol, or a brace of mine-sweepers. Once, indeed, there comes a signal of distress—that appealing S. O. S.—from some sinking ship, but it is taken up by other vessels, and, as we learn later, nearly all are saved.

That this policy of 'sink at sight' causes passing inconvenience to travellers in the Mediterranean is not to be denied ; but as much might be said of many influences of the war on land.

It is a nuisance to have to carry one's life-belt into the dining-saloon for meals. It is a bore to have to interrupt a game of chess or a rubber of bridge for boat-drill. It is a fag to make certain that one's valuables, the notes and other papers sewn in oiled silk, are always on one's person. All this is troublesome, no doubt; but if the perpetrators of these vile outrages imagine that their intended victims pass sleepless nights and anxious days, they are sadly mistaken.

Marseilles at last, one bright winter morning, and then the train through France crowded with all but a handful of passengers who stick to the ship all the way home, so little disturbed by the Frightful Ones that they will not even seek the shorter, safer route to their goal. On this occasion, being on active service, the writer left the ship at Marseilles; but on the last he travelled the whole way to Tilbury without further episode.

Such is the homeward passage in time of war. There are moments, no doubt, in which the sight of little ones, all-unconscious of their danger, playing about the decks fills their elders with quiet horror, but on the whole these go through the days and nights as little troubled by the menace as those who are ignorant of it. Such is the triumph of Tirpitz!

LOVE.

Us from out Thy fulness true
Love doth move Thee to create;
Thee with wider, wider view
In our minds we re-instate;
Thou createst us before,
We create Thee evermore.
Love Thou art, and we are Love,
With Thee we participate;
Thou—below, within, above—
Lordest it in blissful state;
We, Thy ladies, with Thee one,
Feel They self-evolving sun.

ROBY DATTA.